পরিচয়

৪৬

দ্বিতীয় বর্ষ

৯-৩ সংখ্যা

শারদীয়

মতবাদ —

দুর্গাপুজোর আনন্দঘন দিনগুলি আবার এল।
অমঙ্গল আর দারিদ্র্যের হোক চির অবসান,
বিজয়ী হোক প্রগতি আর শুভচেতনা। আজকের
শুভক্ষণে জীবন বীমা নিগমের
এই একমাত্র কামনা।

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

যে বই আপনার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নয়

যে বই নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনার মনমতো ভাষায়, বড় ছোট সকলের জন্য এবং এমন দামে যা আপনার ক্রয়ক্ষমতার বাইরে নয়—

এন-বি-টি-র বইয়ে রয়েছে ওই প্রতিটি আকর্ষণীয় দিক। এন. বি. টি-র গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলো হ'ল—ভারত, দেশ ও দেশবাসী, রাষ্ট্রীয় জীবনচরিত-মালা, নেহরু বাল পুস্তকালয় এবং অপূর্ব আদান-প্রদান।

এন. বি. টি'র কয়েকটি সাম্প্রতিক বই :
একালের মলয়ালম গল্পগুচ্ছ, ৭'৫০ প.; জয়কান্তনের গল্পগুচ্ছ ১০'৫০ প.; ওড়িয়া গল্পগুচ্ছ ৮'০০ প.; সুব্রহ্মণ্য ভারতীর গদ্য-সংগ্রহ ৯'০০ প; হিন্দী একাঙ্ক নাটক ১২'৭৫ প.; পাঞ্জাবী একাঙ্ক নাটক ৯'৫০ প.; আমাদের সূর্য ৫'২৫ প.

এন. বি. টি'র বই সব বিশিষ্ট বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।
এখানেও পাবেন—এন বি টি বুক সেন্টার
৬৭/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক—
এই আমাদের প্রচেষ্টা...

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কাজ করে যাচ্ছে

স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় চাহিদা
মেটানোই আমাদের ব্রত।
এরই জন্যে উঁচুমানের
নানাধরনের ওষুধ তৈরি করা।
এই প্রয়াস এগিয়ে চলেছে—
প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস লিমিটেড
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭১

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়া[redacted]
নামটিকে ঘিরে রয়েছে
নির্ভরতা, চার দশক পেরিয়ে

EIFW/CAS-2/80 BEN

For ERW Steel Tubes
Used For Irrigation,
Construction, Distribution

Contact :

Sekhar Iron Works (P) Ltd

56 CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA-700071
Phone : 44-1384/0945

With best Compliments
from

CHEMEX (India)

19A Jawaharlal Nehru Road
Calcutta-13

Telex CA 2108

Telephone : 237893
233966

Cable—CHEMIND

New Oxford Titles in Economics

MEGHNAD DESAI
Marxian Economics Rs 100

FRANCINE R. FRANKEL
India's Political Economy 1947–1977
The Gradual Revolution Rs 130

SURAJ B. GUPTA
Monetary Planning for India Rs 75

GRAHAM C. HOCKLEY
Public Finance
An Introduction £ 5.95

H. CARTER & I. PARTINGTON
Applied Economics in Banking and Finance £ 4.95

DONALD A. HAY & DEREK J. MORRIS
Industrial Economics
Theory and Evidence £ 7.50

RONALD I. MCKINNON
Money in International Exchange
The Convertible Currency System Rs 25

HENRY PHELPS BROWN
The Inequality of Pay Rs 55

Oxford University Press
P-17 Mission Row Extension
Calcutta-700 014
Delhi *Bombay* *Madras*

— সবারে করি আহ্বান —

"স ম্পু ট"

হাওড়া সুড়ঙ্গ পথের শীততাপনিয়ন্ত্রিত
বাজারের একটি অভিনব বিপণি।

আপনার সংসারের দৈনন্দিন প্রয়োজনে—
কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের
বিপুল আয়োজন ॥

* ন্যায্য মূল্য * সুন্দর ছিমছাম পরিবেশ
* নিশ্চিন্তে কেনাকাটার জায়গা

"স ম্পু ট"

* এখানে পাবেন—

জ্যাম * জেলী * চাটনী * তালা-চাবি * বঁড়শি * লৌহশিল্পজাত
দ্রব্য * পরচুলা * ধূপকাঠি মোমবাতি * মাদুর * ছাতা
বেতের তৈরী সামগ্রী * প্লাস্টিক ও পলিথিন জাত দ্রব্য
খেলাধুলার সামগ্রী * আরও অসংখ্য কুটীর
ও ক্ষুদ্রশিল্প উৎপাদিত রকমারী সম্ভার ॥

★ পশ্চিম বঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প নিগম ★

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩

পঃ বঃ ক্ষুদ্রশিল্প নিগমের প্রচার দপ্তর কতৃক প্রকাশিত ॥

আপনার জীবনের কোনো
কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই
ইউকোব্যাঙ্কের জন্য

যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলতে পারলে ও আর কিছু চায়না। আপনি নিশ্চয়ই চান ছেলে আপনার বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হোক।

আপনার ভাবনার সেই স্মরণীয় মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমরা সাহায্য করব।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ওর সব খেলাই যন্ত্রপাতি নিয়ে। এমনই কোনো মুহূর্তে ওকে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে কি করে ওকে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার করা যায়!

অথচ সম্বল তো মাত্র ওকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন আর মাসগেলে মাইনে।

● অবশ্য এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আছে ইউকোব্যাঙ্ক। মাসের খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু বাঁচাতে পারেন, তাই নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। ইউকোব্যাঙ্কের দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প আপনার কাজে আসবে।

যে মুহূর্তে আপনি স্থির করলেন আপনার ছেলে বড়ো কিছু হবে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যতের সূচনা। আপনার জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাঙ্ক আপনার সঙ্গী।

UCO/CAS-64/80 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

প্রতিবাদের গান / ভালোবাসার গান

অজিত পাণ্ডে

গণসঙ্গীতের শারদীয় রেকর্ড ইনরেকো থেকে

বিষ্ণু দে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অমিতাভ দাশগুপ্ত-র

কবিতার গীতিরূপ

সংসার সুখের হয়
সুগৃহিণীর গুণে।
রান্নার সুস্বাদ হয়
গৃহিণী মশলার গুণে ॥

Ph. 62-2505

Hindusthan Food Products

1 Panchananda Lane

Sreerampur - Hoogly

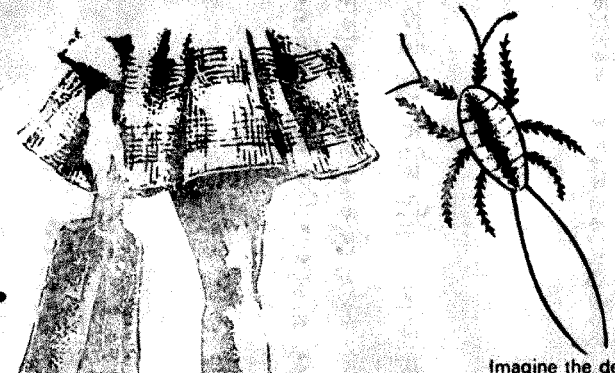

SHELLAC

FOR ANYONE, ANYTHING ANYWHERE

The world of Shellac lies before the twinkling feet of the little girl. The secretions of the microscopic Laccifer Lecca insect is an indispensable part of her everyday life, as it is for almost anyone, anything, anywhere.

Imagine the delight of the little girl as she discovers Shellac. Its reputation as a big, very big foreign exchange earner.

Shellac is in the sole of her shoe as a stiffener for rubber. Shellac as a preservative—in tablets & capsules, in confectionary, in all kinds of foodstuff. Printing ink, so vital for her ever growing world of books, words, pictures, uses Shellac ever-increasingly to enhance colour-intensity and strength of print. Shellac in the flexographic ink used for printing her name across her satchel.

Shellac, impossible to replace in the paint and varnish of beautiful furniture, absolutely essential in the electrical industry, in photography, in cosmetics—in a million other things.

A must for human beings too, anywhere.

SHELLAC EXPORT PROMOTION COUNCIL

14/1-B Ezra Street, Calcutta-700001

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে ঃ গোলাম কুদ্দুস **১৫ টাকা**

লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতই এটিও একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা। ধরলে শেষ না করে পারা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা দিক যা সাধারণভাবে চোখের আড়ালে থেকে গেছে লেখক সেদিকটিকেই সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মানুষ খুন করে কেন ঃ দেবেশ রায় **৩০ টাকা**

চা-বাগানের সমাজকে নিয়ে লেখা একটি চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী উপন্যাস। লেখককে এজন্য অনেক প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোনো সমালোচকই লেখকের সাহস ও বলিষ্ঠতাকে প্রশংসা না করে পারেন নি।

মানুষের গল্প ঃ সম্পাদনা সুনীল জানা/সৌরি ঘটক ১৫ টাকা

বিগত পঞ্চাশ বছরের আন্দোলনের মধ্যে যে কজন উল্লেখ্য কথাকার বাংলা কথা সাহিত্যকে নতুন শক্তিতে শানিত করে তুলেছিলেন তাঁদের ছোট গল্পের সংকলন।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

পাঠকদের দাবি পূর্ণ করে

প্রকাশিত হলো

কলকাতায় গাড়োয়ান ধর্মঘটের চারদিন

(১-৪ এপ্রিল ১৯৩০)

আবদুল মোমিন ২ টাকা

যন্ত্রস্থ :

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ : শংকর চক্রবর্তী

প্যারী কমিউন : অমলেন্দু সেনগুপ্ত

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা : ভি রিডনিক

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

সমস্যার সমাধানে

বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কট সকলেরই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্কটের ফলে রাজ্যের জনসাধারণের দুরবস্থা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। শুধু এ রাজ্যে নয়, বিদ্যুতের অনটন আজ একটি জাতীয় সমস্যা। অন্যান্য রাজ্যও এই সমস্যায় জর্জরিত। পশ্চিমবঙ্গে এই সমাধানে আমরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে নেই। রাজ্যের বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধানে সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করছি। সান্তালডিহি ও ব্যাণ্ডেলের দু'টি কেন্দ্রে আমরা বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াচ্ছি। কোলাঘাট, ব্যাণ্ডেল ও সান্তাল-ডিহির নির্মিয়মান প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হ'লে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা ৯৬০ মেগাওয়াট বেড়ে যাবে। কোলাঘাটে আরও উৎপাদন বাড়াবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে এই কেন্দ্র আরও ৬৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন থেকেই এই কাজ সুরু করা যাবে।

রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ৫টি গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্র চালু করেছি। এর ফলে, এক বছরের মধ্যেই বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ মেগাওয়াট বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এটা কম কথা নয়। না হ'লে এ বছরের বিদ্যুৎ-সঙ্কট আরও তীব্র হ'ত।

অতীতে আর্থিক অসঙ্গতি ও অন্যান্য অনেক অসুবিধা বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার চেষ্টা চলছে। ভবিষ্যতের চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ভাবে পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে জেলাগুলির জন্য পার্বত্য নদীগুলি থেকে আরও বেশী পরিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

উৎপাদন কেন্দ্র থেকে গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার জন্য সারা রাজ্যে নতুন নতুন পরিবহন ও বিবরণ লাইন তৈরি হচ্ছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভাগগুলিকে কর্মমুখী করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও কারিগরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিদ্যুতের অভাবে জনসাধারণের বর্তমানের দুরবস্থা শেষ হবেই। সেইদিন কিন্তু খুব দূরে নয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পুরনে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

॥ কলকাতা—একটি প্রতিশ্রুতি ॥

বিংশ শতাব্দীর শেষ যামে শেষ সলতেটুকু না জ্বেলে না হয় একটা প্রার্থনাই রাখলাম। এই কলকাতা শহরটার জন্য শুভ কামনার প্রার্থনা।

শহুরে সমস্যা নিয়ে অবিশ্বাসীরা তর্ক বিতর্ক করুন বা কবিরা কবিতাই লিখুন। শহর কলকাতার উচ্চবিত্তদের জন্য থাকুক আরও উচ্চাশা কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের জন্য যেন রুটিও থাকে।

বিদেশী পর্যটকদের কাছে এখনও কলকাতার একটা বিরাট মোহ আছে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ধ্বংসের চিহ্ন, নোংরা, জঞ্জাল আর ভাঙ্গচুর রাস্তা ছাড়া শহরের আর কি আছে দেখার মত? এ ছবিও পর্যটকেরা ক্যামেরায় ধরে রাখেন। এটাই কি কলকাতার আসল ছবি? এ দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন দরকার।

কি বিদেশী পর্যটক, নগর পরিকল্পনাবিদ্, ঐতিহাসিক বা গবেষণাকারী সকলের কাছে শহরের আকর্ষণ অনেক, কারণ কলকাতা শুধু শিক্ষাই দেয়না বুঝি বা শিক্ষার ত্রুটিকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

কলকাতার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। এ ইতিহাস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধের গৌরবময় দৃষ্টান্ত। এখানে জীবনযুদ্ধ, যেন ইতিহাস।

আজ কিছু নতুন কথা ভাবতে হবে। শুধু শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে নয়, প্রশস্তি গেয়ে নয়, সমাজের দুর্বল মানুষের কাছে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ তুলে ধরতে হবে। পরিকল্পনা নিতে হবে নতুন নতুন উপনগরীর যেখানে এঁরা সসম্মানে বেঁচে থাকতে পারেন। সেই প্রচেষ্টাই আজ চলছে। এর অংশীদার সি. এম. ডি. এ, আমি, আপনি, সবাই।

আরো জানতে হলে লিখুন—জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম ডি. এ) ৩-এ, অক্ল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭।

আমরা কথা দিচ্ছি জবাব পাবেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংকলিত

বঙ্গীয় শব্দকোষ

দুই খণ্ডে, ক্রাউন অক্টেভো, ২৪৩৩ পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথ ॥ এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল।

রাজশেখর বসু ॥ এই বিশাল কোষগ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে।

নূতন সংস্করণ। ১০০ টাকা

সাহিত্য অকাদেমি

রবীন্দ্র স্টেডিয়াম। কলিকাতা-২৯

যে বইটির জন্য বহু মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন

প্রেমচন্দ : শতবার্ষিকী সংকলন

(শ্রীপত রায়, অমৃত রায় এবং পঃ বঙ্গ শান্তি ও সংহতি সংসদের সৌজন্যে)

সম্পাদনা : প্রদীপ দাশগুপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকা ❁ মরমী জীবন-কথা "কলম কা সিপাহী" এই মহান সাহিত্যিকের রচনার নানাদিক নিয়ে গবেষণামূলক এক্ষগুচ্ছ মননশীল প্রবন্ধ ❁ অনেকগুলি ভিন্ন স্বাদের গল্প, একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস, সুদীর্ঘ বক্তৃতা "সাহিত্যের উদ্দেশ্য" ও সবশেষে লেখা বিস্ময়কর প্রবন্ধ "মহাজনী সভ্যতা"।

॥ এক খণ্ডে একটি অসাধারণ প্রকাশনা ॥

বিশেষ সুযোগ : ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত আঠারো টাকার বই মাত্র চোদ্দ টাকায়।

॥ অন্বেষা ॥

৮৯এ, এন. কে. ঘোষাল রোড,
কলকাতা-৪২

পুজোয় চাই
নতুন জুতো
লিলিপুট ৫৩
সাইজ ৫-৮,
৯-১২
টোনি ১০
সাইজ ৪-৬,
৭-১০
ডায়না ৪৮
সাইজ ৩-৭
মোকাসিনো ১৩
সাইজ ৬-১০
এস্কোয়ার ৫০
সাইজ ৬-১০
Bata

People's Publishing House—A Tradition Unchanged

A PUBLIC FACILITY ITS MANAGEMENT AND THE WORKERS
A Case-Study of Calcutta Tramways: Its Growth and Decay 1939-1975 by Sisir Mitra Rs, 45 00

A COMPREHENSIVE HISTORY OF INDIA Volume Nine 1712-1772
The Mahrata Ascendency. Edited by Dr. A. C Banerjee & Dr. A. K, Ghosh Rs 100·00

SELECTED PAPERS · Angla-Nibandha-Chayana Volume Two by Suniti Kumar Chatterjee Rs. 70·00

AGRARIAN RELATIONS IN INDIA 1793-1947 by Dr. Sunil Sen Rs. 45 00

GANDHIJI—A Study by Hiren Mukherjee Rs. 30·00

ORISSA LEGISLATURE AND FREEDOM STRUGGLE 1912-1947 by K. M. Patra Rs. 48·00

ERNESTO CHE GUEVARA by I. Lavretsky Rs. 20·00 (Library): Rs. 7-50 (Paper).

INDUSTRIALISATION OF INDIA by G. Shirokov Rs. 20·00 (Library); Rs 7·50 (Paper)

PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE
(P) LTD.

5E, Rani Jhansi Road, New Delhi-55.

P. P. H. Showroom
2, Marina Arcade, Connaught Place,
New Delhi-110 001.

সংসদের চিরায়ত বই

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার পদের সংকলন। বহু পদের টীকা। ব্যঞ্জনাযুক্ত শব্দের অভিধান ও পদের বর্ণানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট। সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। [৭৫·০০]

গিরীশ রচনাবলী

গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা পাঁচখণ্ডে সঙ্কলিত। ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রথমখণ্ড ও অন্যখণ্ডগুলি ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [প্রতি খণ্ড ২৫·০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

কথাকোবিদ্ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) তিনখণ্ডে সঙ্কলিত। শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত; জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত। [প্রতি খণ্ড ৪০·০০]

ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তি-সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই বই-এর জন্য সাহিত্য একদমী পুরস্কারে ভূষিত। তৃতীয় মুদ্রণ। [৩০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

বিপ্লবী সূর্য সেন—গণেশ ঘোষ। ৫·০০

দেবাযতন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২০·০০

গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহাব যুগ—ডঃ বিমানবিহাবী মজুমদাব। ১৫·০০

লোকনাট্য যাত্রা গান—মন্মথ বায়। ৫·০০

প্রাচীন ভারতেব জ্যোতির্বিজ্ঞান—অব্দপরতন ভট্টাচার্য। ৮·০০

ছান্দসিকী—দিলীপকুমাব বায। ৭ ৫০

ছন্দোতত্ত্ব ও ছন্দবিবর্তন—ডঃ তারাপদ ভট্টাচার্য। ১৫·০০

দ্বাবিকাদাসের মনসামঙ্গল—সম্পাদনা : ডঃ বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। ২৫·০০

Acharya Prafulla Chandra Roy Birth Centenary Volume 15·00

Agricultural Economics of Bengal—Primal Kumar Roy. 8 00

Calcutta Essays on Shakespeare—Edited by Amalendu Bose. 15·00

Daniel Defoe—His Mind and Art—Dr. Srichandra Sen. 5·00

Education and the Nation—Khagendranath Sen. 30·00

The French in India—S. P. Sen. 7·00

East Indian Bronzes—Edited by Dr. Sisir Kumar Mitra. 140·00

Romance of Indian Journalism—Jitendra Nath Basu. 75·00

প্রকাশন বিভাগ

৪৮, হাজরা রোড

কলিকাতা-১৯

সস্তায় ভালো শাড়ি কিনতে হলে সরকার পরিচালিত দোকানে আসুন

বাংলার ঐতিহ্যময় বয়ন শিল্পের ধারা বহন করে সরকারী উদ্যোগ-এ প্রস্তুত এইসব শাড়ি শুধু দামেই কম নয়, দারুণ টেঁকসই-ও বটে। তার সঙ্গে আছে নতুন নতুন নক্‌সা ও ডিজাইনের বৈচিত্র্য, আপনাকে মুগ্ধ করে দেবার মতো অজস্র রঙের শাড়ি—যেমন পাকা রঙ, তেমনি সুন্দর বুনট, উপরন্তু পাবেন সঠিক মাপ।

১২·৯৫ টাকা থেকে ৬৫ টাকা দামের মধ্যে জনতা, শান্তিপুরী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি, বেগমপুরী শাড়ি পাবেন। এ ছাড়া আছে ৬০ সুতোয় বোনা নানান ধরনের শাড়ি ২৬ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। সব মিলিয়ে যেমনটি আপনি চান।

তন্তুজ ও তন্তুশ্রী দোকানে এই শাড়িগুলি পাবেন। দোকানগুলি কলকাতার রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, শিয়ালদহ, শ্যামবাজার, নিউমার্কেট, বেহালা, দমদম, হাওড়া সারওয়ে মার্কেট প্রভৃতি অঞ্চল ছাড়াও পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত শহরে ছড়িয়ে আছে।

গড়িয়াহাট-এর "গ্রামীণ" ও লিণ্ডসে স্ট্রীটের "মঞ্জুষা"-ও আসতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ১৫৪৯৭।৮০

দশভুজা দুর্গা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

শারদীয়া

শুভকামনাসহ—

নিকোলাস অব ইণ্ডিয়া

মাইক্রোফাইন্ড্ অ্যাসপ্রো প্রস্তুতকারী

অগাস্ট—অক্টোবর ১৯৮০, ৫০ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা

ভ্রমণস্মৃতি। গোপাল হালদার ১
'চরৈবেতি, চরৈবেতি'। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯

ভারতশিল্প ও ধর্ম। নীহাররঞ্জন রায় ৬২
মরমী শিল্পী ও জীবনজিজ্ঞাসু দিলীপকুমার। রাজ্যেশ্বর মিত্র ২৬১
প্রদোষ দাশগুপ্ত-র সাম্প্রতিক ভাস্কর্য
তাৎক্ষণিকের নবব্যঞ্জনা। অজিতকুমার দত্ত ২৬৮
মোনালিসা। পূর্ণেন্দু পত্রী ৩০৬

পরিচয়-এর আড্ডা। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ৯০
সাহিত্যের হট্টগোলে। মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

রবীন্দ্র গীতবাণীর চিত্রকল্প : প্রকৃতি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯
'শিশুতীর্থ'-র পাঠান্তর
রাত কত হল। সুতপা ভট্টাচার্য ২৪৭
যজ্ঞনাথের মই। রুশতী সেন ২৭৫
বিষ্ণু দে : কবিতার পাঠান্তর। অরুণ সেন ১১৫
ঔপন্যাসিকের আত্মপরিচয়
এবং আত্মগঠন : তারাশঙ্কর। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ২০৩
আধুনিক এপিক : 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'। অশ্রুকুমার সিকদার ২২৩

খবর ডায়রি। অজয় দে ৩৩৭
আলোকচিত্র : লেখক

P3284

গল্প

চলিষাছ। অমিয়ভূষণ মজুমদার ২০
অতঃপর। সমরেশ বসু ৪৯
মহালয়ার রাত। বিশ্বনাথ বসু ৩৪২
সই। চিত্তরঞ্জন ঘোষ ৩৫৫
গোনাহ্। আফসার আমেদ ৩৬৭
দেশ। মানিক চক্রবর্তী ৩৭৮
পবিত্রতার অদল-বদল। কেশব দাশ ৩৯৫
সাইক্লোনের চোখ। দেবেশ রায় ৪২৬

বড় গল্প

নবাব ক্লাইভ। অসীম রায় ১২৮

কবিতাগুচ্ছ

অন্নদাশঙ্কর রায, বিমলচন্দ্র ঘোষ, কিবণশঙ্কব সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, মণীন্দ্র বায় ১২৪—১২৭

রাম বসু, আবুল কাশেম বহিমউদ্দীন, তরুণ সান্যাল, শিবশম্ভু পাল, বণজিৎ সিংহ, বত্নেশ্বব হাজবা, কালীকৃষ্ণ গুহ, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, শিবেন চট্টোপাধ্যায, তুলসী মুখোপাধ্যায়, বিতোষ আচার্য, শুভ বসু, শুভাশিস্ গোস্বামী, অনন্ত দাশ, গোবিন্দ ভট্টাচার্য, সত্য গুহ, অজিত পাণ্ডে ২৯০—৩০৫

অরুণ মিত্র, কৃষ্ণ ধব, শঙ্খ ঘোষ, সুনীলকুমার নন্দী, বীবেন্দ্রনাথ রক্ষিত, গোবিন্দ চক্রবর্তী, সুপ্রিয মুখোপাধ্যায়, গৌবাঙ্গ ভৌমিক, জিযা হাযদাব, কবিতা সিংহ, বাসুদেব দেব, সামসুল হক, মৃণাল বসুচৌধুরী, অমিতাভ গুপ্ত, শংকব দে, রবীন সুব, কিবণশঙ্কব মৈত্র, সুমিত নন্দী, দিলীপ সেন, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, প্রদ্যুম্ন মিত্র, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দদুলাল আচার্য, দেবকুমাব গঙ্গোপাধ্যায, অনুবাধা মহাপাত্র, শক্তি চট্টোপাধ্যায, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বব সেন ৪০৬—৪২৫

প্রচ্ছদচিত্র

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

ভাস্কর্য

প্রদোষ দাশগুপ্ত, শর্বরী রায়চৌধুরী

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয়-এব পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

দীপেন্দ্রনাথ রচনাসমগ্র

দীপেন্দ্রনাথ রচনা সমগ্রের যাঁরা গ্রাহক হয়েছেন তাঁরা ও আরো অনেকেই প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের কাছে খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন মাঝে-মাঝেই। প্রকাশনা-প্রস্তুতিতে আমাদের প্রধান প্রাথমিক বাধা ছিল দুটি। এক : তাঁর সমস্ত রচনা, বিশেষত বাল্য-কৈশোরের রচনা খোঁজ করা ; দুই : আর্থিক ব্যবস্থা। প্রথম বাধাটি, একটু দেরি হলেও, এতদিনে উতরনো গেছে। দ্বিতীয় বাধাটি সম্পূর্ণ কাটে নি। শম্ভু মিত্র অভিনীত নান্দীকার-প্রযোজিত 'মৃচ্ছকটিক'-এর একটি অভিনয়ে বিক্রয়লব্ধ টাকা ও কিছু গ্রাহকচাঁদা আমাদের প্রাথমিক মূলধন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রকাশনার সাহায্যের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল। তাঁরা কিছু জানান নি।

এই অবস্থায় আমরা 'কালান্তর প্রেস'-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের স্বতঃপ্রণোদিত প্রস্তাবের ওপর নির্ভর করে এই সংকলন ছাপার কাজ শুরু করছি।

আমরা আশা করেছিলাম, নভেম্বরেই ছেপে উঠতে পারব। কিন্তু শারদীয় সংখ্যার কাজ ও অন্যান্য কারণে তা হয়ে উঠল না। পুজোর পর থেকে ছাপার কাজ শুরু হবে ও আশা করি দু-তিন মাসে শেষ হবে। একটি খণ্ডের এই সংকলনে দীপেন্দ্রনাথের নির্বাচিত বাল্যরচনা ও সাংবাদিক রচনা এবং সমগ্র সাহিত্যরচনা অন্তর্ভুক্ত হবে।

আনুমানিক দাম ছাপা কিছুটা এগোলে স্থির করা যাবে।

'The child'-এর ইংরেজি পাঠান্তরের শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৪	২২	dea	death
২৫৫	১৫	wases	wanes
২৫৫	২২	frenze	frenzy
২৫৫	৩০	bubling	bubbling
২৫৬	১	night, this	night, is this ?
২৫৬	৭	fine	fire
২৫৮	১৬	sleepers	sleepless
২৫৮	১৭	All	Are
২৫৯	১৪	threst	threat

৪১০ 'ছায়ামুকুট'-কবিতাটির কবির নামের শুদ্ধপাঠ 'সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়'

ভ্রমণস্মৃতি

গোপাল হালদার

'আকাশবাণী' কলকাতা থেকে বলছিল (১০ই জুলাই, ১৯৮০) আষাঢের এই কৃষ্ণদশমীতে পাওযাপুবীতে ভগবান্ মহাবীবের তিবোধান—জৈনদেব উৎসব পালিত হচ্ছে এখন সেখানে। পাটনায বসে আমি শুনছি—পাওযাপুবী তো নিকটেই। গৌতম বুদ্ধ আব জৈনদেব শেষ গুরু মহাবীব বাজগৃহ অঞ্চলেই বেশি সমযে বাস, প্রচাব ও পর্যটন কবেছেন। অবশ্য সে খ্রী পূ ষষ্ঠ শতাব্দীব কথা। দুজনাই সমসাময়িক, এক অঞ্চলেব মানুষ, শাক্য ও লিচ্ছবী দুই-জন শাসিত গোষ্ঠীব। বলতে গেলে দুজনাই 'বিহাবী', অবশ্য যখন 'বিহাব' জন্মায নি। মগধ তো এখনকাব বিহাবেব অংশ। সেই মগধে ভাবতবর্ষেব প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। বাজগৃহেব অন্য নাম নাকি ছিল মগধপুব। অবশ্য বাজগৃহেব তাব চেযেও প্রাচীনতব নাম 'গিবিব্রজপুব', 'মহাভাবত'-এব জবাসন্ধেব বাজধানী—এখনো সকলে জবাসন্ধকেই জানে। মহাবীবকেও জানি—জৈনদেব আর্থিক বল ও মন্দিব নির্মাণেব তৎপবতা বাধা মানে না। বুদ্ধকেও এখন আবাব 'ভাবত দ্যাট ইজ ইণ্ডিযা'তেই জেনেছে—যদিও তার নাম ও কথা বিহাবে পঞ্চাশ বৎসব পূর্বেও ছিল প্রায বিস্মৃত। কজন জানত 'নালন্দা'র নাম, 'বৈশালী'ব খোঁজ, কিংবা অশোকেবই কথা তখনো পাটনাতে?

কিন্তু পাটনা বা বিহাব কেন, ভাবতবর্ষেই বা আমবা কত দিন জেনেছি ইতিহাসেব এই অধ্যায? জযদেবেব দশাবতাব স্তোত্র ছাডাও এখানে-ওখানে উঁকি দিত 'নাস্তিক'রূপে বুদ্ধেব নাম ও তাঁব তত্ত্ব আমাদেব হিন্দুদেব শাস্ত্রে—ঐ পর্যন্তই। আজ আমাদেব বাঙালিদেব একটা সৌভাগ্য—ইংবেজেব ভাবত-সাম্রাজ্যেব প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা। সেখানেই তাব উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য, থিযেটব, মুদ্রণ-প্রকাশন থেকে 'ভাবতবিদ্যা'ব চর্চাবও প্রাবম্ভ। এশিযাটিক সোসাইটিতে জেম্‌স্ প্রিন্সেপ পাঠ কবলেন ব্রাহ্মীলিপি আব আমবা পেযে গেলাম 'দেবানং প্রিয প্রিযদর্শী বাজা' অশোকের পবিচয। ম্লেচ্ছ গুলডেনবুর্গেব 'বুদ্ধজীবনী'ব খবব পৌঁছয জাহাজে কবে গঙ্গাব ঘাটে, তাই জানলাম গৌতম বুদ্ধর জীবনকথা। তাবপব তো কথাই নেই—কলকাতাই ছিল সমস্ত এশিয়ায ইংবেজেব বুর্জোযা সংস্কৃতির

ক্লিয়ারিং হাউস। তাতেই তো আমরাও বাঙলা রিনাইসেন্সের পশরা খুলতে লাগলাম, হয়ে পড়লাম প্রিন্সেপ-শিষ্যরূপে গুলডেনবুর্গদের দূর পরম্পরায় বুদ্ধ-অশোকের ওয়ারিসান এবং সত্যসত্যই বাঙলা রিনাইসেন্সে হল বাঙালির ডিসকভারি অব্ ইণ্ডিয়া—অনুবাদে অনুবাদে বেদ উপনিষদ মহাভারত রামায়ণ অষ্টাদশ পুরাণ বাঙালিদের হাতে এসে গেল তখন থেকে—আর ধর্মপদ বৌদ্ধ-সংস্কৃতি, অশোকের ধর্ম বিজয়ের কথাই কি বাদ রইল?

একটা কথা তবু মানতে হবে--ইতিহাসের হাড়গোড় মিলিয়ে শারীরিক শাস্ত্র লেখা যায়, রূপ দেখা সহজ নয়। কিন্তু সে হাড়েই নিশ্বাস-প্রশ্বাস খেলে গেল এক কারণে—সৃষ্টির যাদুতে। সে শিল্পসাহিত্যের ছোঁয়াচে ফা-হিয়েন, হিউ-এন-ৎসাং-এর সূত্র ধরে কানিংহামের ধারায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা আমাদেরও রাজগৃহ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, বরাবর পাহাড় চিনিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'ভারতবিদ্যাই' হোক, 'দিব্যবদান' হোক, 'মহাবস্তু'ই হোক, 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' হোক, কার সাধ্য হতো এমন করে মাতাতে মন যেমন করেছে বাংলা কবিতা

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল পদনখকণা তাঁর

রাজগৃহের বুদ্ধস্তূপ, শ্রাবস্তীর নগরপ্রান্তের অজ্ঞাতনামা ভিখারিণী, মথুরাপুরীর পরিত্যক্তা মৃত্যুমুখিনী বাসদত্তার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের আশ্বাস 'এসেছি বাসবদত্তা', পঞ্চক-মহাপঞ্চক, চণ্ডালিনী-কন্যা প্রকৃতির তপস্যা—অন্যদিকে রাজগীর, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, বরাবর পাহাড়ের 'সুপিয়া' গুহা—সব মিলিয়ে ইতিহাসে আমাদের রক্তের মধ্যে জিইয়ে উঠল।

পঞ্চাশ বৎসরের বেশি পাটনায় যাই, আসি। আত্মীয়-স্নেহ আর গোয়ানিজ রান্না-খানা—ওসব চর্ব-চোষ্য-লেহ্য ইতিহাসের হাড়গোড় নয়, 'ঐতিহাসিক সত্য'। তখনো পাটনার শিক্ষিত সাধারণের কাছে রাজগীর ছিল কুণ্ডের পুণ্যজল, নালন্দার নাম ঢাকা পড়ে আছে অদূরস্থ বড়গাঁয়ের ছায়ায়, পাটনার সীমান্তে কুমরাহারে কে দেখে মৌর্য রাজসভা? অবশ্য কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের ভারত-সন্ধান বৃথা যাবে না—এখন তাই স্বাধীনতার পরে বুদ্ধ-অশোকের নামের মার্কা দাগা হয়েছে রাস্তায়, দোকান-পাটে, একালের নেতাদের নামের সঙ্গে। তখন আমি কুমরাহারে আর পাটনার নিকটে এদিকে-সেদিকে পথে-মাঠেও ঘুরতাম—ভালো লাগত ভাবতে মগধের আদল বুঝি বিহারের মুখে, সেকালের আদল একালের গাঁয়ে, বুদ্ধ-

মহাবীরের তপস্যার ছাপ গান্ধি-যুগের মানুষের মনে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দরের সুরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য যদি অক্ষয়কুমার সরকারের মতো বিচক্ষণ সাহিত্য-গুরু বর্ধমানে যেতে পারেন, আমি শ্রীমতীর দীপাবলি-প্রজ্জ্বলিত স্তূপমূল আবিষ্কারে রাজগীর গেলেই বা কী অন্যায় হত?—নিশ্চয়ই না। তবু যাই নি। অন্তত যেতে-যেতে দেরি হল; শেষে মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হতে তিন অধ্যাপক জ্যেষ্ঠ বললেন, 'তাই তো, রাজগীর-নালন্দাও এখন পর্যন্ত দেখি নি।' তাঁদের অনুগামী হয়ে আমিও চললাম ভারত ভ্রমণে অর্থাৎ রাজগীর দর্শনে। সেই আমার প্রথম রাজগীর দর্শন—ইতিহাস দর্শনও।

পঞ্চাশ বৎসরের বেশি হল। তার কী মনে আছে। জানা কথা সব মুছে গিয়ে যা মনে থাকে তাই নাকি কালচার, অন্য সব শ্রুত ও দৃষ্ট বিস্মরণীয়, মনে রাখবার মতো নয়।

বখতিয়ারপুর থেকে ছোট লাইনের রেল—মাইল পঞ্চাশের পথ ঘণ্টা পাঁচেকে 'উত্তরিবে'—অশ্ব লৌহরথ। যতটা এ রথ চলে তার চেয়ে থামে বেশি। চারদিকে খোলা মাঠ, চষা ক্ষেত, পাকা ফসল ভরা, ক্ষেত আর ক্ষেত আর ক্ষেত। এ পাকাশস্যের ক্ষেত দেখে-দেখে নাকি বুদ্ধদেব শ্রমণদের চীবরের পীতাভ রঙ ঠিক করেছিলেন। সে ক্ষেত, সে ফসল, সেই রঙ, অবারিত মাঠ, এদিকে-ওদিকে—কিন্তু শীতের অবারিত বাতাস খদ্দরের ধুতি-কুর্তা-চাদরের বারণ মানে না, প্রায় কাঁপুনি ধরে। কিন্তু যাত্রীরা সকলে না হোক, মাঠের ওরা সবাই তো ওরূপই, কাপড়ই পরা, তবে আরও ছিন্ন, আরও জীর্ণ, আর মলিন তো নিশ্চয়ই। অবশ্য মাঠে রৌদ্র আছে। সোনা-ঢালা শস্য। ভিক্ষুদের যাই হোক, এত সামান্য পরিধেয়ে সর্বত্র চলে না। ভেড়ার লোমের হাতে-বোনা কম্বলে পথের লোক ও গাড়ির যাত্রীরাও মাথা-দেহ জড়িয়ে চলে। পশমের চাদর কারও কারও আছে। তারা মুখিয়া গোছের মানুষ। সামনের বেঞ্চেই—খানদান কেউ হবেন—আছেন একজন। ভিন্ন রকমের জামা-কাপড়, ভিন্ন রকমের মানুষও, তা বোঝা যায়—বিশিষ্ট মুসলমান। দামি ইজের-আচকান, অবশ্য দুএকদিনের পরা হলেও ফর্সা—আধ-ছাটা দাড়ি গোঁফ, মাথায় পশমের টুপি, কাঁধে তুষের শাল, মুখে-চোখেও মালিকের গর্বের ছাপ, খানদানি না বলে সাধ্য কার? গাড়ির অন্যেরাও দেখছি সমীহ করছে। আমরাও করছি। বাঙালি ভদ্রলোক দেখে কিন্তু নিজে থেকেই তিনি আমাদের সঙ্গে কথা পাড়লেন—কে কোথায় যাচ্ছি, শিক্ষিত

মুসলমানের হিন্দুস্তানী। পাটনাই অধ্যাপক দুজনা কতকটা মুসলমানী আদব সহবতে হুজুরের কথার উত্তর দিলেন। দুপক্ষের সমুচিত সহবতে পরিচয় হল। সাহেব বিহারশরীফে নামছেন—ওখানকারই খানদান। পুলিশের কাজ করেন দারোগা সাহেব। ছুটি নিয়ে এসেছেন বাড়িতে। শহরে গেছলেন—অফিসার ও দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে। খামারবাড়ি দুটো মুনিষকে হাজতে রেখেছিল দাঙ্গার নালিশে, ছাড়াতে হল। প্রজা-রায়ত বে-তরিবৎ হচ্ছে কংগ্রেসওয়ালাদের দেখে-দেখে। দাপট না দেখলে ঠাণ্ডা থাকে না। হেসে জানালেন। বিহারশরীফের মালিকরা জবরদস্ত। আমরাও তা বুঝতে পারছিলাম দেখে ও কথা শুনে। 'ওদন্তপুরী বিহার' এখানে কোথায় ছিল? কিন্তু তিনি ওসব নামও শোনেন নি। এক সময়ে ছিল কোথাও, কিন্তু বিহারশরীফ তো তুর্ক বিজেতাদেরই আস্তানা। অবশ্য সে জমানা নেই, কিন্তু তাদের বংশধররা আছে এ অঞ্চলে সবাই তা মানে। এককালের তুর্ক না পাঠান শাসক স্মৃতির সঙ্গে একালের শাসক-গোষ্ঠীর দারোগার ক্ষমতা মিলে তাকে দিয়েছে সেই আত্মপ্রত্যয়, আর অন্যদের দিয়েছে হুজুর সাহেবদেরকে মানবার অভ্যাস। দুপক্ষেরই চলায়-বলায় তা দেখছিলাম। স্টেশন মাস্টার, অন্য কর্মচারী, যাঁরা তাকে দেখছেন, সসম্ভ্রমে দারোগা সাহেবের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তিনিও খবরদারি করে তাদের কৃতার্থ করছিলেন। বিহারশরীফ এলে তিনি আমাদেরও আপ্যায়িত করে নামলেন—দু-একজন ছুটে এল। হুজুরের মালপত্র নিয়ে চলল।

দারোগা সাহেব চলে গেলেন। যারা নামবার উঠবার উঠছে, রৌদ্র ওঠায় শীত কমেছে। তবে হাওয়ায় শীত লাগবেই। আর চারদিকে খোলা মাঠ। চাষা মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে এখানে-ওখানে। সেই ক্ষেত, পাকা ফসলের হরিদ্র শ্যামল বিস্তার। 'বড়গাঁও' এল—এখান থেকে মাইল খানেক উত্তরে নালন্দার নতুন খোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আবিষ্কৃত অবশিষ্ট। কাঁচা গ্রাম্য পথ, দু-একটি এক্কা, এক-আধটি গ্রাম্য মানুষ নামল, এক আধটুকু ব্যবসায়ের মালপত্রও নামছে। পিলাত পেরিয়ে গেল—শীলভদ্র মোগ্‌গল্লায়নের স্থান এখনো চিপিটক আর খাজার জায়গা। চিপিটক নিশ্চয় আবহমান দেশি উৎপাদন, খাজা মুসলমান দান। ফেরার পথে দুই গ্রহণ করা যাবে। রাজগীর এসে যাচ্ছে, এসে গেল। সামনে পাহাড়, কিন্তু একালের রাজগীর তার বাইরে—পাহাড়ের গায়ে নয়। বড় গ্রাম, বাজার, দোকানপত্র, আর তা ছাড়িয়ে জৈনদের গোটা তিন ধর্মশালা—শ্বেতাম্বরী, দিগম্বরী কোনটায় যাই?

'It's a choice between September and December,' বললেন রসিক আমাদের অধ্যাপক বন্ধু। choice-ও করা গেল। একটাতে শীতের বিছানাপত্র রেখে চললাম পুরাতন্ রাজগীর দর্শনে—অথবা গিরিব্রজপুর সন্ধানে এবং 'রাজগৃহ' খুঁজতে যেখানে শ্রীমতীর প্রদীপ-জ্বালা স্তূপমূল। বিপুল-বৈভার দুই পাহাড়ের পাশে 'রাজগৃহ'—এপাশে বাইরে, ওপাশে ভেতরে সেখানে অন্য অন্য পাহাড়ে ঘেরা বড় উপত্যকা—রাজপুরী হয়তো সেখানেই ছিল আর তাই নাম গিরিব্রজপুর। পাহাড়ে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত সেই নগরের উত্তরের প্রবেশপথই এখন পথ—পাহাড়ের বাইরে সে পথের দুপাশেও প্রাচীন 'রাজগৃহ' পূর্বে স্তূপ ছিল। এখন আছে ব্রহ্মদেশীয় অতিথিশালা। পশ্চিমে ছিল হয়তো আরও বেশি কিছু। প্রাচীরে পরিখায় ঘেরা ছোট অজাতশত্রুর গড়, অশোকস্তূপ। আপাতত থাক, অপরা আগত-উপত্যকায় ছায়া নামছে। সেখানেই আগে চলি উত্তর দ্বার দিয়ে। ডানে ফেলে গেলাম সরকারি 'রেস্ট হাউস'—রাজপুরুষদের আরাম করবার 'আস্তানা'। দু-পাহাড়ের মাঝখানকার প্রকাণ্ড ছেদের মধ্য পথ। তার আগেই দুদিকে বিশাল সাইক্লোপিয়ান ওয়াল—নামেও যেমন আসলেও তাই—মাইল সাত-আটের উপত্যকাকে ঘিরে পাহাড়ে পাহাড়ে গড়া প্রাচীর। আসুরিকই বটে, ভারতবর্ষে নাকি এমন প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সাইক্লোপিয়ান্ প্রাচীর আর নেই। কাদের কাজ ইতিহাস না জানলেও আমাদের বলতে বাধা কি? জরাসন্ধের—অসুর সে ছাড়া আর কে? অসুর, দানব, দাস-দস্যু, নাগ, রাক্ষস এসবই তাদের নাম যারা ভারতীয় আর্যদেরও পক্ষে দেশের আদি-অধিবাসী। ইতিহাস হাসবে এ কথায়, কিন্তু তার হাড়গোড়ের তুলনায় এ কীর্তি যে এখনো সত্যই দুর্জয় স্পর্ধা। ইতিহাসের দর্শনীয় নয়, প্রাগৈতিহাসিক। তা ছাড়িয়ে পূর্বে বিপুল, পশ্চিমে বৈভার পাহাড়ের মধ্য দিয়া গেলাম রাজপুরীর রাজগৃহে।

লোকজন বিশেষ নেই, তবে যা আছে তারা দু-দশজন পশ্চিমে পাহাড়ের গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে—সেখানেই উষ্ণ প্রস্রবণগুলি নাম পেয়েছে সপ্তর্ষিকুণ্ড ও ব্রাহ্মকুণ্ড। পুণ্যতোয়া লোকে স্নান করছে—শীতের অবেলাতেও স্নানে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু আজ আর সময় নষ্ট করা নয়। পাহাড়ের গায়ে একটু উপরে একটা বাঁধানো চত্বর—তা নাকি জরাসন্ধের বৈঠক। তার একদিকে একটা পাথরের কুঠুরি, সমস্ত রাজগৃহ দেখা যাবে নিচে বিস্তারিত, কে একজন দেখছিলেনও। আমরা ভাবলাম—ওপর থেকে কিছু দেখা যাবে না, নিচে

থেকেই দেখি। নিজেদের পড়ামতো খুঁজে নিতে হবে, তবে কেউ না বললে তা সহজ হবে না। ভাগ্যক্রমে সহায় জুটে গেল।

কুণ্ডের দিক থেকে একটা গোলমাল উঠছিল, দু-একজন খুব চিৎকার করছিল। এগিয়ে গিয়ে দেখব নাকি? আমরা বিদেশী মানুষ, তা ঠিক হবে না। তবু চোখ কান সেদিকে রইল। দেখলাম—কে একজন ত্বরিত পদে সে হল্লার মধ্যে গেল। তারপর কী সব কথা হল। উচ্চ কণ্ঠগুলি নিচু হল। ক্রমে থামল। হল্লার কারণটা বুঝলাম। কে একটা অচ্ছুৎ এসে নেমেছিল সপ্তর্ষি কুণ্ডে। ধরে ফেলে পুরুত দুজন। তাই চিৎকার-মারধোর। কিন্তু যুবকটি বোঝাচ্ছে—অচ্ছুৎ হলে কি হয়, ও তো নারায়ণ। তাছাড়া কুণ্ডের জল অপবিত্র হয় না; সকলের পাপ ধুয়ে যায়। পুরুতরা কি মানুষ না। তবে এ যুবকটির এ অঞ্চলে গান্ধি মহারাজের চ্যালা বলে নাম আছে, তাই এবারকার মতো ঐ অচ্ছুৎকে ছেড়ে দিলে। ভাবলাম, গান্ধিজীর জোর আছে। রাজগীরে গৌতমের আনন্দেরও এই সাধ্য হতো না।

মানুষটি এদিকে আমাদের নিকটে এসে গিয়েছেন। বিশ-পঁচিশের যুবক—ভদ্রদর্শন; পরনে পরিষ্কার খদ্দরের ধুতি-ফতুয়া-মোটা চাদর, মুখে শান্তশ্রী—আমাদের নিকটে এসে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা কে, কেন এসেছি। ভদ্রভাষী—আমার পরিধেয়েও তার দৃষ্টি পড়েছিল হয়ত। আমাদের উদ্দেশ্য শুনে বললেন—সন্ধ্যা হয়ে যাবে—তখন কিন্তু নানা বন্যজীবও বেরুবে। তার আগে কী কী দেখা সম্ভব জানতে চাইলাম। তিনি অবস্থাটা বুঝলেন, বললেন, চলুন। অদূরের একটি বৃদ্ধ গ্রাম্য অনুচরকে নিজের কুঠুরির পাহারায় পাঠিয়ে—চললেন আমাদের সঙ্গে। দেখিয়ে চললেন সঙ্গীটি—এত সুযোগ আশা করি নি—এত সৌজন্য। এই সাজ-ভাণ্ডার প্রশস্ত গুহা। সামনের প্রশস্ত চত্বর—এইখানেই বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে প্রথম মহাসঙ্গীতি বসে। প্রথম বুদ্ধবচন সংগৃহীত হয়—পাহাড়ের এ পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলে বাণগঙ্গা, জীবকের উদ্যান, দক্ষিণ-পশ্চিম দুয়ার। তারপর মনিয়ার মঠ দেখতে গেলাম। রাজগীরের প্রায় মধ্যখানে খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে ছোট গোল আকারের এক মন্দির। এও নাকি প্রাগৈতিহাসিক বস্তু—মণি নাগ ছিল এখানকার রাজা—অপরাহ্নের অস্পষ্টতায় মন্দিরগাত্রে দেখলাম নাগমূর্তিও আছে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে। নাগ জাতি ও নাগ পূজার সঙ্গে তা হলে রাজগৃহের সম্পর্ক

আদিপর্ব থেকে। চারদিকে ছোট ছোট গাছ-গাছড়ার বন; ঘন নয়, কিন্তু বন, তার মধ্যে কাঠ কুড়োতে যারা এসেছিল বা মহিষ চরাতে, তারা ফিরে যাচ্ছে—বাইরের গাঁয়ের গৃহে। পথরেখা ধরে আমাদের সঙ্গী বন্ধু নিয়ে গেলেন বিম্বিসারের কারাগারে—উত্তর-পূর্বে গৃধ্রকূট পাহাড় খাড়া উঠে গিয়েছে। নীচ থেকে এই কারাগারের গবাক্ষ দিয়ে বন্দী বিম্বিসার দেখতেন—সূর্যোদয়ের পটে ভগবান বুদ্ধ ওই গবাক্ষের নিকটে পদচারণা করতেন। এককালে অনেক স্তূপ ছিল ওখানে। এদিক দিয়ে উঠবার পথ নেই, আর সময়ও নেই। সূর্যাস্তের সঙ্গে পাহাড়ের ছায়া ঘন হয়ে উঠছে, এখন ফেরা উচিত।

ফিরতে ফিরতে সঙ্গী যুবকটিরও আমরা পরিচয় নিলাম। বেশি বলতে চায় না নিজের কথা। এদিকেরই একটি গাঁয়ের মানুষ। এখানে দিন দুই থাকতে এসেছে ওই কুঠুরিতে। পড়াশুনা করত, কিন্তু শেষ না করতেই গান্ধিজীর ডাক এল। সে স্কুল ছাড়ে, সত্যাগ্রহে জেলও হয়েছে। এখন একটা জাতীয় পাঠশালা করেছে গাঁয়ে। বলতে বলতে এসে গেছলাম তার কুঠুরির দিকেই—আমাদের তার আস্তানায় নেবে—জরাসন্ধের বৈঠক থেকে রাজগৃহ দেখতে পাব। কিন্তু রাত্রিতে কী আর দেখব? সারাদিনে ক্লান্তও সকলে। আমাকেই যেতে বললেন। আমারও আগ্রহ একটু ছিল দেখি ওর জীবনযাত্রাও। কিন্তু দেখতে গিয়ে যা বুঝলাম তা আগে ভাবি নি। কুঠুরিতে এক বৃদ্ধা—যুবকটির মা, যুবকটিকে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন—ছেলে যাবে না। আমাকেই বৃদ্ধা সুপারিশ ধরলেন। দেহাতী ভাষা না বুঝলেও ব্যাপারটা বুঝলাম—তার বড় ছেলে কালেক্টর সিং-এর নামে বৃথা লাগিয়েছে এই ছোট ছেলের এক কংগ্রেসিয়া দোস্ত। কালেক্টর সিং ভারি আদমি, সম্পন্ন ভূমিহার, তাদের এক বর্গাচাষী রায়তকে আর তার ব্যাটাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে নতুন পুত্রবধূর সঙ্গে কালেক্টর সিং রাত কাটিয়েছে। কথাটা মিথ্যা। তবে যারা তাদের জমি চাষ করে তাদের খেয়ে পরে মানুষ, তাদের বাড়িঘরের ওপর দখল তো বরাবরই মালিকের। সে দিনের কথা মিথ্যা। ছোট ছেলেকে ঘরে নিয়ে যেতে এসেছেন মা। ওরও তো ঘরে বউ আছে। একটা বাচ্চাও আছে। বাড়ি যাক। ঠিক না? কিছুই জানি না, বুঝি না এ সব কী কাণ্ড!

ছোট ছেলে আমার চোখের দিকে একবার তাকাল। বুঝলাম—পীড়িত বোধ করছে। ঘর থেকে সে কিছু ফল সঙ্গে নিয়ে আমাকে জানালে—

দেবি হচ্ছে বাবুসাহেবেরা বসে আছেন—পথও ভালো নয়। কথা বললে না আর—থলে শুদ্ধ ফল বাবুসাহেবদের কাছে রেখে জানালে—অতিথিদের ঘরে নিতে পারে নি। কিন্তু রাত্রির সেবার জন্য কিছু নিতে হবে। বিব্রত হলেও আর বাধা দেওয়া গেল না। দেবি হচ্ছে—আমাদের ধর্মশালায় পৌঁছে দেবার জন্য পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল—তার নিজের কথা আর বলতে চায় না। তবে আমাদের কথার উত্তরে জানাতেই হল। পাঠশালা নিয়েও এখানে বিপদ। গ্রামের গরিব ছেলেরা পড়বে, কিন্তু এজাত ওজাত নিয়ে তাদের লাঠালাঠি—ছেলেগুলি এক সারে বসে পড়বেও না। ওদিকে পুলিশও বিরুদ্ধে। বাপেরাও পড়াতে চায় না—মালিকদের ভয়ে। তারা ছেলেগুলোকেও বাপদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যায় বেগার খাটাতে।

দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে রাজগীর বাজারের এক-আধটা বাতির আলো দেখা দিল। সঙ্গীটি বিদায় নিল। বলে গেল সকালে কিন্তু স্নান সেরে সূর্য উঠবার আগেই যেন রাজগীরের বাকিটা দেখে নিই। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকালে দেখে ফেলি বড়গাঁও।

এই আমার প্রথম দিনের রাজগীর দর্শন—পরদিন যেমন পারি দেখলাম রাজগীর নালন্দা। পরে তো কতবার দেখেছি। সময় পেলেই যাই সেখানে। সব বদলে গিয়েছে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার প্রথম দর্শনের কথা কী আর মনে আছে? কী দেখেছিলাম—কী ইতিহাস? কী কবিতা? কই, কিছুতো নেই আমার কালচারের পুঁজিতে। মনে পড়ে—পাকা ফসলের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ধান কাটছে—মাথায় করে তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর মনে পড়ে—আর বিহার-শরীফের দারোগা সাহেব, কুণ্ড স্নানে অনধিকারী সেই নামশূন্য অচ্ছুৎ, আর গ্রামের মালিক কালেক্টর সাহেব, যার নামটা ভুলতে পারি নি। অথচ তার ভাই-এর নাম মনে নেই—তবে মনে আছে সেই গান্ধী আন্দোলনের ছায়ায় ধরা একটি যুবকের মুখচ্ছবি—ভুলে যাবার মতো জিনিস ছিল না তার মায়ের কথাও এবং 'কলেক্টর সিং' নামটা। আর কী পুঁজি সেই ভ্রমণ-যাত্রার? মাঠ আর ক্ষেত—আর চাষী, ক্ষেত আর ক্ষেত আর ক্ষেত—আর ওরা চাষ করে।

•

'চরৈবেতি, চরৈবেতি'

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আপ্ত বাক্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল আমাদের এই দেশে উদ্ধৃতি পরিহার করে চলাই হয়ত সমুচিত, কিন্তু লোভ হচ্ছে ইতালীর সাম্যবাদী অভিযানের প্রথম ঝটিতিসংকুল যুগের মনস্বী নেতা গ্রাম্‌সি-র ভাষায় বলতে যে, মনে যখন নৈরাশ্য আসে তখন সংকল্পের জোরে আশাকে অর্জন করা চাই।

যখন লিখছি তখন সমস্যাজর্জর আমাদের এই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রচুর কারণ রয়েছে। গোটা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলেছে। আসামে যারা 'বহিরাগত' (শব্দটির সংজ্ঞা শুধু অনিশ্চিত নয়, কিছু পরিমাণে ভয়াবহও বটে) তাদের বহিষ্কারের রব ব্যাপক আর বিকট হয়ে উঠেছে। মেঘালয়ে প্রায় অনুরূপ আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। বৈষ্ণব জীবন-চর্যার পীঠস্থান বলে প্রখ্যাত মণিপুরে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে, নৃশংসতার কুৎসিত ছবি দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরার প্রশান্তিকে চূর্ণ করে হঠাৎ যেন অমানুষিকতার তাণ্ডব ঘটে গেছে। ভারত বিষয়ে নাগাভূমির অভ্যস্ত বিতৃষ্ণা ও বিরূপতার উপশম ক্বচিৎ কদাচিৎ লক্ষ করা গেলেও বৈরিতার বিলোপের চিহ্ন নেই। অরুণাচল থেকে এখনও দুঃসংবাদ আসে নি, তবে স্বস্তিবোধের হেতুও বোধ হয় নেই—মনে পড়ে যাচ্ছে অরুণাচলের কর্মকেন্দ্র ইটানগর থেকে কিছুদূরে নির্মীয়মান নতুন রাজধানীর কথা, বছর চারেক আগে তার অপরূপ, প্রায় অতুলন নিসর্গশোভা মুগ্ধ করেছিল, যেখানে ভারতে ইচ্ছা করে মানুষ সর্ববিধ বক্রতা থেকে বিমুক্ত, কিন্তু মনুষ্যচরিত্রের জটিলতার নাগাল কে কবে পেয়েছে?

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার তেত্রিশ বৎসর পরও এভাবে লিখতে হচ্ছে আশ্চর্য কি, যখন 'মহারাজ' ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর মতো প্রাতঃস্মরণীয় মুক্তি-সংগ্রামীর দীর্ঘ বিপ্লবী পরিক্রমার বৃত্তান্তে প্রথম বাক্য দেখি: 'আমার জীবন সফল হয় নাই।' পরাধীন অস্তিত্বের অভিজ্ঞতা যার আছে তার কাছে দেশের রাষ্ট্রিক সার্বভৌম স্বাধীনতার অপরিসীম মূল্য ও মর্যাদা সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন ও বাস্তবে তারতম্য যে কটু ও কঠোর লাগে, তাও নিঃসংশয়ে

বলা যায়। আমাদের সমাজজীবনের বর্তমান অবস্থিতিকে আশাবাদের পরিপন্থী মনে করা হয়ত তাই অযৌক্তিক নয়। হয়ত ঠিক সেজন্যই গ্রাম্‌সচি-র উদ্ধৃত উক্তির বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে : সংকল্পের জোরে আশাকে জয় করতে হবে।

সমাজবাদ-সাম্যবাদে যাদের প্রত্যয়, তারা সৃষ্টিছাড়া নয় ; মানুষ নামক জীবের বহুবিধ দুর্বলতার অল্পাধিক অংশীদারী তাদেরও অবশ্য করতে হয়। পার্থক্য বললে হয়ত ভুল হবে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য তাদের একটা আছে—যে-বিশ্ববীক্ষা যথাসাধ্য আয়ত্ত না করতে পারলে তারা ব্যর্থ, সেই বিশ্ববীক্ষা তাদের সতর্ক করে দেয় যে, সহসা আবেগাতিশয্যে আশান্বিত বা আশাহত হওয়ার মানসিকতাকে যথাসম্ভব পরিহার করে চলতে হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বহুজনের একত্র সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যেই এগিয়ে চলা-র ('চরৈবেতি, চরৈবেতি') অমোঘ মন্ত্র রয়েছে, যাকে কণ্ঠস্থ করা নয়, কর্মে রূপায়িত করাই হল জীবনের সার্থকতা। যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকের অভাব নেই ; সমসুযোগের নব সমাজ যাদের চক্ষুশূল তাদের প্রতিকূলতাকে পরাস্ত করাও সহজসাধ্য নয় ; শ্রেণীসভ্যতার কর্তৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত থেকে শোষণ-শোনিতের আস্বাদ আর আয়াসে যারা অভ্যস্ত, তাদের বিদূরিত করার মতো কঠিন ও জটিল কর্ম আর নেই ; সমাজদেহের অভ্যন্তর থেকে লোভ নামে যে মৃত্যুশেল উৎঘাটিত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে সোভিয়েট ভ্রমণকালে উল্লাসবোধ করেছিলেন, সেই 'ঐতিহাসিক যজ্ঞ' অনুষ্ঠানের যোগ্যতা তত্ত্ব ও কর্মের যুগ্ম সাধনা বিনা সম্ভব নয়।

বহুদিন আগে কার্ল মার্কস একবার বলেন যে, গোটা সমাজকে বদলানো তো দূরের কথা, আমাদের নিজেকে বদলাতেই ১৫ কিংবা ২০ কিংবা ৫০ বৎসর লেগে যেতে পারে, বিপ্লবের পূর্ণ এবং দ্রুত সাফল্যের প্রত্যাশা হল এক ভ্রান্তি। এর অর্থ অবশ্য নয় যে, সবই যখন সময়সাপেক্ষ তখন ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মার্কস নিজে তাই বলেছিলেন যে, পরিস্থিতি পরিপূর্ণ অনুকূল আর সাফল্য অবশ্যম্ভাবী জেনে তবেই যদি বিপ্লবে নামা ঠিক হয়, তো বিপ্লবকে খুব সুসাধ্য এক ব্যাপার মনে করা চলবে। কিন্তু তা নয়, কারণ সম্ভাবনা অনিশ্চিত জেনেও বিপ্লবের লড়াইয়ে নামা সমুচিত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। আধুনিক জগতের শ্রেণীসমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের পরিণতি রূপে বিপ্লব অনিবার্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মার্কসবাদ সমাজের কর-কোষ্ঠী গণনায় প্রবৃত্ত নয়, বিপ্লবের দিনক্ষণ কোনো তুরীয় ভুবনের প্রাচীরে

জ্বল্‌জ্বল্‌ ক র লেখা নেই, রক্তমাংসে গড়া মানুষের সংহতি আর সংকল্প আর সংগ্রামের স্বাক্ষরই হল ইতিহাসের লিপি, তার পরম্পরা, তার প্রবহন, তার প্রকর্ষ, তার প্রাণবস্তু।

স্বাধীনতার প্রকৃত পরিণতি আর সার্থকতা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বিনা সম্ভব নয় বলে সাম্যবাদী মাত্রেরই যে-বিশ্বাস, তাকে যে কোনো উপায়ে শিথিল করার বহুরূপী চক্রান্ত সত্ত্বেও সন্দেহ নেই যে, আজ জগৎ জুড়ে স্বাধীনতা আর সমাজবাদের সৌহার্দ্য অপরাজেয় ভূমিকায় দেখা দিয়েছে। ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস্‌-এর 'সাম্যবাদী ইশ্‌তেহার' 'পিনাকেতে টঙ্কার' লাগিয়ে বুর্জোয়া-শাসিত 'বসুন্ধরার পঞ্জরের-তলে' 'শঙ্কার কম্পন' জাগিয়ে যে-যুগের সূচনা করেছিল, তার অগ্রগমন ঘটছে আমাদের কালো। সমগ্র পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ থেকে ধনিক-বণিকের প্রভুত্ব বিদূরিত হয়েছে—সমাজবাদী সকল রাষ্ট্রের পরস্পর সম্পর্কে এখনও সমস্ত গ্লানি মুছে যায় নি। বহু বিচিত্র বিপ্লবী কৃতিত্ব প্রদর্শন করেও চীনের মতো সর্ব অর্থে মহাদেশ কিছুকাল ধরে বিপ্লব-বৈরীদেরই বাহুবন্ধনে বন্দী হয়ে অনর্থ সংঘটনের উপক্রম করে ভবিষ্যতকে বিপন্ন করার লক্ষণ দেখিয়ে চলেছে; কিন্তু সন্দেহ নেই যে, সমাজবাদ-সাম্যবাদের বৈপ্লবিক শক্তির কাছে ধনতন্ত্রের সমূহ পরাজয় ঘটেছে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। অপরিসীম এই ঘটনার তাৎপর্য।

১৯২৩ সালে রজনীপাম দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'লেবর মন্থলি' পত্রিকায় লেখেন: 'কার্ল মার্কস-এর জন্মের (১৮১৮) একশো বছর পরে প্রথম সর্বহারা বিপ্লব আর সর্বহারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর (১৮৮৩) একশো বছর পরে কি দেখা যাবে বিশ্বব্যাপী সর্বহারা লোকরাজ্য?' ১৯৬৩ সালে আবার তিনি লেখেন ঐ পত্রিকায়: '১৯৮৩ আসতে এখনও বিশ বছর বাকি আছে। অনেক কিছু ইতিমধ্যে ঘটতে পারে। ইতিহাসের গতি বিষয়ে মার্কসবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, তারিখ সম্বন্ধে নয়। তবুও বলব যে ১৯৮৩ নাগাদ সময়ে দুনিয়া জুড়ে সাম্যবাদের জয় একেবারেই অকল্পনীয় নয়। সন্দেহ নেই যে ক্রমশ আরও জোরে দৌড় চলেছে, আর লক্ষ্যস্থল খুব বেশি দূরও নয়।' রজনীপাম দত্ত-র পরিচয় যারা পেয়েছে তারা জানে তাঁর জ্ঞান, তাঁর একাগ্র কমিউনিস্ট নিষ্ঠা, তাঁর আজীবন সাধনার মূল্য। অধুনা 'এদেশে' বিদগ্ধ বলে বর্ণিত-মহলে তাঁর সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে, তার উল্লেখেরই প্রয়োজন নেই। বহু ভারতীয় কমিউনিস্টের গুরু-স্বরূপ এই মানুষটি হৃদয়বান ছিলেন সন্দেহ নেই,

কিন্তু অলস, অলীক কল্পনাপ্রবণতা তাঁর লেশমাত্র ছিল না। নক্ষত্র-বিদ্বানের মতো ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করতে বসেন নি, চলমান জীবনের সম্ভাব্য স্ফুরণেরই আভাস দিয়েছিলেন। বাছাই করেছিলেন হয়তো শুধু মার্কস-এর মৃত্যুর (১৮৮৩) শতবর্ষ-পূর্তিকাল বলে নয়, সম্ভবত পাশ্চাত্যের 'বিদগ্ধ'-চক্রে যশস্বী অরওয়েল-এর '১৯৮৪' গ্রন্থটিরও কথাও ভেবে—একদা সাম্যবাদে সাতিশয় আস্থা ঘোষণা করার পর বাস্তব পরীক্ষায় তাকে পরিহার করে যিনি সাম্যবাদ বিষয়ে কুৎসা ও বিদ্রূপ-রচনায় স্বকীয় লিপিকৌশলের অপব্যবহারে সিদ্ধিলাভ করেন।

সর্বহারার কর্তৃত্ব স্থাপনের পরও শ্রেণীভেদের অবসান ঘটিয়ে সমাজবাদী ব্যবস্থা এবং আরও পরে সাম্যবাদী সমাজ স্থাপনে কতটা কালাতিপাত ঘটবে তা নিয়ে মার্কসীয় তত্ত্বে অনুমানের কোনো প্রয়াস নেই। শুধু বলা হয়েছে যে, সংক্রমণ ঘটবে বেশ কিছু সময় নিয়ে, যা নিরূপণের চেষ্টা অলস কৌতূহলকে তৃপ্ত করতে পারে, কিন্তু তা হবে অবৈজ্ঞানিক ও একেবারে নিষ্প্রয়োজন। সোশালিস্ট সমাজ কতদিনে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এ নিয়ে প্রশ্নোত্তর মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিনকে ব্যতিব্যস্ত করে নি, করার কারণও ঘটে নি। ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে তাঁদের শিক্ষা ছিল স্পষ্ট, তাই কল্পনার ফানুস ওড়াবার প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন ঘটে নি। অবশ্য মাওৎ-সুং কয়েকবার এ-বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন—হয়তো তেমন কিছু গুরুত্ব না দিয়ে, আর সহজ সুরে গভীর কথা বোঝাবার স্বভাবসিদ্ধ এবং কিঞ্চিৎ পুলকিত মনে। এক থেকে কয়েক শতাব্দী তো বটেই, হয়তো আরও বেশি সময় লাগবে সর্বত্র সোশালিস্ট সমাজ আনতে—এ-ভাবের বাক্য তিনি কয়েকবার বলেছেন। ভারতবর্ষেরই মতো প্রাচীন দেশ হল চীন; হয়তো ভারতবর্ষের চেয়ে সুগভীর হল তার অন্তরে প্রোথিত ঐতিহাসিক ধৈর্য ও সহনক্ষমতা। যাই হোক, কারণ যা-ই হোক না কেন, সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিজয় ব্যাপারে বিপুল বিলম্বের সম্ভাবনাই তাঁর মনে ছিল। কে জানে, এ-জন্যই সোভিয়েট ও অন্যান্য সোশালিস্ট দেশের সঙ্গে চীনের মতপার্থক্য এবং অধিকাংশ সাম্যবাদীর মতে তার বিষময় ফল সম্বন্ধে তিনি বিচলিত বোধ করেন নি। অবশ্য মাও-এর বিশাল ব্যক্তিত্বে রহস্য-প্রীতিও ছিল। হয়তো বা তাঁর একাংশ, যা ছিল কবি-সত্তা, 'শুধু অকারণ পুলকে'-ও আকৃষ্ট হতেন। মনে পড়ছে মার্কিন পত্রিকার বিবরণ (যা হয়তো পুরোপুরি অমূলক নয়) মাও-এর সঙ্গে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন-এর এক সাক্ষাৎকার বিষয়ে। দুই দেশের বিভিন্ন বিসম্বাদের নিষ্পত্তি সম্ভব না হওয়ায় মাও নাকি বলেন যে, এই সোভি-

যেট-চীন দ্বন্দ্ব চলবে দশ হাজার বছর ধরে। বলার পরমুহূর্তেই কোসিগিন-এর মুখ বিষাদে অন্ধকার হয়ে পড়েছে দেখে মাও বলে ওঠেন যে, তিনি মত বদলাবেন, কারণ সোভিয়েটের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তিতেও অনেক জোর ছিল আর তাই দশ থেকে একহাজার তিনি ছেঁটে ফেললেন! গল্পটা বানানোও হতে পারে নিশ্চয়ই, তবে বিপ্লব এবং বিপ্লবী সৌহার্দ্য ও সংহতি বিষয়ে চীনা নেতাদের যে অনীহা ও বৈরিতা বেশ কিছুকাল ধরে চলেছে তার একটু হদিস এতে হয়তো রয়েছে।

এসব কথা অবাস্তব মনে হতে পারে, তবে সব সময় সব কথাই যদি মহামূল্য হতে হয় তো জীবন চলে না! তবে শুধুমাত্র সোশালিস্ট সমাজ শীঘ্রই আসছে জেনে সেদিকে যারা চলে, অনেকটা 'জোর যার, মুলুক তার'-ধরনের হিসাব করে, তারা আর যাই হোক অন্তত সমাজবাদ-সাম্যবাদে বিশ্বাসের ধার ধারে না। মনে আসছে একদাখ্যাত নরমপন্থী, ধর্মবিশ্বাসী সোশালিস্ট অধ্যাপক টনি-র (Tawney) একটি চমৎকার কথা: 'ইতিহাসের ধারায় সোশালিজম্ অনিবার্য বলেই তা আমি চাইব কেন? সোশালিজম্ আমি চাই অন্যায় আর অনাচার দূর করার জন্য।' মার্কস যে অসংখ্য দেদীপ্যমান্ উক্তি রেখে গেছেন, তার একটি হল যে, ইতিহাস বলে কেউ তো নেই, ইতিহাস তো লড়ে না, কিছু করে না। যা কিছু করবার এ দুনিয়ায়, তা করে মানুষ। অবশ্য তিনিই বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিত্তিতে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছিলেন আর দেখিয়েছিলেন যে, সমাজেরই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরিণাম যে সমাধানে তা হল সোশালিজম্—কমিউনিজম্—তারও পরবর্তী অধ্যায়ে কি-হবে না-হবে, বাঙালি বাউলের ভাষায় 'জীবন কমল' কি ভাবে 'ফুটবে', তা নিয়ে নিদিধ্যাসনে তিনি প্রবৃত্ত হন নি। মানুষেরই সচেতন সংগঠিত সংগ্রামে শোষণের অবসান ঘটবে, এই প্রগাঢ় নিশ্চিতি এনে দিয়েছিলেন বলেই মার্কস হলেন মেহনতী মানুষের জগৎজোড়া জাগরণের প্রমুখ ঋষি।

প্রায় যেন পাদটীকার মতো একটা খবর এখানে দেওয়া যেতে পারে। কবে পৃথিবীর কতটা জায়গা জুড়ে সমাজবাদ আসবে, এ-চিন্তা শত্রুপক্ষের মনে যে নেই তা নয়। ১২ জুন ১৯৭৯ তারিখের 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকায় 'আফ্রিকায় পশ্চিমী শক্তিসমূহের উভয়সংকট' আখ্যায় এক বিশেষ প্রবন্ধ ছিল, যা লেখেন মোটামুটি নামকরা রাসেল ওয়ারেন হাউ (Russell Warren Howe)। প্রবন্ধের উপসংহারে রয়েছে যে আফ্রিকায় পশ্চিমীদের

এগোবার পথ নেই, অধঃপতন অনিবার্য—মাঝে মাঝে সোভিয়েটকেও মুখ চূর্ণ করতে হবে তাদের নিজেদেরই দোষে, কিন্তু 'আফ্রিকা আর পশ্চিম এশিয়া সম্ভবত নিশ্চিত করে দিচ্ছে যে দশ বৎসর নাগাদ সময়ে পৃথিবীর ⅔ ভাগ 'সোশালিস্ট' হয়ে যাবে।'

জ্যামিতির কায়দায় এখানে 'Q-E-D' বসিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করার মতো বাতুলতা অবশ্য বর্জন করা যাবে, কিন্তু মন্দ লাগে না এমন স্বীকারোক্তি, যা খুব সহজে বুর্জোয়া কলম থেকে বেরিয়েছে মনে করা ভুল হবে। মন্দ লাগে না যখন বিশেষ করে সমাজবিপ্লবের সোজাসুজি শত্রুরা যথাসম্ভব দৌরাত্ম্য চালিয়ে যাচ্ছে আর 'বিদগ্ধ' বলে বর্ণিত বন্ধুদের অনেকে 'New Left'-এর সমুচ্চ স্থিতিতে আশ্রয় নিতে চাইছেন কিংবা অনুরূপ আত্মোৎকর্ষ-প্রবণ ধারণা থেকে সান্ত্বনার সন্ধান করছেন—যাকে বলা হয়েছে 'real, existing socialism', দোষগুণে যা আজ মুনাফামুক্ত, শোষণরহিত সমাজ-নির্মাণের চাক্ষুষ উদাহরণ, তাদের সম্বন্ধে সর্বজ্ঞমন্যতার উচ্চাসন থেকে অবজ্ঞা পোষণ করছেন, নিজেদের বিপ্লবী গরিমায় ঊর্ণনাভবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছেন, বিশ্বব্যাপী যে-বিপুল প্রতিযোগিতা আর পরীক্ষা চলেছে, দুনিয়া জুড়ে অগণিত মানুষ যে-সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট, তাকে কার্যত তাচ্ছিল্য করছেন। হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে ভুলে যাচ্ছেন যে-কথা আঁদ্রে মাল্‌রো একবার বলেছিলেন: 'Qu'est ce importe ce que in importe seul?' ('যার দাম শুধু আমার কাছে, তার দামই বা কি?')। সবিনয়ে তাঁদেরই বলতে হবে মার্কস-এর ভাষায় যে, 'সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত আজ এসেছে যখন কর্মক্ষেত্রে তত্ত্ব রূপান্তরিত হচ্ছে, সঞ্জীবিত হচ্ছে, পরীক্ষিত হচ্ছে।' ভারতবাসী আমরা তো জানি যে, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধথ' পংক্তিটির পরই রয়েছে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—ইতিহাসের কাছে 'প্রাপ্য বর' নেবার জন্য জেগে ওঠার সময়ই বোঝা যায় পথ কত দুর্গম, কত ক্ষুরধার বাধাকে অতিক্রম তখন করতে হয়।

কমিউনিস্ট হওয়ার দায়িত্ব এমনই যে মাঝে মাঝে মতিভ্রমকেও হয়তো মার্জনা করা যায় অবশ্য শুধু এক শর্তে যে সততা ও সক্রিয়তাকে যেন কখনও পরিহার না করা হয়। এই 'dizzying responsibility' হল যাঁর কথা, সেই ফরাসী দার্শনিক মের্লো-পন্তি-র (Merleau-Ponty) আর এক স্মরণীয় বাক্য হল: 'কমিউনিজম্ এমন এক অঙ্গীকার যার প্রসার হল বিরাট আর যা

দিতে হয় সর্বান্তঃকরণে'। এর পিছনে বুঝি আছে একটু স্মিত হাস্য আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু ঈর্ষা। এই যে বিপুল দায়িত্ব আর কঠোর পরীক্ষা, তা নিয়ে একটু অহমিকা আসে আসুক, ক্ষতি কি?

মিশরের নামজাদা সাংবাদিক মুহম্মদ হাইকাল (যিনি নাসের-এর বিশেষ বন্ধু ছিলেন) তাঁর এক বই-এ সুদান-এর প্রধান কমিউনিস্ট নেতা শফীক্ আহ্‌মদ্-এর সঙ্গে কথোপকথনের এক বিবরণ-ব্যপদেশে লেখেন যে, তাঁর মতে কমিউনিস্টরা জাতীয় ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য অর্জনের শক্তি রাখে না, তবে দেশের জমিতে গাছ বা তার বীজ না হতে পারলেও তারা 'সার'-এর ভূমিকায় নামতে পারে। কথাটা বল্‌তেই শফীক্ আহ্‌মদ্ হেসে বলে ওঠেন, 'কি ধরনের সার, বলুন তো? রাসায়নিক সার না গোবর?' বুর্জোয়া ব্যঙ্গে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; রসিকতার পাল্লায় হাইকাল্ হেরে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্র, এবং অবশ্যই আমাদের আপন দেশে, এই প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করতে হবে, জাতীয় জীবনে আমাদের আন্দোলনের প্রভাব (বা তার অভাব) বিষয়ে বিচার করতে হবে, যার স্থান ভাগ্যক্রমে অন্তত এই প্রবন্ধে নয়!

ফ্রান্সের মতো যেখানে বিদ্বৎক্ষেত্রে মার্কসবাদের অপার প্রতিপত্তি ছিল, ১৯৬৮ সালের তড়িৎ বিপ্লব-পিয়াসীরা সংগ্রাম থেকে বিদায় নেবার পর সেখানে কয়েকবৎসর আগে আবির্ভাব হয়েছিল 'নয়া দার্শনিক' দলের, যাদের কাছে 'মার্কস মৃত, ঈশ্বর মৃত,' আশা অন্তর্হিত, বাক্যবিলাসই আশ্রয়। অতি-বাম চিন্তার এক প্রধান প্রবক্তা Fernando Claudin ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে ('Eur-Communism and Socialism', p. 18) পরম প্রজ্ঞায় লিখে ফেল্‌লেন, 'স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয় যতদিন ধনতন্ত্র অন্তর্ধান না করছে আর বর্তমান রুশ শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে না ফেলা হচ্ছে।' এমন কত বিচিত্র রত্ন-খচিত রচনা আজ পাশ্চাত্যের 'বিপ্লবী' চিন্তাকে বিভূষিত করছে—বিবরণ চাই না, কিন্তু জানি এর ছাপ পড়ে, আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে-পাওয়া উপনিবেশিক মনে। ঠিক এজন্যই মনে ঘুরছে বিশ্বাসকে অটল রাখা বিষয়ে মহামতি গ্যেটে-র কয়েকটি পংক্তি, বিশেষত তার শব্দৈশ্বর্যের জন্য (যদিও জার্মান জানি এত অল্প যে, তা লজ্জারই কারণ), 'Ich habe geglaubt, nun glaub'ich erst recht / Und geht es auch winderlich, geht es auch schlecht'—ধর্মতত্ত্ব থেকে মার্কসবাদের পার্থক্য একান্ত ও সামগ্রিক, কিন্তু প্রতীতির প্রসঙ্গে আমরাও যেন অবিচল থাকতে পারি, অসংকোচে।

মনুষ্যমহিমার বাস্তব বিঘোষণ যে-মার্কসবাদ, তার গৌরবকীর্তন শুধু নয়, নবজীবন নির্মাণে লিপ্ত থাকার সংকল্পে হানি যেন না ঘটে।

গ্যেটে-র 'ফাউস্ট' থেকে এই উদ্ধৃতিটা পেয়েছিলাম স্বনামধন্য কিন্তু উত্তর-জীবনে প্রায়-বিস্মৃত দিলীপকুমার রায়-এর কাছ থেকে। বোধহয় কমিউনিজম্ আর ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে সাক্ষাতে আর পত্রযোগে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এর উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর শোকসংবাদ আর অল্প কিছু মন্তব্য এদিক-ওদিক প্রকাশ হয়েছিল ঠিকই, তবু কেমন যেন ভেবেছি যে এই বরেণ্য মহাজনকে ভুলে যেতে আমাদের একটুও সময় লাগে নি—ক্লিষ্টবোধ করেছি যে, 'পরিচয়' পত্রিকাতেও এই তিরোধানের উল্লেখমাত্র চোখে পড়ে নি। সংসদ-সদস্যতাকালে বন্ধু হরিবিষ্ণু কামাথ-এর উদ্যোগে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় আর প্রায় সর্ববিষয়ে মতপার্থক্য সত্ত্বেও পরম ঔদার্যে তিনি আমাকে কাছে টেনে নেন্, আমাদের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তা তাঁর অন্তরের প্রসার আর চিত্তের প্রসাদ স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করেছিল। ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর সুকণ্ঠের গুণগ্রাহী ছিলাম, কিন্তু বহু পরে মানুষটিকে দেখলাম একান্ত সন্নিকটে। আবিষ্কার করতে বিলম্ব হল না এই সংসারত্যাগী অধ্যাত্মসাধকের সদাজিজ্ঞাসু মন আর অবিকৃত মানবমমতা। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটলে তাঁর অনলস লেখনী যে রচনাবৈভব সৃষ্টি করেছে তার প্রকৃত সন্ধানও পেতাম না। বহুভাষাবিদ্ ছিলেন দিলীপকুমার; অনুবাদ ব্যাপারে তাঁর মতো সিদ্ধহস্ত প্রায় দেখিনি আমাদের দেশে। সহৃদয় সজ্জন ছিলেন বলে অপরের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হতেন তিনি স্বভাবধর্মে—সঙ্গে সঙ্গে বিচারবোধও হারাতেন না। অধ্যাত্মক্ষেত্রে তাঁর অগ্রজ ও বন্ধু 'অনির্বাণ'-এর রচনা তাঁরই দাক্ষিণ্যে দেখেছি আর আশ্চর্য হয়েছি আমার কাছে অজানা সেই মহাজনের জ্ঞানের গভীরতা, মনের মুক্তি আর স্বচ্ছ সুন্দর বাংলা গদ্যশৈলী দেখে।

দিলীপকুমার সম্বন্ধে লিখতে বসি নি, তাঁর কথা প্রসঙ্গক্রমে। অনেকে আমরা জানি না তাঁর তরুণ বয়সে ইয়োরোপের পশ্চাৎপটে লেখা উপন্যাস 'মনের পরশ', যা আমাদের ছাত্রাবস্থায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হত 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে (পরে বুঝি অন্য নামে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে), যার কথা তাঁকে বলাতে উল্লসিত হয়ে অনুযোগ করলেন, 'কত আগে, সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চার-পাঁচ বছর পরের কাহিনীতে আমি তখনকার কমিউনিস্টদের কত বাহবা দিয়েছি,

আর আজ বোধ হয় আমাকে তোমরা ভুলেই গেছ বা পলাতক অধ্যাত্মবাজ বলে গাল দাও।' মাঝে মাঝে বলতেন ভালো করে পড়বেন ধর্ম বিষয়ে মার্কস-লেনিনের লেখা—কত খুশি হলেন যখন কমিউনিস্টরা ধর্মকে 'জনগণের অহিফেন' বলে তাচ্ছিল্য করে বলায় জবাব দিয়েছিলাম যে, তিনি তো শ্রুতিধর, সহজে কণ্ঠস্থ করে নেবেন কার্ল মার্কসের জলদগম্ভীর বিশ্লেষণ, 'ধর্ম হল নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস: যে জগৎ দয়াহীন, ধর্ম তার দাক্ষিণ্য; যে পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকতা নেই, ধর্ম তার আত্মা। তাই যে দুঃখ-উপত্যকায় ধর্মের দিব্য জ্যোতির আশ্বাসে মানুষের পরিক্রমা, ধর্মের সমালোচনা হল সেই দুঃখ-উপত্যকারই সমালোচনা।'

'স্বর্গের সমালোচনা' থেকে 'মর্তের সমালোচনায়' নেমে মার্কস তাই বলেছিলেন যে, কাল্পনিক ধারণা পরিহার করতে হবে আর ধর্মতত্ত্বের সমালোচনা পরিণত হবে রাষ্ট্র ও সমাজনীতির সমালোচনায়—'যে পরিস্থিতিতে (ধর্মের মতো) কাল্পনিক ধারণার প্রয়োজন, সেই পরিস্থিতিকেই পরিত্যাগ' করতে হবে। আমরা কমিউনিস্টরা অনেকে আপনার চেয়ে 'নিরাসক্তি' হয়তো বেশি রাখি বলে কৌতুকের চেষ্টা করলে দিলীপকুমার হাসতেন, নিজের সাধনস্বপ্নে বিভোর বলেই শুধু বলতেন যে, তিনি ভাববেন ভালো করে, কমিউনিস্টরাও তো ঈশ্বরেরই সন্তান। আর মজা পেতেন নিজেই (জার্মান ভাষায়) আবৃত্তি করে শৃঙ্গার-শতকের রচয়িতা ভর্তৃহরিকে Hermann Hesse-এর উৎসর্গিত কবিতা: 'তুমি আমার পূর্বগামী ও অগ্রজ, তোমারই মতো আমি আঁকাবাঁকা পথে জীবন কাটাই, গতানুগতিকতা আর উদ্দীপনার মধ্যে রাস্তা খুঁজি, আজ আমি জ্ঞানী আর কাল আমি নির্বোধ, আজ আমি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে আর কাল ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবে থাকি।'

দিলীপকুমার অবশ্য অন্য ভুবনের মানুষ ছিলেন, আমাদের অনেকের কাছে অনাত্মীয়ও বটে। কিন্তু বাস্তবিকই ক্লিষ্ট বোধ করেছি যখন প্রবাসে অবহেলিত আর স্বদেশে নিঃসম্পর্ক অবস্থায় অধ্যাপক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ-এর মৃত্যু হয় কয়েক বছর আগে, শুধু 'পরিচয়' কেন, আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রও বোধ হয় খবরটি নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য দেখায় নি। বিস্মরণ কেবল নয় অবজ্ঞাও প্রকাশ পেয়েছিল এতে। দোষ হয়তো কাউকে দেওয়া যায় না, কারণ প্রায় অর্ধ-শতাব্দী তিনি স্বেচ্ছায় প্রায় অজ্ঞাতবাস করেছেন বিদেশে। স্বদেশের প্রতি একান্ত মমতাই অভিমানরুদ্ধ মানুষটিকে ফেলে রেখেছিল ইংলণ্ডে, যেখানে একক জীবন যাপন করেছেন। অত্যল্পসংখ্যক বন্ধু, আত্মীয়

কেউ কোথাও নেই—একবার আমাকে লেখেন যে, বর্ণবিদ্বেষের দেশের পোকাগুলো পর্যন্ত মুখ দেবে না জেনেও নিজের হাড়গুলো ঐ দেশেই ফেলে যাবেন। তাঁর সম্বন্ধে লণ্ডনে হাই কমিশনের উদ্যোগে ছাপা এক বুলেটিন-এ ইক্‌বাল সিং ছোট্ট একটি স্মারক প্রবন্ধ লেখেন। কেউ কেউ হয়তো দিল্লীর 'লিঙ্ক' বা 'প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় এই ইক্‌বাল সিং-এর রচনা দেখে থাকবেন। লণ্ডনে যখন ভারতবর্ষের প্রগতি লেখক আন্দোলন গঠনের প্রথম প্রয়াস হয় তখন মুল্‌ক রাজ আনন্দ, রাজা রাও, সজ্জাদ জহীর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। যতদূর জানি, বিদেশ থেকে প্রথম প্রচারিত সেই প্রগতি লেখক আন্দোলন নির্মাণের যে প্রস্তাব, তার মুসাবিদা করেন জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ। ইংরাজী সাহিত্য বিষয়ে তাঁর গবেষণা ত্রিশের দশকে প্রচুর সম্মান পেয়েছিল এবং তিনি সানন্দে কিছুটা বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে হাত মেলাতে সংকোচ করেন নি। মনে পড়ছে ইক্‌বাল সিং লিখেছিলেন যে, মস্কোর লেনিন গ্রন্থালয়ে তিনি 'বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে ডক্টর জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের মহার্ঘ রচনা পড়ার প্রথম সুযোগ পান। 'পরিচয়' অবশ্য বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় মার্কসীয় পদ্ধতি প্রয়োগের এই গুরুতর প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে বহুদিন আগে; স্বয়ং কবি বিষ্ণু দে (যদি না ভুল করে থাকি) মোটামুটি এর দীর্ঘ পর্যালোচনা করেছিলেন। জ্যোতিশ্চন্দ্রের কাছ থেকে অপার স্নেহ আমি পেয়েছি, বহু শিক্ষাও পেয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। মুক্তমতি মানুষ তিনি ছিলেন; প্রায় কেউ আজ তাঁকে জানে না কিন্তু নিজের ঢঙে তিনি ছিলেন 'স মহাত্মা সুদুর্লভঃ'। তাঁর কথা এখানে অবান্তর আর কিছুই বলে উঠতে পারব না ভয় করে ক্ষান্ত হচ্ছি। যশের আকাঙ্ক্ষা থেকে বহুদূরে ছিল তাঁর অশান্ত অথচ অদ্ভুত প্রাজ্ঞ এক অবস্থিতি। তাঁর মতো মানুষই বলতে পারেন: 'মৈঁ রহুঁ যা ন রহুঁ/য়হ্ চমন্ আবাদ রহে' ('আমি থাকি বা না-থাকি, এই বাগান যেন ফলতে থাকে')। এমন মানুষ আছেন বলেই **'man, proud man'** বলতে গৌরব বোধ করতেন কার্ল মার্কস।

এই রচনার প্রারম্ভে সংকল্পবলে আশাকে অর্জন করার কথা গ্রাম্‌সূচি-র দোহাই দিয়ে বলেছিলাম। শেষ যখন করছি তখন কেবল মনে পড়ছে সম্প্রতিকার এক সুসংবাদ—ভারতীয় বিজ্ঞানী ও কারুকুশলীদের সমবায়ে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, সঙ্গে সঙ্গে আরও যেন মধুর তার নামকরণ, যা হল

'রোহিনী'। 'রোহিনী জ্যোতিষাম্ শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠসর্বগুণান্বিতা'—রামায়ণের এই শ্লোকার্ধ সেদিন পেলাম-সুপণ্ডিত শিব রামমূর্তির সদ্য-প্রকাশিত অতি-মনোরম গ্রন্থে—যাতে রয়েছে লঙ্কায় গিয়ে বন্দিনী সীতাকে দেখে হনুমানের উক্তি, 'যেন চাঁদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা রোহিনীর মতো বিধুর দেখাচ্ছে সীতাকে, তাকে নিয়ে চলি, রামের হাতে তুলে দিই'। অরুন্ধতী, লোপামুদ্রার মতো রোহিনী হলেন এক নক্ষত্র, সৌন্দর্যে যার তুলনা নেই—ভাবি, কল্পনার কী বৈভবগুণে এমন ভাবে নক্ষত্রের সন্ধান ও নামকরণ হয়েছিল ভারতবর্ষের পুরাযুগে। ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞানপীঠের রসায়নশাস্ত্রী অধ্যাপক বাসুদেবমূর্তির কল্যাণে জেনেছিলাম বেদের প্রমুখ ও প্রধান টীকাকার সায়ণাচার্যের উক্তি: 'জ্ঞানী ও সর্ববিধ বিকারমুক্ত ঋষির সম্মুখে উপনীত হয়ে বিজ্ঞান বলল—অঙ্গীকার করো, পবিত্র শপথ গ্রহণ করো যে, দুর্জনের হাতে আমাকে ফেলবে না, চিত্ত যার মুক্ত আর হৃদয় যার পূত এমন ব্যক্তিই যেন আমাকে গ্রহণ করে। আমার যে শক্তি তা তাদেরই জন্য, আর সে-ভাবেই আমি সমস্ত মানুষের অশন বসন ব্যবস্থা করে দেব। অন্যথা আমি তোমাকে, তোমার শিষ্যবর্গকে, সমগ্র মারজাতিকে ধ্বংস করব।' আমাদের পুরাকাহিনীতে কত সমুজ্জ্বল বস্তু রয়েছে যাকে বলতে ইচ্ছা করে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান বিষয়ে মার্কসীয় চিন্তার ত্রিকালজ্ঞ-প্রায় ব্যাপ্তি ও গভীরতাই প্রাক্‌কথন।

শারদ উৎসব সময়ে বাঙালির নিঃস্ব, রিক্ত জীবনেও উদ্দীপনার স্পর্শ মেলে। এই শরৎ ঋতুকে দিয়েই জীবনের পরিমাপ ঘটে এদেশে, পাশ্চাত্যের মতো গ্রীষ্ম দিয়ে নয়—বৈদিক যুগে দীর্ঘায়ু কামনা করে মানুষ বলেছে 'পশ্যেম শরদঃ শতম্· ·ভূয়সো শরতঃ শতম্' ('আমি যেন একশো শরৎ, একশোরও অধিক শরৎ দেখতে পাই')। দুর্গত মানুষের কাছে এ বুঝি প্রলাপবাক্য, নির্জিত জীবনযাত্রার লৌহভারই হল কঠোর বাস্তব, আশা হল ছলনা, নিয়তির কাছে পরাজয় হল অকাট্য—কিন্তু সতত-সঞ্চরমান এই বিশ্বে শুধু যে বসুন্ধরার অবিরাম অচেতন বিঘূর্ণন নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংহত, সচেতন, সুদৃপ্ত-সন্ধানও চলেছে, 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' যে যুগযুগান্ত ধরে তার অন্বিষ্ট।

•

চলিয়াছ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

বেমরসুম যে, গাড়িটার গতিতে তা বোঝা যাচ্ছে। ঝক্ ঝক্ জাঁ। জাঁ। ক্যাঁ—া—চ্…প্রায় ফাঁকা গাড়ি। ঘণ্টা তিনেক সকাল হয়েছে। যারা উঠছে নামছে দু-এক স্টেশনের জন্য। রিজার্ভেশনের আঁটসাঁট-ভাবের আর-কোনো প্রশ্ন নেই। যে-কোনো সিটে গিয়ে বসতে পারা যায়, জানলা দেখে নিলেই হল।

প্রথমে তেতলা থেকে পূরবী। তেতলা থেকে নেমে বেঞ্চের তলায় চটিটা খুঁজতে একটু দাঁড়াতে হল। তারপরে হাত বাড়িয়ে চশমা নিতে প্রভাতের মুখের কাছাকাছি। দু হাতে চুল ঠিক করে বাথরুম ঘুরে দরজার কাছাকাছি একটা চেয়ার পেয়ে বসে পড়ল। বাইরের বাতাসে তার চুল উড়তে লাগল।

দোতলায় প্রভাত নিজের পায়ের দিকে চেয়ে প্রথমে উপর থেকে সন্তর্পণে নেমে আসা একখানা পায়ের পাতা, তারপর হাঁটু পর্যন্ত গৌরবর্ণ পা যা রোগা রোগা, শায়ার সাদা লেশ, তারপর নীলে সাদা-ডুরির তাঁতশাড়ির পাড় দেখেই মটকা মেরেছিল। যখন সুঘ্রাণটা নাকে গেল তখন নাকের কাছে—সে দ্বিধা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললে না ; ঘুম ভাঙল ?

প্রায় দশ মিনিট পরে ঘুমভাঙার যথোপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ও শব্দ করে দোতলা থেকে নামল। মেঝেতে দাঁড়িয়ে বালিশের তলা থেকে পার্শ, সিগারেট কেশ, দেশলাই পকেটে পুরে বাথরুমে গেল। সেখান থেকে নিজেদের বার্থগুলোর দিকে ফিরতে গিয়ে পূরবীকে দেখে বললে, আরে, এখানে।

: বেশ লাগছে বাতাসটা।

দরজার কাছে লম্বা বেঞ্চটায় কয়েকজন হকার যারা আর বিক্রির আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। ক্লান্ত, নোংরা চেহারার। ঝুড়ি, বাক্স, ট্রে, ঝোলা। বিক্রি না হওয়াতে…এখন বিড়ি টানছে। বই-এর হকার বেঞ্চির সামনে পা নাচাচ্ছে। বেলা নটার হলুদে আলো দরজা দিয়ে, গোল আর হলুদ আর গড়াচ্ছে।

P 3284

প্রভাত সিগারেট ধরিয়ে দরজা দিয়ে গলা মাথা বার করে, যেন তার ফ্ল্যাটের ব্যালকনি, এমনভাবে দাঁড়াল। তা, এঞ্জিনিয়ার হিসাবে এ অঞ্চলটা তার পরিচিত, খুবই পরিচিত। আগে কি ছিল, তারপর তারা কি পরিবর্তন করেছে—এক কথায় কিছুটা মালিকানা-ভাব। বললে, এ সব করেছিলাম।

: এ সব কি উদ্বাস্তু কলোনি ?

: উঁ ? না, হ্যাঁ তা হতে পারে। প্রভাত বললে, অর্থাৎ এগুলো কুলিদের ঝুগ্‌গি ঝোপড়া হিসাবে তৈরি হয়েছিল। এখন দেখছি পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং বেশ কিছু শিশু। অর্থাৎ তা হলে পরে উদ্বাস্তুরা দখল করেছে। এ সব, এসব, দূরে দূরে গিয়েও করেছিলাম।

: কিংবা, পূরবী হেসে বললে (তার তো ভালোই লাগছে), কিংবা এরা সেই কুলিরাই যারা দখল ছাড়ে নি, ফলে এখন শিশুদের দেখা যাচ্ছে।

: অর্থাৎ কুলিরাই উদ্বাস্তু। তা, উদ্বাস্তুর সংখ্যা এখন সব দেশেই বাড়ছে।

: সব দেশে ? না, আপনি নিশ্চয় তেমন বলছেন না। পূরবী হাসল আবার।

গলা, মাথা ভিতরে এনে প্রভাত মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে বললে, তাই নয় ? আবার তার মধ্যে কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো অংশ বেশি উদ্বাস্তু হয়। যেমন ভারতের মধ্যে বাঙালি, আবার তাদের মধ্যে যাকে পূর্ববঙ্গ বলা হতো।

পূরবী আবার হাসল। প্রভাত ভাবলে কত বয়স হবে, ত্রিশ ? অর্থাৎ তার স্ত্রী · ...

প্রভাত বললে, আসলে পৃথিবীময় বাস্তুর অভাব হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ একটা ঘর, ঘরের সামনে বা পাশে একটা গাছ, দুর্বা-ঢাকা এক চিলতে জমি, অর্থাৎ এক কথায় গৃহ কেউ পাচ্ছে না। না, ভেবে দেখুন, সবাই যেন গৃহহীন।

পূরবী খিলখিল করে হাসল। বললে, তার উপরে আপনি আবার বাস্তুকার।

একতলায় মিসেস দত্ত স্বগতোক্তি করল, দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না। তেতালা থেকেও নামতে দেখলাম, আর তারপর দোতলা থেকেও। কিন্তু ফিরতে দেখলাম না।

সে চিন্তা করলে, এখনই উঠবে কিনা। নাকি ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত

ঘুমনোর ভান করে থাকবে। ওরা এলে হাই তুলে উঠে বসবে। কী আর হারাবে? যার যা কিছু সব তো একতলার বেঞ্চের নীচে তিনটে স্যুটকেসে। আর স্যুটকেস তিনটে তিন রঙের। যেমন ধর তার নিজের আর পূরবীর ভ্যানিটি ব্যাগ। একই নক্শা, দুটোই ফোমের। ওরটা সোনালি আর লালে আমার বাদামিটার থেকে·· ·।

মিসেস দত্ত যার নাম প্রভা, যার চল্লিশ হয়েছে, হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু থলথলে যে নয়, গৌরাঙ্গী যে, সে পাশ ফিরে শুল। এখন আর সময়ের হিসাব করে কি হবে? এখন নটা হতে পারে, দশটা, সকাল আটটাও। হাতঘড়িটাকে দেখলে সে। বরং অলংকারই। হাত ঘুরিয়ে কানে লাগিয়ে দেখলে। চলছে·····। দম দিলে হয়। দম দিয়ে স-নটা দেখে আটটা করে দিলে। হাতটা লম্বা করে দিয়ে সুগৌর পুরোবাহুর শেষে গোলাল মণিবন্ধে পাথর বসানো ব্যাণ্ডে বড় পাথরের মতো ঘড়িটাকে পর্যন্ত চোখ বুলাল। তার পরনে আকাশী সিল্কে হাল্কা হলুদ আর সাদা বুটি। উরুর উপরে ভাঁজটাকে মসৃণ করে দিয়ে হাতটাকে সেখানে শোয়ালে।

পূরবী বললে, গাড়িটার গতি কমছে, চলুন গুছিয়ে নেই। মাসীমা ব্যস্ত হবেন।

প্রভাত বললে, এটা নয়, এটা হল্ট। পাঁচমিনিট পরে স্বর্গদ্বার।

হুকারদের ইঙ্গিত করে পরে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে পূরবী বললে, কেউ কেউ নেমে যাচ্ছে।

: স্বর্গদ্বারের নীচের দিকের বস্তিগুলোতে যেতে এখান থেকে পাকদণ্ডি পথ আছে।

: মাসীমা সহজেই ব্যস্ত হন।

: যদি ঘুম ভেঙে থাকে। প্রভাত হাসল। আপনার ভ্যানিটি ব্যাগ?

: বার্থে। ও? ঠাট্টা হচ্ছে? পূরবী উঠে দাঁড়াল।

: আপনি যান। আমি সিগারেটটা শেষ করি।

পূরবী মাথার উপরে হাত তুলে জড়িমা কাটালে যেন। আবার বসল। বললে, গাড়িটা থামল দেখুন। ওরাও কি সব উদ্বাস্তু? যারা নামল?

: আচ্ছা, কলকাতায়, আপনার কি মনে হয়, সেখানে কি সবাই, প্রায় সকলেই উদ্বাস্তু নয়? পূর্বপুরুষরা কিন্তু অধিকাংশ হয় ঢাকা, কিংবা বরিশাল, কিংবা খুলনা, তা প্রায় একশ দেড়শ বছর আগে থেকেই। প্রভাত হাসল।

সিগারেটের অবশিষ্টাংশ জানলা দিয়ে ফেলে দিল। গৃহহীন নয়? চলুন, মাসি ব্যস্ত হবেন।

পূরবী উঠে তাদের তিন থাক বার্থের দিকে চলে গেল।

প্রভাত হাই তুলল। প্রকৃতপক্ষে সে রাতে ঘুমায নি। এই বার্থগুলো ঘুমোনব জন্য নয। কি যেন হবে……। সে পূরবীর পরিত্যক্ত চেযারটায় বসল। গাড়িটা ছাড়ছে না। শেষের এই হাফ-লুপটা, বোধ হয় কযলা দিতে হচ্ছে। গাড়ি না চললে বাইবের আধাপাহাড়ী দেশ একঘেযে লাগে। এই পূরবীব পঁচিশ পাব হযেছে। স্বাস্থ্য ভালো, বেশ স্বাস্থ্য। দেখ শ্যামল রঙে ঠোঁট দুটো লাল। চোখ দুটো বড, স্থিরও বটে। ও, হ্যাঁ, উদ্বাস্তু। সে হাসল।

পূরবী নিজেদের বার্থের বিপরীত দিকের বেঞ্চে বসল। এখন তো একেবারেই ফাঁকা। মিসেস দত্ত ঘুম ভাঙাব ভান করল, হাই তুলল, উঠে বসল, বললে ঘুমেলা গলায, ওমা, উঠে পড়েছিস? কতদূব এলাম, ডাকিস নি কেন? পূরবী বললে, কালকেব রাতের সেই বই-এর হকার

: হুঁ, বেশ মজাব, তাই নয?

: ওব নাম বোধ হয শচীবিলাস।

: তাই বললে বুঝি? কখন দেখা হল আবার?

: দেখা হবে?

: মানে দেখলি কোথায?

: ওই তো, এখনই নেমে গেল। এটা হল্ট। এরপরেই স্বর্গদ্বার।

: নামটা বেশ। কিন্তু গা শিরশির কবে। বললি না কেন? দেখতাম।

: কি দেখবে? বযস, তা চেহারায, পঁযত্রিশ থেকে চল্লিশেব মধ্যে হবে। গড়ন হাল্কা হাড়েমাসে জড়ানো। খাকি পাযজামা, সাদা শার্ট; চোখা চিবুক, গালে মাংস নেই, মাঝারি নাক, বড চোখ। গাযের রং বলে কথা—তা সে কিছু হলুদ-ঘেঁষা ধানি রং।

: যাক। তোর মন তা হলে ভালো আছে। আচ্ছা বই-এব হকারি কেন বল তো?

: বাঙালি বলতে যে আত্মগরিমা যার ফলে নিজেকে শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান এই সব মনে কবা—এই সব জীবিকা-পছন্দেও কাজ কবেছে। কি কাণ্ড! এখন তো তবু বেমবসুম। মবসুমে গাড়ি থেকে নেমে যাবা পাহাড়েব বাস ধরবে, কিংবা পাহাড় থেকে নেমে যারা গাড়িতে উঠবে ষ্টেশনের হৈ চৈ

চাগর্ম, পানসিগ্রেট, আর এদিকে এস এই গাড়িতে—এমন সব শব্দের মধ্যে তারা হয়তো শুনতে পায় কে যেন রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছে, হয়তো দুঃসময়, কিংবা অন্তুকে বলা এলার কোনো কথা, কিংবা অমিত রায়ের ভঙ্গিতে নিবারণ চক্রবর্তীর কথা, অথবা হয়তো ইংরেজিতে 'মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ'...।

মিসেস দত্ত বললে, কালও কি যেন রবীন্দ্রনাথ পড়ছিল।

: আসলে প্রভাতবাবু বলছিলেন লোকটা নাকি উদ্বাস্তু, তাই না মিস্টার ঘোষ?

গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই প্রভাত উঠে নিজেদের বার্থের দিকে এল।

পূরবী হেসে বললে, কালকের সেই বই-এর হকার উদ্বাস্তু নয় কি?

প্রভাত পূরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসল। বললে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। উদ্বাস্তু না হলে উত্তরপ্রদেশের এই উত্তর অঞ্চলে অমন বই-এর হকারি করে?

মিসেস দত্ত ভাবলে এরা দেখছি চোখে চোখে কথা বললে। সে বললে, আসলে হয়তো উলবেড়েতে বাড়ি।

প্রভাত বললে, উলবেড়ে?

পূরবী বললে, অর্থাৎ পদ্মার এপারেও উদ্বাস্তু হয়।

প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, কলকাতার দিকে..

প্রভাত বললে পূরবীকে, কেমন বলেছিলাম না।

পূরবী বললে, এমন কি হেয়ার স্ট্রিট হলেও।

মিসেস দত্ত যেন অবাক হয়ে গেল। বললে, উলবেড়ে নয়?

: হেয়ার স্ট্রিট কিংবা বলরাম ঘোষও হতে পারে। আপনি ভেবে দেখুন মিসেস দত্ত।

প্রভা হাই তুলল, মুখের উপর থেকে চুল সরাল। মৃদু উত্তেজিত হল তার চোখ যাতে কি করে বা একটা সবুজ সোনালি ভাব আছে। বললে, 'আপনি'? আপনি বলছ, তা বেশ তো এবারকার ট্যুরে আপনি বলো।

পূরবী হাসল। বেশ তো খেলা—এই ভাবলে সে।

প্রভাত পূরবীকে বললে, এ বিষয়ে তোমার মত কি?

পূরবী বললে, ক্ষতি কি? আমরা কে কাকে কতটা চিনি? বিশ-পঁচিশ বছরেই কি চেনা হয়?

প্রভাতর যেন একটু ভয় ভয় করল। কিন্তু সদ্য ঘুমভাঙা জড়িমায় যেমন..।

সে হাসল। বললে, মিস্টার ঘোষ, এবার বোধ হয় আপনাকে তৈরি হতে হয়। মনে হচ্ছে স্টেশনটা এসে গেল।

প্রভাত একবার জানলার বাইরে চেয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াল। বললে, চিরকালই আমি এ রকম যে বাসটা প্রায় মিস্ করে · মিস বসু একটু হেল্প কর, মিসেস দত্ত আপনি এই বেঞ্চটায় বসুন। তিনটে বার্থের ছড়ানো বিছানা যা ভিন্ন রঙের হলেও একই ফ্যাক্টরির এবং নিশ্চয় একই দামের—যাকে ঘুঁটিয়ে ব্যাগে পরিণত করা যায় এবং একটু চেপে সুটকেশে ভরে নেয়া যায়, এবং তিনটে তিন রঙের (রংগুলোর তিনটি সমদূরবর্তী নয়—ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে দুটির মধ্যে কিছু নৈকট্য আছে), বাগ যা আবার একই কোআলিটির; এরকম মনে করলে চলবে না এগুলো একই দোকান থেকে একসঙ্গে কেনা; বরং এগুলোর আকার, প্রকার, গুণগত ঐক্য প্রমাণ করে পদবী ঘোষ, বসু এবং দত্ত হলেও মানুষ তিনটি স্লিপিং ব্যাগ, বাগ্, পরে দেখব সানগ্লাস, ইত্যাদির পছন্দে নিজেদের সামাজিক অবস্থানের নৈকট্য প্রমাণ করে।

মিসেস প্রভা দত্ত (গাড়ি ততক্ষণে স্টেশনে থেমেছে, আর ঘন্টা দু-এক নড়বে না, পরে সাইডিং যাবে হয়তো, কারণ এটা তো একটা প্রান্তিক স্টেশন) উঠে দাঁড়িয়ে তার সিল্কের শাড়ির (না, এখন আর পাল্টে কি হবে?) কোঁচকানো অংশগুলোকে একটু-আধটু টেনে, তার সেই একতলার বার্থ থেকে কফি রঙের ভ্যানিটি ব্যাগটাকে নিয়ে বেঞ্চে বসল, মিস পূরবী বসু আর মিস্টার প্রভাত দত্ত বি. ই. সি ই-কে বিছানা গুটিয়ে নেয়ার সুযোগ দিতে। আর তখন দেখা গেল স্লিপিং ব্যাগ তিনটেকে তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন শহরে কেনা হলেও এখন যেন বহনের সুবিধার জন্য একটা কালো স্টিলের ফ্রেমযুক্ত প্ল্যাস্টিকের চৌকোণ কেসে ভরা গেল। আর তখন এক-তলা বার্থের তলা থেকে অজস্র জিনিসপত্তর বার হতে লাগল যা দেখে বোঝা গেল তিনটে বার্থের তিনটি বিছানা দেখে যত হাল্কা-ভ্রমণ মনে করা গিয়েছিল তা নয়। জায়ান্ট-সাইজের দুটো টিফিন ক্যারিয়ার, দশ কাপ চা ধরে এমন সাদা ঢাকনা লাল বডি, স্ট্র্যাপ যুক্ত ম্যাগনাম-থার্মোফ্ল্যাস্ক, কিং সাইজ ওয়াটর বটল। দুটো ফোল্ডিং এবং একটা তাঁবু হেন পুরুষ ছাতা। একটা ওয়াকিং স্টিক এলো বেঞ্চ আর গাড়ির সংযোগস্থল থেকে, আর অবশ্যই তিন রঙের কিন্তু একই কোআলিটির আর প্রায় একই মাপের তিনটে ফোম সুটকেশ।

দুজন কুলি যথেষ্ট। আব তা ছাডা ট্যুবিস্টই যদি, পিঠে থার্মোফ্ল্যাস্ক, ওযাটব বটল ঝুললেই মানায। পিঠেব দিকে ক্যামেবা, মাথায ফেল্ট-হ্যাট, হাতে ওযাকিং স্টিক নিযে প্রভাত, তাব পিছনে এক কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ অন্য কাঁধে থার্মোফ্লাস্ক নিযে পূববী গাডি থেকে নামল বটে, কুলিবা ব্যাগগুলোকে, বিছানার সেই কেস এবং তাঁবু হেন পুরুষ ছাতা নিযে দাঁডিযে আছে বটে , প্রভা নামছে না। ততক্ষণে সে বেঞ্চেব তলায উপবে, মাঝেব বার্থের উপবে, এমন কি চেইন ধবে ঝুলে দাঁডিযে তেতলা বার্থেব উপবে দেখে নিচ্ছে। ওদেব দুজনেবই তো বযস কম, তা ছাডা সকাল থেকে চোখেব ইশাবায কথা বলছে যেন, ভুল হতে কতক্ষণ।

চোখে সানগ্লাস এঁটে পূববী মৃদু গলায ডাকলে, মাসীমা।

এমনকি প্রভাতও তাব সানগ্লাস পবে নিল। অবশেষে সে হাসি আডাল কবে গাডিব দবজাব দিকে ফিবে ডাকল, মিসেস দত্ত।

তখন প্রভা এল এক কাঁধে চকোলেট ভ্যানিটি ব্যাগ অন্য কাঁধে সেই ম্যাগনাম ফাইবাব গ্লাসের ওযাটাব বটল্। গাডি থেকে নেমে বেলা দশটার বোদে নীল, বাদামি, সবুজে পাহাডেব ভাঁজ, ঢেউ, স্তনহেন স্ফীতি ইত্যাদি দেখে নিযে সানগ্লাস চডাল।

আগে কুলি দুজন, পাশাপাশি তিনজন, কখনও একেব পিছনে অন্যজন, কখনও বোন্ ফ্ল্যানেলেব শার্ট অথচ মাথায ছাই বং ফেল্ট-হ্যাট মাথায প্রভাতেব পাশে নীলে সাদা-হলুদ বুটি সিল্ক চকোলেট ভ্যানিটি ব্যাগ গৌরবর্ণ, কখনও প্রভাত আগে আগে পিছনে পাশাপাশি নীলে সাদা হলুদ বুটি সিল্ক ও হলুদে-লাল বর্ণেব পাশে, সবুজ নীলে ডুবি তাঁতের শাডি, হলুদে লাল ভ্যানিটি ব্যাগ আব চিকন শ্যামা মুখে লাল ঠোঁট আব সবুজ সান-গ্লাস।

পথ টাবম্যাক্, খানিকটা যেতে তিন দিক থেকে পাহাড, সবুজ, নীল, বাদামি, গেরুযা হলুদ, আর পথেব মাথায একটা সার্কাসে যেন দাঁডিযে থাকা নানা রঙেব ক্ষযশীলতার নানা স্তরে এমন ঘুমন্ত তেলেপোকা-গুবরে-উচ্চিংডে-হেন বিশ্রামবত বাস।

তখন কুলিবা লম্বা লম্বা শিবা বেব-কবা পাযে হন হন কবে হাঁটছে। নীলে সাদা হলুদ বুটি যা সিল্ক হওযায আলোয, তা বেলা দশটাব হবে, চক্‌চকে, দোদুল্যমান চকোলেট ভ্যানিটি ব্যাগ ও সোনালি হলুদ ফাইবার গ্লাস ওযাটর বটল্, ফ্ল্যাট-হিল স্লিপার, পুষ্ট সুঠাম নিতম্ব, চকচকে

বেশমি চুলের টেনিস বল হেন এলো খোঁপা এগিযে গিযেছে। কোমরের শাড়ি আর সাদায় আকাশী নীল বুটির চোলির মাঝখানে যে পুষ্ট ক্রোম-হলুদ পিঠ তাতে গৃহিণীপনা সত্ত্বেও ব্যথা নেই।

তখন সবুজনীলে ডুরি তাঁতের শাড়ি শ্যামা মুখের সবুজ সানগ্লাসের নীচে লাল ঠোঁট দুটো ছাই রং ফেল্ট-হ্যাটের নীচে দাড়ির নীল আভাস যুক্ত ফর্সা মুখের পাশে।

তখন প্রভাত বললে, ধীরে মিসেস দত্ত।

তা শুনে পূরবী শব্দ না-করে-প্রায় কিন্তু ফিক করে হাসল। বললে, তা হলে মিসেস দত্ত এবং আপনি ঠিক হল।

: ক্ষতি কী? তোমাকেও আপনি বলতে পারি।

: না, বরং, চেষ্টা করে দেখি তোমাকে তুমি বললে কেমন শোনায়।

প্রভাত হো হো করে হাসল। বললে, এই প্রায় গোলাকার বাসের সার্কাস, কোনো নাম নেই। মাপে তিন হাজার পাঁচ শ ছিয়াত্তর বর্গমিটার। ম্যাল বলা যেত। চলে যাচ্ছে বাসস্ট্যাণ্ড নাম নিয়ে। এদিকে অর্থাৎ আমাদের পিছন দিকে স্টেশন পর্যন্ত, লক্ষ করে দেখেছ তো,—একটা উপত্যকা খুব ধীরে ধীরে নেমে, কিন্তু এই বাসস্ট্যাণ্ডের উত্তর আর পশ্চিমে আর উত্তরে উপত্যকাটা হঠাৎ নেমে গেছে ছোট বড় নুড়ি, চাঁই চাঁই পাথরের ঢালে গঙ্গায়। আর বাসগুলো উত্তর-পুব দিয়ে বেরোয় এখান থেকে পাহাড়ে উঠতে।

পূরবী বললে, আপনার সব মুখস্ত দেখছি, এই ম্যাল কি আপনার তৈরি?

কিন্তু প্রভা থেমে দাঁড়াল। পূরবী পাশে এসে পড়লে তার হাত ধরলে। বললে, প্রকৃতপক্ষে তুমি এই প্রথম পাহাড়ে আসছ। সাবধানে চলবে কিন্তু।

আর সেই সুযোগে প্রভাত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল বাস স্ট্যাণ্ডের উত্তরপ্রান্ত যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে একশ ফুট—গঙ্গায়। ভেঙেচুরে নুড়ি ও চাঁই, আর তাদের খাঁজে দু-একটা গাছ। সে দেখলে ওপারে বাস রাস্তা পর্যন্ত যে-ঢাল নেমেছে পাহাড়ের সেটা মৃদু ধসে আক্রান্ত। অস্বস্তিতে সে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে দেখে নিল। প্রকৃতপক্ষে সে কি আগে এসে পড়েছে?

পূরবী বললে, হ্যাঁ প্রথমই তো, যদিও আমার বয়স ছাব্বিশ।

প্রভা বললে, তাহলেই দেখ। আর তা ছাড়া প্রভাত কে প্রভাত?

: প্রভাত তোমার সতীনের বোনপো।

: ওমা। তাই বুঝি বলেছি।

: আর মাসীমা ·

প্রভা নিঃশব্দে হাসল। বললে, আমরা এইগুলোর মধ্যে··। কোন বাসটায় যাব কে জানে।

প্রভাত ভাবলে : কিছু তো ঘটেছে নিশ্চয়। না হলে এরকম গুজব কেন সব এঞ্জিনিয়ার আসছে। তাকে কেউ বলে নি। তাকে কেউ বলে নি।

আর কুলি দুটো তখন তিনটে সুটকেস, একটা স্লিপিং ব্যাগের স্টিলের ফ্রেমে কালো প্লাস্টিকে তৈরি পেল্লায় কেস আর তাঁবু-মার্কা এক ছাতা যার প্যানেলে লাল আর নীল পর্যায়ক্রমে, তা নিয়ে এ-বাস ও-বাসের দরজায় ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও এতটুকু কুয়াশা নেই আর বেলা দশটার রোদে সব ঝকঝকে।

প্রভা তখন হাসল। বললে, পথ হারানো পথিক যেন গো, আমরা এই দিকে প্রভাত।

প্রভাত বললে, আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। এখানে বেমরসুমেও ভালো ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে। তোমরা মালগুলো নিয়ে বসো। আমরা খেয়ে নি। ওপারে যাব, ওপারে··। এখানে ভালো বাথরুম আছে। ভেতরে চলে যান।

পূরবী বললে, মাসীমা তোয়ালে সাবান ব্রাশ বার করে দেব ?

প্রভাত বললে, আমরা কি ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেব, না আপনি দেবেন ?

: আমি যাব আর আসব।

তখন পূরবী বললে, ও· আচ্ছা।

প্রভাত বললে, কি ? সেই উদ্বাস্তুদের কথা ?

পূরবী প্রভাতের মুখের দিকে চাইল, তার চোখ পর্যন্ত চোখ তুললে, তারপর মুখ নামালে। বললে, আচ্ছা, সত্যি কি উদ্বাস্তু হতে পারে ?

: এমন কি হেয়ার স্ট্রিটের।

: কে ?

: সেই বই-এর হকারের কথা বলছ তো ?

: হ্যাঁ।

: এখানেই এই ম্যালেই ওর দোকান আছে।

: আর বোধ হয় গৃহ।

: গৃহ ?

: একটা ঘর, যার পাশে কিংবা সামনে একটা গাছ।

পূবরী ভাবতে লাগল। প্রভাত ভাবলে, এই অবস্থায় পুরুষরা সিগারেট ধরায়। তাতে সময় কেটে যায়। মনে কর যদি সময়টাকে পোড়ানো হয় সেটা? পোড়ানো শব্দটা অবশ্যই ভালো নয়।

পূবরী বললে, বাব্বা। কম নয় তো।

: কি?

প্রভাত বিব্রত হয়ে হাসল। বললে, সহ্য করতে হয়, বোধ হয় সয়ে যায়।

প্রভা এসে জিজ্ঞাসা করলে, অর্ডার দিয়েছ? কী-কী?

পূবরী বললে, তা বোধ হয় দিতে হয় না। বেমরসুম তো। ওরা এক-রকমই রাখে। এখানে আর ট্যুরিস্ট কোথায়?

: ওমা তাই। তা হলে অর্ডার দাও প্রভাত। আহা, বেচারা কুলিরা, ওদের জন্যও চা দিতে বল।

প্রভাত বললে, অর্ডার মতোও পাওয়া যায় হয়তো। হয়তো তাতে দেরি হবে।

: দেরি? ও...তা হলেই বা ক্ষতি কি? প্রভা হাসল, পছন্দমতো অর্ডার দাও ব্রেকফাস্টের।

ভাবলে: কথাটা মিথ্যা নয়। কি ক্ষতি হবে দেরিতে? এটাও গৃহ নয়, যদিও যাত্রা এখানেই আপাতত শেষ করে দোতলার হলঘরে কিংবা যদি ঘর পাও তাতে.. বড়জোর কুলিদের বলতে হবে ঘণ্টা অনুসারে মজুরি দেয়া হবে। বললে, দেরি যদি থাকে, তুমি কি করে স্নান করে নেবে পূবরী?

পূবরী দরজার বাইরের বেলা দশের রোদ দেখল। কেমন যেন ফাঁকা সেটা যদি শুধু রোদটাকে কিংবা বেলা দশটাকে দেখতে পার। অধিকাংশ সময়ে কিন্তু সেই রোদ যাতে পড়ে কিংবা সেই বেলা দশটা যে পাত্রে তার আকার আর রং দেখা হয়।

উঠে গিয়ে অর্ডার দিয়ে এল প্রভাত। টেবিলে বসতে গিয়ে হাসল।

: হাসছ যে?

: কুলিদের বিদায় দিলে হয়।

: সে কি?

: প্রকৃতপক্ষে এটাও পান্থনিবাস দেখা যাচ্ছে।

পূবরী বললে, সেটা কি এর চাইতে ভালো হবে না?

: হবে?

প্রভা বললে, কি যে বলো!

অর্ডার-মাফিক ব্রেকফাস্ট আনতে এবং তা শেষ করতে বেলা দুপুর হতে চলল। এখন ছায়াগুলো কালো হচ্ছে। কুলি দুটি চা শেষ করেছে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে পূরবী বললে, আপনারা মোটঘাট নিয়ে বসুন, আমি দেখি কিছু বইপত্রিকা পাই কিনা।

: মোটঘাট? প্রভাত যেন শব্দটা শুনে অবাক হল। সে ভাবলে, মোট-ঘাট কাদের থাকে? হাসল সে।

: দেখবে? প্রভা হাই তুললে।

পূরবী বেরিয়ে গেলে প্রভাত তার সহানুভূতিক হাই তুলে চেয়ার আর টেবিলের সাহায্য নিয়ে এমনভাবে বসল যেন ।

পূরবী বললে, লোকে আমাদের উদ্বাস্তু ভাবছে না তো। আমরা প্রায় দু ঘণ্টা হয় ট্রেন থেকে নেমেছি।

পূরবীর গতির তরঙ্গটা অবশেষে থিতিয়ে গেল টেবিলের চারপাশ থেকে। তার ফলে আলো থেকে সবুজ আর নীলের ভাবটা কমে বরং সাদা যার এখানে ওখানে লুকনো ঘনিষ্ঠ নীল বিন্দু। বেমরসুম হওয়ার ফলে সেই হলে তখন কোনো ট্যুরিস্ট নেই।

প্রভা বললে, তোমাকে এ পর্যন্ত কোনোদিন সিগারেট খেতে দেখি নি। তোমার ও হাত দেখি।

সে হাত বাড়িয়ে প্রভাতের দুটো হাত নিজের দু হাতের তেলোয় নিলে। বললে, যারা সিগারেট খায় তাদের তর্জনী আর মধ্যমার ডগায় বাদামি হলুদ দাগ পড়ে। তোমার কি মনে হয়?

প্রভা হাসল।

: পড়ে?

: আর তা ছাড়া তোমার আঙুলগুলো বেশ লম্বা আর । বেশ নির্জন কিন্তু এদিকটা।

এই বলে প্রভাতের ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতের তেলোয় রেখে নিজের ডান হাতের তর্জনী দিয়ে রেখাগুলোকে অনুসরণ করতে লাগল।

: তুমি কি হাত দেখতে…

: কে? আমি? ও। প্রভা প্রভাতের হাত থেকে আঙুল সরিয়ে নিল।

: আর একটু চা খাব নাকি আমরা?

: কিংবা কফি?

: কিংবা কফি।

প্রভাত হাসল।

বললে, আচ্ছা

: কি ?

: একটু অদ্ভুত লাগছে।

: লাগছে ? সে কিছু নয, প্রভা বললে, কিন্তু ঘটনাটা দেখ। দশ বছরে এই প্রথম দুজনে একেবাবে একা।

: কিছু বলছ ?

: শুধু ঘটনাটা দেখ, অপ্রতিভেব মতো হাসল প্রভা, শুধু যোগাযোগটা।

: কুলিরা কি ভাবছে কে জানে।

পূববী এল বারান্দা থেকেই হাসতে হাসতে। কলেজের লাইব্রেবি থেকে মন-মতো একগাদা বই নিযে যেন।

প্রভা বললে, সে কি বে, এ যে ক্ষিদেয পাগল।

: বাহ, কতদিন কাটাতে হবে কে জানে।

: হাসছিস যে ?

: দোকানদাবেব কথা ভেবে। সেই হকাব কিন্তু।

: ওমা, তাব দোকানও আছে নাকি ?

: থাকাই স্বাভাবিক।

: তা, এই দেখ তোমাদেব জন্যও এনেছি। সস্তা এডিশনেব মধ্যে সব চাইতে ভালো, হকার বলেছে, পিছনে গ্লসও আছে। এই দেখ একখানা ছবি পর্যন্ত। গেইলগুড্ অ্যাজ অ্যান্টনি। অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা। দোকানদাব বললে, মধ্যবযসেব প্রেমেব এমন চিত্র আব কেউ সাহস কবে আঁকে নি। (পূববী হাসল) আমাব মনে হল এব পবে তাকে আব উদ্বাস্তু বলা যায না। এটা তোমাব জন্য মাসীমা।

: খুব বক্তা তো তোব হকাব। প্রভা বললে।

প্রভাত হাসল। বললে : দেখ, জ্যাকেটেব উপরে বাইটআপটা। দোকান-দাব সেটাই বাংলায বলেছে।

পূববী বললে, তোমাব জন্যও প্রেজেন্ট এনেছি। এই দেখ, এথিকস্ অব এঞ্জিনিযাবিং।

বইটা হাতে নিযে জ্যাকেট উল্টে-পাল্টে দেখে প্রভাত বললে, বল এবাব কি বলেছে তোমাব হকার।

: তুমি তো দেখেই নিলে।

: বাংলাটা কি বললে শুনি।

পূরবী হকারের সুর করে বললে, যদি তুমি এঞ্জিনিয়ার, দাঁড়াও তিষ্ঠ ক্ষণকাল, পৃথিবীর মুখ বদলে দেয়ার আগে।

প্রভা হেসে উঠল। বেশ নকল করেছিস তো।

প্রভাত বললে, আমরা কি এখন যাব?

পূরবী বললে, যেতে হবে? এটা কি দোষ করল?

প্রভা বললে, আমরা কি এখান থেকে খাওয়ার জল ভরে নেব?

প্রভাত বলহে, তা কি দরকার হবে? বোধ হয় ফ্লাস্কে কফি নিলে হয়।

পূরবী বললে রোদ উঠেছে কিন্তু। ছাতাগুলো বার করে নিতে হবে।

তারপর তারা হাঁটতে লাগল। ম্যাল থেকে বেরনোর রাস্তা তো উত্তর পুবেই। সেটা দিয়ে প্রায় এক কি. মি. গিয়ে ব্রিজ। ব্রিজ পার হয়ে নদীর অন্য পার ধরে পাহাড়ের গা ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে তারা তখন।

প্রভাত বললে, তো, একোলজি নিয়ে আজকাল বই লেখা হচ্ছে।

প্রভা বললে, ঐ এথিকস্ কি একোলজির?

: হতে পারে, হতে পারে, পড়ি নি তো।

ওরা দুজনে রঙিন ছাতা মেলেছে মাথার উপরে। প্রভাত তার টুপিকে রোদের পক্ষে যথেষ্ট মনে করেছে। আর রাস্তা চওড়া হলেও যেন খাদের দিক থেকে দূরে থাকতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে একের সারিতে চলেছে।

তখন প্রভাত ভাবলে: আগে এখানে আসতে তিনদিন লাগত ওই ওখান থেকে যাকে এখন ম্যাল বলা হল, এখন তিরিশ মিনিট।

পূরবী ভাবলে, আজকাল তো মেয়েরাও পাহাড়ে যায়, হ্যাঁ পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে, আবার ফিরে আসে, আবার ওঠে।

প্রভা ভাবলে, ও, হ্যাঁ, সেই বাড়িটা। কি জানি তাতে কতগুলো ঘর। পাশাপাশি, নাকি উপরে নীচে?

প্রভাত ভাবলে, এটা কি এথিক্যাল নয়, এই সময় কমিয়ে আনা? আর পূরবী তিষ্ঠ ক্ষণকাল। সে আপন মনে হাসল, দেখতে হবে বইটা পড়ে। দেখতে হবে।

পূরবী ভাবলে, আর পাহাড়ের চূড়ায়, তারপরে নেমে আসে আর হাসে।

আর চূড়াটা তখন অবাক হয়ে ভাবে আবার আসবে না? সে আনমনে হাসি হাসি মুখ তুলে পথটা দেখল।

প্রভা ভাবলে, আর, না নিশ্চয় ভয়ের কিছু নয়? এই দেখ চিরকালের জন্য তো নয়। বরং, দেখ, বাড়িটা কিছু পুরনো হলেও অভিজ্ঞতাটা হবে নতুন। আর···ও হ্যাঁ সেই অ্যান্টনি ·

প্রভাত। হয়তো একোলজিকে ডিস্টার্ব করা উচিত নয়। কারণ ·

পূরবী। তখন কলেজ খোলে। আবার ক্লাস, আবার পড়ানো। অবাক লাগে না? কি করে হঠাৎ সাহস হয়ে গেল।

প্রভা যেন একটা বাড়িকে চোখের সামনে গড়ে উঠতে দেখল। আধুনিক, কিউবের উপরে কিউব বসানো বাড়িই বটে, যার রং কমলা, দরজা জানলায় নতুন করে রং দিতে হবে যেন, বর্ষায় সবুজ শ্যাওলা জমেছে। কাচের জানলা-গুলোয় আলো পড়ছে। সে যেন চমকে উঠল, একটা, বোধহয় দোতলার, জানলা খোলা।

তখন তারা ট্রারম্যাক পথ ছেড়ে পাহাড়ী মাটি আর নুড়ির তৈরি এক পথে বাঁক নিল। যে পথের দু দিকেই পাহাড়। আর যা মৃদু ঢালে উপরে উঠছে।

পূরবী বললে, সিংজানির ইস্কুল-মাস্টার শচীবিলাস, জান মিস্টার ঘোষ।

প্রভাত বললে, দেখ প্রভা দত্ত, মানে তোমার মাসীমা, এগিয়ে যাচ্ছেন। কুলিদের প্রায় ধরেছেন। কে শচীবিলাস? ও, হ্যাঁ সেই উদ্বাস্তু হকার। বলো, বলো ·

: মনে কর তাদের গ্রামে, গ্রামের চারিদিকে, ইস্কুল বাড়িতে, শোবার ঘরে আগুন। কি তার তেজ। পটপট শব্দে বাঁশ পুড়ছে, ঝন্‌ঝন্ করে টিন উড়ে পড়ছে, বাতাস হা হা করছে। যা কিছু জ্বলছে তাতো আগুনেই, কিন্তু দগ্ধাবশেষ অনেক কিছু ধোঁয়া আর বাতাসের ঘূর্ণিতে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় কোথায় চলে গিয়েছে। তখন তার কাছে কলকাতাই বা কি, কালিকটই বা কি? পিছনে এক দারুণ চাপ। হাজার হাজার মানুষের পায়ের চাপে কিংবা বলো দগ্ধাবশেষ যেমন হাওয়ায় ওড়ে শচীবিলাস তেমন এখানে উড়ে এসে পড়েছিল।

: শচীবিলাস বলছ?

: শচীবিলাস নয়?

: ওতো, বোধহয়, গাড়িতে তখন চার অধ্যায় বিক্রি করার চেষ্টায় ছিল।

পূরবী হাসল, বললে, তুমি কি বলবে ওকে তুমি কিংবা তোমার মাসি হেয়ার স্ট্রিটে চিনতে ?

: হেয়ার স্ট্রিট ? উলবেডে নয় বলছ ?·

: কিন্তু তুমি ভাবছ কি ? আমার·

: কি ?

: সন্দেহ হচ্ছে যদি অবিশ্যি ভালোই হয়।

: যদি বাড়িটা সত্যি সত্যি না থেকে থাকে ?

: আহা—তাতে যেন · ডাক-বাংলো থাকবে।

: তা হলেও দেখ এ যেন পুরোপুরি দুপুর। ঘড়ি আছে ?

আর তারপর তখন প্রভাত এগিয়ে গেল। কিছু একটা হয়েছে। মিসেস দত্ত দাঁড়িয়ে পড়ে পিছন দিকে চাইছে।

পূরবী ভাবলে, কুলিরা কি বসে পড়ল ? কিন্তু ওটা বলা, জ্যাকেটে যা লিখেছে তার বাংলা···মাঝ-বয়সের প্রেম তা সত্যি বলতে আর কেউ কি সাহস করে লিখেছে ? সে হাসল, আপন মনে।

··তা, মানায় কিন্তু দেখ। প্রায় সাদা কিন্তু হলুদ এমন দেখাচ্ছে নীল পাড় শাড়িটা। চওড়া সুগঠিত পাছা, চুল টেনিশ বল খোঁপায়, কিন্তু স্বাস্থ্যের ছবি। আর প্যারাসলটা দেখ, যা দেখে মনে হয় এখন থেকে যে-সব শাড়ি পরবেন সবগুলোতে নীল থাকবে। আচ্ছা, হয়তো চল্লিশ হল,···তা এখনও হতে পারে। মনে হয় না ?

কুলিরা বসে পড়েছিল। বিশ্রাম করে আবার উঠল। এবার পথটা আবার পাহাড়ের গায়ে গায়ে চলেছে। আর তখন পূরবী ভাবলে, মনে কর রাত হল। কোন একটা একশ স্কোয়ার মিটার উপত্যকায় রাত কাটল হয়তো। কিন্তু, সে হাসল, এবার জিজ্ঞাসা করার সময় হয়েছে সত্যি একটা বাংলো, কিংবা বাড়ির উদ্দেশ্যেই তো বলা হচ্ছে ? মিসেস দত্ত আর প্রভাত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দ্বিধা করছে যেন।

ঠিক তখনই তারা বাড়িটাতে পৌঁছে গেল। তখন ঘড়ি দেখল পূরবী। আর বললে, ও মা। এ যে দেখছি সাড়ে বারটা বাজে মাত্র।

বাড়িটা সদা। যার দোতলার পুরনো জানলা দরজাগুলোয় রং দরকার। যার সাদা দেয়ালে সাজে নীল লিকেন আর মস্। যার পুবদক্ষিণ কোণে একটা দেবদারু যা-মাথা কোন ঝড়ে ভেঙে দিয়েছে। বাড়িটার সামনেটা দক্ষিণ থেকে পূবে টানা একটা লাইনে। ফেনসিং নেই, ছিল তা বোঝাতে

দু-একটা লোহার খোঁটা আর একটু তার। দক্ষিণ-পুবে টানা লাইনের মাঝামাঝি অদৃশ্য। ফেনসিং-এর বরং কাছে একটা বাদাম গাছ যার নীচে একটা পাহাড়ী গাই যা জাবর কাটছে। টিলাটা লালচে গেরুয়া, বাড়িটা সাদা লিকেনগুলো সবুজ, দেবদারুর পাতার ঝোপটা গাঢ় সবুজ। বাদাম গাছটার পাতা সবুজ আর ভারতী লাল, গরুটার সাদা গায়ে বাদামি ছোপ।

একেবারে অবিশ্বাস্য আর অলৌকিক যেন। আর তাতে ভয় করে উঠল যেন পূরবীর। আর ভয় পাওয়াতে লজ্জা। যেন সেই ভয় কাটাতে সে নিজেকে শোনালে : দেখ, আমি তো দিল্লি থেকে আসছি। আরও স্পষ্ট করে দরয়াগঞ্জ থেকে। আর সেখানে, আমার বয়স ছাব্বিশ, আমি অধ্যাপিকা। এমনকি আমার ছবিও আছে, আমি ছুটি-ছাটায় ছবি আঁকি। নিজের বাস্তবতার এই উপাদানগুলোকে মনে করতে-করতে তার গা শিরশির করে ভয়ভয় প্রত্যাশার কি একটা তার গাল পর্যন্ত উঠল।

সে দেখলে কুলিরা বাড়িটায় ঢুকে পড়েছে। টিলাটা বেয়ে উঠতে উঠতে হাততালি দিচ্ছে যেন মাসীমা। কি দেখাচ্ছে আঙুল দিয়ে। কি বলছে, শব্দ আসছে, বোঝা যাচ্ছে না।

প্রভাতও কম অবাক নয়। সে ভাবলে এটা কি তবে ডাকবাংলো নয়, ইঞ্জিনিয়ারদের? ওই গরুটা কার? তা হলে লোক আছে যে দেখা শোনা করে।

প্রভা দাঁড়িয়ে পড়েছিল গাড়ি-বারান্দার সামনে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, দেখেছ, প্রভাত, গরুটা আছে, কিন্তু শেড্ নেই। টিনের ছাদ দিয়ে বানিয়ে নিতে হবে দেখছি। কেন যে শেড্ করে নি। আমি হলে…। চলো চলো ঘরগুলো দেখে নি! সে হাত বাড়িয়ে প্রভাতের হাত ধরলে।

এসো এসো বলে গাড়ি-বারান্দার নীচে ঢুকে গেল প্রভাতকে নিয়ে।

গাড়ি-বারান্দার সামনে থেমে গিয়ে পূরবী ভাবলে, একটা বাড়ি একজনের ফেট্ হয় না। হব কি? এই বাড়িটার জন্যই কি ছাব্বিশ বছর এক এক করে জমে একজনের? আর এখান থেকে ফিরে যাব যখন, তখন কি অভিজ্ঞতায় অন্য মানুষ?

প্রভা ফিস ফিস করে বললে চোতালার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে, কি সুন্দর না? কি সুন্দর, না? চলো পূরবী আমাদের আগে, মানে ও তো ছেলেমানুষ, আমাদের ঘরগুলোকে ঠিক করে নিই। ওর ঘরও থাকবে, আর তা ভালোই হবে, কিন্তু…। দেখ আগে জানতাম না এমন পাশাপাশি

ঘর সব, আর এক ঘর থেকে বারান্দায় না এসে অন্য ঘরে যাওয়া যায়।

সে আনন্দে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার হাঁপানি সত্ত্বেও খিলখিল করে হেসে উঠল।

ডিনারে বাসমতী চালের ভাত; ডুমুরের ডালনা, টকো দই, আর পাথুরে প্যাড়া। পিতলের ডোমদার শেজ যার পিতলে কলঙ্ক।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে পাশাপাশি তিনখানা ঘর। বাঁ দিকে এক-খানা। তার সামনে বেতের টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। আর তার উপরে প্লেট, চামচ, বউল, সাদা কেওলিন। কাচের গ্লাস। প্রভাত দেখতে পেলে প্রভাকে। হাল্কা নীলে হাল্কা হলুদ চেক সিল্ক। ময়ূরকণ্ঠী নীল চোলি। প্রভা ক্যানভাসের নীল চটির মৃদু শব্দ করে টেবিলে এসে বসল। আলোটা গিয়ে পড়ল তার মুখের একপাশে। আর প্রভাত দেখলে সেই কানে সাদায় নীলে নীলা করা টাপে্ হলুদ পাথর।

প্রভা বললে, অমন হাঁ করে দেখছ কি? আমাকে?

: একেবারে নতুন লাগছে, বললে প্রভাত। এসব কি তৈরি করা ছিল? সে যেন ভয় ঢাকতে হাসল।

প্রভা খুশিতে হাসল, নতুন তৈরি করালে বা দোষ কী? কিন্তু তুমি ও-বইটা হাতে করে এনেছ কেন।

প্রভাত লজ্জিত হয়ে বইটা প্লেটের পাশে রাখল।

প্রভা বললে, পূরবী ঘরে খাবে। ট্রেতে খাবার পাঠিয়েছি।

ও?

প্রভাত দেখলে ডোমদার শেজ থেকে আলোটা হলুদ একটা বৃত্ত হয়ে সাদা টেবিলক্লথে পড়েছে।

ডিনার শেষ হলে প্রভা বললে, আমি এখন ঘরে যাব। তুমি কি বই পড়বে এখন? প্রভাত বললে, একটু পড়ি, কেমন?

যে চাকরকে প্রভা বিকেলে রেখেছে সে টেবিল থেকে প্লেটগুলো সরিয়ে ফেললে আর প্রভাত বই নিয়ে সেই খালি বারান্দায় সেজের আলোয় বই পড়তে বসল।

আলোটা বাঁ দিকে, সে-জন্য কিছুক্ষণের মধ্যে তার ডান দিকটা ছায়ায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হল।

পূরবী এসে বললে, ঘুমাও নি? রাত দশটা হয়ে গেল।

পূরবীর হাল্কা লাল জমিতে ইট-লাল আর সাদায় ছাপানো মাধবী ফুল

এমন ম্যাক্সি। বাঁ বুক ঢেকে চুল। দুহাত বুকে আড়াআড়ি রাখা। আর তা দেখে প্রভাত বললে, নতুন লাগছে।

পূরবী বললে ; বসি একটু।

: বসো। ঘুমাবে না।

পূরবী বললে, তার সবুজ শ্যামল মুখে ঠোঁট দুটো হাল্কা লাল, জানো আমার ঘরে—আমার ভয়-ভয়ই করছে—হয় বাদুড়, কিংবা চামচিকে কিংবা মথ। আর ভয় ঢাকতে সে হাসল।

প্রভাত চারিদিকে দেখে বললে, দরজা খোলা পেয়ে উড়ে গিয়েছে।

পূরবী বললে, বস।

তখন প্রভাত লক্ষ করলে এ যেন গাড়ির মতোই ব্যবস্থা, মাঝখানে তার ঘর, বাঁয়েরটি পূরবীর, ডানদিকের দরজা খুললে প্রভা মাসির। পূরবীর ঘর থেকে তার ঘরে যাওয়া যায়, তার ঘরের দরজা প্রভামাসির ঘরে খোলে।

পূরবী বললে, আরও পড়বে। সে তার ঘরের শেজ বাতি কমিয়ে দিল।

প্রভাত বললে, আর একটু পড়ি, আর একটু। ভারি ইনট্রেস্টিং এই এথিকস্। ..।

বারান্দার টেবলে শেজটাকে বাড়িয়ে দিলে প্রভাত দেখতে পেল প্রভার ঘরের এদিকের দরজাটা খোলা। প্রভা এসে বললে, রাত কিন্তু অনেক হল।

: বসো।

প্রভা হাসল। আর তার নীল চোলি ঢাকা উঁচু বুকে আলো পড়ল।

প্রভাত বললে, উঠি, উঠি ; এখনই উঠছি।

প্রভা হাই তুললে। বললে, আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

ব্রেকফাস্টের সময়ে, তা তখন দেরিই হয়েছে, সাড়ে নটা বাজে। প্রভা টেবলের ধারে বসে দেখতে পেলে পূরবী ভ্যানিটি ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে প্যারাসল মাথায় সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। সিঁড়িতে, ল্যাণ্ডিং-এ এমন কি বারান্দায় পৌঁছেও ছাতা বন্ধ করলে না পূরবী, কপালে উড়ন্ত চুলের আঁশগুলোর নীচে ঘামের বিন্দুগুলোকে মুছলে না।

টেবলের ধারে দাঁড়িয়েও কাঁধের উপরে হেলানো খোলা ছাতাটাকে পাক খাওয়াতে দেখে প্রভা বললে, সকালে মন খুব ভালো হয়েছে দেখছি। বস। একটু চা খেয়ে নিলে হয়।

: অনেক দূর হেঁটেছি। ক্ষিদেও পেয়েছে। আমি ভেবেছি তোমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গিয়েছে।

: আগে একটু চা খেয়ে নি। তারপর· ।

: ম্যালে গিয়েছিলাম। তুমি—তোমার শরীর ভালো আছে তো?

: ম্যালে? শরীর কেন ভালো থাকবে না? ওমা, ম্যালে কেন এই সকালে।

: সেই বই-এর হকার। তাকে চিঠি আসার ঠিকানা করে এলাম। মনে হচ্ছে রাতে ঘুমাও নি। চোখের কোলে কালি।

: পনেরো দিন হয়ে গেল না? আর কপাল আর গা গাল ঢেকে রুক্ষ চুল উড়ছে। পূরবী হাসল ঠোঁট টিপে।

: কি যে বলিস।

পূরবী চায়ের কাপ নিয়ে বললে, বাবা, ভাবো, একটা চিঠি আসছে না। আমরা যেন উদ্বাস্তু···।

: তোমার কলেজ খোলার সময় হল নাকি?

: হবে তো একদিন। হবে না? ··পূরবী কপালের ঘাম মুছলে। তার গা শিরশির করে উঠল। কিন্তু · ।

: কি?

: মিস্টার ঘোষকে কি ডাকতে হবে? অনেক রাতে ঘুমিয়েছে হয়তো। অনেক রাতে, তাই না?

: ওমা সে কি। আমি ভাবছি তোর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।

যখন পূরবী ভাবছে মাসীমারই তা হলে ডাকা উচিত, আর প্রভা ভাবছে পূরবীকে বলবে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকো না, হাসতে হাসতে তখন বেলা দশটায় প্রভাত এল। বললে, সরি, সরি, সরি, দেখ ট্যুরিস্ট কিংবা চেঞ্জার সকলেরই মর্নিং ওয়াক ভালো। তোমরাও খাওনি দেখছি।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে প্রভা বললে, জান, মিস্টার ঘোষ, পূরবী ম্যালে গিয়েছিল।

: বলছেন কি? ইন্‌ট্রিস্টিং।

: বলছিল চিঠিপত্র আসবার তো ঠিকানা থাকা চাই। তাই বই-হকারকে কেয়ার পার্টি করছে। যদিও সে একজন উদ্বাস্তু ছিল। হয়তো···প্রভা হাসল হাল্কা এই মজায়।

প্রভাত বললে, এস পূরবী, শুরু করা যাক।

খেতে খেতে প্রভাত বললে, আজও সে এদিক-ওদিক গ্রামে ঘুরেছে। টিলায় টিলায় যে বাড়িগুলো পাহাড়ীদের সেখানেও গিয়েছে। দুচার বুড়ো বুড়ির সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তো, তারা বললে এই সাদা বাড়িটা যার গায়ে সবুজ আর নীল লিকেন, যার এক কোণে বাড়ে মাথা-ভাঙা দেবদারু, আর ফ্রন্টের মাঝামাঝি কাঠবাদামগাছ—(সে এই জায়গায় গলা সাফ করলে) সেটা কারো বাড়ি কিংবা ডাকবাংলো তা তারা কেউ জানে না।

: কেউ জানে না? প্রভা অবাক হল।

: হ্যাঁ। মানে, ও, কেউ জানে না এটা ডাকবাংলো কিংবা কার গৃহ। (এই জায়গায় প্রভাতকে হতভম্ব দেখাল, আর তা ঢাকতে সে হাসল)।

আর প্রভা বললে, ডিমগুলো টাটকা বটে। ভাবছি একটু বেরোব। টিলায় টিলায় যে গ্রামগুলো তাতে ঘুরব। টাটকা মাখন পেলে ভালো হয়। তাই নয়? আর পরে ম্যালেও যেতে পারি, যদি টাটকা ভেজিটেবল পাওয়া যায়। তোমার কি মনে হয়, পূরবী, আর-একজন হেলপার রাখা দরকার?

পূরবী বললে, হ্যাঁ, ডিমগুলো টাটকা, বেশ টাটকাই।

পরে যখন প্রভা কফি দিচ্ছে পূরবী মিটমিট করে হাসতে থাকল।

প্রভা বললে, হাসছিস যে?

পূরবী বললে, দেখো সেই শচীবিলাস·

: শচীবিলাস? কে? ওই সেই উদ্বাস্তু হকার? কিন্তু ওর নাম কি শচীবিলাসই?

পূরবী বললে, সে কিন্তু পূর্ববঙ্গের নাও হতে পারে। নাও হতে পারে কেন, নয়ই। আসলে হেয়ার স্ট্রিটের। আর ব্যাপারটা প্রেম-ঘটিত। (এই খানে তার গালে টোল খেল, লাল দেখাল তার মুখ)।

: প্রেম? বলিস কি? প্রভা বললে, এমন শুনি নি তো কোনোদিন।

: মানে, বলব কি? (পূরবী এই জায়গায় দুষ্টুমি করছে এই রকম হাসল) অর্থাৎ হেয়ার স্ট্রিটে ভালোবাসা যেত না। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি বিবাহিতা। এবং ··।

: কি এবং? প্রভা এরকম ভাব করলে যেন বলবে, করো তো প্রমাণ তোমার এই গল্প।

পূরবী বললে, সুন্দর কিন্তু কফিটা। তাই নয়, এঞ্জিনিয়ার?

: ও। হ্যাঁ। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

আর পূরবী বললে, কফি থেকে প্রভার চূর্ণকুন্তলে ঢাকা কপাল আর

নীলেসাদায় মিনা ইয়ারটাপ্ পর্যন্ত মুখ তুলে, বুঝতেই পারছ, মাসীমা, স্ত্রীলোকটি শচীবিলাসের, উলবেডেই বলো যদি, সেই জীবনে হয়তো সম্পর্কে কাকিমা কিংবা পিসি ছিল।

প্রভা খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে, তুমি এখন আবার বাইরে যাবে প্রভাত? তা হলে তোমার সঙ্গে গ্রামে ঘুরতে পারি।

তখন পূরবী বললে, তোমার এই ইয়ারটাপ্, মাসীমা, এর আগে দেখি নি। একেবারে নতুন, না? বেরোবার আগে বানিয়েছ?

পূরবীর ঘরখানাই প্রান্তে। তারপরেই বারান্দা। অর্থাৎ তার ঘরের সামনে আর ডান পাশে বারান্দা। সে বারান্দায় এই দুপুরে বেশ বাতাস। এবং আলো। পূরবী লক্ষ করলে ঘরের ভিতর থেকে একটা পাতা উড়ে এসে পড়েছে কখন। তা হলে কোন সময়ে একটা পাখিও এসে বসতে পারে।

সে ঘরের মধ্যে প্যাড আর কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসল। তার সুযোগও দেখা যাচ্ছে। প্রভা তো হাসতে হাসতে প্রভাতের কনুই ধরে বেরিয়ে গেল।

পূরবী প্যাডের বাঁ দিকের মাথায় নিজের ঠিকানা লিখবে ভাবলে। তাকে ভাবতে হল। এই বাড়িটার নাম লেখা যায়? দুই নম্বর এঞ্জিনিয়ারিং বাংলো? কাল একবার মনে হয়েছিল বটে এ বাড়িটার নাম 'বোনাকেক্য' রাখা যায় যদি…। কাজেই সে লিখলে c/o বইএর দোকান। দি ম্যাল, স্বর্গদ্বার। তারপরই তারিখ। তখন সে যুবতীদের মতো হাসল। সে তারিখের অঙ্ক আর বছরের অঙ্ক না লিখে শুধু অক্টোবার লিখলে। যে কোনো একটা অক্টোবার। সুন্দর সাদা ছোট শিখর-দাঁতে নীচের ঠোঁটের ডান কোণটা মৃদু কামড়ে সে ভাবলে: দুদিকে অঙ্ক না বসলে অক্টোবার তার কত বয়সের বলা যায় না, তুলে নেয় যে কোন এক অক্টোবার। প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করতে হবে শিখর মানে দাড়িম তা জানে কিনা। দাড়িম বিচি।

প্যাডের দান দিকে একটু নীচে কলম এনে আবার ভাবলে সে। স্থির করলে চিঠি লেখা শেষ হলে কাকে লিখছে তা ঠিক করা যাবে। শ্যামলী, স্বাতী, শরদিন্দু যে কোন একজনকে সম্বোধন করলেই হবে। সাহদ্রা, দরবাগঞ্জ, কবলবাগ্—কিংবা…পরে দেখা যাবে।

আসলে এই বাড়িটাতো ভালোই, বেশ ভালোই। অবিশ্যি দোতলার বাথরুমে জল, উঠছে না, ফলে একতলার বড় বাথরুমটাকে সকলে মিলে ব্যবহার

কবা হচ্ছে। আব এমন তো মনে হচ্ছে প্রভাত হযতো জলেব নতুন লাইন পাতবাব ব্লু প্রিন্ট তৈবি কবতে ব্যস্ত। যে ঝর্না থেকে পাইপে জল আসে তাব চাইতে উঁচু আব বেশি জলেব ঝর্না থেকে জল এলে তা দোতলায় উঠবে। এটা অবশ্য আমাব ধাবণা। নতুবা গ্রামে গ্রামে ঘুবে বেডানোব আব কোন কাবণ কি থাকবে? আজ অবশ্য মাসীমা খুব আগ্রহী ছিল তাব সঙ্গে আবায বেবোতে। কিন্তু হযতো ম্যালে গিযেছে, আপেল আব ভেজিটেবল আনতে। কি শিল্কই না পবছে।

আসল কথা শ্যামলী, স্বাতী, শবদিন্দু, এমনকি বীবেন্দ্রও নয। আসল কথা যে কোনো একজন। অন্তত যে কোনো একজনেব জানা থাক এই স্বর্গদ্বাব পর্যন্ত অন্তত পথটা এসেছিল—। কেউই যদি না জানে অন্তত এটুকু, কেমন শিব শিব কবে ওঠে না?

সে লিখলে: আমবা এখন অন্তত আজ পর্যন্ত একটা জাযগায, যাব নাম স্বর্গদ্বাব রাখার চেষ্টা হযেছে, এই একটা বাডিতে। বাডিটা ভালো। মেযেমানুষ, আচ্ছা মেযেমানুষ সম্বন্ধে কি ধাবণা তোমাদেব? আমি আজ থেকে বিশ্বাস কবেছি প্রত্যেকটা মহাদেশই ভাসমান দ্বীপ। কোথা থেকে এক বীজের বাদাম এসে পডে, অঙ্কুব, আব তারপবে ক্রমশ গাছ হয, একটা দ্বীপ ভেদ কবে ওঠে, তাবপব শিকড নামাতে থাকে, আব দ্বীপটাও নীচেব দিকে বাডতে থাকে যতক্ষণ না সে গাছটাই সেই দ্বীপ হেন নৌকাব নোঙব—খোঁটা, হয। তাবপবে আব মেযেমানুষটা আব ভেসে বেডায না, শস্যে, ফলে ক্রমশ ভাবি হয। আব কি আশ্চর্য শরীবেব সব বক্ত দুধ হয়ে যায। শিকড যখন তাকে ভেদ কবে নামতে থাকে তখন তাব সঙ্গে পাল্লা দিযে সমুদ্রেব তলদেশ পর্যন্ত নিজেকে ছডিয়ে দিতে কষ্ট হওযাবই কথা, তাবপবে অনুভব যে কববে সেই বক্তই সাদা দুধ হযে যায। তখন আব কষ্ট থাকে না।

একটু ভেবে সে আবাব লিখলে: এই ভদ্রলোক এঞ্জিনিযাব। হঠাৎ একটা বই পেলুম, এথিকস্ অব এঞ্জিনিযাবিং। জানিনা তাতে কি আছে। এই সব ছোট স্টেশনে এমন সব অদ্ভুত বই পাওযা যায—কলকাতাব ফুটপাতে যেমন। নাম থেকে মনে হয: গডাটাই শেষ কথা নয, কী গডলাম, কেন এবং কোথায তাও ভাবনাব বিষয। হতে পাবে কোনো একোলজিস্টের লেখা; সেই পাগলবা যাবা বলে, ও, লেট্ দেম্ বি লেফ্ট, দি উইলডাবনেস অ্যাণ্ড ওযেট্। অর্থাৎ জল থাক, জঙ্গল থাক। কিংবা এমনও হতে পাবে

কোনো সোশ্যাল এথিকস্ থেকে এঞ্জিনিযাবদেব দেখা হযেছে··

পূববী উঠল। আযনাব সামনে গেল। আজ সে মাথা ঘসেছে। চুল বেশমের মতো। কপালে গালে উডছে। নিজের চোখ দুটোকে দেখলে।

ফিবে এসে সে লিখতে বসলে আবাব, তোমবা কেমন আছ? আমি আচ্ছা, তোমবা আমাকে শুভেচ্ছা কামনা করো।

মিটমিট কবে হাসল পূববী। একটা চকচকে পাথবেব টুকবো, যাব অনেক কযেকটি সে ইতিমধ্যে সংগ্রহ কবেছে, প্যাডেব উপবে চাপা দিলে। ঘডি দেখলে, বেলা তিনটে। বোদ পডে আসছে। সে একটা ম্যাক্সি পবলে। যাকে ক্লিঙ্গিং মেটিবিযাল বলে। প্রিন্টই; হাল্কা লাল, হাল্কা খয়েবি, সাদা আব মবা হলুদ। মাঝামাঝি জায়গায একটা অর্ধবৃত্ত পাডেব ব্যাণ্ড-ক্লিপে আটকে গোছাটাকে বাঁ বুক ঢেকে নামিযে দিলে।

পাথরের টুকবো, কোযার্টজ্ সন্দেহ নেই, চাপা দেযা চিঠিটায সম্বোধন আব ইতি না থাকায তাব দিকে চোখ পডায মনে হল। ডাযেবি যেন,··। সে ঠোঁট টিপে হাসল।

তাঁবু মার্কা ছাতাটাই পথ দেখাবে এমন আশা কবা যায। সে দিল্লীতে অবশ্যই ম্যাক্সি পবে পথে বেবোয না। তাছাডা এখন চাযেব সময এগিযে আসছে। চাবটে হচ্ছে টি-টাইম। চুলেব গোছাটাকে বাঁ হাতে ধবে ডান হাতেব তেলোয় তাব আগাটাকে বুলাল। পনেব-বিশ মিনিট ধবে একটা টিলায় উঠে হার্থবাগেব মাপেব একটা উপত্যকায ছাতাটাকে দেখতে পেলে পূববী। সে স্ট্র্যাপে বাঁধা নিচু হিলেব গ্রিস্যান পবে এসেছে। তাও ছোট ছোট পাথরেব নুডি গডায দেখে একটু ধীবে ধীবে নামল।

কিন্তু তাঁবুব তলায প্রভাত ছিল না। সে-উপত্যকাব শেষে অন্য আব এক, তাবও পবে, যেখানে পাহাড থেকে দুটো স্থূল লোমশ বাহু বেরিযেছে, যাব ফলে সেই পাহাডেব বাঁধকে হেনবি মুবেব কাঁধ আর মুণ্ডুহীন বিশাল-তাব টবসো মনে হয, সেখানে, একটা অপুষ্ট কিন্তু গাঁটওযালা বুডো এমন আখবোটেব ছাযায সে প্রভাতকে দেখলে দুহাত ভাঁজ কবে মাথার তলায রেখে চিত হযে আকাশ দেখতে।

পূববী বিন বিন কবে হাসল। এই বুঝি প্লামিং?

আব তখন প্রভাত বললে, প্লামিং। ও, হ্যাঁ, প্লামিং। (সে হাসল।) ঝর্ণা থেকে বাথরুমে শীতল স্নিগ্ধ জল আচ্ছা, দেখ, তোমাব কি মনে হয? বলোতো। বলব কথাটা? ওটা যদি দেখা যায একটা ডাকবাংলো মাত্র,

একটা ডাক বাংলোই।

প্রভাতের মুখটাকে গাঢ় বাদামী দেখাল। পূবরীর ভয় হল যে তার মুখের ভিতরটা শুকিয়ে উঠছে।

পূবরী বললে, আগেকার এঞ্জীনিয়ার করেছিল এমন ডাকবাংলো এটা?

: আমি জানি না, আমি জানি না। কেউ প্রমাণ দিতে পারে না ওটা যে· ·আরও দূরে হয়তো কোথাও আছে। কিংবা পথে ফেলে আসি নি তো?

পূবরী তার বড় বড় চোখ দুটোর কালো মণিদুটো দিয়ে প্রভাতকে দেখতে লাগল। তখন প্রভাতের কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠছে।

পূবরী ম্লান মুখে বললে, তা হলে সাহদ্রয়ে ফিরে যাওয়া?

প্রভাত হাঁ করে নিশ্বাস নিতে লাগল।

তখন ডিনারে বসেছে তারা। নিজের হাতে অ্যাপাল্ পাই করেছে আর চিকেন রোস্ট, তার কিচেন-হেল্প মোটা মোটা চোকলা-সমেত আটার নরম ঘি চোবান পরোটা ভেজেছে, পাহাড়ী পরবলের ঝোল আর রামহাতী ভাত।

প্রভাত বললে, এখানকার জলে পাথর হজম হয় বটে, কিন্তু···।

পূরবী বললে, তোমার বাজার সব ম্যালেই পেলে?—অ্যাপল আর সরষে শাক, অলিভ তেল। সে তখন লক্ষ করলে প্রভা আজ নীলে রুপোলি দাঁত বসান পার দুধে কড়িয়াল পরেছে। কানের কুটো দুটো ডাকতে চোখে পড়ে কি পড়ে না একন ওপ্যালের ফুল। চোখের প্রান্তগুলো লালচে। প্রসাধন তো বটে কিন্তু গাল দুটো শীর্ণ আর গালের হাড় দুটো কিছু উঁচু যেন রুজটা বেশ ছুঁয়েছে সেখানে।

পূবরী ভাবলে, এখন হাসা দরকার প্রভার। হয়তো রুজের স্টিকটা বেশি ড্যাম্প ছিল। সে আবৃত্তি করলে চোখের কালিমার মায়া···। ঝিকমিক করে হাসতে গিয়ে ম্লান হল।

প্রভা বললে, হ্যাঁ, ম্যালে সবই পাওয়া গেল। এমন কি জলপাই। দেখ কত বড় আর পাকা।

প্রভাত বললে, ভাত আর চিকেন রোস্ট, পরোটা আর পরবল হলে কি হয়? যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেল সে।

প্রভা বললে, তা হতে পারে। কিংবা এই মাশরুম

প্রভাত ভাবলে, কোন কোন দিন আলোর বাইরে অন্ধকার ধোঁয়া ধোঁয়া নীল থাকে।

পূবরী ভাবলে, আলোটা তার ডোমের কনে হাল্কা হলুদের উপবৃত্ত হয়ে

পড়েছে সঙ্গে টেবল ক্লথে। আর পরিধিকে কেটে লাল টক্‌টকে, বোধ হয় বিট্ দিয়ে রং করা, ঝোলটার উপবৃত্তাকার সাদা বেসিন।

প্রভাত ভাবলে, পারবলটা জাফরীন রঙের, ওটা বোধ হয় মাশরুম যা যা ইণ্ডিয়া রেডের উপবৃত্ত, বাঁ দিকে টম্যাটো কেচআপের ক্রিমশন গোল বাটি। কী হয় যদি চোখ দুটোকে, ধরো গোটা মনকেই, কেউ এমন সব রং আর আকারের অ্যারেঞ্জমেন্টে আটকে রাখে?

সে বললে, মাশরুম দিয়ে শুরু করলে কি হয়? লাল টকটকে, ভারতীয় লাল, ওটাই বোধহয় মাশরুম। দেখ, পূরবী, মাশরুম দিয়ে শুরু করা যায় কিনা, মাশরুম আর হোয়াইট ব্রেড্।

প্রভা বললে, শুরু কর। মাশরুমটা ভালো হয় নি? পাউরুটিও নিতে পার যদি পছন্দ হয়।

প্রভাত ভাবলে, প্রভার গালে রুজটা মরা লাল।

পূরবী বললে, হ্যাঁ এই তো। সব এসে গেছে।

সে দেখলে প্রভার চোলি আজও নীল বটে। সে ভাবলে, আচ্ছা নীল কেন? গভীর বলে, স্নিগ্ধ বলে, শান্তি দিতে পারি, অথচ এমন ঢেউ উঠে পড়তে পারে যে

কর্ক দিয়ে একটুকরো মাশরুম তুললে প্রভাত। বললে, মাশরুম ফর হেলথ। ভাবলে, মিসেস দত্তর নীলে আজ এত সাদা যে শরতের উদাসীন আকাশ। তা ছাড়া এমন সিয়েনার ম্যাসকার্রা করা ভালো হয় নি যাতে চোখের কোলে দু-ইঞ্চি কালি।

প্রভা বড় চামচ দিয়ে পূরবীর প্লেটে মাশরুম তুলে দিলে।

পূরবী বললে, মাশরুম ফর হেলথ। থ্যাঙ্কস, মাসীমা। সে ঝিকমিক করে হাসল। মন ভুলায় নাকি?

প্রভা বললে, শচীবিলাসকে দেখলাম। সে ভাবলে, কি চালাক মেয়ে, বাবা, বিকেলের সেই ম্যাক্সিটা পর্যন্ত পাল্টায় নি। যেন কেউ জিজ্ঞাসা করুক, কেন তোমার মন খারাপ।

: শচীবিলাস? (প্রভাত মাশরুম টুকরো মুখে দিয়ে চামচটা দোলাতে লাগল। বাঁ হাতে রুটির স্লাইস তুলে কামড় দিলে।) বেশ ফ্র্যাগব্যান্ট কিন্তু। ও হ্যাঁ, শচীবিলাস। হোয়াটস্ ইন্ এ নেম্?

পূরবী বললে, কে? ও সেই বই-এর হকার? বলো। বেশ কায়দা করে উচ্চারণ করে কিন্তু—শচীবিলাস-দামিনী। প্রভা বললে, হ্যাঁ, আমার তো

মনে হয, মানে মাঝপথে সাহস ফুবিযে যাওযা। আব

: কি? লোকটি কমপ্লেকসে ভুগছে?

প্রভা বললে, কমপ্লেকস্? ও হ্যাঁ। তাতো বটেই, নতুবা তাকে ওব দূব-সম্পর্কেব পিসিমাই বলতে হয।

: কাকে?

প্রভা বললে, বোকা মেযে, যাকে নিযে...।

: ও। কিন্তু। পূববী বললে, তোমাব কি ধাবণা, মাসীমা, পুরুষ বাল্যেব কমপ্লেকস কাটিযে ওঠে না। হযতো তাব দূব-সম্পর্কেব পিসি, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগে, অনেকদিন ··তা ছাডা। পূববী আজ ঠোঁটে এত হাল্কা রং দিযেছে যে তাব হাসিটাকে বক্তহীন মনে হল।

: কি তা ছাডা?

: ওদেব, একটি মেয়ে আছে।

: মেয়ে? ওদের?

: মানে, ওদেব সঙ্গে অন্তত···

প্রভা বললে, ও, আচ্ছা? তা হবে। হয়তো কোথাও খেলা কবছিল। আমি দেখি নি বলছ?

পূববী বললে, তা কে তুমি দেখতে পাও নি বুঝি? সেই তো আমাকে সেই বই দুখানা পছন্দ কবে দিয়েছিল। সেই যে অ্যান্টনি আব এথিকস্। ওই মেযেটাও হয়তো উদ্বাস্তু আব ওদেব মধ্যে এসে পডেছে।

প্রভা অবাক হযে পূববীব চোখ দুটোকে দেখলে। পূববী চোখ নামালে না।

পূববী বললে, তা ছাডা মেয়েটাব বযস্ হযেছে। যদিবা সে পিসিব মেয়েই হতে থাকে।

প্রভা বললে, ও, মা। তা হলেও কত আব হবে।

: বাইশ তেইশ ধবো। পূববী হাসল, তা হলে সে তো যে কোনো বয়স্ক পুরুষের সমকক্ষ। তাই নয? বুঝে দেখ। প্রভা বললে, প্রভাত, আরও বেশি কবে মাশরুম নিচ্ছ না কেন? ভালো হয নি। আসলে কি জান, পূববী, মূলেব ব্যাপারটা দেখ। শচীবিলাস তো হেযাব স্ট্রিটের। উদ্বাস্তু হযেছিল পিসির জন্যই। কারণ তার নিজেব আব তাব এই পিসির যে আভিজাত্য তা পিসির স্বামীর পরিবারে হযতো ছিল না।

: তা হতে পারে। খুবই হতে পাবে, পূরবী বললে, তোমার এই মাশ-

কমটা, মাসীমা, কিন্তু ও তুমি বলছ এই মেযেটা যে বাইশ-তেইশ বছবেব আব যে আমাকে ইংবেজি বই দুটো পছন্দ কবে দিযেছিল সে আভিজাত্যে ওদেব নিজেদের তুলনায কিছু নয? সেই জন্যে? পূরবী হাসল বিনিবিনি কবে।

: না-না ঠিক তা নয়। প্রভাত তুমি শুধু মাশরুমই খাচ্ছ। এবার··· চাপাটি না ভাত? যা যার খুশি, কেমন?

পূববী একটা পবোটা নিলে। বললে, বলো এবার, শুনি।

প্রভা বললে, আমাব মনে হয, পূববী, এই মেয়েটা যদি সত্যি মাঝখানে এসে থাকে তা হলে ঠকবে।

: কেন?

বুঝতেই পাবছ একজগতের নয। কমিডিব লোক ট্র্যাজিডিতে হাঁপিয়ে ওঠে না? প্রভা যেন অন্যেব দুঃখে ম্লান।

পূববী বললে খিলখিল কবে হেসে, ও, মা! এর মধ্যে ট্র্যাজিডি কোথায গো? যদি প্রমাণ না হয মেয়েটা শুধু পিসিব নয় শচীরও বটে।

প্রভা বললে, পাহাড়ী পববল বটে। কতকটা পটলই যেন, নয? আসলে কি জান, শচীবিলাসের মা ডাইভোর্সি।

: আজকাল আকছার হচ্ছে।

: ফলে সে তার নিজেব মাকে সন্দেহ করে।

পূরবী বললে, তাতে লোকটির দোষ কী? কেউ কি পিতা-পছন্দে মতামত দেয?

প্রভা বললে, তুমি কি খুব সাহসী বটে। কিন্তু কি জান, এমন হতে পারে, পূরবী, যে সে কাউকে, অন্তত কোনো স্ত্রীলোককেই আব ভালোবাসবে না। নুনটা এগিযে দাও প্লিজ। হ্যামলেট মনে কর? এতক্ষণে প্রভা একবার ঝকৃঝকে হাসি আনলে মুখে। বললে, সরি! বই-এর কথা এসে গেল।

: তাতে আর কি হযেছে।

প্রভাতের মুখে একমুখ মাশরুম আব পাউরুটি। সে হাত তুলে ইশাবা করে দুজনকেই থামতে বললে, যেন এবাব তার পালা, সে বলবে। দলাটা গিলে সে বললে, আমি বোধহয একটু বেশি চলতে পাবি। কিন্তু তোমাদের সামনে বলব কি? (সে অপ্রতিভেব মতো হাসল)। মানে লোকটি ইউনাক। নপুংসক হতে পারে হয়তো। (সে ঝরঝব কবে হাসল)। সে কিছুই

গড়তে জানে না। নাথিং, কিছু না।

প্রভাত হা হা করে হাসল। সে এক শ্লাইশ রুটি নিয়ে প্লেটে রেখে তার উপর টম্যাটো কেচআপ আর চিলি-সস্ ছড়ালে। কর্কে বিঁধিয়ে মাশরুম বউল থেকে এক খণ্ড মাশরুম তুলে সকলের ওপরে রাখলে। বড় হাঁ করে হাত দিয়ে তুলে সবটাই মুখে পুরে দিলে। চেয়ারের পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসল। তার মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল আলো থেকে সরে।

মাশরুমের পরে পরোটা, শেষে চিকেন রোস্ট, তারপর অ্যাপল পাই। কিন্তু অ্যাপল পাই-এর আগে তিনজনে এক রকম নয়ঃ কেউ ভাতের আগে, কেউ পরে পরোটা; কেউ ভাতে মাশরুমের ঝোলের সঙ্গে চিকেন রোস্ট। ইত্যাদি।

তখন পূরবী বললে হাসি-হাসি মুখ করতে করতে, পিওরলি সাই-কোলজিক্যাল হতে পারে, এঞ্জিনিয়ার। মাসীমা বলেছেন ওরা নিজেদের আভিজাত্য দূরে রাখতেই উদ্বাস্তু, শচীবিলাস আর তার পিসিমা। হয়তো গুজব শুনেছিল দুজনের পিতৃবংশের সম্পত্তি এদিকে আছে।

প্রভা বললে, তুমি বলছ এফেট্ অভিজাত্য?

: এফেট্? মানে অবসন্ন, আর-উর্বর-নয়, মানে ক্ষয়-ধরা? তা নয় হয়তো। সে ভয়ে ভয়ে হাসল। ওটাও হতে পারে, স্ত্রীজাতির ওপরে রাগ। আর সে রাগ ধরে রাখতে গেলে নিজেকে হীন ভাবতে হয় আর পিতাকে পছন্দ করা যায় নি বলে পিতাকে খুঁজতে হয়। হঠাৎ যদি পিতাকে পেয়ে যায়, তা হলে অর্থ হয়, সে স্বাভাবিক হয়। আর তখন কিন্তু দেখা যাবে সেই পিসি পাথর হয়ে গিয়েছে।

প্রভা দুহাত একত্র করে চিবুকের নীচে রেখেছিল। সে হাসল এবার। বললে, কিন্তু ততদিন? অ্যাপল পাইটা কেমন, প্রভাত?

: বাহ্। বাহ্। এ আর বলতে? এ, তো তোমার স্পেশ্যালিটি। কেমন কি না?

শোবার আগে চুল বেঁধে নেবে স্থির করে পূরবী আয়নার সামনে বসেছিল। চুলগুলোকে সে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে এনে আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিজেকেও দেখছিল। আর এখন তো ব্রাও নেই। সে আয়নাকে এক টুকরো হাসি আর কটাক্ষ উপহার দিলে।

ভাবলেঃ আচ্ছা মনে করো গল্পটা। না হ্যামলেট নয় যেমন প্রভা বলে লজ্জিত হয়েছিলেন। বরং টেলিমেকুস আর ইউলিসিসের খোঁজে। তাই

বা কেন? যে কোনো পুরুষ। তা কেন হয়? মেয়েরা পুরুষ পেলে আর পিতার সন্ধান করে না—কারণ সেখান থেকেই নিজেকে শুরু করে? আর পুরুষরা তা পায় না বলে পিতাকে গরঠিকানা হলে চলে না? ঠিকানা না পেলে কি পিতাকে সময়ের একটা কালো শূন্য গর্ত বলে অনুভব করে যা শুধু অর্থহীনতার উৎস?

সে প্রভার গলা পেল। প্রভা তার দরজার কাছে বললে, তোর কাছে কোনো অ্যানালজেসিক আছে? চুল আঁচড়াতে গিয়ে হঠাৎ পিঠে টান লেগে গেল। ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা কে জানে।

প্রভার নাইটগাউনটা সেমিজের মতো বাহুল্য বর্জিত। সবুজ আর কালোয় মেশান রং। আর হলুদের আভাটা তার গায়ের।

খালি জলের গ্লাসটা তার হাত থেকে নিয়ে পূরবী বললে, তোমার চুলও তো আঁচড়ানো হয় নি, বসো আঁচড়ে দিই।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূরবী প্রভার চুল আঁচড়ে, জট ছাড়িয়ে রাতের মতো এলো খোঁপার ফাঁসে জড়িয়ে দিল। তখন তাদের, স্বল্প আলোয়, দুই বোনের মতো দেখা যেতে লাগল। তারা তো একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে, ল্যাণ্ডিং পার হয়ে গিয়ে টানা বারান্দাটার অন্য প্রান্তে কিচেনের সামনে বরং সেই ডাইনিং টেবলে হলুদে ম্লান আলোয় প্রভাতকে দেখতে পেল তারা। রাত তো অনেকটাই হল। সে ঝুঁকে বসে বই-এর দুপাশে দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে পড়ছে। এখনও তার গায়ে সারাদিনের পরা সেই খাকি খাকি রঙের জামা। হয়তো এথিকস অব...

পূরবী তখন বললে, আচ্ছা, না থাক। আচ্ছা, মাসীমা, প্রভাতবাবু তো তোমার প্রথম সতীনের বোন-পো।

: কেন?

: মানে, মিস্টার দত্ত তোমাদের উইলটা তেমন করলেন কেন যে প্রভাত-বাবু আর তোমাকে সবকিছু জয়েন্ট রাখতে হবে। দুজনের কেউই একা কিছু পাচ্ছ না। তাতে সন্দেহ হয় না প্রভাতবাবুর যে সে হয়তো...।

: উইল?

: হয়তো গুজব, হয়তো... কেমন কিনা?

তখন তাদের পাশাপাশি দাঁড়ানো সমান্তরাল গভীর রঙের অসমান উচ্চতার ভ্যানডাইক ব্রাউন এবং হাল্কা-ভ্যানডাইকব্রাউনের আয়তঘন মনে হল, যাদের ইতস্তত হলুদ, গ্যাম্বোজ, মরা হলুদ ইত্যাদি এবং নানা পাশফেরানো ইনভার্টেড্ পিরামিডসমূহ—আর ভার্টিক্যাল প্লেনে কমলা ঘূর্ণ্যমান স্পাইর‍্যাল, কিউবিস্টরা কল্পনা করে যেমন।

অতঃপর

সমরেশ বসু

গগন দরজাটা খুলে দিতেই, সুমিতা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল। গগন দরজাটা বন্ধ করে সুমিতার দিকে তাকাল। সুমিতার হাতে টিফিন কেরিয়ার। ঘরের মাঝামাঝি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। ওর ঘাড়ের ওপর থেকে চুলের গোছা খানিকটা ওপরে টেনে, আর ওপর থেকে আঁচড়ে নীচে নামিয়ে, আলগা গুছির ওপরে বাঁশের কিলিপ আটকানো। গগন দেখল, সুমিতার ঘাড় বেয়ে ঘাম ঝরছে। ও ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে একবার দেখল। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? ওরা টের পেয়েছে?'

'বলছি।' সুমিতার হাঁপ ধরা গলা শোনা গেল। কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না। ঘরের এক কোণে, একটা পুরনো কাঠের টেবিল, আর দুটো পুরনো চেয়ার রয়েছে। সুমিতা সেদিকে গিয়ে, টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ারটা রাখল। পিছন ফিরেই কাঁধের আঁচল টেনে মুখ গলা ঘাড় মুছতে লাগল।

গগন দরজার কাছ থেকেই সুমিতাকে দেখতে লাগল। ওর বড় টানা মেয়েলি চোখে অপলক একাগ্র দৃষ্টি। তীক্ষ্ণতা বলতে যা বোঝায়, সেরকম কিছু ওর দৃষ্টিতে নেই। ভয়-বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকানো, কোনো অভিব্যক্তিই নেই। অনেকটা শান্ত আর নির্বিকার, কিন্তু অপলক চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা, অথচ যেন চিন্তামগ্ন, কিছুটা অন্যমনস্ক। একটু লম্বা মুখে, গোঁফ-দাড়ি থাকায় কিছুটা ভরাট মনে হয়। গোঁফ-দাড়ি না থাকলে বোঝা যেত, ওর মুখটা কেমন কোমল। চোখ, নাক, ভুরু, মাথার বড় উসকো-খুসকো চুল, আর মাঝারি ফর্সা মুখে গোঁফ-দাড়িতে ওকে যেন নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখাচ্ছে। যে কারণে সুমিতাই ওর গালের আর চিবুকের নরম কোমল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, 'দিনকে দিন তোমার চেহারাটা যেন যীশুর মতো হয়ে উঠছে।' সুমিতার এই দেখাটা একেবারে মিথ্যা না। গগনের গোঁফ-দাড়ি গজানো শান্ত কোমল মুখ আর চোখ যেন করুণায় ভরা। বয়স সাতাশ-আটাশ। লম্বা শক্ত শরীর। পরনে একটা আধ-ময়লা পাজামা, গায়ে বুক খোলা একটা পাঞ্জাবি।

অঞ্চলটা কলকাতার নিকট উপকণ্ঠ, সুরাবরন রেললাইনের পুবে। স্টেশনের কাছাকাছি বাজার দোকানপাট মিলিয়ে একটা শহুরে চেহারা। শহর ছাড়িয়ে ভিতর দিকে, গগনের আশ্রয় এলাকা অনেকটা গ্রাম্য। পাকা বাড়ির তুলনায় টালির চাল কাঁচা বাড়ির সংখ্যা বেশি। আশেপাশে পুকুর ডোবা, গাছপালা ভরা বাগান, সরু পথ—সাইকেল রিকশা চলতে পারে। দক্ষিণে একটা খাল, যার দুপাশে নিবিড় জঙ্গল। খালটা একদা হয়তো গঙ্গা থেকে দূর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। এখন জলজ ঘাস আর দামে ভরা, কিন্তু জল আছে। এই খালের কাছাকাছি, পাঁচিল ঘেরা একটা বাগানের এক পাশে, দুই কামরার একটা বাড়ি গগনের আশ্রয়। বাগানের জংধরা গ্রিলের গেটে, লোহার শিকলে তালা ঝোলে। সুমিতার কাছে তালার চাবি আছে। ও তালা খুলে ঢোকে, আবার তালা বন্ধ করে দেয়। গেটের বাইরে খানিকটা পোড়ো জমি, তারপরেই খাল। লক্ষ করবার মতো কেউ নেই। কেবল উৎকর্ণ গগনই গ্রিলের গায়ে শিকলের মৃদু ঝনাৎকার শুনতে পায়। বন্ধ জানালার সামান্য একটা ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভিতর থেকে আগেই দেখে নেয়, কে আসছে। জানে, এই ভর দুপুরে ধরা বাঁধা সময়, সুমিতাই আসছে।

আজও দেখছিল। সুমিতা টিফিন কেরিয়ারটা বাঁ হাতের কবজির কাছে ঝুলিয়ে, তালাটা ধরল। ডান হাতে বুকের জামার এক পাশ থেকে একটি চাবি বের করে তালা খুলল। যতটুকু ফাঁক না করলে নয়, গেটটা ততটুকু ফাঁক করে ঢুকল। আবার শিকলে জড়ানো তালা বন্ধ করে, গেটের সামনের দিকে পরিয়ে দিল। তাকাল বাড়িটার দিকে। টিফিন কেরিয়ারটা নিল ডান হাতে। বাঁ হাতে বুকটা একবার চাপল। যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। টিফিন কেরিয়ারটা তুলে একবার দেখল, আবার বাড়িটার দিকে। গগন জানালার ছোট ছিদ্র দিয়ে সবই দেখছিল। এই দেখার কথা সুমিতা জানে না। সুমিতার চোখে মুখে ভয়চকিত ত্রাসের ছায়া। গেটের সামনে প্রায় মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে রইল। যা আগে কোনোদিনই দেখা যায় নি। সুমিতাকে কেউ তাড়া করে নি নিশ্চয়ই। তা হলে, গেট খুলে ওখানে ওভাবে দাঁড়াত না, ছুটে চলে আসত। কিন্তু ওর চোখে মুখে এত ভয় আর উৎকণ্ঠা কেন।

সুমিতা এক মিনিটেরও বেশি দাঁড়িয়েছিল। টিফিন কেরিয়ারটা তুলে আবার দেখেছিল। তারপরে একটা লম্বা নিশ্বাস টেনে, মাথাটা একবার

ঝাঁকিয়ে, যেন মনে মনে কিছু একটা ভেবে নিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল বাগানের মধ্যে। গগনের এই সুন্দর চোখের দৃষ্টি তখন ছিল শিকারী বাঘের মতো তীক্ষ্ণ। ভুরুজোড়া ছিল কোঁচকানো, যীশুর মতো নরম কোমল মুখ ছিল শক্ত। সুমিতা বাগানের নিবিড় ছায়ায় বাড়ির পিছন দিকে চলে গিয়েছিল। গগন জানালা থেকে সরে এসে, পাশের ঘরে গিয়েছিল। ঐ ঘরের দরজায় সুমিতা প্রথমে তিনবার, তারপরে দুবার ঠুকঠুক ঠুকেছিল। এটাই সুমিতার সংকেত। গগন দরজাটা খুলে দিয়েছিল। সুমিতা হুড়মুড় করে ঢুকেছিল।

গগন সুমিতার কাছে এগিয়ে গেল। মুখোমুখি দাঁড়াল। তখনও সুমিতা মুখ তুলল না। গগন দেখল, সুমিতার নত মুখ ফ্যাকাশে। ওর বুকের ভিতরে যেন গাঢ় মেঘের অন্ধকার। সেই অন্ধকারকে বিদ্যুতের তীব্র ঝলক ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিচ্ছে, আর গুরু গুরু মেঘ ডেকে উঠছে। একটা ভয়ংকর আতঙ্কে ও শিউরে উঠল। ওর বড় টানা শান্ত চোখে, কোমল মুখে, তা চাপা থাকল না। স্পষ্ট অনুভব করল, ওর শিরদাঁড়া বহে একটা হিম-শীতল সর্পিল স্রোত নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। ওর চোখে-মুখে স্বাভাবিক শান্ত কোমলতা ফিরে এল। তবু যেন ভয়ে আর উত্তেজনায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? ওরা টের পেয়েছে? তাড়া করেছে?'

'হুঁ।' সুমিতা মাথা ঝাঁকাল, তবু মুখ তুলল না। দমচাপা ভয়ত্রস্ত স্বরে বলল, 'মনে হল যেন তাই। টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি রিকশায় উঠে যখন অপজিট ওয়েতে বটতলার কাছে গেলাম, তখন ওদের দলের দুজনকে দেখলাম, ভাঙা মন্দিরটার বকে বসে আছে। রিকশার হুডটা তোলা ছিল। ওরা নিচু হয়ে আমার মুখটা দেখতে চেষ্টা করছিল। মন্দিরের মোড় থেকে আমার বাঁ দিকে ঘোরার কথা। আমি রিকশাওয়ালাকে ডান দিকে চলতে বললাম।' সুমিতার হাঁফ ধরা স্বর বন্ধ হয়ে গেল। আবার আঁচল দিয়ে মুখ আর গলার ঘাম মুছতে লাগল।

গগনের বুকের গাঢ় অন্ধকার মেলে, বিদ্যুতের ঝিলিকে তখন সবই যেন স্পষ্ট। গুরু-গুরু গর্জন চাপা পড়ে যাচ্ছে। সুমিতার ডান কাঁধে বাঁ হাতটা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর?'

'তারপর?' সুমিতা যেন ভয়ের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে তার পরের ঘটনা মনে করবার চেষ্টা করল। বলল, 'তারপর মণ্ডলপাড়ার টিউবওয়েলের

কাছে পৌঁছে, আমি রিকশার পেছনের পর্দাটা তুলে দেখলাম। ওদের দেখতে পেলাম না। কিন্তু দুপুরে ওদের কোনোদিন বটতলার মন্দিরের বকে দেখতে পাই নি। আজই পেলাম, আর ভাবলাম—।' সুমিতার স্বর যেন নিশ্বাসের কষ্টে বুকের মধ্যে ডুবে গেল।

গগন হাসল। দু হাতে সুমিতাকে জড়িয়ে বুকের কাছে টেনে নিল। বলল, 'তারপরে তুমি মণ্ডলপাড়ার টিউবওয়েলের কাছ থেকে বাঁ দিকে এসে, কলোনির কাছে রিকশা ছেড়ে দিলে, তাই তো?'

সুমিতা মুখ তুলতে গিয়েও, তুলতে পারল না। মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ করল, 'হুঁ।'

'বোকা।' গগন সুমিতার শরীরটা নিজের বুকে চেপে করল। টের পেল, সুমিতার বুকে ঢাক বাজছে। শরীরটা অনায়াসে গগনের বুক লেপটে থাকতে পারছে না, কেমন শক্ত হয়ে আছে। এ সবই নতুন। একটু আগে গেটের কাছে সুমিতা, আর ঘরের মধ্যে সুমিতার মধ্যেও অনেক ফারাক। ও বলল, 'ওরা তোমাকে কোনোদিনই সন্দেহ করবে না। তুমি চারু ঘোষালের মেয়ে, সাতে পাঁচে নেই। শিক্ষিতা, সুন্দরী, বাবার টাকা আছে, টপ সোসাইটিতে মেলামেশা কর, প্রেম করে বেড়াও। এক সময়ে গগন মিত্তিরের সঙ্গেও কিছুদিন মেলামেশা করেছিলে। কিন্তু সেসব ওরা মনে রাখে নি। তোমার সঙ্গে আমার কন্ট্যাক্ট, ওদের কাছে আউট অফ ইমাজিনেশন। তুমি সুমিতা ঘোষাল, ওদের ভাষায়, তোমাকে দাঁড়কাকেরা খাবলে খাচ্ছে—ফলে বিগ পিপলদের সঙ্গে তুমি ব্যালা করে বেড়াও। পলেটিকস ফলেটিকসে তুমি নেই। তুমি অন্য জগতের, আমাদের, ওদের নাগালের বাইরে। এক মাসের ওপর হয়ে গেল। টের পেলে, এর মধ্যেই পেয়ে যেত। টিফিন কেরিয়ারটা দেখতে পায় নি তো?'

সুমিতা এখনও মুখ তুলতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল, 'বোধহয় না। ওটা আমি আঁচলের আড়াল করে রাখি।'

'তবে?' গগন টেবিলের ওপরে রাখা টিফিন কেরিয়ারটার দিকে একবার দেখল। সুমিতার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরল।

সত্যি সুন্দরী। ফর্সা রঙ, উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, উদ্ধত যৌবন। কালো ডাগর চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎ পুরু লাল ঠোঁট, মুখের আকৃতি একটু গোল। হাত কাটা লাল জামা, লাল পাড় তাঁতের কোরা রঙ জমি-শাড়ি। কোরা রঙটা রেশমের বলে ভুল হয়। গা থেকে বিলিতি দামি সেন্টের গন্ধ

ছড়াচ্ছে। এটা বারণ, এখানে আসবার সময়। তবু সুমিতা না মেখে পারে না। বাতাসে গন্ধ ছড়ায়, সন্ধানীদের নাকে যেতে পারে। এখানে আসবার সময় মুখে বা ঠোঁটে রঙ মাখে না। রঙ না মাখলেই ওকে বেশি সুন্দরী দেখায়। ঠোঁট এমনিতেই টুকটুকে লাল। কিন্তু এখন মুখ ঠোঁট সবই ফ্যাকাশে, রক্তহীন। বুকে ধক্ ধক্ ঢাক বাজছে। গগন সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ও সুমিতার মুখ তুলে ধরেছে। তবু সুমিতা ওর দিকে তাকাতে পারছে না। এর থেকে স্পষ্ট আর কী দেখা যায়। গগন হাসল, 'কিন্তু আমার দিকে তাকাতে তোমার ভয় কি।'

সুমিতা চমকে উঠল, শরীরটা কেঁপে গেল। গগনের দিকে তাকাল। ওর কালো চোখের দ্যুতিতে সেই ঝিলিক নেই। হেসে উঠে, মনের উত্তেজনা আর ভয়কে চাপা দেবার চেষ্টা করল, 'তোমাকে ভয়? তোমাকে আবার ভয় কি।'

'তাই বল।' গগন সুমিতার মুখ আরও তুলে, নিজের মুখ নামিয়ে ওর দুই ঠোঁট আগ্রাসী চুম্বনে শুষে নিল। সুমিতা বাধা দিল না। এ তো প্রত্যহের ব্যাপার। গগন সুমিতার গ্রাসে নিজেকে সঁপে দিল। সুমিতার ঠোঁট স্খলিত, কোনো প্রতিদান নেই। এখনও ওর শরীরে সেই অনায়াস সাড়া নেই, শক্ত হয়ে আছে। এর থেকে স্পষ্ট আর কী দেখবার আছে।

ফাল্গুন মাস। বাইরে দক্ষিণ বাতাসের ঝাপটা গাছের ডালে পাতায়। বুলবুলি টুনটুনি সব সময়েই ডাকে। এখন কোকিলও ডাকছে। ঘরের একপাশে পুরনো খাটে বিছানা পাতা। গগন সুমিতাকে খাটের দিকে টেনে নিয়ে গেল, 'অনেকদিন তোমাকে পাই নি, আজ—'

'না না, আজ না।' সুমিতা গগনের আলিঙ্গনে ধরা-পড়া পাখির মতো ছটফট করে উঠল, 'প্লিজ গগন, আজ না।'

গগনের দুই চোখে গভীর আবেগ, 'সুমিতা, আজ, আজই। আজ না করো না। কেন জানি না, আজ তোমাকে বড় পেতে ইচ্ছা করছে। সুমিতা—।' ও আবার সুমিতার ঠোঁটের ওপর মুখ নামিয়ে নিয়ে এল। দেখল, সুমিতার মুখের ভাবান্তর। সুমিতার চোখে অবাক অনুসন্ধিৎসা। সুমিতার দৃষ্টি আস্তে আস্তে করুণ কোমল হয়ে উঠল। আবেগ সঞ্চারিত হল। গগনের ব্যাকুল চুম্বনের প্রতিদান দিল। গগন ওকে আরও নিবিড়-তর করে খাটের ওপর বসিয়ে দিল।

সুমিতা ঠোঁট ছাড়িয়ে নিল, 'কিন্তু, কিন্তু তোমার কাছে প্রোটেকশানের কিছু—।'

'আছে।' গগন বলল, 'তুমিই তো এনে দিয়েছিলে।' ও সুমিতার জামার হুকগুলো পট পট করে খুলে দিল।

সুমিতা বলল, 'কিন্তু শাড়িটা খুলে ফেলতে হবে, নইলে চটকে যাবে।'

'আমি খুলে দিচ্ছি।' গগন হাসতে হাসতে সুমিতার বুক থেকে আঁচল সরিয়ে নিল।

সুমিতা ঘরের সংলগ্ন বাথরুম থেকে চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল। গগন দেওয়াল আলমারি থেকে প্লেট আর চামচ নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। চেয়ারে বসে টিফিন কেরিয়ার খুলে, একটার পর একটা বাটি প্লেটের চারপাশে রাখল। ভাত, ডাল, মুড়িঘন্ট, মাছের ঝাল। চামচেয় করে প্লেটে ভাত তুলল। বলল, 'সুমিতা, জলটা নিয়ে এস।'

সুমিতা দেওয়ালে ঝোলানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল। বলল, 'শুরু কর, আনছি।'

'ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, আগে জল দাও।' গগন বলল।

সুমিতা দেওয়াল আলমারি থেকে একটা কাঁচের গেলাস তুলে নিল। খাবার টেবিলের কাছেই কুঁজো। কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে টেবিলের ওপর রাখল। গগনের উলটো দিকে মুখোমুখি চেয়ারে বসল। চোখে ভয় নেই, কিন্তু নাকের পাটা যেন কাঁপছে। মুহূর্ত-পূর্ব মিলনের কোনো আবেশ নেই চোখে মুখে। আবার ঘামতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু জানালা খোলা। বাতাস আসছে ঘরে। বাইরে কোকিল ডাকছে। বসন্তের বাতাস উতল নিঝুম দুপুর। গগন ভাতের প্লেটটা সুমিতার দিকে এগিয়ে দিল, 'খাও।'

'আমি খাব?' সুমিতা ভুরু কুঁচকে অবাক চোখে তাকাল, 'আমি ভরপেট খেয়ে বেরিয়েছি। তোমার খাবার তুমি খাও। অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

গগনের মুখ আস্তে আস্তে শক্ত হল। চোখের তারা দুটো অঙ্গারের মতো জ্বলছে। টেবিলের ওপর দু হাত ছড়িয়ে দিল, যেন কোনোরকমেই সুমিতা খাবারগুলো ফেলে দিতে না পারে। খসখসে স্বরে যেন একটা অলৌকিক আদেশ ফুটে উঠল, 'ভরা পেটের ওপর সবই একটুখানি করে খাও।'

সুমিতার মুখের রক্ত যেন কেউ শুষে নিল। ঠোঁট দুটো কেঁপে, হা হয়ে গেল। চোখে আতঙ্ক। গগন চামচেয় করে ডাল, মুড়িঘণ্ট, মাছের ঝাল, সবই একটু একটু করে ভাতের প্লেটে তুলে দিল, গলার স্বরে দৈবাদেশ, 'খাও।'

সুমিতা গগনের চোখের দিকে তাকাল। আর মুহূর্তেই যেন বিদ্যুতের নেগেটিভ পজেটিভ তারের মতো জড়িয়ে গেল। সম্মোহিতের মতো, প্লেটে হাত বাড়িয়ে, খাবার মুখে তুলল। মুখে ঘাম দেখা দিল, চোখের তারা দুটো বড় হয়ে উঠতে লাগল। আর কোণ বেয়ে জল পড়তে লাগল। কয়েক গ্রাস মুখে দেবার পরেই, চোখ লাল হয়ে উঠল। ফ্যাকাশে মুখে কালো ছায়া পড়ল। হাত যথাস্থানে না গিয়ে, গালে চিবুকে মাখামাখি হতে লাগল। তারপরে মুখটা আস্তে আস্তে প্লেটের ওপর নেমে এল। দু হাত টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল, কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল। গলায় গোঙানির শব্দ। প্লেটে থুবড়ে পড়া মুখে ভাত ডাল মুড়িঘণ্ট মাছের ঝালে মাখামাখি। কেবল একবার উচ্চারণ করতে পারল, 'শংকর...।' তারপর জবাই করা মুরগীর মতো আস্তে আস্তে গোটা শরীরটা নিথর হয়ে গেল।

গগন জলের গেলাসটা নিয়ে, এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে শেষ করল। সুমিতার দিকে চোখ রেখে গেলাসটা রাখল। শংকরের নামটা শেষ পর্যন্ত সুমিতা না বলে পারল না। শংকর বরাবরই ওকে সহ্য করতে পারে না, কিন্তু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু করত না। অনেকটা বন্ধুর মতো— বন্ধুই তো। সুমিতার একবার উচ্চারণেই ওর চোখ খুলে গেল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে একটা সিগারেট ধরাল। বাইরে বাতাসে পাতা ঝরছে। কোকিল ডাকছে। গগন জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। বাড়ির কথা মনে পড়ল। নিজের অতীতের ছবি ভেসে উঠল। লেখাপড়া করা ভালো ছেলে, হরিদাস মিত্রের সুপুত্র। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল। এম. এ. পড়বার ইচ্ছা ছিল। বাবার ইচ্ছায় আইন পড়তে গিয়ে, প্রথম জগদীশ হালদারের চোখে পড়েছিল। রাজনৈতিক নেতা জগদীশ হালদার। তখন এম. এল এ। তারপরে এ্যাসেম্বলিতে ভাঙন। দলবাজির নতুন দিগন্ত তখন তার রক্তাক্ত যবনিকা খুলে দিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট দুবার ভেঙে গিয়েছে। তার মধ্যেই, গগন পেশাদার খুনীর মতো, তিনটি লাশ ফেলে দিয়ে, গোগা

মিত্তিরে রূপান্তরিত হয়েছিল। বাহাত্তরের নির্বাচন সামনে। জগদীশ হালদারের জয় ঠেকাবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু গোগা মিত্তিরের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বরাবরই প্রবল। সময় বুঝেই ও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে এখানে এসেছে। এ আশ্রয়ও মিলেছে জগদীশ হালদারের ব্যবস্থা মতো।

চারু ঘোষালের মেয়ে সুমিতা, হরিদাস মিত্রের সেই ভালো ছেলে গগনকে ভালোবাসত। কিন্তু গগন যখন খুনী গোগা মিত্তির হয়েছিল, ভেবেছিল সুমিতা স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণায় সরে যাবে। সংসার ভারি বিচিত্র, তার অধিক সীমাহীন মানুষের বৈচিত্র্য। খুনী গোগা মিত্তির সুমিতার কাছে আর নেহাত ভালোবাসার পাত্র ছিল না। হিরো হয়ে উঠেছিল। হিরো মানে নেশা। নেশা ধরানো উত্তেজনা। গোলমালটাও এইখানেই। হিরো-ওয়ারশিপ-এর মধ্যেই মানসিক দ্বন্দ্বের বীজ লুকিয়ে থাকে। আজ জানা গেল, গগনের বন্ধু শংকরের ছিল। হিরোওয়ারশিপ অনায়াসেই পাত্রান্তরিত হয়। সুমিতারও হয়েছিল। আজ জানা গেল। গগনের তুলনায় ঘাতক হিসাবে, শংকর কিছু কম সতর্ক চতুর বা নিষ্ঠুর না। ও প্রায় রাত্রেই গগনের কাছে আসে। রোজ আসে বিপু—বিপ্লব, গগনের নিজের হাতে গড়া বিশ্বাসী চেলা। গগন রোজ রাত্রে বিপুর সঙ্গে খাল পাড় দিয়ে, রেললাইনের কাছে গিয়ে, শহরের পশ্চিমে যায়। রাত্রে দোকান থেকে ফিরে ফিরে আসে। খাবার আগে, এখানে বসেই মদ খেয়ে নেয়। বিপু মদ নিয়ে আসে। এটাও ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের সংকেত কিনা, এতদিন জানা ছিল না। বিপুর আনা মদ ছাড়া, গগন কারোর মদ এখানে মুখে নেয় না।

শংকরের এই পরিকল্পনার কথা কি জগদীশ হালদার জানেন? না জানলেও, জানবেন। অথবা জগদীশদাই হয়ত গগনকে সরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনো কারণ নেই। গগনের পক্ষে জগদীশদাকে টপকে যাবার কোনো উপায় ছিল না, তিনি জানতেন। সে-ইচ্ছাও গগনের ছিল না। তাও জানতেন। জানেন গদির মোহ গগনের নেই। গগনের চাই অর্থ বিত্ত বিলাস সুখ। অবিশ্যি গগন বুঝতে পারে, গদির সঙ্গে এগুলোরও যথেষ্ট যোগ আছে। অতএব কোথায় কী ঘটছে, কার সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, কে কখন শত্রু, আর কে কখন মিত্র, এ পথে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না।

কয়েক দিন ধরে মনের মধ্যে একটা সংশয় উঁকি দিলেও, সুমিতা নিজের হাতে ওকে বিষ তুলে দেবে, এতটা কল্পনা করতে পারেনি। শংকরের ঈর্ষা

আছে। সে ঈর্ষা সাপের মতো বুক চেপে, এগিয়ে এসে হঠাৎ ফণা তোলার মতো এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারেনি। সিগারেটটা শেষ করে, মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সুমিতার দিকে তাকাল। হাত দিয়ে স্পর্শ না করেও বুঝতে পারছে, ওর শরীর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা আর শক্ত হয়ে আসছে।

গগন অনেক ভেবে চিন্তা করে এখানে আসার পরিকল্পনা করেনি। হঠাৎ এসেছিল। জানত না, ওর মধ্যে গোগা মিত্তির নামে একটা ভয়ংকর খুনী লুকিয়ে আছে। একটা অসাধারণ জীবনের হাতছানি অবচেতনে ছিল। অল্পে সুখী সাধারণ মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ওর ভিতরের এই অজ্ঞাত প্রাণীটিকে জগদীশদা আবিষ্কার করেছিলেন। আর ও চোখের সামনে লাশ পড়তে দেখে লাশ ফেলার পথে নেমেছিল। জগদীশদা ওকে অন্যরকম ভেবেছিলেন। তবু এমন ছেলেই বা কোথায় পাওয়া যায়। যাদের না হলে কিছুতেই চলে না।

কিন্তু শত্রু কেবল বিরুদ্ধ দলে নেই। নিজেদের মধ্যেও আছে। এই চিন্তাটা ওকে আস্তে আস্তে অস্থির করে তুলছে। সুমিতা ওকে বিষ খাইয়ে মারতে এসেছিল। ও সুমিতাকে সেই বিষ খাইয়ে মারল। সমস্ত জীবনটা তা হলে একটা প্রকাণ্ড ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? এ কি নিয়তির অমোঘ নির্দেশ নাকি? তাই যদি, তবে শংকর এখন কোথায়? নিশ্চয়ই সুমিতার জন্য কোথাও অপেক্ষা করে আছে। বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। গগন জানে—গোগা মিত্তির জানে, বেলা পড়ে আসতে না আসতেই শংকর একটা ভীষণ ভুল করবে। ও এখানে আসবে।

গগন সুমিতার দিকেই তাকিয়ে রইল। কোনো অর্থ হয় না সুমিতা, আমার হাতে এভাবে এখানে মরে পড়ে থাকার। আমি বুঝতেই পারছি না, তোমাকে আমি ভালোবাসতাম কিনা। তুমি হিরো চেয়েছিলে। আমি সেই থেকেই বোধহয় ভালোবাসতে ভুলে গিয়েছিলাম।

বেলা পড়ে আসছে। দক্ষিণের বাতাস মাতাল, ঝাপটায় ঝাপটায় গাছের পাতা খসিয়ে দিচ্ছে। কোকিলটা ডেকেই চলেছে। বুলবুলি টুনটুনিদের স্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। গগন দুটো ঘরে পায়চারি করছে। পকেটে রিভলবার। জগদীশদার দান। টেবিল পরিষ্কার। বাকি খাবারগুলো টিফিন কেরিয়ারে যেমন তেমনি রয়েছে। গগন ঢাকা দিয়ে রেখেছে।

বাড়িটা একটা সম্পূর্ণ বাড়ি। বাথরুমের পাশে রান্নাঘরও আছে। সুমিতাকে রান্নাঘরে রেখে দিয়েছে।

শংকর এল। গগন জানলার ছিদ্র দিয়ে দেখল, শংকর পাঁচিল টপকে বাগানের ভিতরে এল। কোমরে একবার হাত বুলিয়ে নিল। রিভলবারটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিল। এগিয়ে এসে ঘুরে পিছনের দরজার দিকে গেল। শংকরের সংকেত শোনা গেল, প্রথমে দুই টোকা, তারপর এক। গগন দরজা খুলে দিল। শংকর গগনের দিকে তাকাল। চোখে সন্দেহ, ভিতরের উত্তেজনা চাপতে পারছে না, 'সুমিতা কোথায়? আসেনি?'

'হ্যাঁ এসেছিল তো।' গগনের স্বর শান্ত কিন্তু চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, 'কেন, কী হয়েছে? ভেতরে আয়।'

শংকর ভিতরে ঢুকল। চারদিকে তাকাল। টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ার দেখে থমকে গেল, 'একি, সুমিতা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে যায়নি? তুই খাসনি?'

'না।' গগনের স্বর গম্ভীর, 'পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। সুমিতা এল, টিফিন কেরিয়ারটা রাখল, তারপরেই বলল, আমি চলি, তুমি খেয়ে নিও। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না। কোনোদিন এরকম করে না। খাবার রেখেই চলে গেল। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। নিকুচি করেছে খাবারের। খাইনি, ছুঁইনি। কী হয়েছে সুমিতার, কিছু জানিস? এরকম করে চলে গেল কেন?'

শংকর গগনের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। ওকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখাচ্ছে, বিড় বিড় করে বলল, 'এল, টিফিন কেরিয়ার রেখে চলে গেল? কেন? অথচ ওর বাড়িতে বলল, ও এখনও ফেরেনি।' বলতে বলতে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল।

'বোস শংকর।' গগন দেওয়াল আলমারি থেকে প্লেট চামচ আর গেলাস তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর এনে রাখল, 'এমনও নয় যে আমার সঙ্গে সুমিতার ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল, অথচ ওর ভাবভঙ্গি যেন সেইরকমই দেখলাম।' গগন কুঁজো থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে টেবিলে রাখল, 'এরকম কেন করল, কিছুই বুঝতে পারলাম না। টিফিন কেরিয়ারটা রেখে যেন চলে যেতে পারলেই বাঁচে। আমার কাছে এক মিনিটও থাকতে চাইছিল না। আমি মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি।'

শংকর বারেবারেই গগন আর টিফিন কেরিয়ারটার দিকে দেখছিল, আর

উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্কের মতো বিড়বিড় করছিল। গগন চেয়ারে বসে বলল 'তুই কিছু জানিস, সুমিতার কী হয়েছে? কেন ওরকম করে চলে গেল?'

'অ্যাঁ? শংকর চমকে উঠল, মাথা নেড়ে বলল, 'না, কিছুই বুঝতে পারছি না। অথচ—।' ওর মুখে আর কোনো কথা জোগাল না।

গগন টিফিন কেরিয়ার খোলবার আগে, শংকরকে আড়াল করে দাঁড়াল। চামচে করে প্লেটে ভাত নিল। ডাল মুড়িঘন্ট মাছের ঝাল এক সঙ্গেই প্লেটের ওপর ঢেলে দিল, 'তুই তাহলে বাইরে গিয়ে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা কর, নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। একটুখানি বসে যা, আমি খেয়ে নিই।' ও চেয়ারে বসল।

শংকর ওর মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল। বিমূঢ় অন্যমনস্ক চোখে খাবারের দিকে দেখল। এখনও ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে চলেছে। আশ্চর্য, এত সতর্ক চতুর শংকর, সময় বিশেষে ওরও মাথায় গোলমাল পাকিয়ে যায়। গগন অতর্কিতে পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে, শংকরের দিকে তাগ্ করল, 'তোর মতিচ্ছন্ন না হলে এরকমটা হতো না। খাবারগুলো খেয়ে নে।'

শংকর মুহূর্তেই কোমরের কাছে হাত নিয়ে লাফিয়ে দাঁড়াবার উদ্যোগ করল। মুখের চেহারা বদলে গেল। গগন বলল, 'একদম কোমরে হাত দিস না, উঠে দাঁড়াস না। যা বলছি, তাই কর। টেবিলের ওপরে দুহাত রাখ।'

শংকর গগনের হাতে ফণা তোলা সাপের মতো রিভলবারটা দেখল। টেবিলের ওপর দুহাত রাখল। ওকে এখনও উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে, সেই সঙ্গে দু চোখে আতঙ্ক। হঠাৎই যেন মুখের ঘামের ঝরনা চুঁইয়ে এল। মুখটা হা হয়ে গিয়েছে, বিড়বিড় করছে না।

'সুমিতাও খেয়েছে, তুইও খা।' গগনের স্বরে সেই দৈবাদেশের মতো এক ভয়াল অলৌকিকতা। চোয়াল শক্ত, দৃষ্টি কঠিন।

শংকর স্খলিত স্বরে একবার উচ্চারণ করল, 'মানে—।'

'মানে তুই ভালো জানিস।' গগনের তর্জনি ট্রিগারের ওপর, 'সবই অদৃষ্ট, তোর আমার সুমিতার। আমি তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। খাবার খেতে দোষ কি। খাবার তো। দেরি করিস না। খাবার অথবা কপালের মাঝখানে একটা গুলি, মাথার ঘিলু ছিটকে যাওয়া, যে কোনো একটা বেছে নে।'

'কিন্তু গোগা শোন—।' শংকরের স্বর কাঁপছে।

র তর্জনি ট্রিগাবেব ওপব একটু চাপ দিল, খসখসে
া নয, আমি পাঁচ গুনব। এক—দুই—তিন—'
প্লেটে হাত দিল। খাবাবগুলো নাডাচাডা কবতে
ণ কবল, 'চাব—'

শংকব খাবা... তুলল। ওব মুখটা যেন আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড হযে উঠতে লাগল। চোখ দুটো ফেটে পডবাব উপক্রম। খেতে খেতেই গলায় একটা শব্দ হল। যন্ত্রণায নয়, কান্নায। চোখে জল আসছে। জিজ্ঞেস করল, 'গোগা তুই কী কবে জানলি?'

'মন বলেছিল। খেযে নে।' গগনেব স্ববে শংকবেব প্রত্যক্ষ নিয়তিব আদেশ।

শংকব মুখে আবার খাবাব তুলে বলল, 'গোগা সুমিতাকে আমি—'

'ভালোবাসতিস। তাডাতাডি খা, সুমিতাব সঙ্গেই তোব গাঁটছডা বাঁধা।' গগনেব স্ববে একটা ভৌতিক অমানুষিকতা। জ্বলন্ত চোখের তাবা শংকবেব চোখেব ওপব।

শংকব হঠাৎ যেন ক্ষুধার্তেব মতো, গপগপ কবে খেতে লাগল। আব গলা দিযে একটা শব্দেব সঙ্গে গোটা শরীবটা কাঁপতে লাগল। খেতে খেতে চোয়াল চওডা হযে উঠল, চোখ দুটো ঠিকবে বেরিযে এল, খাবার মুখ থেকে বাইবে বেবিযে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে হাতটা টেবিলেব ওপব এলিয়ে পডল, মাথাটা ঝুঁকে, ঠিক সুমিতাব মতোই প্লেটেব ওপব নেমে এল। বিষেব ক্রিযা শুরু হযে গিযেছে। দু হাত দিযে টেবিল আঁচডাতে লাগল। গলা থেকে গোঙানির শব্দ শোনা গেল। তাবপর হঠাৎ-ই চেযাব থেকে ওব শবীবটা আস্তে আস্তে নীচে গডিযে পডল।

গগন উঠে দাঁডাল। সুমিতা নীচে গডিযে পডে নি, কাবণ ও দাঁডাবাব চেষ্টা কবেনি। শংকর শেষবারেব মতো দাঁডাবার চেষ্টা কবতে গিযে, চেযারের এক পাশে, মেঝেব ওপব এলিযে পডল। গগন ওব বিভলবাবটা লক কবে পকেটে বাখল। শংকরেব কাছে গিযে ওব জামা তুলে, কোমবে গোঁজা দেশি পিস্তলটা বের কবে একবাব দেখল। সেটা টেবিলের ওপব রেখে, পকেট থেকে সিগাবেটেব প্যাকেট আব দেশলাই বের কবে সিগাবেট ধবালো।

বিপুর আসতে এখনও দেবি আছে। সন্ধ্যার পবে, অন্ধকাবে ও পাঁচিল টপকে আসবে। গগন তখন ঘরেব বাইরে বাগানে থাকবে। বেলা প্রায়

শেষ হয়ে এল। কোকিলটা ডেকেই চলেছে। গগন চেযাযে বসল।

অতঃপর? গগন ভাবল। বিরুদ্ধ দলেব শত্রুদেব চেনা যায। নিজের দলেব শত্রুদের চেনা যায না। একটা নতুন বন্ধ দবজা ওব চোখের সামনে খুলে গেল। আর বুঝতে পাবল, এটা একটা শুরু। এব শেষ নেই। পুবনো দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল। যখন ও লেখাপডা কবত, ভালো ছেলে ছিল, বাবা মা-ব একটা বড প্রত্যাশা ছিল ওকে নিয়ে।

কিন্তু সেখানে ও আব কোনোদিন ফিরে যেতে পারবে না। ওব ভবিষ্যৎ চেয়াবেব পাশে মেঝেয লুটিযে পডে আছে। বান্নাঘবে শোয়ানো বযেছে। প্রত্যেক পথেবই একটা নির্দিষ্ট গতি আছে।

ভারতশিল্প ও ধর্ম

নীহাররঞ্জন রায়

কুমারস্বামী জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বোম্বের প্রিন্স অব ওয়েলস মিউজিয়ামে প্রদত্ত কুমারস্বামী স্মৃতি বক্তৃতা (১৯৭৯)। ইংরেজিতে প্রদত্ত মূল বক্তৃতা এখনও অপ্রকাশিত। 'এক' চিহ্নিত অংশটি অনুবাদ করেছেন সত্যজিৎ চৌধুরী। আর বাকি অংশ সিদ্ধার্থ রায়।

এক

Transformation of Nature in Art (১৯৩৪) গ্রন্থে আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী (১৮৭৭-১৯৪৭) এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—যাকে ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূলসূত্র মনে করা যায়। পরম্পরাগত ভারতীয় সমাজ ও নবজাগরণ-পূর্ব মধ্যযুগীয় য়ুরোপ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, এ-ধরনের পরম্পরা-আশ্রিত ও ধর্মাশ্রিত সমাজে, **'art is religion, religion art, not related but the same'**। এই প্রথম এমন স্থিরনিশ্চিতভাবে এ-অভিমত প্রকাশ করলেও ভারতশিল্পের ব্যাখ্যা ও ইতিহাসচর্চার সূচনাকাল থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তের অভিমুখী যুক্তি বিস্তার করে এসেছেন। *Medieval Sinhalese Art* (১৯০৮) গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন, আধুনিক যন্ত্র-শিল্প প্রবর্তন করে ইংরেজরা শুধু সিংহলের পরম্পরাগত শিল্পকলা ও কারিগরি-বিদ্যা ধ্বংস করেছে তাই নয়, আরও শোচনীয় এই যে, এরদ্বারা, প্রথমত, সিংহলি সমাজের মূল গড়ন ভেঙে দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, শিল্পকলাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাঁর এ-সমালোচনায় উইলিয়ম মরিস-এর মতো উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বের ভাববাদী ইংরেজ মনীষীদের যন্ত্রায়ন-বিরোধী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে সন্দেহ নেই। অন্যসব আন্দোলনের মতোই যন্ত্রায়ন-বিরোধী

আন্দোলনও ছিল জটিল এবং এর মধ্যে থিয়সফি বা ঈশ্বরতত্ত্ব, সমাজতন্ত্রবাদ, জড়বাদ-বিরোধিতা, নব্যপ্লেটোবাদ—প্রভৃতি ধারণার সূক্ষ্ম প্রতিফলন ঘটেছিল। এই আন্দোলন তখনকার স্পর্শসচেতন মনের মানুষদের আলোড়িত করে। গ্রেট ব্রিটেনে সেই পরিবেশে কুমারস্বামী তাঁর আনুষ্ঠানিক ছাত্র জীবন অতিবাহন করেন এবং বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর বুদ্ধিজীবী জীবনের সেই আদিপর্বে তিনি বলেন, সিংহলি সমাজে তখনো পর্যন্ত অবশিষ্ট ধর্মীয় কাঠামো দৃঢ় করে তোলাই যন্ত্রায়ন বা জড়বাদী জীবনাদর্শের অশুভ প্রভাব কাটানোর উপায়। প্রায় অতীন্দ্রিয়বাদী মানসিকতার বশে প্রথম যৌবনেই তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পকলা ও জীবনের মধ্যে সুস্থ সৃজনশীল সম্পর্ক কেবলমাত্র ধর্মচেতনাই ফিরিয়ে আনতে পারে।

এর বারো বছর পরে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় *Dance of Siva*। ভারতীয় ও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় জগতের প্রজ্ঞা ও শিল্প-পরম্পরা বিষয়ে ইতিমধ্যে তিনি যে ব্যাপক ও গভীর গবেষণা করেন, তারই ফল এই গ্রন্থ। দুটি ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাজ্ঞান ও অন্যান্য প্রস্তুতি তাঁর ছিল। এই সময় থেকে এর চোদ্দ বছর পরে *The Transformation of Nature in Art* প্রকাশ অবধি ভারতশিল্পের ইতিহাস ও ভারতীয় মূর্তিবিদ্যা বিষয়ে পর্যালোচনা ছাড়া তাঁর জ্ঞানচর্চার মূল প্রবণতা ছিল ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের খ্রীস্টান-শিল্প বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি শিল্পতত্ত্ব গড়ে তোলার দিকে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এটাই ছিল তাঁর প্রধান আকর্ষণের বিষয়।

পরিণামে যে-শিল্পতত্ত্ব তিনি দাঁড় করালেন তা মূলত ভাববাদী এবং পরাবিদ্যা-মূলক। তাছাড়া সেই তত্ত্ব অতিলৌকিকত্ব-অভিমুখী। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ এমন একটি তত্ত্ব, যার সাহায্যে পরম্পরাগত ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় ইয়োরোপীয় শিল্প—দুয়েরই সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজ ও দুই শিল্পধারা সম্পর্কে কুমারস্বামীর অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা, পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির চরম নিদর্শন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিনীতভাবে নিবেদন করতে চাই যে ইয়োরোপের ধ্রুপদী, মধ্যযুগীয় ও নবজাগরণ-কালের শিল্পকলা এবং ভারতীয় শিল্পধারার মধ্যে তুলনামূলক বিচারে তিনি ভারতশিল্পের প্রকৃতি সম্পর্কে যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা প্রশ্নাতীত নয়। তত্ত্বগত এবং ঐতিহাসিক—উভয় দিক থেকেই তাঁর ব্যাখ্যা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন

আছে। এই আলোচনার পরবর্তী দুটি পর্যায়ে, যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, আমি তাঁর অভিমত পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করব। মধ্যযুগীয় ইয়োরোপীয় শিল্প সম্পর্কে নয়, ভারতশিল্পের পরম্পরা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যেই আমার মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে চাই।

কী ভাবে কুমারস্বামী তাঁর শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন? ভারতীয় সমাজ ও শিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজ ও শিল্পের সমধর্মিতা বিষয়ে তিনি কি ভাবতেন?

কুমারস্বামীর প্রথম প্রতিপাদ্য: উভয় সমাজই ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং ধর্মাশ্রয়ী, অতএব উভয় সমাজে জাত শিল্পকলা সমধর্মী। সহজেই মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, পৌরোহিত্য-শাসিত হওয়ায় এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম জীবন-যাপনের একই রীতি-পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ায় উভয় সমাজই ঐতিহ্যাশ্রয়ী ছিল। উভয়েই মানব-নিয়তি নিয়ন্ত্রক ও সব মানুষ যার পরবশ, এমন কোনো অতিমানবিক শক্তির অস্তিত্ব মানা হতো এবং বহু মানুষ ভক্তিভরে ও নিষ্ঠার সঙ্গে এক বা একাধিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করত—এই অর্থে ভারতীয় সমাজ ও মধ্যযুগীয় য়ুরোপীয় সমাজ ধর্মাশ্রিত ছিল মেনে নিতেও অসুবিধে নেই। আরো এক ধাপ এগিয়ে বলা যায়, এই দুই সমাজে উৎপন্ন শিল্প-সামগ্রীর বৃহত্তম অংশে আপন আপন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার মর্মবস্তু ও আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয় উভয় সমাজের ধর্মীয় প্রবণতার মধ্যে মিল এর বেশি দেখানো যায় না, এটাই শেষ সীমা। দুটি সংস্কৃতির ধর্ম চেতনা ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি এক ধরনের ছিল না; তাদের লক্ষ ও আকাঙ্ক্ষা, ধারণা ও আদর্শ ছিল ভিন্নমুখী। বিশ্বপ্রকৃতি, রক্তমাংসের মানবদেহ, জীবন-মৃত্যু, স্থান-কাল, সুখ-দুঃখ, যৌনতা ও নরনারীর সম্পর্ক এবং এমনি অগণিত বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে সাধারণভাবে ভারতীয় জীবনদৃষ্টি বলা যায়—তা আবার সর্বদা ও সর্বত্র অপরিবর্তনীয়ও ছিল না—তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের জীবনদৃষ্টির কোনো মিল পাওয়া যায় না। কোনো শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র যে, ধর্মীয় আধেয়বস্তু সম্পর্কে আপাত চিত্তাকর্ষক যুক্তি-জালের দ্বারা নয়, ঐ সামগ্রিক জীবনদৃষ্টির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে—একথা কী করে অস্বীকার করা যাবে?

উভয় শিল্পধারার ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী বলেন,

"……The purpose of the imager was neither self-

expression nor the realisation of beauty. He did not choose his own problems, but like the Gothic sculpture obeyed a hieratic canon.....(he was just) a *pions* (বাঁকা হরফ আমার) artisan.'

যদি মেনেও নেওয়া যায়, ধর্মসম্প্রদায়গুলির পূজার উদ্দেশে নির্মিত মূর্তি (যা ভারতীয় শিল্পের একটা অংশ মাত্র, অবশ্যই বেশ বড় একটা অংশ) সম্পর্কে কুমারস্বামীর এই বক্তব্য সঠিক, তবুও বলতে হবে—এইসব মূর্তি নির্মাণের পর্যায়ে ধর্মীয় নিষ্ঠার কোনোই ভূমিকা ছিল না। এও জানা কথা, প্রায়শ কারিগরেরা যে মূর্তি গড়ে দেবার কাজ পেতেন—সেসব তাঁদের নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর মূর্তি নয়। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, কারিগরি দক্ষতা, নৈপুণ্য ও সামর্থ এবং কাজের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাই বিবেচ্য ছিল।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কুমারস্বামীর religion শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার মনে হয় পূর্বাপর সাধারণ আভিধানিক অর্থেই শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বা অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় religion শব্দটির কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই। আমাদের 'ধর্ম' শব্দটি religion-এর চেয়ে ব্যাপকতর তাৎপর্যবহ। নিছক দেবদেবীর পূজা, বিশেষ বিশ্বাস ও আচরণবিধি, মন্দির ও তীর্থ ইত্যাদির মধ্যে 'ধর্ম' শব্দের তাৎপর্য সীমিত নয়। পরম্পরাগত পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও আচরণবিধি—যা ব্যক্তি ও তার সমাজকে ধারণ করে রাখে, ভারতীয় মানুষ তাকেই 'ধর্ম' বলে জানে। ঐতিহ্যাশ্রিত ভারতে শিল্পকলা নিশ্চয়ই এই বিশিষ্ট ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং এইদিক থেকেই শিল্প ও জীবন পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে মিলিত। কিন্তু কুমারস্বামী যেমন বুঝেছিলেন, এ 'ধর্ম' সেই মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান ঈশ্বরতত্ত্ব-সম্পৃক্ত কোনো ধারণা নয়।

সুতরাং কুমারস্বামী যখন পরম্পরাগত ভারতীয় সমাজ ও ভারতশিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজ ও খ্রীস্টান শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য দেখান, উভয়ের সাধর্ম্য নির্দেশ করেন, তখন তিনি যে শুধু বিবেচ্য প্রশ্নগুলির অতিসরলীকৃত সমাধান দেন তাই নয়, রূপগত ও আত্মিক আবেদনের দিক থেকে উভয় শিল্পের প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। একাধিক কারণে মনে হয়, এই বিশেষ ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চায় তিনি দুই শিল্পধারার অন্তর্গত শুধু প্রতিমাশিল্পকেই সমগ্র শিল্পকলার মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। এই প্রতিমা-শিল্প মোটামুটিভাবে সন্ত ও বীর, দেবদেবী এবং তাদের অনুচরদের চরিত্র

আশ্রিত। নিঃসন্দেহে এদিক থেকে পরম্পরাগত ভারতশিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সে-তো আপাত সাদৃশ্য মাত্র। দেবদেবী ও সাধুসন্তদের মানবীয় আকৃতি সম্পর্কে উভয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাখ্যা এবং এই জাতীয় শিল্পকলার অভিপ্রায় সর্বতোভাবে পৃথক। ভারতীয় প্রতিমাশিল্প প্রতীকমূলক নয়, এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে প্রাণরস ও জীবনী-শক্তি এবং রক্তমাংসের মানব-জীবনকে প্রভাবিত ও পুনর্গঠিত করার সামর্থ।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, জ্ঞানচর্চার সূচনা থেকেই কুমারস্বামী ভাববাদী ও জড়বাদ-বিরোধী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতশিল্প ও মধ্য-যুগীয় খ্রীস্টান শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্য সম্পর্কে উদ্ভাবিত তাঁর যুক্তির ভিত্তিতে এই দুই শিল্পকে তিনি গ্রীক-রোমক শিল্পে ও নবজাগরণ-পর্বের ইয়োরোপীয় শিল্পে প্রকাশিত অভিপ্রায় ও আদর্শের প্রতিপক্ষে দাঁড় করালেন। ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান শিল্পের মধ্যে গভীরতর সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই পর্যায়ে তাঁর যুক্তি অতি সরল। ধ্রুপদী ও নবজাগরণকালের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পকলা শুধুই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্পর্কে আগ্রহী। তাঁর মতে, এ-মনোভাব জড়বাদী। তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন এবং প্রমাণ করেনও যে, পরম্পরাগত ভারতশিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান শিল্পে এই মনোভাব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক জুড়ে পশ্চিম য়ুরোপের শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে ধ্রুপদী ও নবজাগরণকালীন জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনা-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠায় কুমারস্বামীর পক্ষে নিজের মতবাদ প্রমাণ করা সহজ হয়েছিল। জড়বাদ-বিরোধী প্রবণতার দিক থেকে পরম্পরাগত ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় ইয়োরোপীয় শিল্পের সাদৃশ্য সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ অবশ্য নির্ভুল।

কিন্তু এর তাৎপর্য কী দাঁড়াল? এই দাঁড়াল: উভয় শিল্পই প্রতিরূপ-ধর্মিতার বিরোধী, কোনো সমাজেই বস্তুবিশ্বের বাহ্যরূপের নিরিখে শিল্পকলার বিচার করা হয়নি, এবং ধ্রুপদী ও নবজাগরণকালের ইয়োরোপের মতো দৃশ্যমান বিশ্বজগতকে চরম সত্য বলে মানা হয়নি, বিশ্বপ্রপঞ্চের ওপারে কোনো 'আদর্শ' জগতের অস্তিত্ব মানা হয়েছে। মেনে নেব, এ-মত অস্বীকার করার বিশেষ কিছু কারণ নেই। কিন্তু কুমারস্বামী জোর দিয়ে বলেন, এই জগৎ মেটাফিজিক্যাল বা পরাবিদ্যাগত জগৎ এবং একমাত্র এই পরাবিদ্যাগত জগতই শিল্পীদের মনে সত্য রূপে প্রতিভাত ছিল। তিনি বলেন,

Formal element in art represents a purely mental activity.

যার দ্ব্যর্থহীন তাৎপর্য হল, শিল্পীর জগৎ একান্তভাবে পরাবিদ্যাগত জগৎ—যা কেবলমাত্র প্রজ্ঞা দিয়ে ধারণা করা ও বোঝা সম্ভব।

আমি জানি না—জীবন, বিশ্বপ্রকৃতি ও শিল্প সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানশিল্পের বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক ও শৈলী কতটা সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য এখানে খ্রীস্টীয় শিল্পকলা আমার বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু খানিকটা জোর দিয়েই বলা যায়, দৃশ্যমান বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে এই অভিমত এবং শিল্পকলার দিক থেকে বিশ্বজগতের এই ব্যাখ্যা, অন্তত ভারতশিল্পের ক্ষেত্রে, নেহাতই তত্ত্বগত ও ঐতিহাসিকভাবে সমর্থন করা যায় না। প্রতিরূপত্বের নীতি এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জড়বাদী ব্যাখ্যা প্রশ্রয় পায় নি, শুধু এই নেতিবাচক যুক্তিতে উভয় শিল্পের জ্ঞাতিত্ব প্রমাণও হয়না। রূপকল্পনার দিক থেকে দুই শিল্পধারায় দৃশ্যমান বিশ্বজগতকে পৃথকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানশিল্পে এই অর্থে রূপকল্পনাকে আদর্শায়িত বলা যায় যে পুরোহিততন্ত্রের বিধান-নিয়ন্ত্রিত শিল্পী-মনের ভাবনা-ধারণাগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রূপগুলি উদ্ভাবিত। ভারতশিল্পের রূপকল্পনাও আদর্শায়িত, কিন্তু ভারতীয় শিল্পীরা মুখাকৃতি ও অবয়বের অনুপুঙ্খ বিন্যাস অবধি রূপাদর্শ আহরণ করেছেন প্রকৃতি থেকে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাজে অন্তত এরই প্রমাণ মেলে। বিশেষত তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে প্রাসঙ্গিক প্রাকৃত-বস্তুর ছন্দ ও রস বা প্রাণরস আকর্ষণ করে নিয়েছেন। ভারতশিল্পও প্রতিরূপধর্মী নয়, আদর্শায়িত। তবুও বিশ্বের দৃশ্যমান রূপকে এ-শিল্পে অস্বীকার করা হয়নি। বরং আদর্শায়িতভাবে হলেও ভারতশিল্পে রয়েছে জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির ছন্দের ও সামঞ্জস্যের -তথা সৃষ্টিময়তার তাৎপর্য উন্মোচনের প্রয়াস। আমার আশঙ্কা, জীবন-ভাবনায় যাজকোচিত ও পণ্ডিত-মনস্ক হওয়ায় কুমারস্বামী ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানশিল্পের এই বৈসাদৃশ্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ, শিল্প ও জীবনের এবং শিল্প ও প্রকৃতির সম্পর্ক বিষয়ে উভয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর কাছে অস্পষ্ট রয়ে গেছে, হয়তো বা ভুলই বুঝেছেন। আমি না ভেবে পারি না, কোনো-না-কোনো ভাবে কুমারস্বামীর মধ্যে একটা অযৌক্তিক অন্ধকারাচ্ছন্নতা রয়ে গেছে, যার ফলে ভারতশিল্পের একান্ত শাস্ত্রসম্মত প্রতিমারও রেখাবিন্যাস ও পেশলতায় অঙ্গীকৃত জীবনধর্ম ও ইন্দ্রিয়ময়তার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে নি। মধ্যযুগীয়

খ্রীস্টান প্রতিমাশিল্পে যা তিনি দেখে এসেছেন, সে-বিষয়ে যা ভেবে এসেছেন—তার সঙ্গে ভারতশিল্পের এই বৈশিষ্ট্যের মিল নেই বলে, অথবা ইতিমধ্যে যাঁকে তিনি গুরু মেনেছেন সেই এক্‌হার্ট-এর (১২৬০—১৩২৮) অতীন্দ্রিয়বাদী দর্শন ও শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি নেই বলে হয়ত ভারতশিল্পের এ-বৈশিষ্ট্য তাঁর অগোচর রয়ে গেছে। প্রতিরূপত্বের নীতি মানা হয় নি—শুধুই এই যুক্তিতে কুমারস্বামী যেভাবে পরম্পরাগত ভারতশিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান শিল্পের মধ্যে মিল দেখিয়েছেন, তাও উভয় ধারার জটিল সাংস্কৃতিক ও শিল্পগত পরিস্থিতির অতিসরলীকরণ।

পরম্পরাগত ভারতীয় সমাজ ও শিল্প এবং মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজ ও শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য প্রতিপাদনের পক্ষে কুমারস্বামীর তৃতীয় যুক্তির ভিত্তি, এই দুই সমাজে প্রতিভাত জীবনের অখণ্ডতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা। তাঁর এ-ধারণা অভ্রান্ত। এ-ধারণার তাৎপর্য: তত্ত্বগতভাবে অন্তত বহুমুখী জীবনধারার বিভিন্ন দিকের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও সংহতি বজায় ছিল। জীবনযাত্রার বহুদিকের মধ্যে অন্যতম শিল্পক্রিয়ার স্বকীয় সামাজিক উপযোগিতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু শিল্পক্রিয়া অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজে জীবন ও শিল্পে এই একাত্মকতার ধারণা প্রাধান্য পায় এবং এই ধারণার ভিত্তিতেই মধ্যযুগের মহান অতীন্দ্রিয়বাদী মনীষী এক্‌হার্ট তাঁর শিল্পতত্ত্ব সংগঠন করেন। কুমারস্বামীর রচনা থেকেই আমরা জানি, এক্‌হার্টকে তিনি গুরুর মতো মান্য করতেন। বস্তুত তিনি এক্‌হার্ট-এর শিল্পতত্ত্বের সঙ্গে উনিশ শতকীয় ভাববাদী দার্শনিকদের এবং মনোবিদ্যাবিৎ কার্ল ইয়ুঙ-এর ধারণাসমূহ সংযুক্ত করে জীবনের অখণ্ডতা বিষয়ক তত্ত্বটি আরো জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। ইয়ুঙ পুরাণ, স্বপ্ন ও শিল্প এবং মানব-ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতা বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন। মনে হয়, কুমারস্বামী ইয়ুঙ-এর তত্ত্ব থেকে চৈতন্যের অখণ্ডতা সম্পর্কিত ধারণা সংগ্রহ করেন এবং ভাবেন, মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজ ও শিল্পের মতোই পরম্পরাগত ভারতীয় সমাজ ও শিল্পও জীবনের অখণ্ডতা ও চৈতন্যের অখণ্ডতা—এই দুটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। চৈতন্যের অখণ্ডতা সম্পর্কে কুমারস্বামীর ধারণা এখানে বিচার করার প্রয়োজন নেই। তবে জীবন, শিল্প ও সমাজের অখণ্ডতার ধারণা যে ভারতীয় ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—এ-কথা সহজেই মেনে

নেওয়া যায়।

কিন্তু এই একটি ধারণার ঐক্য-সূত্রের উপরে নির্ভর করে দুই সমাজের বা দুই শিল্পধারার সমধর্মিতা সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। প্রথমত, জীবনের অখণ্ডতার ধারণা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সমাজে ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভাবনাহীন, দীক্ষিত ও অদীক্ষিত এই দুই স্পষ্ট ভাগ ছিল। ভারতীয় সমাজে এ-ধরনের স্পষ্ট ভেদ কখনো ছিল না। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান শিল্প-বিষয়বস্তুর দিক থেকে ঈশ্বর ও দেবদূত, সন্ত ও পয়গম্বর এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত পুরাণ-কাহিনী ভিন্ন আর-সব কিছু বর্জন করে চলেছে। অন্যপক্ষে ভারতশিল্পে কিছুই বর্জন করা হয় নি, দেব-দেবী সাধু-ঋষি মিলে-মিশে আছে দুর্বৃত্ত ও বারবনিতাদের সঙ্গে। তাদের আচার-ব্যবহার সাধারণ মানুষেরই মতো, তেমন কিছু মহিমান্বিত নয়। শিল্পে তাদের যে-রূপ দেখি তা রক্তমাংসের সজীবতায় প্রাণবন্ত। উপস্থাপনার দিক থেকে প্রতিমাগুলি আদর্শায়িত ঠিকই, কিন্তু কখনোই একান্তভাবে শিল্পীর ধ্যানধৃত ও অপরের উপলব্ধির অতীত কোনো আদর্শের উপস্থাপনা নয়। দৃশ্যমান পার্থিব জগতে যা কিছু বাস্তব—তারই আদর্শায়ন। যেমন, ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট সারনাথের বুদ্ধ, কিংবা সত্তার বিভিন্ন আয়তন-দ্যোতক এলিফ্যান্টার ত্রিমূর্তির ধারণা নিশ্চয়ই মননলভ্য, কিন্তু শিল্পের মূর্তরূপে উপস্থাপনার দিক থেকে দুটি দৃষ্টান্তই পার্থিব বাস্তব জীবননির্ভর, বাস্তব জীবনের স্মারক। এ কোনো সন্ত-পুরোহিত বা পণ্ডিত চিন্তাবিদ্ বা বৃত্তিধারী মূর্তি-নির্মাতার আদর্শলব্ধ রূপ নয়।

কুমারস্বামী প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত মানুষ; প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মূর্তিবিদ্যা চর্চা ও শিল্প-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর সমকালীন অধিকাংশের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক বেশি জ্ঞানী, সংবেদনা ও বোধশক্তির অধিকারী। তিনি ভালো ভাবেই জানতেন যে এমন একটি মতবাদ আশ্রয় করেছেন, যা যুক্তির পথে প্রমাণ করা সহজ নয়। তিনি তাই যুক্তিমার্গ এড়িয়ে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির দিক থেকে তাঁর মত ব্যাখ্যা করতেন। কুমারস্বামী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, প্রকৃতিতে, অর্থাৎ বস্তুবিশ্বে বা দৃশ্যমান চরাচরে যা কিছু আমরা দেখি, তার রূপান্তরণ প্রক্রিয়া একটি মানসবৃত্তি বা জ্ঞানবৃত্তির ব্যাপার। যে মতাদর্শ তাঁকে এই অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিল, তা শুধু বিষয়ীগত—সাব্‌জেক্‌টিভ নয়, অতীন্দ্রিয়বাদীও বটে। তিনি বলেন, শিল্পীর

আঁকাড়া উপাদান যে বিশ্বপ্রকৃতি, সে বহির্বিশ্ব নয়। সে প্রকৃতি প্লেটো কল্পিত ভাব-ধৃত বিশ্বের অনুরূপ, দৃশ্যমান জগতের অতীত এ সত্তা, এবং শিল্পী আপন মানসলোকে এই বিশ্ব নির্মাণ করে তোলেন। অন্যভাবে বলা যায়, কুমারস্বামী বিশ্বপ্রকৃতিকে এক অতিপ্রাকৃত তাৎপর্যে এবং শিল্পীর মানসধৃত পরাবিদ্যাগত সত্তারূপে গ্রহণ করেন।

কিন্তু মানসধৃত এই বিমূর্ত ধারণাকে শিল্পী কীভাবে প্রত্যক্ষ, দৃশ্যমান শিল্পসামগ্রীতে রূপায়িত করেন? ভারতীয় শিল্পীদের সম্পর্কে এ প্রশ্নের উত্তরে কুমারস্বামী 'যোগ' ও 'ধ্যান'-এর প্রসঙ্গ তোলেন। বলেন, যোগে ও ধ্যানে শিল্পীরা পরাবিদ্যাগত সত্তা সাক্ষাৎকার করেন এবং সেই সত্তাকে মূর্ত করে তোলেন। সৃজিত শিল্পরূপ মাত্রেই তাই অন্তরতর ভাবাদর্শের বহির্রূপায়ণ। শিল্প-সৃজন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে কুমারস্বামী বারবার 'যোগ' ও 'ধ্যান' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন এবং শব্দ দুটি সম্পর্কে তাঁর অভিপ্রেত ব্যাখ্যার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

প্রকৃতি সম্পর্কে এবং শিল্পে প্রকৃতির রূপান্তর, তথা শিল্প-সৃজন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কুমারস্বামীর ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ায় গুরুতর অসুবিধে আছে। আমি এখানে নব্য-প্লেটোপন্থীদের ভাববাদী তত্ত্বের দুর্বলতা বা শিল্প-সৃজন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় কুমারস্বামীর আরও আপত্তিকর অতীন্দ্রিয়বাদী ও গুহ্য-রহস্যবাদী (esoteric) মত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন আপাতত তুলছি না। কিন্তু জগৎব্যাপার দৃশ্যমান চরাচরের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত একটি ধারণা মাত্র, একটি পরাবিদ্যাগত সত্তা মাত্র—আমাদের অলংকার-শাস্ত্র ও শিল্প-শাস্ত্র বা শিল্প-সৃষ্টি ব্যাখ্যায় কাজে আসে এমন কোনো শাস্ত্রে কোথাও এ-জাতীয় কোনো প্রমাণ আছে কিনা—সে বিষয়ে শিল্প-ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই মনে সন্দেহ জাগবে। ভারতীয়রা অতীন্দ্রিয়বাদী বা গুহ্য-রহস্যবাদী তাৎপর্যের কোনো ধ্যানদৃষ্টি **'a highly specialized technique of vision'** আয়ত্ত করেছিল—এমন কোনো প্রমাণও পাই নি। তত্ত্বভাবনা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের প্রসঙ্গে আমরা 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি ঠিক-ই, কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'দর্শন' বলতে বোঝায় মানস-অবলোকনের প্রক্রিয়া ও তার ফলাফল। কুমারস্বামী যেভাবে তাঁর যুক্তি দাঁড় করান, পরম-সত্তা বিষয়ে সেই বুদ্ধিলভ্য জ্ঞান 'দর্শন'-এর তাৎপর্য নয়। 'দর্শন' বলতে বোঝায় পরম-সত্তার অপরোক্ষ উপলব্ধি। তাছাড়া আদি-থেরবাদ ও শঙ্কর-বেদান্ত মত ভিন্ন আর কোথাও দৃশ্যমান চরাচর মিথ্যা, মায়াত্মক এবং সত্তা শুধু ধারণা-ধৃত—এমন উল্লেখ দেখা যায় না। গোঁড়া

থেরবাদী বা বৈদান্তিকের তো শিল্প সম্পর্কে বা কোনো মূর্ত রূপ সম্পর্কেই কিছুমাত্র আগ্রহ থাকতে পাবে না। থেববাদী ও বৈদান্তিক মত ভিন্ন আব-সব মতবাদে ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে ঐশ্বর্যে-বৈচিত্র্যে ভরা এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে জীবনেব সত্য বলে মানা হয। স্বীকার কবা হয, আব সব কিছুব মতো মানুষও বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ এবং সব প্রাকৃত বিষয আপন আপন ছন্দ ও ভাব (বা বস) অনুযায়ী শিল্পে রূপান্তবিত হতে পাবে। এইদিক থেকেই মানুষ, প্রকৃতি ও অন্য সব চেতন-সত্তাব মধ্যে সঙ্গতি ও ঐক্য উপলব্ধি কবা হযেছে।

তাই, প্রকৃতি একটি ধারণা মাত্র এবং শিল্প 'যোগে' ও 'ধ্যানে' দেখা বিমূর্ত মানস-প্রতিমাব বহির্ঙ্গপাযণ—ভাবতীয ভাবনায কুমারস্বামীর এই ব্যাখ্যাব কোনো অনুমোদন পাওযা যায না। আমাদের শিল্পেব দৃষ্টান্তেও এই বক্তব্যেব কোনো প্রমাণ নেই। বিষয বা বস্তুব সঙ্গে সম্পর্কহীন ধারণা মাত্রেব অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁব, তথা নব্য-প্লেটোবাদীদের মতবাদের কোনো সমর্থন ভাবতীয নন্দনতত্ত্বে পাওযা যায না। আমাদের আলংকাবিকেরা বসেব অলৌকিকত্ব বা অনির্বচনীযত্ব বলতে তাব অসাধাবণত্ব ও ভাষাতীত সূক্ষ্মতাই বোঝান। রসকে অতীন্দ্রিয কোনো ব্যাপাব বলে দাবি কবেন না বা নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে কুমাবস্বামীর মতো **'uncaused spiritual activity'** বলেন না।

আমাদেব শিল্প-শাস্ত্র ও প্রতিমালক্ষণে প্রায়শ ব্যবহৃত 'যোগ' ও 'ধ্যান' শব্দ দুটি তুবীয অতীন্দ্রিয তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করতে গিযেই কুমারস্বামী মুস্কিলে পড়েন মনে হয। লক্ষ্য ও প্রযোগেব দিক থেকে সমার্থক এই শব্দ দুটিতে এমন মনোশাবীবিক নিবিষ্টতা বোঝায—যাব ফলে বিষযী ও বিষযেব, দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্যেব মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে না, বলা হয, এই 'যোগ' ও 'ধ্যান' এক তুবীয অতীন্দ্রিয আনন্দেব হেতু। একহার্টেব অনুগামী এবং শেষতম নব্য-প্লেটোপন্থী ভাববাদী কুমাবস্বামীব পক্ষে যোগ ও ধ্যানেব এই অতীন্দ্রিয তাৎপর্যে তীব্র আকর্ষণ বোধ কবাই স্বাভাবিক। শব্দ দুটিব যে ভিন্নতব তাৎপর্য আছে, ধর্মীযতা-বর্জিত মাটিব কাছাকাছি মানুষেব ব্যবহারেব পবম্পবায শব্দ দুটি যে-অর্থে প্রযুক্ত হযে এসেছে, কুমাবস্বামী তা উপেক্ষাই করেন। 'ধ্যানসে শুনিযে', 'ধ্যান তো লাগাইয়ে'—এ তো নিযত ব্যবহৃত প্রযোগ। শিক্ষকেবা ছাত্রদের সর্বদাই বলেন 'মনোযোগ' দাও—এ ভাবে

যোগ শব্দটিও সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত ভগবদ্‌গীতায় 'যোগ'-এর সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে, 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম' (২।৫০), 'কর্মে কুশলতাই যোগ'। কে না জানে, নিবিষ্টতা ও অভ্যাসে কুশলতা জন্মে। আমাদের শিল্প ও প্রতিমালক্ষণ সংক্রান্ত গ্রন্থে এই তাৎপর্যেই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ধ্যানেন কুর্বৎ' কথাটির সমাহিত হবার পরে [মূর্তি] নির্মাণ কর—এই পণ্ডিতি ব্যাখ্যা না করলেও চলে। দক্ষতার সঙ্গে নিষ্পন্ন কোনো তাৎপর্যপূর্ণ শিল্প-সামগ্রী সৃষ্টির সময়ে শিল্পী মাত্রেই যা করে থাকেন সেই নিবিষ্টতা অর্থে 'যোগ' শব্দটি গ্রহণ করাই যথেষ্ট।

পুরোহিত বা পণ্ডিতরা যে অতীন্দ্রিয়, গুহ্য-রহস্যময় ও অতিলৌকিক অর্থে 'যোগ' ও 'ধ্যান' শব্দ ব্যবহার করেন, রূপদক্ষরা কখনোই সে অর্থে ব্যবহার করেন না। পরম্পরাগত ভারতশিল্প—এমন কি মূর্তিশিল্পের ব্যাখ্যায় সে ভাবে এসব শব্দ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

এতক্ষণ যা বলা গেল, এবারে তার সারসংক্ষেপ করা যাক।

প্রথমত, ভারতশিল্প ও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানশিল্প ঐতিহ্যাশ্রিত ও ধর্মাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও দুই সমাজে ও দুই সমাজের জীবনদৃষ্টিতে অনেক প্রভেদ, ফলে দুটি শিল্পধারার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। পাশ্চাত্যের 'religion' এবং ভারতের 'ধর্ম' সমার্থক নয়, 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক।

দ্বিতীয়ত, পরম্পরাগত ভারতশিল্প ও ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় শিল্প প্রতিরূপ-ধর্মী ও বাস্তবধর্মী নয় ঠিকই, কিন্তু দৃশ্যমান চরাচর সম্পর্কে দুই সমাজের মনোভাবে মিল নেই, ফলে উভয় সমাজে উৎপন্ন শিল্পকলাও সমধর্মী নয়। বস্তুত পার্থিব জীবন এবং ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম জীবনের সম্পর্ক বিষয়ে দুই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পৃথক, তাই এই দুই সমাজে উৎপন্ন শিল্পকলা ভিন্নধর্মী না হয়ে পারে না। তাছাড়া ভারতীয় পরম্পরায় মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের মতো ধর্মাত্মা ও ধর্মভাবনাহীন, পবিত্র ও অপবিত্র প্রভৃতি ধারণার মধ্যে তেমন তীব্র প্রভেদ বা দ্বন্দ্ববিরোধ কখনো ছিল না, বস্তুত ভারতীয় পরম্পরায় তেমন কোনো প্রভেদ ছিল বলেই মনে হয় না।

এবং তৃতীয়ত, উভয় শিল্পে ধর্মীয় বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হলেও শিল্পীদের অতীন্দ্রিয় ও অতিলৌকিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে সে শিল্পের বিশ্লেষণ বা সৃজন-প্রক্রিয়াকে অতীন্দ্রিয় ও অতিলৌকিক ভাবে ব্যাখ্যা করা অবান্তর।

দুই

এই ভাষণের অর্ধেকের বেশি আমি কুমারস্বামী-প্রসঙ্গে বলেছি। আজকের উপলক্ষটিই তার একটি কারণ বটে; কিন্তু তার আরো একটি কারণ আছে। এই পদ্ধতিতে আমার পরবর্তী দুটি বক্তৃতার বিষয় সম্পর্কে আমার বক্তব্যটিকেও আমি একটু পরিষ্কার করে নিতে পারছিলাম—ভারতীয় শিল্পের কোনো অনুসন্ধিৎসু গবেষকই এ-নিয়ে কোনো-না-কোনো ভাবে ভাবিত না-হয়ে পারেন না।

কুমারস্বামী ঠিকই বলেছিলেন যে, সমস্ত পরম্পরাগত সমাজের মতোই পরম্পরাগত ভারতশিল্পেরও নিজস্ব ভূমিকা নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ, তা ছিল ব্যবহারিক। কোনো বিশেষ সমাজের কার্যকারিতা নানা ধরনের ও বিভিন্ন স্তরের হতে পারে। প্রাসঙ্গিক সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে এই বৃত্তিগুলোর বিকাশের ভূমিকায় শিল্পকে নিয়োজিত করা যেতে পারে। একদিকে যেমন এমন শিল্পবস্তু কল্পনা করা যায়, যা কোনো বিশেষ সময়ে ও কালে মানবজীবনের উন্নতির প্রয়াসে নিখাদ পরমানন্দের বিচ্ছিন্ন, নিঃস্বার্থ এবং চরম উদ্বোধনের প্রয়োজন মেটাতে পারে, তেমনি পাত্র, চাটু, পেয়ালা, ছুরি, তলোয়ার ও তার হাতল, পোষাক, অলঙ্কার ইত্যাদির মতো প্রাত্যহিক জীবনযাপনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেও শিল্পবস্তু রচনা করা যায়। মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতার সমস্ত স্তরসংলগ্ন কল্পনাযোগ্য শিল্পরীতির বিভিন্ন ধরন, আকৃতি, প্রতিমা এই দুই কোটির মাঝখানে থাকতে পারে। এমন কি, যখন কেউ শিল্প বলতে কোনো বিশেষ সমাজের ধর্মীয় প্রয়োজনের দাবি মেটানো বোঝেন (ধর্ম কথাটার আভিধানিক অর্থ মনে রেখেই), তখন তিনি কেবল একটি মাত্র স্তরে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট সক্রিয়তার কথা বলেন না। সেখানেও বিভিন্ন ধরনের, আকারের ও স্তরের সক্রিয় ভূমিকা থাকে।

একথা সকলেরই জানা, যে, সনাতন ভারতবর্ষে শিল্পকে ধর্ম ও ধর্মীয় পদ্ধতির কাজে ব্যবহার করা হতো ব্যাপকভাবে। এর কারণ খুঁজতে খুব বেশি দূর যেতে হবে না। জীবনযাত্রার কোনো বিশেষ ধরন, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় ধারার ধ্যান-ধারণা, প্রতীক-আচার, পুরাণ-কল্পকথা ও তার আচরণবিধি সমাজের গভীরে ব্যাপকভাবে চারিয়ে দিতে শিল্প হয়ে উঠতে পারে এক প্রকৃষ্ট অবলম্বন—শিল্পের লোকরঞ্জন ও সামাজিক সংশক্তিরই গুণে। সংস্কৃতির একটি স্তরে একটি শিল্পবস্তুকে যাদু-মাধ্যম রূপে, আর-একটি স্তরে পুরাণ বা পরিচিত প্রতীকের বর্ণনা-প্রসঙ্গে, ও আরো

কোনো তৃতীয় স্তরে কোনো তত্ত্বের বা এমন-কি তত্ত্ববিশ্বের বিগ্রহরূপে, বা আরো-কোনো চতুর্থ স্তরে ধ্যান বা নিদিধ্যাসনের অবলম্বন রূপে শুধুই কোনো যন্ত্র মাত্র বোঝাতে, ব্যবহার করা হয়েছে। এতেও শিল্পের সমস্ত ব্যবহার, উপযোগিতা ও কার্যকারিতা ফুরোয় না, আর এগুলো পরস্পর-বিচ্ছিন্নও নয়।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে শিল্পের ব্যাপক ব্যবহারের অর্থ এই নয় যে, 'ঐহিক' (সেক্যুলার) জীবনে এর কোনো ভূমিকা ছিল না। ধর্মীয় ও ঐহিক জীবনের ভেতরে কোনো বিভাগ বা বৈপরীত্য ভারতবর্ষে ঐতিহ্য-স্বীকৃত নয়, কিন্তু এই মুহূর্তে সে প্রশ্ন-বিচারে আমি যাচ্ছি না। এমন বহু প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সমস্ত শিল্পবিদ্যাই লোকায়ত জীবনে ব্যাপক পরিচিত ছিল এবং ধর্মজীবনের মতোই ঐহিকজীবনেও সমান সক্রিয়তায় ও গুরুত্বে শিল্পকে ব্যবহার করা হতো। তথাকথিত ধর্মীয় শিল্পকলা টিঁকে গিয়েছে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপাদান ব্যবহারের ফলে, কিন্তু তথাকথিত লোকায়ত শিল্পকলা তা হয় নি; হওয়ার কথাও নয়, কারণ মানুষও নশ্বর, তার পার্থিব উপকরণও নশ্বর। কিন্তু এমন বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যার জোরে বলা সম্ভব যে শিল্প, শুধু গার্হস্থ্য হস্তশিল্পই নয়, অপরিহার্য সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হতো; বিনোদন, আমোদ ও উপভোগের জন্য যেমন, তেমনি জীবনের মূল্য বাড়াতেও তার চর্চা চলত।

প্রেম, ভালোবাসা, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, উপকথা, রূপকথা ও মানুষের নানা রীরত্বের সঙ্গে যুক্ত এই সব শিল্পের অধিকাংশই ছিল ধর্মাতিরিক্ত। এই শিল্পকলার কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য ভরত ও পরবর্তী আলংকারিকদের লেখায় বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্-এ ও আমাদের কাব্যনীতি-বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থগুলোতে ইঙ্গিত আছে যে, ভারতবর্ষের উত্তর-খ্রীস্টীয় নাগরিক সমাজে একধরনের শিল্পসাহিত্যের সমঝদার শ্রেণী তৈরি হয়েছিল, যাঁরা শিল্পকে ধর্মাতিরিক্ত, সামাজিক জীবনে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপভোগ ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। আমাদের সনাতন সৃজনশীল সাহিত্য পাঠ করলে বোঝা যায়, ভারতবর্ষের মানুষ পরম্পরাগতভাবে মঞ্চশিল্প ও মঞ্চবহির্ভূতশিল্প, দুয়ের ভেতরেই এমন এক ফলপ্রসূ মাধ্যম পেয়েছিল যার সাহায্যে সে তার ইন্দ্রিয় ও বোধকে তুষ্ট করতে পারত, চিত্ত ও মনের রসদ জোগাতে পারত, যুগিয়ে নিজেকে সতেজ ও সক্রিয় রাখার অবকাশ পেত। শিল্পের কার্যকরী মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের

চিত্ত, কল্পনা ও মনকে প্রভাবিত ও শিক্ষিত করে তোলা যায়, এই সামাজিক উপলব্ধির ফলে শিল্পকে সেই কাজে লাগানো হতো। তাই সনাতন ভারত-শিল্প কখনোই বিচ্ছিন্ন অর্থে ধর্মীয় ছিল না—তত্ত্বগত দিক থেকেও নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও নয়।

ভারতশিল্পের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক চারিত্র প্রমান করবার ব্যগ্রতায় কুমারস্বামী বলেছিলেন, এই শিল্পকলা কোনোদিন মানবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি অনুসারী হয়ে উঠতে চায় নি, তাই, শিল্পবস্তুর বাহ্যরূপের কোনো গুরুত্ব নেই। এর প্রকৃত গুরুত্ব তাঁর মতে, এর পবিত্রক অর্থে, আধ্যাত্মিক আদর্শে। এখানেও, কুমারস্বামীর সিদ্ধান্ত তথ্য ও ঐতিহাসিক প্রমাণের নিরিখে টেঁকে না। বরঞ্চ, প্রাপ্য তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এর বিপরীত সিদ্ধান্তেই পৌঁছুনো সম্ভব। বলা হয়েছে যে, একটি শিল্পবস্তুকে যত বেশি মাত্রায় সম্ভব লোকরঞ্জন করতে হবে, খুব প্রাথমিক স্তরের হলেও, একধরনের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেতেই হবে তাকে। শিল্পের বাহ্যরূপই প্রত্যক্ষভাবে মানবিক অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে, তাই একে আকর্ষণীয় হতে হবে। ভারতবর্ষে শিল্পের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা-নির্ধারণ ও বিষয় বিন্যাসের প্রথম প্রয়াসে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-এ শিল্প সম্পর্কে প্রাচীনতম আলোচনায়, জোর দেওয়া হয়েছে ছন্দের ওপর। এই বৈদিক শব্দটি দিয়ে, অর্থ, মাত্রা, অনুপাত, সমতা ও ছন্দ সবকিছুই বোঝাত। ঐতরেয়-র ঐ একই অংশে বলা আছে, যে, শিল্পসৃষ্টিকে প্রকৃতির নিয়মানুগ হতে হবে, তার মানেই ছন্দের নিয়ম। প্রাচীন কাব্যতাত্ত্বিকদের অলঙ্কারশাস্ত্রে শিল্পের অবয়ব, অর্থাৎ 'শরীর'-এর উপর জোর দেয়া হয়েছে অর্থাৎ একটির কবিতা বা নাটকের নির্দিষ্ট আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ বা ভরতের নাট্যশাস্ত্র, কিংবা বাৎস্যায়নের কামসূত্রম্ (ষড়ঙ্গের তত্ত্ব)-এর মতো শিল্প ও সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ শিল্পের আঙ্গিক গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নত ও উন্নত, ক্ষয় ও বৃদ্ধি, রেখা ও বর্তনা, বিন্দুজ ও পত্রজ রেখাবিন্যাস, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, রূপভেদ ও প্রমাণানি, সাদৃশ্যম্ ও বর্ণিকাভঙ্গম্ এবং শিল্পবস্তুর বাহ্যরূপের সঙ্গে যুক্ত এরকম আরো নানা উপাদানের উল্লেখও করেছেন তাঁরা। উত্তরকালে, নবম শতাব্দী থেকে শুরু করে, 'নবীন'-এরা বা নতুন তাত্ত্বিকেরা শিল্পের আত্মা বা উদ্দেশ্য ও নিহিতার্থ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁরা কখনোই শিল্পের বাহ্যরূপের গুরুত্ব ভোলেন নি; কারণ তাঁরা জানতেন যে, শিল্পবস্তুকে হয়ে উঠতে হবে মনোহর—যা হৃদয়কে

হরণ করে, নয়নানন্দকর—যা দৃষ্টির আরাম, চিত্তচমৎকার—যা চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে ; শোভা, ভাব, লাবণ্য, এবং রস (ভরত-এর মতানুযায়ী শারীরিক উপাদান হিশেবে জীবনরস, আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্ত-এর অর্থে নয়), অর্থাৎ সৌন্দর্য, অনুভূতি, সৌষ্ঠব ও অপরিহার্য জীবনরসে জারিত হতে হবে সেই শিল্পবস্তুকে। আত্মা অর্থাৎ শিল্পবস্তুর পারমার্থিক উপাদান, যা তার নিহিত নান্দনিক অর্থ, তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হলেও, শিল্পের বাহ্যরূপকে কখনোই অবহেলা করা হয়নি, অন্তত ভারতবর্ষের শিল্প-ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলোতে কখনোই নয়। কল্পনাই করা যায় না যে, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের কোনো এক সারনাথ বুদ্ধের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা শিল্পের নমনীয় বাহ্য-উপাদানের মসৃণ ও পেলব, ব্যাপক ও উজ্জ্বল বিন্যাস ছাড়া মূর্ত করা যেত ; অথবা নটরাজ-মূর্তির মহাজাগতিক নৃত্যের গতিময়তায় নিহিত অবিরত অস্থিতির বিমূর্ত ভাবনাকে শিল্পবস্তুর রৈখিক গতির ভাষা ছাড়া প্রকাশ করা যেত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, শিল্পের বাহ্যরূপের প্রতি কুমারস্বামীর উপেক্ষা হয়তো এসেছে মধ্যযুগীয় ইহুদি-খ্রীস্টীয় জীবনদর্শনলালিত মানবশরীরের মোহনরূপের প্রতি সাধারণ উপেক্ষা থেকে—স্পষ্ট ঘৃণা যদি নাও হয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রথম সাংগঠনিক পর্ব ছাড়া, ভারতীয় জীবনাদর্শে এই উপেক্ষা কখনোই স্থান পায় নি।

সে যাই হোক, এটা সত্য যে, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, সাধারণ অশিক্ষার জন্য ও ধর্মানুষ্ঠানের জনসংযোগশক্তির কারণে, প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সমাজ মঞ্চশিল্প ও মঞ্চবহির্ভূতশিল্পকে বিশেষ সামাজিক-ধর্মীয় ভাবনা ও বিশ্বাস, পুরাণ ও লোককথা, সংকেত ও প্রতীক, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করত। ভুলে গেলে চলবে না, যে-কোনো ঐতিহ্যাশ্রয়ী সমাজে ধর্ম হল প্রধান চালিকাশক্তি, ভারতবর্ষও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়। অন্যত্র আমি ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়া বিষয়ে বলেছি। তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও আমি অন্য কিছু প্রসঙ্গ উল্লেখ করব, যা ভারতবর্ষে ধর্ম ও শিল্পের নিবিড় সংযোগে সাহায্য করেছিল।

সভ্যতার প্রথম দিকেই মানুষ দেখেছিল যে, শিল্প তাকে একধরনের অনুপম শুদ্ধ সংবেদনার অভিজ্ঞতা দেয়। এই ধরনের আনন্দদায়ক উপলব্ধি নিশ্চয়ই লুব্ধকর এবং ইন্দ্রিয়সুখের তীব্র ও জরুরি প্রয়োজন মেটাতে শিল্পকে ব্যবহার করবার বিপদ এ থেকে আসতে পারে। উল্লাস, আনন্দ ও

আমোদের ভেতর পার্থক্য সূক্ষ্ম হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে একটার সঙ্গে অন্যটা গুলিয়ে ফেলা সম্ভব। নৈর্ব্যক্তিক ও নিরাসক্ত উল্লাস ও আনন্দের কোনো বস্তু তাই সহজেই সুলভ ইন্দ্রিয়সুখকর আমোদের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। তখন তার কোনো নান্দনিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য থাকে না। এইজন্য সমাজ নিজেকে বাঁচাতে শিল্পকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে চেয়েছে সেই ধর্মেরই সঙ্গে, যে-ধর্ম সমাজকে ধারণ করে রাখে ও জীবনযাপনকে সমৃদ্ধ করে তোলে। শিল্পের উদ্দেশ্য ও ভূমিকাও একই, এবং এই জন্যই শিল্প ও ধর্ম এত নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা।

ভারতীয় দর্শনচিন্তায় শিল্প ও ধর্মের এই অন্তরঙ্গ সংযোগের আরও কারণ বের করা হয়েছে। কোথাও বলা হয় নি, যে, শিল্প হল ধর্মের হাতিয়ার বা শিল্পের সঙ্গে ধর্মের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহজাত সংযোগ আছে। নানাভাবে আলংকারিকরা যা বলেছেন, তা হল, শিল্প বা নান্দনিক (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক) উপলব্ধি এবং ব্রহ্ম-'আস্বাদন' (অর্থাৎ ধর্মীয়) অনুভূতি হলো 'সহোদর', অর্থাৎ এই দুই অভিজ্ঞতা সদৃশ, কিন্তু এক নয়। বিশ্বের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ ও অব্যবহিত সম্পর্ক স্থাপনে মানুষের সহজাত প্রয়াসের বা বলা যায়, সত্তার মূলসন্ধানে অংশ নেবার ব্যগ্রতা ও অনুপ্রেরণা থেকেই এই দুই-এরই জন্ম। ভারতীয় দর্শনচিন্তার এটি সার কথা। ভারতীয় মননের মূলও এইখানেই। এই একাত্মতায় বিশ্বাস থেকেই মানুষ তার চিন্তা ও কর্মকে সত্তার এই অপরিহার্য মূলসন্ধানে নিয়োগ করে ও তাকে নিজের ভেতর উপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হয়। শিল্পের মতো, ধর্মেরও এইটে উদ্দেশ্য ও ভূমিকা। তাই উভয়েই ইচ্ছা, মনন ও আবেগ এই মানবিক বৃত্তিগুলো ব্যবহৃত হয় বা শিল্প, প্রতিমা ও অলংকার বিষয়ক লেখকগণ যে-সব আচার-অভ্যাসের কথা বলেন সেই ধ্যান, কর্মের একাগ্রতা এবং চিত্তের শান্ত মননশক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজনীয়।

কিন্তু সাদৃশ্য ও অভিন্নত্ব এক নয়। শিল্প ধর্ম নয়, ধর্মও শিল্প নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই দুই-এর ভেতর মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথমত, ধর্মীয় উদ্বোধন স্থায়ী; যখন কেউ সেই স্তরে পৌঁছুতে পারে, সেটা তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অখণ্ড অংশ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শিল্প বা নান্দনিক অভিজ্ঞতা অস্থায়ী; কোনো বস্তুর উপলক্ষে তা অনুভূত হয়, এবং সেই বস্তুর অবর্তমানে তা কতক্ষণ স্থায়ী হবে, বলা যায় না। এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির সংবেদনকে তীব্র করে, গভীর করে তোলে তার বীক্ষণ ও জীবনচেতনা; কিন্তু, ধর্মীয়

উদ্বোধনের মতো এই অভিজ্ঞতা কখনই চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অখণ্ড উপাদান হয়ে ওঠে না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের ভেতর অগ্রগণ্য ও কাশ্মীরী শৈববাদের প্রধান প্রবক্তা, অভিনবগুপ্ত দেখিয়েছেন, যে, ধর্মীয় উদ্বোধন ব্যক্তিকে জীবন থেকে দূরে নিয়ে যায়। ঐশ্বরিক শক্তির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তোলবার ব্যগ্রতায় নিবেদিতপ্রাণ ভক্ত প্রাত্যহিক জড়অস্তিত্বের বাস্তব প্রয়োজন, রূপ- ও নাম-সর্বস্ব জাগতিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে তোলে। ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড তাই এমন এক পরিণামের দিকে চালিত হয় যা এই ক্রিয়াকাণ্ডের পরিধির বাইরে। কিন্তু শিল্পক্রিয়ার সংস্রব মূলত এই অবয়ব- নাম-রূপ-সর্বস্ব, দৈনন্দিন জড়জীবনের সঙ্গেই। শিল্প বা নান্দনিক পরিণাম এই প্রক্রিয়া থেকেই জন্মায় ও সেই অর্থে স্বয়ম্ভব। তৃতীয়ত, ধর্মীয় উচ্ছ্বাস এক চরম আত্মবিস্মৃতির স্তরে নিয়ে যায়; নান্দনিক অভিজ্ঞতায় তা কখনো হয় না। শিল্পী বা পাঠক-শ্রোতা-দর্শক কেউই নান্দনিক উপলব্ধির চূড়ান্ত উচ্ছ্রিতিতেও জড়জীবন বিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন না। চতুর্থত, নান্দনিক উপলব্ধি জড়জীবনের ভেতরে থেকেই মানুষকে এক শুদ্ধ আনন্দের স্তরে উন্নীত করে, আর ধর্মীয় উদ্বোধন চূড়ান্ত পরিণতিতে জড়জীবনের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির (মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণের) দিকে নিয়ে যায়। দুয়ের অন্তিম পরিণাম তাই সম্পূর্ণ আলাদা।

ধর্ম যে শিল্প নয় এবং শিল্পও ধর্ম নয়, এই প্রতিপাদ্যকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রতিষ্ঠা করা যায়। আমি আগেই বলেছি, ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার যা কিছু আমরা পেয়েছি, তার অধিকাংশই ধর্মীয়; বিষয়ের দিক থেকে তাই কেউ বলতে পারেন যে, ভারতীয় শিল্প ধর্মীয়। কিন্তু শুধু বিষয় শিল্প নয়, শিল্প শুধু বিষয় নয়। শিল্প হল একটি নির্মাণ, একটি ক্রিয়া। আর বিষয় হল একটি বিবৃতি মাত্র—নিষ্ক্রিয় ও জড়। শিল্পী তার ওপর, তার সঙ্গে, কাজ করে তার ভেতর অর্থসঞ্চার করেন, তাকে জীবন্ত করেন, তাকে বাঙ্ময় করে তোলেন তাঁর ইচ্ছেমতো ঢঙে ও উপায়ে বা যে-ঢঙে ও উপায়ে তার কাছ থেকে কাজ চাওয়া হয় বা প্রত্যাশা করা হয়। এই ঢং, উপায় ও অর্থই হল আঙ্গিক বা নির্মিতি বা ফর্ম। এরই ভেতর নিহিত থাকে শিল্প যা ধর্মীয়ও নয় লোকায়তও নয়। শিল্পের এই আকারগত উপাদানকে, আঙ্গিককে, নির্মিতিকে যখন কেউ অবজ্ঞা করেন, তখন যা অবশিষ্ট থাকে, ধর্ম হিসেবে তা ভালো হতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম হবে শিল্পহীন। এবং সেকারণেই তা ধর্মীয় শিল্প হতে পারে না।

তিন

কুমারস্বামীর যে কোনো নিষ্ঠ পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে, তাঁর বক্তব্যের সমর্থন ও ব্যাখ্যায় ভারতীয়, প্রধানত সংস্কৃত ও পালি, উৎস থেকে শব্দ, ধারণা, তত্ত্ব ও মতবাদ যথেচ্ছ ব্যবহৃত হলেও যে-আদর্শ ও নিরিখে তিনি সনাতন ভারতীয় শিল্প বিচার, মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করেছেন, তা শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে সবৈব ইয়োরোপীয়ঃ উনিশশতকীয় ভাববাদ, ভিক্টোরীয় যন্ত্র-বিরোধিতা, নব্যপ্লেটোবাদ, মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় রহস্যবাদ অতিলৌকিকত্ববাদ, শিল্পে নবজাগরণ-মূল্যবোধ ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, সদর্থক বা নঞর্থক সব প্রসঙ্গেই তাঁর প্রসঙ্গসূত্র ইয়োরোপীয়। সেদিক থেকে, কুমারস্বামীই বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। জন্মসূত্রে আধা ভারতীয়-সিংহলী, শিক্ষাদীক্ষায় উনিশ-শতকের শেষদিককার ইংরেজি মূল্যবোধে লালিত, তাঁর ভেতর যেমন একদিকে প্রতিফলিত হয়েছিল সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের সাড়া-জাগানো ধারণা ও মতবাদ, আবার একই সঙ্গে বোধে ও অনুভূতিতে, এক আর্ত সুদূর-তৃষ্ণায় নিজেকে সনাতন ভারতীয় জীবন, কৃষ্টি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন, যাকে তিনি নিজের শিকড় বলে জানতেন।

আমি যে এতক্ষণ ধর্ম শব্দটি পশ্চিমী আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করেছি, তা অর্থহীন নয়। কুমারস্বামী নিজেও এই শব্দকে তার অতীন্দ্রিয়, অতি-লৌকিক ও পারমার্থিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখন আমি সনাতন ভারতীয় জীবনদর্শনের দিক থেকে এই ধর্মের স্থান ও ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। কুমারস্বামী অন্তত বুদ্ধিগতভাবে যে মত পোষণ করতেন, সেই ইয়োরোপীয় ব্যাখ্যা থেকে তা সম্পূর্ণ আলাদা। কুমারস্বামীর মতোই, আমি এই বিচারের চেষ্টা করব প্রাসঙ্গিক ভারতীয় শব্দ ও ধারণার ব্যাখ্যার মাধ্যমে, যেমন, চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) বা জীবনের চার সনাতন ভাগ , ঐহিক বা ইহলৌকিক এবং পারত্রিক বা পারলৌকিক—অর্থাৎ, পার্থিব এবং এই পৃথিবীর বাইরে লোকোত্তর কোনো জগৎ ; স্বার্থ ও পরার্থ, অর্থাৎ, নিজের ও অন্যের জন্য ; আধ্যাত্মিক, পরা-বিদ্যা ও অপরা-বিদ্যা। বলা বাহুল্য যে, এই বিচারে শিল্প ও ধর্মের প্রসঙ্গলগ্নই থাকব। এ বিষয়ে ভারতীয় চিন্তাধারা জটিল এবং তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। খুব দেরি করে হলেও, খ্রীস্টীয় যুগের শুরু থেকেই, প্রধান মতবাদগুলো দানা বাঁধতে থাকে। সেই দানা বাঁধা মতামতকে আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষে সামাজিক মানুষের পরম্পরাগত ক্রিয়াকলাপ মূলত তিন ভিন্ন

শ্রেণী বা বর্গে বিন্যস্ত। সেগুলো হল—ধর্ম, অর্থ, কাম। ধর্ম বলতে বোঝাত, সামাজিক-ধর্মীয় সক্রিয়তা—এই সক্রিয়তার অন্তর্গত ছিল প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-নিকেতন ও দেবস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক-ধর্মীয় সংগঠন, নির্দিষ্ট স্থান ও কালে তা সামাজিক ব্যবস্থাকেই রক্ষা করত। বাস্তব জীবনের বা আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ও সঞ্চালন বিষয়ক সমস্ত স্তর ও ধরনের কার্যকলাপ ছিল অর্থের আওতায়। মানুষের কল্পনা, বীক্ষা ও সৃজনীপ্সা থেকে যে-ক্রিয়ার জন্ম, এবং যা মানুষের চেতনা, সংবেদন, অনুভূতি, মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে, তা হল কাম। ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলোতে, অর্থ ও কামশাস্ত্রাবলিতে, মহাকাব্যে, ও পুরাণে ও বৌদ্ধ যাজকীয় ও অ-যাজকীয় অনুশাসনে আমাদের সমাজতাত্ত্বিকেরা সামাজিক মানুষের সম্ভাব্য ক্রিয়াকলাপের যে ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ করেছেন, সংক্ষেপে এইটেই তার সারাংশ। এই ব্যাখ্যা ও শ্রেণীবিভাগ আজও প্রাসঙ্গিক, যেমন হাজার-হাজার বছর আগেও ছিল।

এই বিভাগ অনুযায়ী ধর্মীয়-সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ধর্ম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামের ভেতর ধরা হতো সিসৃক্ষা বা সেই অর্থে (জননেচ্ছাসহ) সমস্ত শিল্পপ্রয়াস। ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্মের লক্ষণার্থ অনেক বেশি গুরুত্বের এবং ধর্মপ্রবৃত্তি তার একটা দিক মাত্র, এটা সহজেই বোঝা যাবে। সেই রকম কাম শুধু সম্ভোগ-প্রবৃত্তি বা রতি নয়—ইচ্ছা, বাসনা, কল্পনা, স্পৃহা, কামনা-সঞ্জাত সিসৃক্ষা এর অন্তর্গত। কেন বুদ্ধ যে-কোনো শিল্পপ্রয়াসের প্রতি পরাঙ্মুখ ছিলেন বা প্রথমদিকের জৈনরা শিল্পকে বাসনা-তুষ্টি মনে করতেন, যতি এবং মুনিদের পরিত্যাজ্য বলে উপদেশ দিতেন, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। বৈদান্তিকদের মনোভাব কিছুটা আলাদা হলেও শেষ পর্যন্ত একই অর্থ বোঝাত, কারণ শিল্প মায়া জগতের অন্তর্গত এবং মায়া কামেরই এক প্রতিশব্দমাত্র।

আমাদের জ্ঞানানুযায়ী, প্রাক্-খ্রীস্টীয় ভারতবর্ষ শুধু এই তিন শ্রেণীবিভাগের কথাই জানত। চলিত সংস্করণে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সময় নির্ণয় করা হয়েছে তৃতীয় বা চতুর্থ শতক। মৌর্যরাজত্বের পর্বকে এই বইয়ের উৎসকাল হিসেবে বলা হলেও, মূল রচনাটি খ্রীস্টীয় যুগের আরম্ভের আগে কখনোই হতে পারে না এবং এই মূল পাঠে কেবল ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই তিন বিভাগেরই উল্লেখ আছে। এ ছাড়া, পশ্চিম ভারতের গুহায় আবিষ্কৃত দ্বিতীয় শতকে দুটো উৎকীর্ণ লিপিতেও ত্রিবর্গ-এর উল্লেখ আছে, চতুর্বর্গ নয়। যদিও, মনে করা হয়, যে, কিছুকাল পরে, খ্রীস্টীয় যুগ শুরু হবার আগে

কখনোই নয়, পুরুষার্থ বা মোক্ষ, এই চতুর্থ উপাদান ইতিমধ্যে প্রচলিত ত্রিবর্গের অন্তর্গত হয়ে চতুর্বর্গ হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। এর ফলে, সনাতন ভারতীয় জীবনদর্শনে একটি নতুন উপাদান যুক্ত হয়, কারণ মোক্ষ বলতে সেইসব ক্রিয়া বোঝাত, যা মানুষকে জীবনের, বাসনার, কর্মের, পুনর্জন্ম ও মায়ার, নাম ও রূপসর্বস্ব পৃথিবীর বন্ধন থেকে, প্রকৃতপক্ষে, যত রকমের বন্ধন ভাবা যায়, তা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবে মোক্ষ (অসীম, ব্রহ্মণ্ বা আত্মনের সঙ্গে পরিপূর্ণ একাত্মতা) বা নির্বাণ (সমস্ত বাসনালুপ্তি) বা কৈবল্যের দিকে। শিল্পজগৎ বলতে যখন মায়া বা নাম-রূপ বা বাসনার জগৎ বোঝায়, তখন মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির কাছে অন্তত তত্ত্বগত দিক থেকে, শিল্পের কোনো উপযোগিতা নেই, শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কোনো প্রয়াসেই তার কোনো দরকার নেই। প্রকৃতপক্ষে, মোক্ষ, নির্বাণ, কৈবল্য ইত্যাদির জগৎ হল অরূপ, অ-শিল্পের, পরাবিদ্যক বিমূর্ততার ভুবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বলা যায়, অরূপরতনের আশায় রূপসাগরের গভীরে ডুব দেওয়া যায়। কিন্তু অরূপকে একবার পাওয়া হয়ে গেলে তুরীয় স্তরের হালকা বাতাসে রূপ লুপ্ত হয়ে যায়।

জীবনের আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকলাপের সনাতন শ্রেণীবিভাগের দৃষ্টিকোণ থেকেও এই সমস্যার বিচার সম্ভব। দুই স্থূল ভাগে এরা বিন্যস্ত: (ক) ঐহিক বা ইহলৌকিক, অর্থাৎ, এই পরিবর্তনশীল, নশ্বর, প্রাত্যহিক পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকলাপ; (খ) পারত্রিক বা পারলৌকিক, অর্থাৎ, এই নরজগৎ-উত্তীর্ণ এক মৃত্যুহীন, অপরিবর্তনীয় লোকান্তর-অভিমুখী লক্ষ, অভিলাষ ও ক্রিয়াকলাপ। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে যে, ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গাধীন যেসব মানবিক ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে, তারা স্পষ্টতই ঐহিক বা ইহলৌকিক পর্যায়ে পড়ে, কারণ এই সবই সামাজিক ক্রিয়াকর্ম এবং, শিল্পকর্ম, ধর্মবিশ্বাস, পূজাপাঠ ও ধ্যানমন্ত্র সমস্ত ক্রিয়াকলাপই এই নশ্বর, রূপনামের প্রাত্যহিক পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত। পশ্চিমী ধারণা অনুসারে এইসব ক্রিয়া, 'ধর্ম'-এর অন্তর্গত সামাজিক-ধর্মীয় কর্মাদি, হল লোকায়ত। ধর্মার্থকামবর্গের কর্মাবলির তুলনায়, মোক্ষ-বর্গের অন্তর্গত কার্যাদি স্পষ্টতই পারত্রিক বা পারলৌকিক শ্রেণীভুক্ত। ভারতীয় পরম্পরা অনুসারে, এগুলো হল অধ্যাত্ম বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ; ইচ্ছে করলে কেউ একে পারমার্থিকও বলতে পারেন, কিন্তু কখনোই 'ধর্মীয়' নয়।

এই যুক্তিকে আরও একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সমস্ত ঐহিক কার্যসাধন নিজের অথবা/এবং অন্যের প্রয়োজন, বাসনা এবং কৌতূহল মেটাতে —অর্থাৎ স্বার্থে বা পরার্থে ব্যবহৃত হয়; অন্য ভাষায়, এই সব কর্মপ্রয়াস সামাজিক মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় পরম্পরায় আরও এক ধরনের কর্মপ্রবৃত্তির উল্লেখ আছে—তা হল, পরমার্থ-সাধনা, অর্থাৎ জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ ও আকাঙ্ক্ষা অভিমুখী ক্রিয়াকলাপ, যাকে অন্তিম পারমার্থিক পরিণামের বিচারে ব্রহ্মণ বা আত্মন নির্বাণ বা শূন্য বা কৈবল্যের উপলব্ধি বলা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, শিল্পপ্রয়াস কখনই পরমার্থ-সাধন বলে বিবেচিত হয় নি।

তাই ভারতীয় সনাতন শিল্প ব্যাখ্যায় ইয়োরোপীয় প্রসঙ্গ ও নিরিখ ব্যবহার না করে যদি ভারতীয় ঐতিহ্যেই ফিরে আসতে হয়, তাহলে দেখা যাবে, 'রিলিজিয়ন'-কে ধর্ম বলে ধরলে, সনাতন ভারতীয় শিল্পে 'ধর্মীয়' ও 'লোকায়ত' বা 'পবিত্র' ও 'অপবিত্র'-এর ভেতর কোনো বিরোধ বা দ্বন্দ্ব নেই। শিল্প নিশ্চিতই লোকায়ত। কিন্তু ধর্মও তাই। কারণ দুই-ই ঐহিক বা ইহলৌকিক, অর্থাৎ, এই ক্ষয়িষ্ণু, প্রাত্যহিক, পরিবর্তনীয় পৃথিবী, বা সংসারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে, বৈদিক এবং ব্রাহ্মণ্য, পূজা ও প্রার্থনার বিধিতে মন্ত্রের মাধ্যমে সর্বদা কোনো ইচ্ছা বা বাসনা প্রকাশ করা হয়, যা ভক্ত পূরণ করতে চায়। এই সমস্ত প্রার্থনা ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, সেগুলো সবই অবধারিত পার্থিব কামনা বা বাসনা, একটি সুন্দরী স্ত্রীর অভিলাসসহ।

তাহলেও, সামাজিক মানুষের এইসব ঐহিক বা সাংসারিক ক্রিয়াকলাপের ভেতর পার্থক্যের স্তর বা মাত্রা লক্ষ করা যায়, প্রকারভেদ নয়। কাজের ভেতর থেকেই শিল্পকর্ম জন্ম নেয়। কিন্তু, যেহেতু তারা সবই সামাজিক ক্রিয়া, সেহেতু তারা সামাজিক, বা অন্য ভাষায় ধর্মের, প্রয়োজন চরিতার্থ করবার দিকে চালিত হয়, এইসব ক্রিয়া কখনো কখনো, মানবিক অভিজ্ঞতার উচ্চ, সূক্ষ্ম, উদ্বুদ্ধ স্তরের দিকে, বা যেমন উদাহরণ দেয়া যায়, সমস্ত বন্ধনমুক্তি বা মোক্ষের পরম উপলব্ধির অনির্বচনীয় উল্লাস বা আনন্দের দিকে, চালিত হতে পারে। এটা কদাচিৎ হয় এবং তা কোনো বিশেষ শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীর দক্ষতা, কুশলতা, দূরদৃষ্টি ও কল্পনার ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু উচ্চতর এই শিল্প-ক্রিয়ায় শিল্পকর্ম থেকে উৎসারিত অভিজ্ঞতাকে ধর্মীয় বলে বর্ণনা করলে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা নিশ্চয়ই ভুল। স্বঐতিহ্যে বিশ্বাসী একজন সৎ

ভারতীয় একে আধ্যাত্মিক বলে বর্ণনা করবেন, বা পশ্চিমী শব্দ ব্যবহার করলে, স্পিরিচুয়াল বলবেন। কিন্তু, সেই সূক্ষ্ম ও পরম অভিজ্ঞতার উপলব্ধিকে একজন ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিক অলৌকিক বলবেন—পারমার্থিক, বা পারত্রিক বা পারলৌকিক কখনোই নয়। মানুষের পক্ষে অধিগম্য চূড়ান্ত স্তরের অসাধারণ বিরল লৌকিক বা ঐহিক অভিজ্ঞতাই হল অলৌকিক উপলব্ধি। শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের অগ্রগণ্য ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌দের মতে এই উপলব্ধি ব্রহ্মণ্‌ বা আত্মন্‌, নির্বাণ বা শূন্য বা কৈবল্যের অভিজ্ঞতার সদৃশ, কিন্তু এক নয়।

প্রকৃতপক্ষে, আমার যতদূর মনে হয়, ধর্মীয় ও লোকায়তের ভেতরকার তথাকথিত দ্বন্দ্বের ধারণা এসেছে ধর্ম ও শিল্প সম্পর্কে ইহুদি-খ্রীস্টীয় ধারণার উনিশ শতকী ব্যাখ্যা থেকে। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ধরনের দ্বন্দ্বের কোনো অস্তিত্ব নেই—ধর্মেও নেই, শিল্পেও নেই।

চার

সনাতন ভারতীয় শিল্পকে যখন ধর্মীয় আখ্যা দেওয়া হয়, তখন এই শিল্পের অধিকাংশ বিষয়বস্তুর নিশ্চিত ধর্মীয় অনুষঙ্গই বোঝায়। প্রথমত, পরিমাণের দিক থেকে বলা যায়, অপেক্ষাকৃত স্থায়ী উপাদানে তৈরি এই শিল্পের প্রধান অংশের যে-ভাণ্ডার তার বিশেষ ধর্মীয় বা আধা-ধর্মীয় তাৎপর্য আছে। দ্বিতীয়ত, মন্দিরে বা মঠে, দেবালয়ে বা পবিত্র বেদিতে, কুলঙ্গিতে, ভিতর ও বাহির অলিন্দে উপস্থাপিত পুরাণ ও লৌকিক গাথা, প্রতীক ও সংকেত, মূর্তি ও প্রতিমাগুলো প্রধানত ভারতবর্ষের সমৃদ্ধ ধর্মকথা থেকেই গৃহীত। এবং তৃতীয়ত, সৌন্দর্যের দিক থেকে এই শিল্পের সব চাইতে অর্থপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট নিদর্শনের ভেতর এমন একটা চারিত্র আছে, যা ভারতবর্ষের উত্তুঙ্গ, পবিত্রতম, সূক্ষ্ম, মহান, পারমার্থিক ও সেই সঙ্গে নান্দনিক প্রচেষ্টার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকেই মূর্ত করে তুলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়ঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বেলেপাথরে তৈরি বুদ্ধ-বোধিসত্ত্বের মূর্তি, সপ্তম-অষ্টম শতকে গ্রানিট পাথরে খোদা এলিফান্টার মহেশমূর্তি, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের চিদম্বরমের শিব-নটরাজের ব্রোঞ্জমূর্তি। ব্যাপক অর্থে এই চারিত্র নির্ণয়ে কারও আপত্তি থাকবার কথা নয়, যদিও মধ্যযুগের পরের দিককার অধিকাংশ (সুলতানি, মুঘল, রাজস্থানি ও পাহাড়ি) চিত্রকলা ও স্থাপত্য এই সনাতন চারিত্রের বাইরে থেকে যাবে। তৎসত্ত্বেও

এই চারিত্রানিরূপণ সহজবোধ্য বলেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

কিন্তু, প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে, এখানে বিচার করা উচিত, শিল্পে এই চারিত্রের অর্থ কী, শিল্পের প্রসঙ্গে ধর্মীয় ধারণা আমরা কী অর্থ আরোপ করছি, কিংবা শিল্পের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নান্দনিক ও পারমার্থিক উপলব্ধির অন্বেষণের সঙ্গে, ধর্মকে এক করে দেওয়া হচ্ছে কি না। এই বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করতে গেলে, সনাতন ভারতীয় শিল্পকর্মকে তার নির্দিষ্ট স্থানকাল বা বলা যায় সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ ও যুক্তিনিষ্ঠভাবে বিচার করতে হবে। ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের অনুশাসনে-বিধানে তৈরি ভাববাদী পুথিপত্রের বিধান দিয়ে বিচার করলে চলবে না।

এই সব পুথিপত্র শুধু বিধানই থাকে—সৃষ্টি প্রক্রিয়া বা / এবং শিল্পকর্মের প্রকৃতি ও চারিত্র সম্পর্কে, কোনো অনুভব এ-সব বিধানে নিহিত নেই।

সবিস্তার বিচারের উপলক্ষ ও অবকাশ এটা নয়, তবুও আমাদের শিল্পে ধর্মের ভূমিকা ও সেই ধর্মের প্রকৃতির প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে বোঝবার সুবিধের জন্য কিছু সাধারণ মন্তব্য করা যেতে পারে। সাধারণ অর্থে, ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়া যখন কোনো ধর্মীয় শিল্প নেই, তখন শুধুমাত্র বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না—যদি না সেই বিষয়বস্তু শিল্পের আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করে।

গঠনমূলক শিল্পের দিক থেকে বলা যায়, চৈত্য, বিহার, স্তূপ ও বিভিন্ন ধরনের মন্দির প্রভৃতি নানা ধর্মীয় প্রাসাদ-প্রাকারের পরিকল্পনা ও নকশাতে নির্দিষ্ট ধর্মের ব্যবহারিক ও প্রতীকী বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিফলিত। বৌদ্ধ চৈত্যের ভিত্তি-পরিকল্পনা এবং উত্তর ভারতের সাধারণ শিখর-মন্দিরের প্রসঙ্গে আমি এই বিষয়টি সবিস্তারে অন্যত্র বিচার ও ব্যাখ্যা করেছি। যা বলেছি, তার পুনরাবৃত্তি না-করে বলা যায় যে, এইসব পরিকল্পনা বিশেষ বিশেষ ধর্মের সামাজিক-ধর্মীয় প্রয়োজন ও প্রতীকী বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্ধারিত হতো। স্তূপের দ্বার বা গোপুরম, প্রাকার ও প্রদক্ষিণ, শিখর ও বিমান, চৈত্যের সম্মুখভাগ ইত্যাদি খাড়া-গড়ন সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায়। বিশেষ বিশেষ ধর্মের আচারের প্রয়োজন ও প্রতীক-ব্যবহার ছাড়া, তাদের এই আকৃতি ও অবয়ব হতো না।

আমাদের ভাস্কর্য ও চিত্র-বিষয়ে একথা হয়তো বলা যাবে না। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে সারনাথের বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব মূর্তির মতো শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাদ দিলে, তৎকালীন সারনাথের বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য মূর্তির ভেতর বা পাল-বৌদ্ধ আমলের

বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান ব্রোঞ্জমূর্তি ও দণ্ডায়মান বিষ্ণুর ব্রাহ্মণ্য শিলামূর্তির মধ্যে রীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রহ্মণ্য ভাস্কর্য ও কুষাণ-মথুরার যক্ষরা আকারগত, ও অনেক সময়ে স্টাইলেও, মোটামুটি এক। একটি শৈব রাজস্থানি বা পাহাড়ি চিত্র এবং একই শ্রেণীগত একটি বৈষ্ণব চিত্রও আকারগতভাবে এক। অজন্তার মতো আমাদের কোনো ব্রহ্মণ্য দেয়ালচিত্র নেই, থাকলেও তারা যে আলাদা হতো, এরকম ভাববারও কোনো কারণ নেই। দক্ষিণ ভারতের একাধিক মন্দিরের দেয়ালে দশম-একাদশ শতকের ব্রহ্মণ্য দেয়ালচিত্রের নিদর্শন আছে; সেই সময়ের ইলোরাতে জৈন দেয়াল-চিত্র থেকে তারা খুব আলাদা নয়। পশ্চিম-ভারতীয় জৈন পুথিচিত্রের থেকে সমসাময়িক বৈষ্ণব নিদর্শনগুলোর খুব একটা পার্থক্য নেই।

কিন্তু, এতক্ষণ যা বলা হল, তা বোধ হয় সবটুকু সত্য নয়। পূজা ও প্রচারে বিভিন্ন ধর্মের ভেতরে আচারের পার্থক্য যদি বিশেষ বিশেষ শিল্পের চারিত্রকে প্রভাবিত না-করেও থাকে, বিশেষ বিশেষ ধর্মের তত্ত্ব তা করেছে। উদয়গিরি বরাহবতারের গতিময়, দুরূহ প্রাণশক্তি ও অবিস্মরণীয় কৌণিক প্রবল আক্রমণ, তার আকারের গুরুত্ব, সমসাময়িক বৌদ্ধ স্থাপত্যে অচিন্তনীয়। কারণ, বৌদ্ধধর্মে সেই যুগ ছিল অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর ভাববাদী বিজ্ঞানবাদের যুগ। সপ্তম-অষ্টম শতকের ইলোরা ও এলিফান্টার ব্রহ্মণ্য খোদাই-শিল্পের আকারগত উৎকর্ষ, চারিত্রের দীপ্ত গতিময় প্রাণ, সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ব বা উত্তরকালে ভারতবর্ষের কোনো স্থানের কোনো বৌদ্ধ স্থাপত্যে ভাবা যায় না। এমনকি পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের মথুরা ও সারনাথ বুদ্ধের মূর্তিগুলো ও সপ্তম-অষ্টম শতকের এলিফান্টার মহেশমূর্তিতে নিহিত শমতা, যোগ-সমাধি ও ধ্যানমগ্নতা মূল তাৎপর্যের দিক থেকেই পৃথক। সারনাথের ধ্যানী ও যোগী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলো এত পেলব ও সংবেদনশীল যে তারা শূন্য বা নির্বাণে লীন হয়ে যায় যেন, এত দীপ্ত যেন তারা বোধির অনন্ত আলোয় মিশে যাবে। অন্যদিকে, এলিফান্টার মহেশ মূর্তির যোগ ও ধ্যানে জীবনের জোরালো, নিশ্চিত, প্রবল দার্ঢ্য প্রতিফলিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনোপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ তারা।

এই প্রসঙ্গে আমি মতাদর্শের পার্থক্যের কথা বলেছি। কিন্তু এই মতাদর্শ কি ধর্মীয় ছিল? পশ্চিমী অর্থে ধর্ম-প্রসঙ্গে এর কোনো ভূমিকা আছে? বা বলা যায়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তি-দ্বারা, ধর্মবৃত্তি যার সামান্য একটা অংশ, কী তা নির্ধারিত হয়েছিল? তা হলে তো তা ভারতীয় ঐতিহ্য-

লালিত 'ধর্ম' দ্বারা ভারতীয় জীবনে অনুভূত ও অনুসৃত। এই প্রশ্নগুলোকে যাচাই না করে কেউ শিল্প পরম্পরার ধর্মীয় চারিত্র বিচার করতে পারেন না। ও আমাদের দেখতে হবে, বৌদ্ধ-ভাববাদ এবং স্মৃতি ও পুরাণের নব্য-ব্রাহ্মণবাদের দ্বন্দ্ব কোনো নিছক ধর্মীয় বিরোধ, না গভীর ও ব্যাপক তাত্ত্বিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্ন, যা শুধু বিষয়বস্তুতেই নয়, সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পের নির্মিতি ও আঙ্গিকেও প্রতিফলিত? শিল্পে এই দ্বন্দ্বের যে-ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা পারমার্থিক বা অতিলৌকিক নয়। উপলব্ধ অভিজ্ঞতায় ও দৃশ্যের বাস্তবতায় তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা সম্ভব হয়েছে তার সামাজিক-ধর্মীয় বাস্তবতার জন্য। সেটা একটা উপলব্ধ সত্য, মনের কল্পনা নয়।

মোটামুটিভাবে, ভারতীয় ভাস্কর্যের আদিপ্রয়াস প্রধানত বৌদ্ধ বিশ্বাস-পূজা ও আচারের সংকেত ও প্রতীকের, পুরাণ ও লোকগাথার নানা গভীরতা ও মাত্রার খোদাই-কাজ। এর আগে মৌর্য-শিল্প অবশ্যই ছিল, এবং তাতে প্রতীকী তাৎপর্য ও বিশালত্বের ব্যঞ্জনা থাকলেও, আকার ও মেজাজের দিক থেকে তারা সাধারণ ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে দূরে। একটু আগে উল্লিখিত, বৌদ্ধ (বা জৈন) বর্ণনামূলক খোদাইকাজে নিশ্চিতভাবেই বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিককার পুরাণ ও লোকগাথা, ধ্যান-ধারণার অনায়াস বোধগম্যতা, উপলব্ধি ও জ্ঞানের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, শিল্পকর্মের লক্ষ ও আদর্শ বরাবরই এক রয়ে গিয়েছে। কিন্তু বরহুত থেকে অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা এবং গোলি পর্যন্ত এই শিল্পবিকাশ লক্ষ করলে দেখা যাবে, ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন সামাজিক-আর্থনীতিক কারণেও, এই শিল্পের চরিত্র ও তাৎপর্য স্তরে স্তরে, বদলেছে। সুতরাং, বিষয়ের বদল হলেই আঙ্গিকের বদল হয় না; সমগ্র প্রক্রিয়া ও জীবনদর্শনের পরিবর্তনের ফলেই তা হয়। এবং বিলিজিয়ন তার একটি সামান্য অংশমাত্র।

ব্রহ্মণ্যবাদেও, চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে, তার মহাকাব্য, পুরাণ ও লোকগাথাকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য এই বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, প্রায় এই সময়েই, বর্ণনার এই ঢং-এর আকারগত বদল ঘটে যায়। প্রথম দিককার বৌদ্ধ খোদাই-কাজে বর্ণনার ধরন যেমন অনেকটা গল্প-বলার মতো ধারাবাহিক, পরের দিককার বর্ণনার ঢং তেমনি কিছুটা উপাখ্যানমূলক, বিচ্ছিন্ন, পৃথক-পৃথক ভাগে বিন্যস্ত। বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্যবাদী পুরাণ ও লোকগাথার প্রসঙ্গেই এটা সত্য, বেশি করে অষ্টম-নবম

শতকে। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। দক্ষিণ ভারতের আগেকার মধ্যযুগীয় কিছু মন্দিরে পৌরাণিক ও মহাকাব্যিক খোদাই-কাজের নিদর্শন আছে, কিন্তু তারা প্রচলিত রীতিকেই প্রতিষ্ঠা করে। যদিও, এই ক্ষেত্রে আখ্যান-বর্ণনার পদ্ধতি বদলের ফলে খোদাইয়ের আঙ্গিকের এই পার্থক্য পুরাণ বা লোকগাথার বিষয়ের কোনো বদল ঘটাতে পারে নি। যদি এই ব্যাখ্যা ঠিক হয়, তাহলে এর অর্থ কী? তার মানে কি এই যে, সামাজিক ব্যবহার বদলে গিয়েছে ও কিছু পুরাণ ও লোকগাথার মৃত্যু হয়েছে। অন্য কথায়, তারা কি প্রতিনিধিমূলক আচার ও বিগ্রহেই পরিণত হয়েছে কেবল? কোনো নান্দনিক নিহিতার্থ কি তাদের নেই?

ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলার এই বর্ণনামূলক দিককে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা বিষয় ও চারিত্রে প্রধানত বিগ্রহনির্ভর। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকে বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ও শক্তি বিগ্রহগুলো এবং পুরাণের দেবদেবীর মূর্তি-গুলো ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবদেবী ও তাঁদের ভক্ত ও আধা-ভক্ত সহচরবৃন্দ দেশের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোতে ক্রমশ ছড়িয়ে যান। প্রত্যেক দেবদেবী নিজেকে বিভিন্ন আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকে বিমূর্ত তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রতীক ও মূর্তরূপ, তাঁদের প্রতিটির পেছনে নির্দিষ্ট পুরাণ এবং ধ্যান ছিল এ-রকম ভাবেই তাঁরা জাহির হতেন। এইসমস্ত প্রত্যক্ষ প্রতীকী মূর্ততা প্রধানত নরকেন্দ্রিক আদলের ভেতরেই বিকশিত হয়, কিছু পশুকেন্দ্রিক মূর্তিও ছিল। তাঁরা তাঁদের সহচর, বাহন ও সবরকম অনুগামী, ত্রিভুবনের অধিবাসীবৃন্দ, অপ্সরা, কিন্নর ও উভয়লিঙ্গের গন্ধর্বগণ, অধীনস্থ ও সঙ্গী দেবগণ নিয়ে যে-কোনো জায়গায় প্রধান স্থান দখল করতেন। কিন্তু এই সব দেবদেবী থাকত মূল বিগ্রহমূর্তির খোদাইকে আরো স্পষ্টতা দিতে, প্রকট করতে। গঠনগত ভাবে ও তত্ত্বগত ভাবে প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের প্রথমদিককার (ও পরবর্তী তিন শতকের) প্রস্তর ও ব্রোঞ্জমূর্তি এবং পুথিচিত্র ছিল সম্প্রদায় বিগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট গাথা বিষয়ক। সন্দেহাতীতভাবে, এই বিগ্রহশিল্প মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় ইয়োরোপের শিল্পেরই অনুগামী। এই বিগ্রহশিল্পই প্রধানত কুমারস্বামীর মননে ও কল্পনায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। কারণ, এই শিল্পের ভেতর তিনি য়ুরোপের খ্রীস্টীয় বিগ্রহশিল্পের প্রতিতুলনা দেখেছিলেন। কেউ যখন অগণিত দেবদেবীর অগণিত মূর্তি দেখেন, তাদের অগণিত বিগ্রহ রূপ দেখেন কিন্তু সবই পুনরুক্তিপ্রবণ একই বিন্যাসে, তখন বিষয়ের

অর্থ ও গুরুত্বের প্রতি আর মনোযোগ থাকে না, তখন দেবদেবীর সীমাহীন রূপে, তাদের জন্ম ও বিবর্তনের বৃত্তান্তে, পৌরাণিক ও লোকগাথার সংসর্গে এবং বিমূর্ত চেতনার প্রকাশে মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এই বিগ্রহশিল্প বিষয়ে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দেবদেবীরা আমাদের ধর্মবৃত্তির মূলভাবকে প্রকাশ করে। মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িক জীবনদৃষ্টি ও খ্রীস্টীয় য়ুরোপের দর্শন এবং বিশেষভাবে একহার্টের রহস্যময় গুহ্য ও অতিলৌকিক দর্শনের প্রতি তাঁর আচ্ছন্নতায় কুমারস্বামী ভেবেছিলেন, এই বিগ্রহশিল্পই ভারতীয় ধর্মীয় উপলব্ধির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং যাজকীয় বিগ্রহশিল্পীরা এইসব বিগ্রহ নির্মাণের পেছনে যেসব বিমূর্ত ভাবশক্তির দাবি করতেন সেইগুলোই হল ভারতীয় মননের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

মনে হয়, ভারতীয় শিল্প, এমন কি এই বিগ্রহশিল্প, বোঝার ক্ষেত্রে, এটা দুর্ভাগ্যজনক। বিগ্রহবিদ্যা ও বিগ্রহতত্ত্বের কথা বাদ দিলেও, নান্দনিক ও পারমার্থিক নিদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ এই বিগ্রহশিল্পে যা আছে (সংখ্যায় প্রচুর) সেগুলির এক ব্যাপক ও গভীর মানবিক তাৎপর্য-সমন্বিত নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক আবেদন আছে। এই শিল্প মধ্যযুগীয় খ্রীস্টীয় শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের। প্রথমত, এইসব বিগ্রহে দেবভাবারোপণ, এমন কি পশুণভাবারোপও, মানবিক বা জান্তব আদলের বিমূর্ততা নয়, মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় শিল্পের মতো তাদের শারীরিক গড়ন ছাঁচে ঢালা নয়। প্রকৃতির বাস্তব আদলের ভাবগত প্রকাশ তারা। বিগ্রহের প্রচলিত বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন সত্ত্বেও এই সব মূর্তি আকারে এবং অবয়বে প্রাণবন্ত।—পেলব তরুণ, ইন্দ্রিয়বান ও নমনীয় শরীর, ভাষাময় মুখ, লাবণ্যময় ঠাট এবং সমান লাবণ্যময় ভঙ্গ ও ভঙ্গি। দেবদেবী বা দেবোপম বলে এরা পরিচিত হলেও, শরীরে মনে তীব্র মানবিকভাবে ওদের উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমস্ত মূর্তি আক্ষরিক অর্থে জীবন্ত; তারা জীবনের প্রতি বিশ্বাসে ও আসক্তিতে ভরপুর। এই দেবদেবীরা সদাপরিবর্তনশীল জীবনের আরও কাছে টেনে এনেছেন ভক্তদের। মধ্যযুগের খ্রীস্টীয় পুরাণ ও লোকগাথা, সাধু-সন্ন্যাসীরা তাঁদের ভক্তদের জীবন থেকে দূরে ঠেলে দেন। তৃতীয়ত, দেবদেবী, মুনি-ঋষিরা ভালোবাসেন, বিবাহ করেন, সন্তানাদি হয়, সংসার পাতেন। তাঁদের অনেকেই সপরিবারে উপস্থাপিত। প্রায়শই তাঁরা কামকলায় নিজেদের উপভোগ করেন। সামাজিক

নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে আরও নানা কার্যে লিপ্ত হন। তাঁরা খুব স্থূল আমোদেও যোগ দেন। সাধারণ মানুষের মতোই তাঁরা আনন্দ ও দুঃখ ভোগ করেন। তাঁরা রাগে ও ভয়ে কম্পিত হতেন। তাঁরা নাচ-গান পছন্দ করেন। একদিকে রাজারাজড়া, অন্যদিকে ভিখিরি, ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, নিরুদ্দিষ্ট নিচুতলার মানুষের সঙ্গেও মিশতেন। অন্য কোনো ধর্মাচরণে লোকায়ত জীবন এত উদার স্বাধীনতা ও ঘনিষ্ঠ মানবিক প্রাণশক্তি পায় নি। এই শিল্পের দেবদেবীরা তাঁদের ভুলভ্রান্তি নিয়ে ভালোবাসার পাত্রপাত্রী হয়ে ওঠেন। ভারতীয় পরম্পরায়, মানুষই নিজেদের দেবদেবী করে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেবতারাই মনে হয় তাঁদের স্বর্গীয় আবাস ছেড়ে এই পৃথিবীতে নেমে এসে মানুষের মতো আচরণ করছেন। মূলত ঐহিক,মানবিক এই লোকায়ত উপাদানই ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অন্বেষণের একটা দিক। ভারতীয় কবিরা বার বার এই কথার পুনরাবৃত্তি থেকে ক্ষান্ত হন নি। এই বিগ্রহশিল্প ভারতীয় জীবনের এইদিককেই প্রকাশ করে।

০

পরিচয়-এর আড্ডা

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

১৯৩৮

৭ জানুয়ারি

আজকের পরিচয়-এর বৈঠকে একজন নতুন লোককে দেখলাম। মুখে দাড়ি। মনে হল ইংরেজ ইহুদি। মাদ্রাজি ও মারাঠিদের সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। বোঝা গেল তিনি এই সব প্রদেশে অনেকদিন থেকেছেন, অনেক কিছু জানেন। তারপর কী কথায় বললেন, তিনি রোমান হরফের চ্যাম্পিয়ানদের বিরোধী। হিন্দি ও উর্দুকে তুলে দিয়ে রোমান হরফ প্রচলন হলে পশ্চিমী ও দক্ষিণী ভারতীয়দের মধ্যে সমঝওতা বাড়বে সে-কথা আদপেই বিশ্বাস করেন না। গানের কথা উঠতে বললেন, 'ভারতীয় সুর ও তাল অনেকটা সমতল-বাসিন্দা য়ুরোপীয়দের লোকসংগীতের মতো শোনায়।' হারীতদা তাঁকে গেয়ে শোনাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে সুধীন্দ্র অধীর হয়ে উঠছিলেন। তারপর যখন তিনি বললেন, 'কোন স্পেনের লোকসংগীত ভালো? যারা বোমা ফেলছে, না যারা বোমা খাচ্ছে'—তখন নীরব থাকতে না পেরে সুধীন্দ্র ফেটে পড়লেন, 'ইয়ু আর ইন্ এ ফ্রাইট্-ফুলি ব্রিলিয়ান্ট ফর্ম।'

কে-একজন নীরেনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এডিংটন-এর বক্তৃতা কেমন লাগল।' তিনি বললেন, 'খুব ভালো।' আমি বললাম, 'বাজে—ছায়াপথ থেকে হঠাৎ নক্ষত্রের মধ্যে কি আছে বলতে গিয়ে খেই হারিয়ে তারপর যখন ছায়াপথে ফিরে যান তখন আর সময় ছিল না।'

মেঘনাদ সাহার বক্তৃতার কয়েকটি কথা অনুকরণ করে সকলকে হাসিয়ে দিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'আই থ্যাঙ্ক, স্যার আর্থার ফর আণ্ডারটেকিং টু ডেলিভার দি স্পিচ।'

১৪ জানুয়ারি

আজকের 'পরিচয়'এর আসরে গিয়ে দেখি এত বড় ঘরে মাত্র চারজন বসে আছেন সুধীন্দ্র, অপূর্ব চন্দ, হেমেন্দ্রলাল ও সমর সেন। অপূর্ব ও হেমেন্দ্রর মধ্যে পাশ্চাত্য-সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। অপূর্ব বলছিলেন

তাঁর মতো রেকর্ডের সংগ্রহ খুব কম লোকেরই আছে—কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য রেকর্ডের দাম পাঁচ পাউণ্ড করে। লোক-সংগীতের বড় সংগ্রহ আছে। হেমেন্দ্র উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কয়েকজন গায়কের নাম শুনে বললেন তাঁরা পরিচিত। হাঙ্গেরিয়ান লোক-সংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আসক্তি। অপূর্ব বললেন, তিনি চারটি হাঙ্গেরিয়ান গানের রেকর্ড বারেবারে বাজিয়ে নষ্ট করে ফেলেছেন। এখন কেউ রেকর্ড চাইলে আর ধার দেন না।

একটা কথায় কোনো আপত্তি হল না দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অপূর্ব বললেন, 'পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীতের তুলনায় প্রাচ্যে কিছুই নেই।' হেমেন্দ্র সায় দিয়ে বললেন, 'তার কারণ আমরা গান বাজাই।'

সুধীন্দ্র বললেন, 'সংগীতে কি এমন কোনো নোট আছে যা চিরস্থায়ী—যা আয়ত্ত করা সকল যন্ত্রবাদকের লক্ষ্য।'

হেমেন্দ্র বললেন, 'স্থির কিছুই নয়—এই ধরুন না—বেহালা ও পিয়ানোর মধ্যে তফাত আছে—'

অপূর্ব বললেন, 'খোকা (সুধীন্দ্রর ডাক নাম) সাহিত্যের কথা ধরা যাক।'

চক্ষু নিমীলিত করে একটু হেসে সুধীন্দ্র বললেন, 'কবিতা পুরোপুরি মাত্রা ও ছন্দে বাঁধা।'

হেমেন্দ্র গদ্য-কাব্যের কথা তুললেন। সুধীন্দ্র বললেন 'গদ্য কবিতার ছন্দ আছে বই কি, তা না হলে ত কবিতাই হয় না। প্রতিটি বাংলা কাব্য হচ্ছে ছন্দের নিয়মে বাঁধা।' তিনি আরও বললেন যে তাঁর একটা থিওরি আছে যে বাংলা কাব্যের ভাষা উদ্ভব হয়েছে আরিয়া থেকে। অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে দেখালেন—তারপর পয়ার নিয়ে বিশ্লেষণ করলেন—আমার কাছে তাঁর ব্যাখ্যা জটিল হয়ে পড়ছিল।

শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল নিখুঁত খাঁটি সংগীত বলে কিছু হয় না। তবে কি, যা শুনতে ভালো লাগে তাই একমাত্র খাঁটি? ইতিমধ্যে সুশোভন এসেছিলেন। বললেন, ওস্তাদি গান তাঁর ভালো লাগে না। সমর সেন কিছু বললেন না, কিন্তু মন দিয়ে শুনছিলেন সব কথা। তাঁকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছিল। অপূর্ব আজকে কোনো হাল্কা কথা বলেন নি। সুধীন্দ্র যখন বললেন আর উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন যে বাংলাভাষায় একটা স্বাভাবিক ছন্দময় প্রবাহ আছে যা নিয়ন্ত্রিত—সে নিয়মবদ্ধতা অচেতন-লোক থেকে উৎসারিত, তখন অপূর্ব বললেন, তিনি রোজই নতুন কিছু শেখেন। সুশোভন উঠে পড়তে সভা ভঙ্গ হল।

২১ জানুয়ারি

আজ 'পরিচয়'-র আসরে অনেকে এসেছিলেন—প্রবোধ বাগচী, আইয়ুব, হুমায়ুন কবির, নীরেন, হেমেন্দ্র, সুমন্ত্র ও আর-একজন নতুন লোককে দেখলাম। তারপর হামফ্রে হাউস, তুলসী গোস্বামী, সাহেদ ও অপূর্ব চন্দ এলেন। সুধীন্দ্র ত ছিলেনই।

শেষের চারজন আসবার আগে আমরা সুন্দর-সুন্দর জায়গার গল্প করছিলাম। নীরেন বললেন, তিনি তাজমহল প্রথম দেখেন পূর্ণিমা রাতে। মনে হয়েছিল এত হাল্কা যে একটা পাখি এসে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে যেতে পারে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারেন স্থাপত্যের কৌশলে হাল্কা ও ভারি যুগপৎ দুইভাবেই প্রকাশ পায়। হেমেন্দ্রলাল বললেন, ফতেপুর সিক্রি ঢের বেশি আকর্ষণীয়। কবির বললেন, তার কারণ সে জায়গা নির্জন ও প্রশান্তিপূর্ণ। ভাবলাম হিরণ থাকলে ভালো হতো। তার মতো দেখবার চোখ কারও নেই।

সুধীন্দ্র বললেন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ চাই। তিনি নিজে সতের বছর বয়সে দেড় খানা বই শেষ করবার পরে আর কিছুই পড়েন নি, সুতরাং তাঁর নিজের লেখা সম্ভব নয়। নীরেন বললেন, তিনি তাঁর গ্রন্থ সমালোচনা করে বিরাগভাজন হয়েছেন; তাছাড়া তারপর আরো দুবার শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে লিখেছেন, অগত্যা আর কিছু লিখবার নেই।

দেখা গেল, সুধীন্দ্র শরৎচন্দ্রের রচনা না-পড়েই তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করেন। সোজা বলে দিলেন, 'আমি যদি লিখি তাহলে ভালো কথা কিছু বলব না।' সুধীন্দ্রর কাছে এই ধরনের অযৌক্তিক উক্তি শুনব আশা করিনি।

কে যেন বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তুললেন। হুমায়ুন সুধীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কি বঙ্কিম শতবার্ষিক সংকলনের জন্য কিছু লিখছেন? সুধীন্দ্র কিছু বলবার আগেই আইয়ুব বলে বসলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার উপরে কোনো দখল ছিল না।'

নীরেন বললেন, 'কী আশ্চর্য।' সুধীন্দ্র কিন্তু আইয়ুবের মন্তব্যে সায় দিলেন। আমি বললাম, 'বঙ্কিমচন্দ্র জমকালো কথার মালা গেঁথেছেন।' সুধীন্দ্র বললেন, 'তিনি ভালো গল্প বলতেন, কিন্তু তাঁর ভাষা ভালো ছিল না।' হুমায়ুন বললেন, 'ইন্দিরার ভাষা ভালো।' আর-একজন 'সীতারাম'-এর নাম করলেন। নীরেন এবার জোর দিয়ে বললেন, 'বিষবৃক্ষ' হচ্ছে মহৎ

গ্রন্থ। তারপর তিনি কবির-এর দিকে ফিরে বললেন, 'স্কট সম্বন্ধে আপনার কি মত? তাঁর ইংরেজি ভাষা কি স্লিপশড্ ছিল না?'

সুমন্ত্র আমার কানে কানে বললেন, 'এই তুলনা করার স্বভাবটা হচ্ছে আমাদের জাতীয় বদ-অভ্যাস। অনর্থক স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের তুলনা করা হয়।'

এরপর এলোমেলো গরম-গরম বাক্য বিনিময় হল কিছুক্ষণ। নতুন কিছু শিখলাম না। সুমন্ত্র বললেন, 'আপনি এত ভালো বাংলা লিখতে কোথায় শিখলেন? গতবারের "পুস্তক পরিচয়"-এর মুখবন্ধ পড়েই মুগ্ধ হয়েছি।' বললাম, 'ঠিক তার উল্টো মন্তব্য শুনেছি অন্যলোকের কাছে।' সুমন্ত্র তবু বললেন, আমার লেখার ভঙ্গি নাকি আশ্চর্য রকম প্রাণবন্ত। পরিশেষে আমি বললাম, 'লেখা এসে ঠেলা না দিলে আমি লিখি না।'

হাউস এসে মার্গ সংগীতের রাগ-রাগিনী সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। রাগের স্বর-বিন্যাসের মধ্যে গান রচনার কথা উঠতে বাংলা ভাষাকে সরাসার বাতিল করা হল স্বরবর্ণের উচ্চারণ-পদ্ধতির দোষে। 'তাছাড়া ব্যঞ্জন বর্ণের "স" শব্দটিকে নিয়ে মুশকিল', বললেন হেমেন্দ্রলাল। তিনি আরো বললেন, 'আধুনিক হিন্দি ভাষাও খাপ খাবে না।' উদাহরণস্বরূপ গেয়ে শোনালেন।

হেমেন্দ্রলাল-এর কথা বলবার ভঙ্গি আমার ভালো লাগে।

সাহেদ সুরাওয়ার্দি, অপূর্ব চন্দ ও তুলসী গোস্বামী ঢুকলেন ঝড়ের মতো। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, 'শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন তাঁর যে-সমর্থন দরকার তা তিনি পাবেন—তিনি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রেস্ট বদল করবেন না।'

তুলসীবাবুকে এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখলাম—তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আই উইশ টু গড দে স্টপ দি গ্রান্ট—আমরা দেখে নেব।'

এই শান্ত শিষ্ট অতি-ভদ্রলোকটিকে এত গরম হয়ে উঠতে আগে কখনো দেখিনি। তিনি আরও বললেন, 'যে-লোকের কথার কোনো মূল্য নেই—যাঁর আজকের কথা কাল থাকে না—দু-পেনিও দাম থাকে না, সেই ফজলুল হককে দেওয়া হয়েছে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।'

নীরেন বললেন, 'শ্যামাপ্রসাদ কি একদিক থেকে সমান দরের কপট নয়?'

নীরেনকে প্রকারান্তরে আঘাত দেবার জন্যেই বোধকরি সুধীন্দ্র বললেন,

'স্টালিন-এর মতো মানুষ কপট চূড়ামণি হয়েও কাজের ক্ষেত্রে দক্ষ, কিন্তু আমাদের হক সাহেবের ত কর্মক্ষমতাও নেই।'

অপূর্ব সরকারি গদির বড়-বড় চাঁইদের নাম করে তাঁদের দুষ্কর্মের তালিকা দিতে গেলে প্রবোধ বাগচী বললেন, 'য়ুনিভার্সিটি সম্পর্কে দুর্নীতির কথা সেনেটে তোলেন না কেন?'

সাহেদ বললেন, 'শ্যামাপ্রসাদের এইসব লম্ফঝম্পের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। তিনি জেনেছেন যে তাঁর পুনর্নিযুক্তির সম্ভাবনা নেই। আমি জানতে চাই—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার খাতা থেকে নাম তুলে দিয়ে কেবলমাত্র বোল নম্বর দিলে ক্ষতি কি ছিল? মুসলমান ছেলেরা যদি মনে করে যে হিন্দু পরীক্ষকেরা ইচ্ছে করে কম নম্বর দেয় তাহলে আর কি উপায় আছে?'

সেনেট-এর কথা উঠতে তুলসী গোস্বামী বলে উঠলেন, 'ড্যাম ডি পি আইকে কিসের জন্যে বোর্ডে নেওয়া হয়েছে?'

সভা ভাঙলে প্রবোধ বাগচী, হেমেন্দ্রলাল আর আমি এক সঙ্গে বেরিয়ে আসতে বাগচী তাঁর স্বাভাবিক নরম কণ্ঠে বললেন, 'এঁদের যত তম্বি এখানে—সেনেটে স্পষ্ট কথা বলার সাহস নেই।'

২৮ জানুয়ারি

আজকের আসর বসেছিল প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। সুধীন্দ্র কলকাতার বাইরে কোথাও গেছেন। হেমেন্দ্রলাল, জীবনদা আর প্রবোধবাবুকে বলছিলেন কেশরবাঈ-এর কথা। জীবনদার মুখে ছিল আলবোলার নল। তামাকের গন্ধ ভালো লাগল, কিন্তু কেন জানি না শব্দ মনে হল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইছে না। অনেকটা শব্দ করে খাওয়ার মতো তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আরাম করে ধীরে-সুস্থে টান দিলে বোধ করি বিরক্তিকর মনে হতো না। হেমেন বলছিলেন, অপূর্ববাবু তাঁকে গানের আসরে নিয়ে গিছলেন। গানের সঙ্গে সংগত ছিল তানপুরা আর সারেঙ্গি—অপূর্ব সে গান—'আমি যত নারী কণ্ঠ শুনেছি তার মধ্যে কেশরবাঈর কণ্ঠ হচ্ছে সব চেয়ে ভালো।'

জীবনদা বললেন, 'কোনো বাঙালি মেয়ের বড় গায়িকা হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে কি?'

'না, কাছাকাছিও নয়—'

'বীণা মুখার্জি ?'

'তার সম্ভাবনা বন্ধ হয়েছে বুড়ো ঠাকুর্দার দোষে—তাঁর প্রভাবে স্বাভাবিক প্রকাশ বাধা পায়—'

'মালা ও গীতা দাস আরও ভালো, কিন্তু মুসলমান শিল্পীদের তুলনায় অনেক নিরেস, একেবারে ভিন্ন শ্রেণীর।'

সাহেদ ও তুলসী গোঁসাই একসঙ্গে এলেন। কথা উঠল শ্রেষ্ঠ তবলচি কে ? কেউ কেউ বারাণসীর বীরু মিত্রের নাম করলেন। নীরেন বললেন, 'হীরু গাঙ্গুলী।' হেমেন্দ্র আপত্তি করলেন। তাঁর মতে, হীরু গাঙ্গুলী হচ্ছেন নিম্নশ্রেণীর বাদক।

সাহেদ-এর প্রাচ্য সংগীতের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হলাম। আমার ধারণা ছিল তিনি দীর্ঘদিন য়ুরোপে ও বিশেষ করে সেই সব দেশের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে পাশ্চাত্য সংগীতে বিশেষজ্ঞ হয়ে স্বদেশকে তুচ্ছ করে এসেছেন। আজ সে ভুল ভাঙল। তিনি আবদুল করিম ও ফায়াজ-এর তুলনামূলক ব্যাখ্যান দিয়ে মজার মজার গল্প বললেন। ফায়াজ একবার কেশরবাঈর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হন নি। একটা উপমা সাহেদ বরদাস্ত করতে পারেন নি—বললেন, 'ফায়াজ বলেছিল একটি পদ্মের পাতার ওপর দুটি মত্ত হাতি যুদ্ধ করলে যে ভাব-সাম্যের দরকার তাই আছে কেশরবাঈর কণ্ঠে—কোনো মানে হয় না।'

সাহেদ আরও বললেন, 'সেদিন গানের জলসায় তাঁর মেজাজ বিগড়ে দেয় একজন মাড়ওয়ারি। বোকা-বোকা মন্তব্য করা ছাড়া ও মাঝে মাঝে উচ্ছ্বাসের চোটে তাঁর গায়ে কনুইর গোঁত্তা দিচ্ছিল।'

সাহেদ-এর বর্ণনা খুব মজার হয়। এবার প্রশ্ন উঠল, সুভাষ কিরকম কংগ্রেস সভাপতি হবেন। সাহেদ বললেন, ভাবাবেগের জগা-খিচুড়ি—জহরলাল-এর কাছাকাছিও যেতে পারবেন না—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে জহরলাল-এর তুলনায় তাঁর প্রতিপত্তি নেই বললেই হয়। তারপর সাহেদ জহরলালের প্রশংসায় শতমুখ হয়ে পড়লেন। তাঁর বুদ্ধি, বোধশক্তি, মনের প্রসার, জ্ঞান সব গুণের উচ্ছ্বসিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন।

তুলসী গোস্বামী বললেন, 'ভাষার অসুবিধা আছে অবশ্য।' নীরেন বললেন, সুভাষকে একটা চিঠি লিখে এমন একটা উত্তর পেয়েছেন যা থেকে কিছুই বোঝবার উপায় নেই—কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেন নি। তবে জহরলাল সম্বন্ধে তাঁর তিক্ততা প্রকাশ পেয়েছে যখন তিনি বলেন যে, যে-

লোক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী, সে কেমন করে কৃষাণ ও অন্যান্য সংগঠনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকছে, সেটা তাঁর বোধগম্য নয়।

তুলসীবাবু বললেন, 'দেশে শ্রমশিল্পের প্রসার না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রথায় সমাজতন্ত্রের ডাক নিরর্থক। আগে চাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা।'

তুলসীবাবুর প্রতিটি কথা খাঁটি বলে মনে হয়। নীরেনবাবুর কথা অনেক সময় মনে হয় পুঁথি-পড়া।

এবার তুলসীবাবুর কণ্ঠে শুনলাম জহরলালের চরিত্র-বর্ণনা। তাঁর অসাধারণ কর্মক্ষমতা, ধৈর্যহীনতা, ক্রোধ, স্নেহ ও প্রীতির আকর্ষণী শক্তির কথা বললেন, যেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। আবিষ্ট হয়ে শুনলাম।

কে একজন প্রশ্ন করলেন, 'বাংলাদেশে বসে এম এন. রায় কি করছেন?'

সাহেদ বললেন, 'তিনি ত দেখছি মুসলমানদের তোয়াজ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তাঁর বোঝা উচিত যে এখানে তাঁর চেয়ে আরও অনেক চতুর রাজনীতিজ্ঞ বাসা গেড়ে বসেছে। তাঁর নিজের উপযোগী ক্ষেত্র হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ।'

সে কথায় সায় দিলেন তুলসী গোঁসাই। তিনি বললেন, 'মানবেন্দ্র রায়ের রাজনৈতিক মতবাদের জন্যে বাংলা দেশ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নাম করেছেন বলে যেটুকু সমাদর পেয়ে থাকেন সেটা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। রায় বিচক্ষণ লোক, কিন্তু একই কথা বলে বলে নিজেই বিরক্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর বলবার কথা একমাত্র হচ্ছে—কংগ্রেসকে শক্তিশালী কর। সমাজতন্ত্রের পার্টি চুলোয় যাক।' কে একজন বললেন, রায় নাকি রাত একটা পর্যন্ত খাটেন।

সাহেদ বললেন, তিনি যত রাজনীতিজ্ঞ দেখেছেন তার মধ্যে সব চেয়ে নীচমনা হচ্ছেন বিধান রায়।

একজন প্রশ্ন করলেন, 'চট্টো, প্রতাপ, পিলে ইত্যাদি বিপ্লবীরা যুদ্ধের সময় কি শিক্ষা করেন?'

সাহেদ বললেন, সবাই পুঁজি টাকা খুইয়ে দুঃখদৈন্যের মধ্যে দিন কাটায়। একদিন গভীর রাত্রে তাঁর মস্কোর বাসায় বারকাৎউল্লা হাজির। আনওয়ার পাশাকে খুন করা হয়েছে বলে তার আত্মারাম আতকে প্রায় খাঁচা-ছাড়া। সে নাকি প্যান ইসলামের সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে শাসকদের বিরাগভাজন হয়। শেষ পর্যন্ত একজন ইহুদি মহিলার দয়াতে পালিয়ে বাঁচে।

সাহেদ-এব মনে পডল কথা হচ্ছিল মানবেন্দ্র সম্বন্ধে। তিনি এবাব বললেন, 'অবনী মুকুজ্যে বায়কে ডুবিযেছে।'

নীবেন, জীবনদা আব আমি হিবণকে দেখতে গিয়ে শুনলাম ওঁর মা একটু ভালো আছেন, কিন্তু মৃত্যু অবধাবিত।

৪ ফেব্রুয়াবি

'পবিচয'-এব আসবে যাবার পথে জীবনদা কেশববাঈব গানেব কথা বলছিলেন। গত সন্ধ্যায় শুনে এসে পর্যন্ত তাঁব ঘোব কাটেনি। সে এক অদ্ভুত, অনির্বচনীয অভিজ্ঞতা। আমবা যেতে পাবিনি বলে দুঃখ কবলেন। দ্বিজেন মৈত্রব কথা উঠল। জানতাম না তিনি গুড ইভ স্কুলাব ছিলেন। আবও শুনলাম যে, তিনি অধীনস্থ ডাক্তাবদেব কাজে দোষ দেখিযে কথায কথায অপদস্থ করবাব স্বভাব ছাডতে পারলে দেশেব সর্বপ্রধান অস্ত্রচিকিৎসক হয়ে উঠতে পারতেন। তা ছাডা নানাবিধ জ্ঞান আহবণের চেষ্টায পেশা অবহেলা কবেন। নীলরতন সবকার-এব স্বাভাবিক মাধুর্য আর চিকিৎসায় বিচক্ষণতাব কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হযে উঠলেন জীবনদা। বিধান রায়-এর কথায বললেন, লোকটা অদ্ভুত প্রতিভাবান—'জিনিয়াস'।

সুমন্দ্রর সঙ্গে দেখা হযে গেল। তিনজনে প্রবোধ বাগচীব বৈঠকখানায এক সঙ্গে ঢুকে দেখি মজিদ রহিম ও নীবেন-এব মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। বিষয় মদনমোহন মালব্যব অস্ত্রোপচার কবিয়ে আযুষ্কাল বাডাবাব চেষ্টা। রহিম বলছিলেন, সেই সঙ্গে শরীরেব কসরত না কবে গেলে কোনো ফল হবে না। প্রবোধ বাগচী বললেন, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবার আবও সহজ উপায় আছে। আব কে যেন বললেন, মালব্য তাঁব বার্ধক্য ঝবাতে পাবলে তাবপব গান্ধিজীর ওপর পরীক্ষা চালানো হবে। রহিম বললেন, সকলে জীবন আঁকডে থাকলে সমাজে বাস করা দুর্বিষহ হযে উঠবে। আমি বললাম, ধনীদেব ওয়ারিসরা গুলি করে মারবে—তাছাডা অধ্যাপক ক্রু-র কথার পুনবাবৃত্তি করে বললাম, মানুষের অঙ্গ অবযব ইন্দ্রিয সবই যখন ল্যাবরেটবিব জাবে জিযানো রাখা যায, তখন মৃত্যুকে ঠেকিযে বাখা এমন কি ভাবনার কথা। তারপর বললাম, মুশকিল হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষেব চবিত্র বার্ধক্যে বিকল হলে গ্রন্থি পাল্টালেও কোনো কাজ হয় না।

এত কথা একসঙ্গে বলি না বড একটা। হাসির ওপব আবও হাসির ঢেউ তুলে রহিম বললেন, 'চুলে পাক ধরলে তাঁর কোন আপত্তি নাই কিন্তু টাক

পড়ায় তাঁর ভীষণ আপত্তি।'

আমি বললাম, 'জীবনদা টাক মাথায় চুলের ফসল ফলাতে পারেন কিন্তু মাথা কামাতে আমার আপত্তি।'

সুমন্ত্র মহালনবীশ বললেন, তিনি সচক্ষে দেখেছেন জীবনদার চিকিৎসাধীনে অশোক মৈত্র মাথা কামিয়ে ঔষধী মেখে গৃহবন্দী হয়ে বসে আছেন।

এবার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু করলেন প্রবোধ বাগচী। তিনি বললেন, 'জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করবার কাজে চীনকে ব্রিটেন সাহায্য করছে।' আমি বললাম, 'ঠিক তার উল্টো। এখানকার ইংরেজ শিল্পপতিরা জাপানকে সাহায্য করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের ধারণা জাপান চীনের উত্তর অঞ্চল অধিকার করে নিলে কম্যুনিজমের বন্যা রোধ করা যাবে, নতুবা নয়। লোহা পাথরের রপ্তানিকে যে রকম জোরদার করা হয়েছে তাতে সেই সাক্ষ্যই দেয়।' সুশোভন বললেন, 'বাণিজ্য ক্ষেত্রের বেচা-কেনা থেকে রাজনীতির বিচার করা যায় না।' তিনি ইতিহাস থেকে নজির বার করে দেখালেন, যুদ্ধের মধ্যেও শিল্পপতিরা মুনাফার লোভে শত্রুপক্ষের শিবিরে রসদ ও অস্ত্রের যোগান দিয়েছে।

মানবেন্দ্র রায়ের কথা উঠতে সকলে মুখর হয়ে উঠলেন। সুশোভন প্রশ্ন করলেন 'ওঁর অনুগামী কোনো জনবল আছে কি?' নীরেন বললেন, 'হাঁ আছে।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারা কারা?' নীরেন উত্তরে বললেন, 'কংগ্রেসের মহারথীদের মধ্যেও এমন লোক আছেন যাঁরা রায়ের চিন্তাধারায় পরিচালিত'—এমন কি তাঁর ধারণা 'স্বয়ং জহরলালও তাঁর প্রভাবমুক্ত নন।' তারপর নীরেন নিজের কথার জের টেনে বললেন, 'ঐ ভালো বইটা লিখে ফেলবার পর জহরের উদ্যম যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

সুশোভন বললেন, তিনি আগে স্বাধীনতা অর্জন তারপর সমাজবাদের চিন্তা, এই যুক্তি বা মনোভাবের মধ্যে কোনো সততা বা সার্থকতা খুঁজে পান না।

আমি জানতে চাইলাম, মানবেন্দ্র রায় কি সাম্যবাদের সপক্ষে কোন স্পষ্ট কথা বলেছেন।

শুনলাম: 'সে কথা ধরে নেওয়া যায়।' তিনি সোভিয়েট দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি

বাগচীর বাড়ি পৌঁছে বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম সাহেদ আর রহিম-

এর মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে। ঢুকে দেখি গ্রন্থ খুলে তর্কের মীমাংসার চেষ্টা করছেন গৃহকর্তা। বিষয়টি ভাস্কর্য। রহিমের মতে ভারতীয় ভাস্কর্যের চেয়ে গ্রীক প্লাস্টিক আর্ট শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ভারতীয় প্রতিমূর্তি সর্বাঙ্গসুন্দর কেবল মাত্র সামনের দিকে, গ্রীক ভাস্করের কাজে পিছন পাশ ও সামনে সব দিকই সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়। সাহেদ বললেন সে কথা ঠিক নয়। প্যারিসের একটি প্রদর্শশালায় তিনি দেখেছেন, একটা বড় ঘরের ঠিক মধ্যিখানে রাখা হয়েছে এক ভারতীয় দেবী মূর্তি। যে কোনো দিক থেকে সে ভাস্কর্যের সুষম সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

রহিম হেসে বললে, রাখা হয়েছে সৌন্দর্যের জন্যে নয়, আসল কারণ সেটা হচ্ছে কৌতূহলোদ্দীপক—সে মূর্তি যেখানে ইচ্ছা রাখা যেতে পারত।

সাহেদ রেগে গিয়ে বললেন, যে-লোক পাঁচটার বেশি ভারতীয় মূর্তি দেখেনি, তার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

ততক্ষণে প্রবোধ বাগচী একটি দক্ষিণ ভারতীয় ব্রঞ্জ-মূর্তির ছবি খুঁজে পেলেন। পিছন থেকে তোলা। রহিম লাফ দিয়ে উঠে তীব্র বিদ্রূপের কণ্ঠে বললেন, 'কি বিশ্রী হাত দুটো।'

সাহেদ বললেন, 'ঠিক বলেছ, বোঝা গেল তোমার সৌন্দর্য দেখবার চোখ নেই।' এবার তিনি সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন হাতের বিন্যাস সুন্দর ভাবে মূর্ত করে তোলা কত কঠিন। শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এই অঙ্গকে শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রূপ দিতে পারে নি বলে অনেক প্রাচীন সভ্য জাতির ভাস্করেরা হতাশ হয়েছে। মিশরীয় ভাস্করেরা তাদের সমস্যার সমাধান করেছিল শরীরের পাশে হাত জুড়ে দিয়ে। গ্রীক ভাস্করকে তাঁদের রচিত মূর্তিগুলিকে ব্যায়ামরত দেখাতে হয়েছে; এই ধর—চাকতি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে। ভারতীয়রা কেবলমাত্র দুই হাত নয়, চার হাত, দশভুজা মূর্তি গড়ে দেখিয়েছে কেমন অনায়াসে সংগতি আনা যায়। ভাস্কর তার সৃষ্টির একাগ্রতায় কিম্ভুতকিমাকারকে শিল্পের মাহাত্ম্যে তুলে দেয়।

নীরেন বললেন, 'দশ হাত আসলে দুই হাতের গতিবিধির ইঙ্গিত করে।'

'হাঁ, সেই কথাই বলছিলাম,' বললেন সাহেদ, 'হাতগুলির সংগতিপূর্ণ, সমবেত গতি সহজেই চোখে পড়ে। আমি স্বীকার করি যে কোনো কোনো সময়, বিশেষ করে পাল রাজাদের রাজত্ব কালে, এক ধরনের অনুকরণ প্রাধান্য পায়—তখন শিল্পীদের অকৃতকার্যতা পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। সেই যুক্তিতে বলা যায় যে নিছক মানবদেহের নিখুঁত প্রতিকৃতি কিংবা সঠিক

কর্মরত, অঙ্গভঙ্গির প্রকাশ শিল্পোত্তীর্ণ হয় না।'

রহিম বললেন, 'নিখুঁত মানব দেহের চেয়ে সুন্দর কিছু হতে পারে না।'

সাহেদ বললেন, তিনি একটি সুন্দর গায়ের শাল, ফুলদানি অথবা কার্পেট দেখে সমান আনন্দ পান। তাঁর মতে, ভারতীয় শিল্পকলা ও গ্রীক আর্টের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে যেখানে ভারতীয়রা দেবদেবীদের মানুষে পর্যবসিত করবার অভিপ্রায় করেছে, সেখানে গ্রীকরা দেখি মানুষকে স্বর্গীয় শক্তি ও সৌন্দর্য-মণ্ডিত করে দেবতার স্তরে তোলবার চেষ্টা করেছে।

নীরেন বললেন, 'আমিও তাই বলি।'

সাহেদ যখন চিন্তাশীল কথা আন্তরিকভাবে বলেন তখন তাঁর ভুরু কিছুটা উঁচুতে ওঠে। আমি আকৃষ্ট হই। রহিম সহজে হার স্বীকার করবার ছেলে নন্। তিনি হেসে কিছুটা অসংযত ভাবে বলে উঠলেন, 'মানুষকে দেবত্বের স্তরে তোলা উপাখ্যানটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল নয় কি? ঈশ্বরের যথার্থ-রূপ যখন কল্পনায় আনা যায় না, তখন মানুষের ব্যায়ামপুষ্ট সুন্দর দেহের মাধ্যমে দেখাতে আপত্তি করবার কি থাকতে পারে?'

সাহেদের মনে পড়ল কোথায় যাবার আছে। রহিমের গাড়ি ধার করে চলে গেলেন, রহিম প্রবোধ বাগচীর কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে হিন্দু দেব-দেবী সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিন। প্রথমে বলুন বেদের দেবতারা কেন হিন্দুমনে স্থান পায়নি।' বাগচী বললেন, ব্রহ্মা ছিলেন দেবতাদের স্তরভেদের মধ্যে সর্বোত্তম। সর্বোপরি থাকার জন্যে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বর্তমান দেব-দেবীরা কিভাবে বিবর্তিত হয়েছেন বলতে গেলে তন্ত্রের আগের যুগে যেতে পারেন না। মহেঞ্জোদারোর সময় দেখা যায় নগর-দেবতার পূজা হতো, সেই থেকে হয়তো আধুনিক যুগের দুর্গার বিবর্তন হয়েছে। অন্য দেবতারা আরও সাম্প্রতিক। উড়িষ্যাতে সূর্য দেবতার উপাসনা হতো কিন্তু তার সঙ্গে বেদের সূর্য-দেবতার সম্বন্ধ আছে বলে মনে করেন না তিনি। সে পূজার প্রবর্তন হয় কোনো কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রাজার আরোগ্য কামনায়।

এবার পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে দার্শনিক আলোচনা শুরু হতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। মনে রইল সৃষ্টির আনন্দের উল্লেখ।

সুশোভন আজকে য়ুরোপীয় পোশাকে এসেছিলেন। রহিম হিন্দু দেব-দেবীদের ছেড়ে জ্যোতিষ-বিদ্যার কথা তুললে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন বলে মনে হল।

রহিম বলছিলেন তাঁর এক কেরানির অদ্ভুত গণনা শক্তির কথা। তাঁর অতীত-জীবনের কয়েকটি ঘটনা এমন সঠিক বলে দিয়েছে যে উনি জ্যোতিষ বিদ্যা শিখতে শুরু করেছেন।

নীরেন-এর উৎসাহে আমি নিজের কয়েকটি বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বললাম।

২৫ ফেব্রুয়ারি

আজ' আসর বসেছিল প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। উপস্থিত নিয়মিত-সভ্যরা ছাড়া চিত্রকর সতীশ সিংহ ও হারীতকৃষ্ণ দেবকে দেখলাম। দেশ-বিদেশের ভোজ্য দ্রব্য ও আহারপদ্ধতির গল্প হচ্ছিল। সাহেদ বললেন, 'য়ুরোপীয় রীতির চেয়ে পারসিক প্রথায় খাওয়া ঢের বেশি আকর্ষনীয়। একটার পরে আর-একটা খানা আলাদা করে খাওয়ার চেয়ে সব কিছু একসঙ্গে নিয়ে খেতে বসলে খাবারের রঙ ও রূপের সমাবেশ অধিকতর তৃপ্তি দেয়।'

হারীতকৃষ্ণ বললেন, 'অধ্যাপক এম. ঘোষ পড়াবার সময় বলতেন, ছবির ঐশ উপাদান (divine element) হচ্ছে তার রঙ।' কথাটা লাগসই না হলেও নীরেন-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গুরুর কথা স্মরণ হলে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। তাঁর কথা সমর্থন করে সাহেদও অনেক কথা বললেন। সাহেদ পুরনো কথা মনোরম করে বলতে পারেন। এই মহৎ শিক্ষকের কাছে তাঁরও পড়বার সুযোগ হয়েছিল এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধ্যান ধারণা অনেক কিছুই তাঁর কাছে পাওয়া।

নীরেন বললেন, 'আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজি শিক্ষার চেয়ার নিলে অনেক ভালো হতো—নিচ্ছেন না কেন?'

পরমুহূর্তে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'অবশ্য সুকুমার শিল্পকলার গুরুত্ব কিছু কম নয়—ছাত্ররা যে উপকৃত হচ্ছে না তা বলছি না—তবে কিনা অনেক বেশি সংখ্যক ছেলে মেয়ে ইংরিজি সাহিত্য পড়ে থাকে।'

সাহেদ খুশি হয়েছেন মনে হল। বললেন, 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমি জনপ্রিয় হব না।' হামফ্রে হাউস-এর কথা মনে করিয়ে দিলেন।

আর-একবার মনোমোহন ঘোষের অধ্যাপনার কথা উঠতে শুনলাম ছাত্ররা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল বা না হল সেদিকে তাঁর কোনো লক্ষ্য ছিল না। তাছাড়া কারও মনোরঞ্জন করাও তাঁর ধাতে ছিল না।

সাহেদ এবার বললেন, ইংরিজি সাহিত্য পড়াতে পেলে তিনি খুশিই হতেন।

একজন প্রশ্ন করলেন, 'কেউ আছে যে ফাইন আর্টস পড়াতে পারে?'

সাহেদ উত্তর দিলেন, 'কেন? আমাদের বন্ধু কালিদাস নাগ ত বড় বড় চঞ্চু ফাঁক করে হাঁ করে রয়েছেন।'

কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় নি। বেশ রসিয়ে-রসিয়ে বলেন। তারপর তিনি বললেন, সেদিন প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁকে পোয়েট্রি সোসাইটিতে কবিতা পড়বার আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। যথাসময়ে হাজির হয়ে দেখেন দশ জন লোককে ধরে বেঁধে আনা হয়েছে। শুনলেন, প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির হল ঠিক করা হয় এবং সভ্যদের সেই মতো খবর দেওয়া ছিল, তারপর হঠাৎ শোনা যায় আর-কোনো সংস্থা বেদখল করে নিয়েছে সে-হল, তখন তাড়াহুড়ো করে খোঁজাখুঁজির পরে ইম্পিরিয়াল রেস্তোরাঁর সেই ঘর-খানা পাওয়া যায়। ও. সি. গাঙ্গুলী উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রিয়রঞ্জন সেনকে প্রশ্ন করেন, 'সাহেদ কি ইংরিজি জানেন?' উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে দুজন ছিলেন বৈজ্ঞানিক, আর ছিলেন ফটকা বাজারের সুকুল। সে ইংরিজি কবিতার কি বুঝবে?

একজন বললেন, 'কেন হুমায়ুন কবির ছিলেন না? তিনি তো পোয়েট্রি সোসাইটির সভ্য।'

বাগচী বললেন, 'হুমায়ুন ত সম্পাদক ছিলেন—সেই সুবাদে স্টেটসম্যান-এর সঙ্গে দোস্তি করে সমালোচনার জন্যে বই নিতে শুরু করেন। কাজ হাসিল হয়ে গেলে পোয়েট্রি সোসাইটির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার দরকার হয় নি।'

তুলসী গোঁসাই নিচু গলায় বললেন, 'এই ধরনের অপবাদ দেওয়া অন্যায়।'

এতক্ষণ পরে গিরিজাপতি ঢুকলেন। তাঁর নাকে অদ্ভুত আকারের ডাঁটি লাগানো চশমা। বললেন, ক্লে পিজন মারা ক্লাব থেকে আসছেন।

রহিম বললেন, তিনি একবার ঘোড়া ছুটিয়ে একটা হরিণকে ধাওয়া করে মেরে ছিলেন। তাঁর সেই রাইফেলটির প্রশংসায় শত মুখ হয়ে উঠলেন।

নীরেন সাহেদ-এর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি কি সমরসেট মম্‌কে চিনতেন? উনি নাকি শিল্পকলা থেকে অধ্যাত্মচর্চা পর্যন্ত অনেক কিছুর অনুরাগী।

সাহেদ বললেন, তাঁর সঙ্গে মম্‌-এর পরিচয় হয় নি, তবে একজন ইংরেজ মহিলা মম্‌কে যামিনী রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চাইলে সুধীন্দ্র তাঁকে

একখানা চিঠি লেখেন—তারপর কী হয় তিনি জানেন না।

হারীতকৃষ্ণ এবার সাহেদকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি গগন ঠাকুরের শ্রাদ্ধবাসরে গিয়েছিলেন?

সাহেদ বললেন, গিয়েছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশের দৈন্যদশা দেখে কষ্ট পেয়েছেন।

সৌম্যেন ঠাকুর তাঁকে বলেছেন যে বদার্স্টাইন-এর কাছে কিছু দানভিক্ষা চেয়ে চিঠি লেখা হয়েছে। কাসিনস্-এর কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতে পারে আশা করা হচ্ছে। এইসব কথা শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। এই ভাবে দীনতা প্রকাশ করা কি ভালো হচ্ছে?

গগন ঠাকুরের ছবি সম্বন্ধে সাহেদ-এর মত হল, তাঁর কতকগুলি কাজ খুবই ভালো। শিল্পী সাহসী ছিলেন এবং কিছু-কিছু অঙ্কন-কৌশল ভালোভাবে উৎরে গেছে কিন্তু তিনি কোনো কিছুতে সবটা মন দিতে পারেন নি। যামিনী রায়ের কথা তুলে বললেন, এই একজন সত্যিকারের শিল্পী যিনি নিজের আঁকা ছবির আজেবাজে উৎকট নাম দিয়ে থাকেন। মনে হয় তিনি কী করছেন সে সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। অথচ তাঁর শিক্ষায় কোনো ফাঁকি নাই।

সাহেদ বলে গেলেন, যামিনী রায় একবার সরাসরি অবনীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন, 'কি করছেন আপনি, রঙ নিয়ে এ-খেলায় লাভ কী? আমি ত এর মধ্যে প্রাণ দেখি না।' অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ও সি গাঙ্গুলীর কাছে পাঠান। অর্ধেন্দুবাবু হ্যাভেল-এর বই পড়তে উপদেশ দিয়ে খালাস। যামিনীদার পরম সৌভাগ্য তিনি হচ্ছেন বাঁকুড়ার লোক। দেশে যান আর সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা দেখতে পান। ঐ শিল্পীদের খুঁজে বার করে তাদের সৃষ্টিশৈলীর উৎস জেনে নেবার চেষ্টা করেন।'

মজিদ বহিম সাহেদ-এর বক্তৃতায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন, লাইন টেনে গরু আঁকার মধ্যে কোনো মহৎ শিল্প লুকিয়ে আছে বলে মনে করেন না তিনি।

সাহেদ তাঁর দিকে বক্রদৃষ্টিতে অগ্নিবর্ষণ করে ইঙ্গিত করলেন যে সে-যুক্তি অগ্রাহ্য—তারপর আমাদের দিকে মুখ করে বলে গেলেন, 'কোনো কোনো বিরল মুহূর্তে শিল্পী কয়েকটি রেখার টানে তার সমস্ত সত্তাকে প্রকাশ করতে পারে। একটানে একটা বৃত্ত পরিসরের সব দিকটা ফুটিয়ে তুলতে

পারে।' পরিশেষে তিনি বললেন, 'আমি যামিনীদাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর মগজে যে লেশমাত্র বুদ্ধি নেই সে-কথা স্বীকার করতেই হয়।'

কে-একজন কথা ঘুরিয়ে অজন্তার ছবির কথা তুললেন। তাঁর প্রশ্ন হল, শত শত বছর তাজা থাকার পরে রঙ ও রেখা এত দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?

সাহেদ একজন ইংরেজ চিত্রকরকে দোষী করে বললেন, 'এক পোঁচ বার্নিস লাগিয়ে সর্বনাশ হয়েছে।'

গিরিজাপতি বললেন, 'অনেকদিন মাটিচাপা থাকার ফলে ছবিগুলো তাজা ছিল।'

সাহেদ বললেন, 'নিজাম তাঁর সাধ্যমতো সবই করেছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে।'

বাগচী আর-একটা প্রসঙ্গ তুললেন, অজন্তার শিল্পের সঙ্গে এলোরার ভাস্কর্যের কি মিল আছে?

এবার আলোচনা শুরু হল আর-এক খাতে।

শিল্পের ধারা কেমন করে দেশ থেকে দেশান্তরে যায় সেই সম্বন্ধে প্রবল মতবিরোধ দেখা গেল।

সাহেদ বললেন, তাঁর অনুমান রাজপুত স্টাইল বলে যে-ছবিগুলি পরিচিত সে পদ্ধতি হচ্ছে বাংলার অবদান। একটা মিল তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। তিনি মনে করেন একদিন তাঁর এই ধারণা অবিসংবাদী ভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে।

বাগচী বললেন, 'রাজপুতানার এক রাজবংশ নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয়।'

রহিম বললেন, কোনো লোকশিল্প যে স্থানান্তরে গিয়ে বাসা বাঁধে সে মতবাদ তিনি অস্বীকার করেন।

এবার প্রচণ্ড তর্ক বেঁধে গেল—বিতর্কের বিষয়বস্তু হল যাঁযাবর মানুষ কোন পথে, কোথায় কোথায় গেছে। মধ্য এশিয়ার প্রসঙ্গে দেখলাম, সাহেদ-এর পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়াও, কিছু-কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

বাগচী এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। রহিমও অনেককিছু জানেন। আমরা নিবিষ্ট হয়ে এই তিনজনের আলোচনা শুনলাম।

আর একবার ও. সি. গাঙ্গুলীর কথা উঠতে সাহেদ বললেন, তিনি বিস্তর পড়েছেন, কিন্তু চাক্ষুষ দেখেছেন খুব কম। অন্যের চোখ দিয়ে দেখা আর নিজের দেখায় অনেক তফাৎ। উদাহরণ স্বরূপ বললেন, একবার 'মূর-

মনুমেন্ট' দেখে আসবার পরে তাঁকে নিজের বই থেকে পুরো একটা পরিচ্ছেদ বদল করতে হয়।

৪ মার্চ

সুধীন্দ্র ফিরেছেন। তাঁর বাড়িতেই আসর বসেছিল। জীবনদাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ফলে আমার পৌঁছুতে একটু দেরি হয়ে যায়। দেখি জমজমাট আড্ডা চলেছে। বিষয়—বাংলা দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা। সুধীন্দ্র কী কথায় 'ওয়াইল্ড গুস্ পারচেসিং' বলে উঠতে সকলে হেসে উঠলেন। তারপর তিনি একটু গম্ভীর হয়ে বললেন 'সত্যি আমার সময় উত্তর প্রদেশে ম্যাট্রিক-কুলেসান পরীক্ষার মান ছিল বাংলার ইন্টার আর্টস-এর মতো।'

বাগচী মানতে চাইলেন না সেকথা। তিনি জেরা করে সুধীন্দ্রকে দিয়ে স্বীকার করালেন যে 'লজিক' পড়ানো হত না উত্তর প্রদেশে। এখন মোটা-মুটি আমাদের প্রদেশে শিক্ষাপ্রদানের মান যে অবনতির দিকে সে কথা সকলেই মেনে নিলেন। কারণ দর্শানো হল দারিদ্র্য। জীবনদা বললেন, সরকারি হস্তক্ষেপই হচ্ছে এই অবনতির কারণ। শিক্ষার সব কিছু এখন সরকারি দপ্তরে নির্ধারিত, অত্যাধিক কাজে পরিশ্রান্ত শিক্ষকদের অনাবশ্যক খাতা দেখা থেকে ছাত্রদের ওপর ক্রমবর্ধমান শিক্ষনীয় বিষয়ের বোঝা চাপানো —এই সবের মূলে আছে আমলাতন্ত্রের শাসন। পরোক্ষচাপে শিক্ষক অবসন্ন, ছাত্র অনুৎসাহ। এ এক দুঃসহ পরিস্থিতি।

সুধীন্দ্র যে-মনোযোগ দিয়ে জীবনদার কথা শুনলেন তাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল।

বাগচী বললেন, 'ভারতীয় মননে এই শিক্ষা পদ্ধতি কখনোই ফলপ্রসূ হতে পারে না।'

সুধীন্দ্র বললেন, 'এই একই পদ্ধতি সর্বকালে সর্বদেশে গ্রহণ করা হয়েছে' —তিনি বাগচীকে কোনো বিকল্প পদ্ধতি দেখাতে আহ্বান করলেন।

বাগচী বললেন, তিনি গ্রন্থ-মুখস্থর কথা বলছিলেন না—কথা হচ্ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য কী—প্রাচীন ভারতে সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের মাধ্যমে সত্যকে জানা।

সুধীন্দ্র তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মাই ডিয়ার সার, আপনি কি জানেন না পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞান-অর্জন হয় সেই একই উদ্দেশ্যে ও উপায়ে— রেনেসাঁসকে ভুল করে চতুর্থ শতকে ফেলা হয়েছে। আসলে পুনরভ্যুত্থানের

সময় হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে।'

হারীতকৃষ্ণ বললেন, 'বিজ্ঞান তখন কি ছিল?' কে একজন বললেন, 'অপরসায়ন, কিমিয়া—তারা জ্যামিতি জানত না—গণিত-বিজ্ঞানের কি বুঝবে।'

বাগচী একটি গ্রন্থের নাম বললে, সুধীন্দ্র হেসে বলেন, 'অফ কোর্স—পিরামিড্ কেমন করে তৈরি হয়েছিল—'

এবার প্রশ্ন উঠল যুক্লিড-এর সময় নিয়ে। বিশ্বকোষ না কোন একটি গ্রন্থ ঘেঁটে দেখা গেল সুধীন্দ্রর কথাই ঠিক।

সুধীন্দ্র বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে দ্রুত ইতিবৃত্ত দিয়ে বাগচীকে চেপে ধরলেন, 'বলুন, একমাত্র পদার্থবিদ্যায় সত্যেন ছাড়া পঞ্চাশ বছরে কোন ভারতীয় বিদ্যালয় বিশ্বকে কি দিতে সমর্থ হয়েছে।'

দর্শন শাস্ত্রের কথায় নীরেন বিবেকানন্দর নাম করতে, বলা হল অ্যাকাডেমিক অর্থে বলা হচ্ছে।

বাগচী বললেন, 'একজন বুদ্ধিমান ছাত্র এম-এসসি পাশ করে যা-কিছু শিক্ষা করেছে তার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় কারণ তখনও সে আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে নি।'

সুধীন্দ্র ছেলেটির সমস্যাটিকে আরও বিশদ করে জানতে চাইলেন। তারপর ধরেই নিলেন যে তার জিজ্ঞাসার সঙ্গে রাসেল-এর মন্তব্যের কোনো প্রভেদ নেই। রাসেল বলেন যে বিজ্ঞানকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির মধ্যে থাকতে গেলে একটা সীমারেখা স্বতই এসে যায়।

হেমেন্দ্রকে বলতে শোনা গেল যে, 'আলোর গতির যে মাপ করা হয় সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের মন গড়া—রোগাস্।'

সুধীন্দ্র অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেমন করে রোগাস হল?'

গিরিজাপতি বুঝিয়ে দিলেন গতির পরিমাপ যে-ভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকুক না কেন, যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ ও তার উপগ্রহ চন্দ্রের গ্রহণ দেখে তার নির্ভুলতা প্রমাণ হয়।

বাগচী বললেন, 'একটা আলোকে আর একটা আলো দিয়ে মিলিয়ে দেখলে চরম জানা হয় না।'

গিরিজা হেসে বললেন, 'তাতে হয়েছে কি? যাত্রাপথে হয়ত আলোর রশ্মির মধ্যে কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়ে থাকবে, কিন্তু গতি ত সেই একই।'

হেমেন্দ্রর সন্দেহ গেল না। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি ইলেক্‌ট্রন দেখেছে?' গিরিজা বললেন, 'আমি দেখেছি ইলেকট্রনের পথরেখা।'

তাঁর এ উক্তিতে সন্দেহ ঘুচল না।

সুধীন্দ্র এবার বুঝিয়ে বললেন ৯৩ নম্বরের মৌলিক পদার্থের নতুন আবিষ্কার-বৃত্তান্ত।

সভা ভাঙবার আগে সুধীন্দ্রর মনে পড়ল দিল্লিতে দেখা এক প্রাচীন শিল্পের নমুনা। তখনও রঙের প্রলেপন শুরু হয় নি, কিন্তু কলসের গঠন অপূর্ব সুন্দর।

মাঝে-মাঝে হারীতকৃষ্ণের সরস উক্তিগুলি সুধীন্দ্রকে খেপিয়ে দিচ্ছিল। একবার দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলে ওঠেন—'ভাই ইওর উইট্‌ ইস্‌ সিন্টিলেটিং টোডে।'

সুধীন্দ্রর মুখে 'ভাই' কথাটি শুনে আশ্চর্য হলাম।

বিষ্ণুর সঙ্গে এক ট্রামে হিরণ-এর বাড়ি যাচ্ছিলাম। শুনলাম হুমায়ুন কবির আর বুদ্ধদেব 'চতুরঙ্গ' নাম দিয়ে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। তাঁরা স্থির করেছেন লেখকদের ৫ টাকা থেকে ১৫ টাকা পর্যন্ত দক্ষিণা দেবেন।

সাহিত্যের হট্টগোলে

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে, 'শব্দচয়ন' নামক এক প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন, "সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে।"

শব্দশাস্ত্রের ধার ধারে না এমন কয়েকটি ভুঁইফোড় শব্দ ও বাক্‌শৈলী সুধীবর্গের সামনে উপস্থাপিত করছি—এগুলি 'পীড়াদায়ক' কিনা নিষ্ঠাবান্ লেখকেরা বিচার করে দেখুন।

সাফল্যের সঙ্গে, সাবধানতার সহিত, সহানুভূতি সহকারে

আমরা কাজ করি। কাজ সমাপ্ত হলে উপলব্ধি করি কাজে ফললাভ হয়েছে কিনা অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হয়েছে কিনা। ফললাভ হলে বলি 'কাজে সফল হয়েছি', না হলে বলি 'কাজে বিফল হয়েছি'। 'সফল' মানে 'ফল সহ বর্তমান'—বহুব্রীহি সমাস 'স (=সহিত) ফল যার'। 'সফল' বিশেষণ পদ, বিশেষ্যে 'সাফল্য' বা 'সফলতা'। সুতরাং 'সফল হয়েছি' না বলে কখন কখন বলি 'সাফল্য অর্জন করেছি'।

কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ দেখা যাচ্ছে লেখকেরা যেন ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছেন। তাঁরা কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না। তাঁরা 'সাফল্যের সঙ্গে' কাজ করছেন। মনে হয় 'সাফল্য' নামক কোন ব্যক্তিকে কিংবা কোন গুণকেই 'সঙ্গে নিয়ে' তাঁরা কাজে অগ্রসর হচ্ছেন।

অসঙ্গতিটা লক্ষ্য করা দরকার। আমরা যখন 'সযত্নে' কাজ করি, তখন 'যত্ন' কাজের সঙ্গেই থাকে, কাজের পরে 'সযত্ন' হই না। কিন্তু 'ফল' কাজের সঙ্গেই থাকে না, 'ফললাভ হয়' অর্থাৎ 'সফল হই' বা 'সাফল্য হয়' কাজের পরে। সুতরাং 'সাফল্যের সঙ্গে কাজ করি' বাক্‌শৈলীটি হাস্যকর। এই বাক্‌শৈলী লেখকেরা ধার করেছেন ইংরেজী বাক্‌শৈলী থেকে। **'I have been successful'** না বলে ইংরেজীতে কখন কখন বলা হয় **'I have done it with success'**। অনুকারীরা ভেবে দেখেন না ইংরেজী বাগ্‌বিধিতে

এখানে 'with' শব্দের যে-দ্যোতনা, বাংলাভাষায় 'সহ, সহিত, সঙ্গে, সহকারে' প্রভৃতি শব্দে কখনও তা প্রকাশ পায় না।

'সাফল্যের সঙ্গে, সাফল্যের সহিত, সাফল্য সহ, সাফল্য সহকারে' কিংবা 'সাবধানতা' বা 'সহানুভূতি' 'সহ' বা 'সহকারে' জাতীয় বাগ্‌রীতি যে কতটা অযৌক্তিক, অন্য দিক্ থেকেও বিচার করা যেতে পারে। 'যত্নের সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, ভয়ের সহিত, খেদের সহিত, হাস্য সহ, শব্দ সহ, গর্ব সহকারে, দম্ভ সহকারে' শব্দগুলির পরিবর্তে ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে বলা যায় 'সযত্নে, সস্নেহে, সভয়ে, সখেদে, সহাস্যে, সশব্দে, সগর্বে, সদম্ভে'। 'সাফল্যের সঙ্গে' স্থলে 'সসাফল্যে' বলা চলবে?

'অবধানের সহিত বর্তমান=সাবধান (স+অবধান)।' বিশেষ্যে 'সাবধানতা', ক্রিয়াবিশেষণে 'সাবধানে'। সহজ শব্দ 'সাবধানে' না লিখে কেউ কেউ লিখছেন 'সাবধানতার সঙ্গে, সাবধানতা সহকারে'। 'সাবধানতা' শব্দের মধ্যেই 'সহ' শব্দ আছে। আরও একটা 'সহ' বা 'সঙ্গে' চাই?

অবশেষে 'সহানুভূতি'। সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের অনেক সময়ে নূতন নূতন শব্দ তৈরি করতে হয়। 'অবলাবান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'Sympathy' শব্দের বাংলা করেছিলেন 'সহানুভূতি'। এই শব্দ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে পাই, কবি বলছেন, "সহানুভূতির উপর আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই।" ১৩৩৬ সালের ২৫শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, "সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে, যেমন 'সহানুভূতি'।" এই তো 'সহানুভূতি'র ইতিহাস। অতঃপর 'সহ+অনুভূতি'র সঙ্গে আরও একটা 'সহ' বা 'সহিত' যোগ না করলে ভাষা অর্থবহ হয় না?

'সাহিত্যের হট্টগোলে' সৃষ্ট এমন আরও দু-একটি শব্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আন্তর্জাতিক

একটা অদ্ভুত শব্দ বাংলাভাষায় পাকাপোক্ত আসন গ্রহণ করেছে—একে বিতাড়ন করার সময় বোধ হয় পার হয়ে গেছে। শব্দটি হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক'। শব্দটি কার মাথা থেকে বেরিয়েছে জানি না। যিনিই এ শব্দ সৃষ্টি করে থাকুন,

তিনি 'inter-' আর 'internal' যে ভিন্ন গোত্রের শব্দ তা খেয়াল করে দেখেন নি। ইংরেজী 'in' শব্দের অর্থ 'অন্তঃ, inside'। 'Internal' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে 'in'-এর সঙ্গে '-ternus' suffix যোগ করে। এর অর্থও 'inside'। কিন্তু 'inter-' পূর্ণ শব্দ নয়, এটি একটি 'prefix' মাত্র, এর অর্থ হচ্ছে 'between, among, দুইয়ের মধ্যে, বহুর মধ্যে'। 'Inter-' prefix সহযোগে যেসব শব্দের সৃষ্টি হয় তাদের সঙ্গে 'অন্তঃ=inside' শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। 'অন্তঃস্থ, অন্তর্গত, অন্তর্নিহিত, অন্তর্ভূত, অন্তর্মুখ, অন্তর্যামী, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তঃসলিলা, অন্তর্জগৎ, অন্তর্বাস, অন্তর্দাহ, অন্তঃসার, অন্তঃপুর, অন্তঃপ্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দ দেখলেই বোঝা যাবে 'অন্তর্জাতি' শব্দের কোন অর্থই হয় না। সুতরাং তার সঙ্গে একটা ষ্ণিক প্রত্যয় যোগ করে 'আন্তর্জাতিক' শব্দ সৃষ্টি করা চলে না। কষ্টকল্পনায় 'আন্তর্জাতিক' শব্দের কোন অর্থ আবিষ্কার করলেও তা কস্মিন্ কালেও 'international' হবে না।

'আন্তর্জাতিক' শব্দের ছাঁদে নিত্য সৃষ্ট হচ্ছে নয়া নয়া ছেঁদো শব্দ—'আন্তঃপ্রাদেশিক, আন্তঃসাম্প্রদায়িক, আন্তঃ-ঔপনিবেশিক, আন্তর্বৈবাহিক, আন্তর্জাতীয়, আন্তর্মহাদেশীয়, আন্তঃ-উপজাতীয়,' এমনকি 'আন্তঃকলেজীয়'। আশ্চর্য, যাঁরা নিশ্চিন্তমনে এই শ্রেণীর বিশেষণপদ চালিয়ে যাচ্ছেন, এগুলির মূল বিশেষ্যপদ কখনও তাঁদের মনে আসে নি—'অন্তঃপ্রদেশ (interstate), অন্তঃসম্প্রদায়, অন্তঃ-উপনিবেশ, অন্তর্বিবাহ, অন্তর্জাতি, অন্তর্মহাদেশ, অন্তঃ-উপজাতি, অন্তঃকলেজ' শব্দগুলি কিন্তু এখন পর্যন্ত ভাষায় প্রচলিত হয় নি।

প্রাগৈতিহাসিক

আর একটা উদ্ভট শব্দ গজিয়ে উঠেছে 'প্রাগৈতিহাসিক', যার মানে দেওয়া হচ্ছে 'ইতিহাসপূর্ব, prehistoric'। মনে হচ্ছে 'প্রাক্' যেন ইংরেজী 'Pre-' prefix-এর বাংলা প্রতিশব্দ!

'প্রাক্' শব্দের অর্থ কী? প্রাক্=পূর্ব। দিক্, দেশ, কাল—সকল অর্থেই 'প্রাক্' মানে 'পূর্ব'। প্রাঙ্মুখ (প্রাক্+মুখ)=পূর্বদিকে মুখ যার। প্রাগ্দেশ=পূর্বদিগ্বাসীর দেশ। প্রাক্কাল=পূর্বকাল; প্রাক্তন=পূর্বতন; প্রাক্ ইতিহাস=পূর্ব ইতিহাস। মনে রাখতে হবে 'পূর্ব ইতিহাস' আর 'ইতিহাসপূর্ব' এক কথা নয়। 'পূর্ব ইতিহাস' বললে বোঝা যায় 'আগের দিকের ইতিহাস, প্রারম্ভকালের ইতিহাস—ইতিহাসেরই অন্তর্গত'। কিন্তু

'ইতিহাসপূর্ব' কথায় বোঝায় 'ইতিহাস-সূচনার পূর্বে—ইতিহাসের মধ্যে নেই, ইতিহাসের বাইরে'। অতএব 'প্রাক্-ইতিহাস, প্রাগিতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক' কোন শব্দ দ্বারাই 'ইতিহাসপূর্ব' অর্থ প্রকাশ করা যায় না।

সম্প্রতি ডক্টর সুকুমার সেন একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, নাম দিয়েছেন 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস'। এই গ্রন্থে রামকথার পূর্ব বৃত্তান্ত, পূর্ব ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার 'প্রাক্ ইতিহাস' না লিখে লিখেছেন 'প্রাক্-ইতিহাস', অর্থাৎ 'প্রাক্' ও 'ইতিহাস' এই দুই শব্দের মধ্যে সংযোগচিহ্ন (hyphen) দিয়ে একটি সমাসবদ্ধ পদ গঠন করেছেন। লেখক যদি সন্ধি করে লেখা পছন্দ করতেন, লিখতে পারতেন 'প্রাগিতিহাস' যার বিশেষণ-রূপ দেওয়া হয়েছে 'প্রাগৈতিহাসিক। গ্রন্থনাম 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' প্রচলিত 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দের বিরুদ্ধে ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপকের এক নীরব প্রতিবাদ কিনা জানি না। তবে নামটি সার্থক ও সময়োচিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বৈয়াকরণ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন 'Prehistoric' অর্থে 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দের প্রয়োগ অযৌক্তিক, অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু স্বচ্ছন্দাচার সাহিত্যিক-সম্প্রদায় বৈয়াকরণের শাসনই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন. তাই ইদানীন্তন বাংলা রচনায় 'প্রাক্' শব্দ তার সংস্কৃত অর্থ প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। 'প্রাক্' শব্দের অর্থপ্রসার ঘটেছে। অধুনা 'প্রাক্' শব্দ ইংরেজী 'Pre-' prefix-এর বাংলা অনুকল্পরূপেই সর্বদা প্রযুক্ত হচ্ছে। 'প্রাক্-প্রস্তরযুগ, প্রাক্-রবীন্দ্রসাহিত্য, প্রাক্-নির্বাচনপ্রতিশ্রুতি' প্রভৃতি শব্দবন্ধ দিয়ে এখন প্রকাশ করা হচ্ছে 'প্রস্তরযুগের পূর্বযুগ, রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্বে রচিত সাহিত্য, নির্বাচনের পূর্বে দেওয়া প্রতিশ্রুতি'। ব্যাকরণবিধি স্বীকার করলে 'প্রাক্ শব্দের এরূপ প্রয়োগ চলে না। তবে এটা তো সর্বশিথিল যুগ, এ যুগে কোন ব্যাপারেই বিধিনিষেধ মান্য করে চলার রীতি নেই। অভিনব একটা কিছু কেউ চালালেই নির্বিচারে তা বহুজনগ্রাহ্য হয়ে যায়। আর ভাষার ক্ষেত্রে তো নিয়মই বেঁধে দেওয়া হয়েছে, প্রয়োগবাহুল্য ঘটলে শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার নিষ্প্রয়োজন, সবই 'প্রয়োগসিদ্ধ' বলে ধরে নিতে হবে। ভাষাজননী সর্বংসহা, অতএব বৈয়াকরণ যুক্তিতর্ক 'অরণ্যে রোদন' মাত্র, ঐ যাকে বলে 'a voice in the wilderness'!

শানচ্ প্রত্যয়

বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে দুটো বিশেষ শ্রেণী দেখা যায়। একদল লেখক আছেন যাঁরা যথাসম্ভব তৎসমশব্দবর্জিত নিরলঙ্কার আটপৌরে কথ্য-ভাষাই লেখার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন—তাঁরা 'অভ্যাস' শব্দের বানান দিচ্ছেন 'অব্যেস', 'বিশ্রী'কে লিখছেন 'বিচ্ছিরি', 'শীঘ্র'কে 'শিগগির', এবং মনে করছেন খাঁটি বাংলা লেখা হল। অবশ্য এই শ্রেণীর লেখক-সংখ্যা যে খুব বেশী তা নয়। আর-এক শ্রেণীর লেখক মার্জিত ভাষাই ব্যবহার করতে চান। এঁরা রচনা গুরুগম্ভীর করার অভিপ্রায়ে তৎসম শব্দই ব্যবহার করেন বেশী যদিও চলিত ভাষার রূপ আশ্রয় করে। এই লেখকশ্রেণীতে যাঁরা কিঞ্চিৎ পণ্ডিতম্মন্য তাঁরা নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করেছেন ভেবে। নব নব সৃষ্টির একটি হাতিয়ার হচ্ছে সংস্কৃত ব্যাকরণের শানচ্ প্রত্যয়। শানচ্ প্রত্যয়ান্ত অধিকাংশ শব্দ 'মান' ভাগান্ত হয় এবং শব্দগুলি বেশ গালভরা হয়, শ্রুতিসুখকর হয়। মুশকিল হচ্ছে সংস্কৃত সব ধাতুতেই সর্বত্র শানচ্ প্রত্যয় চলে না, কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর জন্য নির্ধারিত হয়েছে শতৃ প্রত্যয়। কিন্তু ভাষাকে যাঁরা প্রাণবন্ত করতে বদ্ধপরিকর, কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য পরস্মৈপদী আত্মনেপদী বিচার করবার অবসর তাঁদের নেই, তাঁদের চাই অনতিসাধারণ শব্দবৈচিত্র্যে ব্যঞ্জনাময় ছন্দোময় চমকপ্রদ ভাষা। অতএব দিনের পর দিন আসর জাঁকিয়ে বসছে 'ক্রন্দমান, প্রশংসমান, মজ্জমান, চলমান, ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান, প্রবহমান, অপস্রিয়মান', যায় 'অস্তমান'। নূতনত্বের খাতিরে মাঝে মাঝে শব্দ-সংক্ষেপও চলছে, যথা—'রোরুদ্যমান' স্থলে 'রুদ্যমান'। আবার সংস্কৃত ভাষা থেকেই শব্দ গ্রহণ করে তার পরিমার্জিত সাধু রূপ দেওয়া হচ্ছে, যেমন—'মুহ্যমান' শব্দের পরিবর্তে 'মোহ্যমান'।

মোহ্যমান :

মুণ্ডকোপনিষদের একটা শ্লোকে পাই 'সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ' (৩।১।২)। ঋগ্বেদেও 'মুহ্যমান' শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু অভিধান রচনাকালে 'চলন্তিকা'-কার রাজশেখর বসু আবিষ্কার করলেন 'মুহ্যমান' শব্দ ব্যাকরণসম্মত নয়, বিশুদ্ধ শব্দ হচ্ছে 'মোহ্যমান'। 'চলন্তিকা' প্রকাশকালে তিনি বিজ্ঞাপনেই প্রচার করলেন 'মুহ্যমান' কি 'মোহ্যমান' কোন্ শব্দ সাধু তা এই অভিধানে দেখানো হয়েছে। 'মুহ্যমান' শব্দ

ব্যাকরণদুষ্ট সন্দেহ নেই, কারণ 'মুহ্' ধাতু পরস্মৈপদী, সুতরাং শানচ্ প্রত্যয় চলে না। কিন্তু সাধু শব্দের সন্ধান করতে গেলে শতৃ প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ শব্দ হবে 'মুহ্যন্'। শানচ্ প্রত্যয়ের স্থানই নেই, অতএব 'মুহ্যমান' না 'মোহ্যমান' এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করাই ভাল। বাংলা ভাষায় শব্দটির যদি প্রয়োজন থাকে, আর্ষপ্রয়োগ 'মুহ্যমান'-ই গ্রহণ করতে হবে, 'মোহ্যমান' বা 'মুহ্যন্' দুই শব্দেই পাঠকের চক্ষু স্থির হবে।

রুদ্যমান :

সংস্কৃতে একটি শব্দ আছে 'বোরুদ্যমান', মানে 'অতিশয় রোদনযুক্ত'। অতিশয় অর্থে যঙ্ প্রত্যয়, যঙন্ত ধাতু আত্মনেপদী হয়। যঙন্ত 'রুদ্' ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ে রূপ হয় 'বোরুদ্যমান'। কিন্তু 'বোরুদ্যমান' শব্দটা বড়ই সংস্কৃতগন্ধী। অতএব 'রো' বর্জন করে বাংলা রূপ দেওয়া হল 'রুদ্যমান'। এখন নিষ্কর্মা (না কর্মনাশা ?) বৈয়াকরণ বসে বসে ভাবুন শব্দটার প্রকৃতি-প্রত্যয় কী হবে।

ক্রন্দমান :

'রুদ্যমান' যখন পাওয়া গেল তখন 'ক্রন্দমান' হবে না কেন ? হোক না 'ক্রন্দ্' পরস্মৈপদী ধাতু, 'রুদ্'-ও তো পরস্মৈপদী ধাতু।

প্রশংসমান :

'শন্স্' ধাতু পরস্মৈপদী। অতএব, দু-একজন বিশিষ্ট সাহিত্যাচার্য 'প্রশংসমান-লোচনে' দেখলেও 'প্রশংসমান' শব্দকে আমরা প্রশংসনীয় মনে করতে পারছি না।

মজ্জমান :

'মস্জ্' ধাতু পরস্মৈপদী। 'মজ্জমান' চালালে নিমজ্জনের আশঙ্কা থাকে। শীর্ষস্থানীয় কবিরা পার পেয়ে যেতে পারেন তাঁদের পর্বতপ্রমাণ কৃতিত্বের জন্য, কিন্তু সাধারণ লেখকরা বিপন্ন বোধ করবেন না ?

চলমান, ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান :

'চল্, ভ্রম্' পরস্মৈপদী। সুতরাং 'চলমান' যত কম চলে ততই ভাল। আর যাঁরা ভ্রমণশীল তাঁরা কদাচ 'ভ্রমমান' হতে যাবেন না, 'ভ্রাম্যমান' হলে তো ঘুরিয়েই মারবে।

প্রবহমান .

'বহ্' ধাতু উভয়পদী, সুতরাং 'বহমান' পদে বাধা নেই। কিন্তু শব্দটা

যে তেমন জুতসই হচ্ছে না, কেমন যেন হাল্কা হাল্কা লাগছে। অতএব চালাও 'প্রবহমান', হল-ই বা প্র-পূর্বক বহ্ ধাতু পরস্মৈপদী।

অপস্রিয়মান :

আহাহা। শব্দের কী বাহার, কী সুষমা, কী ধ্বনি। কেউ বলতে পারবে এ শব্দ সংস্কৃত নয়? অভিধানে শব্দটা পাওয়া যায় না? তা, অভিধানকাররা কি সব শব্দের সন্ধান রাখেন? এ শব্দ ছাড়া চলবে না—হোক না 'সৃ' ধাতু পরস্মৈপদী। কেউ কেউ আবার একটু বিভ্রমেও পড়েন—বানানটা কি 'অপসৃযমান'? না, না। কৃ ধাতুতে যখন ক্রিয়মাণ, মৃ ধাতুতে ম্রিয়মাণ, সৃ ধাতুতেও 'স্রিয়মান'-ই হবে। কিন্তু দন্ত্য-ন কেন? ও—তাই নাকি? তা একটা দিলেই হল; দন্ত্য-ন যদি না চলে, দিয়ে দাও মূর্ধন্য-ণ।

অস্তমান :

এইবার মোক্ষম্। এবার আর পরস্মৈপদী আত্মনেপদী 'ধাতু' নয়, একেবারে গোটা 'শব্দ'র পরেই শানচ্ প্রত্যয়! বুঝে দেখুন শানচ্-এর কী সর্বগ্রাসী বিক্রম, অপরিমেয় মহিমা!

তবে লেখকদের এতটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা বোধহয় সঙ্গত হচ্ছে না। তাঁরা হয়তো জেনেশুনেই এসব শব্দ তৈরি করছেন। এ শব্দগুলি যে সংস্কৃত নয় তার প্রমাণ রেখেছেন তাঁরা 'ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান, প্রবহমান, অপস্রিয়মান' শব্দগুলিতে মূর্ধন্য-ণ বর্জন করে দন্ত্য-ন বসিয়ে। ণত্ব-বিধি যে বাংলা শব্দে প্রযোজ্য নয়, এযুগে তা কে না জানে? কেবল সন্দেহ জাগে যখন খাঁটি সংস্কৃত শব্দেও মূর্ধন্য-ণ উধাও হয়ে যায়।

বিষ্ণু-দে : কবিতার পাঠান্তর

'ঘোড়সওয়ার', 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'

অরুণ সেন

জাতীয় গ্রন্থাগারে জীবনানন্দ দাশের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের পরে খুব সম্প্রতি বিষ্ণু দে-র পাণ্ডুলিপি-সংগ্রহের উদ্বোধন সম্পন্ন হল। ভবিষ্যতে আরো নানা সংগ্রহে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পাণ্ডুলিপির এই ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে, এরকম আশা করা যায়। আর এই উদ্যোগের পথিকৃৎ হিসেবে ডঃ রবীন্দ্র-কুমার দাশগুপ্ত নিশ্চয়ই সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। যদিও হয়তো এর আয়োজনে আড়ম্বর, ঘোষণা ও প্রতিজ্ঞা যতটা, যথাযথ সংগঠনে ঐকান্তিকতা বা উৎসাহ ততটাই কিনা সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তাই কি দায়সারা গোছের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান ঘটে যায়, প্রায় অগোচরে—পাণ্ডুলিপি বিষয়ক আলোচনার কোনো স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রস্তাব-পরিকল্পনাও পাত্তা পায় না?

তবু আপাতত এতেই খুশি হওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথের পরে, আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায়, থিসিস-মুখী আগ্রহ ছাড়াই, তথ্যজ্ঞান ও উপাদান-সংগ্রহের গুরুত্ব যদি এর ফলে স্বীকৃত হয়, তবে তো ভালোই। বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রেও, শুধু পাণ্ডুলিপি নয়, বিভিন্ন মুদ্রণের পাঠান্তর থেকে অনেক কিছুই শেখার-জানার থাকে—কেবল বিষ্ণু দে সম্পর্কেই নয়, আধুনিক কবিতার জন্মকালীন বিভিন্ন সমস্যা, দায়-ঝোঁক ও চর্চা এবং আবিষ্কার সম্পর্কেও। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যভাষার মৌলিকত্ব কিভাবে অনুশীলিত ও অর্জিত হচ্ছে, সেই প্রক্রিয়ার ছবি পাওয়া যায় এই পাণ্ডুলিপি বা পাঠ-পাঠান্তর থেকেই।

বিষ্ণু দে-র কবিতা-আলোচনার সূত্রে তাঁর কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি, প্রধানত কবিতার, কিছু-কিছু গদ্যরচনারও, দেখার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর রচনাপঞ্জি তৈরি করতে গিয়ে তাঁর মুদ্রিত রচনার পাঠান্তরও (সাময়িকপত্রে প্রথম প্রকাশের পর গ্রন্থের এক বা একাধিক সংস্করণে) নজরে এসেছে। অবশ্য বিষ্ণু দে-র প্রথম দিককার রচনার, বিশেষত কবিতার, কোনো পাণ্ডুলিপিই বোধহয় রাখা হয় নি। ফলে, 'উর্বশী ও আর্টেমিস', 'চোরাবালি' থেকে শুরু করে 'সন্দ্বীপের চর' পর্যন্ত তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনার পাণ্ডুলিপি দেখার কৌতূহল আজ আর কোনো মতেই মিটবে না।

কিছু কিছু অসমাপ্ত গদ্যরচনার পাণ্ডুলিপি—সেই যখন প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে তিনি গল্প লেখার চেষ্টা করছিলেন—সেগুলোই আমাদের দেখা তার হাতের লেখার প্রাচীনতম নিদর্শন। তা ছাড়া একটি টুকরো কাগজে 'চোরাবালি' গ্রন্থের 'ক্রেসিডা' কবিতার একটি অংশ—নোটবুকের ছেঁড়া পাতায়—দেখা গেছে। সেটি নিম্নরূপ :

ভৈরব

এই তবে ভোরবেলা।
তুষারবর্ণ ফুলেরা আমার।
কোনো সান্ত্বনা নেই?

—

সকাল ও রাত, তবু
একদা ছিলো না আমাদের কাছে
তফাৎ তো তাতে কিছু।

প্রথম তিনটি লাইন তো সকলেই সহজে চিনতে পারবেন, যেটি সাময়িক-পত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল :

এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি আমার
কোনো সান্ত্বনা নেই?

তারপর ঐ অংশটিই, গ্রন্থে :

এই তবে ভোরবেলা।
হে ভূমিশায়িনী শিউলি। আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই?

শুনেছি, 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' কবিতার বহু টুকরো অংশই এভাবে আলাদা করে লেখা হয়েছে—বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে তার ইঙ্গিতও তিনি রেখেছেন। এভাবে টুকরো-টুকরো অংশকে গাঁথার নৈপুণ্যের কথা যেমন কেউ কেউ বলেছেন, তেমনি কেউ কেউ এ-উপায়ে দীর্ঘ কবিতা গড়ার ন্যায্যতার প্রশ্নও তুলেছেন। সেই নান্দনিক প্রশ্ন বিচারের স্থান অবশ্য এটা নয়। কিন্তু লক্ষণীয়, টুকরো-কাগজে লেখা ঐ তাৎক্ষণিক লাইন তিনটির ২য় লাইন বিশেষ কবিতার বিশেষ অভিজ্ঞতার চাপে রূপান্তরিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন বাক্‌প্রতিমা হয়ে উঠেছে। এ-সময়ের আরো কিছু নমুনা পেলে আরো স্পষ্ট হতো কিভাবে কবির মনে বিচ্ছিন্নভাবে অনুরণিত ছোট ছোট স্তবক

পুনর্লিখিত হয়ে রূপ পাচ্ছে প্রথম যুগের ভাষার ঐ কঠিন দীপ্তিতে।

এ-রকম লিখন-পুনর্লিখন যে অবিরল ঘটেছিল সে অনুমান আমরা করতেই পারি। শুধু বিষ্ণু দে-র কবিতাতেই নয়, আরো অনেকের কবিতাতে। আধুনিক কবিতার নন্দনের সঙ্গে তা জড়িত। সহজ সাবলীল রচনার আদর্শ আধুনিক কবিদের কাছে আর গ্রাহ্য ছিল না। বিষ্ণু দে-র কাছেই শুনেছি, শৈশবের বহু চতুর পদ্যরচনা তিনি নষ্ট করে ফেলেছিলেন, তাদের ঐ তথাকথিত সহজ সাবলীলতার জন্যই। আরো শুনেছি, সুধীন্দ্রনাথের কবিতালেখার খাতায় কাটাকুটির অজস্রতায় তিনি কিরকম মুগ্ধ হয়েছিলেন, 'উটপাখি' কবিতা দু-বছরে তিরিশ বার পুনর্লিখন করা হয়েছে এ-তথ্যের সপ্রশংস উল্লেখও তিনি করেন। কিংবা জীবনানন্দ সম্পর্কে লেখেন: 'জীবনানন্দ প্রেরণাবশত কবিতাটি লিখেই বিরত হতেন না, অনেক সময়েই তার মানসধৃত মৌলরূপের কাঠামোতে…লৌহতন্ত্রীর মতো তাকে মেলাতে মেলাতে ক্লান্তি-হীনভাবে, স্বকীয়তায়, আধুনিকতায়, পুনর্লিখিত করতেন।'

মানসধৃত মৌলরূপের এই পুনর্লিখন বিষ্ণু দে-র কবিতায় কতখানি কিভাবে ঘটেছিল প্রথম পর্বে, তার দৃষ্টান্ত পাণ্ডুলিপির অভাবে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু 'চোরাবালি'-র বেশ কয়েকটি কবিতার বিভিন্ন মুদ্রিত পাঠে যে কিছু কিছু তাৎপর্যময় রূপান্তর ঘটেছে, তার দৃষ্টান্তে আমরা ক্লান্তিহীন পুনর্লিখনের প্রক্রিয়াটা আন্দাজ করতে পারি।

'চোরাবালি'-র বহু কবিতাই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থস্থ হয়েছে প্রথমে ভারতীভবন-এর প্রকাশনায় (১৯৩৭) এবং পরে সিগনেট প্রেস-এর সংস্করণে (১৯৬০)। 'মন-দেওয়া-নেওয়া' (যার প্রথম প্রকাশকালে নাম ছিল 'আধুনিক প্রেম'), 'সন্ধ্যা', 'পঞ্চমুখ', 'গার্হস্থ্যাশ্রম', 'বিরমিষা', 'উভচর' প্রভৃতি কবিতায় ছোট-বড় অজস্র পরিবর্তন ঘটেছে সাময়িকপত্র, ভারতীভবন-সংস্করণ ও সিগনেট-সংস্করণের মধ্যে—শব্দের পরিবর্তনে, শব্দের সংযোগে-বিয়োগে, নতুন বিন্যাসে। প্রথম প্রকাশিত কবিতার ভিন্ন ভিন্ন অংশকে ওলোট-পালোট করে একই বা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় নানাভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই 'সম্পাদনা' ও নতুন বিন্যাসই বুদ্ধদেব বসু-কে প্রবোচিত করেছিল এ-কথা লিখতে: '[প্রগতি-তে প্রকাশিত] ট্রিয়োলেট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রচনাগুলোকে বিক্ষিপ্ত না-রেখে যে-ভাবে পারম্পরিক সংযোজনায় আবদ্ধ করেছেন [বিষ্ণু দে] তাতে যথেষ্ট নিপুণতা আছে।'

আপাতত অবশ্য আমরা 'চোরাবালি'-র সব কটি কবিতাকে আলোচনায়

না এনে বহু-পরিচিত তিনটি কবিতার পাঠান্তরের সূত্রেই বিষ্ণু দে-র ভাষা-সন্ধানের প্রথম পর্যায়কে ধরতে চাইছি, যদিও জানি এ সন্ধান এ কটি কবিতাতে তো বটেই, এমনকি 'চোরাবালি'-তেই থেমে থাকে নি।

২

'ঘোড়সওয়ার' প্রথম কবিতা 'চোরাবালি'-র, যাকে রবীন্দ্রনাথ ভুল করে উল্লেখ করেছিলেন 'চোরাবালি'-র নামকবিতা বলে। কবিতাটি প্রথম বেরোয় 'পরিচয়'-এ ১৯৩৬ সালে (শ্রাবণ, ১৩৪৩)। তখন ১২-১৪ লাইনে ছিল :

দান-প্রতিদান কখনো হয় না গড়া ?
শশকবিষাণ দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মআহুতি চিরকাল থাকে বাকি ?

ভারতীভবন সংস্করণে সেটি ছাপা হল :

এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

শেষ লাইনটির পরিবর্তন গৌণ এবং শ্রুতিগত, কিন্তু প্রথম দুটি লাইনের পরিবর্তন অনেক ব্যাপক। বিশেষত প্রথম লাইনে প্রতিমার একটা নির্দিষ্টতা এসে যায়।

এরকমই প্রতিমার সংগঠন ও পুনর্গঠন চলতে থাকে ১৭-১৮ লাইনে 'সাগর পারে নেমেছে লবণজল, / হৃদয় আমার চড়া'-র বদলে 'সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল, / হৃদয়ে আধির চড়া' কিংবা ২৯ লাইনে 'তুষার-মেঘের দুরন্ত আশা মনে'-র বদলে 'হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে' জাতীয় নানা পাঠান্তরে। কবি যে শব্দকে ক্রমশই আরো তির্যক, আরো নিষ্কাশিত, ও সংবাহী করে তুলতে চাইছেন তা বোঝা যায়। ৪১ লাইনে 'চেয়ে দেখ দূরে অমরলোকের দ্বার।'-এর জায়গায় 'চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার।' হয়তো শ্রুতির কারণেই শুধু নয়, এই সব দিক থেকেই আরো অর্থময়, সুধীন্দ্রনাথ-কথিত নানার্থব্যঞ্জনা আরো প্রসারিত, যুং-বিষয়ক অতিকথন সমর্থিত। কোনো কোনো জায়গায় আবার শব্দের নিরন্তর অদলবদলে তিনি কানের সাবালক দাবিকেই মেটাতে চান বাক্‌প্রতিমার ব্যঞ্জনাপ্রসারের অঙ্গাঙ্গিতাতে। যেমন,

৩২ লাইনে 'কামনার তাপে বায়ু কাঁপে থরো থরো' হয়ে যায় 'কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরো থরো।'

৩

এর চেয়েও তাৎপর্যময় ও ব্যাপক পরিবর্তন বোধহয় 'ওফেলিয়া' কবিতার পাঠান্তরে। 'ওফেলিয়া' বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এর কার্তিক ১৩৪১ (১৯৩৪) সংখ্যায়। প্রথম গ্রন্থভুক্ত হওয়ার পর যে পরিবর্তনগুলো ঘটে, তার বেশ কিছুই অবশ্য গৌণ। একটা বড় তাগিদই ছিল কাব্যিক শব্দবর্জন। 'হেথা', 'তব', 'মোর' জাতীয় শব্দ 'পরিচয়'-এ ছিল। এখানে তা বর্জিত হল। ১৬-২০ লাইনে 'পরিচয়'-এর 'আঁধার জমেছে হেথা কালো হ'য়ে পাথুরে পাহাড়' হয়ে যায় ভারতীভবন-গ্রন্থে 'আঁধার এখানে জমে কালো কালো পাথুরে পাহাড়'। কাব্যিক শব্দবর্জনের নীতির সূত্রে শব্দের এরকম অদলবদল অনিবার্য হয়ে ওঠে আরো নানা জায়গাতেই।

ভারতীভবন-সংস্করণেও এই নীতি সর্বত্র অনুসৃত হয় নি। সিগনেট-সংস্করণেই 'ঘেরিয়া'-র জায়গায় 'ঘিরে' বা 'তোমারে'-র জায়গায় 'তোমাকে' লেখা সম্পূর্ণ হল। কাব্যিক শব্দবর্জনের জন্য শব্দের ওলোটপালোটের কৌশল তাই সিগনেট-সংস্করণ পর্যন্ত ঘটাতে হয়েছে। 'পরিচয়'-এর 'হৃদয় মোর ভোলালে, ওফেলিয়া', ভারতীভবন-সংস্করণে 'ভোলালে মোর হৃদয়, ওফেলিয়া', সিগনেট-সংস্করণে 'আমার মন ভোলালে ওফেলিয়া'। এরকমই ৪৫ লাইনে ভারতীভবন-সংস্করণের 'মরণে মোরা করি নি জয়' সিগনেটে 'মরণে দোঁহে করি নি জয়', ৪৯ লাইনে 'দেবযানী। তব সন্ধ্যাপ্রণাম মাঝে' এখন 'দেবযানী। সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে'—এসব হয়তো খুবই গৌণ পরিবর্তন, কিন্তু ৫১ লাইনে দেখি প্রয়োজনীয় কথাবিস্তারেও তাঁকে যেতে হয়। তাই 'শাপমোচনের সুরভি সুরে—এ মোর সাধনা' হয়ে যায় 'শাপমোচনের সুরভি সুরের পাকে পাকে এই সাধনা আমার'। 'পরিচয়'-পাঠে ২৫ লাইনের 'শরতের শাদা মেঘ' ভারতীভবন-সংস্করণে যে 'শরতের শাদা খামকাখুশির মেঘ' হয়, তার পেছনে অবশ্য অর্থযোজনারই তাগিদ।

শব্দসমাবেশের ধ্বনিগত নির্দিষ্টতায় পৌঁছনোর অস্থির আকুতি এই পাঠ-পরিবর্তনগুলিতে খুবই স্পষ্ট। তাই ৩১ লাইনে 'পরিচয়'-এর 'আমারই হৃদয় নিথর গভীর অতল পদ্মদীঘি', ভারতীভবন-সংস্করণে 'আমারই হৃদয় নিথর গভীর নীলিম পদ্মদীঘি', সিগনেট-সংস্করণে 'আমারই হৃদয় নিথর গভীর নীল

সে পদ্মদীঘি'।

কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্য অপেক্ষাকৃত গুরুতর ধরনের—এমনকি হয়তো চিত্রকল্পনা বদলেরও। ৩ লাইনে 'পরিচয়'-এর 'স্রোতগ যাত্রার ছায়া ফেলে দাও, স্যাটিন-এ ঘুম'-এর শেষাংশ ভারতীভবন-সংস্করণে 'দূর্বাদল ঘুম'। এভাবেই ৫৯ লাইনের 'উদ্ধত প্রেম উত্তোল হাতে আনো' হল 'উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো'।

৪৬-৪৭ লাইনে 'পরিচয়'-এ আছে :

বালীর মতো বাঁধি নি আজো মোরা।
বিদায়রবি বর্ণালোকে, শিশিরভেজা ভোরে

ভারতীভবন-সংস্করণে সেটাই

অতনুরতি বাঁধিনি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশির-সিত ভোরে

কিংবা ৪৯ লাইনের 'অমরবাসিনী, তব সন্ধ্যাপ্রণাম-মাঝে' এখন 'দেবযানী। সাঁঝে তোমার প্রণাম মাঝে'।

কবিতার একেবারে শেষ ৩টি লাইনের পরিবর্তনও খুব উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। 'পরিচয়'-এর পাঠে

ট্রয়ের প্রাচীর হলো চুরমার এল্‌সিনোরেই
ধূমকেতু এই বিশ্ব আমার তোমারই চোখে
পেয়েছিল তার পরমাগতি।

ভারতীভবন ও সিগনেট গ্রন্থে, দেখা যায়, কবি প্রতীচ্য পুরাণের অনুষঙ্গ বাদ দিতে চান :

অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চুরমার হল মর্ত্যলোকেই।
ধূমকেতু এই বিরাটদাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি।

'ওফেলিয়া' (এবং 'ক্রেসিডা') কবিতার স্তবকবিন্যাস অনেককে বিমূঢ়, অনেককে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু গ্রন্থে যেভাবে এই স্তবকগুলি আছে, 'পরিচয়'-এ প্রথম প্রকাশের সময় কিন্তু তা ছিল না। বিশেষভাবেই অন্যরকম ছিল। কবিতাটি সংখ্যানির্দেশেই দশটি ভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রন্থে শুধু সংখ্যাগুলিই লুপ্ত হয় নি, তার বিন্যাসেরও বদল ঘটেছে।

৩

'ক্রেসিডা' কবিতাটি যখন 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪৩ (১৯৩৬) সংখ্যায় বেরোয়, তখন তার নাম ছিল 'মৃত্যু, প্রেম ও মহাকাল'। 'কবিতা'-য় বারোটি অংশে বিভক্ত—ভারতীভবন-সংস্করণে সেই সংখ্যানির্দেশ উঠে গেল বটে, কিন্তু বিভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে এদের আপাতবিচ্ছিন্নতা বোঝানো রইল। তবে 'ওফেলিয়া'-র মতো 'ক্রেসিডা'-তে বিন্যাস আপাদমস্তক ওলোটপালোট হয় নি—শুধু দু-জায়গায় দুটি স্তবক আগে-পরে করা হয়েছে। শব্দের বা শব্দবিন্যাসের পরিবর্তন অবশ্য খুব কম নয়।

'ক্রেসিডা'-র বহু বিখ্যাত লাইন বা শব্দগুচ্ছ, যা পাঠকদের স্মৃতিলগ্ন হয়ে আছে, তার আদিরূপ কিন্তু অনেক সময়ই ভিন্ন ছিল। গোড়াতেই, ৩ লাইনে 'ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন' ছিল 'শোকাবসন্ন নিদ্রাহীন', ১৩ লাইনে অনন্তস্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ' ছিল 'অন্তবিহীন ক্রতোকৃতের শেষ'। এমনকি ২১ লাইনের বিখ্যাত বারীন্দ্রিক উদ্ধৃতি 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে' আদতে ঈষৎ বাঁকাভাবে ছিল 'রজনীগন্ধা দলিত আমার কাল রজনীর ঝড়ে'। ৬৩ লাইনে 'শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে মুখে, সারা শরীরে নগ্নভাষা।' 'কবিতা' পত্রিকায় যেন একটু বাগাড়ম্বর: 'শত্রুশিবিরে কটীর নীবির চোখের মুখের তন্বীতনুর এই বিবস্ত্র ভাষা'। ৭৩ লাইনে 'বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধমন্নাবির' ছিল 'অপাপবিদ্ধ বুদ্ধি আমার অন্নাবির'। যে-সব লাইনগুলো এখন পাঠকদের অপরিবর্তনীয় অনিবার্য ও দৈব লব্ধ বোধহয়, দেখা যায়, তাদের সম্পর্কে কবি হয়তো কোনো না কোনো সময় অনিশ্চিতই ছিলেন—অন্তহীন অতৃপ্তি ও চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই খুঁজে নিতে হয়েছে সেই ভাষা।

শব্দকে পুনর্বিন্যস্ত করে, সঠিক শব্দে পৌঁছনোর অবিরল অনুসন্ধান 'ক্রেসিডা'-র বহুস্থানে, মুদ্রিত পাঠান্তরেই। 'কবিতা' পত্রিকায় ২৫-২৮ লাইনে

ধোঁয়ামেঘে ঠেলে নীলমেঘ, নীলে কালো মেঘেদের ভিড়।
মেঘে আজ ভিজা শ্রাবণের দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে পূবরীহাওয়াতে, বজ্রও দিল ডুব।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও কথাগুলি ওড়ে তার।

ভারতীভবন-সংস্করণে:

লালমেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভিড়।
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কীর দিন হল একাকার।

বিদ্যুৎ নেভে ঈশানবিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

এরকম নানা অভিপ্রায়ের পরিবর্তন 'ক্রেসিডা'-র পাঠান্তরে সর্বত্র। ঝোঁকের পরিবর্তনে, ২৯ লাইনে 'কবিতা'-য় 'ভ্রান্তি তোমার নিয়ে যায় যদি', ভারতীভবন-সংস্করণে 'ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে যায় যদি', সিগনেট-সংস্করণে 'ভ্রান্তি আমারে'। অর্থপ্রসারে, ৩০ লাইনের 'আঁধারক্রান্তি কাকে দেবে উপহার?' হয় 'ভবিষ্যহীন আঁধারক্রান্তি'। শ্রুতির বৈচিত্র্যে, ৪৬ লাইনে 'লোকোত্তর এ রূপসী কেন বা লোকায়ত এই মরণ-তৃষা?' এখন 'লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন? লোকায়তিক এ মরণ-তৃষা?' সংকোচনের দাবিতে, ৫০ লাইনে 'জীবনের লোভে বিদিশা বিভ্রমণ' হয় 'জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ'। ৪৮ লাইনে দেখা যায় শব্দবদল করেও অপ্রচলিত শব্দ-ব্যবহারের তির্যকতাকে ছাড়তে চান না কবি। তাই 'কুটসোল্লুটে বলি নাক তাই কথা' হয় 'সোৎপ্রাসপাশে বলিনাকো তাই কথা'। আবার এরকম গৌণ পরিবর্তনও আছে, ৪১ লাইনের মতো, যেখানে বিখ্যাত 'ঊষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা'-য় পৌঁছনোর আগে কবি লেখেন 'ধূসর আকাশে ঊষর হয়েছে মরণের আনাগোনা'।

'ক্রেসিডা'-র ৩২-৩৪ লাইন ('স্বসমুখ সে কোন্ দেবতার জবাসঙ্কাশে!') 'কবিতা'-য় ছিল না। তবে সেখানেও ভারতীভবন-সংস্করণের 'মোর কুরুবক জেবলী কেবল' সিগনেট-সংস্করণে হয় 'আমারই শেফালি জেবলী কেবল'।

'ক্রেসিডা'-র ৮০-৮৬ লাইনের স্তবকদুটিও 'কবিতা'-য় ছিল না, ভারতী-ভবন-সংস্করণেও না। সিগনেট-সংস্করণের আগেই অবশ্য 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় (১৯৫৫) এই সংযোজন আমরা পাই। কাব্যার্থের দিক থেকে স্তবক দুটির গুরুত্ব সীমাহীন—এখানেই বিষ্ণু দে হেন্‌রিসনের ক্রেসিডাকে তাঁর কবিতায় বিচিত্র মৌলিকতায় সংলগ্ন করে দিলেন। কিন্তু ভারতীভবন-সংস্করণের মুখবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ কি করে লিখলেন, 'উপসংহারে তিনি হেন্‌রিসন্-এর পদাঙ্কে চলেছেন'? তিনি কি ছাপা হয়ে যাবার পরে বিষ্ণু দে-র সংযোজনটুকু জেনেছেন? যেমন আমরা পেয়েছি ভারতীভবন-সংস্করণের একটি পুরনো গ্রন্থে বিষ্ণু দে-র নিজের হাতের লেখায়? না কী শেষ পাঁচটি লাইন থেকেই তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত?

'ক্রেসিডা'-র শেষাংশটি একদা আমাদের খুব ভাবিয়েছিল, এখনও সে-ভাবনার অবসান হয়েছে এমন বলা যায় না। 'রণমন্থনে দূরবিদেশের নারী'

কে? চসব, শেক্সপিযব, হেন্‌রিসন—কেউই তাব জবাব, অন্তত স্থূল জবাব, দিতে পাবে না। কাব্যগত এই সমস্যার সমাধান পাঠ-পাঠান্তবে মেলে কিনা তাবও খোঁজ কবা হযেছে। 'কবিতা'-ব পাঠে ছিল: 'কালো সন্ধ্যায দিল শ্বেতবাহু দুটি'। ভাবতীভবন ও সিগনেট-সংস্কবণে 'দিল' হয়ে যায 'দিলে'। এর ফলে কর্তাবও কি বদল ঘটে? শ্বেতবাহু কি ক্রেসিডাব? না কী সুধীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'নবোঢার বাহুবন্ধন', তা-ই?

শেষ লাইনে 'কবিতা' পত্রিকাব 'স্মবণ তোমাব নামে আজো তববারি' রূপান্তবিত হয 'স্মবণ তোমার হানে আজো তববাবি।'—বোঝা যায, আধুনিক কবিতার শব্দসন্ধান কতদূব অস্থিরতার মধ্য দিয়েই অমোঘতাকে স্পর্শ করতে চায়।

৪

দৃষ্টান্ত তো বাডিযেই যাওযা যায—আলোচনাও হতে পাবে অন্তহীন। প্রত্যেকটি পাঠান্তরেব পেছনেব নান্দনিক লক্ষ্যের সন্ধানও অপেক্ষায় থাকতে পাবে কোনো মেধাবী আলোচকের। কিন্তু আসল কথা এই, আধুনিক বাংলা কবিতার তথ্যহাজিবাব গুরুত্বকে আব অস্বীকাব কবা যাবে না। তাহলেই জানা যাবে: ১. আত্ম-অচেতন কাব্যোচ্ছ্বাসেব অনর্গলতাকে পেছনে বেখেই আধুনিক কবিতাব আত্মসচেতন অনুসন্ধানী মনেব যে কাজ শুরু হযেছিল তাকে উল্‌টে দেওযার চেষ্টা অনাধুনিকতা। ২. সেই আত্ম-সচেতনতা যে সব-সময পাণ্ডুলিপিব কাটা-ছেঁডা বা মুদ্রণেব অস্থিব পাঠান্তবেই যান্ত্রিকভাবে আসবে এমন নাও হতে পারে। ঠিকই কবিব সমগ্র কাব্যজীবন ও কাব্য-অভিজ্ঞতাব সজাগতায কখনও মনের ভেতরকাব দহন থেকে বেবিযে আসতে পাবে প্রায প্রেবণালব্ধ শব্দস্রোত, কিন্তু আধুনিক কবি তাব পাশাপাশি খুব বেশিক্ষণ গোপন বাখতে পাবেন না তাঁব শব্দসন্ধানেব লডাই—পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তবের অরণ্যে প্রকাশ হযে পডে তাঁব ভিন্ন যাত্রাবস্তু। বিষ্ণু দে-ব পববর্তী যুগেব পাণ্ডুলিপিতেও, কখনো দেখি মৌল রূপেব অকলঙ্কিত নিশ্চয়তা, আবাব কখনও তাব চেযেও বেশি দেখি অজস্র পাতায নানান কলমে-কালিতে-পেন্সিলে ছিন্নভিন্ন অনুসন্ধান, লডাই ও উপার্জন।

খেলার মাঠ না কারবালা

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভারত খেলোয়াড়ের মেলায়
তোদের কবি গর্ব
বাঙালি ফুটবলের রাজা
বাঙালি নয় খর্ব।
হায় রে বাগান। হায় বেঙ্গল।
হারালি আজ সর্ব।

কাণ্ড দেখে দর্শকেরা
হাঁকে, 'পালা। পালা।'
ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি—
'মার ডালা। মার ডালা।'
খেলার মাঠ না মরণফাঁদ
বাংলার কারবালা।

চতুর্দশপদী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ঘুরেছি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে হে প্রণয়, তোমার সন্ধানে
লোকের অজ্ঞাতসারে। সেই ঋজু দেবদারু গাছ
রাস্তার বাঁ দিকে ছিল চেনে তাকে অরণ্যসমাজ
প্রশান্ত মর্মরকম্প্র মূক তার সাক্ষ্য মন মানে।

প্রেম প্রিয় প্রেয় বলে যতগুলি শব্দ অভিধানে
রয়েছে, সেগুলি নিয়ে অলঙ্কারে বহুবর্ণ সাজ
পরাতে বাসনা নেই, ভাব দিয়ে অন্তর্গূঢ় কাজ
মিটুক বা না-মিটুক মত্ত অলি মধুর সন্ধানে।

বহুমুখী কটাক্ষের মাঝামঞ্চে বিবিধ পর্দার
ওঠা নামা দেখে দেখে ক্লান্ত মন তত্ত্ববোধিনীকে
প্রজ্ঞায় অর্পণ করি কেন তুমি জানো নিরাকার
কন্দর্পের ছলাকলা রতিব্যূহ রচে চতুর্দিকে।
যে চোখে কটাক্ষ নেই তারি খোঁজে অষ্টাদশাক্ষরে
চতুর্দশপদে রচি বাঙ্ময় প্রতিমা লঘুস্বরে।

স্বপ্নকে দুচোখে রেখে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বপ্নকে দুচোখে রেখে যুগ কেটে যায়।

প্রেম ভালোবাসা রূপ পায়
স্বপ্নের ছোঁয়ায়
প্রেমিকের বিপ্লবীর সন্ন্যাসীর চোখে ;
জীবনের শুরুতে কি মধ্যযামে শেষ প্রহরেও
একটি নিবিড় স্বপ্ন চোখের মণিতে
কে না ধরে রাখতে চায়।
সফল মানুষ তার স্বপ্ন খুঁজে নিবিড় সন্ধানে
অন্বিষ্টকে পায়।

পথে যেতে নানা বাধা চড়াই উৎরাই
নদী টিলা মাঠ তেপান্তর
জেগে ওঠে ; অথচ এসব কোনোদিন
প্রবল বাধার মতো জাগে নি কখনো
যদি স্বপ্ন চোখে লীন থাকে।

স্বপ্নের টানেই হাঁটে পৃথিবীতে প্রতি পদক্ষেপে
কবি শিল্পী প্রেমিক বিপ্লবী ;
স্বপ্নকে পাঠালে নির্বাসনে
সব মন্ত্র অর্থহীন ;
পড়ে থাকে শুধু চতুর্দিকে
অনুর্বর প্রান্তরের ছবি ॥

নিজেকে ছাখো, সাঙ্কো পাঞ্জাকেও ছাখো

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

গুণী, তোমার জ্ঞানের বোঝা
দাও গাধাদের পিঠে চাপিয়ে।
আমরা তোমার পোশাক চাই না,
তোমাকে চাই, গুণী হে।

২

কেন তুমি নিজের কথাই কেবল বলো?—
ফেনিয়ে বলো, ফুলিয়ে বলো?
কবিকে কি মানায় এমন অহঙ্কারের বর্ণমালা?—
তুমিই বলো।

৩

একটি দ্বীপের শস্য—অন্ন
সাঙ্কো পাঞ্জা চেয়েছিলেন।
সেই দ্বীপটি কোথায় আছে,
দেখেও তিনি গিয়েছিলেন।

দ্বীপ জোটে নি, তবু সাঙ্কো
মরে যান নি—বেঁচেই ছিলেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০

সঞ্চয়

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সহস্র ধারায় যত জল ঝরে
তত তৃষ্ণা থেকে যায়,
বন্যতা উদ্দাম প্রেম অসংহত
তবু ভূমিজ করুণা।

চারিদিকে শব্দ সমারোহ বৃষ্টি ঝরে
জলের ধারায় নেই সঞ্চয়ের ক্লেশ।

যেমন অলিন্দ পথে চলে গেলে
অবয়ব কিছু রেখে যাও
কিছু যেন ঝরে ঝরে পড়ে চারপাশে
প্রত্যয়ের সমূহ সঞ্চয়।
সহস্র ধারায় ঝরে প্রেম তবু তৃষ্ণা থেকে যায়।
কেননা তৃষ্ণার মতো সঞ্চয়ের পাত্র হাতে নেই।

বেআইনি চেতনা আজ

মণীন্দ্র রায়

যেন এক বিদেশী এয়ারপোর্টে
লালনীল আলোর সংকেতে
কিছু চিন্তা ভিসাহীন রয়েছে দাঁড়িয়ে।
অন্য অনুপ্রবেশের খোঁজে তাই যেন
রাজেয়াপ্ত অক্ষরের এত মুসাবিদা।

বড় কষ্ট এইসব রুটিনবিহীন
মিনিটের চাপ বুকে বয়ে,
বড় কষ্ট অ-নাগরিকের পথে হেঁটে।
কয়েকটি জানালা যদি খুলে যেত, তবে
এ জীবন জেরবার হতো না এমন
সময়ের চাঁদমারি চুমোর বুলেটে।

ডিমের ভিতরে পাখি যে-রকম জন্ম নিতে নিতে
বুক চাপা আকাশের মৃত্যু-জন্ম-সংহারে চৌচির,
তেমনি তাগিদ নিয়ে চেকপোস্ট আলো করা সঙিনের মুখে
বে-আইনি চেতনা আজ
ভয়াবহ স্থির।

অমীয় রায়

নবাব ক্লাইভ

'তুমি যে ভাবে এগোচ্ছ ববার্ট, তাতে তামাম ইণ্ডিযা কোম্পানিব দখলে চলে আসবে।'

'দূব!' মুখ থেকে গডগডার নল নামিযে ক্লাইভ বললে, 'তুমি মান, ইণ্ডিয়াব ম্যাপটাই দেখো নি। দেখেছো?'

ক্লাইভেব বাল্যবন্ধু ম্যাবিন অফিসার মান অতোশত বোঝে না। সে তেডে তেডে কথা বলতে ভালবাসে। ফোর্ট সেন্ট জর্জে ক্লাইভ যখন তরুণ বাইটাব তখন সে তাব শুধু এক বোতলেব ইযারই না, এক মহিলার খদ্দেব। তাবপব থেকে ক্লাইভেব ক্রমাগত উত্থান তাব জীবনেব সবচেযে বিস্মযেব বস্তু। কাছেব লোক, যাব সঙ্গে দিনেব পব দিন ইযার্কি ঠাট্টা ফাজলামি কবেছে, সে শুধু এদেশে নয ইংল্যাণ্ডেও সবচেযে বড হিবো, এই ম্যাজিকেব পেছনে কোনো দৈবশক্তি কাজ কবছে বলে তাব বিশ্বাস।

তাবপব মান হঠাৎ চিৎকাব কবে হাত পা নাডিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে:

The proof is naw beyond all doubt
Snice about Clive they keep such rout,
Where'ver he goes 'tis holiday,
The tradesmen throw their work away,
All run in crowds unto the windows
To see the Conqueror of the Indians.

'আশ্চর্য! তোমার তো অসাধাবণ স্মবণশক্তি মান! আমি তো ভুলেই গিযেছি।'

ঠিক দু-বছব আগে। ১৭৫৪-ব অক্টোবরে ইংল্যাণ্ডে পদার্পণেব সময তাকে সেই হিরোব অভ্যর্থনা, এখন অ্যাডমিবাল ওযাটসনেব জাহাজ কেন্টের ডেকে বসে, মনে পডে তাব। ঐখানেই ইতি করলেই কি ভালো ছিল না? পেছনে থাকত বেশ কযেক বছবেব খ্যাতি, আর্কটেব দুর্গ জয়। তারপব কাবেবী ত্রিচেনাপল্লী—একটাব পব একটা সাফল্যেব বিজযকেতন, তারপব এক নবাব হটিযে আব-এক পেটোযা নবাবকে বসিযে বস্তুত সাবা দাক্ষিণাত্য দখল, দুপ্লে বিতাডণ—এবপব ইংল্যাণ্ডে একটা জমিদাবি কিনে বসা যেত না? ক্লাইভ হিসেব কবে দেখেছে। বছবে পাঁচশ পাউণ্ড হেসেখেলে আসত। কিন্তু এখনো তো সে বুডো হয় নি। তামাম হিন্দুস্তান জুডে উচ্চাশাব সুনীল আকাশ। দাক্ষিণাত্য কব্জা কবা গিযেছে, এবপব বাংলা

সুরা। নীল সমুদ্রে শুশুক উঠছে পড়ছে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে ক্লাইভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'তুমি যাই বলো', মান ভয়ে ভয়ে তাকায় ক্লাইভের দিকে, যেভাবে অর্জুন তাকাত প্রিয় সখা কৃষ্ণের দিকে কুরুক্ষেত্রের আগে।

ক্লাইভ চমকে তার দিকে তাকায়। এবং ঠিক এই মুহূর্তে বেড়ালের মতো লাগে ক্লাইভকে। ঠিক বেড়ালের মতো সতর্ক সজাগ তার ভাবভঙ্গি। এই সতর্কতার জন্যেই কি সে যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয়?

'আমি কি বলি?' ক্লাইভ তার বন্ধুর কথার খেই ধরিয়ে দেয়।

'আমাদের সেই ফোর্ট সেন্ট জর্জ। সেই ফোর্ট ডেভিডের জীবনযাত্রাই ছিল ভালো।'

ক্লাইভ ভুরু কুঁচকায়। খারে খারে বলে, 'আমি পেছনের দিকে তাকাই না মান। যে রাস্তায় একবার হেঁটেছি সে রাস্তায় আর হাঁটি না।'

'তা হয়তো ঠিক রবার্ট, তা হয়তো ঠিক।' মান একটু থতমত খায়।

আসলে মান কি বলতে চাইছে ক্লাইভ টের পায়। ফোর্ট সেন্ট জর্জে এবং আরও বিশেষ করে ফোর্ট ডেভিডে থাকবার সময় তাদের দুজনের অপর্যাপ্ত নারীসঙ্গের কাহিনীগুলো সে একলা পেলেই ক্লাইভকে বলতে চায়। ব্ল্যাক টাউনে পর্তুগিজ তেলেঙ্গি রমণীদের পাকাঘর চালাঘরে সর্বত্রই ছিল তাদের দুজনের অবাধ গতি। তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরেও কিছু আধা-সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রমণীদের সঙ্গে সহবাসও মানের স্মৃতিবিজড়িত। এই সব ঘটনার পর টেমস্ নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। দাক্ষিণাত্যে ক্লাইভের অপরাজেয় কীর্তির সঙ্গে কোনো কোনো ইংল্যাণ্ডের মিলিটারি ভাষ্যকার অতীতের সর্বোচ্চ জেনারেলদের কীর্তিকলাপের তুলনা করেছে। তারপর পেগীর সঙ্গে বিবাহ, পেগী এখন তৃতীয় সন্তানের মা হতে চলেছে।

'আমার কাবার্ড থেকে মাডেইরার বোতলটা নিয়ে এসো মান।'

পান করতে করতে ক্লাইভ মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

'হাসছো?' মান গেলাস নামিয়ে বলে।

'হাসছি, কারণ তুমি মান ঠিক আগের মতোই আছো।'

আবেগরুদ্ধ গলায় মান বললে, 'আমি আগের মতোই থাকতে চাই। মনে আছে, তুমি তখন কাবার্ডের গাঁইট সামলাতে, গলগল করে ঘেমে শার্ট ভিজে যেত, ঘামাচিতে গা কুট কুট করত।'

ক্লাইভ গলার স্বর টেনে টেনে বললে, 'তুমি মান, ঠিক আগের মতোই আছো।'

এমন সময় কড়কড় করে বাজ ডাকে। কেল্টের কামানগুলোয় বিদ্যুৎ ঝলকায়।

'ঝড় উঠবে নাকি?'

'সেই রকম মনে হচ্ছে।'

আকাশের রং পাল্টাচ্ছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের রং। মান-কে সে কি-করে বোঝাবে এ-ক্লাইভ সে-ক্লাইভ নয়। গতবার যখন পেগীর সঙ্গে সে ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছিল তখন সেই ছ-মাসের হানিমুনে পেগীর ভালবাসার চেয়েও তার আকর্ষণ ছিল তার বন্ধু ওর্মের সান্নিধ্য। ওর্ম তখন তার ইতিহাসের প্রথম খসড়া করছে। সারা সকাল দুপুর দুই বন্ধু সেই খসড়া নিয়ে আলোচনা করেছে। আর্কট দুর্গ রক্ষা করার যেসব স্ট্র্যাটেজি ক্লাইভ গ্রহণ করেছিল, যেসব খুঁটিনাটি সে ইতিমধ্যেই ভুলতে বসেছে, সেগুলো তার স্মৃতি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করেছে। রাত্রিবেলায় অতর্কিত আক্রমণ, ছুটন্ত গুলির মাঝখানে জলপ্রপাতের মতো ধাবমান অশ্বারোহীর সামনে ঠাণ্ডা মাথায় নিশানা ঠিক রেখে গুলি চালনা, মেলার মতো সম্পূর্ণ অরক্ষিত বিরাট এলোমেলো ভারতীয় সৈন্যশিবিরে অতর্কিতে কামান দাগা—এই সব স্ট্র্যাটেজির আলোচনায় সে পেগীর বাহুবন্ধনের চেয়েও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। কি করে বোঝাবে মান-কে? যশ একটা অন্য জিনিস। যশের জন্যে সব কিছু করা যায়।

আবার বাজ ডাকে। বেশ জোরে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। ঝড় উঠলে মুস্কিল। তার মানে যাত্রাপথ আরও সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

এমন সময় ওয়ালশকে আসতে দেখা যায়। বড়লোকের ছেলে বলে প্রথম থেকেই তার সম্পর্কে ক্লাইভের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা। এবারের এক্স-পিডিশনেও তাকে সে পে-মাস্টার বানিয়েছে।

ওয়ালশ একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। আস্তে আস্তে বলে, 'তোমার পেটের ব্যথাটা আবার চাড়া দেয় নি তো?' তারপর বোতলের দিকে চেয়ে বললে, 'চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। ম্যাডেইরা সর্বরোগের ধন্বন্তরী।'

মান আর এক গেলাস ঢেলে বললে, 'তুমি?'

'না, ঠিক আছে। পরে নেব।'

ওয়ালশ বললে, 'তোমার মনে আছে ববার্ট, ওর্মের চিঠি। কদ্দিন আগে?'

'বছর-চারেক হবে।'

বছর-চারেক আগে ক্লাইভকে ওর্ম লিখেছিল, 'তুমি যদি এই বুড়ো কুত্তাটাকে ফাঁসিতে লটকাতে পারো তাহলে কোম্পানির পক্ষে সবচেয়ে বড় কাজ হবে। ও বেঁচে থাকতে কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের আর উন্নতি হবে না।'

ওয়ালশ বললে, 'এখন তো বুড়ো কুত্তাটা মরেছে। ওর নাতিটা শুনছি একেবারে অপদার্থ।'

ক্লাইভ গম্ভীর হয়ে বললে, 'যতখানি সোজা ভাবছো ততখানি মোটেই নয়। আমার ইন্টেলিজেন্সের খবর, অন্তত বিশ হাজার ঘোড়-সওয়ার এখনো নবাবের পক্ষে আছে। তারপর ফরাসীরা। ওদের কামানের ব্যারেল ওঠানো-নামানো যায়। তার মানে বুঝতে পারছো?'

মান কিঞ্চিৎ বসস্থ। হাত নাড়িয়ে বললে, 'ওসবে কিচ্ছু এসে যায় না। যখন Conqueror of Hindusthan সামনে এসে দাঁড়াবে...'

'আমি কি আলাদিনের ম্যাজিক ল্যাম্প?'

'ঠিক তাই, ঠিক তাই ববার্ট।'

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওয়ালশকে বললে, 'তুমি বসো।' তারপর উঠে গিয়ে তার ক্যাবিন থেকে একটা ফাইল নিয়ে আসে ক্লাইভ।

বাঁ-হাত দিয়ে ফাইলটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বলে, 'খুলে দেখো।'

মুর্শিদাবাদের শিল্পীর আঁকা দুই নবাবের ছবির কপি।

'ভালো করে দেখো।' ক্লাইভ বললে, 'ঠাকুর্দার চোখ দুটো—স্টেডি, আনফ্লিঞ্চিং। আর নাতির চোখ দুটো—ঠিক হরিণের মতো না? বড় টানা টানা, ভিতু ভিতু। লোকটার মনের মধ্যে ভয় আছে। ওইটাই আমার ক্যাপিটাল।'

ওয়ালশ ছবি দুটোর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'তুমি যা বলছো আমার কাছে তা খুব সূক্ষ্ম লাগছে।'

'কিছুই সূক্ষ্ম না, খুব স্থূল। তোমার শত্রুপক্ষকে তোমায় বুঝতে হবে। এইটাই তোমার সবচেয়ে বড় স্ট্র্যাটেজি। তোমার চান্দা সাহেবের ক্যাম্পের কথা মনে আছে? তুমি ছিলে, না, ডাল্টন ছিল? ও ডাল্টন।'

'আমি শুনেছি ব্যাপারটা।'

'চান্দা সাহেবের ক্যাম্প মানে একটা মেলা। সমস্ত ইণ্ডিয়াতে একই ব্যাপার। কয়েক মাইল জুড়ে গোরু ঘোড়া ছাগল উঁটের পাল, হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে, ব্যাপারিরা ভারে ভারে জিনিস নামাচ্ছে, সেপাইরা চারপাইতে শুয়ে তামাক খাচ্ছে ছেলে-বৌ-পরিবৃত হয়ে। এই বিরাট মেলার ওপর নদীর ওপার থেকে আমি অতর্কিতে কামান দাগলাম।'

'এখানেও সেই ব্যাপার হবে রবার্ট। নির্ঘাত সেই ব্যাপার।'

'তা নাও হতে পারে। সামনাসামনি লড়াই হলে কী হয় বলা যায় না। বৃষ্টির আগেই সব সারতে হবে। তা কি সম্ভব?'

একটুক্ষণ থেমে স্বগতোক্তি করলে ক্লাইভ, 'ডুপ্লে আর বুসীর কাছ থেকে যে কায়দাটা শিখে আমরা ডেকান কব্জা করলাম সেইভাবে যদি কিছু করা যায় তাহলে লোকক্ষয় অনেক কম হয়। এই ছশ ইয়োরোপিয়ান, আর নশ সিপাই। যদি বেশিদিন যুদ্ধ চলে, কী হবে বলা যায় না।'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে উত্তেজিত ভাবে বললে, 'খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি।' তারপর নিচু গলায় বললে, 'আমার ভয় সিরাজদ্দৌল্লা নয়। আমার ভয় ওয়াটসনকে নিয়ে, আয়ার কূটকে নিয়ে। ওরা সবাই তলে তলে চটে আছে, এত ক্ষমতা আমাকে দিয়েছে বলে।'

ওয়ালশ বললে, 'সবাই ক্ষমতা চায়, সবাই যশ চায়।'

ক্লাইভ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'যশ সবাইয়ের কাছে আসে না। ক্ষমতা রাখতে গেলে একজনকেই রাখতে হয়।'

মান বসন্ত কণ্ঠে বললে, 'হীয়ার হীয়ার।'

মাঝে মাঝে এই বেষারেষিতে ক্লাইভের অবসাদ আসে। মাদ্রাজে কোম্পানির বেশির ভাগ অফিসারই তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত। নিজেদের মধ্যে তার নামকরণ করেছে 'হিরো'। তার সাহস কিংবা দক্ষতার চেয়েও তার ভাগ্যকে তার উপর্যুপরি যুদ্ধজয়ের কারণ হিসেবে দেখায় তারা। আর ক্রমাগত ভবিষ্যদ্বাণী করে, অতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়, এবার ঠিক পড়বে।

একটা লোক তাকে ক্রমাগত সাহস জুগিয়ে এসেছে। সেই পোড়খাওয়া লরেন্স। লরেন্স না হলে সে দাঁড়াতে পারত না। কারণ শুধু বীরত্বই যথেষ্ট নয়। বীরত্বের পাবলিসিটিই মোদ্দা কথা। প্রত্যেক যুদ্ধের পর ওপরওয়ালাদের কাছে তার পদোন্নতির সুপারিশ করেছে স্ট্রিংগার লরেন্স। 'ওরা খ্যাঁক খ্যাঁক করুক, কিচ্ছু আসে যায় না। ওদের কামড়াবার ক্ষমতা

নেই।' লরেন্স বলত ক্লাইভকে। ঝড়ো হাওয়ায় গত কয়েক বছরের স্মৃতি উড়ে আসে।

'এটা কী?' ওয়ালশ একটা মোটা খাম তোলে ফাইল থেকে।

সিরাজদ্দৌল্লাকে লেখা গভর্নর পিগটের সিল করা চিঠি।

'মুখস্থ হয়ে গেছে আমার। শুনবে? The great commander of the king of England's ships has not slept in peace since this news and is come down with many ships, and I have sent a great Sardar who will govern after me by name colonel Clive, with troops and land forces.'

'ব্যস? আর কিছু নেই?'

'You are wise: consider whether it is better to engage in a war that will never end or to do what is just and right in the sight of God.'

'ব্রাভো! ব্রাভো!' উৎসাহে হাততালি দেয় ওয়ালশ।

'ডেকানে আমার সমস্ত ব্যাপারটা হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। তুমি তো জানো ওয়ালশ, তেলেঙ্গি কুলি খাটিয়ে আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। স্টুয়ার্টের কাজটা ছিল চাল গম মাংস ঘি জোগাড় করা। কিন্তু স্টুয়ার্টের কাজ করতে করতে স্থানীয় তেলেঙ্গিদের সঙ্গে বেশ একটা যোগাযোগ হয়েছিল। ওরা কী চায়, কী ভয় পায় আমার নখদর্পণে। বাংলা সুবা মুর্শিদাবাদ, এখানকার জলা-জঙ্গল আমি কিছুই বুঝি না। কলকাতার যা রিপোর্ট পাচ্ছি তা তো মারাত্মক।'

ওয়ালশ বললে, 'ড্রেকটা একেবারে ভেড়ো।'

'তোমার সঙ্গে আমি একদম একমত। একেবারে ভেড়োর ভেড়ো। কলকাতা ছেড়েছুড়ে জাহাজে চেপে চাচা আপন বাঁচা করে পালানো এমন লজ্জার ব্যাপার। ইংরেজদের মুখ কালি হয়ে গেছে।'

'তুমি আবার ইংরেজের মুখোজ্জ্বল করবে।'

'না না। এসব ভাবের কথা এখন বলার সময় নয়। শুনছি বেঙ্গল জেন্টলম্যানরা ইতিমধ্যেই ওয়াটসনের সঙ্গে পত্রালাপ করছে। আমার এত ক্ষমতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে।' ক্লাইভ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিকনিং। সিকনিং।' উত্তেজিত হয়ে বললে, 'আমি জানি ওদের কী মতলব। শুধু কলকাতা উদ্ধারই যথেষ্ট নয়। শুধু কোম্পানির গৌরব

ফিরিয়ে আনতে ওরা থোড়াই উৎসাহী। ওদের যা যা লুটপাট হয়েছে তা সমস্ত ফেরত চায়। ওরা প্রাইভেট ট্রেড করে যে অতুল সম্পত্তি করেছিল, যা এখন নষ্ট হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ চায়, ইতিমধ্যেই তা নিয়ে গভর্নর পিগটের কাছে চিঠি গিয়েছে। অদ্ভুত না?'

ওয়ালশ বললে, 'অদ্ভুতই বটে। আগে আমরা কলকাতা উদ্ধার করি। তারপর ও-সব দেখা যাবে।' তারপর সান্ত্বনার সুরে বললে, 'যাই হোক না কেন, তুমি মাথা ঠাণ্ডা রেখো, তোমার ওপরেই সব নির্ভর।'

ক্লাইভ চটে গিয়ে বললে, 'আমার কোনো উপদেশের দরকার নেই। আমার মাথা ঠাণ্ডা না থাকলে ডেকান আজকে ইংরেজের কব্জায় আসত না। কিন্তু এই পেটিনেস, এই মিননেস এগুলো মানুষকে বিরক্ত করে না?'

এবার সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইতে থাকে। চড়বড় চড়বড় করে ডেকের গায়ে বৃষ্টি নামে। ঝড় উঠছে। প্রচণ্ডভাবে দোল খায় জাহাজ। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে প্রথম আসার সময় এই রকম আচমকা দুলুনিতে ক্লাইভ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়েছিল না? তারপর ক্যাপ্টেন বালটি নামিয়ে তাকে উদ্ধার করে।

ওয়ালশ এই ঘটনাটা জানে। বললে, 'ডেকে আর থাকা চলবে না রবার্ট। চলো ক্যাবিনে যাই।'

'দূর! কিছু হবে না। বোস না। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।'

'তোমার রবার্ট সত্যিই চার্মড লাইফ। কি করে যে তুমি বেঁচে যাও প্রত্যেকবার। আমার সত্যিই খুব অবাক লাগে।'

ক্লাইভ হেসে বললে, 'ছাখো, আমি কিন্তু কোনো ক্রস ঝুলাই না বুকে। কিন্তু একবার মনে হয়েছিল একটা কিছু তুকতাক করি।'

আর্কটের পরিখা তদারক করার সময় পাশাপাশি তারা দুজন। গুলি খেয়ে পাশের সেপাই মারা গেল। মৃতদেহ আড়াল করে গুলি চালিয়ে একবার ক্লাইভ শত্রুব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর ফরাসীরা একবার মাঝরাত্তিরে একেবারে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ওয়ালশেরও কথাটা মনে পড়ে যায়। 'সেই নাইট শার্ট পরে যেবার তুমি বেরিয়ে এলে। চারদিকে ফ্রেঞ্চ অফিসার। কিভাবে বাঁচলে?'

হো হো করে হেসে উঠল ক্লাইভ, 'ওখানে ভড়কি না দিলে একেবারে খতম। পিস্তল বার করে ঘিরে ফেলেছে আমাকে। আমি উল্টে বললাম—

পালাবার সামান্য চেষ্টা করো না। তোমাদের চারদিকে ঘিরে ফেলেছে। বেরিয়ে আসতেই এক সুবেদার তলোয়ার চালালে। নাক মুখ কেটে গেল। একটু সরে না গেলেই গলা উড়ে যেত।'

'চার্মড লাইফ। একেবারে চার্মড লাইফ রবার্ট। সিরাজদৌল্লা সেদিনের ছেলে। তোমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তোমার বুদ্ধি, তোমার সাহস...'

মাতাল মান বেসুরো গলায় গান ধরে, 'কংকারার অফ হিন্দুস্থান।'

হঠাৎ প্রবল হাওয়ার দমকে মাস্তুল কাত হয়ে পড়ে। নীচে মাল্লারা চিৎকার দেয়। ডেকে বসে থাকা অসম্ভব। সবাই দৌড়তে দৌড়তে ক্যাবিনে গিয়ে ওঠে। ঘণ্টা দু-এক প্রবল ঝড় চলে। ক্লাইভের মনে হয় জাহাজের গতি পালটে যাচ্ছে। যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে আর যাচ্ছে না।

'আমরা এগোচ্ছি না পেছোচ্ছি?' ক্যাপ্টেনকে ফোন করে ক্লাইভ।

'আমরা এখন কলোম্বের পথে।'

'সে কি?'

'উপায় নেই। সামনে এগোলে জাহাজ সামলানো যাবে না।'

'তার মানে, ক্যালকাটা পৌঁছতে আরও দেরি?'

'উপায় নেই। পরে মেকআপ করব।'

কলম্বো ঘুরে দেড়মাস জলযাত্রার পর একদিন ভোরবেলায় ডেকে এসে ক্লাইভ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওয়ালশ, ওয়ালশ। ছাখো জলের রং পাল্টে গেছে। ঘোলাটে পলিমাটির রং। আমরা ক্যালকাটার কাছে এসে পড়েছি।'

দুই

রাজমহল থেকে শিকার সেরে সিরাজ কাল রাতে ফিরেছে। আজ দরবারে বসতে দেরি হবে। জগৎশেঠ মহতাব রায় স্বরূপচাঁদকে বললে, 'তাহলে কি আমরা ফিরে যাব?'

মহতাব রায়ের চেহারার চেয়েও তার খুড়তুতো ভাই স্বরূপচাঁদের চেহারায় ফতেচাঁদের ছাপ স্পষ্ট। ফতেচাঁদের মতই তার লম্বা-চওড়া চেহারা। মহতাব আরো বেঁটে। তার চোখ দুটো ছোট। কিন্তু আরো সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর দশ-এগারো বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে জগৎশেঠের প্রতাপ-প্রতিপত্তি কমে তো নি, বরং বেড়েছে।

ইংরেজদের বুলিয়ান ব্যবসা এখন তাদের সম্পূর্ণ করায়ত্তে। বিদেশী মুদ্রা গলিয়ে দেশী টাকায় রূপান্তর করার বাটা এখন ফতেচাঁদের সময় থেকেও চড়ে গেছে। তাছাড়া মারাঠা আর আফগানদের সঙ্গে বছরের পর বছর লড়াইয়ে শেঠরা অকৃপণভাবে আলীবর্দিকে সাহায্য করে এসেছে। অনেক মহাজনরা এ সময় বসে গিয়েছে কিন্তু শেঠেরা সামলে গেছে।

মহতাবকে নিরুত্তর দেখে স্বরূপচাঁদ বললে, 'এইটাই কি শিকারের সময়? ইংরেজরা আবার কলকাতা দখল করে নিয়েছে। সাবুৎ জং ঘন ঘন চোখ রাঙানো চিঠি লিখছে। আর উনি বাঘ শিকার করে বেড়াচ্ছেন রাজমহলের জঙ্গলে।'

মহতাব নিরুত্তর হয়ে তার হীরের আংটির দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে।

'আমার মাঝে মাঝে সিরাজের জন্য কষ্ট হয়। ওকে সবাই ভয় পায়। কেউ সত্যি কথাটা বলতে সাহস করে না। কলকাতা আক্রমণের সময় সবগুলো সর্দার অ-বাজি ছিল। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলতে পারল না।'

'বলতে পারল না কি বলছো? সবাই লাফিয়ে উঠল, সেই মুহূর্তেই যেন কলকাতার ওপর চড়াও হবে।'

'অথচ ঐ ব্যাপারটা না হলে আজকের এই বিপদ আসত না।'

'তোমার মনে আছে স্বরূপ কলকাতা জিতে সিরাজ কি রকম আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়েছিল? সারা রাত ধরে নদীর পাড়ে বাজি, মোতি ঝিলে বাঈ-নাচ খানাপিনা।'

স্বরূপ বললে, 'আমি তখনই সাবধান করে দিয়েছিলাম।'

'তাতে কিছু লাভ হয়েছিল?'

'নাঃ। বরং অপমান করেছিল সিরাজ।'

মহতাব কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণভাবে তার আংটির দিকে চেয়ে বললে, 'আমার খালি মনে হয় দাদামশাই থাকলে কি করতেন?'

মহারাজ স্বরূপচাঁদ তার দাদা জগৎশেঠ মহতাব রায়ের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই দৃষ্টি বিনিময়ে অনেক কথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

'তুমি গিরিয়া যুদ্ধের কথা বলছো দাদা?'

'আমি যা ভাবছি তুমিও তাই ভাবছো।'

'কিন্তু কিভাবে? আলিবর্দি সরফরাজকে মেরে মসনদে বসল। এ-রকম তো হামেশাই হয়। কিন্তু সাবুৎ জঙ বিদেশী। সে এসে সিরাজকে হারিয়ে

মশনদ দখল করবে, এটা লোকে মেনে নেবে? আমাদের পক্ষেও তো এটা মুশকিল।'

মহতাব বিরক্ত হয়ে বললে, 'তোমার মাথাটা একদম খেলাচ্ছ না স্বরূপ। একবার চোখ খুলে দেখো না চারপাশে কি কাণ্ড ঘটছে। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজরা কি করেছে? এক নবাবকে হটিয়ে তাদের পেটোয়া মহম্মদ আলিকে বসিয়েছে। তোমার মনে নেই আর্কট দুর্গ জয়ের পর ইংরেজ অফিসারদের কেউ কেউ ইউনিয়ান জ্যাক তুলেছিল। ক্লাইভ তাদের ধমকে মহম্মদ আলির সবুজ পতাকা তুললে।'

'এখানে সেরকম কে আছে?'

'অতো হড়বড় করো না। এইতো সবে জানুয়ারি মাস। সাবুৎ জঙ কলকাতা নিয়ে বসে থাকবার পাত্র নয়।'

'তুমি তাহলে এক কাজ করো দাদা। উইলিয়াম ওয়াটসের হাতে একটা চিঠি পাঠাও। তুমি ওর চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিয়েছো?'

কলকাতা জয়ের আগে ফলতায় নেমে ক্লাইভ যে রিপোর্ট পেয়েছিল তাতে পলাতক ইংরেজদের অনেকেই একবাক্যে শেঠেদের তারিফ করেছে। নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদের চোখের আড়ালে দিনের পর দিন শেঠেদের লোকেরা ইংরেজদের কাছে টাকা পয়সা রসদ পাঠিয়েছে। ক্লাইভ সঙ্গে সঙ্গেই ধন্যবাদ জানিয়ে মহতাব রায়কে চিঠি দিয়েছিল।

মহতাব বললে, 'আমি সাধারণ ভাবে চিঠি দিয়েছি।'

'তুমি খোলাখুলি ভাবেই চিঠি দাও। দরকার হলে, মহাজনতলির আরও সব ব্যবসায়ী, তাদের সই সংগ্রহ করা যাক। এই এখন সময়। সিরাজ ভয় পেয়েছে। ইংরেজরা কলকাতা নিয়েছে। এখনই তাকে ধাক্কা দেবার সময়।'

'ছাড়া পাওয়ার পর ওয়াটসের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'

'কাশিমবাজারের কুঠিয়াল লোকটা দারুণ কাজের লোক। আগেও আমার তাই ধারণা ছিল। ও সত্যিই মখমলের দস্তানার মধ্যে ছুরি রাখে।'

'কিন্তু নবাব ওকে গোবেচারা ভাবে। সেদিন দরবারে তুমি ছিলে না। নবাব বললে, এই একটা ভেড়ুয়াকে কোম্পানি বাহাদুর আমার সঙ্গে কথা বলতে পাঠিয়েছে।'

'নবাব এই জন্যেই মরবে। মানুষ চেনে না। ওকে যারা মদৎ দিচ্ছে নিজেদের সুবিধের জন্যে, নবাব ভাবছে ওরাই অদিনের বন্ধু।' তারপর

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমরাই শত্রু হয়ে গেলাম। আলীবর্দি আমাদের ওপরেই সর্বক্ষণ নির্ভর করেছে—কি মারাঠা আক্রমণ কি আফগান আক্রমণ।'

'এ লোকটার সঙ্গে তো কথাই বলা যায় না।'

দরবারে ডাক আসে এতক্ষণ পর।

নবাব, রাজা দুর্লভরাম, মীরজাফর, মোহনলাল, মদনলাল, হুগলির ফৌজদার মানিকচাঁদ, ডেপুটি ফৌজদার, মহারাজ নন্দকুমার, খোজা ওয়াজিদ আরো অনেকে। কলকাতা ইংরেজদের করতলগত হবার পর প্রথম দরবার। চারদিক থমথম করে।

জগৎশেঠ মহতাব রায় আর মহারাজ স্বরূপচাঁদ কুর্নিশ করে আসন গ্রহণ করে।

'ঐ ছুঁচোটাকে ডাকো', নবাব বললে।

ওয়াটস অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। আস্তে আস্তে দরবারে ঢুকে কুর্নিশ করতে করতে এগিয়ে আসে। সত্যিই ভীষণ গোবেচারি ভিতু ভিতু চেহারা তার। সে যেন তল্পিদার মাত্র, তার নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই।

ওয়াটস ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজ গর্জন করে ওঠে, 'এখনও এই উল্লুকটার মাথাটা দেখছি ঠিক জায়গাতেই আছে। এর পরেও কি তোমাদের জাতকে আমাদের দেশে ব্যবসা করতে দেওয়া উচিত হবে। তোমার কী মত?'

ওয়াটস মৃদু গলায় বললে, 'সবই নবাবের মর্জি। নবাবের মর্জিতেই আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছি।' তারপর গলা ঝেড়ে বললে, 'আর আমাদের ব্যবসায় শুধু আমরাই না, সারা দেশের মানুষ উপকৃত হচ্ছে।'

'তুমি শোনো, বেয়াদপ সাবুৎ জঙের কাণ্ড। মানিকচাঁদ।'

মানিকচাঁদ আভূমি কুর্নিশ করে দাঁড়িয়ে। বললে, 'আমরা সাবুৎ জঙের সেপাইদের সঙ্গে জোর লড়াই করি। ওরাও মারে আমরাও মারি। তবে দিল্লির জঙ তাদের জাহাজ থেকে কামান দেগে কেল্লা দখল করে নেয়। আমরা হটতে বাধ্য হই।'

রাগে সিরাজের গলা চড়ে যায়, 'তোমরা কি লড়াই করতে এসেছো না ব্যবসা করতে এসেছো, সাফ জবাব দাও।'

'আজ্ঞে আমরা ব্যবসা করতেই এসেছি। দিল্লির বাদশার ফরমান আমাদের সে অধিকার দিয়েছে। তারপর গলা নামিয়ে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে

ওয়াটস বললে, 'আমাদের আত্মরক্ষার জন্যেই কলকাতা পুনর্দখল করতে হয়েছে। আমরা যুদ্ধ চাই না।'

সিরাজ বিমূঢ়ভাবে তার দিকে চেয়ে থাকে। এই স্বল্পভাষী মৃদুগলার লোকটা এত জোর কোথা থেকে পায়? আর একবার কয়েদ করার কথা ভাবছিল। এমন সময় ওয়াটস ধীরে ধীরে বললে, 'আপনি কি কর্নেল ক্লাইভের লেখা চিঠিখানা ইতিমধ্যেই পেয়েছেন?'

রাগে থমথম করে সিরাজের মুখ। বিকৃত গলায় বললে, 'তোমাদের সর্দারের চিঠি পড়া ছাড়া আমার অন্য অনেক কাজ আছে।'

'আমার কাছে আর-এক কপি আছে আপনাকে দেবার জন্যে।' ওয়াটস চিঠিখানা বাড়িয়ে দেয় মুন্সির দিকে।

ইংরেজি-জানা আর এক অভিজ্ঞ মুন্সির ডাক পড়ে। ক্লাইভের চিঠিখানা দুবার পড়ার পরও সে বোকার মত তাকিয়ে থাকে। তারপর ফার্সিতে অনুবাদ না করে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মূল চিঠিখানা পড়তে থাকে: **'I have brought with me a larger military force than has ever appeared in Bengal.'**

সিরাজ চেঁচিয়ে ওঠে, 'লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

'ফার্সি বোল, ফার্সি বোল,' মোহনলাল চেঁচিয়ে ওঠে।

এবার মুন্সি সম্বিত ফিরে পায়। কিন্তু চিঠিতে ক্লাইভের শাসানি অসহ্য লাগে সিরাজের কাছে। চিৎকার করে ওঠে, 'চোপ চোপ। এসব কী বলছে লোকটা।' তারপর দরবারের চারদিকে চেয়ে বিস্মিতভাবে বললে, 'যারা হেগে ছুঁচতে শেখেনি, তাদের কাছ থেকে আমরা যুদ্ধবিদ্যা শিখব?'

চারদিক থমথম করে। সকলের চোখই অলক্ষে ওয়াটসের দিকে পড়ে। ওয়াটস বোকা বোকা হাসে।

মহারাজ স্বরূপচাঁদ বললে, 'যদি গোস্তাকি মাফ করেন তাহলে বলি..'

ক্রুদ্ধ সিরাজের দিকে চেয়ে স্বরূপচাঁদ থমকে যায়।

জগৎশেঠ মহতাব রায় বললে, 'ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে কোনো ফয়শালা হবে না।'

'তোমাকে তোমাকে...' সিরাজের গলা আটকে যায় রাগে। তারপর বলেই ফেলে, 'তোমাকে ছুন্নৎ করব বলে দিচ্ছি। আর-একটা কথা বললেই তোমাকে ছুন্নৎ করে দেব।'

সবাই আশ্চর্য হয়ে সিরাজের দিকে চেয়ে থাকে। রাজা রায়দুর্লভ

মোহনলাল প্রতিবাদ করতে গিয়ে নবাবের মূর্তি দেখে চুপ করে যায়। মহতাব রায় আর স্বরূপচাঁদ বসে থাকে পাথরের মতো।

'আমি জানি না, আমার দাদামশাই দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছে? আমার কাছে সব খবর আসে। ইংরেজদের সঙ্গে দহরম-মহরম করেই যদি ব্যবসা করতে চাও তাহলে মুর্শিদাবাদ কেন? কলকাতা তোমাদের ডাকছে। সেখানে যাও।'

তারপর ওয়াটসের দিকে ঘুরে সিরাজ গম্ভীর গলায় বললে, 'তোমার সর্দারের চোখ-রাঙানি নবাব সহ্য করবে না। এই সব পোকামাকড়কে টিপে মারবার ক্ষমতা নবাব রাখে।'

ওয়াটস তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হয়।

সিরাজের কথায় সভাসদদের মধ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়। রায়দুর্লভ তার আলখাল্লার নিচে তার বাঁ হাতখানা হতাশার ভঙ্গিতে তুললে, নতুন সেনাপতি মোহনলাল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুখে চেয়ে থাকে স্থিরদৃষ্টিতে নবাবের দিকে, মীরজাফরের ঠোঁটের দুপাশে তাচ্ছিল্যের হাসি ফোটে। আর জগৎশেঠ হাতখানা তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার হীরের আংটির দিকে।

তিন

ফোর্ট উইলিয়াম পুনর্দখল ক্লাইভ করে নি। ক্লাইভের সৈন্য পৌঁছবার আগেই অ্যাডমিরাল ওয়াটসন জাহাজ থেকে কামান দেগে আয়ার কূটকে দিয়ে দুর্গ দখল করেন। ক্লাইভ ঢুকতে গিয়ে কেলেঙ্কারি। জোরজার করলে ওয়াটসন বললে কামান দেগে উড়িয়ে দেবে ক্লাইভের সেপাইদের। অবশ্য মিটমাট হয়ে গেল। ক্লাইভের হাতে ফোর্ট উইলিয়াম ফিরে এল কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটায় ক্লাইভ তিতো হয়ে যায়। যুদ্ধ জয় এবং বিশেষ করে লুটের নেশা কোম্পানি এবং যে নতুন সৈন্য ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে তাদের পেয়ে বসেছে। ভীষণ বেজার লাগে ক্লাইভের। ড্রেকের সাঙ্গপাঙ্গগুলো একেবারে বাজে। তারা সবাই একসঙ্গে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে নবাবের কলকাতা আক্রমণের সময় তাদের যা যা লুটপাট হয়েছিল তা কড়ায়গণ্ডায় শোধ দিতে হবে। এদিকে চন্দননগরের তিনশ শিক্ষিত ফরাসী সৈন্য তাল ঠুকছে নবাবের সঙ্গে হাত মেলাতে। তার ওপর নিজের দাঁত ব্যথা শুরু হয়েছে। কষের দুটো দাঁত ফেলে দেবার পরও দপদপানি চলছে।

ইতিমধ্যে মার্লবারো যুদ্ধের জাহাজ এসে গেল। ওয়াটসনের জাহাজগুলো

হুগলিতে এসেই একনাগাড়ে কামান দাগলে। তারপর সৈন্যরা গঙ্গার ধারে ধারে যত ধানচালের গুদাম ব্যবসায়ীদের আড়ৎ, সেখানে একধারসে বহ্ন্যুৎসব লাগালে। ক্লাইভ শেঠেদের চিঠি লিখে আবার তাদের সাহায্য চাইলে।

হুগলির ছাইয়ের গাদায় দাঁড়িয়ে সিরাজ চমকে ওঠে। আলীবর্দির উপমাটা তার মনে পড়ে। একসঙ্গে মৌমাছিরা হুল ফুটিয়েছে। গঙ্গার দুধারে সমস্ত পুড়ে ছাই। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খোজা ওয়াজিদ। ফৌজদার মানিকচাঁদ টের পায় এদিকে যুদ্ধ ছড়ালে সমস্ত রসদ বন্ধ।

পরদিন নবাব ওয়াটসনকে চিঠি লিখলে, আগেকার মতো বাণিজ্য করার অধিকার তারা ফিরে পাবে। ক্লাইভ চিঠিখানা তার চোখ থেকে সরিয়ে নাকের ওপর রাখে, যেন সে চিঠির গন্ধ শুঁকে বার করতে চাইছে নবাবের আসল মতলব কী।

দুজনেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। ক্লাইভের একবার মনে হয় ফরাসীরা নবাবের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এইরকম একটা উড়ো খবর পাওয়া মাত্রই সে সিরাজকে লেখে: 'আমি আপনাকে আমার বাবা-মার মতো মনে করি। আপনিও আমাকে আপনার পুত্র সমান দেখবেন। আমি সবচেয়ে আনন্দিত হব যদি আপনার জীবন রক্ষার জন্য আমার জীবন বিসর্জন দিতে পারি।'

চিঠিটা ছাড়বার আগে নিজের শাঠ্যে নিজেই স্তম্ভিত হয়ে যায় ক্লাইভ। তারপর তার মনে হয় সে ঠিকই করেছে। আর্কটের বীরত্বের রঙিন অর্কিড বাংলার জলকাদায় পচে যাবে। এখানে অন্য রাস্তা। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য লোকজনদের একটা গোপন চিঠি তাকে আশ্বস্ত করেছে। স্বাক্ষরকারীদের শিরোনামায় জগৎশেঠ, মহতাব রায় আর মহারাজ স্বরূপচাঁদ।

নবাবসৈন্য কলকাতার কাছে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায় আছে সে সম্পর্কে জানা দরকার। যদি হুড়মুড় করে নবাবি সেপাই কলকাতার রাস্তায় ঢুকে পড়ে তাহলে দ্বিতীয়বার লণ্ডভণ্ড সবার সম্ভাবনা। এ অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো দরকার। নবাব যদি পুনর্দখল করে শহর, তাহলে জাহাজে চেপে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এখানকার জল-হাওয়া যতখানি খারাপ ভেবেছিল ক্লাইভ ততখানি নয়। কয়েকদিনের মধ্যেই নবাবের বিরুদ্ধে মার্চ শুরু করতে হবে। কিন্তু কলকাতার আশেপাশের

ভূগোল সম্পর্কে ক্লাইভের স্পষ্ট ধারণা নেই। বেঙ্গল জেন্টলমেনগুলো একেবারেই অপদার্থ। ভালো কোনো ম্যাপ নেই। নবাবের কাছে লোক পাঠানো যাক। সেরকম বিশ্বাসযোগ্য কে আছে?—ওয়ালশ। আর একটা লোক? আর একটা লোক? স্ক্র্যাকটন। এ লোকটার কথা ভুলেই গেছিল ক্লাইভ। খুব চালাকচতুর ছোকরা। আর চমৎকার ড্রাফটস্‌ম্যান। ও যদি নবাবের পজিশানটা ঠিক ছকে নিয়ে আসতে পারে··

মারাঠা ডিচের কাছে আসতে না আসতেই নবাবসৈন্যের বিপুল সমাবেশ তারা টের পায়। ওয়ালশ বললে, 'লিউক, এখানকার ব্যাপারটা আর্কটের মতো হবে না মনে হচ্ছে।'

লিউক স্ক্র্যাকটন বললে, 'খেয়াল করেছো, আসবার সময় কতগুলো জলা পড়ল। এই গরমেও চারদিকে এত জল।' মারাঠা ডিচ পেরিয়ে সিরাজের শিবির। সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। কাতার দিয়ে ইরানী ঘোড়সওয়াররা দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের সর্বত্র ঘোড়া। উমিচাঁদের বাগান। অজস্র বড় বড় গাছ, বড় বড় শিরিষে এখনও ফুল, হাওয়ায় চাঁপার গন্ধ। স্ক্র্যাকটন হাঁটতে হাঁটতে পকেট বই-এ পেন্সিল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটে।

'দারুণ পজিশান নিয়েছে নবাব। আগে থেকে না জানলে কেউ হদিশ করতে পারবে না।'

ওয়ালশেরও তাই মনে হয়। উমিচাঁদের শিকার লজ। বিকেলের আলোয় এক জোড়া ময়ূর শিমূল গাছের উঁচু ডাল থেকে ডাকতে শুরু করে।

'স্ট্রেঞ্জ কান্ট্রি!' ওয়ালশ বললে

'স্ট্রেঞ্জার পিপল।' সহকর্মী জবাব দেয়।

তাদের দুজনকে খুব আপ্যায়ন করলে সিরাজ। ডাচ ক্ল্যারেটের বোতল আনালে।

'সাবুৎ জঙের মতো সর্দার আমি আগে কখনও দেখি নি।' বলেই সিরাজ স্ক্র্যাকটনের দিকে আড়চোখে চেয়ে বললে, 'তোমাদের কি মতলব বলতো।'

এমন সময় এক জোড়া হাতি আওয়াজ করতে থাকে।

'নবাব সাহেব, আবার কি আপনি কলকাতা আক্রমণ করে আমাদের তাড়াবেন?'

ওয়ালশের কথায় বিস্মিত সিরাজ বললে, 'সে কি। এসব আমার চিন্তারই বাইরে। এখানে এসেছি শিকার করতে। অজস্র পাখি। এই লবণহ্রদে অজস্র পাখি আর হরিণ। তোমাদের দুজনের থাকার-ব্যবস্থা

করে দিয়েছি। কালকে ভোরে তোমরা আমার সঙ্গে শিকারে বেরোবে।'

ওয়ালশ বলতে চাইছিল শিকারের জন্যে এত হাতি, ঘোড়া, সৈন্যসামন্ত কেন? কিন্তু সে কিছু বলবার আগেই স্ক্র্যাকটন বললে, 'আপনার আদেশ শিরোধার্য নবাব। এখানে হরিণও আছে?'

'কত চাই?'

দুজনে কুর্নিশ করে যখন বেরিয়ে আসে তখন উমিচাঁদের বিশাল বাগান-পাশে লবণহ্রদের জল অস্ত-সূর্যের গলা সোনায় ঝলমল করছে। একরাশ পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়।

বাগানের এককোণে তাদের তাঁবু। তাঁবুর ঠিক পেছনেই হাতির পাল।

তাঁবুতে ঢুকেই হাঁটু গেড়ে বসে স্ক্র্যাকটন বাগান, লবণহ্রদ, মারাঠা ডিচ জুড়ে একটা ম্যাপ এঁকে ফেলে।

ওয়ালশ বললে, 'অনেকদিন প্যাট্রিজের মাংস খাই নি। ময়ূরের মাংস অনেকটা প্যাট্রিজের মতো।'

একদল সজ্জিত ঘোড়সওয়ার উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে আসছে দেখা যায়।

'তুমি পাগল হয়েছো?' স্ক্র্যাকটন বললে। তার পাতলা বাদামি গালের পেশী কুঁচকে যায় কথা বলার সময়। 'আজ রাত্তিরে এখানে থাকলে আমরাই শিকার হয়ে যাব। একটু অন্ধকার হলেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

আবার নৈঃশব্দ্য ছাপিয়ে বৃংহণ। 'তুমি কি মনে করছো পাখি মারার জন্য এত তোড়জোড়?'

'আমারও তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

'নবাব যদি একবার ঢুকে পড়ে কলকাতা শহরে তাহলে কিন্তু জঘন্য ব্যাপার হবে।'

গাছের তলায় তলায় ডেচকি চাপিয়ে মাংস রান্না হচ্ছে। হাওয়ায় মাংসের গন্ধ। অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার লাগাম হাতে তারা দুজন এগোয়। দুজন সহিস এগিয়ে আসে।

ফটক পেরিয়ে যেতেই দুজনে লাফিয়ে ঘোড়ায় চেপে চাবুক কষায়।

খানিক দূর যাবার পর উত্তেজনায় ফিস ফিস করে স্ক্র্যাকটন বলে, 'এক মুহূর্ত আর দেরি নয়। রাত্তিরেই আক্রমণ হওয়া দরকার। ঠিক আর্কটের মতো। এই হাতি ঘোড়ার মেলাতে এখনই কামান দাগা দরকার।'

ক্লাইভের কাছে পৌঁছে রিপোর্ট করতেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণের সিদ্ধান্ত

নেয় ক্লাইভ। ওয়াটসনকে বললে পাঁচশ নৌ-সৈন্য দিতে ভাবি কামান ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু রাস্তায় যে এত জলকাদা ক্লাইভ আগে স্বপ্নেও ভাবে নি। ত্রিচেনাপল্লীর শক্ত লালমাটিতে ঝড়-বর্ষণ একরকম সহ্য করা যায়, কিন্তু এখানে হড়হড়ে কাদা। নালার ধারে বিষাক্ত সাপের কামড়ে একজন নাবিক সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতেই একটা মিউটিনির অবস্থা। জলের মধ্যে ভারি কামান বসে যাচ্ছে। তাকে ঠেলে টেনে তুলতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। নবাবসৈন্যের কাছে যখন ক্লাইভ এসে পৌঁছয় তখন ভোরের আলো ফুটছে। নবাব শিবির থেকে তাদের দিকে আগুনে হাউই ছুটে আসতে থাকে, মাঝে মাঝে এক ঝাঁক তীর।

আরো এগোতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। গাঢ় কুয়াশার পর্দায় চারদিক ঢেকে যায়। কুয়াশার যবনিকার ভেতর দিয়ে ক্লাইভসৈন্য নবাবশিবিরে ঢুকে পড়ে। তারপর ফায়ারিং শুরু হয়। কিছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গুলিবিদ্ধ মানুষের হাতিঘোড়ার আর্তনাদ দাপাদাপি চারদিক ছেয়ে ফেলে। ক্লাইভ পিস্তল তুলে হুকুম করে এইসব আর্তনাদ গোঙানি লক্ষ করে ক্রমাগত ফায়ারিং করতে। একদল ফায়ার করে, বারুদ ফুরোতেই পেছনের আর একদল বারুদ-পোরা বন্দুক এগিয়ে দেয়। একটা আহত হাতি ব্যথায় উন্মত্ত হয়ে নবাবসৈন্য পায়ে পিষে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু আবার আর-এক কাণ্ড ঘটে। যেরকম অতর্কিতে কুয়াশার যবনিকা নেমেছিল তেমনি অতর্কিতে যবনিকা উঠে যায়। ঝলমলে রোদে ক্লাইভ টের পায় তারা নবাবশিবিরের একেবারে কেন্দ্রে, উমিচাঁদের বাগানবাড়ি অনেক দূর। এবার স্থির লক্ষে ক্লাইভের সৈন্যের দিকে নবাবের কামান গর্জন করে ওঠে। আর উত্তোলিত তলোয়ার হাতে তিনশ ঘোড়সওয়ার ছুটে আসে। 'স্টেডি! স্টেডি!' ক্লাইভ হাঁকে। ইংরেজসৈন্য যেরকম গুলি চালাচ্ছিল তেমনি চালাতে থাকে। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ ইরানী অশ্বারোহী হুড়মুড় শব্দে ঘোড়া থেকে পড়ে। নতুন করে উমিচাঁদের সুরক্ষিত বাগানবাড়ি আক্রমণ অসম্ভব। ক্লাইভসৈন্য পিছু হটতে থাকে। দুটো ইংরেজদের কামান পড়ে থাকে। এখন ফোর্ট উইলিয়ামে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মোহনলাল বলেছিল ইংরেজ সেনাদের তাড়া করে ফোর্ট উইলিয়াম পৌঁছনোর আগেই ধরে ফেলতে। কিন্তু আর দুজন সর্দার আপত্তি জানালে। মানিকচাঁদেরও আপত্তি ছিল। কুয়াশায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রায় তেরশ নবাব-

সৈন্য মারা গেছে কিংবা জখম হয়েছে, তাছাড়া অনেক হাতি ঘোড়া উট মরে পড়ে আছে চারদিকে।

সিরাজ একবার ভাবলে তার ঠাকুর্দার কথা। আলীবর্দি নিশ্চয় থামত না। কারণ যুদ্ধ এখন তার হাতের মুঠোর মধ্যে। এখনও বেশ কয়েক হাজার সৈন্য প্রস্তুত। এমন সময় মৃত্যুপথযাত্রী একটা ঘোড়া গোঙাতে থাকে একটানা স্বরে।

সিরাজ বললে, 'বেশ, তাই হোক। সন্ধিই হোক ইংরেজদের সঙ্গে।'

চার

দ্বিতীয়বার নবাবসৈন্যের সঙ্গে মুখোমুখি হবার পর ক্লাইভ তার বাবাকে চিঠি লেখে : **As this success has probably saved the company, this is the proper time to push my interest.** ফক্স, আর্চবিশপ কেন্টারবেরি, কোম্পানির কয়েকজন ডিরেক্টারকেও চিঠি দেয়।

আগে যখন সত্যিই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা সে দেখিয়েছে তখন ব্যাপারটা বুঝত না। এক স্তম্ভিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় দিনের পর দিন অবরুদ্ধ আর্কট দুর্গ অসম যুদ্ধে রক্ষা করার সময় কিংবা ত্রিচেনাপল্লীর পথে অকস্মাৎ খোলা প্রান্তরে চারদিক থেকে অগ্নিবর্ষণের মাঝখানে ঠাণ্ডা মাথায় যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধে জিতেও ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে নি।

মৃত্যুর সামনে কে কতখানি সব কিছু তুচ্ছ করে দাঁড়াতে পারল, বীরত্বের মাপকাঠি তা নয়। বীরত্ব কে কতখানি লগ্নী করে খাটাতে পেরেছে তার খ্যাতি-মর্যাদা-প্রতিপত্তি আদায়ের জন্যে সেইটাই হল আসল কাজ। এই আসল কাজ ক্লাইভ প্রথম জীবনে অবহেলা করেছে। এই অবহেলায় হিরো হওয়া যায় না। হিরো হতে গেলে ঢাক পিটোতে হবে। এই ঢাক পিটনোর নামই তো পাবলিসিটি। ক্লাইভ টের পেয়েছে দরকার হলে নিজেই নিজের পাবলিক রিলেশানস অফিসার হতে হবে। অবশ্য তার দরকার নেই। ক্লাইভের বুড়ো বাপই তার পি-আর-ও। কেউ কেউ টিটকিরি দিয়েছে বটে, বুড়ো রিচার্ড ক্লাইভের হরদম ইণ্ডিয়া অফিসে ছেলের জন্যে নিরলস দরবার লক্ষ করে। কিন্তু এ ব্যাপারে ক্লাইভ যদি নিশ্চেষ্ট থাকত তাহলে তার স্থির বিশ্বাস ইংল্যাণ্ডে দুবছর আগের সেই হিরোর ওয়েলকাম অসম্ভব ছিল।

কলকাতার জেন্টলমেনরা খেপে গিয়েছে। তারা ওয়াটসনকে উত্তেজিত করছে এখনই সরাসরি নবাবসৈন্য আবার আক্রমণ করতে। নবাব রাজি

হয়েছে ক্ষতিপূরণ দিতে কিন্তু ক্ষতিপূরণের অঙ্ক আরও বাড়াতে হবে। সব সময় চাপ বাড়ছে। ক্লাইভ একবার নাটকীয় প্রস্তাব দিলে মাদ্রাজে সে ফিরে যাবে। ঠিক এই সময় শেঠেদের চিঠি এল : কোম্পানির শর্ত মেনে নিতে নবাব রাজি। দরকার হলে আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে প্রস্তুত।

দাক্ষিণাত্য আর বাংলাদেশ এক নয়—এই কথাটা শেঠেদের চিঠি পাওয়ার পর থেকেই ক্লাইভের মনে নড়েচড়ে বেড়ায়। সিরাজের এখনও যথেষ্ট দম আছে, তারপর কলকাতা থেকে ফেরার পথে সে চন্দননগর নেমেছিল। যদি ফরাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি সে আদায় করে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে নবাবসৈন্য আক্রমণ মানে আত্মঘাতী হঠকারিতা। তার চেয়ে··· শেঠেদের চিঠিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে ক্লাইভ ভাবলে···আর একটা পথ তো খুলে যাচ্ছে। প্রশস্ত পথ, সে পথে লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা অনেক কম, সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি। যেভাবেই হোক, জেতাটাই আসল ব্যাপার।

ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন নতুন মুখ দেখা যায় ক্লাইভের বাড়িতে। সবার আগে নতুন পদে প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট ওয়াটস। গোরেচারা হাসি হাসি মুখে ওয়াটস তিনচার দিন ধরে ক্রমাগত ক্লাইভের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে। তারপর আসে আর্মেনিয়ান ধনকুবের খোজা ওয়াজিদ, আর-এক ধনকুবের শিখব্যবসায়ী দাড়িওয়ালা উমিচাঁদ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ ঘরে পরামর্শ চলে। আরও দু-তিনজন লোক মুর্শিদাবাদ শহর থেকে আসে। তাদের হাতে জগৎশেঠ মহতাব রায়ের চিঠি। এক নিরালা সন্ধ্যায় দোতলা বারান্দায় পায়চারি করতে করতে ক্লাইভ নিজেকে প্রশ্ন করে : এ কোন অধ্যায় শুরু হল তার জীবনে? বীরত্বের না দেনা-পাওনার?

ওয়াটস আর উমিচাঁদের মুর্শিদাবাদ ফিরে যাবার আগেই এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ ক্লাইভের হাতে এসে পৌঁছল। ওয়াটসের বিস্তারিত চিঠি। ডেপুটি ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে উমিচাঁদ হাত করেছে। নন্দকুমার উমিচাঁদকে জানিয়েছে—নবাবের হুকুম, যদি ইংরেজরা ফরাসীদের আক্রমণ করে তাহলে ফরাসীদের সাহায্য দিতে হবে আবার ফরাসীরা যদি ইংরেজদের আক্রমণ করে তাহলেও ইংরেজদের সাহায্য দিতে হবে। নবাবের নীতি নিরপেক্ষ। কিন্তু উমিচাঁদকে সে আরও জানিয়েছে, যদি বারো হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি সে পায় তাহলে ফরাসীদের সাহায্য

থেকে সে বিরত থাকবে। ওয়াটসের শেষ কটা লাইন: 'এই উপহার যদি আপনি দিতে রাজি থাকেন তাহলে পত্রবাহককে আপনি শুধু বলবেন গোলাবকে ফুল।'

ঘনায়মান সন্ধ্যায় পত্রবাহকের দিকে তাকিয়ে ক্লাইভ চমকে ওঠে। অবিকল উমিচাঁদের মতো চেহারা। দ্বিতীয় বার নজর করে দেখলে পত্রবাহকও শিখ, তবে তার দাড়ি উমিচাঁদের মতো কাঁচাপাকা নয়, বয়স অনেক কম।

ক্লাইভের মুখে হাসি ফোটে। পত্রবাহকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'গোলাবকে ফুল'।

পাঁচ

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আপনার চারপাশে যারা আছে তারা সবাই ইংরেজের চর।'

ফরাসী কোম্পানির প্রতিনিধির চেহারাটা ওয়াটসের ঠিক উল্টো। অনেকখানি লম্বা, ঝাঁকড়া চুল, কথা বলবার সময় চোখ নাচে, আর হাত ঝাঁকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ফোয়ারার মতো কথা ছিটোতে থাকে।

জঁ ল-র দিকে চেয়ে সিরাজ আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি আমাকে অকারণ ভয় দেখাচ্ছেন। এই দেখুন, কালকেই সাবুৎ জঙের আর-একখানা চিঠি পেয়েছি। লিখেছে, চন্দননগর আক্রমণের কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।'

চিঠিখানার দিকে হতাশভাবে চেয়ে দুহাত শূন্যে তুলে ল বললে, 'আমরা ওদের সঙ্গে অনেকদিন থেকে কারবার করছি। আমরা জানি, ইংরেজরা কখনও সত্যি কথা বলে না। আমার কাছে খবর আছে, মাদ্রাজ থেকে ওদের হুকুম এসেছে চন্দননগর দখল করতে।'

'তাহলে ক্লাইভ অপেক্ষা করছে কেন?'

'ক্লাইভ অপেক্ষা করছে কারণ সে আপনাকে চটাতে চায় না। আপনি কি করবেন তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। ক্লাইভ জানে আপনাদের সৈন্যরা যদি যোগ দেয় তাহলে আমাদের সুশিক্ষিত তিনশ ইউরোপিয়ান সৈন্যের সামনে ইংরেজ দাঁড়াতে পারবে না। ক্লাইভ এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয়। আপনি হাত গুটিয়ে থাকবেন কি থাকবেন না?'

সিরাজ চুপ করে থাকে। আর নাটকীয়ভাবে হাতখানা শূন্যে তুলে

ল বললে, 'আর আপনি জেনে রাখুন নবাব বাহাদুর, ক্লাইভ জানে—চন্দননগরের পরেই মুর্শিদাবাদ।'

চাপা আতঙ্কে সিরাজের চোখ দুটো আরও বড় দেখায়। ভাঙা গলায় বললে, 'আপনি কী বললেন? কী বললেন?'

ল মাথা দুলিয়ে বললে, 'আমি ঠিকই বলেছি নবাব বাহাদুর। চন্দননগরের পরেই মুর্শিদাবাদ। মাঝখানে আর কিছু নেই। ক্লাইভ আপনাকে এখনই চটাতে চাচ্ছে না।'

'আমি এখন কতদিক সামলাব। ওদিকে আবদালি বাংলা সুবা আক্রমণ করছে। আমি ইংরেজদের চটাতে চাই না। সাবুৎ জঙ আমাকে লিখেছে সে তার সৈন্য নিয়ে আমার সঙ্গে যাবে আবদালিকে ঠেকাতে।'

ল চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা একটা বিরাট ভড়কি। বিশ্বাস করুন। ঐ কথাটা বলে ওরা মার্চ করবে কলকাতা থেকে। তারপর চন্দননগর আক্রমণ করে বসবে।'

'তাহলে শেঠরা কেন আমায় বারবার বলে আসছে, ফরাসীদের আক্রমণ করার ইচ্ছে ক্লাইভের বিন্দুমাত্র নেই।'

চারপাশে তাকিয়ে নিচু গলায় ল বললে, 'আমার কাছে খবর আছে। জগৎ শেঠের গোমস্তা রঞ্জিত রায়।...'

'আচ্ছা যাক যাক'...সিরাজ প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চায়। বস্তুত উমিচাঁদের বাগানে ক্লাইভের আক্রমণের পর থেকেই শেঠদের সম্পর্কে ভয় ঢুকেছে সিরাজের। এক-একবার তার সরফরাজ খাঁর কথা মনে পড়ছে। শেঠরা ক্লাইভের লোক—যে লোকটা হুগলি পুড়িয়ে ছাই করেছে। ক্লাইভের একটা সাম্প্রতিক চিঠি তার মনে পড়ে—'আমি খুব সাবধানে বন্দুক চালাতে হুকুম দিয়েছি। যাদের না মারলেই নয় কেবল তাদেরই মেরেছি।' এই সাবধানে বন্দুক চালিয়ে সে উমিচাঁদের বাগানে তেরশ নবাব-সেপাই মেরেছে। জগৎশেঠ তাদেরই লোক।

হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে সিরাজ, 'আমি সবাইকে কোতল করব। কাউকে ছাড়ব না।' উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে নবাব।

'আপনি শান্ত হোন নবাব বাহাদুর। আপনাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যদি আপনি থাকেন আপনার নখের ডগা কেউ ছুঁতে পারবে না।'

'আপনি ঠিক বলছেন ?'

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।'

'তাহলে ঠিক আছে, আমি মানিকচাঁদকে হুকুম দিচ্ছি, আজই পাঁচ হাজার সওয়ার নিয়ে আপনাদের কেল্লার পেছনে অপেক্ষা করুক। আর তোপখানা থেকে আমাদের যে-কটা বড় কামান আছে তার অন্তত অর্ধেক আপনাদের কেল্লার রাস্তায় বসাক। সাবুৎ জঙ আসবে মাঠ ভেঙে আর দিল্লির জঙ্গ নদী দিয়ে।'

'যথেষ্ট যথেষ্ট নবাব বাহাদুর। আমি দেখব, শেঠরা যতই শক্তিশালী হোক কী করে তারা নবাব পাল্টায়। আমরা বেঁচে থাকতে তা কখনো সম্ভব হবে না।'

যাবার আগে আর-একবার সে নবাবকে সাবধান করে দেয়, 'জগৎশেঠ টাকা ছিটোচ্ছে। আপনার আমীর-ওমরা থেকে পেশকার পর্যন্ত সবাইকে টাকা খাইয়েছে। আপনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন তা যেন না টলে দেখবেন।'

ল যাবার কিছুক্ষণ পরেই ওয়াটস আসে। কুর্নিশ করে হাবার মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

সিরাজ সেদিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। পেশকারকে বলে চিঠি লিখতে। গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসারকেও সে ডেকেছিল। আগামীকাল ফরাসীদের সাহায্যের জন্যে নবাবসৈন্য কিভাবে কার কার নেতৃত্বে পাঠানো হবে তার তখন একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিল।

গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী সুদর্শন ইউসুফ। তার একটা গুণ, কোন্ দিকে হাওয়া বইছে তা বুঝে নিয়ে সে কাজ করে। ঘেসেটি বেগমের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হবার পরই যেই সিরাজ মোতিঝিল অবরোধ করলে, অমনি সে সিরাজের পক্ষে চলে যায়। তারপর তার ক্রমশ পদোন্নতি। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে হাওয়া ঘুরছে সে টের পেয়েছে। ওয়াটস ঘরে ঢুকতেই তার সঙ্গে তার চোখ চাওয়া-চাওয়ি হয়। সিরাজ টের পায় না। কিন্তু তাদের মাঝখানে এক গোপন বন্ধুত্ব খুব স্পষ্ট। কুর্নিশ করে বেরিয়ে যাবার সময় তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার ওয়াটসের চোখাচোখি হয়।

'কী, বলো সাহেব, তোমাদের কী মতলব। দস্যু জঙ কি চন্দননগর আক্রমণ করছে ?'

'অসম্ভব!' প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে ওয়াটস। 'কর্নেল আমাকে

কালকেই চিঠি দিয়েছে। এই দেখুন।' বুক-পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজখানা বার করে।

'আমাকে সে লিখেছে আপনাকে জানাতে আফগান সেনাপতি আবদাল্লাকে রুখতে তার যথাসাধ্য সে আপনাকে সাহায্য করবে।'

'তাই নাকি। বাঃ।' সিরাজ বালকের মতো বিস্ময় প্রকাশ করে।

'আমরা ইংরেজরা যা কথা দি, প্রাণ থাকতে তার নড়চড় হয় না।'

'ক্লাইভ সত্যিই আমাকে সাহায্য করবে?'

'আমাকে আপনার বিশ্বেস হচ্ছে না। আপনার মুন্সিকে ডাকুন। সে এই চিঠির অনুবাদ করুক।'

রুপোর পরাতে জরিমোড়া পানের পাশে ক্লাইভের চিঠিখানা রাখলে ওয়াটস।

'আপনি আমাদের কর্নেলকে বিশ্বেস করছেন না। কর্নেল আমার বন্ধু। সর্বক্ষণ আপনার মঙ্গল চান। আপনার আসল শত্রুকে আপনি চিনতে পারছেন না নবাব বাহাদুর।' বিলাপের সুরে ওয়াটস বললে।

তারপর একটা আঙুল তুলে বললে, 'আপনি ঐ লম্বা লোকটাকে বিশ্বাস করবেন না। ও আপনার সর্বনাশ করবে। আপনি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী ক্লাইভকে ভয় পাচ্ছেন। আর ওদিকে বে অফ বেঙ্গলে চার পাঁচটা যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে বুসী অপেক্ষা করছে। এখানে সামান্য ইঙ্গিত পেলেই চলে আসবে।'

আবার সেই আতঙ্ক ঘড়ির মতো টিকটিক করে ওঠে সিরাজের মনে। একদিকে আফগান সর্দার এগিয়ে আসছে, ওদিকে ক্লাইভ, আবার বুসী—

আত্মগত ভাবে সিরাজ বললে, 'আচ্ছা দেখি।'

'দেখবার কিছু নেই নবাব বাহাদুর। দেখবার কিছু নেই। ফরাসীদের অবিলম্বে তাড়ান, নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বুসী কী কাণ্ড করেছে ডেকানে সেটা কি আপনাকে নতুন করে বলতে হবে। বুসী এসেই পুতুল নবাব বসাবে মসনদে। সে আমাদের কর্নেলের মতো নয়। বাংলা সুবা একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে।'

হুগলি শহরের ছাইগাদার কথা মনে আসে সিরাজের। মুর্শিদাবাদ শহরও কি ছাইগাদায় পরিণত হবে। গঙ্গা বুঁজিয়ে দেওয়া যায় না, যাতে যুদ্ধের জাহাজ না আসতে পারে?

'সাবুৎ জঙ আমাকে সাহায্য করবে?'

'আলবৎ। সে তো মার্চ করতে প্রস্তুত।'

বিহ্বল দেখায় সিরাজকে। আলীবর্দির যুক্তিটার পুনরাবৃত্তি করে করুণভাবে। 'আমার সুবার মধ্যে আপনারা, বিদেশীরা, নিজেদের মধ্যে লড়াই করবেন, তা আমি কখনই হতে দেব না।'

'ফরাসীদের আমরা আক্রমণ করব না, ওরাই আমাদের আক্রমণ করবে। ঐ যে ঢেঙা লোকটা, ও একটা ঘাঘি বজ্জাত। আপনার আমীর-ওমরাহ সমস্ত কর্মচারীকে হাত করার জন্যে টাকা ছিটোচ্ছে।'

সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমেলে লাগে। চন্দননগরে সাহায্য পাঠাবার জন্যে এত সাত-তাড়াতাড়ি হুকুম না দিলেই হত। তারপর যদি সাহায্য সত্ত্বেও ফরাসীরা হেরে যায় তাহলে তো কেলেঙ্কারি। ইংরেজদের আগ্নেয়াস্ত্রের ক্ষমতার কথা স্মরণ করে সিরাজ। কুয়াশায় অদৃশ্য শত্রুর ঝলকে ঝলকে অগ্নিবর্ষণ, আর্ত হ্রেষারব, আহত সৈনিকদের গোঙানি নবাব যেন এই মুহূর্তে শুনতে পায়।

স্তব্ধ সিরাজের দিকে তার ভাসাভাসা সবল চোখ মেলে ওয়াটস ধীরে ধীরে বললে, 'বিশ্বাস করুন নবাব বাহাদুর, ইংরেজরা আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী।'

ওয়াটস যাবার সঙ্গে সঙ্গে উমিচাঁদের প্রবেশ। 'এসো উমিচাঁদ', নবাব এই চতুর শিখব্যবসায়ীকে মনে মনে ভয় পায়। কলকাতায় ব্যবসা, মুর্শিদাবাদে ব্যবসা, কলকাতা-মুর্শিদাবাদের অসংখ্য বাড়ির মালিক এই প্রৌঢ় শিখকে সে ঠিক বুঝতে পারে না। কখনও মনে হয় সে ইংরেজদের প্রবল শত্রু, কখনও মনে হয় পরম বন্ধু।

'তোমরা কি কোনো মতলব ভাঁজছ?'

'মতলব?' দাড়িওয়ালা শিখটি অপ্রসন্নভাবে নবাবের দিকে চায়। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'মতলব যদি ভাঁজি তাহলে তা হবে আপনার সঙ্গে।'

'তোমার সঙ্গে শেঠেদের গোমস্তা বঞ্জিত রায় দেখা করেছিল?'

'হ্যাঁ, আমার কিছু টাকা পাওনা আছে জগৎশেঠের কাছে সেই ব্যাপারে তাগাদা দিতে এসেছিল।'

'আর কিছু কথা হয়েছে?'

উমিচাঁদ দৃঢ় গলায় বললে, 'নিশ্চয় ঐ ঢ্যাঙা লোকটা আপনাকে এই সব মতলব দিচ্ছে। তাহলে আমি বলি ওদের কাণ্ড। আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেই বলছি। ল আমাকে বলেছে, ওদের কোম্পানির

সঙ্গে আমাদের ব্যবসায় আমার যা লাভ তার ওপর মোটা উপরি আমাকে দেবে যদি আমি ওঁদের হয়ে নবাবের কাছে বলি।'

সিরাজ হেসে ফেলে। বললে, 'সবাই দেখছি একই রকম', তার গলায় বেশ আত্মপ্রসাদ।

'তবে হ্যাঁ, এই কথাটা আমি জোর গলায় বলতে পারি—ইংরেজদের সঙ্গে ধরুন আমি প্রায় চল্লিশ বছর ব্যবসা করছি—ওরা যদি কথা দেয় কখনও নড়চড় হয় না।'

'আপনি ভেবে বলছেন?'

'নিশ্চয়, আমি ভেবেই বলছি। ক্লাইভ যদি আপনাকে বলে থাকে ও চন্দননগর আক্রমণ করবে না, তাহলে ও কখনও তা করবে না। ইংরেজরা কথার দাম দিতে জানে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে', নবাবের কথায় উমিচাঁদ উঠে পড়ে।

পরদিন জঁ ল দরবারে এসে অবাক। নবাব আসে নি। খোঁজ নিয়ে জানলে গতকাল চন্দননগরে সাহায্য পাঠাবার যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। উত্তেজিত ল জোর করে ভেতরে ঢুকতে গেল। শান্ত্রী বাধা দিয়ে জানালে, নবাব বাহাদুর হারেমে আছেন। আজ দরবারে আসবেন না।

ক্লাইভের মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণের ছবিটা মনে আসে। নুলিয়ারা 'ইয়ালা। ইয়ালা।' চেঁচাচ্ছে, তার মাঝখানে ঘর্মাক্ত সড়সড়ে কালো পিঠের ওপর চেপে এদেশের মাটিতে পদার্পণ। তারপর ফোর্ট সেন্ট জর্জের লম্বা তিনতলা ব্যারাকের দিনগুলো। বালির ঝড় উঠেছে, ঘরময় বালি কিচকিচ করছে। সন্ধের পর আলো কাঁপছে হাওয়ায়। সেই নিঃসঙ্গ ইয়াং রাইটারের জীবন আর তার দশ বছর পরবর্তী জীবন—একেবারে আসমান জমিন ফারাক। তখন তার দুটো পোশাক, একটা গরম আর একটা সুতির, গরম জামার উলের রং জ্বলে গেছে। দশ বছর পর সবচেয়ে দামি দুশোটা শার্ট আর দেড়শো ব্রিচেশের অর্ডার পাঠিয়েছে লণ্ডনে।

ক্লাইভ নিজেকে ঝাঁকি দিয়ে তার অতীতের স্মৃতি রোমন্থন থেকে মুক্ত করে নেয়। সামনে চন্দননগর, চন্দননগরের পরে মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের পরে কী? পাটনা দিল্লি?

ওয়াটসের ঘন ঘন চিঠি আসছে। নবাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চন্দননগর আক্রমণ করতে সে বারবার আহ্বান জানাচ্ছে। খোজা ওয়াজিদ তলে তলে তাকে নবাবের সঙ্গে ফরাসীদের সমস্ত পত্রালাপ দেখিয়েছে। স্কাউণ্ড্রেল নবাব, ওয়াটস লিখেছে, বুসীর সঙ্গে পত্রালাপ চালাচ্ছে। বুসী মাত্র দুশ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে।

ক্লাইভ মার্চ মাসের গোড়ায় অবিশ্রাম চিঠি লিখে চলে নবাবকে। নবাবের মন সম্পর্কে সে আরও নিশ্চিত হতে চায়। কারণ, অকারণ লোকক্ষয় ঠিক নয়। নবাবের যে সৈন্য তা দাক্ষিণাত্যের নবাবদের থেকে আরও সুশিক্ষিত। এদের কোনো কোনো সর্দার দুর্ধর্ষ মারাঠাদের হটিয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ সরে গেছে বটে কিন্তু যারা আছে তারা ইংরেজ সৈন্যদের যথেষ্ট বেগ দিতে পারে। তাছাড়া সরাসরি যেসব ইংরেজ সৈন্য বাংলা দেশে এসেছে তারা এখানকার জলকাদায় অভ্যস্ত নয়। শেষ পর্যন্ত পোড়খাওয়া তেলেঙ্গি সৈন্যই ভরসা। নবাবকে এখনই উপেক্ষা করা সম্ভব না।

মালি বাগান থেকে একথোকা সদ্য-ফোটা গোলাপ ফুলদানিতে দিয়ে যায়। সেদিকে চেয়ে চেয়ে ক্লাইভ নিজের মনে বললে, 'গোলাবকে ফুল।' সত্যিই গোলাপের গন্ধে মুর্শিদাবাদ আমোদিত। ওয়াটস লিখেছে, নবাবের ইন্টেলিজেন্স অফিসারকে সে হাত করেছে। শেঠেরাও গোলাপ ফুল ছড়াচ্ছে। ক্লাইভ মনে মনে চিন্তা করে, মুর্শিদাবাদে পৌঁছতে হবে বর্ষার আগে। তার মানে এখনো পুরো তিন-চার মাস হাতে সময় আছে।

ক্লাইভ আবার সিরাজকে চিঠি লেখে: 'দাক্ষিণাত্যে বুসী তাদের পুতুল নবাব সৃষ্টি করেছে। আমরা ওসব ধান্দায় নেই। আমরা ব্যবসায়ী, আমরা চাই ব্যবসা করতে, নিজেদের রক্ষা করতে। দরকার হলে, আপনাকে রক্ষা করতেও আমরা প্রস্তুত।'

চিঠি ছাড়ার দুদিন পরেই ক্লাইভ মার্চ শুরু করলে। কখনও নৌকোয়, কখনও হেঁটে। শাপলা শালুকে বাংলাদেশের খাল বিল ভর্তি। তার মাঝখান দিয়ে ক্লাইভের সৈন্যভর্তি নৌকো ভেসে চলে। একটি তেলেঙ্গি সেপাই শালুকের পাপড়ি ছিঁড়ে বিচি খায়। 'স্ট্রেঞ্জ কান্ট্রি।' ক্লাইভ সেদিকে চেয়ে চেয়ে বললে।

গোলাপ ফুলের কী গন্ধ। ডেপুটি ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমার তার কয়েক হাজার নবাব-সেপাই নিয়ে সরে পড়েছে। ক্লাইভ স্থলপথে এসে চন্দননগরের শহরতলি দখল করে নেয়। কয়েকদিন পর ওয়াটসনের জাহাজ

আসে। 'কেন্ট', 'কাম্বারল্যাণ্ড' থেকে কামান দাগা শুরু হয়। কেল্লা থেকে কামানের জবাব আসে। 'কেন্ট' আর 'টাইগার' জাহাজের ডেকে ফরাসী গোলা এসে পড়ে। ওয়াটসন অল্পের জন্যে বেঁচে যায়, তবে বেশ কয়েকজন ইংরেজ অফিসার প্রাণ হারায়। কিন্তু জাহাজের অবিরত কামানের গোলার সামনে কেল্লার দেয়াল ভাঙতে শুরু করে। মৃতের স্তূপের ওপর দিয়ে ক্লাইভের সৈন্য কেল্লায় ঢোকে।

কেল্লায় ঢুকে আর্কটের হিরো অবশ্য বেকুব বনে যায়। তার চাপা মুখখানা আরও চাপা লাগে। যেন একটা গ্লোবের গায়ে নাক কান চোখ জুড়ে দেওয়া হয়েছে, এইরকম লাগে তার লাল উত্তেজিত মুখ। 'শালা একেবারে ভিখিরির জাত।' নিচু গলায় গাল পাড়ে ক্লাইভ।

সিন্দুক একেবারে ফাঁকা। সোনা রুপো হীরে জহরৎ যা যে কোনো ছোট্ট ভারতীয় কেল্লা থেকে ইংরেজ সৈন্য বরাবর হাতিয়েছে বাগিয়েছে তার চিহ্নমাত্র নেই।

তিন-চারজন ম্যরিন সৈনিক হাঁপাতে হাঁপাতে দুটো লম্বা চিত্র ধরাধরি করে নিয়ে আসে ক্লাইভের সামনে। পঞ্চদশ লুই এবং তার মাদামের তৈল-চিত্র।

ক্লাইভ খেপে গিয়ে বললে, 'আমার কাছে কেন? আমি কি ও ছবি ভেজে খাব? পাঠিয়ে দাও। কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।'

ছয়

সিরাজের কলকাতা আক্রমণ, ক্লাইভের পুনর্দখল, এমনকি চন্দননগর পতন মুর্শিদাবাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় সামান্য ছায়া ফেলে নি। দরবারে মহিমাগঞ্জে অবশ্য চাপা ফুসফুসানি, এখনকার পরিভাষায় বলতে গেলে, বাড়িতে বাড়িতে গোপন গ্রুপ মিটিং, কিন্তু নদীর ধারে পণ্যবাহী সারি সারি নৌকোর দিকে চেয়ে মনেই হতে পারে যেরকম যা ছিল তেমনি তাই চলছে।

গত দু বছর রেশম আর সুতির কাপড়ের বাজার খুব তেজি। বিদেশী কোম্পানিগুলোর রেষারেষিতে তাঁতিরা ভালো দাম পাচ্ছে। আর দিশি ব্যবসায়ীদের তো পোয়াবারো। কাশিমবাজারের কান্তবাবু হু হু করে ব্যবসা করছে, জমি কিনছে। মহাজনতলির চেহারা আরও গমগমে। আর দোকানপাট গুদামঘর উঠছে। আগ্রা মির্জাপুরের ব্যবসায়ীদের একটা

আলাদা পট্টি গড়ে উঠেছে। আড়ৎ থেকে মাথায় মাথায় রেশম আর কাপড়ের পেটি বজরা ভর্তি হচ্ছে। নদীতে পণ্য-বোঝাই নৌকোর অবিরাম আনাগোনা। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হতেই সোরা ভর্তি নৌকোর আনাগোনা বেড়ে গেছে। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহি থেকে বস্তা বস্তা চাল মশলা, ঢাকাই নৌকোয় মসলিন, ঘি পনীর, বেনারসের নৌকোয় উঠছে কাপড়ের পেটি, সুপারি পান আসছে বরিশালের নৌকোয়। কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কোথায় কারা পাহাড়ে জঙ্গলে কাটাকাটি করছে তাতে কিছু এসে যায় না—চকবাজার মসজিদের আশেপাশের দোকানে যারা ভিড় করছে, মহাজনতলির ব্যাপারীদের গুদামে যারা মাল তুলছে নামাচ্ছে, আশেপাশের গাঁ থেকে যারা সুতো রেশমের গুটির মোট বয়ে আনছে আড়ত-এ মাথায় করে, তাদের মধ্যে উদ্বেগ বিশেষ কিছু নেই।

বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক, বুড়ো শিবের বাবা গত বছর দেহ রেখেছে। তার জায়গায় বুড়ো শিব দোকান চালাচ্ছে। বছর দুই হল তার বিয়ে হয়েছে। একটি পুত্রসন্তানও লাভ হয়েছে।

'কদিন থেকে যা গরম পড়েছে,' শেঠেদের রামগোবিন্দ মুন্সি দোকানে ঢুকলে। প্রতিদিনের মতো সে এক ভাঁড় দই আর ছানাবড়া নিয়ে বসে।

এরপর তশিলদার, এক মুহুরি, খালশার দু-তিনজন কর্মচারী এসে ঢোকে। কচুরি ভাজা শুরু হয়।

'আপনার মদনদার কথা মনে আছে?'

বুড়োশিবের প্রশ্নে রামগোবিন্দ দইয়ের ভাঁড় থেকে মুখ তোলে। তার এখন চুল কাঁচাপাকা। আগের চেয়ে দেহ শীর্ণ।

'কোন মদন?' রামগোবিন্দ বললে।

'আপনাদের মহিমাগঞ্জে যে কাজ করত, টাঁকশালের সেপাই।'

'কী জানি। কত মদন এল গেল।'

তশিলদারটি বললে, 'আমি মাঝে মাঝে নদীর ঘাটে মদনকে বসে থাকতে দেখি। নদীর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে।'

'ও আমাদের সেই পাগলা মদন! ওকে দেখব না কেন? শহরের কানাচে সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়।'

বুড়োশিব বললে, 'আবার নাকি নতুন নবাব হবে শুনছি।'

মুন্সি বললে, 'ছাখো ছোকরা, যার যা কাজ তাই করো। ময়রা মিঠাই বানায়, মুন্সি কলম পেষে।'

'তাতো বুঝলাম কাকা। তবে কদিন থেকেই শুনছি কথাটা। ভাবলাম, আপনি অনেক খবর রাখেন। তাই বললাম।'

রামগোবিন্দ নরম হয়ে বললে, 'কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।'

'বলুন দাদা, বলুন। আমরা তো কিছুই জানতে পারি না', তশিলদার বললে।

'না ছাখো, এসব কথার মধ্যে না থাকাই ভালো। চারদিকের যা অবস্থা।'

রামগোবিন্দ হঠাৎ চুপ করে যাওয়ায় কথাটার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

বুড়ো শিব বললে, 'মদনদা কিরকম সব অদ্ভুত কথা বলত। শহরের সব সাধারণ মানুষ আমরা এক হয়ে শত্রুকে রুখব, শহর বাঁচাব।'

'ওই সব ফালতু চিন্তা করেই ওর মাথাটা গেল', রামগোবিন্দ বললে। তারপর বুড়োশিবের দিকে চেয়ে বললে, 'ইংরেজদের কামানের সামনে তুই দাঁড়াবি?' তারপর গম্ভীরভাবে বললে, 'জগৎশেঠকে যে অপমান করতে পারে তার যাওয়াই ভালো।'

'তাই নাকি? আমরা তো একথা আগে কখনও শুনি নি।'

'তবে? ভাবা যায়? যখনই আলীবর্দি খানের টান পড়েছে জগৎশেঠের কাছে হাত পেতেছে। আর নবাব কেন, সারা দুনিয়া হাত পেতে আছে। আর সেই লোককে প্রকাশ্য দরবারে অপমান।'

'অবশ্য নবাব পাল্টালে আমাদের কিছু যায় আসে না।' বুড়ো শিব মধ্যস্থতা করে।

'এইটাই হক কথা। নবাব আসবে যাবে, তাতে আমাদের কী?'

'তবে কী জানেন?' তশিলদার বললে, 'এবারে একটু অন্য ব্যাপার হচ্ছে শুনছি।'

'বটে? তুমি তো দেখছি সর্বজ্ঞ। দেখো, আবার মদন বাউরি হয়ে যেও না।'

রামগোবিন্দের কথায় তশিলদার চটে বললে, 'এবারে একটু অন্য ব্যাপার হচ্ছে। খাল কেটে কুমির আনা হচ্ছে।'

রামগোবিন্দ আরও চটে গিয়ে বললে, 'তোমার মাথা হচ্ছে।'

'তবে যাই হোক না কেন, আমাদের কিছু আসছে যাচ্ছে না,' বুড়োশিব বললে।

'এইটাই খাঁটি কথা।'

বুড়োশিব বললে, 'কাকা যা বলেছে—ময়রা মিঠাই বানায় তাঁতি তাঁত বোনে।'

'ঠিক কথা, আর মুন্সি কলম পেষে,' রামগোবিন্দ বললে।

'তবে কেউ কেউ বলছে···তশিলদার নাছোড়বান্দা।'

রামগোবিন্দ বললে, 'গুলি মারো তোমরা কেউ কেউ। কেউ কেউটা কে? রাজা রায়দুর্লভ, মীরজাফর?'

বুড়োশিব বললে, 'তাহলে কি এরাই নবাব হচ্ছে।'

'এই ছাখো, আমার মুখ থেকে কথা বার করার চেষ্টা করো না। তুমি সেদিনের ছেলে। নবাব কে হচ্ছে না হচ্ছে তাতে আমাদের কী এসে যায়।'

'তা বটে।'

তশীলদার বললে, 'ইংরেজরা চন্দননগর দখল করেছে। এবার মুর্শিদাবাদ দখল করবে।'

রামগোবিন্দ হাত তুলে নাটকীয় ভাবে বললে, 'চমৎকার। চমৎকার। ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করবে, রাজত্ব করবে। গাঁজা খেয়েছ নাকি ছোকরা? ইংরেজরা সাহায্য করতে পারে। ওদের সাবুৎ জঙ শুনেছি খুব জবরদস্ত সর্দার। ওরা আর-এক নবাবকে বসাবে। সে নবাব সাবুৎ জঙকে জায়গির দিয়ে দেবে। সাবুৎ জঙ হবে জায়গিরদার, পাঁচ হাজার কি সাত হাজার ঘোড়সওয়ার থাকবে তার নিচে। আবার যখন দরকার হবে নবাবের, তখন সে নবাবের হয়ে লড়বে। এ তো সোজা ব্যাপার! এত কঠিন করে দেখার কী আছে?'

'কিন্তু সাবুৎ জঙ যদি রাজি না হয়। ওরা তো কলকাতায় রাজত্ব করছে। যদি মুর্শিদাবাদে এসে রাজত্ব করে।'

'তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ছোকরা। বাজে কথায় কান দিও না। কে বলছে ওরা কলকাতায় রাজত্ব করছে? নবাবের অনুগ্রহে ওরা কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। নবাব ওদের কেল্লা বানাবার অনুমতি দিয়েছে, তাই বানিয়েছে।

'আমাদের কাছারিতে একজন কাজ করে। তাদের বাড়ি হুগলি। সে অনেক কথা বলে।'

রামগোবিন্দ বেজার ভাবে বলে, 'কী কথা?'

'হুগলিতে ইংরেজরা জাহাজ থেকে এমন কামান দাগলে, আর চারদিকে এমন আগুন জ্বলল এরকম আগুন কেউ বাপের জন্মে দেখে নি।'

রামগোবিন্দ এই হুগলির ব্যাপারটা খুব অস্পষ্টভাবে শুনেছে। শুনেছে জগৎ শেঠও। আপত্তি জানিয়েছিল হুগলির এই অগ্নিকাণ্ডে। আন্দাজে বললে, 'ওরকম মাঝে মাঝে হয়। ইংরেজরাও তো লড়াই করতে জানে রে বাবা।'

'সেইজন্যেই তো ভয়।'

রামগোবিন্দ হাত তুলে বললে, 'ওসব বাজে কথা। নবাব আছে, জগৎ শেঠ আছে। যেরকম ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে তেমনি চলবে। শহর কিরকম বেড়ে যাচ্ছে দেখেছ? কত মাঠে কোঠাবাড়ি উঠছে।'

বুড়োশিব বললে, 'হ্যাঁ, কাশিমবাজারে গিয়েছিলাম।'

দোকানের বুড়ো কারিগর বললে, 'বুড়োশিবের শ্বশুরবাড়ি।'

রামগোবিন্দ জানত না। বললে, 'জানি জানি, সব জানি।'

বুড়োশিব বললে, 'এবারে গিয়ে দেখি, নদীর দুধারে একফালি জমি পড়ে নেই। সারি সারি কোঠা বাড়ি উঠছে।'

রামগোবিন্দ বললে, 'তবে?'

এ তবে-র কোনো মানে নেই। রামগোবিন্দ হয়তো বোঝাতে চাইছে এই বিপুল সমৃদ্ধ বাংলার রাজধানীকে কব্জা করার ক্ষমতা ইংরেজদের নেই।

'যাই বলুন দাদা', তশিলদারটি আবার বললে, 'আমার কিন্তু ভালো মনে হচ্ছে না। এই ইংরেজ লালমুখোগুলো একদম আলাদা।'

'নবাব আলাদা নয়?'

ছোকরাটি বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললে, 'না নবাব আলাদা নয়।'

রামগোবিন্দ তাকে চেপে ধরে, 'কোনটা আলাদা নয় বলো। ওদের চালচলন বেশভূষা কথাবার্তা সব আলাদা।'

'আমাদের খালসায় যারা মাথা তারাও তো সব একইরকম। একইরকম জোব্বা পরে, ফারসি কথা বলে। আলাদা কোথায় দেখলেন মুন্সিজি?'

বুড়োশিব বললে, 'আমরা কিন্তু বেশ ছিলাম।'

'কিরকম?' রামগোবিন্দ অপ্রসন্নভাবে তাকায়।

'এই দেখুন আমরা সবাই তো মিলেমিশে ছিলাম। বাবা বলতেন

একটা কথা, তখন ভালো বুঝতাম না। বলতেন, এই হিন্দুমুসলমান নিয়ে আমাদের মুকসুদাবাদ, কিন্তু কখনও একটাও কাজিয়া দাঙ্গা বাধে নি।'

'এবার বাধবে।' তশিলদার বললে।

রামগোবিন্দ চটে গিয়ে বললে, 'তোমরা সব কবে থেকে এরকম জ্যোতিষী হলে হ্যা? যেরকম ছিলাম তেমনি থাকব। আমি বলছি এদিক-ওদিক কিচ্ছু হবে না।'

'কিন্তু ইংরেজরা একেবারে আলাদা।' তশিলদার বললে, 'ওরা ধীরে ধীরে আমাদের সব ব্যবসা দখল করছে। নুন, সুপুরি, সেদিকেও হাত দিয়েছে। চৌকিতে বাধা দিলে সেপাই পেটাচ্ছে। দু-তিনটে খুন-জখমও হয়েছে।'

রামগোবিন্দ হাতখানা শূন্যে তুলে বললে, 'তোমার কথা যদি ঠিক হয় তাই হোক। এখন নবাবকে সেলাম বাজাচ্ছি, তখন ইংরেজকে সেলাম বাজাব।'

সাত

চন্দননগরের দক্ষিণে ঘিরেটির বাগান বাড়ি। ফরাসী ডিরেক্টারের এই প্রাসাদে থামের মাথায় মাথায় বারোক ভাস্কর্য, ঝিনুক বসানো পাথরের জলপরীরা মালা হাতে ডাক দিচ্ছে সিলিং-এর দেয়ালে।

ক্লাইভ গঙ্গার জোয়ার-ভাটা লক্ষ করে ভাবে কতখানি পাকল ব্যাপারটা। পাকতে সময় দিতে হবে, হট করে কিছু করলে চলবে না। সকলের জানাজানি হবার আগেই ব্যাপারটা সারতে হবে। কিন্তু আধ-খেঁচড়া হলেই সর্বনাশ। সবসময় চেষ্টা করতে হবে যাতে নবাবের সামান্য সন্দেহ না হয়। নবাব যদি আঁচ করতে পারে, শেঠেদের মতো সেও গোলাপ ফুল ছড়ায় তাহলে এই মুর্শিদাবাদের বিপ্লবের কী চেহারা নেবে বলা মুশকিল।

রেভল্যুশান কথাটা ওয়াটস আজকাল ব্যবহার করছে চিঠিতে। নবাব যে সন্ধির কোনো শর্তই মানবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। জগৎ শেঠ তার ওপর চাপ দিচ্ছে এই সার কথা ইংরেজরা যেন না ভুলে যায়। কিন্তু সরাসরি মুর্শিদাবাদ আক্রমণ প্রায় অসম্ভব। সাম্প্রতিক রিপোর্টে হাজার পঞ্চাশেক সৈন্য এখনও সিরাজের তাঁবে আছে। তাছাড়া ফরাসীরা আছে। বাগানের হাওয়ায় বেশ শরীরটা ঝরঝরে লাগে ক্লাইভের। এখনও বাংলা সুবায় এসে তার গলস্টোনের ব্যথাটা ওঠে নি, পেট ব্যথা বমি ভাব একদম নেই। গঙ্গার হাওয়া সম্পর্কে নেটিভরা ঠিকই বলে। বেশ গা জুড়ানো হাওয়া। চমৎকার৬-

ঘুমের পর ভোর বেলায় ক্লাইভ সিরাজকে লিখলে : আপনার রাজ্যে শান্তি বিঘ্ন হবার পথে একটাই বাধা—ঐ ভবঘুরে জঁ ল আর তার ফরাসী সাঙ্গপাঙ্গ। ওদেরকে আপনি বিদায় দিন। ওদের বিদায় দিলে আমাদের আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তখন আমরা আমাদের সমস্ত ফোর্স নিয়ে আপনার আজ্ঞা পালন করব।'

শেষ লাইনটার গভীর প্রবঞ্চনায় কলম ভারি হয়ে ওঠে। ক্লাইভ নিজেকে ধাক্কা দেবার জন্যেই নিজের মনে চেঁচিয়ে ওঠে : বাংলা ডেকান নয়। তাছাড়া এখন বয়েস বেড়েছে। এখন সেই বেপরোয়া দুর্ধর্ষ আর্কটের বীর হতে সে আর রাজি নয়। অনেকবার গুলি ফসকেছে তার গা থেকে, ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিছলে বেরিয়েছে তলোয়ার। উমিচাঁদের বাগানে মানিকচাঁদের ঘোড়সওয়ার ভালোই চার্জ দিয়েছিল। এর দশগুণ জোরাল চার্জের সম্ভাবনা আছে বেপরোয়া সংগ্রামে।

তাছাড়া ক্লাইভ ভেবে দেখেছে, নগদলাভের এ-রকম সম্ভাবনা এ যাবৎ হিন্দুস্থানে কখনো আসে নি। যখনই ইংরেজ সৈন্য কেল্লা দখল করে লুট করেছে তখনই বেশ কিছু-না-কিছু লাভ হয়েছে বটে। চন্দননগরে অবশ্য একদম বাজে ব্যাপার হয়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের সম্ভাবনা তো অকল্পনীয়। গঙ্গার জোয়ারভাঁটার দিকে চেয়ে চেয়ে ক্লাইভের মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে যায়। হীরে জহরৎ সোনা রুপো আর নগদ নিয়ে সিরাজের সিন্দুকের উত্তরাধিকার প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা। হয়তো অতোখানি নয়। কিন্তু যা রটে তার অনেকখানিই ঘটে। জগৎশেঠই তো তিনকোটি দেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছে।

তবে বড্ড বেশি লোক সুড়সুড় করে এই ষড়যন্ত্রে ঢুকে পড়ছে বলে ক্লাইভের দুর্ভাবনা। শেঠেরা তো আছেই তার ওপর রায় দুর্লভ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, মহারাজ নন্দকুমার—নাঃ। বড্ড বেশি লোক হয়ে যাচ্ছে। আর যে জন্যে সে ভয় পাচ্ছে, সবাই হয়তো একটা পার্সেন্টেজ চাইবে। তাছাড়া বিপ্লব বিপ্লব বলে চেঁচালে তো চলবে না। বিপ্লবের রূপরেখা কী? ক্লাইভ আসন্ন বিপ্লবের রূপরেখা বুঝবার জন্যে ওয়ালশকে ডেকে পাঠালে।

ওয়ালশ বাগানে ঢুকতে না ঢুকতেই বললে, 'সুখবর আছে রবার্ট। নবাব তোমাকে একজোড়া চিতা উপহার পাঠিয়েছে।'

'যাক, তাহলে এখনও কিছু টের পায় নি। এখানেই বোস। কুর্সি লাও' ক্লাইভ তার তেলেঙ্গি আর্দালিকে হাঁক দিলে।

ওয়ালশ বললে, 'তবে সাবধান রবার্ট। চিতাগুলো ট্রেনড, হরিণ ধরতে জানে। হরিণ ধরতে গিয়ে তোমাকে না ধরে।'

ক্লাইভ সজোরে হেসে ওঠে।

দেয়ালের দিকে চেয়ে ওয়ালশ বললে, 'এ তো রাজপ্রাসাদ হে। এতসব সুন্দরী ললনা, ফ্রেঞ্চ ব্যাটাদের আর্টিস্টিক সেন্স আছে।'

'আরও অনেক সেন্স আছে। ওরা থাকলে নবাবকে হটানো মুশকিল। ঐ ঢ্যাঙা ব্যাটা শুনছি নবাবকে খুব মদৎ দিচ্ছে। ওকে অবিলম্বে হটাও।'

ওয়ালশ গম্ভীরভাবে বললে, 'লোকটা শুনেছি খুব করিতকর্মা। জগৎশেঠের কাছেও গিয়েছিল।'

'তারপর?' ক্লাইভের গলায় উদ্বেগ।

'না না, ওখানে বিশেষ পাত্তা পায় নি।'

'যাই হোক। তুমি আবার একটা ওয়াটসকে চিঠি দাও। এখন সরাসরি হুমকি দাও আমার নামে। অনুরোধ-উপরোধের সময় চলে গেছে। এপ্রিল মাস হয়ে গেল।'

উত্তেজনায় পা নাচাতে নাচাতে ক্লাইভ বললে, 'কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? শুনছি সবাই আমাদের পক্ষে—জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, মীরজাফর, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ—দরবারের বেশির ভাগ লোকই আমাদের আসার জন্যে দিন গুনছে। কিন্তু চেহারাটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছেও তা খুব স্পষ্ট নয়।'

'তুমি এক কাজ কর। লিউক স্ক্র্যাফটনকে পাঠাও। ওর আঁকা উমিচাঁদের বাগানের স্কেচটা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। তাছাড়া বেশ অ্যাগ্রেসিভ টাইপ। ওয়াটস বোধহয় একটু ম্যানমেনে—তাই না।'

'তুমি ওয়াটস সম্পর্কে ভুল করছো রবার্ট। ও সত্যিই খুব ধুরন্দর। অসাধারণ ধৈর্য, সাতচড়েও রা করে না। ওর মতো লোকেরই দরকার।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওয়াটস সম্পর্কে ভুল হতে পারে। আমি এখানে এসে দেখছি আমাকে এক সঙ্গে সব হতে হবে। যুদ্ধশাস্ত্রে বিশারদ, মনুষ্যচরিত্রবিশারদ···

'হ্যাঁ রবার্ট, তুমি অনেক পাল্টে গেছ।'

ক্লাইভ দৃঢ়ভাবে বললে, 'মানুষ মাত্রেই পাল্টাচ্ছে, এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকে না যদি সে মানুষ হয়।'

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে বলে, 'এক একবার মনে

হয়েছিল ইংল্যাণ্ডেই থেকে যাই। অনেক যশ কুড়িয়েছি। এখনই যা করেছি তাতেই ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে কেউ আমার নাম মুছে দিতে পারবে না, কী বলো।'

ঈর্ষান্বিত চোখে ওয়ালস তার বন্ধুর দিকে চেয়ে থাকে।

'কী, চুপ করে আছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? ছাখ, ওর্ম হয়তো লোক হিসেবে খুব সুবিধের নয়, তুমিও জানো আমিও জানি। কিন্তু ওর ইতিহাস এরই মধ্যে ইংল্যাণ্ডে প্রচুর সমাদর পেয়েছে।'

'রবার্ট রবার্ট। এগুলো তুমি কাকে বোঝাচ্ছো। তোমার গ্রেটনেস আমি কি মুহূর্তের মধ্যে সন্দেহ করেছি?'

ক্লাইভ আত্মসচেতনভাবে বললে, 'না না, আমি তা বলছি না।'

'আমার মাঝে মাঝে তোমাকে সীজারের মতো মনে হয়। সীজারের মতো তুমি হিন্দুস্থানে এসেছো কুশাসন মুক্ত করতে।'

কয়েক বছর আগে হলেও ক্লাইভ এই ধরনের মুখোমুখি কথাবার্তা বদরুচি মনে করত। কিন্তু এখন সে উঠে গিয়ে ওয়ালসের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

'ও, তোমাকে যে কথাটা বলবার জন্যে এসেছি সেটাই ভুলে গিয়েছিলাম। এতদিনে কিন্তু আমাদের চিন্তাভাবনা একটা শেপ নিচ্ছে মুর্শিদাবাদে।'

উৎসুক ক্লাইভের দিকে চেয়ে বললে, 'তোমার সত্যিই একটা সুখবর আছে রবার্ট। ওয়াটসন কোট পরেছে।'

উত্তেজিত ক্লাইভের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'তাই নাকি, তাই নাকি।'

'ওয়াটসের চিঠিতে যা জানতে পারছি তাতে সেইরকম দাঁড়ায়।'

'কী করে ঘটনাটা ঘটল?'

'ওয়াটসন একটা প্রাইভেট বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিল নবাবের সঙ্গে।'

'নবাব কি সত্যিই বালি ঢালছে নদীতে?'

'হ্যাঁ ওয়াটসনের জাহাজ ঠেকাবার জন্যে নদীর মুখটায় সাতদিন ধরে বালি গাছের গুঁড়ি ফেলেছে। জাহাজের কামানকে ওর বড্ড ভয়।'

'লোকটা সত্যিই একটা স্কাউণ্ড্রেল।'

'নবাব ঠিকই করেছে। ওয়াটসের মতে প্রাইভেট বন্দোবস্ত যদি করতেই হয় তাহলে নবাব সাবুৎ জঙের সঙ্গে করবে। দিল্লির জঙের জাহাজ পৌঁছবে না মুর্শিদাবাদে।'

চাপা একটা আনন্দ ক্লাইভের মুখে চোখে ফুটে ওঠে। সেদিকে চেয়ে

ওয়ালশ বললে, 'সত্যিই বলতে কি, ঐ একজন লোকই তোমার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে।'

কথাটা খুবই সত্য, কিন্তু ক্লাইভের পছন্দ নয়। চন্দননগর এবং কলকাতা পুনর্দখলের বিজয়কেতন অ্যাডমিরাল ওয়াটসন অনেকখানি বহন করেছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ভবিষ্যৎ এ-সবকিছু ম্লান করে দেবে। যদি নিজেই সে মানে মানে কেটে পড়ে তার চেয়ে সুখবর কিছু থাকতে পারে না।

'কিন্তু ব্যাপারটার চেহারা কী নেবে সে-রকম কিছু আন্দাজ পাচ্ছো?'

'ওয়াটস লিখেছে, দিন পাঁচছয় আরও অপেক্ষা করতে হবে। দিন পাঁচছয় পরে উমিচাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়বে, তখন ওর সঙ্গে কথা হবে।'

ক্লাইভ মাথা দোলাতে থাকে।

'চারদিকে নবাবের চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়াটসকে নবাব তো একদিন গর্দান দেবে বলে চেঁচিয়ে উঠল দরবারে।'

'একেবারে স্কাউণ্ড্রেল।'

'ওয়াটসের সপ্তাহখানেক আগের চিঠিটা তো তুমি দেখেছো? ফরাসীদের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স। সমস্তটা খোজা ওয়াজিদ হাত সাফাই করেছে।'

'মনস্টার! মনস্টার!'

বিস্মিত হয়ে ওয়ালস বললে, 'কার কথা বলছো?'

'নবাব নবাব! একেবারে মনস্টার!'

ক্লাইভ স্থির করলে, আগামীকালই গভর্নর পিগটকে জানাবে এই রাক্ষসের কাহিনী। এটা সে মনে মনে স্থির করে, যত দিন ঘনিয়ে আসছে তত আরও কালি ছিটোতে হবে সিরাজের গায়ে। একলাই তাকে সব কিছু করতে হবে। একদিকে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, আর একদিকে রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা। ক্লাইভ ভাবলে, হাতে যদি একটা খবর-কাগজ থাকতো কী ভালোই না হত।'

বিকেলের দিকে কড কড করে মেঘ ডেকে উঠল। কালো আকাশে মেঘের ভাঁজে ভাঁজে সূর্যাস্তের আভা। তারপর চড়বড় করে বৃষ্টি নামে।

একপশলা বৃষ্টির পর গরম কেটে বেশ ঠাণ্ডা। তবে বৃষ্টি হলেই বাদলা পোকা ওড়ে। বারান্দায় টেবিলে রাখা সেজের গা ঘেষে পোকা ওড়ে। তেলেঙ্গি বেয়ারা ডাচ ক্ল্যারেটের পেতল দিয়ে যায়।

আর ঠিক এই সময় কাঁপা কাঁপা আলোয় সিলিংয়ের বারোক সুন্দরীরা আরও রাক্ষস রূপ ধারণ করে। তাদের ভারি নিতম্ব আর স্তনে জোড়ায়

জোড়ায় পুরুস্টু টিকটিকি লেপ্টে থাকায় আরও কামোদ্দীপক লাগে সেই সব জলপরীদের চেহারা। ক্লাইভ স্থির করলে কালকে সকালের ডাকে পেগিকে চিঠি লিখবে চলে আসতে।

পা নাচাতে নাচাতে ক্লাইভ ভাবলে, পেগি বেড়ে মেয়ে। এখন ডেপুটি গভর্নরের স্ত্রী হয়েও তার মাথা ঘুরে যায় নি। সেইরকম গলগল করে কথা বলে, ছবি আঁকে, গান গায়। আর ঘ্যান ঘ্যান করে না একদম, এইটাই তার সবচেয়ে বড় প্লাশ পয়েন্ট।

খাবার পর তেলেঙ্গি বেয়ারা ক্লাইভকে সিল্কের পাজামা সার্ট পরিয়ে দেয়। ঘরের মধ্যে বাদলা হাওয়া খেলে। বেয়ারাটি মশারি গুঁজে দিতে দিতে বিস্মিত হয়ে শুনলে ঘুমোবার আগে ক্লাইভ হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে: পেগি ইজ এ গুড গার্ল।

টিকটিকিগুলো সিলিংয়ের আনাচে কানাচে জলপরীদের গায়ে খেলে বেড়ায়।

আট

একজোড়া চিতাবাঘ উপহার পাঠিয়েছে নবাব। খাঁচার মধ্যে থেকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে আছে জন্তু দুটো।

'এগুলো কিন্তু ট্রেণ্ড চিতা বর্বার্ট', ওয়ালস বললে।

'কিসের জন্যে ট্রেনিং?'

ওয়ালস বললে, 'ওরা হরিণ ধরে। কিন্তু আমার ধারণা, ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে তোমাকে ধরবার জন্যে।'

খাঁচার ভেতর থেকে দুজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। ক্লাইভ হাসতে হাসতে বললে, 'এ বিয়াল মনস্টার।'

ওয়ালস চলে গেলে ক্লাইভ এক দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসে নবাবকে। 'তুমি আমার বাবার মতো। তোমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে আমি কি উৎসুক তুমি জানো না।' কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে সেই গোল গোল মোটা হরফগুলো সে ছুঁড়ে দেয় গুলির মতো, সেগুলো যেন আগামী যুদ্ধেরই এক মস্ত অংশ। লিখতে লিখতে তার পাতলা ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে। ক্লাইভ একটা বাদলা পোকা তাড়াবার জন্যে হাত তুলে সাবেকি ভাবনাগুলো তাড়িয়ে দেয়। শুধু পরাক্রমের মোটেই ব্যাপার নয়। পরাক্রম দিয়ে দুটো পাঁচটা কেল্লা দখল করা যেতে পারে।

কিন্তু এই বিরাট হিন্দুস্থান—এর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এত বিশাল যে শুধু পরাক্রমের ওপর ভর করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ওয়াটস তাকে বারবার খোঁচাচ্ছে, নবাবকে এক বিন্দু বিশ্বাস না করতে বারবার অনুরোধ জানাচ্ছে। নবাব সুবিধে পেলেই চুক্তি ভাঙবে, ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করবে। ঠিক কথা। নবাবকে সে প্রেমপত্র লিখতে বসে নি। কিন্তু তার মনোযোগ নড়াতে হবে, তার মসনদের সমস্ত ভিত নড়ে যাচ্ছে এটা যেন সামান্য টের সে না পায়। ক্লাইভ ভাবছিল ভবিষ্যৎ কাল তাকে কি চোখে দেখবে তাতে তার কিছু এসে যায় না। দরকার হলে সে সিরাজকে বাবা বলবে, তার কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এখন ওই ঢ্যাঙা ফরাসীটাকে হটাতে হবে। পরদিনই সিরাজকে আর একখানা চিঠি লিখতে বসে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি হঠাৎ সিরাজের হুকুম—জঁ ল, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করো।

'এ কি, এটা কি?' ঢ্যাঙা লোকটার চুল উড়ছে। 'অসম্ভব। অসম্ভব। শালা শেঠেদের কাণ্ড। গাল পাড়তে পাড়তে দরবারে ঢোকে জঁ ল। দরবার বন্ধ। সিরাজ অন্দর মহলে। লক্ষ্ণৌ থেকে নর্তকী এসেছে, গান বাজনা চলছে। ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছে, ডিনারের পর দেখা হতে পারে।

ঠায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করে ল আর তার চার পাঁচ জন সঙ্গী। রাগে থম থম করে তার লম্বা সুন্দর মুখখানা। যতবার খবর পাঠাবার চেষ্টা করে ততবার রক্ষীরা জানিয়ে দেয়, নবাব ব্যস্ত, আরও কিছুক্ষণ পর দরবারে আসবে। শেষবার মুন্সি এসে জানালে তাদের জন্যে খাবারের বন্দোবস্ত হয়েছে।

খেতে বসে ল বললে, 'এই নবাব বাড়ির খানা? এ যে আমাদের ডেকে অপমান!'

সত্যিই এরকম খানা আগে কেউ খায় নি এই চল্লিশ থামওয়ালা বাড়িতে। এক প্লেট ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত, একটা বেগুনের ঘ্যাঁট, আধসেদ্ধ কয়েক টুকরো মাংস।

ল তার হাতখানা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি বলছি জমজমাট এই শহর এসব কিছুই থাকবে না। এ সব মরুভূমি হয়ে যাবে। ইংরেজরা নতুন নবাব বসাবে, তাকেও হটাবে। আমার কাছে সমস্ত

ব্যাপারটা দিনের মতো পরিষ্কার। অথচ এ নবাব—এ কি নবাব না ম্যাওপুসী?'

বাস্তবিক সেই ভদ্রলোককে দেখাচ্ছিল এক বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতো। তার চুল উড়ছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'আমাকে বলে কি না ক্লাইভের কাছে আত্মসমর্পণ। অসম্ভব! এ বান্দা সে বান্দা নয়।'

তার সঙ্গিটি স্বাস্থ্যবান, মাথায় টাক। সে নিচু গলায় বললে, 'জঁ, তুমি অতো উত্তেজিত হও না। আমরা চলো শেঠেদের কাছে যাই। ওরাই তো কলকাঠি নাড়াচ্ছে।'

'কোথায় আছো? পেয়র, তুমি কোথায় আছো?' গানের মতো সুরেলা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ল। তারপর তার অবিন্যস্ত চুলের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে বললে, 'সর্ব চেষ্টা করেছি আমি পেয়র, সব চেষ্টা করেছি। গতকাল ভোরবেলাতে দেখা করেছি ওই দুই মক্কেলের সঙ্গে। খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমার কথা শুনলে।'

'কিছু বললে না?'

বললে, আমরা ব্যবসায়ী, রাজনীতি বুঝি না। এক ব্যাটা ঠাট্টাও করলে, বললে, আমরা ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে ভয় পাই, আমরা ভিতু। শুনলাম। সব শুনলাম। বুঝেছো পেয়র, সব চুপ করে শুনলাম।'

'তুমি তাহলে এখন কী করবে?

'আমি?' ল হঠাৎ ভাতের ডিসটা উল্টে দিয়ে বললে, 'দেখি, কী করতে পারি?'

বলেই সটান নবাবের অন্দর মহলের দিকে পা বাড়ালে। শান্ত্রীরা হৈ হৈ করে ওঠে। কিন্তু সেই বিশাল চেহারার উত্তেজিত সাহেবটি তাদের ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

নর্তকী তখন কথক নাচের ভাও দেখাচ্ছিল। উড়নি একবার তুলে একবার নামিয়ে মাঝে মাঝে মদির কটাক্ষ হানছিল সিরাজের দিকে চেয়ে, তার আরক্তিম ঠোঁটে ফিকফিক হাসি। উত্তেজিত সাহেবকে ঢুকতে দেখে সারেঙ্গিবাদক বাজনা বন্ধ করে, তবলা থামে।

সিরাজ আঙুল দিয়ে বাঈজীকে সরে যেতে বলে অপ্রসন্নভাবে সাহেবের দিকে তাকালে।

কুর্নিশ করে ল বললে, 'আমার গোস্তাকি মাফ করবেন নবাব। চারদিক

থেকে আপনার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। আপনি আমাকে কী মনে করেন জানি না। কিন্তু আমি আপনার একজন—বিশ্বাস করুন—সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমাদের এই ষাট-সত্তর জন লোককে থাকতে দেওয়া আপনার রাজত্বে কিছুই অসম্ভব ব্যাপার না। আপনার এই মুর্শিদাবাদ শহরে তামাম হিন্দুস্থানের লোক, এমন কি ইয়োরোপের লোক আশ্রয় নিয়েছে। আমি শপথ করে বলছি নবাব, আমাদের জান থাকতে আপনার নখের ডগা কেউ ছুঁতে সাহস করবে না। শয়তান ইংরেজরা এ কথাটা জানে, সেইজন্যে তারা উঠে পড়ে লেগেছে আমাদের তাড়াবার জন্যে।'

সিরাজ তাকিয়া থেকে সোজা হয়ে উঠে বললে, 'আপনাদের কয়েকজনের জন্যে আমি ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই নে।'

'এটাই কি আপনার শেষ কথা?'

সেই তীব্র উত্তেজিত মুখ আর জ্বলজ্বলে চোখের দিকে চাইতে পারলে না সিরাজ। চোখ ফিরিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, শেষ কথা।'

'আমি জানি কারা এই সর্বনাশ করছে। তবে আপনি জেনে রাখবেন নবাব সাহেব, আমাদের সর্বনাশ মানে আপনারও সর্বনাশ। আপনার দরবারে যারা বন্ধু হিসেবে আপনাকে ঘিরে রেখেছে, জেনে রাখবেন তারা সবাই তলে তলে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চলেছে।' ল-র গলা আরও উঁচু খাদে উঠে যায় উত্তেজনায়। 'সব্বাই, কেউ বাদ নেই।'

'আমাকে পাল্টে ওরা কাকে বসাবে মসনদে?' হাল্কা ভাবে প্রশ্ন করতে গিয়ে সিরাজের গলা কেঁপে যায়। তার চাপা আতঙ্কটা আর চাপা থাকে না।

'চন্দননগর ইংরেজরা আক্রমণ করবার আগে আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম নবাব। আপনি রাজিও হয়েছিলেন। তারপর উমিচাঁদ জগৎশেঠ আপনাকে বুঝ দিলে—ইংরেজরা কখনও কথার খেলাপ করে না। আপনি আপনার সৈন্য তুলে নিলেন। ইংরেজরা সত্যিই কথার খেলাপ করে না।'

জঁ ল-র ব্যঙ্গোক্তি কিন্তু সিরাজকে স্পর্শ করে না। চন্দননগর এখন অতীত কাহিনী। তাকে আর খুঁচিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া—সিরাজ মনে মনে চিন্তা করে, যে হারছে তার সঙ্গে ভাগ্য মেলানো যুক্তিযুক্ত নয়। ফরাসীরা এখন হেরো পার্টি। তাদের সঙ্গে ভাব করা মানেই ইংরেজদের চটানো।

সিরাজ বললে, 'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি।'

'আপনার প্রশ্নের জবাব তো খুব সোজা। খোদা ইয়ার লতিফ খানকে ওরা মসনদে বসাচ্ছে।'

এইবার হো হো করে হেসে ওঠে সিরাজ। জঁ ল-র কথায় সত্যিই সে মজা পায়। চেঁচিয়ে বলে, 'ঐ লুত্তি? ঐ বেঁটে মোটা লোকটা?'

'হ্যাঁ নবাবসাহেব। যাকে জগৎশেঠ মহতাব রায় মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পোষে।'

'তুমি কি ঠাট্টা করছ ল?'

ল গম্ভীর হয়ে বললে, 'ঠাট্টা করার সময় নয় এটা নবাব সাহেব। শেঠেরা চমৎকার খেলছে। হয়তো তুরুপের তাসটা ঠিক দেখাচ্ছে না। যেটা দেখাচ্ছে সেটা ফেকলু তাস। আসল তুরুপের তাস হয়তো, হয়তো মীরজাফর।'

'মীরজাফর?' এবার নবাবের গলায় আতঙ্ক স্পষ্ট।

লম্বা চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে নিয়ে ল বললে, 'কেউ বাদ নেই নবাব—রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, মহারাজ নন্দকুমার ..'

'নন্দকুমার?'

'সব সব। এখন কী অসুবিধেটা হচ্ছে জানেন—পার্সেন্টেজের। পার্সেন্টেজ নিয়ে গণ্ডগোল হচ্ছে।'

'তার মানে?'

জঁ ল-র ঝরঝরে ফার্সির মধ্যে পার্সেন্টেজ কথাটা অনুবাদ করতে ভুলে গিয়েছিল।

কৌতূহলী সিরাজের চোখের দিকে চেয়ে বললে, 'বখরা নবাবসাহেব, লুটের বখরা।'

সিরাজ মৃদু মৃদু হাসে। আবার গড়গড়া মুখে দেয়। ল যা বলছে তা খানিকটা সত্যি হতে পারে কিন্তু সবটা নিশ্চয় নয়। তাছাড়া কাকে বিশ্বাস করা যাবে? সালারৎ জঙ্গকে বুসি তার পোষা নবাব বানায় নি দাক্ষিণাত্যে?

কয়েকবার গড়গড়ায় টান দিয়ে সিরাজ বললে, 'তুমি নিশ্চয় কম বয়সে নাটক করতে সাহেব।'

'অবস্থাটা যখন নাটকীয় তখন নাটক করতে আপত্তি কী?'

'ক্লাইভ বলছে, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের যে চুক্তি হয়েছে তাতে ইংরেজদের বন্ধু আমাদের বন্ধু, ইংরেজদের শত্রু আমাদের শত্রু।'

'আপনি ভালো করেই জানেন নবাব সাহেব এটা ক্লাইভের ভড়কিবাজি। চুক্তিতে এরকম কোনো কথাই নেই।'

'ঠিক আছে,' সিবাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আপনাদেব আত্মসমর্পণ কবাব দবকাব নেই। যেখানে ইচ্ছে আপনাবা যেতে পাবেন, তবে আমার বাজ্যে আব নয।'

জঁ ল তাব লম্বা হাত তুলে তিনবার কুর্নিশ কবলে নবাবকে।

সিবাজ হাল্কাভাবে বললে, 'আব তেমন যদি দবকাবই পডে তখন না হয ডেকে পাঠাব।'

'আমাকে?' চমৎকাব নাটকীয হাসি হাসলে জঁ ল। 'আমাকে ডাকলে আব পাবেন না। এই আমাদেব শেষ দেখা নবাব বাহাদুব।'

কুর্নিশ কবে জঁ ল বেবিযে যায। সাবেঙ্গি আবাব বাজতে থাকে।

নয

ঘিবেটিব বাগানে সে বছব খুব গোলাপখাস হযেছিল। গঙ্গাব ধাবে কযেকটা গাছ একেবাব ঝুমঝুম কবছে আমে। যেমন গন্ধ তেমনি স্বাদ। ক্লাইভ পব পব তিন দিন ডিনাবে আম খেলেন। তাবপব গবমে কিংবা আম বেশি খাওয়ায অথবা দুশ্চিন্তায ক্লাইভেব পেট নামল। শেষেব কাবণটাই ক্লাইভেব মতে তাব শবীব খাবাপেব আসল কাবণ। আর্কট ত্রিচেনাপল্লীতে মৃত্যুর সঙ্গে বাবে বাবে পাঞ্জা লডতে হযেছে, বাবে বাবে মৃত্যুব নিঃশ্বাস গাযে এসে লেগেছে কিন্তু এবকম দুশ্চিন্তা তাকে কাবু কবে নি।

ওষুধবিষুধে পেটেব অসুখ চাপা পডল বটে কিন্তু তাব গলস্টোনেব ব্যথাটা আবাব মাথা চাডা দিতে থাকে। ক্লাইভ টেব পায এই ভ্যাপসা গবমে যদি তাকে দিনেব পর দিন এভাবে নিঃসঙ্গ কাটাতে হয তাহলে অসুখেব প্রবল আক্রমণ ঘটে যাবাব সম্ভাবনা। অথচ হটপট কবে কিছু কবাব নেই।

ক্লাইভ ভেবে দেখেছে বেশ ভালো করে। যদি লেনদেনেব কাববারটা ঠিকমতো পেকে না ওঠে তাহলে অন্তত পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নবাবেব পক্ষে থেকে যাবে। বাংলাদেশেব মতো জলকাদায সবাসবি খোলা সমতলভূমিতে শুধু কামানেব ওপব নির্ভব কবে পঞ্চাশ হাজাবেব সামনে দাঁডানো অসম্ভব। ওয়াটসনেব নাবিকবা নিজেদেব মধ্যে অনেক কথা বলে বেডাচ্ছে—নেটিভ কুলিদেব মতো তাদেব কামান টানাব জন্যে আনা হযেছে ইত্যাদি। তাছাডা খোলা জাযগায কোনো কভাব নেই। নবাব যদি বুদ্ধি কবে তাব সৈন্যদেব মাইনে পত্তব মিটিযে দেয তাহলেই সর্বনাশ। বিশেষ কবে নবাবের যে ক্র্যাক

ইবানি ঘোড়সওয়ার আর পাঠান রেজিমেন্ট সেই হাজার দু-তিনেক বডিগার্ড মারাঠাদের সঙ্গে লড়েছে। তারা কামানের গোলা ভ্রূক্ষেপ করবে না। একমাত্র ভরসা মীরজাফর আর রায় দুর্লভ। কিন্তু তারা কোনো ট্যাঁ ফোঁ করছে না। এই ভ্যাপসা গরমে আর কতদিন? ওয়াটসকে কড়া করে চিঠি দেয় ক্লাইভ: জলকাদায় আর কিছু করা সম্ভব হবে না। বৃষ্টির আগেই যদি কিছু না হয় তাহলে মাদ্রাজে ফিরে যাব।

ওয়াটসের কোনো জবাব আসে না। তবে লিউক স্ক্র্যাফটন তার অভাব পূর্ণ করে। স্ক্র্যাফটন ছোকরাটি বেশ, তার বিস্তারিত চিঠি পড়তে পড়তে ক্লাইভ মনে মনে তারিফ করে। মুর্শিদাবাদ দরবারের আনুপূর্বিক বর্ণনা পাওয়া যায় তার চিঠিতে। একটা ঝামেলা মিটেছে—সেই ঢ্যাঙা ফরাসীটা ভেগেছে। অবশ্য নবাব খুব অন্যায় করেছে তাকে ঐভাবে ছেড়ে দিয়ে। আবার নবাবকে চিঠি লিখতে বসে ক্লাইভ।

সম্প্রতি আর একটা চিঠি এসেছে স্ক্র্যাফটনের কাছ থেকে। শেঠেরা তাকে জানিয়েছে নবাবের সিদ্ধান্ত—ওয়াটসের গর্দান যাবে। ওদিকে মানিকচাঁদ ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করছে। নবাব এখন তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষী।

বাগানে শিষ দিতে দিতে ক্লাইভ পায়চারি করে। শেঠেরা চমৎকার খেলছে, ভারতীয়দের মধ্যে এ-রকম বুদ্ধিমান লোকজন অন্তত দাক্ষিণাত্যে দেখা যায় নি। ক্লাইভ আঁচ করে মুর্শিদাবাদের মসনদ বিপ্লবটা শেঠেরা যেন তার কাছে বিক্রি করছে নানাভাবে—কখনও ছোকরা নবাবের রাশ টেনে, কখনও তাকে খেপিয়ে। কারণ ক্লাইভ টের পায় শেঠরা ভয় পাচ্ছে যদি এই সব দরাদরিতে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসে। সেই জন্যে তারাই এখন নবাবকে খেপাচ্ছে, তার ইংরেজ-বিদ্বেষে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

সেদিন গরমে ছাতে বেতের চেয়ারে বসে ক্লাইভ পান করছিল সূর্যাস্তের আলোয়। এমন সময় স্ক্র্যাফটনের আর এক চিঠি। স্ক্র্যাফটনের চিঠি ক্লাইভের কাছে এখন বন্দুক কামানের থেকেও দরকারি। কারণ বন্দুক কামান দিয়ে মুর্শিদাবাদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে না। এ বিষয়ে ক্লাইভ ক্রমশ নিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

স্ক্র্যাফটনের চিঠিতে ঠাসা খবর। লুত্তি কুত্তি কেউ নয়, স্বয়ং মীরজাফর, নবাবের দরবারে সবচেয়ে খানদানি আমির, নবাব সৈন্যের পে-মাস্টার মীরজাফর এখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছে। দুর্দান্ত টার্মস। অঙ্কগুলো সন্ধেক

অন্ধকারে ঠিক পরিষ্কার না হওয়ায় সিঁড়ি দিয়ে তড়বড় করে ক্লাইভ নিচে নেমে আসে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কোথায় অর্কট! কোথায় দাক্ষিণাত্য। টাকা গয়নাগাটি হীরে জহরত মিলে হেসেখেলে ছ-সাত কোটি টাকা। তবে সাবধান। লিউক স্ক্র্যাফটনের দূরদর্শিতা অপূর্ব। স্ক্র্যাফটন হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে—নানা দিক থেকে বাগড়া আসছে। ব্যাপারটা চারদিকে জানাজানি হবার সম্ভাবনা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে—কারণ প্রত্যেকেই একটা ফ্যাকড়া তুলে কিছু খিঁচে নেবার তাল করছে। যাই হোক, স্ক্র্যাফটন লিখছে, যুদ্ধ অনিবার্য—মুর্শিদাবাদে বিপ্লব আসন্ন।

তারপর পাঁচ-ছ দিন চুপচাপ। মুর্শিদাবাদের ডাক বন্ধ। লোক প্রমুখাৎ প্রবল গুজব কানে আসতে থাকে। একটা বেসরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওয়াটসের মাথা বল্লমে ঝুলিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে, মীরজাফরের প্রাসাদের সামনে কামান বসানো হয়েছে। এদিকে মাঝখানে আকাশ কালো করে বাজবিদ্যুৎ নিয়ে প্রবল কালবৈশাখী নৃত্য করে যায় এক সন্ধেবেলা। বাগানে জলকাদা জমে। ওয়াটসকে আবার কড়া করে চিঠি লেখে ক্লাইভ। সারা দুপুর পলাশিতে নবাব শিবিরের ম্যাপগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ক্লাইভ। আক্রমণের ব্যবস্থা পাকা। তবে যদি পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সামনে খোলা জায়গায় দাঁড়াতে হয় তাহলে আবার সন্ধেবেলা তল্পিতল্পা গুটিয়ে কলকাতা প্রত্যাবর্তন অনিবার্য।

প্রবল দোটানার মধ্যে ক্লাইভের দিনগুলো কাটে। এক-একবার তার প্রাক্তন বীরত্ব তাকে খোঁচা দেয়, এইসব হিসেবনিকেষ দরাদরি শেষ করে সরাসরি সৈন্য মার্চ করতে তাকে আহ্বান জানায়। সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা, মুর্শিদাবাদ দরবারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, সেখানকার প্রত্যেকটা নামজাদা লোকের দ্বৈত ভূমিকার কথা ক্লাইভ স্মরণ করে। তাছাড়া লোকক্ষয়ের সম্ভাবনা ভুললে চলবে না। এতদিন পর্যন্ত সে অপরাজেয়। একবার ফরাসীদের আক্রমণে তাকে নাইটশার্ট পরে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল, আর্কট কেল্লার পরিখায় দুবার তার দিকে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার পাশে দাঁড়ানো সঙ্গির মৃত্যু ডেকে আনে। কিন্তু এই অপরাজিত ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদে সরাসরি সংগ্রামে অক্ষুণ্ণ থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। ক্লাইভের খালি ভয় হতে থাকে আবার পেটের যন্ত্রণা শুরু না হয়। মনটাকে স্থির করার জন্যে সে পেগির সুঠাম দেহের স্মৃতিতে তার চিন্তা আরোপ করার চেষ্টা করে—তার লম্বা সুগঠিত আঙুল, ঘাড়, চেটাল ঠোঁট, ঝকঝকে

হাসি। কিন্তু বেশিক্ষণ মন সেখানে আটকে থাকে না। খালি দুশ্চিন্তা হতে থাকে—শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কেঁচে যাবে না তো?

একদিন ভোরে ওয়ালসের পাল্কি আসতে দেখা যায় বাগানের রাস্তা দিয়ে। হাতে তার চিঠি। স্ক্র্যাফটনের সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠির পাঠোদ্ধার করে এনেছে ওয়ালস।

চিঠিখানা ক্লাইভের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'উমিচাঁদ সমস্ত ব্যাপারটা উল্টে দিয়েছে।'

দুবার আদ্যোপান্ত চিঠিখানা পড়ে ফেলে ক্লাইভ। চাপা গলায় বললে, 'স্কাউণ্ড্রেল। এ ড্রেডফুল স্কাউণ্ড্রেল!'

ওয়ালস বললে, 'ও দুটো কোর্টেই একসঙ্গে খেলছে। ওয়াটসকে শাসাচ্ছে নবাবকে সব কথা ফাঁস করে দেবে যদি তার সঙ্গে আলাদা বন্দোবস্ত না হয়।'

'ওর টার্মসে কী দাঁড়াচ্ছে?'

'নবাবের দৌলতখানার পাঁচ পার্সেন্ট। আর হীরে জহরতের চারভাগের এক ভাগ। সমস্তটা লিখিত পড়িত ভাবে করতে হবে। মীরজাফরের সঙ্গে যে ফাইনাল দলিল হবে তাতে তার প্রাপ্য অঙ্কের কথা লেখা থাকবে। নড়চড় চলবে না।'

'ডেভিল! মনস্টার!'

'তুমি এক কাজ করো রবার্ট। তুমি বললে, ও হয়তো তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকায় রাজি হয়ে যাবে।'

ক্লাইভ চটে গিয়ে বললে, 'তাহলে আমরা যারা এত কাঠ-খড় পোড়াচ্ছি, আমরা কী করব?'

'ঠিক বলেছ রবার্ট। আমরা কী করব?'

ভীষণ উত্তেজিত দেখায় ক্লাইভকে। মুখ থম থম করে, চোখগুলো আরও কুতকুতে দেখায়।

'তুমি এক কাজ কর রবার্ট। উমিচাঁদকে নামিয়ে দাও। শেঠদের বললেই ব্যবস্থা করবে।'

'তুমি পাগল হয়েছ ওয়ালস! এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদে খুন? সমস্ত কিছু জানাজানি হয়ে যাবে।'

'স্ক্র্যাফটন দুদিনের মধ্যে উত্তর চেয়েছে।'

'ঠিক আছে ওয়ালস, তুমি এক কাজ কর। তুমি কালকে সকালে চলে এস। হয়তো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সন্দেহের চোখে ওয়ালস তার দিকে তাকায়।

ক্লাইভ দৃঢ় গলায় বললে, 'এ সম্পর্কে আর আলোচনা নয়, কাল এসো।'

ঠিক ভারতীয় যোগক্রিয়া নয় তবে ক্লাইভ মনঃসংযোগের জন্যে নির্জনতা পছন্দ করে। সারা বিকেল সন্ধে ভেতরের বারান্দায় একলা বসে থাকে, কারুর সঙ্গে দেখা করে না। বজরায় ইট বোঝাই হচ্ছে, তার পাশে বিচালির নৌকো, সারা বিকেল সেদিকে চেয়ে চেয়ে ক্লাইভ সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন ওয়ালস এলেই সরাসরি চিঠি ডিকটেট করে। দুখানা দলিল—একটা সাদা কাগজ আর একটা লাল কাগজ। সাদাটা আসল লালটা জাল।

'সবই তো হল বুঝলাম। কিন্তু ওয়াটসন?'

ক্লাইভ ভুরু কুঁচকে বললে, 'এই যে, আমার নিচেই ওয়াটসন সই করবে।'

ওয়ালস ভাবিক্কি চালে বলে, 'আমি তো সেই কথাটাই বলতে এসেছি। ওয়াটসন বলে পাঠিয়েছে, এসব ছেঁদো ব্যাপারে ও থাকবে না।'

ক্লাইভ ওয়ালসের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'ওয়াটসন থাকবে না তাতে কী আছে? ওয়াটসনের সই থাকবে।'

'আই সি, আই সি', ওয়ালস ভয়ে ভয়ে তাকায় ক্লাইভের দিকে।

'দাও কলম দাও। আর ঝামেলা পাকিও না।'

ক্লাইভ লাল দলিলটায় ওয়াটসনের সই করলে। ওয়ালশ মুগ্ধ হয়ে লক্ষ করলে অবিকল অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের সই।

ওয়ালশ বিদায় হবার পর ক্লাইভের অস্থিরতা আরও বাড়ে। ইতিমধ্যে যা করণীয় সব করা হয়ে গেছে। মীরজাফর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পয়লা মে তারিখে ক্লাইভ কমিটির মিটিং ডেকে সর্বসম্মতিক্রমে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নিয়েছে। প্রস্তাবের মোসাবিদা আগে থেকেই করে দিয়েছে ক্লাইভ: মুর্শিদাবাদে বিপ্লব আসন্ন। ইংরেজরা চাক কিংবা না চাক এ-বিপ্লব ঠেকানো যাবে না। আর যখন নতুন নবাবের কাছ থেকে অনেক ভালো টার্মস পাওয়া যাচ্ছে তখন তাকে সামরিক সাহায্য দিতে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু এত আটঘাট বাঁধার পরও যাত্রা নাস্তি। এ যেন অনেকটা

কলাপাতায় নুন আর লেবু নিয়ে বসে থাকা ভোজন পর্বের আশায়। সমস্ত মাসটা আশায় আশায় কাটে। কবে সই পর্ব সমাধা হবে। এক একবার মনে হত সব বুঝি ভেস্তে গেল। গরমও প্রবল ভাবে পড়তে থাকে। ভ্যাপসা গরমের পর কখনও কখনও নির্মেঘ আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। বিষ্টি নামলে গরম কমতে পারে কিন্তু বিষ্টি নামলেই সর্বনাশ। এই নদী-নালায় ভারি কামান নিয়ে মার্চ করা অসম্ভব।

পলাশি কতদূর? ক্লাইভের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা নির্জন সন্ধেবেলায় গঙ্গার হাওয়ায় ভেসে যায়ঃ 'হাউ ফার ইজ প্লাসি?' আর কত অপেক্ষা হবে? পেগির চিঠি এসেছে। সঙ্গে পেন-ড্রইং ঃ হাতির ওপর হাওদায় এক সাহেব গড়গড়া টানছে—টান দিয়ে পেগি লিখেছেঃ লর্ড ক্লাইভ। ক্লাইভ আশ্চর্য হয়ে যায়। পেগি তার মনের কথা জানল কী করে?

আবার ক্লাইভের বাঁকা বাঁকা হরফে নবাবের কাছে চিঠি যায়ঃ 'আপনার মতো মহানুভব লোকের বন্ধুত্বই আমার একমাত্র ভরসা। বাজে লোকের কথায় কান দেবেন না।'

গরমে অনিশ্চয়তায় রাত্তিরের ঘুম বন্ধ। এরকম অবস্থা আর কিছুদিন চললে নির্ঘাত নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে। মীরজাফর তো মুর্শিদাবাদ শহরেই বসে আছে। এতদিনেও কি একটা সই জোগাড় হয় না? 'সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে। আমার চিঠি পাওয়ার পরেও যদি কোনো ব্যাপার পাকাপাকি না দাঁড়ায় তাহলে আমি ফিরে যাব, বর্ষায় যুদ্ধ অসম্ভব।' ওয়াটসকে চিঠি লিখে ক্লাইভ খানিকটা মানসিক স্থৈর্য অর্জনের চেষ্টা করে।

অস্থির মে মাসের পর জুন মাস। পাঁচ তারিখে সেই অভিপ্রেত ঘটনাটি ঘটে যায়। ডুলিতে মীরজাফরের হারেমবাসিনীদের পিছু পিছু ওয়াটস তার প্রাসাদে ঢুকে পড়ে। সই হয়ে যায়। রায় দুর্লভও আর ফ্যাকড়া তোলে না।

এর পর অবস্থা আরও অসহনীয়। সারা মুর্শিদাবাদ শহর গুজবে ছেয়ে যায়। শিকারের ছুতো করে ওয়াটস বেরোয় তার সঙ্গীদের নিয়ে। শহরের বাইরে এসে খোড়া ছুটিয়ে দেয় সহিসদের পেছনে ফেলে। গুড়গুড় করে আকাশে মেঘ ডাকে। ইংরেজ সৈন্যের ড্রাম বাজে। ক্লাইভের মার্চ শুরু হয়। সেদিন ১৩ই জুন।

দশ

দিন দশেক পরে সন্ধেবেলা বেগমপুর গ্রামে আশ্চর্য রং হয়েছিল আকাশে। সেদিন দুপুরে দিকে তুমুল বৃষ্টি হয়েছিল, আকাশের কালো মেঘের বদলে ঝলমল করে ফিরোজা রেগনি গোলাপি আর উজ্জ্বল হলুদ রং। গাঁয়ের প্রান্তে কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে তাঁতিপাড়ার যে দুটি কমবয়সী বউ জল তুলছিল তাদের একজন বললে, 'ছাখ ছাখ কেমন রং হয়েছে।'

বৃষ্টিতে গরমও অনেক কম। বড়বউ ছোটবউকে বললে, 'তোর ননদটা আর পাল্টালো না।'

'নাঃ!' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট বউটি।

'আমি বাবা ভালো আছি। ননদটা বদ্ধকালা। কেউ ওর কথা ধরে না।'

ছোট বউটি বললে, 'তোমার মতো ভাগ্যি করে তো সবাই আসে না দিদি।'

এমন সময় একটা সোরগোলের শব্দ শুনে তারা ভয়চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সদর রাস্তার দিকে। 'ওমা, এরা কারা!' ছোট বউটি আর্তনাদ করে ওঠে।

'চুপ চুপ। সরে আয়। নবাবের সৈন্য দেখছিস না?' তারা দুজনেই কুয়োর পেছনে একটা বিশাল কাঁঠাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নেয়।

শ্রান্ত অবসন্ন পথহারা মানুষের দল পলাশি থেকে ফিরছে। তাদের অনেকের কাঁধেই বন্দুক নেই, পায়ের পট্টি খুলে গেছে। পা ভর্তি ধুলো কাদা, মুখে অবসাদ, মুখ নিচু করে শ্রান্ত পায়ে তারা মুর্শিদাবাদ ফিরছে।

বিশেষ তাড়া নেই তাদের গতিতে। ভয়ের বদলে অবসাদই তাদের চোখেমুখে স্পষ্ট। তারা দশ মাইল পথ হেঁটেছে, আরও দশ মাইল সামনে। কোনো কোনো সেপাইয়ের গায়ে আঘাতের চিহ্ন। একটা সেপাই কুয়োর পাড় লক্ষ করে তার বন্দুকটা ছুঁড়ে দেয়। কেউ কেউ তাদের ঘামে জবজবে কুর্তা দলা পাকিয়ে নিয়ে হাঁটতে থাকে। ঘন্টা খানেক এইভাবে চলে। আরও আশেপাশে বনবাদাড় খাল নালা পেরিয়ে সেপাইরা ফিরছে। কেউ কোনো কথা বিশেষ বলে না। দুটি বউয়ের মনে হতে থাকে এই রকম অজস্র মানুষের নিস্তব্ধ মিছিল সারা রাত ধরে চলবে।

কিন্তু হঠাৎ মিছিল বন্ধ হয়ে যায়। বউ দুটি চারদিক তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করে। মিছিল শেষ হয়ে গেছে, আশেপাশে পায়ের আওয়াজ নেই।

কাঁঠাল গুঁড়ির পেছন থেকে দুজোড়া ভিতু চোখ কুয়োর পাড়ে তাদের জলভরা কলসীর দিকে চেয়ে থাকে। পাতলা অন্ধকারের একটা আস্তরণ কুয়ো-পাড়ের বাদামগাছ বাঁশঝাড় ঢেকে দেয়, একফালি চাঁদ দেখা যায়।

পা টিপে টিপে বেরিয়ে এক ঝটকায় কলসি তুলেই ছোট বউটি চিৎকার করে ওঠে, 'ওমা, কি হবে গো?'

'ডরো মৎ, পানি দেও। বহৎ তিয়াস।'

সামনে দাঁড়িয়ে দুজন পাঠান সৈনিক।

ছোট বউটি তার কলসি থেকে জল ঢালতেই দুজন সৈনিক আঁজলা ভর্তি করে জল পান করে। মুখে কপালে ঘাড়ে জলের ঝাপটা দিতে থাকে।

বড় বউটি গাছের পেছন থেকে ফোঁসে, 'মর এবার, তোকে পই পই করে বারণ করলাম যাস নে।'

ছোট বউটির কিন্তু ভয় কেটে গেছে। সেপাইয়ের প্রথমজন বয়স্ক, কাঁচাপাকা দাড়ি, রোদে পোড়া ফর্সা রং, দ্বিতীয় সৈনিকটির বয়স কম, তার বাঁ কাঁধে বোধহয় চোট লেগেছে, একফালি ন্যাকড়া ফুটে রক্তের কালো চাপড়া বোঝা যায়। এক হাত দিয়ে সে জলপান করে।

বয়স্ক সৈনিকটি আর একবার বললে, 'ডরো মৎ, ঘর যাও, ঘর যাও।' ছোট বউটির আতঙ্ক কেটেছে। সে ডাক দিয়ে বলে, 'অ দিদি, ওরা ভালো লোক। তুমি চলে এসো।' দুটি বউ ত্রস্ত পায়ে কলসি কাঁখে নিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়।

দুটি শ্রান্ত সৈনিক সেই ম্লান চাঁদনিতে কুয়োর পাড়ে বসে জিরোয়।

'করম আলি, তুমি তো অনেক লড়াই লড়েছ। এরকম লড়াই কখনো দেখেছ?'

বয়স্ক সৈনিকটি বললে, 'এটা কী হল কিছুই বুঝতে পারলাম না। এটা কি লড়াই না আর কিছু?'

পা ছড়িয়ে বসে অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, 'সিকান্দার, আমার আজ মনে পড়ছে অনেক কথা, মারাঠারা চারদিক আমাদের ঘিরে ফেলেছে, আর আমরা দুষমন কাটতে কাটতে সেই ঘোড়ার পাঁচিল ভেঙে বেরিয়ে এলাম।'

'আমি অবাক, লাল কোর্তারা সব হটে যাচ্ছে। মোহনলাল চমৎকার লড়ছে। ঠিক এই সময় আমাদের হটে আসতে হল। এরকম হুকুম কখনও আগে হয়েছে?'

'এ এক আজব কাহিনী সিকান্দাব। যুদ্ধটা আগেই হযে গেছে। জেনে শুনেই আমরা হেবেছি।'

'কবম আলি, আমাব মাথায কিছুই ঢুকছে না। শুধু আমবাই লডলাম। ডান দিকে প্রায তিন ভাগ সৈন্য ঠায দাঁডিযে দাঁডিযে দেখল। এ কেমন লডাই কবম আলি।'

'আবে আমি তো লাল কোর্তাদের তখন আক্রমণ কবছি। ওবা তোপ দাগছে। কিন্তু আমি ঠিক লক্ষ কবেছি, ওবা ডান দিকে চেযে মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছে। ওবা বুঝতেই পাবছে না ডান দিক থেকে আক্রমণ হবে কি হবে না।'

'ডান দিকে নতুন নবাব বসে আছে হাতিব ওপব। তিন ভাগ সেপাই তাব দিকে।'

'মাঝখান থেকে আমবাই জনাকযেক লডলাম।'

'সিপাইবা সব সময লডে সিকান্দাব।'

'বুঝলাম, কিন্তু এ তো লডাই নয।'

বযস্ক সৈনিকটি বললে, 'লাল কোর্তাদেব সঙ্গে নতুন নবাবেব বন্দোবস্ত হযেছে।'

'তুমি যা বলছ কবম আলি, তাব মানে লডাইটা আগেই হয়ে গেছে।'

'অনেক আগেই লডাই খতম হযে গেছে।'

'আমবা এখন কী কবব?'

'আমবা? যে মাইনে-পত্তব ঠিক মতো দেবে তাকে সেলাম কবব।'

'আমার কিন্তু একটা ধাবণা কবম আলি, কিছু কিছু সর্দাব এখনও নবাব সিবাজদৌল্লাকে মদত দেবে।'

'বাজে কথায কান দিও না। কোন নবাব এল গেল তাতে আমাদেব কী। চল ওঠ।'

'আব কত দূব।'

'আব পাঁচ ক্রোশ।'

তরুণ সৈনিকটি চেঁচিযে উঠল, 'কিন্তু এটা একটা জঘন্য বেইমানি।'

'সবাই বেইমান সিকান্দাব। মসনদেব জন্যে সবাই বেইমান।'

১১

আকাশে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে ওঠে। আর সেই জলঝরা বর্ষার আকাশের নীচে ড্রাম বাজাতে বাজাতে ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদ শহরে ঢোকে। সমস্ত শাহী রাস্তা লোকে লোকারণ্য, পূব পার থেকে মানুষরাও কাতার দিয়ে দেখতে আসে। বাড়ির ছাত বারান্দা-উঠোন গলি নদীর ঘাট শহর গ্রামের লোক ভরে যায়। পুরো পাঁচ মাইল জুড়ে যুবকযুবতী বৃদ্ধবৃদ্ধা শিশুর ভিড়। লালকোর্তাপরা বিদেশী লোকগুলোর দিকে, তাদের কামান বন্দুকের দিকে তারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কেউ কেউ আঙুল দিয়ে সাবুৎ জঙকে দেখায়। 'কোনটারে কোনটা?' 'ঐটা।' এইরকম ধ্বনি ওঠে মাঝে মাঝে।

সেই কাতার দেওয়া মানুষের মধ্যে অনেক নবাব সেপাই পাইক বরকন্দাজও ভিড়ে যায়। তাদের সঙ্গে মিশে থাকে আশেপাশের গ্রামের তাঁতিপাড়া জোলাপাড়া ছুতোরপাড়া জুতোপট্টির মানুষ। চকবাজারের ঘাট গম গম করে। ব্যবসায়ীরা ঝাঁপ বন্ধ করে আসে। মহাজনতলি মহিমাগঞ্জের দোকানদার ব্যবসায়ীরা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে।

ওয়ালশ লিখেছিল 'শো' দেবার জন্যে, যাতে ইংরেজ শক্তির মহিমা সাধারণ মানুষও টের পায়। ক্লাইভ সেজন্য কয়েকটা কামানও তার এই বিজয় মিছিলে এনেছে, আর ব্যাণ্ড পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে ঢোকে ইংরেজ সৈন্য, পিছনে তেলেঙ্গি সেপাই, ভারি কামান ঘোড়া উঁট।

লোকে কিন্তু ইংরেজ শক্তির মহিমা সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা ভিড় করেছে সাবুৎ জঙ নামে এক বাজিকরকে দেখতে, যে বাজিকরের সাহায্যে নতুন এক নবাব পুরনো নবাবকে হটিয়ে মসনদে বসবে। পলাশির আমবাগানের খবর চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। নবাব-সেপাইদের কাছ থেকেই কথাটা ছড়িয়েছে। খুব একটা লড়াই কিছুই হয় নি। সাবুৎ জঙ বাজিকর ফুঁ দিয়ে নবাব সৈন্য উড়িয়ে দিয়েছে।

বাস্তবিক মহাজনতলির ব্যাপারী অথবা পুরপারের অজস্র কারিগরের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা নবাবী কাণ্ড মাত্র। নবাবরা নবাবী রাখতে গিয়ে নানারকম কাণ্ড করে, বাপ ছেলেকে মারে ছেলে বাপকে মারে। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যায় সাবুৎ জঙকে নতুন নবাব কয়েক কোটি টাকা দিয়েছে, কেউ

কেউ বলে শেঠেরা তিনকোটি টাকার সোনা কুলিদের মাথায় মাথায় পৌঁছে দিয়েছে ইংরেজ শিবিরে।

এই বিজয় মিছিল চকবাজার ঘাটের কাছে এসে পৌঁছয়, তখন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে। খুব একটা কাণ্ড কিছু নয়, সামান্য হৈ-হৈ বলা যায়। আড়াই মাইল শহরের পথ অতিক্রম করে ক্লাইভ যখন তার সিল্কের রুমালে কপালটা চট করে মুছে নিচ্ছিল ঠিক সেই সময় তার পায়ের কাছে একটা পাথর পড়ে। চারদিকে হৈ-হৈ পড়ে যায়। নবাব সেপাইরা তেড়ে যায়। তারপর একটি কালো কুচকুচে দীর্ঘ লোককে মারতে মারতে বার করে নিয়ে আসে ভিড়ের মাঝখান থেকে। তার আশেপাশে গাঁয়ের লোক, রামুনঘাটির তাঁতিপাড়া বাউরিপাড়ার মানুষরা। 'ও পাগল, পাগল। ওকে মেরো না', রামুনঘাটির রত্নেশ্বর তাঁতি সেপাইদের সামনে এসে হাত জোড় করে অনুনয় করে। আশেপাশের লোকেরা তার সঙ্গে যোগ দেয়। রত্নেশ্বর শক্ত হাতে মদন বাউরির হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ইংরেজদের বিজয় মিছিল মুহূর্তের জন্যে থমকে আবার চলতে শুরু করে।

ঘেমে নেয়ে ক্লাইভ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা চল্লিশ থামওয়ালা প্রাসাদে অপেক্ষা করতে থাকে। বাইরে এক পশলা বৃষ্টিতে মাটি তো ভেজেই নি, গুমোট আরও বেড়েছে। ক্লাইভের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়ালশ, কিলপ্যাট্রিক, ওয়াটস।

ওয়ালশের দিকে পেছন ফিরে ক্লাইভ বললে, 'চকবাজারের কাছে একটা ঘটনা ঘটেছিল। মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ একটা ম্যাডম্যান, পাথর ছুঁড়ছিল।'

'ঐরকম ম্যাডম্যানরা যদি মুর্শিদাবাদের রাস্তায় বেশি থাকত তাহলে হয়তো আমাদের ফিরে যেতে হত।'

'না-না, বেশির ভাগ মানুষই নর্মাল, শান্তিপ্রিয়।'

'তাই বাঁচোয়া।'

'রবার্ট তুমি এ-কাগজগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পার।'

আলগোছে কয়েকটা দলিলে চোখ বুলোয় ক্লাইভ। নতুন নবাব এক সোনার ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছে, সমস্ত ইংরেজ সৈনিক সেই ঝর্ণায় স্নান করছে। দলিলগুলো আর কিছুই না, সেই ধারাস্নানের বর্ণনা।

'থ্রি মিলিয়ান স্টার্লিং—এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে কথায় লিখে দাও',

ক্লাইভ ওয়ালশকে বললে নিস্পৃহভাবে। এর মধ্যে তিরিশ লাখ টাকা শুধু তার নিজের জন্যে ; প্রত্যেক কমিটি মেম্বার সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা, কাউন্সিলাররা আড়াই লাখ টাকা ; মায় চুনোপুঁটি আর্মির প্রত্যেক ইংরেজ সৈনিকের অঙ্কও ষাট হাজার টাকা। একমাত্র ওয়াটসন বাদ পড়েছে। ক্লাইভ পাতা উল্টোতে উল্টোতে ভাবলে ছ কোটি টাকার মধ্যে ওয়াটসনের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে, নইলে বড্ড খারাপ দেখায়।

লিউক স্ক্র্যাকটন ফিসফিস করে বললে, 'রায়দুর্লভ কিন্তু দারুণ রাগড়া দিচ্ছে। সিরাজের দৌলতখানা থেকে ইতিমধ্যেই সোনাপাচারের খবর আসছে। আপনি আজ বিকেলেই একবার নিজে যান। রায়দুর্লভ ভীষণ ঢ্যাঁটা। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেবে না।'

লিউক স্ক্র্যাকটনের উৎসাহ ক্লাইভকে স্পর্শ করে। বললে, 'তুমি ঐ রাসকেলটার সাহায্য নাও।'

'উমিচাঁদ ?'

'ও সমস্ত খোঁজখবর রাখে। ওকে তুমি খুব গ্যাস দিচ্ছ তো ?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনি যেরকম বলেছেন। আমি বলেছি, তোমার নাম ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

'আমাদের সম্পর্কে আবার কোনো সন্দেহ '

'না না, একেবারেই না। ও এখন বিশ লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে। আপনি যে তিরিশ লাখ থেকে ওর অঙ্ক বিশ লাখে নামিয়েছেন—এটা একটা চমৎকার টাচ। সন্দেহ করার যেটুকু কারণ ছিল সেটাও নেই।'

'খুব সাবধান। লোকটা একেবারে শয়তান।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। কারণ নতুন নবাব নাকি ঘুমোচ্ছেন। ক্লাইভ নিজের মনে বললে, 'ব্যাটা ভাং খেয়ে ঘুমোচ্ছে। দু-বার লোক পাঠালাম, জবাব নেই।'

সমস্ত দরবার অপেক্ষা করতে থাকে। বিরাট ঝাড় লণ্ঠনের নীচে মুক্তোখচিত মসনদের দিকে চেয়ে চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আজগুবি লাগে ক্লাইভের কাছে। মীরজাফরের শেষ চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত কি প্রবল টেনশ্যান। একবার তো মনে হল কাটোয়াতেই ক্যাম্প করে বর্ষাকালটা কাটাবে। দিনের পর দিন সেই অনিশ্চিতি পলাশির মাঠেও একেবারে কাটে নি। বিকেলের আগে পর্যন্ত তিনভাগ সৈন্য নিয়ে মীরজাফর ডানদিকে ঠায় দাঁড়িয়ে। তাদের মতি গতি কী হবে তখনও তা দুর্জ্ঞেয়। কয়েকবার

সেদিকে তাক করে গুলি ছুঁড়তেও হুকুম দিয়েছিল ক্লাইভ। আমবাগানের ভেতরে হান্টিং লজে বসে বৃষ্টিতে চপচপে ভিজে তার নিজের কথাটাই তার কানে বাজতে থাকে। ক্লাইভ নিজের মনেই বলেছিল, 'আজ আর উপায় নেই। সন্ধেবেলা বন্দুক কাঁধে ফেলে কলকাতা ফিরতে হবে।'

ক্লাইভ এবার অসহিষ্ণু হয়ে মীরনকে তাড়া মারে, 'কী ব্যাপার। তোমার বাপকে বল। কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব?' ওয়াটসও মীরনের সঙ্গে নবাবকে আনতে যায়।

আরও আধঘন্টা পর নতুন নবাবের প্রবেশ। অসময়ে দিবানিদ্রা ভাঙায় চোখ লাল, ভাঙের নেশায় ছলছল। ঝকমকে পোষাকে আরও বিশাল লাগে তার চেহারা। মীরজাফর সোজা মসনদের দিকে না এগিয়ে ক্লাইভের কাছে এসে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় পুরো এক মিনিট এই ধন্দ অবস্থা। জগৎশেঠ রায়দুর্লভ সবাই অবাক হয়ে নিষ্পলক নবাবের দিকে চেয়ে থাকে। মীরজাফর তখন ভাবছে ক্লাইভই নবাব, ক্লাইভই মসনদে বসবে।

এগিয়ে গিয়ে মীরজাফরের হাত ধরে ক্লাইভ। তারপর তাকে টানতে টানতে মসনদের কাছে নিয়ে ঠেলে তুলে দেয় ওপরে। কোটের পকেট থেকে কয়েকটা আশরফি তার পায়ের কাছে সোনার থালায় ছিটিয়ে দিয়ে তিনবার কুর্নিশ করে। ক্লাইভের দেখাদেখি দরবারের আর-সবাই নজরানা দিয়ে কুর্নিশ শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে ঠন ঠন শব্দ কানে আসে।

সন্ধেবেলা খুব নিস্পৃহ মুখে ক্লাইভ সিরাজের দৌলতখানায় প্রবেশ করে যেন সে ব্যাঙ্কে নিজের ভল্ট দেখছে। মাটির নীচে ধনাগারে মশালের আলো ঝলকায় হীরে জহরতে, সিন্দুকের পর সিন্দুকের ডালা খুলতেই সোনার তাল ঝকঝক করে ওঠে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', ক্লাইভ নিস্পৃহ ভাবে বলে। দরজার গোড়ায় এসে দৌলতখানায় আলাদা সেপাই রাখার হুকুম দেয়।

গঙ্গার ধারে মোরাদাবাদ বাগানে তিন-চারটে দিন বেশ কাটে। মাঝখানে দুদিন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছিল। পৃথিবী অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে। লণ্ডনে ক্লাইভ চিঠি লেখে: পঞ্চাশ হাজার দুর্ধর্ষ নবাবী সৈন্য পর্যুদস্ত করে সে নতুন নবাবকে মসনদে বসিয়েছে। বাবাকে চিঠি লেখে, ইণ্ডিয়া হাউসে ভালো করে পলাশির পাবলিসিটি দিতে।

সত্যিই ক্লাইভ এ ব্যাপারে ক্রমশ নিশ্চিত যে যুদ্ধজয়ের গৌরবের অনেক-

খানি নির্ভর করছে পাবলিসিটির ওপর। মোরাদাবাদের বাগানে গঙ্গার হাওয়ায় ক্রমশ তার মনে এক নতুন জীবনদর্শন দানা বাঁধতে থাকে। শুধু কি যুদ্ধক্ষেত্রে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পাবলিসিটি অপরিহার্য। ধরা যাক একজন ভালো লেখক, একজন ভালো দার্শনিক, সুবক্তা এদের শুধু এলেম দিয়েই বিশ্বজয় সম্ভব নয়। বিশ্বজয় করতে হলে যথোপযুক্ত প্রচারের দরকার। একথা লণ্ডনের ওপরওয়ালাদের বোঝা দরকার পলাশির যুদ্ধটা শুধু একদিনের মামলা নয়। এর পেছনে গত চার-পাঁচ মাসের অবিরত চেষ্টা, নতুন করে বাধার সম্মুখীন হওয়া এবং নতুন করে বাধা অতিক্রম করা। তারই ফলে প্রায় বিনা রক্তপাতেই এই জয়। ক্লাইভ তার বাবাকে চিঠি লেখে: পলাশির জয় সারা হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ পালটে দেবে।

এরই মধ্যে এক সন্ধ্যায় মহিমাগঞ্জে আমন্ত্রণ। মহিমাগঞ্জের দরবারে ঢুকে ক্লাইভের মনে হল মঙ্গুরগঞ্জ থেকে এ দরবার আরও বেশি পরাক্রমশালী। বিরাট প্রাসাদ, টাঁকশাল, বাড়িঘরদোর মন্দির, হাতিশালা ঘোড়াশালা, সিপাইসান্ত্রী।

জগৎশেঠ, মহতাব রায় আর মহারাজ স্বরূপচাঁদের আত্মবিশ্বাস ক্লাইভের বেড়ে লাগে, একটু ঈর্ষাও যে না হয় তা নয়। লণ্ডনে অন্তত এরকম ব্যাঙ্কার দুর্লভ। আর কোনো অনিশ্চিতি থাকে না। জগৎশেঠই দায়িত্ব নেয় নবাবের তরফ থেকে। এইটাই ভালো। সমস্ত ব্যাপারটা একটা হিসেবের মধ্যে ফেলা যাবে, বিজয়ী সৈন্যের লুটপাটের মতো ব্যাপারটা দেখাবে না।

জগৎশেঠের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর দলিল পড়া হয়। উমিচাঁদ তার আসন থেকে ঝুঁকে পড়ে ভালো করে শুনবার জন্যে। ঠিক এই সময় ক্লাইভ স্ক্র্যাকটনকে ইশারা করলে চোখ দিয়ে।

'উমিচাঁদ, ও লাল দলিল ঝুঠা হ্যায়। তুমকো কুছ নাহি মিলে।' স্ক্র্যাকটন উমিচাঁদের দিকে ফিরে বললে।

উমিচাঁদের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বেরোয়, 'কেয়া, কেয়া বাৎ?'

স্ক্র্যাকটন দৃঢ় গলায় পুনরাবৃত্তি করে, 'হাম বোলা, উমিচাঁদ ও লাল দলিল ঝুঠা হ্যায়। তুমকো কুছ নাহি মিলেগা।'

লম্বা বৃদ্ধ ব্যবসায়ীটি হঠাৎ গলগল করে ঘামতে থাকে। অর্ধেক দাঁড়িয়ে উঠেছিল এবার কার্পেটের ওপর বসে পড়তে চায়। ক্লাইভ আঙুল দেখিয়ে তার সঙ্গীকে বলে বাহিরে নিয়ে যেতে।

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ছকের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। দাক্ষিণাত্যে এসব ব্যাপার ভাবাই যেত না। এক-একবার ক্লাইভের মনে হয় পলাশি যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই সে মীরজাফরকে যে চিঠি দিয়েছিল, 'এ জয় আমার নয়, এ জয় আপনার'—এতখানি না লিখলেও চলত। কিন্তু এভাবে না লিখলে কি নবাবের সোনার ঝরণা এমন অকৃপণভাবে উৎসারিত হত?

শুধু একটা খ্যাঁচ থেকে যায়। গত কাল ওয়ালশ এসে জানালে সিরাজকে মেরে টুকরো করে শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছে। আজ সকালে মীরজাফরও এসেছিল। যাই হোক, ক্লাইভ ভাবলে এসব ওদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। চান্দাসাহেবকেও তো আততায়ীরা হিংস্রভাবে হত্যা করেছিল। পরাজিত নবাবদের রক্ষা করার দায় তার নয়। ক্লাইভ লণ্ডনে রিপোর্ট পাঠালে—মাইনে না পেয়ে বিদ্রোহী সেনারা সিরাজকে হত্যা করেছে।

পঁচাত্তরখানা নৌকো নিশান দিয়ে সাজানো হয়। প্রত্যেক নৌকোয় একলাখ টাকা করে এক একটি বিরাট লোহার সিন্দুক। এটা প্রথম কিস্তি। তোপ দাগা হয়, ব্যাণ্ড পার্টি ঘাটে এসে বাজনা বাজাতে থাকে। সবচেয়ে মজা করলে লিউক স্ক্র্যাকটন। অপেক্ষমান ক্লাইভের সামনে এসে মোগল কায়দায় কুর্নিশ করে বললে, 'ইওর একসেলেন্সি, নবাব ক্লাইভ।'

ক্লাইভ বললে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'আমার মাথা ঠিকই আছে', স্ক্র্যাকটন বললে। তারপর আলোর মালা-খচিত বজরাগুলোর দিকে চেয়ে বললে, 'তামাম হিন্দুস্থানে এখন একজনই নবাব—নবাব ক্লাইভ।'

কথা শেষ

পলাশির পর দশ বছর যেতে না-যেতেই মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজার আর তার আশেপাশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল জুড়ে যে পরস্পরনির্ভর হিন্দু-মুসলমানের গ্রাম-শহরের জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল তা ভাঙতে শুরু করে, তার পরের দশ-পনেরো বছরে এ ভাঙন সম্পূর্ণ হয়।

প্রথমে বোঝা যায় না। অন্তত বছর দু-তিনেক মনে হতে থাকে পলাশির আমবাগানে যে নবাব পাল্টানোর যুদ্ধ হয়েছিল তা অতীতের অজস্র যুদ্ধ হানাহানির একটা। তারপর একটা একটা করে মুর্শিদাবাদের স্নায়ুকেন্দ্রের কলকব্জাগুলো বিগড়ে যেতে থাকে বা জোর করে বিগড়ানো হয়। জগৎ-

শেঠের টাঁকশাল স্থানান্তরিত হল কলকাতায়। বাংলা সুবার দেওয়ানি কোম্পানি বাহাদুর গ্রহণ করার পর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মহাজনতলি ফাঁকা হতে থাকে, পণ্য বোঝাই বাণিজ্যতরীর অবিরাম যাওয়া আসা ধীরে ধীরে কমে আসে। কোম্পানি জগৎশেঠের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। তারপর নবাব মীরকাশিমের হুকুমে পাটনায় জগৎশেঠ আর স্বরূপচাঁদের হত্যার পর ফতেচাঁদ বংশের প্রতাপ আরও অস্তমিত। কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে তারা আর এঁটে উঠতে পারলে না।

নবাব আলীবর্দি, নবাব সিরাজদৌল্লা, নবাব ক্লাইভ—সবাই একে একে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলে। ক্লাইভ বাথরুমে নিজের গলায় ছুরি মেরে আত্মহত্যা করলে। পলাশির পর পঁচিশ তিরিশ বছর নতুন ক্ষুদে নবাবরা এল মুর্শিদাবাদে বাংলা সুবায় রাজত্ব করতে। কোম্পানি বাহাদুরের এই সব কর্মচারীদের অবিশ্রান্ত অর্থগৃধ্নুতায় বাংলা সুবার আর্থিক জীবন শুকিয়ে এল, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের চাষীর দুঃখে গলা কাঁপিয়ে অনেক বক্তৃতা হল, আর কিছু হল না। তারপর ভাগীরথীও খাত পালটানো শুরু করল।

সতেরোশো সত্তর সালের দুর্ভিক্ষে মুর্শিদাবাদের আশেপাশের গ্রাম ক্ষৌত হয়ে যায়। সমস্ত গ্রামাঞ্চলের আকাশ জুড়ে শকুন উড়ছে। পথে ঘাটে ক্ষেতে খামারে শবের স্তূপে গন্ধে টেকা দায়। এই নরকে একজনের পুনর্জন্ম ঘটে। বামুনঘাটির তাঁতিপাড়ায় প্রাণেশ্বর তাঁতির শবের ঠ্যাং ধরে যখন কুকুর টানাটানি করছিল তখন স্মৃতিভ্রংশ মদন বাউরি কোথা থেকে এসে একটা চেলা কাঠ ছুঁড়ে মারে। তারপর প্রাণেশ্বরের ছেলে রত্নেশ্বরকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে থাকে।

'মরবা মিঠাই বানাই, তাঁতি তাঁত বোনে'—এ জীবনদর্শন প্রচণ্ড ভাবে চোট খায় পলাশির পর। খদ্দেরের অভাবে বৈকুণ্ঠ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার উঠে আসে কাশিমবাজারে, দোকানে বাত্তিরে শোয় মদন। আর তাঁতিদের ব্যবসাও উঠে যায়। তারা কেউ কেউ কোম্পানির আড়ং-এ শান্ত্রীর পাহারার কাজ করে খুব কম বেতে।

একদিন খুব ভোরে দোকানে এসে রত্নেশ্বর বললে, 'মদনদা, শহরে যাবে নাকি?'

'শহর?' অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মদন বাউরি। স্মৃতি ফিরে আসার পর সে আর মুর্শিদাবাদ শহরে যায় নি, যাবার ইচ্ছেও হয় নি।

তার অবাক মুখ দেখে রত্নেশ্বর তার হাতের ছোট থলিটা দেখিয়ে বলে, 'কয়েকটা রেশমের রুমাল ছিল। এখন তো আর এসবে কাজ হয় না। শহরে যাই। যদি বিক্রি করতে পারি।'

'কোথায় বিক্রি করবে?'

'একটা ঠিকানা ছিল, অনেক বছর আগে, শাহী রাস্তায়।'

'শাহী রাস্তায়? আচ্ছা চলো।'

মদন আর রত্নেশ্বর যখন শহরের পথে এগোতে থাকে তখন ধীরে ধীরে স্মৃতি ডালপালা মেলে ধরে মদনের মনে।

'তোর মনে আছে রতন?'

রত্নেশ্বর বুঝতে পারে মদন কী বলতে চায়। বলে, 'ও সব ভেবে কী হবে? ও সব কি কিছু আছে?'

বাস্তবিক কিছুই নেই। শহরের পুব পারে যে অজস্র কারিগর আর সাধারণ মানুষ বসত গেড়েছিল তা এখন জংলায় পরিণত হতে চলেছে।

'এই পুকুরটায় আমরা চান করেছিলাম, মনে আছে?' একটা পানায় বোঁজা পুকুরের দিকে আঙুল দেখায় মদন। আশেপাশে সেঁকরাদের বেশির ভাগ বাড়িই পরিত্যক্ত। বিস্তীর্ণ আস্তাবল এখন মাঠ। মাঝে মাঝে হাতিশালার পরিত্যক্ত কয়েকখানা ঘর।

মদন বাউরি বললে, 'একটু দাঁড়া। ঘোড়া আসছে।' সে যেন অশ্বারোহীদের শব্দ শুনতে পায়।

'দূর মদনদা। ওতো হাওয়ার শব্দ।'

বর্ষার আকাশের নীচে চকমসজিদের মিনারগুলো শুধু হাতছানি দেয়। তবে চকবাজারের বেশির ভাগ দোকান উঠে গেছে। মহাজনতলির এক শূন্য গুদামে ঢিল ছোঁড়ে মদন। এক ঝাঁক পায়রা উড়ে যায়।

ঘাটে এসে ওপারে যাব বলতে খেয়ার মাঝি বললে, 'কোথায়?'

রত্নেশ্বর বললে, 'শাহী রাস্তায়?'

মাঝি আবার প্রশ্ন করে, 'কোথায় বল না।'

'মীর্জা ইউসুফের বাড়ি।'

'তেনারা কি আছেন? তেনারা সব চলে গেছেন।'

ওপারে উঠে দুজনেই হতভম্ব। নদী খাত পালটেছে, পশ্চিম পারের অনেকখানি অংশ নদীগর্ভে। এসব কথা তারা শুনে এসেছে, কিন্তু নিজের চোখে দেখা আর এক রকম।

শাহী রাস্তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাই ধরে তারা অগ্রসর হয়। এবার ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়। খানিক দূর এগিয়ে একটা শিবমন্দির, বোধহয় মারাঠারা তৈরি করেছিল, আর একটু এগিয়েই খোসবাগের মসজিদ।

বৃষ্টি কমে আসে। কুঁই কুঁই করে জল পড়তে থাকে। আর কয়েক পা এগিয়েই একটা গলির মোড়ে মীর্জা ইউসুফের বাড়ি। চিনতে অসুবিধে হয় না।

সামনের এক চিলতে বাগানের একমাত্র সাক্ষী একটা গন্ধরাজ গাছ। পাশে ঘোড়ার গাড়ি। ডাকাডাকিতে যে লোকটা বেরিয়ে আসে তাকে রত্নেশ্বর চিনতে পারে না। একটা রোগা বুড়ো এসে বললে, 'কিধার যায়েগা?'

রত্নেশ্বর নমস্কার করে বললে, 'অনেক বছর আগে আপনার কাছে আসতাম। মনে নেই? আপনি রেশমী রুমাল নিতেন? এক পেটি নিয়ে এসেছি। খুব সস্তায় দেব, নেবেন?'

বুড়ো এবার তীক্ষ্ণ চোখে রত্নেশ্বর আর মদন বাউরিকে লক্ষ করে। অদ্ভুত নিস্পৃহ হাসি ফুটে ওঠে তার ছুঁচলো মুখে।

'হামি গাড়ি চালাই, রুমাল কী নেব? সোওয়ারি জানা আছে?'

সুজাউদ্দিনের ফরা বাগ, চল্লিশ থামওয়ালা মর্মর প্রাসাদ, মন্সুরগঞ্জ ডাহাপাড়ার প্রাসাদ সব নদীগর্ভে।

চল্লিশ থামওয়ালা প্রাসাদের খালি একটা থাম পড়ে আছে বালিতে, নীচ দিয়ে বর্ষাস্ফীত ভাগীরথী ছুটে চলেছে।

সেই থামের ওপর বসে জলের দিকে তাকিয়ে রত্নেশ্বর বললে, 'কিছুই থাকে না এই জগতে, না মদনদা? এত দৌলত এত ক্ষমতা হাঁক ডাক, সব ফক্কা।'

মদনের চুল এখন ধপধপে সাদা। রতন প্রৌঢ়। নদীর ঢেউগুলো তাদের অতীতকে ডাক দিয়ে যায়। রতনের মনে পড়ে চল্লিশ বছর আগের কথা। মাঝখানের অনেক উত্থান-পতনের স্মৃতি ম্লান, এমন কি গত দশ-পনেরো বছরে তাদের জীবনযাত্রার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে সে স্মৃতিও ফিকে হয়ে গেছে। কিন্তু তার বাল্যকাল, পুরনো মুকসদাবাদের স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বলে। এখনও সে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনে। আলীবর্দির

অভিষেক হচ্ছে চল্লিশ থামওয়ালা প্রাসাদে আর মদনের হাতখানা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে আছে তাকে।

'সব চলে যায়, না মদনদা?'

একমাথা সাদা চুল ঝাঁকিয়ে মদন আস্তে আস্তে বললে, 'আমরা থাকি।'

রতনের কানে তার কথা যায় না।

'নেংটার বাটপাড়ের ভয় নেই। আমরা থাকি। আমরা এই নদীর জলের মতো, মাটির মতো, হাওয়ার মতো। আমরা বেঁচে থাকি।'

বহুকাল আগের সেই মদন রাউরি যেন আবার ফিরে এসেছে। সেই মহিমাগঞ্জের ট্যাঁকশালের সেপাই যে অন্যরকম ভাবত, অন্যরকম চিন্তা করত। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রতন তার দিকে।

মদন তার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলে, 'আমার মাথা ঠিক আছে রতন। আমি ঠিকই বলছি। আমরা বেঁচে থাকি। আমরা বেঁচে থাকব।'

রবীন্দ্র গীতবাণীর চিত্রকল্প : প্রকৃতি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

বোঝা যায়, উপমায় তিনি বীতস্পৃহ না হলেও রূপকে তিনি আরো স্বচ্ছন্দ — তাই বাদল বাউলের একতারা বাজানোর ছবিতে বিষয় এবং আনুরূপ্য— যাকে আধুনিক সমালোচনার পরিভাষায় 'সাবজেক্ট' ও 'এ্যানালোগ' বা 'ভেহিকল' ও 'টেনর' বলা হয়—তা এক হয়ে যায় ; 'শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে' এও সেখানে নয় প্রচলিত সমাসোক্তি, বরঞ্চ এই 'শ্রাবণ' সেখানে প্রতীকের লক্ষণযুক্ত ; 'তপের তাপের বাঁধন কাটুক'—এই মানসিক চিত্রকল্পে তাঁর বলার কথা ব্যাহত হয় না বটে, কিন্তু 'ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে'—এই পারিভাষিক অর্থে ফিগারেটিভ, অথচ প্রমূর্ত ও সংহত চিত্রকল্পে বলার কথা নির্দিষ্ট ভাবসিদ্ধি পায়। এখানেই রবীন্দ্রগীতিবাণীর চিত্রকল্পের আধুনিকতা। চিত্রকল্প বিষয়ে আধুনিক জিজ্ঞাসু এ-কারণে রবীন্দ্রগীতিবাণীর চিত্রকল্পের বিস্তৃত আলোচনায় আগ্রহ বোধ করেন। 'গীতবিতান'-এর প্রকৃতি-পর্যায়-নির্দিষ্ট গানগুলি আমাদের এ-আলোচনায় একটা নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। 'প্রেম' ও 'পূজা'র গানে চিত্রপ্রতীক প্রায়শই মৃদুভাষী। মৃদু হয়েও তারা গূঢ় হবার গৌরব অর্জন করে। সেক্ষেত্রে 'প্রকৃতি'-র গানে প্রত্যক্ষের সংযোগে নব-নব প্রতিমা রচনার অবকাশ অনেক বেশি—এমনকি হৃদয়ের নিগূঢ় ভাষণের সময়েও সে প্রতিমা রচনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না।

'গীতবিতান'-এর 'প্রকৃতি'-র গানের লিরিকগুলির চিত্রকল্প পৃথক ভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, এখানে মূল চিত্রকল্পগুলি প্রায়ই প্রতীক। বর্ষা-বসন্তের প্রধান কবিতাগুলি তো বটেই প্রৌঢ় ঋতুর ফসল গ্রীষ্ম এবং শরৎও এখানে প্রতীকী। সুতরাং মূল প্রতীকগুলির টানে প্রধান কবিতায় এখানে মুঞ্জরিত হয়েছে চিত্রকল্পের একটি-দুটি ফুল। অতএব আগে এই প্রতীকগুলির রহস্য ব্যাখ্যা করে নিলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতি'-র গানের চিত্রকল্পগুলির স্বভাব, বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনাকে সঠিক পটভূমিকায় রাখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রধান গ্রীষ্মের গানগুলি তাঁর ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বৎসর

বয়সের মধ্যে লেখা। পরিণত প্রৌঢ়ের নিরাসক্ত দৃষ্টির পরিচয় মেলে এই গানগুলিতে। গ্রীষ্মের গানে ছবি কম। বিবর্ণ ল্যাণ্ডস্কেপ, তুলির মিত প্রয়োগ—এ সবই কি তাঁর ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের জীবন-বৃত্তের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নয়? সেই তন্মাত্র এবং স্কেলিট্যাল, সেই কঠিন এবং অনুচ্ছ্বসিত চিত্রভূমির সঙ্গে যে-কবির পরিচয় তখন নিবিড় হয়ে উঠেছে—গ্রীষ্মের গানগুলি তাঁরই রচনা। 'আকাশ ঢাকা জটিল কেশে' (১৩ নং গান। প্রকৃতি) কঠিনের ক্রূর বক্ষতল' (১২।প্রকৃতি) 'তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা' (২২।প্রকৃতি), 'যে ফুল কানন করত আলো / কালো হয়ে সে শুকালো' (২৫। প্রকৃতি)—এইসব চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথের ছবির জগতের কথা মনে করিয়ে দেয়। যদি বার বার এক মৌন তাপস দেখা দিয়েও থাকে তবে সে তাপস 'বৈশাখ' (১৩০৬) কবিতার ('উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থ) তাপস মূর্তি থেকে পৃথক হয়ে যায় 'ঋতুরঙ্গ'-র গানের উপক্রমণিকা হিসাবে। অবশ্যই পরিণত বয়সের গ্রীষ্মের গান আর শীতের গানের একক তাৎপর্য যতটা আস্বাদ্য তাদের 'ঋতুরঙ্গ'-পালার অংশরূপে সার্থকতাটা তার থেকে অনেক বেশি। একথা সহজেই মনে আসে যে, গ্রীষ্মে ও শীতের গানে একটা প্রতীক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। সে প্রতীক্ষার মুখটা বাইরের দিকে ফেরানো—একটায় ঝড় বা বর্ষার জন্য প্রতীক্ষা, আর-একটায় বসন্তের জন্য। এই বহির্মুখিতার জন্যই বোধহয় গ্রীষ্মে আর শীতে—এমনকি শরতে-হেমন্তেও অন্তর্গূঢ় কোনো প্রেমের গান নেই। ঋতুনাট্যের অংশ হিসাবে প্রেমের গান না থাকতে পারে, প্রাকৃতিক দ্বৈতক্রিয়ায় জীবনের দ্বন্দ্বময় বহির্বাস্তবতার রূপক সেখানে প্রধান কথা হয়ে উঠতে পারে—কিন্তু লক্ষণীয় গ্রীষ্ম বা শীত—শরৎ এবং হেমন্ত, এমনকি স্মৃতি-সঞ্চারিণীও নয়। গ্রীষ্মের একটি প্রভাত ও একটি দুপুর মাত্র স্মৃতিকে উতলা করে তুলেছে—'বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ' এবং 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে'। শীত এবং শরৎ স্মৃতির মুখাপেক্ষী নয়। রিক্ততা থেকে পূর্ণতা অথবা পূর্ণতা থেকে রিক্ততায় আনাগোনার যে-রবীন্দ্র-জীবন-ভাষ্যের কথা শ্রদ্ধেয় পূর্বাচার্যেরা বলেছেন, সেই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গানের এই বৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া যায় তাঁর ঋতুচিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠার ইতিহাসের ভিতর দিয়ে।

দুই

এ প্রসঙ্গে আমাদের সব থেকে বেশি আকর্ষণ করে তাঁর বর্ষার গানের বাণীর চিত্রকল্পের প্রতীকী বিবর্তন। একুশ বছর বয়সে লেখা 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া' যেন তখনো ষোল বছর বয়সের ভানুসিংহের 'শাওন গগনে ঘোর ঘন ঘটা'-র বাধার বেশ মিটিয়ে দিতে পারছে না। বর্ষার প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তখনো কিছু বলার নেই। আটাশ বছর বয়সে 'এমন দিনে তারে বলা যায়' 'গীতবিতান'-এর 'প্রেম'-পর্যায়ে নির্দিষ্ট এই গানটিতেই প্রথম কবি পুরনো কবিতার জের কাটিয়ে বর্ষার লিরিকে স্বয়ংভাষ হয়ে উঠলেন। 'ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায় / বিজুলি থেকে থেকে চমকায়'—শুধু বর্ষা-প্রসঙ্গ নয়, অন্তরের অকথিত বাণীর অদম্যতার প্রতিমাও বটে, এও যেন পাঁচশত বৎসর আগের 'ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া'-র প্রতিধ্বনি। অস্থির বিদ্যুৎ পংক্তি সেদিন একথাই বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—'শূন্য মন্দির মোর'। এখানেও 'বিজুলি' নিজেই যেন সেই কথাটি, যা বলার জন্য কবি চঞ্চল। অথচ 'সমাজ সংসার মিছে সব / মিছে এ জীবনের কলরব'—উপনিবেশের মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সমালোচনা। স্মরণ করা যায় লোকেন্দ্র-নাথ পালিতের পরামর্শে বর্জিত 'প্রেমের অভিষেক' কবিতার প্রথম কয়েক ছত্র। চৌত্রিশ বছর বয়সে 'ঝর ঝর বরিষে বারিধারা'-য় তিনি আবার একটি নিজস্ব ছবি এঁকে দিলেন—'তিমিরদুকূলা' যমুনার ছবি। অন্তরা অংশে, 'ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে'—লিরিকটির বাধা-অনুষঙ্গ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সম্ভব চিত্রকল্প থেকে বোঝা যায় বাংলা বর্ষা-কবিতার পুরাতন অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে তিনি এবার বাইরে বেরিয়ে আসছেন। ছত্রিশ বছর বয়সে 'হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে' বোধ হয় প্রথম বর্ষাকবিতা যেখানে মেঘ হল স্মৃতিবাহিনী, অনুষঙ্গ হল আধুনিক জীবন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত প্রধানাংশে বর্ষা তাঁর কবিতার উপকরণ। তখনো পর্যন্ত বর্ষা এবং তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের সংযোগে স্বকীয় অর্থের ছায়া গাঢ় হয়ে উঠছে না।

সেটা হল তাঁর আটচল্লিশ বছর বয়সে। যখন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বেদনা হয়ে উঠেছে স্তূপীকৃত, যখন আঘাত এবং প্রতিকূলতা একটা প্রাকৃতিক রূপকের আকার ধারণ করছে, তখনই তিনি সব থেকে সংবেদী ভাষায় বর্ষাকে করে তুললেন তাঁর আত্মদর্শনের উপায়। সব থেকে সংবেদী ভাষা—তাই সব থেকে নিরলংকৃত। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' গানটিতে 'দুরন্ত বাতাসে'

যদি-বা একটি ছবির আভাস আনে, নইলে, এ গানে কোনো চিত্রকল্প নেই। সবটা মিলিয়ে একটা ছবি ফুটে ওঠে,—প্রতীক্ষকের আকুলতার ছবি, কিন্তু যাকে কবিতার শব্দচিত্র বলে তার কোনো দরকার এখানে হল না। ঐ আটচল্লিশ বছর বয়সে একই আষাঢ়ে (কয়েকমাস আগে ধনঞ্জয়ের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের কাহিনী-সম্ভূত গানগুলির পালা চুকিয়ে দিয়ে) তিনি লিখলেন—'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল', 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা ভাদরে' —এই সব গান। বর্ষার গান বলে নির্দিষ্ট হলেও 'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' ও 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' গান দুটি সমাসন্ন প্রতীক্ষার ভাবানুষঙ্গকেই প্রবল করে তোলে। সেই আষাঢ় মাসেই উতলা প্রতীক্ষক এই গানগুলিতে তাঁর দুঃসহ বর্তমানকে মূর্তি দিলেন। চিত্রকল্প নয়, বরং এক ধরনের মানসিক পরিস্থিতির ভাবমূর্তি এখানে প্রধান কথা। চিত্র একেবারে নেই এমন কথা বলা যাবে না। মেন্টাল ইমেজের ছোটখাটো গড়নের আদল মিলবে এই সব পংক্তিতে— 'আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে' 'প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি' 'আকাশ কাঁদে হতাশসম'। কিন্তু মেন্টাল ইমেজের গণ্ডি পেরিয়ে যেখানে সংগুপ্ত চিত্রকল্পে অন্যতর অভিপ্রায় আভা ছড়ায় সেই সব মুহূর্তগুলি অবিস্মরণীয়। যেমন 'বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে'—এই তরঙ্গই রবীন্দ্রনাথের গান অথবা তাঁর গানের বাণীনিরপেক্ষ সুর। 'নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে', শুধু 'নিলাজ' বিশেষণটির জন্য এক মেঘময় পটভূমিকে দুঃসহ করে দেয়। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' কবিতাটি এক হিসাবে বৈষ্ণব কবিতার অভিসারের পদের সম্পূরক। বৈষ্ণব কবিতায় বারে বারে এক চলিষ্ণু নায়িকার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি জানিয়ে দেয়, আমি স্থির থাকলেও তিনি চলিষ্ণু। সেই প্রতীক্ষকের আরেক বেলাশেষের বাণী গুঞ্জরিত হয়েছে 'উতল ধারা বাদল ঝরে' গানটিতে। এ গান তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে লেখা। এমনিতে রবীন্দ্রনাথের হাতে এ এমন কিছু গান নয়। শুধু, কবিতাটি যখন এই অংশে পৌঁছয়—'উতল ধারা বাদল ঝরে / দুয়ার খুলে এলে ঘরে'—তখনই আমরা টের পাই আরেকটা গানের বাণী পাখা মেলবে—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'। বাহান্ন বছরের এই গান রবীন্দ্রনাথের ঝড়ের গানগুলির অন্যতম।

তাঁর জীবনের ষাট-বাষট্টি থেকে তাঁর বর্ষার গানের চিত্রকল্পে নতুন পালা শুরু হল। বিষয়টি উপস্থিত করার আগে আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন এই

পাঁচ বছরের বর্ষার গানের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই সব বর্ষার গানে 'আজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। বাক্যের ক্রিয়াপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ বর্তমান বা সদ্যসম্পন্ন-অতীত বাচক। গতকাল বা আগামীকালের কোনো প্রসঙ্গ গানগুলিতে নেই। গতিশীল কালের কোনো ইমেজ—যা বসন্তের গানে পুষ্পিত হয়েছে, তাও এই গানগুলিতে ছিল না। এ একান্তভাবেই মনের এক স্থির মুহূর্তের ছবি। ষাট-বাষট্টি বছর বয়সের গানগুলিতে কিন্তু গতির ছবি ফুটে উঠল। শেষ বর্ষণ, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা শ্রাবণগাথা প্রভৃতি গানের পালায় পুরো গীতিনাট্যের যোজনা-সূত্রে গানগুলি পেল অন্য গতিবেগ। আটচল্লিশ থেকে বাহান্ন, এই পাঁচ বছরে যেখানে গানগুলি ছিল অন্তর্গূঢ়—গানে-বাঁধা পালায় সে হয়ে উঠল বহতা দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার একটা অংশ। সুতরাং রূপের দিকে ঝোঁকটুকু পড়েছে স্বাভাবিক ভাবে। সুর-বৈচিত্র্য, লয়-বৈচিত্র্য সেই রূপ নির্মিতির সহযোগী। এখানে বর্ষার গান সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব পদের—চাইকি আবহমান বাংলা গানের অনুষঙ্গ ছাড়িয়ে এক স্বতন্ত্র উদ্দীপক ভূমিকায় মুক্তি পেল। তার লিরিকের চিত্রকল্পেও তাই এক অভূতপূর্ব সজীবতা এল—রূপকে প্রতীকে এই বর্ষা তখন বসন্তের মতোই হয়ে উঠল এমন এক শক্তি, যে স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দেয়। তখন আর বাক্য গঠনে ভবিষ্যৎ বাচক ক্রিয়াপদের অসদ্ভাব ঘটে না। স্মরণ করতে পারি 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ গগন অঙ্গনে' এবং 'ওরে ঝড় নেমে আয়' প্রভৃতি গান। শ্রাবণ বা আষাঢ় এখানে প্রতীক। অন্তত এক্ষেত্রে, এই সব পালা গানে, সে নয় কেবলমাত্র বিরহের অনুষঙ্গবাহী। সে মুক্তির প্রতীক। অর্থাৎ মল্লারের ভাবাবর্তে নয়, বর্ষার মধ্যেও তিনি দীপকের বাতাবরণ সৃষ্টি করেন, লোকায়ত জীবনের বর্ষাকালীন উল্লাসের আবেগের মাঝখানে বিরহ-বর্ষার বিষয়গত সীমাবদ্ধতা তিনি ঘুচিয়ে দেন। তারই টানে তখন মুঞ্জরিত হয় এই সব চিত্রকল্প—'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা', 'বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে / সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে', 'সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে', 'অগ্নিবরণ নাগ-নাগিনী ছুটেছে উদাসী', 'পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা / উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় অধীরা', 'নব অঙ্কুর জয় পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ /—ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর'। লক্ষ করি শুধু নায়ক বা নায়িকা-হৃদয় নয়, কৃষক গৃহস্থ পরিবারের জননী হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে বর্ষার রূপকে তিনি এর আগেই চিত্রিত করেছেন

'ক্ষণিকা'য (১৯০০)—'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে' গানে। এই বাস্তবের বর্ষার ছবি এঁকেই তিনি আভাস পেলেন বর্ষার মুক্তিদাতা রূপের। ষাট বছর বয়স থেকে তাঁর আটাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বর্ষার নানা গান থেকে যে চিত্রকল্পগুলি সংগ্রহ করা গেল তার মূলে বর্ষার ভাব নয়, প্রতীকী রূপ।

বর্ষার এই প্রতীকী রূপের টান তখন এমনই প্রবল যে, বর্ষার বিপরীত প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে, বসন্তের ইমেজে বর্ষার প্রতীকী ভাবকে মূর্ত করে তুলতে কবির কোনো সংকোচ হল না। সকলেরই মনে পড়বে বিখ্যাত গান—'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে'। শ্রাবণ নটরাজ বাউল বসন্তের মতো শিখার জটা ছড়িয়ে দেয় ; আগুনের পুলক ফুটে ওঠে, কদম্ব-বন রঙিয়ে ওঠে, আগুনের বেগ লাগে—এই সমস্ত চিত্রকল্পে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এক বেপরোয়া বসন্ত। ওরে ঝড় নেমে আয় চিত্রাঙ্গদার ক্ষেত্রে রূপকের দিক থেকে বর্ষাকে আহ্বান, রূপকার্থের দিক থেকে বসন্তকে ডাক। দ্বান্দ্বিক রূপান্তরের প্রতিমা রচনায় বর্ষা-বসন্ত কেউ কারো দূরে নয়। তাই 'ওরা অকারণে চঞ্চল' সামান্য হেরফেরে একবার হয় বসন্তের গান, একবার বর্ষা-মঙ্গলের।

বর্ষা এইভাবে গতিশীলতার প্রতীক হিসাবে দেখা দিল বলে বর্ষার গানের নানা চিত্রকল্প সমৃদ্ধ হয়েছে লোকায়ত জীবনের বিচিত্র অনুষঙ্গে। গ্রামীণ জীবনে বহিরাগত বেদে সাপের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আসে তুবড়ি বাঁশি বাজাতে বাজাতে। এরই উপাদানে তৈরি হল এই ছবি—'পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী—/শূন্যে বাজায় ঘন ঘন হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন/সাপ খেলাবার বাঁশি'। আপাত বিচারে এটিও মেন্টাল ইমেজ—হয়তো বা অডিটরি ইমেজ বা শ্রাব্য চিত্রকল্প। কিন্তু কবি গোটা লিরিকটিতে চিত্র-কল্পটিকে ক্রমে বেড়ে উঠতে দিলেন। 'দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী'—ঐ বাঁশির সুর শুনে যেন বেরিয়ে পড়েছে সাপের দল। চিত্রকল্পটি এখানে নিহিত বা সংগুপ্ত। মেঘ-বিদ্যুৎ-নাগ-চিত্রকল্প রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গ' ('মরণ-মিলন' কবিতা) এবং 'পূরবী' ('তপোভঙ্গ' কবিতা) কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করা গেছে। কিন্তু একষট্টি বছর বয়সে লেখা এই গানটিতে ভিনদেশী বেদিয়ার ডমরুর রূপকে মেঘের ডাক এবং সাপের রূপকে বিদ্যুৎ এক নতুন রূপচ্ছবি সৃষ্টি করে—'আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু/ডমরু রব ওই হয়েছে শুরু। / তাই শুনে আজ গগনতলে/পলে পলে দলে দলে/অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী'। তখন তা আর মেন্টাল ইমেজ থাকে না, থাকে

না সংগুপ্ত চিত্রকল্প। তখন তা হয়ে ওঠে প্রমূর্ত আধুনিক চিত্রকল্প। প্রসঙ্গত উল্লেখ কবি 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' গানটির মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখার ভুজঙ্গ-প্রযাতে শ্লিষ্ট অর্থে সাপের কথা ধরিয়ে দিয়ে ঐ ছবিটিকেই জাগিয়ে তোলে।

শ্রাব্যচিত্রকল্প বা অডিটরি ইমেজে ও দৃশ্যচিত্রকল্পে বা ভিসুয়াল ইমেজে —অর্থাৎ মেন্টাল ইমেজেরই দুইস্তরের বিপরীত উপস্থাপনার ফলে কাব্য সংগীত নিরপেক্ষ লিরিকের বিচারে কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করি। 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু' গানটির প্রথম ভাগ শব্দময়— শ্রাবণ সন্ন্যাসীর রাগিণীর শ্রাব্যচিত্রকল্পে তা রচিত। শেষভাগে শ্রাবণ সন্ন্যাসীর অনুষঙ্গ সরিয়ে এগিয়ে এল রূপকথার কাহিনীর ভাবানুষঙ্গ—'নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া'। অডিটরি ইমেজ ভিসুয়াল ইমেজ-কে পথ ছেড়ে দিতেই পারে। এখানে অনুষঙ্গের হের ফের হয়ে গেছে বলে কথাটা পৃথকভাবে তুললাম। এখানে সুর এসেছে বিপন্ন কবিতাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে। বলা দরকার তার সে-ভূমিকা যথাসাধ্য পালিত হয়েছে।

এরই পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করা গেছে। বর্ষার গতিময় রূপ গড়ে তুলতে তুলতেই বর্ষার অন্য এক ভাবরূপ তিনি রচনা করছেন। প্রতীক্ষা নয়, অধ্যাত্ম বিরহও প্রধানত নয়—পরিণত পর্যায়ে বর্ষার এ সমস্ত কবিতা স্মৃতিবাহিনী। এখানে যে-বিরহ তা একান্তভাবে স্পষ্টত মানবিক। স্মৃতি এবং প্রতীক্ষাও মানবিক। আটচল্লিশ বছর বয়সে 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে'-তে যে-আকূতি তার সঙ্গে বাষট্টি বছর বয়সের 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা'-র প্রতীক্ষা এবং আকুতির, তারতম্য নয়, শ্রেণীগত পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমোক্ত লিরিকে সেখানে আশ্রয়ের জন্য, নিজেকে নিবেদনের জন্য আকুলতাটি প্রধান। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি এ-পার্থক্য বিশ্লেষণযোগ্য নয়, অনুভবগম্য। দুটি কবিতাতেই আছে বিনা কাজের প্রসঙ্গ। কিন্তু একটায় প্রাধান্য 'আঁধার করে আসে' এই তথ্যটি। আরেকটায় প্রাধান্য পেয়েছে 'হৃদয় নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী' এই উপলব্ধি। 'ঝরি ঝরি' এবং 'জাগে লহরী' একযোগে এক প্রতীক্ষকের প্রত্যাশাকে মূর্ত করে তোলে। যার সুরের তরীর জন্য এই প্রতীক্ষা সে সত্তার দিক থেকে নান্দনিক—এখানে এ কথাটি প্রধান। প্রভেদ এই মাত্র। চৌষট্টি বছর বয়সে 'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা' গানটির সঙ্গেই জন্মলাভ করেছে শ্রাবণ

পূর্ণিমার এই অপরূপ চিত্রকল্প—'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্—। হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল'। 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ গগন অঙ্গনে / শোন্ শোন্ রে মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে'—বাষট্টি বছর বয়সের এই গানের সঙ্গে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী' আটাত্তর বছরের এই গানের ভাববীজের সাদৃশ্য অবশ্যই লক্ষণীয়—কিন্তু আরো বেশি লক্ষণীয় রূপের দিক থেকে, সুর এবং ছন্দের আঙ্গিকের দিক থেকে, দুয়ের তফাৎ। আবার ঐ বছরেই লেখা 'সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা / অন্ধ বিভাবরী সঙ্গপরশ হারা' ব্যক্তির নিঃসঙ্গতার প্রতিধ্বনি। অস্থায়ীর অংশটি পূর্ণচ্ছেদ বিহীন চারটি বাক্যের সমষ্টি। 'সঘন গহন রাত্রি' একটি বাক্য, দ্বিতীয় বাক্য 'ঝরিছে শ্রাবণ ধারা', 'অন্ধ বিভাবরী' এই ক্ষুদ্রতম বাক্য শ্রাবণ রাত্রিকে দৃশ্য করে তুলল, 'সঙ্গ পরশ হারা'—রাত্রির হিমশীতলতাকে যেন স্পর্শ করা যায়। সযত্নে 'আমি'-বাদ দেওয়া হয়েছে এই অংশে। তাই শ্রাবণের নৈশ বিপুলতা মূর্ত হয়েছে এমন ভাবে। বর্ষার চিত্রকল্পে কবির ভূমিকা প্রত্যক্ষ স্পষ্টতা পেতে শুরু করেছে তাঁর ঋতু বিষয়ক গানে-বাঁধা পালাগুলির বাণীতে—কেননা সেখানে বলবার কথায় নানা সম্পর্ক সূত্র জড়িত, নানা ছবিতে সেখানে রূপান্তরের মূর্তি রচনা। অথচ ব্যক্তিক আকুলতা, সুগম্ভীর বিরহের প্রশান্ত বিষণ্ণতার মূর্তিও এর পাশে পাশেই স্থাপিত।

'এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইলা বাটে'—এই গানটি আর আমাদের মনে পড়ে না 'তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি / কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী'-র সুর-স্বাতন্ত্র্যে ও রূপ-স্বাতন্ত্র্যে। কিন্তু ভুলতে পারি না ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আত্মস্থ করেন—ভুলতে পারি না মধ্যযুগীয় কবির কবিতার ভাববীজকে তিনি কীভাবে নতুন মূর্তি দেন। 'রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে—/ যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে / কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি'—এ আধুনিক মনের দৃঢ় সংকল্পের কথা। বাঁধাবন্ধন ছিঁড়ে ফেলার এ কথা বৈষ্ণব পদটিতেও ছিল—রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যাটি আমাদের মনে পড়ে—'শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে ; আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া, শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।' কিন্তু বাধার সে অভিপ্রায়, 'মোর মনে হেন করে' এই মধ্যযুগীয় সীমারেখায় বন্দী ছিল। মুক্তির স্বাধিকারকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁর গানে। দুবছর বাদে 'পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণ

গগন অঙ্গনে' এই গানে তিনি তাকে আরো অবারিত করে দিলেন—'দিক-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে / কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন সীমা লঙ্ঘনে'। তখন আর পুরাতন কোনো ভাববীজও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক দুঃসাহসী অভিযাত্রীর গান আর বর্ষার গান তখন এক হয়ে যায়। আবার আটাত্তর বছর বয়সে 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'-গানে আর দুঃসাহসের দীপ্তিটিও দরকার হল না। মুক্তির আকাশে পক্ষ বিধূনন সেখানে ধ্বনিত হয়েছে। কান পেতে যেন বলাকার পাখিদের পাখার শব্দ শুনি—'ক্বচিৎ ক্বচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে'। 'ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে'-তে সুর আন্দোলিত শাখাকেই মূর্ত করে তোলে।

৩

বর্ষা যে-ভাবে একটা পর্যায়ে মুক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিল, তাঁর বসন্তের গান সেভাবে মুক্তির প্রতীক হয়নি। 'বসন্ত' গীতিনাট্যের শেষ গান অথবা 'নবীন' গীতিনাট্যের 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে' (যেটি 'হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে'-গানের পাঠান্তর) বা এইরকম দু-একটা উদাহরণ ছাড়া, বসন্তকে কবিতায় যেমন বিদ্রোহীর ভূমিকায় কখনও কখনও পাওয়া গেছে, গানে সেভাবে পাওয়া যায় নি। বসন্ত তাঁর গানে হয়েছে জীবনের উপলব্ধির প্রতীক। শুকনো পাতা আর মুঞ্জরিত পাতার সহাবস্থানে জীবনের যে সামগ্রিকতা, রবীন্দ্রনাথের বসন্ত তার কথা বলে। 'এপ্রিল ইজ্ দি ক্রুয়েলেস্ট মান্থ, ব্রিডিং লিল্যাক্স্ আউট অফ দি ডেড ল্যাণ্ড'—এই এলিয়টীয় চিত্রকল্পে জীবনের যে-ভাষ্যের দেখা মেলে, রবীন্দ্রনাথের অরূপরতনের 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে। / দেখিস নে কি শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে'—এই গানে তার চেয়ে পূর্ণতর জীবনবৃত্তের দেখা পাওয়া যায়। যিনি 'উৎসবরাজ' তিনি ঝরা ফুলের খেলাও দেখেন। তাই পরিণত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বসন্ত-ছবিতে রঙের ঐশ্বর্য আছে বটে, দ্বিরুক্তিবাচক শব্দের সাহায্যে বসন্তের ব্যাপক বৈভবের আভাস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বটে, 'গগনের করে তপোভঙ্গ'—এ-রকম ক্লাসিক মীথের ব্যবহারও ঘটেছে বটে—কিন্তু তাঁর বসন্তের গানের প্রকৃত আবেদন অন্যত্র। সে গান সময়ের প্রবহমাণতা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে। তা চলতে চলতে তার সপ্রাণ অকৃপণতার পরিচয় দেয়—এখানে সেও গতির প্রতীক। গ্রীষ্মের নীরস

বিবর্ণতার বন্ধন থেকে বর্ষা যেমন লোকায়ত প্রাণোল্লাসের মাঝখানে আমাদের মুক্ত করে, শীতের হাত থেকে বসন্তও তেমনই মুক্তি দেয়। এই প্রসঙ্গে ফাল্গুনী-পর্যায় থেকে কবির বসন্ত অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জড় ঔপনিবেশিক জীবনে নবজাগ্রত যুবশক্তির ভূমিকার রূপক। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের নিয়তি-সচেতন করে তোলে—সেই সচেতনতায় তাঁর বসন্তের গান বর্ষার গান থেকে অন্যতর কথা বলে—এ কথাটাও সত্য। পুরাতনকে ভাঙতে ভাঙতে সে আসে। কিন্তু তার নিজের আত্মদানও বাকি থাকে না। ইতিহাসের এ ট্র্যাজিক সংকল্পের আধুনিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানেই আমরা প্রথম পেলাম। 'পিছন পানের বাঁধন হতে চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে' এই সংকল্পের ছবি তখন পূর্ণতা পায় শেষ চরণে—'অকূল প্রাণের সাগর তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয় ক্ষতিরে। / যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড় অনন্তে'। আমরা স্মরণ করতে পারি এইসব প্রতীকী ছবিগুলি —'এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সেদিন তালে তালে— / চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে', 'অস্ত গিরির ওই শিখর চুড়ে / ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে। / কাল বৈশাখীর হবে যে নাচন, / সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন—/ হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়', "এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে / ঝরব তখন হাসি মুখে— / অফুরানের আঁচল ভরে / মরব মোরা প্রাণের সুখে"। রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গানে ভবিষ্যৎ-বাচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে বেশি। এও তাঁর সময়ের প্রবহমাণতা সম্বন্ধে চেতনার নিদর্শন, শুধু প্রাকৃতিক চক্র-চেতনা নয়, মানবিক ইতিহাস-চেতনার রূপকও বটে।

ধূলির সঙ্গে তাঁর বসন্তের যোগ নিবিড়, ঝরা পাতা আর ঝরা ফুলের সঙ্গেও। এ যোগ একদিনে গড়ে ওঠেনি। ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সের যে-গানটি আমরা একটু আগে উল্লেখ করলাম, 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে'—'অরূপরতন'-এর এই গানটি থেকেই বসন্তের এই দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার দিকে কবির দৃষ্টি সজাগ হয়েছে। বসন্তের গানে ধূলি>ঝরে পড়া>শুকনো পাতা>নষ্ট মুকুলের একক অথবা মিলিত উপাদানে রচিত চিত্রকল্পের বারে বারে দেখা পাওয়া যায় এই কারণে। গীতবিতানের প্রকৃতি-পর্যায় থেকে এইসব চরণগুলি মনে আসে :

ক. তোমার সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝ'রে—
তারা ধূলা হল, তারা ধূলা দিল ভরে। —(২১১)

খ মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিনীরে (২১৫)

গ. শুক্‌নো পাতা কে যে ঝরায় ওই দূরে (২২৪)

ঘ. কবর তোমায় কী সম্ভাষণ কোথায় তোমার পাতর আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জ কুটিরে। (২২৭)

ঙ. যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝরো ঝরো। (২৩০)

চ ছেয়ে গেছে শুক্‌নো পাতায় কানন বীথি। (২৩৫)

ছ. নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি। (২৫৩)

জ. তারগুলি তার ধূলায় ধূলায় গেছে কি ঢেকে। (২৫৬)

ঝ. সেই ফুলেরই ছিন্ন দলে চিহ্ন যে তার পড়ল ঢাকা। (২৫৯)

ঞ. ফাগুনের শুরু হতেই শুক্‌নো পাতা ঝরল যত। (২৬৪)

ট. সুধা পসরা ধূলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বকুলমঞ্জরী। (২৭১)

ঠ. শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়, (২৭৮)

ড. ঝরাপাতা গো বসন্তী রঙ দিয়ে শেষের বেশে
সেজেছ তুমি কি এ। (২৮৩)

এর মধ্যে সবগুলি চিত্রকল্প নয়—কিন্তু বর্ণনার উপাদানেই হোক বা প্রতীকী চিত্রকল্পেই হোক, আমাদের উল্লেখিত প্রসঙ্গের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ এই কথা জানিয়ে দেয় যে, চলিষ্ণু ইতিহাসের ছায়া পড়েছে কবির বসন্ত-কল্পনায়। 'বসন্তের এই চরম ইতিহাসে'—শুধু বসন্তের বিদায়বাণী নয়, 'চরম'-বিশেষণটি বুঝিয়ে দেয় সমগ্র বসন্তের অস্তিত্বের সঙ্গে এই ইতিহাস যুক্ত। তাই বসন্তের বসন্তী রঙের সুতো আর বিষণ্ণতার ধূসর রঙের সুতো জড়িয়ে কবি বুনে দিয়েছেন তাঁর এই পর্যায়ের পরিণত দিনের চিত্রকল্প :

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে॥

এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
করে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে॥

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে॥
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে সুরের খেলা ডুব সাঁতারে—

অশোক রেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি॥

সময়ের প্রবহমাণতার এই চেতনা থেকে বসন্ত-পর্যায়ে কয়েকবার জোয়ার > প্লাবন > বর্ষা-র চিত্রকল্প রচিত হয়েছে। বসন্তের চিত্রকল্পে বর্ষার রূপ যত না বিস্ময়কর, বন্যা বা বর্ষার চিত্রকল্পে বসন্তের রূপ তার থেকে বেশি বিস্ময়কর। 'নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার স্রোতে/শুক্লরাতে চাঁদের তরণী'—এমনই এক জটিল অথচ আলঙ্কারিক চিত্রকল্প—ফিগারেটিভ ইমেজ। 'তিথির পরে তিথির ঘাটে আসিছে তরী দোলের নাটে'—চিত্রকল্পটিতে আরো বিস্তৃততর অর্থের সংহতি দেওয়া হল। এই জাতীয় চিত্রকল্পগত বিন্যাসের আরো দুটি উদাহরণ মনে পড়ে। একটি হল 'তুমি কোন পথে যে এলে পথিক আমি দেখি নাই তোমারে' এবং আরেকটি হল 'ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা।' প্রথমোক্ত গানটিতে কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প হল,

ফাগুনে যে বান ডেকেছে মাটির পাথারে।
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া এলে জোয়ারে॥
ভেসে এলে জোয়ারে—যৌবনের জোয়ারে॥

আখরের অংশে রূপকের জন্য যে শিথিলতা এসেছে তা সহজে আমরা উপেক্ষা করতে পারি। দ্বিতীয়োক্ত গানটিতেও কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প,

সেই মুক্ত বন্যাধারায় ধারায় চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়
ও সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্য নবীন বর্ণা॥

যে-সব চিত্রকল্পে এমন ভাবে বর্ষা-বসন্তের প্রতীকী সমাহার ঘটে গেছে সেগুলি থেকে আমরা কিন্তু বাদ দিচ্ছি স্রোত বা বন্যার মেন্টাল ইমেজ, যেমন—'চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন রাতের অন্ধকারে/চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে।'

৪

তাঁর ঋতুবিষয়ক গানের পালায় কখনো কখনো এক সন্ন্যাসীর ছবি, এক বিচিত্র সন্ন্যাসীর অনুষঙ্গ ফুটে উঠেছে। সে আলোচনায় সবচেয়ে আগে বলার কথা বোধ হয় এই যে, প্রকৃতির ভিতর থেকে সন্ন্যাসীর চিত্রমালা সংগ্রহ করে নেবার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসী-কল্পনার জন্ম হয়েছে ভারতীয় জনজীবনের উপবাস ক্লিষ্ট, নামমাত্র বস্ত্রাবৃত বিপুল অংশের মুখোমুখি হয়ে। 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'নববর্ষ' (১৩০৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে এক প্রতপ্ত বৈশাখের পটভূমিকায় যে দরিদ্র, কৃশপঞ্জর, উপবাসী, দারুণ-সহিষ্ণুকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সে একান্তভাবেই ভারতবর্ষের সনাতন মানুষ—কিন্তু 'তপ্ততাম্র আকাশের' ও 'শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের' সংযোগে, সেই 'জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের' সংস্পর্শে মানুষটি কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছে সন্ন্যাসীর রূপকে। স্বাভাবিক মানসতায় অবশেষে গ্রীষ্ম সেই সন্ন্যাসীর অনুষঙ্গবাহী হয়েছে—'হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে / মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে'। সে তাপস তপোবহ্নির শিখা জ্বালে, তার তাপস নিশ্বাসই ঝড়, তার জটা পিঙ্গল। একবারই মাত্র সে গ্রীষ্ম 'শুষ্ক তাপের দৈত্যপুর' বলে রূপকান্বিত হয়েছে। তা নইলে, সে সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমার ধার ধারে না। 'তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে'—বৈশাখের শূন্যতা বিরাট বলেই তাকে ভরে দিতে হয় মূর্ত নীরবতা দিয়ে।

শ্রাবণ সন্ন্যাসীর রূপকের টানে মন্দ্রিত হল শব্দময় জগৎ। প্রচণ্ড ডম্বরু, বাউলের একতারা, সাপ খেলাবার বাঁশি সবই কোনো ঘরছাড়া বিরাগীর ভাবানুষঙ্গ ধারণ করে। 'মেঘের জটা', 'জটার শিখা' ইত্যাদি ছোট ছোট ছবিতে সে ভাবানুষঙ্গ এক নির্দিষ্ট তাৎপর্য পায়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ স্বাভাবিক কারণে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে—ডম্বরু একতারা বাঁশি তারই শ্রাব্যচিত্রকল্প। অথচ সবটাই যুক্তিবাচক বলে বিশালতাকে, ব্যাপকতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য দ্বিরুক্তিমূলক বহুবচনের ব্যবহার ঘটেছে ঘন ঘন। বর্ষা এবং বসন্তে এই বিরক্তিমূলক বহুবচনের বাহুল্য ফুটিয়ে তোলে এদের অনিবার্যতাকে, এদের অকৃপণ ঐশ্বর্যকে—এদের অপরিমেয়তাকে।

শীতে সেই তাপসের তপের কঠিন বাঁধন ভাঙার আয়োজন। হিমগিরি নিবাসী সন্ন্যাসীর ভাবরূপের সমাসন্ন পরিবর্তনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে পুরাণের স্মরণ—'রুদ্র এবার বরবেশে তারে করো গো ধন্য—হও প্রসন্ন'।

এখানে বাংলার লৌকিক সন্ন্যাসীর চিত্রকল্প ফোটে না। একেবারেই ফোটে না তা নয়। শুকনো পাতার রঙে এক বৈরাগীর আভাস মেলে—'শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে / উদাস করা কোন্ সুরে। / ঘর-ছাড়া ওই কে বৈরাগী / জানিনা যে কাহার লাগি / ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে'। সেই শুকনো পাতার রঙে সন্ন্যাসীর গৈরিক-আভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'ঝরা পাতা গো আমি তোমারি দলে' গানটিতে। সময়ের প্রবহমাণতার যে-চেতনা বসন্তের গানগুলিকে এক অনাসক্ত বিষণ্ণতায় গাঢ় করে রাখে, এই গানটি তাদের অন্যতম। 'বসন্তী রঙ', 'শেষের বেশে', আগুন রঙে উত্তরী রাঙিয়ে নেবার সাধ এক সন্ন্যাসীর ভাবচ্ছবি - মেণ্টাল ইমেজের উপাদান। কিন্তু কবিতাটির শেষ চারটি চরণে এক প্রতীকী চিত্রকল্প মুঞ্জরিত হয়েছে,

তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি—
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

লক্ষণীয় 'আগুন রঙে' এই চিত্রকল্পটি। তার আগেই ঝরা পাতার পীতবর্ণ আর ফাগুনের শেষের সাজ এক হয়ে গেছে। বিদায়ী ফাগুন হাসি-অশ্রুর জড়িত স্মৃতির মাঝখানে যা দিয়ে শেষ হোলি খেলে গেল সেও তার গৈরিক ধূলি—ধূলিও তো মহাপরিণামের প্রতীক—শেষের রঙ। 'চরম' বিশেষণটি মৃত্যুর অনুষঙ্গ বয়ে আনে—আর আগুন-রঙ সেই চরমের আকর্ষণে তখনই জ্বলে ওঠে—মনে পড়ে যায় 'গীতাঞ্জলি'র ১১৪-সংখ্যক গীতের এই অংশ—'যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন / এতদিনের সব আয়োজন / চরম দিনে সাজিয়ে দেব উহারে'। তারপর সেই আগুন আর অস্তরবির রঙ এক হয়ে যায়—আবার মনে পড়ে যায় 'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা' এই রূপকটি। কিন্তু এখানে একটা অন্যতর বাসনার অঙ্গীকার—মৃত্যুর স্পর্শে কবির শেষ সম্বল অর্থাৎ গান ('কণ্ঠে নিলাম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি') নতুন দীপ্তি পাক। এখানেই ঝরাপাতার পরাজয়।

তখন তাঁর বয়স ঊনসত্তর বছর।

ঔপন্যাসিকের আত্মপরিচয় এবং আত্মগঠন : তারাশঙ্কর

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-জীবনকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায় : আদি (১৯২৮-৩৮), মধ্য (১৯৩৯-৪৭) আর অন্ত (১৯৪৮-৭১)। মধ্য পর্বই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল। রাজনৈতিক ইতিহাসের পাঁজি অনুযায়ী, তারাশঙ্করের এই মধ্য পর্যায়ের শুরু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল থেকে, আর শেষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনের সালে। এই নয় বছরে তাঁর দশখানি উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়—'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'কবি' (১৯৪২), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৫), 'ঝড় ও ঝরা পাতা' (১৯৪৬), 'অভিযান' (১৯৪৭), আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭)। তাছাড়া, এগারোখানি ছোটোগল্পের বই আর পাঁচটা নাটকও বেরোয় এই সময়ের মধ্যে। পূর্বতন পর্বের এগারো বছরে (১৯২৮-৩৮), বেরিয়েছিল ছয়টি উপন্যাস আর তিনটি ছোটোগল্পের সংকলন। অতএব নিছক প্রাচুর্যের দিক দিয়ে ১৯৩৯-৪৭-এর পর্বকে তাঁর সৃষ্টির বসন্ত-পর্যায় বলতে পারি।

পরিমাণের সূত্রে আর একটা প্রসঙ্গ এসে যায়। 'বেদেনী' (১৯৩৯), 'পৌষলক্ষ্মী' (১৯৪৪), 'তমসা' (১৯৪৫) বা 'কামধেনু'-র (১৯৪৬) মতন গল্প লিখলেও, এই দ্বিতীয় পর্বে, প্রথম পর্বের তুলনায়, ছোটগল্পের ফলন অনেক কম : প্রায় অর্ধেক। অন্য পক্ষে, সংখ্যায় তো বটেই, গুণের দিক দিয়েও, এই পর্ব তারাশঙ্করের উপন্যাসের যুগ ; তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি এই বসন্ত-পর্যায়ের ফসল।

অর্থাৎ, যদিও ছোটগল্পকে বাহন করে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক দিগ্বিজয়ের ত্রপাত, ১৯৩৯-এর পর থেকে, ক্রমশ তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে সুউপন্যাস। কী তার কারণ ? বাংলা বইয়ের বাজারের যা হালচাল, তাতে এই বাহন-বদলের একটা সরল আর্থিক ব্যাখ্যার আকর্ষণ প্রায় অবোধ্য। আমাদের সমাজে সাহিত্যও যেহেতু পণ্য, তার কেনাবেচায় বাজারের নিয়ম

ক্রিয়াশীল। বাংলা বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছে ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের কদর এবং চাহিদা বেশি ; সুতরাং, ছোটগল্পের চেয়ে তার দরও বেশি, বাজারও বড়ো। ছোটগল্পের এই চিরস্থায়ী মন্দা কীভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে তিরিশের দশকের শুরুতে লেখক-মহলে কিছু জল্পনা-কল্পনাও হয়েছিল। বইপত্রের কাটতি বজায় রাখা বা বাড়ানোর পেছনে যেমন বিজ্ঞাপনের কারসাজি আছে, বাজারের এই টানও তেমন বিজ্ঞাপনে টের পাওয়া যায়। তাই দেখি, ১৯৪০ সালের কোনো বহুবিক্রীত শারদীয় সংখ্যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি'-কেও বিজ্ঞাপিত করা হয় উপন্যাস হিসেবে! এই যখন পরিস্থিতি, যে-লেখকের সাহিত্যই জীবিকা, তাঁর পক্ষে উপার্জনের তাগিদে উপন্যাসের দিকে ঝোঁকা স্বাভাবিক। এই আর্থিক ব্যাখ্যা তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযোজ্য? 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'কবি' বা 'গণদেবতা' বাবদ উপার্জন তাঁকে কলকাতায় যুঝতে, দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল ঠিকই ; কিন্তু তাঁর লেখায় আর্থিক প্রবর্তনার ছাপ পড়েছে, অনেক পরে, তাঁর জীবনের শেষের দিকে, নিরাপত্তা আর সচ্ছলতার সময়ে ; তাঁর শেষ পর্যায়ের অনেক 'উপন্যাস' আসলে লম্বিত গল্প। লেখার তাড়নায় উপার্জন করাটা দোষের নয়, যা দোষের, তা হচ্ছে, নিছক উপার্জনের তাগিদে লেখা। আর, তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতির পাঠকমাত্রই জানেন : উপার্জনের আকর্ষণে লেখার সুযোগ, নিজের সংগ্রাম আর অভাবের সময়ে, কত অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি।

কোনও লেখক, তাঁর সৃষ্টির বিশেষ পর্যায়ে, কোন্ শিল্পরূপ কে বেছে নেবেন, সেটা, এক হিসেবে, তাঁর ব্যক্তিগত খুশির, আনন্দের ব্যাপার। তারাশঙ্করের মধ্য-পর্বের উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি, এই আনন্দ, এই আবিষ্টতা। ১৯৩৯-৪৭ পর্যায়ের উপন্যাসগুলোর স্বরভঙ্গিতে (tone) ফুটে উঠেছে, নিজের একটা বৃহৎ, বর্ধিষ্ণু পাঠকসমাজকে সম্বোধন করে তাদের সঙ্গে প্রসারিত পর্দায় দীর্ঘমাত্রিক আলাপ জমানোর আনন্দ। এই আনন্দ, ভরবেগ জুগিয়েছে লেখন-প্রক্রিয়ার একটানা স্রোতে।

বড় পাঠকসমাজের সঙ্গে প্রসারিত আলাপচারির এই আবিষ্ট আকাঙ্ক্ষার পেছনে সেদিনের ইতিহাসের একটা ভূমিকা ছিলো, আর ছিল সেই ইতিহাসের সঙ্গে সংবদ্ধ তাঁর অভিজ্ঞতা আর আইডিয়লজির বিবর্তন-জনিত চাপ। অভিজ্ঞতা আর আইডিয়লজি কথা দুটোকে যদিও পাশাপাশি লিখছি, এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করা দরকার। অক্ষরেখা-দ্রাঘিমার

মতো আইডিয়লজি চিহ্নিত করে দেয় অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ; অভিজ্ঞতার আলোয় চেনা যায় আইডিয়লজির স্বরূপ। আইডিয়লজি বিন্যাস, তাৎপর্য, পুরুষার্থ দেয় অভিজ্ঞতাকে ; অভিজ্ঞতা আইডিয়লজিকে দেয় অন্তঃসার। উপন্যাসের দ্বান্দ্বিক রসায়নে আইডিয়লজি হয়ে ওঠে অভিজ্ঞতা, আর অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে আইডিয়লজি। আমার বিশ্বাস 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯) প্রকাশের কিছুকাল আগে থেকে বড় বিবর্তন শুরু হয় তাঁর অভিজ্ঞতা—আইডিয়লজির। ১৯৩৯-৪০-এর কিছু আগে থেকে শুরু হয়ে চল্লিশের দশকের প্রথম ছ-সাত বছর ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের গণরূপ ও চেতনান্তর দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে ছোটো থেকে বড়ো দিগন্তে। চাষীকে প্রত্যক্ষণের কেন্দ্রে স্থাপনের প্রচেষ্টায়, 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকেই যিনি সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে স্বতন্ত্র হয়ে উঠছিলেন, জনমানসের এই ব্যাপক, প্রচণ্ড আলোড়নের দিনগুলিতে তিনি সাধারণ্যের সঙ্গে আরও প্রসারিত, আরও অবিচ্ছিন্ন, সাহিত্যিক-সংযোগ চাইবেন, এ তো স্বাভাবিক। দ্বিতীয় পর্বের অনেকগুলি উপন্যাসে তারাশঙ্কর তাঁর ১৯২১-৩১-এর অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে ফিরে-ফিরে দেখছেন চল্লিশ-দশকের জাতীয় আন্দোলনের বিবর্ধমান গণভিত্তির বীক্ষণমঞ্চ থেকে। এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অভিজ্ঞতাকে আর ছোটো ফ্রেমে নয়, বড়ো-বড়ো কাঠামোয় বেঁধে তার মানে নতুন ভাবে বুঝতে চাইছেন। উপমার ভাষায় বলতে পারি, এবার অভিজ্ঞতার ছাঁদকে ফোটাতে চাইছেন, ভাস্কর্যের বদলে স্থাপত্যের রীতিতে। অভিজ্ঞতার বিস্তার দাবি করছে আখ্যান-কাঠামোর বিস্তার, যার সংস্থান নেই ছোটগল্পের শরীরে।

তবে উপন্যাসের শরীরে এই বিস্তার-যোজনের আঙ্গিক দ্বিতীয় পর্বে এসে অনেকটা যেন বদলেছে পূর্বতন পর্বের তুলনায়। ১৯২৮-৩৮ পর্বে দেখি, তারাশঙ্কর কখনও ছোটগল্পকে বাড়িয়ে উপন্যাসের চেহারা দিচ্ছেন—যেমন, 'শ্মশানের পথে'-র পরিবর্ধিত রূপ 'চৈতালী ঘূর্ণি' আর 'স্রোতের কুটো'-র 'নীলকণ্ঠ'—কখনও-বা দুটো গল্পকে জুড়ে বানাচ্ছেন উপন্যাস—যেমন, 'রাই-কমল' আর 'মালাচন্দন' এই দুই গল্প সংযোজিত করে 'রাইকমল'। অর্থাৎ, প্রথম পর্বের ছটি উপন্যাসের মধ্যে তিনটি-ই হচ্ছে পরিবর্ধিত ছোটগল্প। ছোটগল্প সম্প্রসারিত করে উপন্যাস-রচনার এই আঙ্গিক, দ্বিতীয় পর্বে শুধু একটি ক্ষেত্রে, 'কবি'-তে, অনুসৃত ; আর 'কবি' ঠিক উপন্যাস নয়, নভেলেট। ১৯৩৯-৪৭ পর্বে লেখা 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী' আর 'গণদেবতা'-'পঞ্চগ্রাম'-

এর সঙ্গে যথাক্রমে 'সমুদ্রমন্থন', 'ফল্গু' (প্রথমে নাম ছিল 'মা') আর 'পিতাপুত্র'-এর যোগ আছে। তারাশঙ্কর নিজে 'ফল্গু'-কে 'কালিন্দী'র আর 'পিতাপুত্র'-কে 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এর 'বীজ' গল্প বলেছেন। কিন্তু এই গল্পগুলিকে উপন্যাস-দুটির বীজ বলা অযৌক্তিক। কারণ বীজের সঙ্গে বৃক্ষের যা সম্পর্ক, তা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত; 'কালিন্দী', 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' কোনক্রমেই 'ফাল্গু', 'পিতাপুত্র'-এর বিবর্ধিত রূপ নয় (আর 'সমুদ্র-মন্থন'-এর গল্পাংশকে তারাশঙ্কর 'ধাত্রীদেবতা'-র কাঠামোয় আভাঙ্গা গেঁথে নিয়েছেন, মূল-কাহিনীর বিপ্রতীপ উপাখ্যান হিসেবে)।

বিস্তার-সঞ্চারের এই যে রীতি-বদল, এ-থেকে কতকটা টের পাওয়া যায়, উপন্যাসের আঙ্গিক-চর্চায় ১৯৩৯-৪৭-এর বছরগুলিতে তিনি কতটা এগিয়েছেন। এই হাত পাকাবার প্রক্রিয়ায় তারাশঙ্কর যেন ক্রমশ বুঝে নিয়েছেন, ছোটগল্পের বিস্তারের সঙ্গে উপন্যাসের বিস্তারের তফাৎ শুধু পারিমাণিক নয়, গুণগত। আঙ্গিক দখলে আনার এই প্রক্রিয়া আসলে অভিজ্ঞতা-পরিগ্রহণের নামান্তর। কারণ, লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পিত অভিজ্ঞতার যে-প্রভেদ, সেটাই আঙ্গিক। অর্থাৎ ব্যাপারটা একই প্রক্রিয়ার দুই দিক: এক দিকে আঙ্গিকের বিকাশ ক্রমশ সূচী-চিহ্নিত করেছে তাঁর অভিজ্ঞতাকে, অন্য দিকে অভিজ্ঞতার বিকাশ ভাঙাগড়ার মারফৎ ক্রমে-ক্রমে বিবর্তিত, লক্ষভেদক্ষম করে তুলেছে তাঁর আঙ্গিককে। একই উপন্যাসের একাধিক লেখনের, রূপান্তরের, মধ্যেও ছড়িয়ে আছে এই প্রক্রিয়ার, এই সংঘর্ষের চিহ্ন। ওপরের বর্ণনায় ব্যাপারটা যত নৈর্ব্যক্তিক শোনাচ্ছে, আসলে তা নয়। কারণ, বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ঘটিয়েছেন একজন বিশেষ শিল্পী—তারাশঙ্কর—নিজের মধ্যস্থতায়, শক্তিতে; প্রবল অক্লান্ত একনিষ্ঠ সক্রিয়তায়। এই সক্রিয়তার প্রায় কোনও তুলনা নেই, বাংলা উপন্যাস-লেখার সমস্ত ইতিহাসে। (ক্রমিক পুনর্লেখনের এই রীতিকে উপন্যাসের হয়ে-ওঠার, জৈবিক বিকাশের, প্রক্রিয়া বলে মনে করতেন তারাশঙ্কর। তাঁর অপ্রকাশিত ডায়রির (১৯৪৪) এক জায়গায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট বিবৃতি পাওয়া যায়। 'পঞ্চগ্রাম' আবার আগাগোড়া নতুন করে লিখেছেন শুনে কোনও সাহিত্যিক বিরূপ মন্তব্য করেন। এতে ক্ষুব্ধ তারাশঙ্কর নিজের ডায়রিতে লেখেন, উপন্যাসের প্রথম-পাঠ সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর সঙ্গে তুলনীয়, তার পরিশুদ্ধ-পাঠের—তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে সংশোধন মানেই বিবর্ধন—সঙ্গে তুলনা চলে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত মানুষের। 'সৃষ্টিগুলিকে অসমাপ্ত রেখে যে যায়—সে প্রগতিশীল নয়—অসহিষ্ণু,

সার্থকতালোভী স্রষ্টা। তার সৃষ্টির মতো সেও অসম্পূর্ণ। সন্তান প্রসব করেই মায়ের কর্তব্য শেষ হয় না। তাকে সর্বলাঙ্গ সম্পূর্ণ মানুষ করে দেওয়ার পর—তার মাতৃত্ব সার্থক সম্পূর্ণ হয়।')

অভিজ্ঞতা আর আঙ্গিকের এই অন্যোন্য বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর যে-উপন্যাসে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতি অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে, 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' (১৯৪২-৪৪)। পৃথক বই হিসেবে চললেও, এরা একটা এপিক উপন্যাসের দুটো খণ্ড। তারাশঙ্করের আদি পরিকল্পনাও ছিল তা-ই—'চণ্ডীমণ্ডপ' আর 'পঞ্চগ্রাম' নাম দিয়ে দুই খণ্ডে একটি উপন্যাস লিখবেন, যার নাম হবে 'গণদেবতা'।

'আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতি'—এই শব্দদুটি দিয়ে যে-অর্জিত সিদ্ধির কথা বলতে চাইছি, তার মূল উপাদান এইগুলি : ক) 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১) থেকে প্রায় দীর্ঘ এক যুগ, যে-বিষয়বস্তুকে উপন্যাসের শরীরে তারাশঙ্কর ক্রমাগত বাঁধতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে উঠেছেন এই এপিক উপন্যাসে। খ) বিষয়-বিষয়ীর এই ঐক্যের পাশাপাশি দেখতে পাই, চেতনার আপেক্ষিক স্বচ্ছতা, বিস্তার, চাষীর সঙ্গে সমপ্রাণতা। তাই, 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যস্থতায় সঞ্চারিত হতে পেরেছে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা; আঞ্চলিক সীমার মধ্যে থেকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের বাস্তবতার ছাঁদ। গ) ব্রত-পার্বণ-কথকতার বিন্যাস অন্তর্গ্রথিত করে নিয়ে 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন বাংলা উপন্যাসের নতুন রূপ, দেশজ রূপ, যার কাঠামোর সঙ্গে দেশের তৎকালীন (১৯২১-৪৭) গ্রাম্য সামাজিক কাঠামোর সমরূপতা (homology) লক্ষণীয়। ওপরে যা লিখেছি তা থেকে অন্তত এ-টুকু, আশা করি, স্পষ্ট যে : উপন্যাস-চর্চায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর হয়ে উঠেছেন 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম'-এ (১৯৪২-৪৪)। আর, এ-ধরনের প্রতিভাস্বাতন্ত্র্যবান শিল্পকাজের পক্ষে যা স্বাভাবিক : 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' বাংলা উপন্যাসের ঐতিহ্যেরও কিছু রূপান্তর ঘটিয়েছে—অংশত পাল্টেছে আমাদের উপন্যাসের সংজ্ঞা, পরিধি, মানদণ্ড। এই সিদ্ধির পেছনে যে-দীর্ঘ প্রস্তুতির ইতিহাস—আত্মপরিচয় ও আত্মগঠনের দীর্ঘ পটভূমি—সংক্ষেপে তা বলে নিলে তারাশঙ্করকে বোঝা এবং তাঁর সাফল্যের মূল্যায়ন সহজ হবে।

২

সেই দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন : তারাশঙ্কর নিজের জীবনের কাজ হিসেবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেছেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে, ৩৫ বছর বয়সে (১৯৩৩ সালে)। এর আগে, মাঝে-মাঝে ছেদ দিয়ে, তিনি পদ্য-নাটক-গল্প লিখেছেন বটে, তবে তা অনেকটা শখের ব্যাপার, সাহিত্য তখনও তাঁর ঐকান্তিক চর্চার, পেশার, বিষয় হয়ে ওঠে নি। যে-'রসকলি' 'কল্লোল'-এর সাহিত্যিকদের খুশি করে, তা-ও এই শৌখিন সাহিত্যচর্চার সময়ে লেখা। 'অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স' বলার পেছনে একটা বিশেষ তুলনার পৃষ্ঠপট আছে : তাঁর সমসাময়িকদের অনেকেই, বিশেষত 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর লেখকরা, সাহিত্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন আরও তরুণ বয়সে। মনে পড়ছে, কল্লোলীদের এই তারুণ্যকে বিদ্রূপ করে শ্রীবলাহক নন্দী [শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী] 'শনিবারের চিঠি'-তে লিখেছিলেন, 'বয়সের কথা বলিতে-বলিতে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্টতা মনে পড়িল। দু-চার জন ব্যতীত বাঙ্গালী লেখকদের প্রায় সকলেরই বয়স ষোল হইতে ত্রিশের মধ্যে।...সুতরাং বাংলা সাহিত্য *under-graduate*-দের হাতে পড়িয়াছে, জীবনের *under-graduate*, বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।'

নিজেকে, নিজের ব্রতকে, শনাক্ত করার ব্যাপারে এই দীর্ঘায়িত বিলম্ব—অর্থাৎ 'জীবনের আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট' পর্বের মেয়াদ কাটিয়ে ওঠা নয়, বাড়িয়ে দেওয়া—অনেক অসাধারণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানীর আত্মবিকাশের ইতিহাসে মনস্তত্ত্ববিদরা লক্ষ করেছেন। সমাজ এবং নিজের জন্ম-জীবনের কাছে আত্মঋণ শোধের প্রক্রিয়া এইভাবে দীর্ঘদিন মুলতুবি রাখাকে প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ বিচিত্রভাবে কাজে লাগান, এটা হয়ে ওঠে তাঁদের অঙ্গ। তারাশঙ্করের আত্মবিকাশেও তাই দেখি। ধনী শ্বশুরকুল তাঁকে 'কখনও কানপুরে, কখনও কলকাতার আপিসে, কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন'। কিন্তু তিনি আত্মস্থও বোধ করেন নি, স্বস্তিও পান নি, এ ধরনের জীবিকায় ; আত্মতাবিহীন সাফল্যের পশ্চাদ্ধাবন যেন শাস্তি ব'লে মনে হতো তাঁর। তাই, 'প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারি নি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হই নি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।' তিনি নিজেই লিখেছেন, কয়লাকুঠিতে কাজের অভিজ্ঞতায় 'চৈতালী ঘূর্ণি'-র শ্রমিকদের ছবি এঁকেছেন। সেই অভিজ্ঞতা হয়তো 'ঘাসের ফুল' বা 'খাজাঞ্চীবাবু'-র মতন বিখ্যাত ছোটোগল্পেরও নেপথ্যভূমি।

৩

আবাল্য কী বিশ্বগ্রাসী আগ্রহে, তারাশঙ্কর নিজের গ্রাম আর গ্রামের মানুষকে দেখে আসছেন, তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা 'আমার কালের কথা'-র পাঠকমাত্রেই তা জানেন। যা দেখেছেন, তার কিছুই তিনি ভোলেন নি, তা দেশান্তরীণ রোম্যান্সের বর্ণবিভা জড়ানো বেদে-বেদেনী জাদুকর-জাদুকরী হোক, বা নিরেট কয়লার ব্যাবসায় ফেঁপে-ওঠা নব্য-ধনীর সঙ্গে জমিদারের বিরোধ হোক। প্রত্যক্ষণের এই আবাল্য-সঞ্চারিত আকাঙ্ক্ষা, বাস্তবতা পায় কাজের এবং দেশসেবার ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। 'উনিশ শো ষোল-সতের সাল থেকে উনিশ শো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে' তারাশঙ্কর ঘুরেছিলেন জমিদারি আর দেশসেবার কাজে। ছোট জমিদারি; তার চালনার ব্যাপারে বিষয়বুদ্ধির কিছু গরিমা তিনি করেছেন; কিন্তু এ-কাজেও তাঁর মন টেঁকে নি। তবে, জমিদারি-চালনার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে ভূমি-সম্পর্কের বিন্যাস তিনি যেমন বুঝে নিয়েছেন, তেমন পরিচিত হয়েছেন নানান ধরনের গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে, তাদের পেশার আর মনের সঙ্গে।

দেশসেবার সাংগঠনিক সুযোগ জোটে কৈশোরে সমাজ-সেবক সমিতির, এবং পরবর্তীকালে, কখনও স্থানীয় কংগ্রেসের, কখনও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফৎ। বাল্য থেকে বয়ঃসন্ধির উদ্যোগে-স্বাবলম্বনে উত্তরণ এবং পারিবারিক গণ্ডির বহির্বর্তী বড় পরিমণ্ডলে নিজের ভূমিকা ও পরিচয় শনাক্তকরণ শুরু হয় মধ্যরাতে অগ্নিত্রাণের একটি ঘটনায়, তারাশঙ্করের বয়স যখন তের-চোদ্দ। তাঁর ভাষায় সেই 'কৈশোর-জাগরণ'-এর বিবরণ উদ্ধৃত করি:

'আমাদের গ্রামে সমাজ-সেবক সমিতি নামে একটি সমিতি ছিল, নানা কাজের মধ্যে আগুন নেভানোর কাজ ছিল সব চেয়ে বড় কাজগুলির একটি। বালতি ছিল পঁচিশটা। · সেদিন রাত্রে [চিৎকারে] ঘুম ভেঙে উঠে বাড়ির ছাদে উঠে দেখলাম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে উত্তর দিকে। · কোথায় আগুন? বুঝতে পারছি না, বোধহয় মহুগ্রামে।·· চৈত্রমাস— চাল একেবারে শুকনো হয়ে আছে। ওদিকে আকাশে জ্বলন্ত খড়ের কুটি আগুনের শিখার বেগে হাউইয়ের মতো ছুটকে উঠে আকাশময় ছড়িয়ে জ্বলতে জ্বলতে ভেসে চলেছে।···মানুষের আর্ত-কলরব আমার মনে যেন একটা অলঙ্ঘনীয় আহ্বান এনে দিল।···হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। ছুটে নীচে নেমে এলাম। পিছনে মা পিসিমা বিস্মিত শঙ্কিত হয়ে আমায়

ডাকলেন, ওরে-ওরে। কিন্তু বারেকের জন্য—ক্ষণেকের জন্যও দাঁড়াই নি। সমবেত চেষ্টায় আগুনকে দাঁড়াতে হল থমকে, তারপর নিভল। নিভল যখন রাত্রি তিনটে। আমার গায়ে অনেক জায়গায় আগুনের আঁচে ফোস্কা পড়েছিল। কেটেও গিয়েছিল কয়েকটা জায়গায়। সেই আমার কৈশোর-জাগরণ, সেদিন বুঝতে পারি নি—আজ পারি। তবে পরের দিন থেকে আমি যে পাল্টে গিয়েছিলাম এটা অনুভব করতে পারতাম। মনে হত বড় হয়েছি আমি।'

ওপরের বৃত্তান্তে দুটো বিষয় লক্ষণীয়: অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা; যার সঙ্গে 'গণদেবতা'-র হরিজন পল্লীদাহের বর্ণনার বিলক্ষণ মিল। হয়তো, কৈশোর-জাগরণের সেই রাতে-দেখা গ্রাম-জ্বলার দৃশ্য, তারাশঙ্করের স্মৃতিতে অনপনেয় হয়ে যায়। তাঁর বড়-হয়ে-ওঠার বোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গ্রামে-গ্রামে জনসেবাকর্মের অনুশীলন।

সেবাকর্মের মধ্যে দিয়ে গ্রামের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের এই প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল দীর্ঘ দিন। 'বন্যাটা আমাদের দেশে হয় না এমন নয়, তবে কম। আগুন, ঝড় এবং কলেরা এই তিনটাই আমাদের অঞ্চলে সব চেয়ে বড় বিপদ। এরই মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা ছিল। বিশেষ করে ১৯২৪।২৫ সালে আমাদের অঞ্চলে যে ব্যাপক মহামারীর আক্রমণ হয়েছিল তাতে আমি অন্ততঃ আমাদের গ্রামের চারিপাশে ত্রিশ-চল্লিশখানি গ্রামে একাদিক্রমে ছ মাস ঘুরেছি, খেটেছি। এই সেবা আমার ব্যর্থ হয় নি। পাথরের দেবমূর্তি ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। এর খানিকটা আভাস আমার 'ধাত্রীদেবতা'-র মধ্যে আছে।' এর আভাস শুধু 'ধাত্রীদেবতা'-য় নয়, 'গণদেবতা'-তেও রয়েছে, এবং রয়েছে পূর্ণতর দ্যোতনায়। এমন কি, 'পুতুলের মতো অচেতন মানুষগুলির' মধ্যে দেবতা-স্বরূপ চেতনা জেগে-ওঠার এই উপমাও দুবার ব্যবহৃত হয়েছিল 'গণদেবতা'-র প্রথম পাঠে।

কিন্তু এই জনসেবা আর প্রত্যক্ষ রাজনীতির কাজ তীব্র 'নেশা' জাগালেও, তারাশঙ্কর একে ঠিক নিজের কাজ বলে সনাক্ত করতে পারেন নি, শেষ পর্যন্ত। হয়তো, তাই থেকে-থেকে 'মনের মধ্যে জেগে' উঠত 'সেই অশান্ত। যে জাগলে মানুষের আর নিষ্কৃতি নেই।' তখন 'কাঁধে বোঁচকা বেঁধে' বেরিয়ে পড়তেন: 'আমি গ্রামে গ্রামান্তরে মেলায় ঘুরেছি অনেক।'

কখনও চাষীদের বাড়িতে অতিথি হয়েছেন, কখনও হয়তো আশ্রয় নিয়েছেন গাছতলায়।

এমনি করে চাষীর সঙ্গে, এমন কি বাগদি বাউরি কাহার ডোম সাঁওতালদের সঙ্গেও, ক্রমে-ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। 'আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালবাসার জন'—আত্মচরিতে তারাশঙ্কর এই যে একাত্মতার বড় দাবি পেশ করেছেন, তাঁর সাহিত্যের গভীরতর রূপান্তর-রূপায়ণের বিশ্বে সেটা কতদূর মূর্ত, এ নিয়ে হয়তো মতান্তর হতে পারে, কিন্তু যা অনস্বীকার্য তা হচ্ছে: শ্রমজীবী কৃষকের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার, ভালোবাসার উন্মুখতা। এই উন্মুখতাকে পুষ্টি, রাজনৈতিক অন্তঃসার জুগিয়েছিল জাতীয় আন্দোলনের গণবাদী (populist) আইডিয়লজি। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধিজির আবির্ভাব হয় ১৯১৭ সালে, চম্পারণ সত্যাগ্রহে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯২০ সালে। তারপর থেকে, সাধারণ লোক, গ্রামের চাষী, বিপুলতর সংখ্যায় আন্দোলনে সামিল হতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় মুক্তি-সংগ্রামের গণভিত্তি যেমন বাড়তে থাকে, আন্দোলনের চেতনাস্তরেও তেমন চারিয়ে যায় কৃষক-মজুর-সাধারণ মানুষ সম্পর্কে নতুন ইমান।

ফলে সেদিন দেশের হাওয়াতেই উঠেছিল একটা নতুন ঢেউ। যে-কালে দেশের অবিসংবাদী নায়ক কৃষকের সঙ্গে ঐকাত্ম্য চাইছেন, সে-কালে সাহিত্যিকও যে এই সাযুজ্যের সন্ধান করবেন, এ তো স্বাভাবিক।

চাষীর সঙ্গে সাযুজ্যসন্ধান বাংলা উপন্যাসের বিষয়ে-বিন্যাসে বাস্তবতা-পরিগ্রহণের জন্যেই আবশ্যিক ছিল। এদিক দিয়ে বীরভূমের ভূগোল আর পরিবেশ হয়তো তারাশঙ্করকে সহায়তা করে থাকবে। একদিকে রাঢ়ের প্রখর উজ্জ্বল রূঢ় রোদ আর কঠোর মাটি; অন্যদিকে সদ্‌গোপ-বাউরি-সাঁওতাল চাষীর প্রাত্যহিক স্বেদাক্ত শ্রম—এই আদিম, দৈনন্দিন দৃশ্যে মনকে চোখ ঠারার অবকাশ ঈষৎ কম। যে-লেখক এই আবেষ্টনীতে ক্রমে-ক্রমে বড় হয়েছেন, অবারিত বাস্তব-প্রত্যক্ষণ তাঁর প্রায় নিত্য-অভ্যাস হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। এই রোদ (ঝড়-বৃষ্টি), মাটি আর কৃষক তাঁর সাহিত্যের মূল স্বর রূপে বারবার ঘুরে এসেছে। এখানে মাটি আর রোদের প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি। কলকাতা শহরের পটভূমিতে লেখা একটি গল্পে দেখি, চরিত্র বিশেষের উপমান খুঁজতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে যায়, দেশের মাটির কথা: 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আমার দেশের মাটির কথা, সেখানে দেখেছি এক-একটা যায়গায়

মাটি মরে পাথর হয়ে যায়। বর্ষার জলে মাটি ধুয়ে গিয়ে পড়ে থাকে বালির রাশি—ক্রমে সেই বালি জমে এক অখণ্ড পাথরের স্তরে পরিণত হয়, ঘাস জন্মায় না, সামান্য অসাবধানতায় তার উপর পদক্ষেপ একটু অসতর্ক হলেই হিংস্র জানোয়ারের মতো দাঁত বসিয়ে রক্তপাত করে দেয়··'। রাঢের মাটির এই জান্তব ছবির পাশে, বাংলা গল্প-উপন্যাসে মাটির অভ্যস্ত বর্ণনা যদি মনে-মনে স্থাপন করি, তাহলে বুঝে নিতে পারব, তারাশঙ্করের আবেষ্টনীর এবং প্রত্যক্ষণের বিশিষ্টতা। রাঢের আগ্নেয় রোদ, চাষীদের সঙ্গে তাঁর অবাধ মেলামেশার একটা শারীরিক সুবিধেও করে দেয়ঃ 'একটা বড় সুবিধা ছিল আমার। রূপ আমার ছিল না, যেটুকু লাবণ্য বা শ্রী ছিল সেটুকুও রৌদ্রে ঘুরে-ঘুরে এমনই পুড়ে গিয়েছিল যে কর্কট [কর্কোটক] নাগ বিষজর্জর নল রাজার সারথ্যকর্ম গ্রহণের সুযোগের মতো আমিও পেয়েছিলাম ওদের [চাষীদের] সঙ্গে সমান হয়ে মিশবার সুযোগ। ওদের কথাবার্তা আচার-ব্যবহার সব জেনেছিলাম সেদিন—ওদেরই একজনের মতো।' সেই রোদে-পোড়-খাওয়া 'তারাশঙ্করকে প্রথম দর্শনে (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভেবেছিলেন এক সাঁওতালি যুবক।'

এই ভালোবাসা আর সাযুজ্যসন্ধান খুলে দেয় প্রত্যক্ষণের দ্বার। 'দু চোখ ভরে দেখেছি'—তাঁর এই উক্তি অলীক অহংকার নয়। গ্রাম আর গ্রাম্য মানুষের অজস্র টাইপ; পল্লীসমাজের উৎপাদন-কাঠামো এবং তার দ্বন্দ্ব; ক্ষয়িষ্ণু গ্রামে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঢেউ; পালা-পার্বণ-ব্রত-গাজনের দ্বারা পরিমাপ্য কালপঞ্জী, প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে মানুষের নিয়তির টানাপোড়েন—এই ধরনের উপাদান নিয়ে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর প্রত্যক্ষণের মৌল সঞ্চয়। তারাশঙ্করের এই দৃশ্যলোকের কালাঙ্কঃ ১৯১৬-১৭ থেকে ১৯৩০-৩১। আর স্থানাঙ্কঃ লাভপুর-সন্নিহিত রাঢভূমি। এই মৌল সঞ্চয়, সাহিত্যে বিনিয়োজন-রূপান্তরণের জন্যে অপেক্ষা ছিল একটি ব্যক্তিগত তীব্র উদ্ভাস-মুহূর্তের, জয়েস যার নাম দিয়েছেন 'এপিফ্যানি' (আবিঃ), যখন দৃশ্যের সঙ্গে দৃষ্টি নীত হবে যথাযথ ফোকাসে আর আত্মপ্রকাশ করবে দৃশ্যের অনাবরণ স্বরূপ। দৃশ্য বা বিষয়ের এই যে অন্তর্মোচন একে আমরা অন্যভাবে বলতে পারিঃ আইডিয়লজি ও অভিজ্ঞতার অন্যোন্য রূপান্তরের ক্রান্তিবিন্দু। তারাশঙ্করের বোধের, ব্যক্তিত্বের, এই ক্রান্তিবিন্দুতে পৌঁছানোর বিবরণে এবারে আমরা এসে পড়লাম।

৪

আকৈশোর সাহিত্য আর রাজনীতি ছিল তারাশঙ্করের দুই আকর্ষণ-বিন্দু; এর মধ্যে কোনটা জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে, ১৯৩০ পর্যন্ত তা অনেকটা অনিশ্চিত রয়ে যায়। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে সিউড়ি জেলে তিনি সাহিত্যচর্চাকে স্বব্রতরূপে নির্ধারণ করলেন নিশ্চিতভাবে; আর স্থির করলেন, দেশসেবাও করবেন তিনি সাহিত্যেরই মারফৎ। এই সিদ্ধান্ত ১৯৩০ সালে নিলেও পেশায় লেখক হতে তাঁর লেগে গেল আরও প্রায় তিন বছর (১৯৩৩)।

এই পিছুটান কেটে যায় কতকগুলো আকস্মিক ঘটনার ধাক্কায়। সবগুলির বৃত্তান্ত আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, এখানে শুধু তিনটি ঘটনার উল্লেখ করলেই চলবে। তার মধ্যে প্রবল এবং প্রধান হচ্ছে: ১৯৩২ সালের নভেম্বরে (৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) তাঁর ছ-বছরের মেয়ে বুলুর মৃত্যু। তারাশঙ্করের আট বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়; তখনও 'সে আঘাত অনুভব করার মতো স্পর্শশক্তি হয় নি' তাঁর মনের। তারপর এই প্রথম মৃত্যুশোক। তারাশঙ্করের বোধের বিকাশে গাঢ় প্রভাবসঞ্চারক, 'অতি অতি পবিত্র', এই প্রথম শোক যা ঘটালো, তাকে হয়তো রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বলা যায় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'—আকস্মিক তীব্র-গভীর এক অপরোক্ষ-অনুভব, যাতে চোখের ওপর থেকে পর্দা সরে যায় আর প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে বহির্বিশ্ব, চতুষ্পার্শ্বের মানুষ, দৃশ্যের সঙ্গে দ্রষ্টার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার একটা মৌলিক তফাৎ প্রথমেই লক্ষ করা দরকার। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির উন্মীলন ঘটে প্রকৃতির প্রসাদে। আর, তারাশঙ্করের: মৃত্যুর বিষাদে। তাই, সদর স্ট্রিটে সেদিনের সূর্যোদয়ের অভিভব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'দেখিলাম,·· বিশ্বসংসার আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।' বিপরীত পক্ষে, উন্মীলনের মুহূর্তে তারাশঙ্কর অনুভব করলেন: 'অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব'।

রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর সদর স্ট্রিট-ঘটিত অভিজ্ঞতার অন্তর্দর্শী বিবরণ লিখেছেন, তারাশঙ্কর কখনোই তা করেন নি। তবে, 'জীবনপ্রবাহের মোড় ফিরে' যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা, তাঁর রচনাবলীতে বহুস্থানে উল্লেখিত।

যেমন, 'বাণী মা' গল্পে বুলুর মৃত্যুর সরাসরি উল্লেখ করে লিখেছেন এই শোকের সংঘর্ষে 'নারিকেলের ছোবড়া ও খোলার মতো হৃদয়ের আবরণটা' ভেঙে যাওয়ার অনুভব হয় তাঁর। এবং নিজের এই বেদনার মধ্যে দিয়ে 'মানুষের বেদনাকে যেন বুঝতে পারলাম'—এ-কথা তিনি বলেন, তাঁর পঞ্চাশ-বর্ষ-পূর্তি উৎসবে। এই ধরনের প্রকীর্ণ উল্লেখ থেকে, এগুলিকে কিছুটা সম্বন্ধ-বিন্যস্ত করে নিয়ে, আমরা হয়তো বুঝে নিতে পারি, তাঁর অভিজ্ঞতার তাৎপর্য। অনুমান করি : তিনি যাকে বলেন, 'তন্ময়তার যোগ', যখন গল্পের 'পাত্রপাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী', নৈরাত্ম্যসিদ্ধির সেই প্রক্রিয়া হয়তো প্রকৃতভাবে শুরু হয়, এই তীব্রতম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিঘাতে। তাঁর নিজের এই শোক খুলে দিল অন্যের মনের বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ; ব্যক্তিগত শোক রূপান্তরিত হল নৈর্ব্যক্তিকবোধে। হয়তো তাই, কন্যার মৃত্যুর আগে-লেখা অধিকাংশ গল্প ('রসকলি'-র মতো দু-একটি বাদে) নিষ্প্রাণ ; কিন্তু এই ঘটনার পরে—১৯৪৭ অবধি তো বটেই, তার পরেও আরও কয়েক বছর—যে-সব ছোটগল্প তিনি লেখেন, ভালোত্বের তারতম্য থাকলেও, তার সবগুলিই প্রাণিত। যে-গল্প থেকে এই বিভাজন-রেখার শুরু, তা হচ্ছে 'সন্ধ্যামণি' ('বঙ্গশ্রী', প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯)। এখানে স্মর্তব্য, বুলুরও ভালো নাম ছিল সন্ধ্যা। বুলুর 'মৃত্যুর অব্যবহিত পরে' সমাপ্ত এই কাহিনীর পটভূমি : উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট, আর ঘটনাবিন্যাসের কেন্দ্র : শিশুকন্যার মৃত্যু। 'সন্ধ্যামণি'-তে 'কন্যাহারা উদাসী নায়কের যে অন্তর-বেদনা ফুটে উঠেছে সে আমারই বেদনা।'

নৈরাত্ম্যসিদ্ধির এবং আঙ্গিকচর্চার দিক দিয়ে 'সন্ধ্যামণি' তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনে ক্রান্তি-চিহ্ন। এই সূত্রে আর-একটি বিষয় লক্ষিতব্য : তারাশঙ্করের আখ্যান-কাঠামোয় সন্তানের অকাল মৃত্যুর মোটিফ—অস্তিত্বের পরিধি-থেকে-কেন্দ্র-পর্যন্ত হানা-দেওয়া সেই অনন্ত রাত্রির ইঙ্গিত হয়ে—অনেকবার ঘুরে আসে। 'গণদেবতা'-য় দেবুর শিশুপুত্রের কলেরায় মৃত্যুর ঘটনা এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে। কিন্তু উপন্যাসগুলোকে যদি আপাতত এই গণনা থেকে বাদ দি, তাহলে 'বায়রাড়ি' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩), 'ব্যাঘ্রচর্ম' (আনন্দবাজার পত্রিকা, দোলসংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৩), 'সন্তান' (শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪), 'বোবাকান্না' (আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫১)—এই রকম

আরও ছোটগল্পে এই মোটিফের উদাহরণ পাওয়া যাবে। তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন 'ছলনাময়ী'-র উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন: 'আমার বুলুরাণী সন্ধ্যামণি মামণি / আমার সোনার মেয়ে—/ মরণের অন্ধকারে যে আমার হারাইয়া গেল / তাহার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিলাম।'

এই উৎসর্গে (এবং আত্মস্মৃতিতে) প্রথম শোক বিষয়ে আবেগের কিছু প্রগল্‌ভতা হয়তো প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু তদানীন্তন গল্পে তিনি অনেকটা নিরুচ্ছ্বাস, নৈর্ব্যক্তিক। হারিয়ে-যাওয়াকে যদি পূর্বোক্ত মোটিফের রূপান্তর হিশেবে দেখি, তাহলে 'মেলা'-য় (বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪০) তার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাব। মেলায় যে-মেয়েটি হারিয়ে যায়, তার নাম মণি, আর, সে-ও 'ছয়-সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে'। সন্ধ্যামণির সঙ্গে মণির এইসব মিল হয়তো আপতিক; তবে এই হারিয়ে-যাওয়ার অভিঘাত আমাদের মনের উপর ক্রিয়াবান হতে থাকে। আসলে, এই হারিয়ে-যাওয়ার ঘটনার পরেই হঠাৎ আমূল বদলে যায় আখ্যানের স্তর: মেলার অনুপুঙ্খময় তথ্যচিত্র মুহূর্তে আক্রান্ত হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক বেদনায়। বাংলা সাহিত্যের পাঠক হয়তো 'মেলা'-কে সংলগ্ন করে নিতে পারবেন রবীন্দ্রনাথের 'হারিয়ে-যাওয়া' আর বিষ্ণু দে-র 'বামী' কবিতার সঙ্গে, কতকটা একই অনুষঙ্গ-মণ্ডলে।

'ব্যাঘ্রচর্ম' এমন একটা গল্প, যার সঙ্গে শোকের কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই; বরং একটা সরল হাসির গল্পের যাবতীয় উপাদান এতে ছিল। গল্পের নায়ক হচ্ছে রতন হাড়ী। 'ছয় ফুট, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এক জোয়ান, তেমনি পরিপুষ্ট দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, চোখ দুটো করমচার মতো রাঙ্গা, লোকটার হাতে তাহারই দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দীর্ঘ একগাছা লাঠি। কপালে প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ।' এই বিভীষণ চেহারা নিয়ে সে পেশাদার ষণ্ডামার্কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। রতন কোনও বাঁধা কাজ করে না, সে 'ফ্রি লান্স' লেঠেল। জমিদারদের হুকুম-মতো 'দাঙ্গা-দখল পেজাশাসন' করে থাকে। লোকে তাকে দেখলে কাঁপে, নামে ডরায়; কারণ তারা জানে, ফরমাসমাফিক নরহত্যা গৃহদাহ ইত্যাদি কাজে সে দক্ষ। কিন্তু এ-সবই তার বাগাড়ম্বর, আস্ফালন। আসলে সে হিংসায় অক্ষম। শৌখিন-শিকারী, জমিদার হেমাঙ্গবাবুর গুলিতে একটি অন্তঃসত্ত্বা খরগোস মারা গেলে সে সারা সন্ধ্যা কাঁদে। নকল ষণ্ডামার্কের ভূমিকা তার বেঁচে-বর্তে থাকার কৌশলমাত্র। গল্পের উপসংহারে আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করি:

বছর দশেক আগে দেশে এমন অজন্মা হয় যে না-খেয়ে মানুষ মরতে থাকে। দীর্ঘ উপবাসে শরীরে বল ছিল না রতনের, খাটতেও পারত না, ভিক্ষা-ও কেউ তাকে দিত না। তার ওপর, একমাত্র ছেলেটার হল অসুখ। শেষে, রতন এক জমিদারের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চায়। 'সেখানেও ভিক্ষে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। পথে আসতে আসতে আবার ফিরলাম। জমিদারকে গিয়ে বললাম, ভিক্ষে দেন—না হয় কাজ দেন। জমিদারবাবু বললেন, কি কাজ পারিস তুই? মরিয়া হয়ে বললাম—যা বলবেন, খুন, জখম, ঘরে আগুন লাগান—যা বলবেন, তাই করব। আশ্চর্য বাবু, জমিদার বাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা টাকা বকশিশ দিলেন। ছেলেটা মরে গেল সেই অসুখেই, আমি কিন্তু ফন্দিটা শিখে নিলাম।'

ইংরেজি *buffoon*-এর 'বাগ্‌জীবন' এই প্রতিশব্দ বানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রতন হাড়ী উভয় অর্থেই বাগ্‌জীবন। অন্য কোনও লেখক হয়তো রতনের অসংগতি নিয়ে রঙ্গ করতেন। তারাশঙ্করের গল্প শেষ হয়, পেটের ভাত জোগাড়ের ধান্দায় গ্রামের ভূমিহীন শ্রমজীবী ভাঁড় হয়ে যাচ্ছে, এই ইতিহাসের প্রত্যক্ষণে। হাসির আবেগ স্তব্ধ করে দেয় আবার সেই অনন্ত রাত্রির সঞ্চার।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনার বিষয় আর বিন্যাসের নানান বিচিত্রতার মধ্যে যা সাধারণ সূত্রের মতন বিদ্যমান, তা হচ্ছে, এই রাত্রির অস্তিত্ব; যার কখনো-প্রকাশ্য-কখনো-প্রচ্ছন্ন সঞ্চরণ টের পাওয়া যায় তাঁর অনেক ছোটগল্পে; 'কবি' এবং 'আরোগ্য নিকেতন'-এর মতো ভিন্নধর্মী রচনায় অথবা 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম' আর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র মতো বিপরীত জাতের উপন্যাসে। এই বেদনা আখ্যানের গূঢ়স্তরে, চরিত্রায়ণে, প্রতিমায়, স্বরভঙ্গিতে বিকীর্ণ। এই বিষাদ, এই শূন্যতার সত্তাগত ও সামাজিক স্তরে শিকড় কোথায়? তাঁর এই প্রত্যক্ষণ শেষ পর্যন্ত প্রত্যয়ে, বিশ্ববীক্ষায় দানা বাঁধে কি-না?—এই প্রশ্ন যদিও প্রাসঙ্গিক, তার উত্তর খোঁজা ঠিক এই প্রবন্ধের পরিধির মধ্যে পড়ে না।

ছেলেবেলায় এক পক্ষীমাতার শোকে প্রথম পদ্য লিখেছিলেন তারাশঙ্কর, আর ৩৪ বছর বয়সের এই কন্যাশোক তাঁকে চূড়ান্তভাবে ঠেলে দিল কথাসাহিত্যের চর্চায়। 'আমার সমগ্র জীবনে এই আঘাত একটা পরিবর্তন এনে দিলে।...আমার জীবনে চলার পথে যে দু-নৌকায় দু-পা রেখে চলা তাতে ছেদ পড়ল। একখানা নৌকাকেই আশ্রয় করে হাল ধরলাম।'

দ্বিতীয় যে-আঘাত তাঁকে সাহিত্য-তরণীর আশ্রয় নিতে তাড়িত করে, সেটা আসে লাভপুরের 'শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী' পরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বিরোধের সূত্র ধরে। কয়লার ব্যাবসা থেকে জমিদার-হয়ে-ওঠা এই পরিবারের সঙ্গে লাভপুরের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন জমিদারবাড়ির—তারাশঙ্কর-পরিবারেরও—দ্বন্দ্ব এক-পুরুষ আগে শুরু হয়। ১৯৩২ সালে তারাশঙ্কর যে-বিরোধে জড়ান, তা গজিয়ে ওঠে, কোনও বিলেত-ফেরৎ পাত্রের সঙ্গে ঐ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিবারের আত্মীয়, শ্রীকালীকিংকর মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষ করে। এই বিরোধে শেষ পর্যন্ত জিতলেও, তিনি উত্ত্যক্ত হয়ে লাভপুর আর তার বৈষয়িক-সামাজিক ঘোঁট থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন।

তৃতীয় যে-তাড়না তাঁকে 'এই মোড় ফেরার গতিবেগ যুগিয়েছিল', তা আসে পুলিশের তরফ থেকে। 'উনিশ শো তেত্রিশ সাল বীরভূমের রাজনৈতিক কর্মীদের জীবনে দুর্যোগের কাল'। সারা জেলায় রাজনৈতিক প্রতিবাদ নির্মূল করে দেওয়া ছিল তদানীন্তন ইংরেজ শাসকদের নীতি। দোহা তখন বীরভূমের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট; ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই দমন-নীতি তামিল করার ব্যাপারে যাঁর ছিল, যাকে বলে, অতি উৎসাহ। 'যে যেখানে কর্মী ছিল, তাদের জালে ফেলে গুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন দোহা সাহেব। এবং দোহা সাহেবের কিছু নেকনজর আমার ওপর ছিল। আমার পেছনে স্পাই লাগলো।' রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে জড়ানোয় কসুর ছিল না দোহার দিক থেকে। তারাশঙ্করকে লাভপুর থানার এক সাব-ইনস্পেক্টর 'ইঙ্গিতে বলেও দিলেন, বীরভূম থেকে সরে যান আপনি'। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে কলকাতা-বাসের বিশ্বাস্য কারণ খাড়া করতে হয় তারাশঙ্করকে। গল্প লিখে জীবিকার্জন করেন, এ প্রমাণ করা সহজ নয়। তাই স্থির হলো: ' 'শনিবারের চিঠি'-র মাইনের খাতায় আমার নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে। মাইনে অবশ্য আমি নেব না; এবং কুড়ি টাকার অধিক বলে খরচ দেখানোর বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যে এক আনার টিকিট লাগে সেটাও আমি দেব।' এইভাবে 'তিনি কিছুকালের জন্য 'শনিবারের চিঠি'-র সহ-সম্পাদকের ভোল গ্রহণ' করেন।

ওপরে যে-তিনটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছি, তার প্রথমটি ব্যক্তিগত, দ্বিতীয়টির জট বাঁধা লাভপুরের বৈষয়িক-সামাজিক জীবনের সঙ্গে আর

তৃতীয়টি রাজনীতি-সম্পৃক্ত। ঘটনাপুঞ্জের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় পুরাতন বাঁধনগুলোর এই ত্রিমাত্রিক গ্রন্থি খুলে ফেলা সহজ হল তারাশঙ্করের পক্ষে। এর পর তাঁর সামনে খুলে গেল: আঙ্গিকের ক্রমার্জিত ব্যুৎপত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ইতিহাস-সমাজের সংলগ্ন পটে আত্মপরিচয় এবং ঐকাত্ম্য (identity) খুঁজে পাওয়ার নতুন পরিপ্রেক্ষিত।

৫

এবারে কর্মকেন্দ্র সরে এল লাভপুর থেকে কলকাতায়।

১৯৩৩ সালে তারাশঙ্কর 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের কপিরাইট শৈলজানন্দের সাহায্যে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্সকে বেচে দিয়ে একশো টাকা জোগাড় করলেন। 'বঙ্গশ্রী' থেকে 'মেলা' গল্প বাবদ পেলেন পনেরো টাকা (সেকালের তুলনায় স্ফীত দক্ষিণা), আর 'ভারতবর্ষ' থেকে 'ডাইনীর বাঁশী'র জন্যে দশ টাকা। মা আর পিসিমার হাতে টাকাগুলি দিয়ে বললেন, 'রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শনে যাবার ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। এই টাকায় তোমরা পুরী যাও। রথের দড়ি টেনে কামনা কর যেন আমার যাত্রা কোন-দিন না থামে।' তারপরে, একখানি টিনে-ছাওয়া ছোট ঘর, মাসিক পাঁচ টাকায় ভাড়া নিলেন মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে—অশ্বিনী দত্ত রোড, মহানির্বাণ রোড, মনোহরপুকুর রোডের মোড়ের কাছাকাছি। 'জগন্নাথের রথের চাকায় বাঁধা জীবন চলতে শুরু হল।.....ভূমিকা-পর্ব শেষ করে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল।'

'পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন' শুরু হওয়ার প্রসঙ্গে এই যে রথযাত্রার ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের উপমান দুবার ফিরে আসা, এটা সকলেই লক্ষ করবেন। 'গণদেবতা'-র শেষে এবং 'পঞ্চগ্রাম'-এর শুরুতে রথযাত্রার প্রতীক ব্যবহার, এই সূত্রে অনেকের হয়তো মনে পড়বে। শ্রেয়োমুখী মৌল পরিবর্তনের দিকে যে পদক্ষেপ, তার অনুষঙ্গে তারাশঙ্করের অবচেতনায় রথযাত্রার উপমা জেগে উঠেছে বারংবার।

মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনের বস্তিসংলগ্ন সেই টিনের ঘরে নিজের সাহিত্য-চর্চার আসনখানি পাতলেন তারাশঙ্কর। লিখতে শুরু করলেন প্রাত্যহিক কঠোর কঠিনে, নিষ্ঠায়। তাঁর সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার যা লিখেছেন, অমিতোক্তি-বহুল 'কল্লোল যুগ'-এ তা (অন্তত সেদিনের তারাশঙ্কর বিষয়ে) প্রায়-যথাযথতার দৃষ্টান্ত: 'নিষ্ঠার আসনে অচল অটল সুমেরুবৎ বসে আছে

তারাশঙ্কর...সম্প্রতি এত বড ইষ্টনিষ্ঠা দেখি নি আর বাংলা সাহিত্যে।' অসাধারণ নিষ্ঠায় সাহিত্যচর্চাকে শৌখিনতা থেকে বিমুক্ত করে নিয়ে, তাকে দিলেন ব্রতচর্যার চেহারা আর এইভাবে আত্মসংগঠন ও আত্মবিকাশের পথ বানালেন তারাশঙ্কর। এই সূত্রে যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য স্বাভাবিক-ভাবে মনে পড়ে। বহু বিষয়ে এঁদের মিল: যেমন, দুজনেই ব্যক্তিগত স্টাইলের সামাজিক শিকড় খুঁজেছেন মধ্যবিত্ত চৌহদ্দির বাইরে—লোকায়ত মানসে, জীবনযাত্রায়। কিন্তু, ঠিক এই মুহূর্তে যে-কথা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে: জীবন-যাপনের বিন্যাসে এঁদের সহধর্মিতা। বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামের বনেদি জমিদার-বাড়ি থেকে কলকাতায় চলে এসে যামিনী রায় নিজেকে নিবিষ্ট করেছিলেন নিষ্ঠাময় নিয়মিত শিল্পচর্চায়। যামিনী রায় একদা বলেছিলেন, জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদি অনেকেরই প্রতিভা ছিল; কিন্তু একমাত্র রবীন্দ্রনাথই শিল্পকর্মকে গ্রহণ করেছিলেন পেশা বা বৃত্তি হিশেবে। এই দৃষ্টিমান মন্তব্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশেষত্ব যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমন এ-থেকে বৃত্তি-বিষয়ে যামিনী রায়ের নিজস্ব মনোভাবেরও পরিচয় পাই আমরা। বৃত্তিচর্যা যে কী জিনিস, যামিনী রায়ের দিনযাপন তার দৃষ্টান্ত। প্রতিদিন সকাল থেকে আরম্ভ হতো তাঁর কাজের রুটিন, থামতেন ক্লান্ত হবার পর। প্রত্যেক দিন তাঁর কাজ চলত বিক্ষেপহীন—'ঘটনার সব উত্থান পতন ও সাময়িক সব সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সমতালে'। ভাস্কর বা শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে দীক্ষা গ্রহণ করছেন কোনও কবি বা সাহিত্যিক—সংস্কৃতির ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল নয়। আমরা জানি, বর্দা-র প্রাত্যহিক কাজ করার দৃষ্টান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, নিজেকে পালটেছিলেন, বিলকে। হয়তো, যামিনী রায়ের এই ব্রতপালনের মতো দিনযাপনের উদাহরণ থেকে তারাশঙ্কর প্রেরণা পেয়েছিলেন—যেমন, পেয়েছিলেন তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর লেখক, বুদ্ধদেব বসু। ঘটনাচক্রে, ১৯৪০ সালে যামিনী রায়ের নিকট-প্রতিবেশী হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। বাগবাজারের গলিতে সেই সাহচর্য থেকে তারাশঙ্কর যে কত লাভবান হন, তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। কিন্তু তারও ৭/৮ বছর আগে, প্রথম পরিচয়ের দিনেই, যামিনী রায় তাঁকে কলকাতায় চলে এসে লেখক-বৃত্তির কৃচ্ছ্রতা আর বিনয়, পালনের প্রবোচনা দিয়েছিলেন: 'শ্মশান না হলে শব-সাধনা হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়োজন হয়। এ যুগে কলকাতাই হল

সাহিত্যের শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, এক বেলা খেয়ে থাকুন—তবে পাবেন।'

তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতি থেকে এই 'টিনের ছাউনি ঘরে' প্রাত্যহিক সাহিত্যচর্যার বিবরণ উদ্ধৃত করি :

'কল-চৌবাচ্চা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম, ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি ক'রে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হত। আসবাব কিছু ছিল না, একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য জিনিস থাকত ; মেঝের উপর শতরঞ্জি পেতে, সুটকেস টেনে সেইটিকেই রাইটিং ডেস্ক হিসাবে ব্যবহার করতাম।

'সকাল বেলা গৃহকর্ম সেরে লিখতে বসতাম, বেলা বারোটা নাগাদ স্নান সেরে লেখা বগলে বেরিয়ে যে কোন পাইস হোটেলে খেয়ে নিয়ে কাগজের আপিসে হাজির হতাম।...

'এই ঘরখানিতেই কাটিয়েছিলাম প্রায় দেড় বছর। এরই মধ্যে অনেকগুলি ভাল গল্প এবং উপন্যাস লিখেছিলাম। 'শ্মশান বৈরাগ্য', 'ছলনাময়ী', 'মধুমাষ্টার', 'ঘাসের ফুল', 'ব্যাধি', 'রঙীন চশমা', 'জলসাঘর', 'বাঘবাড়ি', 'টহলদার' 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'ট্যারা', 'তারিণী মাঝি', 'প্রতীক্ষা'—আরও দু-চারটি গল্প এখানেই লিখেছিলাম। এই সময় আরো একটি গল্প লিখেছিলাম, 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'—'দুই পুরুষের' বীজ। আরেকটি গল্প লাভপুরে লিখেছিলাম—'নারী ও নাগিনী', পূজা সংখ্যা 'দেশ'-এর প্রকাশিত হয়েছিল। 'আগুন' উপন্যাসও এই ঘরে লেখা। তবে 'আগুন'-এর খসড়া তৈরি করেছিলাম বেহার প্রদেশের মগমা নামক স্থানে ; বেহার ফায়ার ব্রিকস কারখানায়।

'খরচ, মাসে পঁচিশ-তিরিশ টাকার বেশি নয়। তাও সব মাসে কুলোয় না। যে মাসে টাকা ফুরোয়, সে মাসে তিনটে টাকা থাকতেই লাভপুরে রওনা হই। আবার কিছু লিখে, কোনক্রমে দশটা টাকা যোগাড় করে কলকাতা রওনা হই এবং কাগজের আপিসে আপিসে ঘুরে সেগুলি দাখিল করে আসি আর অনুরোধ জানাই যাতে সেই মাসেই প্রকাশিত হয়। তা হলেই টাকাটা পাব।'

এই সময়ে কখনো-কখনো 'সারা দিন না খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত' লিখেছেন তিনি।

'কৃচ্ছ্র' শব্দের একটা অর্থই হচ্ছে : কষ্টসাধ্য ব্রত। এই কৃচ্ছ্রসাধনে শুধু কষ্ট নয়, আনন্দও পেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। সেই দিনগুলির স্মৃতিচারণ সূত্রে লিখেছেন : 'এই সময়টুকুর স্মৃতি আমার মনে পরম রমণীয়'। আবার : 'মনে ক্ষোভ ছিল না এ বলব না—তবুও ওই গৌরববোধের তুলনায় সেটা অকিঞ্চিৎকর'। স্ববিরোধী শোনালেও কথাগুলো সত্য। যতই দুর্ভোগ পোয়াতে হোক, মনের মতন কাজ পেলে, তাতে আনন্দ আছে। তার ওপর, তারাশঙ্কর যে-কাজে লিপ্ত হলেন, তা তাঁকে স্থিত করল তাঁর স্বধর্মে, আত্মস্থতায়। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, যারা ঐকাত্ম্যের সংকট-পেরোনোর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে স্বধর্ম খুঁজে পায়, ইহজীবনে তাদের যেন দ্বিতীয় জন্ম ঘটে। পঁয়তিরিশ বছর বয়সে এই বিলম্বিত দ্বিতীয় জন্মে, দ্বিজত্বে উত্তরণের আনন্দ, ব্যক্তিস্বরূপ আবিষ্কারের এই তীব্র সুখ—এর কাছে গৌণ হয়ে যায় তাঁর ব্রতপালনের ক্লেশ। আর, নিজের কেন্দ্র খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল তাঁর স্নায়ুর শক্তি-উৎস। শুধু ছোটগল্পের যে-তালিকা নীচে দেওয়া হল, তা থেকে ১৮৩৩-পরবর্তী এই বর্ধিষ্ণু সৃষ্টিশীলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। স্মর্তব্য, ১৯৩৩-৩৮ সালের মধ্যে পাঁচটি উপন্যাসও তারাশঙ্কর প্রকাশ করেন।

সাল	প্রকাশিত ছোটগল্প
১৯৩১	৩
১৯৩২	৩
১৯৩৩	১০
১৯৩৪	১২
১৯৩৫	৮
১৯৩৬	১৫
১৯৩৭	১৫
১৯৩৮	১৩

• এই প্রক্রিয়া চলতে-চলতে সৃষ্টির জোয়ার নামল ১৯৪১-৪২ সালে, যখন তিনি সাত-আটখানি ছোটগল্প; দুইটি নাটক, একটি একাঙ্কিকা ছাড়া লিখলেন 'কবি' আর 'গণদেবতা'। কিছুটা সময়ে এই দুখানি বই একই সঙ্গে লেখেন তারাশঙ্কর। একটানা লেখায় এক 'অদ্ভুত মগ্নতা'-র অনুভূতি তিনি নিজেই খুশি মনে স্মরণ করেছেন পরবর্তীকালে। 'তখন হাতের জোর ছিল

অসাধারণ। অন্তত দিনে এক ফর্মা দেড় ফর্মা অনায়াসে লিখে যেতে পারতাম। 'গণদেবতা'-র ভাবনা কল্পনা সব কিছু সুসম্পন্ন আয়োজনের মত মনের মধ্যে থরে থরে সাজানো ছিল। সে দিক দিয়েও "গণদেবতা" রচনায় গতি মুহূর্তের জন্য ব্যাহত হয় নি।'*

* সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সস-এর আনুকূল্যে রচিত

আধুনিক এপিক : 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'

অশ্রুকুমার সিকদার

রামায়ণের আদলে সতীনাথ ভাদুড়ী যে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' লিখতে চেয়েছিলেন সেটা যেমন তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস'-এর প্রতিধ্বনিময় নামকরণ থেকে বোঝা যায়, তেমনি জানা যায় তাঁর ডায়েরি থেকে। সতীনাথ বহুপাঠী ছিলেন, দেশবিদেশের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল গাঢ়, ফলে এমন হতেই পারে হোমারের মহাকাব্যের আদলে লেখা জয়সের 'ইউলিসিস'-এর বিন্যাস তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিল। দুটি রচনার পার্থক্য আছে—একটি চেতনাপ্রবাহের উপন্যাস, অন্যটির প্রধান লক্ষণ বহির্জাগতিক বস্তুনিষ্ঠা ; একটির কালসীমা একদিন, অন্যটির কালসীমা তিরিশ বছরের কিছু বেশি সময়। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এমন হতে পারে, পুরোনো মহাকাব্যের ছাঁচে আধুনিক এপিক লেখার প্রেরণা সতীনাথ জয়সের কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

ডায়েরিতে সতীনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, ফর্ম বা রূপকল্প হচ্ছে উপকরণ থেকে চূড়ান্তভাবে আদায় করে নেবার দক্ষতা। কী তাঁর সেই উপকরণ, সেই উপকরণ থেকে সবটুকু নিংড়ে আদায় করে নেবার জন্য কেন তিনি রামায়ণের গঠন-প্রণালী ব্যবহার করলেন, তারও ইতিহাস সতীনাথ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর নায়ককে তিনি 'এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র' করতে চেয়েছিলেন, কারণ 'শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না'। তাছাড়া তাঁর উপন্যাসের বিষয় ছিল ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ও সমাজের যে পরিবর্তন ঘটছে, সেই পরিবর্তনশীলতাকে রূপায়িত করা। তা রূপায়িত করতে গেলে আশেপাশের এমন কিছু বিবরণ তাঁকে দিতে হবে যা হয়তো 'মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধরহিত'। তখন, 'রামায়ণ মহাভারতে কত উপাখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলগাভাবে গাঁথা, সেইরকম ভাবে লিখলে দেখলাম আমার কাজ চলতে পারে। ভেবেছিলাম আদি কবির আড়ালে আশ্রয় নিলে, হয়তো পাঠকেরা বইয়ের পরিবেশ-প্রধানতা ক্ষমা করতে পারবেন ; আর সর্বজন পরিচিত,

দৃঢ়, কালজয়ী কাঠামোটা গাঁথনির আলগাভাব খানিকটা সামলে নিতে পারবে।' এই সব কারণে সতীনাথ 'পুরোনো মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াই-রামকে' বাঁধতে চেষ্টা করেছেন 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ। দুই চরণে বিন্যস্ত 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এও সপ্তকাণ্ড। প্রথম চরণে চারকাণ্ড—আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড, পঞ্চায়েতকাণ্ড, রামিয়াকাণ্ড। আর দ্বিতীয় চরণে—সাগিয়াকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, হতাশাকাণ্ড। এই উপন্যাসের উল্লেখ্য ঘটনাসমূহের যে-সব নামকরণ করেছেন লেখক তার মধ্য দিয়ে সচেতনভাবে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলা হয়েছে রামায়ণের স্মৃতি। এখানেও, যুদ্ধ ঘোষণা, অগ্নিপরীক্ষা, শাপমুক্তি, পুনর্জীবনলাভ, নাগপাশে বন্ধন, বরাভয়দান, কুক্কুরমেধ যজ্ঞ, স্ত্রীনিগ্রহ, চরুলাভ, অক্ষয়তূণীরলাভ, হাকিম রায়বার, তিতলিকুঠিদাহন, স্বর্ণসীতা—প্রতিধ্বনিময় সব ঘটনাই আছে।

উপন্যাসের প্রথম বাক্যটিতেই যদিও বলা হয়েছে 'অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া'। কিন্তু পূর্ণিয়ার এই চিত্রকর সতীনাথ, জিরানিয়াকে আধুনিক অযোধ্যার স্থান দিয়েছেন উপন্যাসে। ঢোঁড়াইয়ের কাহিনী রামচন্দ্রেরই পথরেখা অনুসরণ করে, অযোধ্যা-জিরানিয়া থেকে তার যাত্রা বিসকন্ধা-দণ্ডকারণ্যের নির্বাসনে, আবার শেষে প্রত্যাবর্তন সীতাহীন জিরানিয়ায়। সতীনাথ ডায়েরিতে আরো লিখেছেন, 'যেখানে সংকট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের average লোক রামায়ণ মহাভারত পুরাণের মনের মতো একটা কাহিনীর উপদেশ পেলে বর্তে যায় —খোঁজে। ও সব বইয়ে যা খোঁজে তাই পাওয়া যায়।' তাই উপন্যাসের মধ্যে নানা চরিত্র—সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' থেকে কথায়-কথায় বচন উদ্ধৃত করে, প্রবাদ-প্রবচনের মতো ব্যবহার করে। রামায়ণের কাঠামোটা এই উপন্যাসের পক্ষে কৃত্রিম মনে হলেও, সতীনাথ জানতেন রামায়ণের ঐতিহ্য এদেশের আপামর মানুষের মজ্জায়-মজ্জায়। তাৎমাটোলার লোকেরা বলে, রোজা, রোজগার আর রামায়ণ নিয়েই লোকের জীবন। ঢোঁড়াইয়ের প্রতিপালক বৌকা বাওয়ার মা মৃত্যুকালে বৌমাকে অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। বাস্তবিকই বৌমা শেষ পর্যন্ত বিরাগী হয়ে চলে গিয়েছিল আশ্রয়ের সন্ধানে অযোধ্যায়, রামচন্দ্রজীর অঙ্গুলিসংকেত সে উপেক্ষা করতে পারে নি। ঢোঁড়াইকে নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বাপের একমাত্র উচ্চাশা ছিল, সে বড় হয়ে রামায়ণ পড়তে শিখবে, দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে। বাওয়ার

নজরে পড়ে, মাতৃপরিত্যক্ত ঢোঁড়াইয়ের 'গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল। পচ্ছিমা মেয়ে রামিয়াকে যখন ঢোঁড়াই জিজ্ঞাসা করে তাৎমাটোলা তার কেমন লাগছে, তখন জবাবে রামিয়া জানায়, ডোম বা মুসলমান নেই বলে ভালই লাগছে, কিন্তু ভাল লাগছে না বালিভরা জমি আর রামায়ণপাঠে সকলের অক্ষমতা। ঢোঁড়াই তাকে কৌশলে জানায় যে, তাদের টোলাতেও রামায়ণ পাঠ হয়। সে রামিয়াকে বিয়ে করতে উৎসুক, কিন্তু বাওয়ার মতামতের ব্যাপার আছে, সমাজ আছে, সর্বোপরি আছে পচ্ছিমা মেয়েটির পছন্দ-অপছন্দ। রামায়ণ যে পড়তে জানে না, তাকে কি রামিয়ার পছন্দ হবে। অথচ রামিয়াকে বিয়ের ইচ্ছে যখন ঢোঁড়াই বাওয়ার কাছে প্রকাশ করে, তখনও চলে আসে রামায়ণের প্রসঙ্গ। পুত্রোপম ঢোঁড়াইয়ের বিয়ে হয়ে গেলে সে আলাদা হয়ে যাবে; অনিবার্য বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় বৌকা বাওয়া কাঁদে অথচ থানে মন্দির করার চাইতেও সে বেশি সুখী হবে যদি ঢোঁড়াই সুখী হয়। আত্মগত চিন্তায় মগ্ন হয়ে বাওয়া স্বপ্ন দেখে, 'তারপর ছেলেপিলে; বাড়বাড়ন্ত সংসার, ঝকঝকে নেপা উঠোন, বড় বড় কাঁচামাটির জালা দাওয়ার উপর; ঢোঁড়াইয়ের বৌ রঙিন কাপড় পরে কাঁচাহলুদ সিদ্ধ করছে শুখিয়ে বিক্রি করবার জন্য, তেঁতুল গাছ জমা নিয়েছে পাঁচ টাকায়, আদা দিয়ে বড়ি দিচ্ছে, উঠোনে আমলকী আর অশথের ডগার আচার শুখোতে দেওয়া হয়েছে;—সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবি ভরা পাতা, একখানার পর একখানা খুলে যাচ্ছে বাওয়ার চোখের সম্মুখে।' বিহারের বিখ্যাত ভূমিকম্পে যখন বিসকন্ধায় সব কিছু ছত্রখান হয়ে যায় তখন ঢোঁড়াই দেখে বড়লোকদের পাকা বাড়িগুলো ফেটে চৌচির অথচ গরিবের কুঁড়ে ঘরের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় ন্যায়বিচারের হদ্দ করেছেন রামচন্দ্রজী। গান্ধীজির ডাকে আজাদদস্তায় যোগ দেয় ঢোঁড়াই যেহেতু তা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ। ক্রান্তিদলে সে রামায়ণ পড়তে শেখে, অর্জন করে রামায়ণজী নাম। সেদিনের সেই অজাত সন্তান ভেবে, অসুস্থ এনটনিকে নিয়ে সে ফিরে আসে তাৎমাটুলিতে। কারণ তুলসীদাসের বাণীর হঠাৎ পরিবর্তন করে ঢোঁড়াই ভাবে 'যেখানে রামিয়া থাকে সেখানেই অযোধ্যা।' ভুল ভাঙে অচিরেই, এনটনির জননী রামিয়া নয়; সেই মৃতার স্থানাধিকারী এই রমণী রামিয়া-সীতা নয়, সে স্বর্ণসীতা। 'জুয়ো খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে সে। রিক্ত নিঃসীম হয়ে যায় তার সমস্ত জগৎ।'

অথচ যতই ঢোঁডাইয়েব চেতনাব উন্মেষ হয়, যতই তার জগতেব দিগন্ত প্রসারিত হয, নিজেব পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যতই সে সজ্ঞান হয়ে ওঠে, ততই সে দেখে দ্রুতপরিবর্তমান সংসাবেব সঙ্গে সে তাব চিবন্তন রামাযণকে মেলাতে পাবছে না। সে মনে-মনে ভাবে, 'পাককী আর পাটের দামেব বাজা, কাপড আর কেরোসিনের রাজা, মাটিতে জমিদাব হাকিম দাবোগা ফৌজেব রাজা, আকাশে হাওযাই জাহাজের বাজা, বাতাসে ফৌজী হাওযা-গাডিব গন্ধব রাজা। বামাযণে এ-রকম রাজাব কথা লেখা নেই। বিলাক-এব কথা লেখা আছে?' ব্ল্যাকেব কথা লেখা নেই, নতুন যুগেব অনেক কিছুর হদিশ যে বামাযণে আর পায় না। আগস্ট আন্দোলনেব ক্রান্তিদলে যোগ দিযে যে ঢোঁডাই রামাযণজী নাম অর্জন কবেছিল, সেই ঢোঁডাই যখন এনটনির বাডি ছেডে চলে যায, তখন তাই হয়তো ফেলে চলে যায তাব কম্বলের সঙ্গে বহু আরাধনায পাওয়া তার রামাযণ।

অসতর্কতার বশে রামাযণ ফেলে চলে যায ঢোঁডাই, আব ঢোঁডাইযের কাছে 'পাক্কী না কী নামেব যেন' রাস্তাটা একেবাবে অপরিচিত বলে ঠেকে। এই উপন্যাসে অপরিবর্তনীযতা ও পবিবর্তনের প্রতীক হিসেবে যেমন পাই 'বামচবিতমানস'-কে, রামাযণকে, তেমনি পাই কোশী-শিলিগুডি বোডকে, তাৎমাটুলিব লোকেরা যে রাস্তাকে বলে পাক্কী। ঢোঁডাই জানত, 'বদলায না কেবল পাক্কী আর বামাযণ। এ দুটোব সঙ্গে যে নাডি বাঁধা তাব।' রামাযণ যেমন শাশ্বত ঐতিহ্যময সত্যের প্রতীক, তেমনি 'পাক্কী ঢোঁডাইযের কাছে নির্বিঘ্নতা, দৃঢ়তা আব বিশালতাব প্রতীক।' এই পাকা রাস্তা আবার ধবমপুব আর হাভেলী পবগণাব সীমাবেখামাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙ্গড এই দুটি সম্প্রদাযেব হৃদযেবও বিচ্ছেদরেখা। জাতেব নিযম ভঙ্গ করে তাৎমাজাতেব মিথ্যে ইজ্জতের তোযাক্কা না বেখে, পঞ্চাযেতের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য কবে ঢোঁডাই ধাঙ্গড শনিচবা ইত্যাদিদের সঙ্গে বাস্তা সাবাইযেব কাজে যোগ দেয। তাব এই সিদ্ধান্তে ধাঙডেবা যুগপরিবর্তনের ইঙ্গিত পায—'কালে কালে কিন্তু সকলের ফুটানি ভাঙবে।·· দিন আসছে···।' গাঁযের মহতোও ভাবে 'খারাপ হাওযাব দিন আসছে।' মহতো, ছডিদার, নাযেবদেব বিরুদ্ধে লোকেবা মুখ খুলতে শুরু কবেছে। রাস্তা সাবাইয়ের কাজেব গোপন বহস্য শুধু ঢোঁডাইযের আযত্ত হয না। বাস্তা দিয়ে গাডি যায, গাডোযানদেব সঙ্গে গল্প কবে কত গাঁযেব কত আজব খবব শোনে সে। তার জগতের পবিধি ক্রমেই বিস্তৃত হয। তাব দৃষ্টি আরো বেশি প্রসারিত হয

তখন যখন সে বৌকা বাওয়ার টাকায় গাড়িবলদ কেনে। 'এখন সে নিজের গাড়িতে মাল বোঝাই করে কত দূরে দূরে চলে যায়, পাঁচ কোশ, সাত কোশ, পুরুবে পচ্ছিমে, করহাগোলায় গঙ্গাস্নানে, মথৈলে, কুর্বাহাটের মেলায়। জাতপাঁত আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত একই রকম।' যে-রাস্তা তাকে জাতপাঁতের গণ্ডি ভেঙে মানুষের পরিচয় জানতে শেখায়, রামিয়ার কৃতঘ্নতায়, ব্যক্তিজীবনের শূন্যতার অনুকারে সেই রাস্তা ধরেই ঢোঁড়াই এক রাত্রে অনির্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে যায় এই রাস্তারই সংলগ্ন আর এক গ্রামে, বিসকন্ধায়। তার আগের জীবন আর নতুন জীবন, তাৎমাটুলির প্রাণোচ্ছল রামিয়া আর বিসকন্ধার স্নিগ্ধ মাগিয়ার মধ্যে সংযোগসূত্র এই পাল্কী। তার রামায়ণ যেমন বদলায় অথচ বদলায় না, পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়, সেই রকম পাল্কীটাও অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। 'লোহাতে ঘুণ ধরেছে, সোনাতে মরচে পড়ছে; একি কলির শেষ হয়ে এল নাকি?' অষ্টপ্রহর ফৌজি হাওয়াগাড়ি চলছে পাল্কী দিয়ে। পশ্চিমে কতদূর চলে গেছে এই রাস্তা কেউ জানে না, পূর্বে নাকি চলে গেছে কামিখ্যামাই হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত। এমনি করে সব বদলে যাচ্ছে। 'এ কী হল দুনিয়ার। দিনে দিনে সব বদলে যাচ্ছে।' খাপরার চালের বদলে বাবুভাইয়াদের বাড়ির চাল তৈরি হচ্ছে ঢেউ-খেলানো টিনে, ছেলেদের চালচলন বদলে যাচ্ছে। শিলাবৃষ্টিও আগের মতন হয় না। বাড়ি-বাড়ি টিউবওয়েল বসেছে বলে কুয়ো তৈরি, কুয়ো মেরামতির রোজগার নেই। 'দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না।'

রামায়ণের কাঠামোর আশ্রয়ে, পাল্কীর দুপাশের গোটা তিনেক গ্রাম নিয়ে, 'average/typical Indian character' নিয়ে, ঢোঁড়াই-রামকে নায়ক করে, একালের যে রামকথা লিখিত হল তার স্নায়ু হল আলোড়নের সময়ে সামাজিক শক্তিসমূহের টেনশন বা আততি। যে-সব জরুরি সামাজিক উপাদান ঢোঁড়াইয়ের জগতকে নিয়ন্ত্রিত করে তারই যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি সতীনাথ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। এইভাবে 'পূর্বাগত কালপ্রবাহ থেকে ছিন্ন না করেও এ-বই আমাদের এক নতুন কালের মুখোমুখি নিয়ে আসে, পরিচিত দেহশ্রী থেকে ছিন্ন না করেও এ-বই আমাদের এক নতুন দেশের মুখোমুখি নিয়ে যায়।' কোন তাগিদ তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল সে কথা সতীনাথ নিজেই বলে গিয়েছেন, 'ইচ্ছা ছিল আমার

জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজেদের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে।' গোপাল হালদার ঠিকই বলেছেন, ইকলজি আর ইকনমি মিলে গড়ে উঠেছে এই আধুনিক মহাকাব্য রচনার 'সশ্রদ্ধ এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রয়াস'। ছোট্ট জিরানিয়া শহর, তার নিকটবর্তী গুটি তিনেক নগণ্য জনপদকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'সেই অখ্যাত anonymous India-র ঘুমভাঙা নতুন জাগরণের ও বাধাজড়িত পদযাত্রার প্রধান মহাকাব্য।'

কিঞ্চিদধিক তিরিশ বছর সময়-সীমা বেছে নিয়েছেন সতীনাথ। দেশের বড়-বড় রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলের নিস্তরঙ্গ জীবনকে গেঁথে দিয়েছেন বাইরের ঘটনাবর্তের সঙ্গে এবং দেখিয়েছেন বাইরের ঘটনার অভিঘাত গ্রামের নিশ্চেতন জীবনকে কীভাবে সচেতন করে তুলছে। ঢোঁড়াইয়ের জন্ম হল ১৯১১ সালে, দিল্লির দরবারের সময়। লেখক পাদটীকায় জানিয়েছেন জিরানিয়া প্রথম মোটরগাড়ি আসে ১৯১৩ সালে। ১৯১৭ সালে যুদ্ধের চাঁদা সংগ্রহের জন্য টুরনমন বা টুর্নামেন্ট হয়েছিল, লড়াই থামার জন্য ১৯১৮ সালে ভোজ হয়। ঢোঁড়াই যে-দিন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেদিন ১৯১৯-এর অসহযোগ আন্দোলন উপলক্ষে 'হাড়তাল' ছিল। সেই সময় মাস্টারসাব সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন, 'সাভা' হয়, 'গান্‌হীবাবা'-র বার্তা এসে পৌঁছয়। মদের দোকানে পিকেটিং হয়। কুমড়োর উপর গান্‌হীবাবার আবির্ভাব হয়—'বিলিতি কুমড়োর খোসায় গান্‌হীবাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে।' মাঝে-মাঝেই শুনি বাল্যবিবাহ-নিরোধক সর্দা আইনের কথা। ১৯৩১ সালে হয় আদমশুমারি। বৌকা বাওয়া যখন অযোধ্যাজীর উদ্দেশে যাত্রা করে তখন শুরু হয়েছে লবণ সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি। ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্প বিসকন্ধা গ্রামকে তছনছ করে দিয়ে যায়। নতুন আইন অনুসারে 'বোট' বা ভোটের বার্তা নিয়ে ইতিমধ্যে গ্রামে এসে হাজির হয় মহাৎমাজীর বলন্টিয়াররা। কাংগ্রিস সরকার নতুন ভূমিসংক্রান্ত আইন পাস করায়। কিন্তু তারপরে কাংগ্রিস সরকার গদিত্যাগ করে, যুদ্ধ এসে যায়। কোয়েরীটোলাতেও একদিন বলন্টিয়ারের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তারপর 'আজকাল বছরে যতদিন, তত খবর, হাটে যত লোক, তত খবর।' জাপানিরা যুদ্ধে

যোগ দেয়, পাকা রাস্তা দিয়ে অষ্টপ্রহর ফৌজি হাওয়া গাড়ি চলে। 'রাজ্যিশুদ্ধ লোক ঠিকেদার হয়ে উঠছে।' এমন সময় আসে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের খবর। মহাত্মাজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ এসে যায়। বিসকন্ধার লোকেরা শপথ নেয়, 'এক বাপ, এক রাত।' থানাতে স্বরাজ হয়ে গেল। ঢোঁড়াই আজাদদস্তায় যোগ দেয়। উপন্যাস শেষ হয় তখন, যখন ব্যক্তি-জীবনের নিঃসীম রিক্ততায়, রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থ হতাশায় ঢোঁড়াই কাছারিতে সারেণ্ডার করতে এগোয়। এইভাবে, ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ের পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনকে জিরানিয়ার দর্পণে বিম্বিত করেছেন সতীনাথ।

প্রাচীন এপিকেরই আধুনিক প্রতিভূ উপন্যাস, একথা আজ সবাই জানেন। হেগেল জানিয়েছিলেন এপিকের লক্ষণ 'totality of objects', যেমন নাটকের লক্ষণ 'totality of action'। তিনি জানতেন তিনি এক পরিবেশ-প্রধান বস্তুনিষ্ঠ আধুনিক মহাকাব্য লিখতে যাচ্ছেন। তিনি জানতেন ভালো উপন্যাস দুই জাতের হয়। 'এক রকম হয় অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ significant মুহূর্তের যোগফল।...এ বইগুলোয় নাটকীয় উপাদান থাকে বেশি।' দ্বিতীয় রকমের ভালো উপন্যাসে এই নাটকীয়তা নেই, সেই দ্বিতীয়গুলি এপিক গুণান্বিত, 'যার মুহূর্তগুলোর উপর গুরুত্ব কম...প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের বলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—অনায়াসে—বিনা চেষ্টায়—epochal unity—মুহূর্তগুলো blurred...। এই আয়াসহীন, আপাত-শিথিল, বস্তুসমগ্রতায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'। এই বস্তুসমগ্রতাকে ধারণের প্রয়োজনেই 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ আঞ্চলিকতা এসেছে, যাকে গোপাল হালদার বলেছেন, ইকলজি।

অধিকাংশ আঞ্চলিক উপন্যাসে একটা প্রদর্শনেচ্ছা উগ্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একটা বিশেষ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখক কতটা জানেন তাই জানাতে, পাঠকের মুগ্ধ কৌতূহলকে উদ্দীপিত করতে তিনি আগ্রহী হন বেশি। সেই রকম লেখকের হাতে, সেই অঞ্চল একটা অণুবিশ্ব হিসাবে বৈশ্বিক সত্যকে প্রতিভাত করার চাইতে, বিশিষ্টতা ও পার্থক্য নিয়ে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দিকেই যেন সচেষ্ট থাকে বেশি। আঞ্চলিক উপন্যাসে সচরাচর বিশিষ্ট লাক্ষণিকতার অনুপুঙ্খময় বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক হয়ে যান প্রকৃতিবাদী স্বভাবের। অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বলে, দুরূহ অভিজ্ঞতায় যা অর্জন করেছেন তার কোনো অংশই বর্জনে তাঁর

মন সায় দেয় না। সতীনাথ সেই প্রকৃতিবাদী চোরাবালিতে একেবারেই ধরা পড়েন নি। তাঁর 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ আঞ্চলিকতা বাস্তবিকতারই অন্য নাম, বস্তুনিষ্ঠার শর্ত বজায় রাখার প্রয়োজনে লেখককে নিরুপায়ভাবে আঞ্চলিক লক্ষণকে তুলে ধরতে হয়েছে। এই উপন্যাসে কোথায়ও উগ্র প্রদর্শনেচ্ছার প্রমাণ আমরা পাই না। মানবপ্রেমে তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি প্রখর হয়েছে, নিরাসক্ত অথচ সহৃদয় দৃষ্টিতে তিনি যেমন ব্যক্তি-মানুষকে তেমনি মানবগোষ্ঠীকে পর্যবেক্ষণ করেছেন; পর্যবেক্ষণ করেছেন মৃদু, মর্মস্পর্শী কৌতুকের দৃষ্টি দিয়ে। জিরানিয়া অঞ্চলের মানুষের লোকচর্চা, লৌকিক জীবন, তাদের প্রবাদ-প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, হাসি রঙ্গ তামাশা, নীতিবোধ, সংস্কার, প্রথা সবই চিত্রিত হয়েছে—কিন্তু অনায়াসে; অবিকল বস্তুসত্য রূপায়ণের দাবিতে।

তাৎমাটোলার লোকেরা জানে 'আশ্বিনের পরে জ্বর বাতাবি লেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।' চিকিৎসা মানে ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, জড়িবুটি, টোটকা-টাটকি। বাঁশঝাড়ে ফুল ধরা অমঙ্গলের সূচক। তার অর্থ, বারো বছরের মধ্যে সকলকে ভিটেমাটি ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। খরার দিনে বৃষ্টির প্রত্যাশায় পূর্ণিমার রাত্রে মেয়েরা জাটজাটিনের গান গায়। ছোটরা রাজপুত্র সদারুচ আর রাজকন্যা সুরঙ্গার কাহিনী শোনে, গল্প শোনে 'তরোয়াল নিয়ে যাচ্ছেন বিজা সিং'। ঢোঁড়াই স্বপ্ন দেখে জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে সে বিজা সিং-এর মতো ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। তাৎমারা সূর্যকে বলে গোঁসাই। তারা বিশ্বাস করে, অমাবস্যার অর্ধেক রাত্রিতে কন্ধকাটা ভূতের দল চলে। জলে ডুবে মরলে হয় 'পানডুব্বীভূত'। এ ছাড়া আছে কিচিনপেত্নী, 'শাখড়েল'। জোনাকি পোকা আসলে খোকাভূতদের চোখ। তুকতাক, জাদুবিদ্যা, বাণমারায়, বেরণগুণী পারঙ্গম; সে শ্মশানে যায়, সারারাত ভূত নাচায়, মানুষের মুণ্ড নিয়ে ভূতেদের সঙ্গে খেলা করে। ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিবাহ প্রসঙ্গে জানতে পারি তাদের বিবাহ-পদ্ধতি। জল-সহার মতো স্ত্রী-আচার হয় পানকাট্টি। বিয়ের আগের দিন গোঁসাই জাগাবার গান হয়, বরযাত্রী এলে দুয়ার-লাগার অশ্লীল গান গাওয়া হয়। পাঁচ এয়োতে তেলসিঁদুর গুলে মাটিতে পাঁচটা ফোঁটা দেয়, এক ফোঁটা রক্ত মাখানো পানের খিলি খাওয়ায় ঢোঁড়াই রামিয়াকে। বরকনে দুজনে মিলে উখলিতে ধান ভানে। এই সব সংস্কার, প্রথা, রীতিনীতি ছাড়াও, ভাষার

ভঙ্গিমা ও প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বাস্তবতা। লৌকিক অভিজ্ঞতাকে তারা স্বকীয় প্রবাদের মধ্যে ধারণ করেছে—পেট খারাপ করে মুড়ি আর ঘর খারাপ করে বুড়ি; বাজা (বাদ্য), ছাজা (ছাউনি), কেস (কেশ), এই তিন বাংলাদেশ; চারজন কাঙাল হলে একজনের বাংলোবাড়ি ওঠে।

কিন্তু আগেই বলেছি, আঞ্চলিকতা এই উপন্যাসের অ-প্রাথমিক লক্ষণ, তার প্রাথমিক লক্ষণ বাস্তবতা। সেই বাস্তবতা রুজিরোজগারের, জীবন-যাপনের, অর্থনৈতিক বিন্যাসের, রাজনৈতিক অভিঘাতের—আর সেই সব ব্যাপারে জিরানিয়া একটি অঞ্চল হয়েও অণু-ভারতবর্ষ। রাজনৈতিক কার্য-কলাপে যোগদান করে যে-অভিজ্ঞতা সতীনাথ অর্জন করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাকে স্বাঙ্গীকৃত করেই গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসের মহিমান্বিত বাস্তবতা। তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতাই তাঁর বাস্তবতার ভিত্তি। কিন্তু তিনি শুধু 'representation'-এ সুখী ছিলেন না, তাঁর সৃজনশীল কর্মের লক্ষ্য ছিল 'transformation'। এই 'সত্যপ্রিয়' লেখক শুধু বাস্তবের বহিরঙ্গ বিবরণে তৃপ্ত ছিলেন না, শুধু রুজিরোজগার, জীবনযাপনের বর্ণনায় খুশি ছিলেন না, তিনি বুঝে নিতে চেয়েছিলেন শ্রেণীগত বিন্যাসকে, অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের আঘাতপ্রত্যাঘাতকে। উপন্যাসের প্রথম চরণে সতীনাথ তাৎমাটোলার জীবন বর্ণনা করেছেন। এই তাৎমারা 'চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চাষ না।' কিন্তু সতীনাথ বুঝেছিলেন চাষবাসের বিবরণ ব্যতীত ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াইকে স্থানান্তরিত করেছেন জমি ও চাষের রাজ্য বিসকন্ধায়। নিজেই লিখেছেন সতীনাথ, 'আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর-গাড়ি-চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাৎমাটুলি থেকে সরাতে হল চাষ-বাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য।' 'তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না, জমিদারের গল্প করত কালেভদ্রে। কিন্তু বিসকন্ধার হাওয়াই অন্য রকম। এখানকার হাসিকান্না গল্পরঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে।' কিন্তু শুধু বহিরঙ্গতা নয়, অন্তরঙ্গতাও এই উপন্যাসের বস্তুসমগ্রতাকে দৃঢ় করে। উনিশশতকী এপিক-উপন্যাসের সঙ্গে তিনি হয়তো জয়স ও প্রুস্ত্ ইত্যাদি ঔপন্যাসিকের অন্তরঙ্গতার শিক্ষাকেও মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই বারে-বারে পেয়ে যাই আমরা চরিত্রসমূহের আত্মগত চিন্তাকে—ঢোঁড়াইয়ের মা-র, ফুলঝরিয়ার, বৌকা বাওয়ার, মহতোর, বাবুসাহেবের,

সর্বোপরি নায়ক ঢোঁডাইয়ের। এইসব আত্মগত চিন্তা, চেতনাপ্রবাহের আপাত-অপ্রস্তুত ধরনে নয় অবশ্য, উপন্যাসের বাস্তবতাকেই বেধ দেয়, এক অতিরিক্ত মাত্রা দেয়।

তাৎমারা নানা উপায়ে রোজগার করে। ছেলেরা ঘরের ছাউনি দেয়, কুয়ো তৈরি বা পরিষ্কার করে। মেয়েরা বর্ষার পর ঘাস বিক্রি করে, অঘ্রানে পুবে যায় ধান কাটতে, মাঘ মাসে বুনো ফুল বিক্রি করে, ফাল্গুন-চৈত্রে শিমুল তুলো আর কচি আম বিক্রি করে। যেহেতু কায়ক্লেশে উপার্জন করে সেই কারণে তাদের সমাজে মেয়েদের স্বাধীনতা অনেক বেশি। আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদের আছে বলে, বিবাহব্যাপারেও তারা স্বাধীন ; বিধবাবিবাহও তাদের সমাজে প্রচলিত। কিন্তু বচ্চন সিং বাবুসাহেবের গৃহিণীর কোনো স্বাধীনতা নেই, তার বাড়ির এলাকাও তালাবন্দী থাকে—দরকার পড়লে বাবুসাহেব তালা খুলে গুনে-গুনে এলাচ দেন গৃহিণীকে। ধান কাটতে গিয়ে তাৎমা মেয়েরা আরো বেশি স্বাধীনতা পায়। পুরুষরা সঙ্গে না থাকায়, সামাজিক বিধিনিষেধ হয়ে যায় আরো শিথিল। যে-মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব হয় না। পুবে ধান কেটে তাৎমা মেয়েরা যখন ঘরে ফিরে আসে তখন নতুন আনা ধানের মালিক তারা, ধরাকে তাই সরা জ্ঞান করে। 'দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা।' বাবুদের দেখে-দেখে এদের পুরুষেরও কখনো-কখনো ইচ্ছে জাগে বাইরে উপার্জন না করে মেয়েরা অন্তঃপুরিকা হয়ে ঘরসংসার করুক। ঢোঁডাইয়ের বি-পিতা, চেরমেনসাহেবের চাপরাশি, বাবুলাল তাই চেয়েছিল, ঢোঁডাই নিজেও রামিয়াকে ঘরের বৌ করে রাখতে চেয়েছিল। রাওয়া যখন হঠাৎ কিছু টাকা পেয়ে যায় বিজন-বাবুর হাস্যকর লক্ষ্যভ্রষ্টতায়, তখন সেই টাকায় ঢোঁডাইয়ের জন্য গাড়ি-বলদ কেনাই ঠিক হয়। গাড়োয়ান হয়ে রোজগার করে ঢোঁডাই। তারপর পঞ্চায়েতের চক্রান্তে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় ঢোঁডাই—উপস্থিত হয় বিসকন্ধায়। সাইয়াদের তামাকখেতের দেখাশুনো করে সে। জমির রাজ্যে নায়ককে এনে কৃষিব্যবস্থার বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করান লেখক। বৃষ্টি পড়লে বীজধান চাই, ধানের চারা চাই। এখানে, যেমন সারা ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে, 'রোজগার মানেই যে জমি। ইজ্জতের সঙ্গে রোজগার, জমি। আর রোজগারের সঙ্গে ইজ্জত চাইলে তারও দরকার জমির। চাষের জমি, গোরুচরাবার জমি, নিকাশের জমি, বসতবাড়ির জমি, ধেনো জমি, তামাকের জমি, ভুট্টার জমি, যার আছে সে আরও চায়, যার কোনওদিন ছিল না

সে-ও আজকে চায়; যাদের ছিল, গিয়েছে, তারা তো চাইবেই।...জমি, আর জমি, আর জমি।' কিন্তু যেভাবেই এই মানুষেরা রোজগার করুক, তারা সবাই সমান দরিদ্র। একদিন ঢোঁডাইকে পেটভরে আলুর তরকারি খাওয়াতে পারে নি ভেবে বৌকা বাওয়া দুঃখ করে। 'জাতপাঁত আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত একই রকম।' আসলে এক জন্তুর জীবন যাপন করে এই দরিদ্র মানুষেরা। 'জানোয়ার মরা আর মানুষের মরায় তফাত কী। কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গোরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ দিতে হবে; এই তফাত।' মরায় যেমন তফাত নেই, জন্তু আর মানুষের জীবনযাপনেও নেই তেমন কোনো মৌলিক তফাত।

এই দরিদ্র মানুষগুলির জীবন নিয়ন্ত্রিত করে গাঁয়ের পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের কাজ হচ্ছে গ্রাম্য ঝগড়ার মীমাংসা করা, আর সেই ঝগড়া থেকে আর্থিক ফায়দা ওঠানো। পাক্কীতে রাস্তা সারানোর কাজ নেওয়ায় ঢোঁডাইয়ের বিচারের ব্যবস্থা করে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতকে অগ্রাহ্য করেই ঢোঁডাই তার নেতৃত্বশক্তির প্রথম পরিচয় দেয়। তাৎমারা তন্ত্রিমাছত্রী হবে কিনা, উপবীত ধারণ করবে কিনা এ নিয়েও মহতো এবং পঞ্চ্‌দের সঙ্গে বিরোধ বাধে ঢোঁডাইয়ের। তাৎমা মেয়েদের পক্ষে যা রীতিবিরুদ্ধ সেই সাজ যখন রামিয়া করে অর্থাৎ লোটা হাতে ময়দানে যায়, তখন সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবস্থা হয় পঞ্চায়তির। মহতোর মেয়ে ফুলঝরিয়াকে বিয়ে না করে ঢোঁডাই রামিয়াকে বিয়ে করছে, এই হল রামিয়া তথা ঢোঁডাইয়ের উপর মহতো ও মহতোগিন্নীর রাগের কারণ। শেষ পর্যন্ত পঞ্চায়েত অবশ্য রামিয়ার বিচার করে না—কারণ সে হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তিতে 'হাপরের মতো ফুলে যাওয়া' বাওয়ার পুত্রবধূ হতে চলেছে। আর 'টাকাওয়ালা লোকের বিরুদ্ধে পঞ্চ্‌রা যেতে পারে না, একথা সবাই জানে।' বাওয়া যখন অন্তর্ধান করেছে, সেই সময় অবশ্য এই পঞ্চায়েতই সামুয়রের বিরুদ্ধে ঢোঁডাইয়ের ঈর্ষার এবং রামিয়া-ঢোঁডাইয়ের ঝগড়ার সুযোগ নিয়ে তাৎমাটুলি থেকে ঢোঁডাইয়ের বেদনার্ত প্রস্থানের কারণ হয়।

পঞ্চায়েতের সঙ্গে এসে যায় ডিস্ট্রিবোর্ডের চাপরাশি, চেরমেন, ভাই-চেরমেন সাহেবের কথা, দারোগা, কলেক্টরের কথা। জাতভাইকে অমান্য করে ঢোঁডাই রাস্তা মেরামতের কাজ নিলে ক্রুদ্ধ পঞ্চায়েত আক্রমণ করে

বাওয়ার থান। বাবুলাল চাপরাশি পিট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে দেয় থানে। মুরুব্বির মারফতে ঢোঁড়াই অভিযোগ করে পুলিশে। পুলিশের সঙ্গে সেই ঢোঁড়াইয়ের প্রথম যোগাযোগ। কনেস্টবলের সামনে যখন হাজির হয় অভিযুক্তেরা তখন 'কোথায় গিয়েছে তেতর নায়েবের কাল রাতের প্রতাপ, কোথায় গিয়েছে ধনুয়া মহতোর জিয়লগাছে হেলান দিয়ে বসা ন্যায়াধীশের গুরুগাম্ভার্য, কোথায় গিয়েছে চাপরাশি সাহেবের পদগৌরব।' কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের শরীরেও যেহেতু এদেরই রক্ত, তাই বৌকা বাওয়ার নিঃশব্দ নির্বন্ধে ঢোঁড়াই সাক্ষী দেয় না অগ্নিকাণ্ডের। বেঁচে যায় পঞ্চেরা। কিন্তু পুলিশের সঙ্গে পরবর্তী যোগাযোগ এমন শুভঙ্কর হয় নি। সার্ভের সময় জনসাধারণের গোরুচরানোর জমিকে নিজের পতিত জমি বলে লিখিয়ে নিয়েছিল জমিদার কিছু পয়সার বিনিময়ে। এখন সেখানে যখন লবণ সত্যাগ্রহের আয়োজন হয়, সম্ভাবনা দেখা দেয়, জায়গাটা মহাত্মাজীর থান বলে চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া জমিদারের ভয় হয়, জমির স্বত্বের অস্বস্তিকর সত্যটা গ্রামের লোকে জেনে ফেলতে পারে। ফলে সে পঞ্চায়েতের ছড়িদারকে দিয়ে গোপনে পুলিশে খবর পাঠায়। পুলিশ এসে গ্রামের লোককে ভয় দেখায় ও সতর্ক করে দিয়ে যায়। সতীনাথ এইভাবে দেখিয়ে দেন পঞ্চায়েতে-জমিদারে-পুলিশে গূঢ় যোগাযোগের সূত্রটি।

বিসকন্ধার ঢোঁড়াইয়ের জগতের বাস্তবতা মানেই চাষ ও জমির বাস্তবতা। সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে যে জমিদার ও মহাজন তাদের বাস্তবতা। বিসকন্ধায় জমিদারের সর্বত্রব্যাপী সর্বশক্তিমান অস্তিত্ব। বিসকন্ধার আসল জমিদার বচ্চন সিং রাজপুত। নিজেকে তিনি কিষাণ বলেন, যদিও তাঁর তিন হাজার বিঘা জমি। এই অঞ্চলে তিনি এসেছিলেন মজকুরী সেপাই হিসেবে। 'সেই মজকুরী সেপাই কেমন করে আস্তে আস্তে এখানকার বাবুসাহেব হয়ে গেলেন, সেটা এদিককার প্রতিটি গ্রামের গতানুগতিক ইতিহাস। তার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই।' যার লাঠি তার মোষ, এই স্বাভাবিক নিয়মের সূত্র ধরে সব জমি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে বাবুসাহেবের পেটে। 'এমনি করেই জমি বাড়ে। জলে জল আনে। কোথা থেকে কেমন করে যে জমি বাবুসাহেবের হাতে চলে যায়, তা আগে থেকে লোকে টেরও পায় না।' বড় ছেলে আনোখীবাবু ভাং খেয়ে পড়ে থাকেন, ছোট ছেলে লাড়লীবাবু মহাৎমাজীর কাজ করেন, জেলে

যান। বাবুসাহেব ইদানীং ভজন-পূজন নিয়েই থাকেন। তবু জমি চলে আসে তার কুক্ষিতে। সাগাইয়ের মা মোসম্মতের জমিই তার প্রমাণ। বচ্চন সিং আত্মগত চিন্তা করেন—'বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পৌঁছায়, ঐ লাঠিসমেত হাত। হাত গুটিয়ে বসে থেকো না কখনো। আলের মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু-একটু করে। কচার ডালের খুঁটি নতুন করে সরিয়ে পোঁতো। জমির সীমানার বেড়া এগিয়ে নিয়ে যাও রাস্তার দিকে, নইলে পরে নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা পাবে না।' তাঁর আন্তরিক বাসনা, নিজের বাড়ির দোরগোড়া থেকে শিলিগুড়ি-কোশী রোড বা পাক্কী পর্যন্ত যেতে তাঁকে যেন অন্যের জমি স্পর্শ করতে না হয়। সবটা এক চকে দেখে যেতে চান বাবুসাহেব। মাঝখানে মোসম্মতের জমিটুকুই তাঁকে নিরতিশয় বিরক্ত করে তুলেছে। সুতরাং জমিদারের সাগরেদ গিধর মণ্ডল, বুড়হাদাদার নাতির মৃত্যু হলে প্রমাণ করে দেয় যে, ডাইনি মোসম্মতই তার জন্যে দায়ী। সেই বদনাম দিয়ে তাকে ভিটে-ছাড়া করা হয়। পরে, করুণাবশত তাকে প্রাণে না মেরে বুড়িকে অন্য ভিটায় বসানো হয়। বাবুসাহেবের ইচ্ছা এতদিনে পূরণ হয়। কৃতজ্ঞতা জানান বাবুসাহেব—'জয় জয় হো জানকীবল্লভ রঘুনাথজী! জয় জানকীমাই। জয় লছমনজী, ভরতজী, দশরথজী, কৌশল্যামাই, মহাবীরজী, শত্রুঘনজী, সুগ্রীব, বিভীষণ··· আর কোনো নাম ছেড়ে গেল না তো?'

এই সর্বশক্তিমান বচ্চন সিং বাবুসাহেবের সঙ্গে সংঘর্ষে লাগে বহিরাগত ঢোঁড়াই। বৃষ্টি পড়ছে, সুতরাং বীজধান চাই, ধানের চারা চাই। ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বে সবাই যায় বচ্চন সিং-এর বাড়ি। তাদের দলবদ্ধ দৃঢ়তা দেখে, বাইরে উদারতার ভান করে বচ্চন সিংকে তখনকার মতো দাবি মেনে নিতে হয়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয় ক্রুদ্ধ বাবুসাহেবের 'ফটক সঞ্চরণ'। 'বড় বাড় বেড়েছে কোয়েরীগুলোর'—সুতরাং রাজপুতজাতের মাতব্বরদের একত্র করা হয়—কারণ 'মেয়েমানুষ বুকে টানে সুখের সময়, আর জাতে বুকে টেনে নেয় বিপদের সময়।' মোকদ্দমার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ঢোঁড়াইয়ের নেতৃত্বাধীন কোয়েরীরা দেখে, উকিল বামনেওয়াজ মুন্সী এক রাশি টাকা চায়। এমন কি অনিরুধ মোক্তারের দাবিমতো টাকাও জোগাড় হয় না। বাবুসাহেব যাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিলেন তারা জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় থানা-পুলিশ, ফৌজদারি আদালতের দৌরাত্ম্যের দরুন। সেই সব রায়তী জমিতে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়

সাঁওতালদের। এইভাবে বিসকন্ধার পটভূমিতে আর একবার আমরা পেয়ে যাই জমিদার-পুলিশের যোগাযোগের প্রমাণ। গিধর মণ্ডল আর বাবুসাহেব পরস্পর মেলে নিজেদের স্বার্থে আর আনুকূল্য দেয় শাসনযন্ত্র—'দারোগা পুলিশ বিরুদ্ধে থাকলে, রাজপুতের লাঠি হয়ে যায় পেঁকাটির মতো ফঙ্গবেনে ; রাজপুতের ঘোড়া হয়ে যায় গাধার সামিল।' এই জমির দেশে লড়াই করতে গিয়ে মাঝে-মাঝে বিহ্বল বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ঢোঁড়াই। 'পরিষ্কার সামনা-সামনি দু-পক্ষের লড়াই জিনিসটা ঢোঁড়াই ছোটবেলা থেকেই বুঝতে পারে। এ কেমন যেন অনেক দলের লড়াই, অনেক লোকের লড়াই, অনেক রকম ঝগড়ার মুখ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কে কোন দলে, কোন দল কখন কোন দিকে বোঝা যায় না।' আর এক প্রস্থ লড়াই লাগে যখন বাবুসাহেব নদীর ধারের পতিত জমি দখলের মতলব করেন। নদীপথেই এখানে এসেছিলেন তিনি, তাই নদীর ধারকে আয়ত্ত করতে তিনি বড় উৎসুক। অনেকদিন থেকেই সেখানে তিনি কলাই-কুষ্টি ছিটোচ্ছিলেন। এবারে সাঁওতালদের মোষ ধরে খোয়াড়ে দেওয়ালেন ওখানে চরাইল বলে—উদ্দেশ্য নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। কোয়েরী আর সাঁওতালেরা এবারে কিন্তু একজোট হয়ে বাধা দেয়। কারণ নদীর ধার কত কী কাজে লাগে। গোরু-মোষ ঐ পথে জল খেতে যায়, ঐ জমি সারা গাঁয়ের নিকাশের জমি, দরকার পড়লে মেয়েরা নদীর ধারের আবরুতে যায়। দশ প্রকার কর্ম নদীর ধারে। সাঁওতাল-কোয়েরীর মিলিত বাধায় পিছিয়ে যান বাবুসাহেব। কিন্তু পিছিয়ে গিয়ে এগিয়ে যাওয়াই তাঁর ধর্ম। বাবুসাহেব যখন দেখেন লাড়লীবাবু রেশমের অফিসারকে নিয়ে এসেছেন নদীর ধারের জমিতে গুটিপোকার খাদ্য রেড়ির চাষের জন্য, তখন তিনি যেন অক্ষয়তূণীর লাভ করেন। তাঁর দুর্ভাগ্য, ইতিমধ্যে এসে যায় বিয়াল্লিশের আন্দোলন। থানাতে স্বরাজ হয়ে যায়। এই দেশব্যাপী আন্দোলনে সে কিছু করার সুযোগ পায় নি বলে ঢোঁড়াইয়ের দুঃখ ছিল। সবাই মিলে এবার তারই নেতৃত্বে রেশম চাষের তিতলিকুঠিতে আগুন লাগায়। গ্রেপ্তার এড়াতে পলাতক ঢোঁড়াই এবার যোগ দেয় আজাদদস্তায় বা স্বাধীন দলে। সরাসরি রাজনীতির জগতে প্রবেশ করে ঢোঁড়াই।

পঞ্চায়েতের সঙ্গে বিরোধিতা করে যে ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত, মনোজগতের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে রাজনীতির জগতে প্রবেশ যেন

তার বিধিনির্দিষ্ট ছিল। আজাদদস্তায় প্রবেশের আগে থেকেই সে অবশ্য রাজনীতির সংশ্রবে আসতে শুরু করেছিল। আর সেই রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছে ক্রমেই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেরণগুণী গান্‌হী বাওয়ার কাছে হার মানে। মদের দোকানে সদ্য মদ খেয়ে এসে গান্ধীমাহাত্ম্য মেনে নিয়ে সে ঘোষণা করে, 'কাল থেকে গান্‌হী বাওয়া, পচই ছাড়া আর কিছু খাব না।' যে-চালকুমড়োর উপর গান্ধীমূর্তি ফুটে উঠেছিল, সেই দৈব চালকুমড়োটি হস্তগত করে বেরণগুণী মেলায়-মেলায় দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে। প্রচারিত আদর্শ আর বাস্তব সত্যের মধ্যে বিপুল পার্থক্য এই কৌতুকজনক ঘটনার ভিতর দিয়ে সতীনাথ পরিষ্কার দেখিয়ে দেন। বিহারের ভূমিকম্পের পর লাড়লীবাবুর মতো কংগ্রেসীরা রিলিফের কাজের জন্য জেল থেকে ছাড়া পায়। নিজে হাতে কুয়ো পরিষ্কার করার জন্য লাড়লীবাবু পিঠ চাপড়ান ঢোঁড়াইয়ের—স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত রেখেছে সে। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন যখন বাবুসাহেবের পুত্র লাড়লীবাবু তখন সবাই ভাবে, 'সত্যি, দৈত্যকুলে এমন প্রহ্লাদ জন্মালো কী করে।' এই কংগ্রেসী প্রহ্লাদের স্বরূপ অবশ্য ক্রমেই প্রকাশ পায়। ভূমিকম্পের পর বছর ঘুরে গেল, প্রতিশ্রুত রিলিফ এল না। যখন এল, দেখা গেল বাবুসাহেবের বাড়িতে সব ইঁট সিমেন্ট জড়ো হয়েছে। জিরানিয়ায় মাস্টারজীর আশ্রমে খবর নিয়ে দেখা গেল, বিসকন্ধার রিপোর্টে বলা হয়েছে, গরিবদের ঘরের কোনো ক্ষতি হয় নি আর কোয়েরীটোলার লোকেরা নিজেরাই কুয়ো পরিষ্কার করেছে। সাহায্য দরকার যাদের বাড়ি পাকা, কেননা ক্ষতি হয়েছে তাদেরই। লাড়লীবাবুর কাছে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করতে গেলেই তিনি জানান, জমির ব্যাপারে তিনি থাকেন না, ওসব দেখেন বাবুসাহেব ও আনোখীবাবু। ইতিমধ্যে কৌশলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লাড়লীবাবু হয়ে যান ডিস্ট্রিবোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব। জমিদার শ্রেণী থেকে কি ভাবে স্বাধীন ভারতের শাসকশ্রেণী অঙ্কুরিত হয়েছে তারই ইতিহাস ইঙ্গিতে রেখে যান সতীনাথ লাড়লীবাবুর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। লাড়লীবাবু চেয়ারম্যান হবার পরেই ডিস্ট্রিবোর্ডের অবসিয়র এসে পাক্কী থেকে বাবুসাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে দেয়। গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, 'সাহেবী টুপী না থাকলে কী হয়, লাড়লীবাবুও হাকিম। নতুন হাওয়া গাড়ি কিনেছে দেখিস না চেয়ারম্যানসাহেব।'

ইতিমধ্যেই নতুন শাসনতন্ত্র অনুযাযী জিবানিযাব নিকটবর্তী গণ্ডগ্রামেও 'বোট' বা ভোটেব বার্তা নিযে হাজিব হয় বলণ্টিযবজীবা। ঢোঁডাইযেব সহজাত নেতৃত্বক্ষমতা আছে বুঝে তারা তাকে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করে, ঢোঁডাইজী বলে ডাকে। ঢোঁডাই ভাবে বলণ্টিযবজী তাকে 'পনর বিঘা জমিওযালা লোকের ইজ্জৎ দিযেছে, বামায়ণ-পডা লোকেব ইজ্জৎ দিযেছে।' এই ফাঁপা সম্মানের ছিদ্রপথে ঢোঁডাইকে ঠকানো সহজ হযে যায়। তাকে বোঝানো হয, সাদা বাক্সে 'বোট' দিলে মহাৎমাজীকে যাবতীয় উৎপীডনের বিরুদ্ধে চিঠি লেখা হল। তাদের ভোটের জোবে কংগ্রেস সবকাব প্রতিষ্ঠিত হল পাটনায। গিধবেব মতো লোকও খাদি পবা ধরেছিল এই সময দিন কতক। বলণ্টিয়রের মাধ্যমে গাঁযেব লোকেরা খবর পায, কংগ্রেস সরকার যে নতুন কানুন বানিযেছে সেই অনুযায়ী আধিযাদারেবা আঠাবো-বাইশ ভাগ পাবে এবং ধান দিযে রসিদ পাবে। কিন্তু রসিদ চাইতে গিযে দেখা যায, রাযতী স্বত্বধাবী বচ্চন সিং বাবু-সাহেবের মতো তথাকথিত কিষাণের আধিয়াদাবদের সেই রসিদ চাইবার হক নেই। তাছাডা, আগে থেকেই এই মর্মে দলিলে টিপ-ছাপ দেওযানো আছে যে এদের জমি দেওযা হল মাত্র এক বছবের জন্য। এই ঘটনায় প্রমাণ হযে যায কংগ্রেসী ভূমিসংস্কারের শূন্যগর্ভতা। জমি যাদের আর্থিক সম্পদের ভিত্তি, সেই লাডলীবাবুরা যদি ভূমিসংস্কাব-ব্যবস্থাব আযোজন করে, তাহলে অবশ্য এই জাতীয ভূমিসংস্কারই ঘটে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। কিন্তু জনসেবার সুস্বাদ পেযেছেন যে লাডলী-বাবু, তিনি ডিস্টিবোডের চেবমেন পদ থেকে ইস্তফা দেওযায কোনো আগ্রহ বোধ কবেন না। বলণ্টিযবরা আগে বাবুসাহেবের বৈঠকখানায আশ্রয পেত, সেখানেই খানাপিনা কবত। কিন্তু লাডলীবাবু কংগ্রেস ছাডাব সঙ্গে সঙ্গে বাবুসাহেবেব কাছে বলণ্টিযবজীব আব আদব থাকে না।

কংগ্রেসী বাজনীতির সঙ্গে সমান্তবালভাবে প্রবহমাণ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিব অনতিপ্রচ্ছন্ন ধারাব সঙ্গেও আমাদেব পবিচয করিযে দেন সতীনাথ এই উপন্যাসে। মুসলমান চামডাব ব্যবসাযী এক মেথবানীকে মুসলমান কবে নিযে বিযে কববে এটা তাৎমাদেব সহ্য হয না। তাকে রক্ষিতা বাখুক আপত্তি নেই, ধর্মান্তবিত কবাতেই তাদের আপত্তি। নিজেবা হিন্দু কিনা তা তাবা জানে না, শুধু জানে তাবা মুসলমান নয। মেথরানীকে তাবা ছোঁয না ঠিক, তা হলেও সে তাদেরই মেযে। সেই

মেয়েকে নিয়ে যাবে 'গোরুখোরে'? বৌকা বাওয়া চাষ ঢোঁড়াইরা মুসলমান চামড়া-ব্যবসায়ীকে জব্দ করুক, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির মোহান্তেরও তাই অভিপ্রায়। গান্‌হীবাওয়া জিরানিয়ায় এলে তাঁর কাছে নালিশের কথাও ওঠে, যেহেতু গান্‌হীবাওয়া মেথর-মেথরানীদের ভালোবাসেন। তাৎমা ছেলেরা মহরমে লাঠি খেলে শুনে পচ্ছিমা মেয়ে বামিয়া অবাক। তাদের পশ্চিমে তো এই রীতি বছর চারেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে। তাৎমাটুলি যে বামিয়ার ভালো লাগে তার অন্যতম কারণ এখানে মুসলমান বাসিন্দা নেই। বোঝা যায়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জায়গায় ক্রমেই আসছে বিরোধ এবং অবিশ্বাস। উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে আমরা ইনসান আলির কথা পাই। সে বাবুসাহেবেরই একজন অনুচর। তারই টাকায় সে জেলাবোর্ডের খোঁয়াড় জমা নিয়েছে। নির্বাচনের সময় দেখা যায়, কংগ্রেস-বিরোধী দলে যেমন বাবুসাহেবের মতো রাজপুতরা, যেমন দারোগা, তেমনি এই ইনসান আলি। কিন্তু লাড়লী বাবু জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েই খোঁয়াড় পাইয়ে দেন গিধরকে, আর বিক্ষুব্ধ ইনসান আলি তখন 'সবুজ নিশানের লিঙে' অর্থাৎ মুসলীম লীগে যোগ দেয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দূরত্ব সত্ত্বেও, আর্থিক স্বার্থে তারা সহজেই একত্রিত হতে পারে। যুদ্ধের সময় লাড়লীবাবু আর ইনসান আলি নেপালে চাল-কাপড়ের আড়তের যৌথ কারবার শুরু করে।

সে যাই হোক, আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়েও ঢোঁড়াই দেখে সর্বত্রব্যাপী মিথ্যাচার, শূন্যগর্ভতা, কথা ও কাজের অপরিমিত দূরত্ব। 'স্বরাজ হয়ে গিয়েছে। বড় দারোগা ছেগেছে, সারকিল মানিজর হাকিমি টুপি খুলেছে।' মহাৎমাজীর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে আন্দোলনকারী জনগণ ভাবে, এতদিন জুলুমকার সরকারকে বছরে এক টাকা দিতে হতো পচই খাওয়ার অনুমতি-পত্রের জন্য, স্বরাজ হওয়ায় গান্ধীজির রাজ্যে অনুমতিপত্র বিনাই পচই খাওয়া যাবে। আজাদ-দস্তা, যার পরবর্তী নাম ক্রান্তিদল তাতে যোগ দিয়ে ঢোঁড়াই দেখে অন্তহীন ঈর্ষাদ্বন্দ্ব দলাদলি। পলাতকদের মধ্যে নেতৃত্বস্থানীয়রা বড় বড় সর্বভারতীয় নেতার নামে ছদ্মনাম নেয়। সেই নাম নিয়েও ঈর্ষার শেষ নেই। সমর্থকদের বাড়িতে একদল আত্মগোপনকারী ভালো খায়দায়, অন্যদের তেমন জোটে না। ভয় দেখিয়ে, চাঁদা আদায় হয়েছে একমাত্র কাজ, সেই চাঁদা তোলা নিয়ে দলে-উপদলে বিরোধ। ইউনিয়ন বোর্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছিল একজন, ক্রান্তিদলে যোগ দিয়ে প্রথম সুযোগেই সে ইউনিয়ন

বোর্ডের খাতাপত্র আগুনে জ্বালিয়ে দেয়। সবাই অন্য সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নির্মম হতে চায়, নইলে দলের মধ্যে কায়ের বা কাপুরুষ বলে দুর্নাম রটবে। অথচ রামায়ণজী ঢোঁড়াই তাদের কোনো নিষ্ঠুর শাস্তিমূলক কাজে বাধা দিলে তারা বাইরে বিরক্তি প্রকাশ করলেও ভিতরে-ভিতরে স্বস্তি বোধ করে। আর 'আজকাল হয়েছে মিটিন আর মিটিন, আর মিটিন।' নিত্য মিটিং আর নিত্য ঝগড়া। দল যত ছোট হচ্ছে, তত মনোমালিন্য বাড়ছে। 'আসল রাজনীতির প্রথম পাঠ নিতে-নিতে ঢোঁড়াই হাই তোলে।' গ্রাম্য ঘুমপাড়ানি ছড়ায় ক্রান্তিদলের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢোঁড়াইয়ের অবসাদ কাটে বটে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও, নিত্যনূতন প্রোগ্রাম সত্ত্বেও, এক ক্লান্ত একঘেয়েমি ও নির্বেদ তাকে যেন গ্রাস করে। তার উপরে আছে সর্বদা ধরা পড়ার আতঙ্ক। 'বাতাব ঘুণধরা বাঁশের কুট্‌কুট্‌ শব্দকেও ঘোড়ার খুরের শব্দ বলে ভুল হয়।' কংগ্রেস আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলে কেউ-কেউ সারেণ্ডার করে, কেউ দলের টাকা ও পিস্তল নিয়ে নেপালে পালিয়ে যায়। এই অস্থির অনিশ্চিত জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে। আর, তাই ঢোঁড়াই দিন-দিন নিজেকে বেশি করে গুটিয়ে নেয় তার রামায়ণ-খানার মধ্যে।

এই 'totality of objects' বস্তুজগতের সমগ্রতার সঙ্গে ঢোঁড়াই চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' উপন্যাস। এই আধুনিক এপিক। এই ঢোঁড়াই-চরিত্রের পরিকল্পনা বুঝতে গেলে সতীনাথের ডায়েরির একটু অংশ আমাদের জেনে নিতে হয়। তিনি লিখেছেন, 'আমাদের চিন্তাধারার, ethics-এর, ভালমন্দ বিচারের সব চেয়ে মৌলিক contradiction হলো যে, যে values-গুলোকে আমরা নৈতিক-দৃষ্টিতে উঁচুস্থান দিই সেগুলো দিয়ে successful man হওয়া যায় না সমাজে। সেগুলো যে লোকের আছে তারা সমাজে misfits। উদারতা, লোভহীনতা, সারল্য, সাধুতা, প্রাণখোলা ভাব, দিলদরিয়া হাসিখুশির ভাব, ভাবালুতা, আদর্শবাদিতা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি গুণগুলিকে আমরা উচ্চস্থান দিই। অথচ এগুলো দিয়ে জীবনে সাফল্য লাভ করা যায় না। এদিকে জীবনে সাফল্য-লাভকে সমাজ বড় মনে করে।' ব্যাপক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে সতীনাথ জেনেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়ে দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা অনেক বেশি উদার। স্ত্রীলোকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদার ব্যাপারে, নেশার ব্যাপারে সেই উদারতাবোধের পরিচয় মেলে। মানুষের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ নিয়ে তারা ভুল

বোঝে না। অথচ তারা সিনিক নয়, জীবন সম্বন্ধে প্রত্যয়ের এক গভীরতা তাদের প্রাণিত করে। এইসব ভাবনার ভিত্তিতে, ভারতবর্ষীয় গড়পড়তা মানুষকে আশ্রয় করে, ঢোঁড়াইকে এক আদর্শচরিত্র হিসেবে গড়ে তুলেছেন সতীনাথ। সেই শুধু ঢোঁড়াই নয়, সে ঢোঁড়াই রামচন্দ্র।

জন্মের পরে-পরেই তার বাবা মারা গেছে। মা পুনর্বিবাহ করেছে বলে মায়ের দ্বারাও সে পরিত্যক্ত। বৌকা বাওয়ার থানে থাকে সে, তারই সহচর। বাওয়ার ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গি। নির্দিষ্ট কোনো পেশা নেই, পারিবারিক জীবনের বন্ধন নেই, তাই সে ভিতরে-ভিতরে নিরাসক্ত। অথচ চারদিকের জগৎ সম্বন্ধে প্রখর দৃষ্টি তার। ছোটদের দলের পাণ্ডামি করে ক্রমেই সে নেতৃত্বগুণ অর্জন করে। 'আর কী জেদী, কী জেদী। বকে ঝকে কি ওকে সামলানো যায়। ঝোঁক একবার উঠলে হল।' তাছাড়া সকলের সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের ভাব। ধাঙ্গড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির চিরাগত ঝগড়া, কিন্তু ঢোঁড়াই ধাঙ্গড়টুলিতে যায়, সেখানকার লোকেদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। ক্রিশ্চান ধাঙ্গড়দের মধ্যে কেউ-কেউ তাকে এতদূর ভালোবাসে যে তাকে 'সনরেটা' বলে ডাকে। অন্য তাৎমাদের মতো সে কখনো গায়ে পড়ে ঝগড়া শুরু করে না, কিন্তু ঝগড়া একবার আরম্ভ হলে সে পালায় না। নিয়মভঙ্গ করার, পঞ্চায়েতকে অমান্য করার সাহস তার আছে। সেই সাহসেই সে পাক্কী মেরামতের কাজে যোগ দেয়। সে জানে, যে-পঞ্চায়েত তাকে খেতে দেয় না, সেই পঞ্চায়েতের অধিকার নেই তার উপার্জন-পদ্ধতি নির্ণয়ের। অভিমানী জেদী ঢোঁড়াই যে মায়ের প্রতি অভিমান করেই রাস্তা সারাইয়ের কাজে যোগ দিয়েছে, সেটা অন্তত তার মা বোঝে। আবার তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে যে-পঞ্চায়েত বৌকা বাওয়াকে নিপীড়িত করে, সেই পঞ্চায়েতকে সে-ই বাঁচিয়ে দেয় পুলিশের হাত থেকে। বাঁচিয়ে দেয়, বাওয়ার প্রতি শ্রদ্ধাবশত, জাতের প্রতি আনুগত্যবশত। পৈতা-ধারণের ব্যাপারেও সে পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে যেতে ডরায় না। 'আর কেউ না নিক, আমি একাই পৈতা নেব।' এই একলা চলার সাহসের জন্য, সবাই স্বীকার করে, 'হিম্মৎ আছে ছোকরার।' তাৎমাটুলির গরু চরানো জমিতে পুলিশ যখন লবণ সত্যাগ্রহের আয়োজন ভণ্ডুল করতে আসে, তখন ঢোঁড়াই-ই চৌকীদারী খাজনার অন্যায্যতার অভিযোগ সাহস করে হাকিমের কাছে তোলে এবং লোকচক্ষুতে বড় হয়ে যায়। ঢোঁড়াইয়ের তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধি আমাদের আকৃষ্ট করে, আকৃষ্ট করে কার্যকারণ বুঝে নিতে

পারায় তার সহজাত দক্ষতা। ধান-বোঝাই গরুর মিছিল পাকা রাস্তা নষ্ট করে চলে, রাস্তা মেরামতকারী বোকারা ভাবে গরুর গাড়ি চলাচল বন্ধ করা উচিত। ঢোঁড়াই জানে, রাস্তা এইভাবে ভাঙে বলেই তারা কাজ পায়, তাদের রোজগার হয়।

কৈশোরের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মায় ঢোঁড়াইয়ের মনে। মহতো বা মহতো-গিন্নির চতুর অভিপ্রায়কে সে প্রশ্রয় দেয় না বটে, কিন্তু তাদের পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়ার প্রতি সে মমত্ববোধ করে। ধানকাটনীর দল যখন ফেরে তখন ফুলঝরিয়ার নবলব্ধ বন্ধু রামিয়া তার নজর কেড়ে নেয়। সে ইন্দ্রাসনের পরীর মতো দেখতে, 'কাঁচা কঞ্চির মতো লচক মেয়েটার দেহে।' তার দিকে তাকিয়ে এক অনাস্বাদিত অনুভূতি তাঁর দেহমনকে আচ্ছন্ন করে। রামিয়ার কথাবার্তা, তার চালচলন ঢোঁড়াইকে বিহ্বল করে তোলে। তার নাম সুন্দর, আচার-আচরণ সুন্দর, কর্মিষ্ঠ এই মেয়ে। বাবার থান নিকিয়ে দেওয়ার কথা যখন বলে রামিয়া, যখন থানে সে প্রতিদিন প্রদীপ জ্বেলে দেয়, তখন একেবারে অভিভূত হয়ে যায় ঢোঁড়াই। গভীর ভালোবাসায় বিয়ের পর রামিয়াকে একেবারে আপনার করে পেতে চায় ঢোঁড়াই। নিজেও স্বতন্ত্র, রামিয়াকে সে সকলের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। তাকে রোজগারে বেরোতে দিতে চায় না। রাজ্যের লোক এসে তার বৌয়ের সঙ্গে গল্প জুড়বে বলে সে মুদির দোকান দিতেও নারাজ। অথবা হয়তো এক জায়গায় স্থিতিশীল হয়ে থাকা তার অনাসক্ত মনের অনুকূল নয় বলেই সে দোকানী হতে চায় না। গাড়ি-বলদ কেনে সে। গাড়ি নিয়ে কত দূরে-দূরে চলে যায়—দৃষ্টি ক্রমেই হয় তার প্রসারিত। রামিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় তার জগৎ একেবারে শূন্য হয়ে যায়, কিন্তু সিনিসিজম্ তাকে গ্রাস করে না। ভারতবর্ষীয় সাধারণ মানুষের যে-গভীর প্রত্যয়ের কথা সতীনাথ বলেছেন, সেই প্রত্যয়, জীবনের প্রতি সেই আস্থা, ঢোঁড়াইকে অনুপ্রাণিত করে। তাই সে বিসকন্ধায় নতুন করে জীবন শুরু করে। শিলাবৃষ্টিতে মোসমনত-সাগিয়ার খেতের তামাক নষ্ট হলে সে দুঃখ পায়। অথচ তাৎমাটুলিতে শিল পড়লে সে খুশি হতো বাবুভাইয়াদের ছাতের খাপরা ভাঙতো বলে, মেরামতির কাজ পাওয়ার সুযোগ হত বলে। সে বোঝে, 'মন বদলাচ্ছে তার, বিসকন্ধার জিনিসের উপর মায়া বসছে।' জীবনের প্রতি নতুন করে মায়া বসছে, নতুন নারীর প্রতি সে আকর্ষণবোধ করছে। সাগিয়াকে দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে চলাকুমারের গানের

সেই রাজকন্যার কথা। 'একে দেখলেই মন ভিজে ওঠে ঠাণ্ডা মিষ্টিরসে।' ভালোবাসা—নারীর প্রেম, অপত্যস্নেহ। বামিয়ার গর্ভে যে-সন্তানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তাকে সে ভুলতে পারে না। সাগিয়া যখন মামলা-লড়ার জন্য ঢোঁড়াইকে তার মৃত সন্তানের মালা দেয়, তখন এই মৃতবৎসা মায়ের জন্য সমবেদনায় তার মন ভরে ওঠে। সেই মালা সে সব সময় সঙ্গে রেখে দেয়। এনটনি, যাকে সে নিজের ও বামিয়ার ছেলে মনে করেছিল, তার চিকিৎসার জন্য সাগিয়ার মৃত সন্তানের এই মালা বিক্রিতে ঢোঁড়াইয়ের মন সায় দেয়। এই ছেলের মধ্যে তার ও সাগিয়ার ছেলে এক হয়ে যায় যেন। নিজের ছেলে মনে করে এনটনিকে প্রাণপণে সে ভালো করে তোলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জানতে পারে, এ-ছেলেও তার ছেলে নয়।

মোসম্মতের খেতের মজুর হিসেবে কাজে ঢুকেছিল ঢোঁড়াই। কিন্তু মাইনেও সে চায় নি কোনোদিন। কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে যায় সে, তাদের দায়-দায়িত্ব তুলে নেয়। মোসম্মত স্বাভাবিক বিষয়-বুদ্ধিতে বোঝে ঢোঁড়াই মানুষটা খাঁটি। কিন্তু সাগিয়াকে বিয়ে করে মোসম্মতের জমি দখলের মতলবে ছিল যে গিধর মণ্ডল, সে স্বভাবতই ঢোঁড়াইকে মনে করে তার অভীষ্ট অর্জনের পথে বাধা। অন্যদিকে 'বাধা না পেলে ঢোঁড়াইয়ের আসল রূপ খোলে না।...এই টক্কর দেওয়ার সাধ বড় মিঠে।' নতুন গাঁয়ে এসে ঢোঁড়াই বীজধানের দাবির মিছিলে নেতৃত্ব দেয়। ক্রুদ্ধ বাবুসাহেবের কটক সঞ্চরণ শুরু হলে মোকদ্দমার চেষ্টা করে ঢোঁড়াই। বিরোধের কাজেও ঢোঁড়াই, গঠনের কাজেও ঢোঁড়াই। ভূমিকম্পে কুয়ো নষ্ট হয়ে গেলে, অন্যের সাহায্যের অপেক্ষায় না থেকে কুয়ো সাফ করে ঢোঁড়াই। ধীরে ধীরে রাজনীতির সংশ্রবে চলে আসতে হয় ঢোঁড়াইকে, তার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির অনিবার্য পরিণাম হিসেবে। বলন্টিয়ররা তার নেতৃত্ব দক্ষতাকে মেনে নেয়। আজাদদস্তায় ক্রান্তিদলে তার মায়া-মমতা আর দয়াকে সবাই পরিহাস করে বাইরে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার স্বাতন্ত্র্যকে, তার নৈতিক শ্রেয়তাকে সবাই স্বীকার করে। তাই তার নাম হয় রামায়ণজী। শুধু রামায়ণ সে পড়ে বলে নয়, রামায়ণের শুভত্ববোধ তার মধ্যে বিগ্রহ পেয়েছে বলেও। রাজনীতিতে যোগদান করে ঢোঁড়াই দেখে, সেখানেও ক্রমান্বয় বিশ্বাসঘাতকতা। যেমন ব্যক্তিজীবনে, তেমনি রাজনৈতিক জীবনে এক মহাশূন্যতার সামনে এসে দাঁড়ায় ঢোঁড়াই। নিজেকে তার সর্বস্বান্ত মনে হয়, নিঃসীম রিক্ত তার জগৎ। তাৎমাটুলি ছেড়ে

বেরিয়ে পড়ার সময় তার মনে হয়েছিল 'একেবারে একা সে দুনিয়ায়। তার মন চেয়েছিল বাঁধা পড়তে। কিন্তু তার কপালই আলাদা, ছোটবেলা থেকে সে দেখে আসছে।' আবার গিধরের মন্ত্রণায় মোসম্মত যখন ঢোঁড়াইকে চলে যেতে বলে তখন ঢোঁড়াই দেখে, 'যখনই ঢোঁড়াইয়ের জীবনটা চলনসই গোছের হয়ে আসে, অমনি একটা আঁধি উঠে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়।' ঘর ছাড়বার মেয়ে নয় সাগাই, কিন্তু মায়ের উপর অভিমান করে, গিধরের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে যেন আত্মহত্যা করে—বিদেশিয়ার নাচের দলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। ঢোঁড়াই মোসম্মত বা সাগিয়া কারো উপর রাগ করতে পারে না—'সব জায়গা থেকে তাকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে তার কপাল।' এই কপাল,—তার স্বভাব, তার চারিত্র্য। এই নৈতিকতা-অনুপ্রাণিত মানুষ সাংসারিক অর্থে successful man হতে পারে না, ব্যক্তিজীবনে পারে না, সমাজজীবনে পারে না, রাজনৈতিক জীবনে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে একা থেকে যায়—'একেবারে একা সে আজ এই দুনিয়াতে।'

এইভাবে দেশ-কাল ও মানুষ নিয়ে লিখিত হয়ে যায় এক আধুনিক এপিক—এক আধুনিক রামকথা। তিরিশ বছরের কিছু বেশি সময়, জিরানিয়া শহরের নিকটবর্তী জনপদ, যা আসলে অণু-ভারতবর্ষ আর অনেক মানুষ—এই হলো উপাদান। এক স্থানুসমাজ অর্থনৈতিক অভিঘাতে ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে নিশ্চেতনার নির্মোক খসিয়ে চলমান হতে শুরু করেছে। এক উল্লেখযোগ্য কালখণ্ডকে আশ্রয় করে ভারতবর্ষের এক পরিবর্তনের কাহিনীর মধ্যে আমরা মহাকাব্যের কথাবস্তুর ব্যাপ্তি পেয়ে যাই। দেশের সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানের এক বীরোচিত পর্ব তার প্রধান প্রসঙ্গ। তারই মধ্যে ঘটেছে একজন নায়কের বিকাশ—কারণ ভারতবর্ষের এক বিপুল পরিবর্তনের কাহিনী একজন মানুষের বিকাশের ইতিহাসকে অবলম্বন করেই বিধৃত হয়েছে। এই নায়কের নৈতিক চেতনা, সহজাত ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব, দৃঢ়তা ও সরল সাধুতা ভুলিয়ে দেয় তার জন্মের সামান্যতা। এক প্রধান কাহিনী ও এক নায়ককে অবলম্বন করে কত মানুষ, কত অজস্র মানুষ, নায়কের জীবনের এক এক কাণ্ডে তারা আবির্ভূত হয়, আবার তারা মিলিয়ে যায়। বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র কাহিনী, নানা রসের সমাবেশ। সব মিলিয়ে পেয়ে যাই জীবন সম্বন্ধে এক প্রচ্ছন্ন গূঢ়গভীর আস্থাশালতা, এক অবিকল প্রশান্তির

প্রান্তে আমরা পৌঁছে যাই। এইভাবে এক আধুনিক মহাকাব্যের আস্বাদ পাইয়ে দেন লেখক। সর্বশূন্যতার মধ্যে লক্ষ কবি ঢোঁড়াই যে সারেণ্ডার করতে চলেছে, তার কারণ সে জানে 'জেলে সাগিয়া আছে।' যতক্ষণ সাগিয়া আছে, জীবনের প্রতি প্রত্যয় ততক্ষণ অটুট আছে।

একটা প্রশ্নের মীমাংসা বাকি থাকে। সতীনাথ তো ভেবেছিলেন এই উপন্যাসের তৃতীয় চরণ লিখবেন তিনি। তার নামও ভেবে রেখেছিলেন 'উত্তরঢোঁড়াইচরিত'। তার অগ্রজ ভূতনাথ ভাদুড়ীর কথা থেকে সেই অজাত উপন্যাসের বিষয়বস্তুও জানা যায়—'তৃতীয় চরণে ঢোঁড়াই-এর স্বাধীনোত্তর রাজনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে লেখার ইচ্ছা ছিল। স্বাধীনতার পর দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র, সরকারি অব্যবস্থা, পুরাতন রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারি অনুগ্রহলাভের চেষ্টা, অর্থলোলুপতা, স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থ-হরিজন সমস্যা—যা পরবর্তীকালের তাঁর ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পে প্রকাশ পেয়েছে—এই সবই লেখার ইচ্ছা ছিল—ঢোঁড়াই তৃতীয় চরণে।' স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যখন 'রাজকাজ' শুরু করেছে, তখনকার ভারতবর্ষকে তিনি 'উত্তরঢোঁড়াইচরিত'-এ রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় চরণ প্রকাশের পর প্রায় বছর পনেরো সতীনাথ জীবিত ছিলেন, কিন্তু পরিকল্পিত তৃতীয় চরণে তিনি হাত দিলেন না কেন? নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, ভালো বিক্রি হলে 'শুধু উত্তরঢোঁড়াইচরিত কেন, উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত পর্যন্ত লিখে চলতে না?' এই কথাটা অবশ্য হালকা চালেই বলা। কারণ তিনি জানতেন 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ জনপ্রিয় হবার উপাদান নেই। তিনি জানতেন, সমকালীন সাহিত্য জনপ্রিয় হয়—যদি তার মধ্যে উত্তেজক ঘটনার বিবরণ থাকে, যদি তা পাঠকের অপূর্ণ ইচ্ছাকে কল্পনায় পূরণের সুযোগ দেয়। 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ এই দুই লক্ষণই অনুপস্থিত. তবে কি গোপাল হালদারের সিদ্ধান্তই সত্য—'সতীনাথ বুঝেছেন গান্ধী আন্দোলনে উত্তরপুরুষ নেই।' তাই প্রস্তাবিত 'উত্তরঢোঁড়াইচরিত' লেখা হয় নি। কিন্তু তাই বা হবে কেন? যে-ঢোঁড়াইয়ের বিবর্তন সতীনাথ দেখাচ্ছেন, যাকে তিনি দ্বিতীয় চরণের শেষে বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের যুবক অবস্থায় ছেড়ে দিলেন, তার ভবিষ্যৎ বিকাশ গান্ধী-আন্দোলনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষার নতুন নতুন আন্দোলনে সে যোগ দেবে; সে যোগ দেবে, তার উত্তরপুরুষ যোগ দেবে। সেইভাবেই

লিখিত হয়ে যাবে উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত। গান্ধী-আন্দোলন নিষ্ফল হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় মানুষের প্রতিনিধি ঢোঁড়াই বা তার বংশধরেরা নিষ্ফল নয়। সুতরাং গান্ধী-আন্দোলনের বন্ধ্যাত্ব বা ব্যর্থতা উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত রচনায় সতীনাথের পক্ষে বাধা হতে পারে না। বাধা ছিল 'নিজের অপর্যাপ্ততা'-র মধ্যে। তিরিশ সাল থেকে দশ-বারো বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন, তাকেই জারিত করে তাঁর পক্ষে 'ঢোঁড়াইচরিতমানস' লেখা সম্ভব হয়েছিল। উপন্যাসের শেষাংশের ঘটনাকাল ও উপন্যাসের রচনাকালের মধ্যে ছিল প্রায় বছর দশেকের ব্যবধান। স্বাধীনতার পর গ্রামাঞ্চলে যে পরিবর্তন এলো—লাড়লীবাবুরা ক্ষমতাসীন হলেন, গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বঞ্চনা তীব্রতর হল—সেই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট রূপ নিতে বছর দশেক সময় লেগেছে। সতীনাথের হাতে সময় ছিল না। সেই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে খানিকটা সময়গত দূরত্বের নিরাসক্তি দিয়ে তাকে তিনি রূপায়িত করার সময় পান নি। এই সময়গত দূরত্বের অভাবকেই তিনি 'নিজের অপর্যাপ্ততা' বলেছেন, বলে মনে হয়। সতীনাথের যাঁরা সাহিত্যিক উত্তরপুরুষ তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল সেই 'উত্তরঢোঁড়াইচরিত' বা উত্তরোত্তর ঢোঁড়াইচরিত রচনার। সেই দায়িত্ব কেউ পালন করলেন না, যতদিন মহাশ্বেতা দেবী নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ না করলেন।

রাত কত হল

সুতপা ভট্টাচার্য

'রাত কত হল? / উত্তর মেলে না'—'শিশুতীর্থ'র এই আশ্চর্য সূচনা যে ইংরেজির অনুবাদ, সে যে খুব সহজে কবির হাতে উঠে আসে নি, লেখাটির পাঠান্তরগুলিতে তার প্রমাণ আছে।[১] রবীন্দ্রনাথের একমাত্র মূল ইংরেজিতে লেখা এই কবিতা 'The Child' লেখা হয়েছিল ফিল্ম-এ গ্রহণযোগ্য রচনার ফরমাসে। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি থেকে পাই, এ-লেখা শুরু হয় জার্মানির মারবুর্গ শহরে। কিন্তু ঠিক একদিনে বা এক রাতেই লেখাটি সমাপ্ত হয় নি। অমিয় চক্রবর্তীর চিঠির তারিখ অনুসারে এটি শুরু হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জুলাই, আর প্রথম জনসভায় পাঠ করে শোনান কবি ১ ডিসেম্বর, নিউ-ইয়র্কের কার্নেগী হলে।[২] অর্থাৎ প্রায় চারমাস ধরে কবিতাটি রচিত হতে থাকে। ১৯৩০-এর এই বিদেশ-ভ্রমণে সম্ভবত আর কোনো কবিতা তিনি লেখেন নি।

'The Child'-এর যে-পাঠগুলি পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায়, তার কোনোটিতেই কোনো তারিখ নেই যদিও, তবু, কবিতার পরিণতির ক্রম নির্দেশ করা কঠিন নয়। রক্ষিত পাঠগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটি প্রাথমিক বলে মনে হয়, সেটি একটি টাইপ কপি, নাম নেই। এর উপর যেসব

---

১. 'The Child'-এর প্রথম অংশের পাঁচটি পাঠান্তরসহ মূল লেখা আলোচনার শেষে সন্নিবিষ্ট হল।

২ ১৯৩০ সালের ৫ ডিসেম্বর-এ লেখা একটি চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'The Babe'-এর একটি পাণ্ডুলিপি পাঠান Frederick Bohn Fisher-কে। এই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে কার্নেগী হলে তিনি কবিতাটি পড়ে শুনিয়েছেন। রবীন্দ্র-ভবনের সংবাদ-পত্র-কর্তিকা থেকে জানা যায়, কার্নেগী হলে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেছিলেন ১ ডিসেম্বর, বক্তৃতার পর দুটি কবিতাও শুনিয়েছেন। ফ্রেড ফিশারকে লেখা চিঠিটি ছাপা হয়েছে ফিশার-এর স্ত্রীর রচিত তাঁর উপর একটি বইতে। কবির পাঠানো 'The Babe' পাণ্ডুলিপিটিও এই বইতে তিনি ছেপে দিয়েছেন, তাঁর ধারণা কবিতাটি অপ্রকাশিত। কবিতাটির চূড়ান্ত পাঠের সঙ্গে এর কোথাও কোনো অমিল নেই। [দ্রষ্টব্য 'Frederick Bohn Fisher—World Citizen', by Welthy Honsinger Fisher, New York, 1944]

সংশোধন করেছেন কবি, তার সঙ্গে আরো সংযোজন করে রচিত হয়েছে একটি হাতে-লেখা পাঠ। এই দুটি পাঠেই কেবলমাত্র প্রথম অংশটুকু পাওয়া যায়, পুরো কবিতা নয়। প্রথম পাঠটির দৃশ্যগত বর্ণনার পর দ্বিতীয় এই পাঠটিতে জোড়া হয়েছে শব্দের মাত্রা—পৃথক একটি অনুচ্ছেদে। টাইপ করা আরো দুটি পাঠ রয়েছে, ভিন্ন দুই শিরোনামায়, গোটা কবিতাটি পাওয়া যাচ্ছে দুটি পাঠেই। এর একটির নাম 'He is Eternal, he is newly born', অন্যটির 'The New-comer'। এই পাঠদুটির প্রথম অংশ থেকে নির্ধারণ করা মুশকিল, কোনটি আগের আর কোনটি পরের। কেন-না কবির স্বহস্তে লেখা 'The Babe' পাঠটির সঙ্গে দুটি পাঠেরই মিল আছে যেমন, অমিলও আছে তেমনই। কিন্তু শেষ অংশটি দেখলে দেখা যায় 'The New-comer'-এর পাঠই অনুসৃত হয়েছে 'The Babe'-এর কবির স্বহস্তে লেখা পাঠে, আর টাইপ করা পাঠেও—পুস্তিকাধৃত 'The Child' যার সঙ্গে সর্বাংশেই এক। তাই 'He is eternal, he is newly born' নামের পাঠটিকেই তৃতীয় পাঠ বলা গেল, আর 'The New-comer' হল চার নম্বর পাঠ। কবির হাতে-লেখা 'The Babe' পাঠটি পাঁচ নম্বরের।

'The Babe' নামে দুটি টাইপ করা কপি রয়েছে সংগ্রহে, দুটিরই উপর লেখা আছে 'final version'—এইটিই চূড়ান্ত পাঠ, ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে যেটি ছাপাখানায় দেওয়া হয়েছে। যদিও এই পাঠ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে ১৯৩০-এ-ই, আর রবীন্দ্রনাথ বিশপ ফিশারকে লিখেছিলেন, ম্যাকমিলান ওটি বড়দিনের আগেই ছাপতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত ম্যাকমিলান কেন যে ছাপে নি, আর ছাপতে এতটা দেরিই বা হল কেন—তা ঠিক জানা যায় না।

মাথায় চলচ্চিত্র ভাবনা ছিল বলেই হয়তো যা বর্ণনার বিষয়, তাকেও ছবির পর ছবি দিয়েই ফলিয়ে তুলেছেন কবি—'The Child'-এর এই প্রথম অংশেও স্পর্শাতীত সময়কে স্পর্শযোগ্য করে তুলতে চাইছেন দৃশ্যে আর শব্দে আর পরিমিতি রচনায়। শুধু চলচ্চিত্রের জন্যে লিখছেন বলেই নয়, মনে রাখা উচিত এই সময়টায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কলালক্ষ্মীরই সান্নিধ্যে রয়েছেন সবচেয়ে বেশি। একটির পর আরেকটি শহরে তাঁর ছবির প্রদর্শনী দেখানো হচ্ছে, ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন দেশ-বিদেশের হরেক জ্ঞানীগুণী। ছবি-আঁকার সময় হয়ত হাতে নেই তখন, কিন্তু ছবি আঁকার

৩. 'The Child' কিংবা তার অনুবাদ 'শিশুতীর্থ'র সবটুকু নয়, কেবলমাত্র প্রথম অংশটিই এই আলোচনার বিষয়।

জন্যে মন উন্মুখ হয়ে রয়েছে, জার্মানি থেকে কাগজ কিনেছেন আঁকার, ফরাসি কালি কেনার ফরমাস করছেন রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে। তাঁর ছবি-আঁকার মেজাজই তাই যেন মনে হয় সঞ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর কবিতার ভাষায়। তাঁর ছবিতে দেখতে পাই প্রায়ই রেখাকে ডিঙিয়ে যায় রঙ। রেখা যেখানে প্রবল, সেখানেও তার কাজ বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনায় নয়, বরং বস্তু যেন নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অন্য দিকে ইশারা মেলে ধরে। এইভাবেই তাঁর ছবি মিলতে চায় কবিতার সঙ্গে।

'The Child'-এর প্রথম পাঠ থেকেই দেখি এর বিপরীত গতি—কবিতা এসে মিলতে চাইছে ছবির সঙ্গে। রাত্রির ছবি আঁকছেন যেন ভাষায়—প্রথম পাঠে রঙের কাজ আর রেখার কাজ মিলে-মিশে রয়েছে, যেন তুলিতে একবার রঙ চড়াচ্ছেন, আবার তুলি ফেলে নিচ্ছেন পেন্সিল; অল্প পরেই পেন্সিল ছুঁড়ে আবার তুলে নিচ্ছেন তুলি। 'পাহাড়গুলিতে রাত্রি গভীর, মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গেছে' এটুকুতে রঙের টান, ঠিক তারপরেই অসংবদ্ধ বস্তুর প্রসঙ্গ, পর পর কয়েকটি ফর্ম সৃষ্টি। তারপরে আবার ফিরে যাচ্ছেন কবি রঙে—বলছেন রাত্রির থেকেও কৃষ্ণতর ছায়ার কথা, আর তার পাশাপাশি রাখছেন দিগন্ত জোড়া আলোর লাল রঙ।

প্রথম পাঠের এই অংশের পংক্তিক্রম বদলায় না দ্বিতীয় পাঠেও। তৃতীয় পাঠেও দেখি, রঙের আয়োজনেই কবি মন দিয়েছেন বেশি, একসঙ্গে এনেছেন রঙের প্রসঙ্গগুলি আর পেন্সিলে আঁকা বিবিধ ফর্মগুলির বেশ কিছু মুছে দিয়েছেন। 'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো'—আশ্চর্য এই দ্যোতনাময় পংক্তিটি প্রথম দেখা দিল এই তৃতীয় পাঠেই। কিন্তু চতুর্থ আর পঞ্চম পাঠে কবি এটি বর্জন করেছিলেন কেন? তখন কি তাঁর মনে হয়েছিল এত কথা বলার সামর্থ্য নেই রঙের? চূড়ান্ত পাঠে হয়তো বা কবিতার দিক ভেবেই কবি পংক্তিটি ফিরিয়ে এনেছিলেন আবার। সময়কে, 'অন্ধ কাল'কে সরাসরি উপস্থাপন করলেন তৃতীয় পাঠেই প্রথম। পথ খুঁজে না পেয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে অন্ধকাল—সমসময়ের সমস্ত উদ্‌ভ্রান্তি এই ছবিতে শরীরী হয়ে ওঠে। কিন্তু আঁকতে চাইলে কী-ভাবে আঁকা যাবে সময়ের মূর্তি? জানি না, সেইজন্যেই কিনা, ছবিটি পরের পাঠে বাদ পড়ে যায়। পরের পাঠে অবশ্য আবার এটি ফিরিয়ে আনেন কবি। তৃতীয় পাঠে মুছে দেওয়া রেখার কাজগুলি কিন্তু চতুর্থ পাঠে ফিরে আসে আবার। চিত্রবস্তুর সংস্থান বিষয়ে যেন

মনস্থির করতে পারছেন না কবি। পঞ্চম পাঠে রঙের কাজ আর রেখার কাজ আবার পৃথকভাবে সাজিয়েছেন, তৃতীয় পাঠের মতোই, এ-পাঠেই, প্রায় যেমন আমরা মুদ্রিত 'The child' দেখি, তেমনই। পংক্তিগুলি এই পাঠেই প্রথম গদ্যের মতো টানা নয়, কবিতার মতো অসমান।

রাত্রির এমন নঙর্থক ছবি রবীন্দ্রকাব্যে দেখা যায় না বড় একটা। কালো থেকে আলোয় উত্তরণের বাণীই তিনি শুনিয়েছেন বারবার। 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থে একবার মাত্র নঙর্থক এই নিশীথ চেতনা রূপ নিতে দেখি :

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
বসেছি বসিয়া।
চারিদিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হু হু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।
পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী।
আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়।
কাঁদিছে পেচক—
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে
না পড়ে পলক।

('নিশীথজগৎ', 'ছবি ও গান')

এ ছবির রঙের বিন্যাস যদি লক্ষ করি, দেখব—পুরো পট জোড়া তারার আলোয় উজল হালকা কালো, তার উপরে ঘন কালো লেগেছে পশ্চিমের মেঘে, আর মেঘের প্রান্তে রয়েছে বিদ্যুতের চড়া আলোর রেখা। 'শিশুতীর্থ'র ছবির পটভূমির কালো আরো নিবিড়—প্রথম পাঠের 'পাহাড়-

তলির গভীর রাত' বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে 'মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের' ভয়াবহতায়। এরই উপর আকাশের বুক-চেপে-ধরা মেঘ, চূড়ান্ত পাঠে যা দুঃস্বপ্নের উপমান পায়। মাটিতে রাত্রির চেয়ে আরো গভীর ছায়া পুঞ্জ পুঞ্জ জমে রয়েছে, রূপান্তর নিতে নিতে শেষে যা হয়ে ওঠে 'নিশীথরাত্রির ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ'; এইখানেই তুলির কাজ খুব পরিষ্কার—টানা রঙের বদলে এমন 'গুহায়-গর্তে' ভিন্নভাবে 'পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা'-র বিন্যাসে। ছবি-আঁকার অভিজ্ঞতা আরো প্রত্যক্ষ কালোর মধ্যে আলোর ব্যবহারে। 'নিশীথজগৎ'-এর মতো একটিমাত্র টান নয়—এখানে রয়েছে দিগন্ত জোড়া 'আগ্নেয় উগ্রতা' —যার রাগী চেহারা তৃতীয় পাঠটিতে পরিষ্কার, আর এই রাগী রঙ রবীন্দ্রনাথের ছবি থেকেই চিনে নিতে পারি আমরা। 'An angry ball of fire glowers in the skyline'—তৃতীয় এই পাঠে বাদ পড়েছে 'waxes and wanes' বাক্‌ধারাটিও, যদিও চূড়ান্ত পাঠে তা ফিরে এসেছে আবার। ফিরে এলেও ঠিক আক্ষরিকভাবে কি দেখব একে আমরা, 'জ্বলে আর নেবে' —কি দুই ভিন্ন সময়ের ব্যাপার? যে দুটি উপমানে এ আলো বিশিষ্ট— 'অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি' কিংবা 'অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা'—এ ছবি থেকে সে-রকম মনে হয় না। বরং জ্বলা আর নেবা যেন একই পটে ঘটছে, অর্থাৎ ঘন কালোর পটভূমির উপর রাগী আলোর রঙ একটানা লাগছে না। 'প্রলয়' নামে যে অকৃত ছবির পরিকল্পনা লিখে রেখে গিয়েছেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, তার সঙ্গে 'শিশুতীর্থে'র এ-ছবির সাদৃশ্য পেতে পারেন কেউ: 'আর এইসব ভয়াবহতার উপরে দেখা যাচ্ছে গুমোট-কালো মেঘে মেঘে বায়ুমণ্ডল ভরাট; সে মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে আকাশ থেকে ক্রুদ্ধ বজ্রনিপাতের আঁকাবাঁকা রেখায়, দুর্বোধ্য অন্ধকারের মধ্যে এখানে ওখানে আলো পড়ছে যার থেকে।' লিওনার্দোর এই চিত্রকল্পনায় অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে প্রাণীজগৎ আর মানুষের সংসারের। 'শিশুতীর্থ'তে প্রাণীজগতের পরিবর্তে আছে বস্তুপুঞ্জের ছবি— মানুষের চারপাশে গড়ে ওঠা বস্তুময় ইমারতগুলোই এ-ছবিতে সময়ের মৃত্যুবমনকে রূপ দিচ্ছে। বস্তুর অনুপুঙ্খের প্রয়োজনে রেখাকে বিশেষ কাজে লাগান না রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ছবি তাঁর ভাষায় 'রেখার কবিতায়ন'। সেই শিল্পী-স্বভাবই 'শিশুতীর্থে'র এই বস্তু-ছবিগুলিকে অর্থগর্ভ করে তুলেছে ক্রমশ। ভাঙা সেতু, শুকিয়ে যাওয়া খাল, পরিত্যক্ত কুটির, ছড়িয়ে থাকা ইটপাথরের কাঠামো— প্রথম পাঠের এইসব নির্দিষ্ট রেখার ছবিগুলির বেশ কিছু চূড়ান্ত পাঠে

অনুপস্থিত অপ্রয়োজন বোধে, আবার ভাঙা সেতুর সঙ্গে শুকিয়ে যাওয়া খালকে যুক্ত করে যখন লেখা হয় 'শুষ্ক নদীর বিস্মৃতি বিলগ্ন ভগ্ন সেতু',' তখন ছবির নির্দিষ্ট রেখাগুলি মুছে গিয়ে কিছুটা যেন আবছা অনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে।' অনির্দিষ্ট হয় কবিতারই ধর্মে ঠিকই, তবু ছবির ধর্মও তিনি ভোলেন না। ছবির বাস্তব মাথায় থেকে যায় বলেই একটি পংক্তি বারবার করে লিখতে হয় কখনো। প্রথম পাঠে ছিল 'অসমাপ্ত মন্দির, বাদুড়ের বাসস্থান'; দ্বিতীয় পাঠে—'বাদুড়-সন্ত্রস্ত ধ্বস্ত মন্দির'; তৃতীয় পাঠে তা হল 'সর্পসংকুল পূজাবেদীর ধ্বংসাবসান'। পঞ্চম পাঠে ছবিটি দীর্ঘ হল আরো 'মন্দিরের ফাটা ফাটা দেওয়াল, তার সঙ্গে পিচ্ছিল সব সরীসৃপে ভরা বেদী'। চূড়ান্ত পাঠে সে ছবি দাঁড়ালো: 'দেবতাহীন পূজাবেদী—সরীসৃপের আশ্রয়স্থল'। একটি ছবিতে একই সঙ্গে ফটো দেওয়াল আর দেওয়ালের ভিতরের বেদী দেখানো যায় না বলেই কি ছবিটি আবার সংক্ষিপ্ত করা হল? 'শিশুতীর্থ'-তে যদিও দেউল-এর প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে, কিন্তু তা বিবরণমাত্র, ছবি সেখানে 'সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী'ই। গর্তগুলির উল্লেখে 'সরীসৃপের আশ্রয়স্থল' আরো বেশি ছবিতে মূর্ত হতে পারল।

যা শ্রবণযোগ্য, তাকেও দৃশ্য করে তুলে শব্দের অনুষঙ্গে অন্য এক দৃশ্যধারা যেন যুক্ত করে দিলেন কবি—মন্‌তাজ পদ্ধতিতে। পাথরগুহায় আটকপড়া বন্যা, ঝোড়ো হাওয়ার উন্মত্ততা, কিংবা দাবানলে আত্মাহুতি দেওয়া অরণ্য—জল, আগুন, হাওয়া—আদিম সব বস্তুগুলি যেন প্রকাশ করছে প্রকৃতির রুদ্র রূপ—জাগিয়ে তুলছে ভয়। মূল ছবিগুলি দ্বিতীয় পাঠ থেকেই পাওয়া গেলেও বদরদল হয়েছে প্রায় প্রতি পাঠেই। 'বাঁধ-ভাঙা বন্যা' হয়েছে 'গুহাবন্দী বন্যা', তারপর 'বন্দী'র পরিবর্তে এসেছে 'মরীয়া' বিশেষণ, 'বজ্রনির্ঘোষ করা'র বদলে সে বন্যা গুহার দেওয়ালে 'আঘাতের পর আঘাত হানে; এ ভাবে, শব্দের উপমান হলেও কবি ছবিকেই ক্রমে মূর্ত করে তোলেন। ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনকে প্রথমে আত্মঘাতী ধর্মোন্মাদনার বলবোল বলে কবি সন্তুষ্ট থাকেন না, কেননা ছবি হিসেবে খুব সার্থকতা থাকে না তার। তাই হাওয়ার গর্জন হয় ধর্মোন্মাদের মন্ত্র-উচ্চারণ, আর দাবানল খুব যথার্থ ভাবেই হয় প্রাচীন অরণ্যের অহেতুক আগুনে আত্মাহুতির ছবি। যেন ইতিহাসের অন্ধকার-যুগের অন্ধকারের দ্যোতনা চলে আসে এইসব ছবিতে। ঝড়ের ডাক, আগুনের ডাক, বন্যার ডাক এইভাবে একদিকে প্রাকৃতিক ভয়ের যোগ্য পট রচনা

করে মানবিক ক্রান্তিকালের অন্যদিকে বর্তমান অন্ধকারের সঙ্গে যুক্ত করে অতীতের অন্ধকার।

পটভূমি রচনাই এত দীর্ঘ আয়োজন-সাপেক্ষ, তার মধ্যে মানুষ কটির ছবি কিন্তু প্রথম পাঠেই পরিণতি পেয়ে গেছে, যাদের হাতের মশাল কোনো আলোর রঙের আভা ছড়ায় না, শুধু সাদা-কালোর ছক টেনে মুখের উপর 'বিভীষিকার উল্কি' পরায়। এরা ঘুরে বেড়ায় ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো—ইতিহাসকে বহন করে কিন্তু অর্থময় করে না। এই বর্ণনাটুকুতেই সন্ত্রস্ত আর শিকড়-ছিন্ন বর্তমান উঠে আসে অনেকটা, চূড়ান্ত পাঠে এরই সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আঘাত আর আহত-র, বিবাদ আর বিলাপের টুকরো পরিস্থিতি—যার প্রয়োজন সম্বন্ধে তত নিশ্চিন্ত ছিলেন না কবি, কেননা সব কটি পাঠেই রক্ষিত হয় নি এ অংশ। নারীদের আর্তনাদ আর অট্টহাসির ছবিটিও, যা আবার মনে করিয়ে দেয় লিওনার্দোর 'প্রলয়'-কল্পনা, প্রথম পাঠেই সম্পূর্ণ।

'শিশুতীর্থ'-র এই প্রথম অংশই কবির অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে—যে অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখেছিলেন—'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দুঃখ সকলকেই পেতে হবে—এখনি পাচ্ছে, সংকট এড়িয়ে আরামে থাকবার প্রত্যাশা করাই ভুল' (৩১ অক্টোবর ১৯৩০)। কবিতাটির পরবর্তী অংশগুলি কিছুটা নাটকের ছাঁদে কবির ভিশন মূর্ত করে তুলেছে। সে অংশের মূল্য কম নয়; মানুষের সভ্যতায় যুগে যুগে বারে বারে নূতন জন্ম যে ঘটে—তার জন্যে যে কান্না জমা হতে থাকে সমগ্র মানবিকতার বুকের মধ্যে—'পূর্বদেশের বৃদ্ধ' তারই কাহিনী শুনিয়েছিল—দানবিক সভ্যতারই মুখের উপর। আজ পঞ্চাশ বছর পরেও এর অভিঘাত একটুও কম নয়। কিন্তু এর প্রথম অংশ আমাদের অভিভূত করে অন্য এক কারণেও। সমসময়কে এমন করে রবীন্দ্রনাথ ছুঁতে চেয়েছেন অল্পই। 'নিশীথজগৎ'-এর যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে আগে, তার থেকে 'শিশুতীর্থ'-র এ অংশ অন্য জাতের হয়ে যায় 'আমি'-র অনুপস্থিতিতে। বিষয়কে নির্বিকার তদ্‌গত-চিত্তে দেখাকে তিনি মনে করেন বিশ শতকের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য—সেই দেখারই পরিচয় তিনি রেখেছেন এখানে। সে-দেখা উপস্থাপনায় নয়, ছবিতে। 'রেখার কবিতায়ন' যদি হয় তাঁর ছবি, তবে 'শিশুতীর্থে'র এ অংশ তাঁর শব্দের চিত্রায়ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, তাঁর জীবনের অন্তিমে আরো একবার ভাষায় এঁকেছিলেন তিনি নঙর্থক অন্ধকারের ছবি,

স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন অন্ধকারের কাছে আলোর পরাজয়ের, 'সৃষ্টির আত্মগ্লানি'র কথা। তাঁর আঁকা ছবি সে লেখায় ভাষায় উঠে এসেছিল, 'শিশুতীর্থ'র তুলনায় আরো ঘনিষ্ঠভাবে: 'আদিম অন্ধকারে পথহারা গহ্বরের ভিতর থেকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে অপরিসীম অনিদ্রা অস্বাস্থ্যে আবিল। তার অতলস্পর্শ পঙ্ক-শয্যা থেকে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিচ্ছে অতিকায় কুৎসিত অর্ধগঠিত জলহস্তীর দল।... সেই আদিম—সেই ভয়ঙ্কর—সেই আত্মহিংস্রক, সেই নরঘাতী, তার চিরকালের গহ্বরের থেকে হঠাৎ কখন আবার দেখা দেয়—বলে যে, বর্বর এখনও মরে নি, কদর্য এখনও তার রাজ্যের জন্য লড়াই করছে।' ১৯৪১-এর ২ জুলাই তারিখের এই রচনা হয়তো বা গদ্যরচনা হিসেবে শেষতম। 'পরিচয়' পত্রিকায় এ লেখা প্রকাশ হয়েছিল তাঁর প্রয়াণের মাসটিতেই।

প্রথম পাঠ

They ask, What is the time ?

No answer comes.

The night is deep in the valley, the sky overcome by clouds The things around are incongruous, they are a noise, the refuse of time's regrets and rejections, fruitless failures and reckless attempts,—the bridge that is broken, the canal dry and gaping, the huts deserted, scattered bricks and rafters, the temple unfinished, tenanted by bats, trees uprooted and rotting, marble steps leading to blankness. Some menacing shadows here and there darker than night ; are they cast by a meaningless life or some formless dea ? The lurid red glow that waxes and wanes on the rim of horizon—is it a threat from neighbouring planet or an elemental hunger licking the sky ?

The men gathered there are vague, like torn pages of an epic. While grouping in groups or single their torch light absurdly tattos their faces producing pictures of frightfulness A continual hum rises in the air like bubbling hot volcanic mud, a mixture of sinister whishpers, rumours and slanders laughters of derision and angry growls. The maniacs suddenly strike their neighbours on suspicion and a bubble of indiscriminate fights bursts forth echoing from hill to hill The women weep and wail, they

cry that their children are lost. While others are defiant in ribaldry, with raucous laughter and bare limbs unshrinklngly loud for they think that nothing matters

দ্বিতীয় পাঠ

They ask, What is the time ?

No answer comes

The night is deep in the valley, the sky overcome by clouds The things around are incoherent they are a noise, the refuse of time's rejections, fruitless failures and reckless attempts rusting and crumbling, the bridge that is broken, the canal dry and gaping, huts deserted, scattered bricks and rafers, the ruined temple haunted by bats, trees uprooted and rotting, marble steps leading to blankness. Masses of shadows, darker than night, do they belong to some giant life choked by a nightmare of death ? The lurid red glow that waxes and wases on the rim of horizon, is it a threatfrom a neighbouring planet or an elemental hunger licking the sky ?

Sounds suddenly coming out from their ambuscades seem to fight in the sky, and the shudder of an indefinite fear runs along the sleepless hours The noises are difficult to recognise, are they floods breaking their dams, storm winds hawling and whirling like some suicidal frenze of piety, a forest fire hissing and crackling and panting hot breaths, or the piteous screams of a dumb multitude attacked by the blind and the deaf ?

The men gathered there are vague, like torn pages of an epic, while groping in groups or single their torch light absurdly tattoos their faces, producing pictures of frightfulness A continual hum creeps up and spreads underneath the noises like a bubling hot volcanic mud, a mixture of sinister whispers, rumours and slanders laughters of derision and ugly growls.

The women weep and wail, they cry that their children are lost. While others are defiantly ribald, with raucous laughter and bare limbs unshrinkly loud, for they think that nothing matters.

তৃতীয় পাঠ

HE IS ETERNAL, HE IS NEWLY BORN

What hour of night, this ? There is no answer For Time gropes blindfold in the maze of ages and wons At the foot of mountains darkness is black as the socket of dead demon's eye. The sky is smothered with clouds. Here and there weird crags and crevices seem filled with fragments of night's torn brown limbs An angry ball of fine glowers in the skyline Is that the red eye of an unknown planet ? Or the reeking tongue of a primal hunger ? Masses of matter shrick and roll in a frenzy of fever . broken turrets of irresponsible power ; bridges of a lost river ; ruins of a snake-infested shrine !

A sudden shattering noise

Is it the crumbling of caves at the rush of a torrent ?

Is it the groaning of a forest in flames ? Through that terrific clamour flows an undertone as lava through a volcano's ravings, and voices of hate and jealousy come to mingle in the evil stream Men and women flit there like torn pages from a book of History. Faces are tattooed with terror. A man flies into rage and beats his neighbour. They fight like beasts A woman wails "Woe for our children who not what they do", but another woman, naked and shameless sways with laughter and cries, "Nothing in the world matters at all".

চতুর্থ পাঠ

The New-Comer

—a—

They ask, what of the night ?

No answer comes

The night is deep in the valley, the sky is overcome by clouds Things around are incoherent ; they have become noise, the refuse of time's rejections, fruitless failures and reckless attempts, rusting and crumbling, the bridge that is broken, the canal dry and gaping, huts deserted, scattered bricks and rafters the ruined temple haunted by bats, trees uprooted and rotting, marble steps leading to blankness, These masses of shadows, darker than night,—do

they belong to some giant life choked by a nightmare of death? the lurid glow of red that waxes and wanes on the rim of horizon, is it a threat from a neighbouring planet or an elemental hunger licking the sky?

Sounds suddenly rising from their ambuscades sum fiercely fight in the sky, and the shudder of an indefinite fear runs along the sleepless hours. These noises are hard to recognise. Are they imprisoned floods, thundering against the cave walls, or the storm winds howling and whirling like some suicidal frenzy of a fanatic? Is it a blazing forest, hissing and crackling and panting hot breath, or the pitious scream of a dumb multitude scourged by lunatic blind and deaf?

(The men gathered there are vague, like torn pages of an epic Groping in groups, or single, their torch-light tatoos their faces in chequered lines, in pictures of frightfulness) Underneath the turbulent medly of noises a continual hum creeps up and stealthily spreads round like bubbling hot volcanic mud, a mixture of sinister whispers, rumours and slanders, laughters of derision and ugly growls.

The women weep and wail, they cry that their children are lost. Others are defiantly ribald, with raucous laughter and bare limbs unshrinkingly loud, for they think that nothing matters.

পঞ্চম পাঠ

কবির হাতে লেখা কপি

The Babe

"What of the night" they ask.
No answer comes.
For the blind Time gropes in a maze and knows not
its path or purpose.
The night is deep in the valley, the sky overcome
by clouds,
Masses of shadows lie scattered like shattered
limbs of the night.
A lurid glow of red that waxes and wanes on the
rim of horizon,—

Is it a threat from an alien planet,
or an elemental hunger licking the sky ?
Things around are deliriously incoherent,
like a noise whose grammer is a groan
and words smothered out of shape and sense,
They are the refuse, the rejections, the fruitless
failures of life,
the abrupt ruins of the prodigal pride,—
the fragments of a bridge brooding over
the memory of a vanished stream.
the cracked walls of a temple with its shrine
haunted by slimy reptiles,
trees uprooted and rotting,
marble steps leading to blackness.
Sudden tumults rise in the sky and wrestle
and a shudder runs along the sleepers hours
All they from desperate floods
hammering against their cave walls
or from some fanatic storms
whistling and howling incantations,
Is it the cry of an ancient forest
flinging up its hoarded fire of ages
in a last extravagant suicide,
Or screams of a dumb multitude scourged by
lunatics blind and deaf ?
Underneath the turbulent noises a hum creeps up
and stealthily spreads round like
bubbling hot volcanic mud,
a mixtute of sinister whispers, rumours
and slanders.
and hisses of derision.
The men gathered there are vague
like torn pages of an Epic.
Groping in groups or single, their torch light
tatoos their faces in checquered lines,
in pictures of frightfulnes.
The women weep and wail,
they cry that their children are lost
in a wilderness of contradictory path with no goal.

Others are defiantly ribald with raucous laughter
and lascivious limbs unshrinkly loud,
for they think that nothing matters.

THE CHILD শিশুতীর্থ।

Rabindranath Tagore

I

'What of the night ?' they ask
No answer comes.
For the blind Time gropes in a maze and knows not its
Path or Purpose.
The darkness in the valley stares like the dead
eye-sockets of a giant,
the clouds like a nightmare oppress the sky,
and the massive shadows lie scattered like the torn
limbs of the night
A lurid glow waxes and wanes on the horizon,—
is it an ultimate threst from an alien star
Or an elemental hunger licking the sky ?
Things are deliriously wild,
they are a noise whose grammar is a groan,
and words smothered out of shape and sense.
They are the refuse, the rejections, the fruitless failures
of life,
abrupt ruins of Prodigal Pride,—
fragments of a bridge over the oblivion of a vanished
Stream,
godless shrines that shelter reptiles,
marble steps that lead to blankness
Sudden tumults rise in the sky and wrestle
and a startled shudder runs along the sleepless
hours.
Are they from desperate floods
hammering against their cave walls,
Or from some fanatic storms
Whirling and howling incantations ?
Are they the cry of an ancient forest

Flinging up its hoarded fire in a last extravagant
suicide,
Or screams of a paralytic crowd scourged by lunatics
blind and deaf ?
Underneath the noisy terror a stealthy hum creeps up
like bubbling volcanic mud,
a mixture of sinister whispers, rumours and
slanders, and hisses of derision.
The men gathered there are vague like torn pages of
an epic
Groping in groups or single, their torchlight tattoos
their faces in chequered lines, in patterns of
frightfulness
The maniacs suddenly strike their neighbours on
suspicion.
and a hubbub of an indiscriminate light bursts forth
echoing from hill to hill.
The women weep and wail,
they cry that their children are lost in a wilderness
of contrary paths with confusion at the end
Others defiantly ribald shake with raucous laughter
Their lascivious limbs unshrinkingly loud,
for they think that nothing matters.

মরমী শিল্পী ও জীবনজিজ্ঞাসু দিলীপকুমার

রাজ্যেশ্বর মিত্র

'ইনটেলেকচুয়েল' বলতে যা বোঝায়, দিলীপকুমার ছিলেন তাই; কিন্তু তিনি ছিলেন কম্পোজার, শিল্পী। এই পর্যায়ের লোকদের যা হয়, তাঁর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। গোটা জীবনই তিনি খুঁজে বেড়িয়েছেন, কোনটা তাঁর পথ, কোনটা তাঁর পরম কাম্য। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সংগীতে মগ্ন, যৌবন অতিক্রম না করতেই তিনি অনুভব করলেন অধ্যাত্ম জীবনের আকর্ষণ। তারপর, রফা করতে চেয়েছেন সংগীতচর্চা এবং সাধনা—এই দুই ধারার মধ্যে। বার বার ফিরে তাকিয়েছেন সংগীতের আকর্ষণে। নিজে রচনা করেছেন, শিখিয়েছেন, গাইয়েছেন; লিখেছেন বিস্তর, সাধনায় অবসরও করে নিয়েছেন এইসব কাজে নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট থেকেও। পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিলেন ভক্তিধর্মকে। তাঁর শেষ পর্যন্ত ধারণা ছিল ভগবদ্‌ভক্তি এবং আত্মনিবেদনেই সব সার্থকতাকে লাভ করা যায়। এই সময় তিনি অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তিপ্লুত অবস্থায় তিনি অনুভব করতেন এমন পরিবেশ, যা লৌকিকতার মধ্যে সীমিত ছিল না। তিনি বলতেন, তিনি গণিতের ছাত্র, বিজ্ঞানের অধ্যয়নে তাঁর ছাত্রাবস্থা কেটেছে, অতএব, তাঁর উচিত ছিল রিয়ালিজম ছাড়া আর কিছুতে আস্থা স্থাপন না করা, কিন্তু তাঁর একটি প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল যে, এমন অনেক কিছু আছে, যা তর্কের আয়ত্তে পড়ে না এবং কোনোকালে পড়বে না। সেই অঘটন ঘটেও চলেছে, কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণে তা প্রায়ই ধরা পড়ে না। এইটাই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর অতিপ্রসিদ্ধ 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম সবই'—গানের একটি আখরে, যেখানে তিনি বলছেন—'ওরা জানে না তাই মানে না, আমি জানি তাই মানি, আমি অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনেছি, তাই বঁধু আমি জানি।' তিনি উপলব্ধি করতেন, মানুষ সেই অবস্থায় আসতে পারে, যখন সে এই অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করতে পারে। এটা বিশ্বাসের কথা, তর্কের কথা নয়। এইখানে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল অনেকেরই; কিন্তু তিনি তাঁর স্বতন্ত্র নির্বাচিত পথ ধরেই চলেছিলেন, জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত। শেষের দিকে বহু বৎসর তিনি গাইতেন কেবলমাত্র ভজন; সেই ভজনের স্টাইল একান্তভাবে তাঁরই।

তাঁর প্রথম জীবনের সঙ্গে শেষ জীবনের তফাৎ অনেকখানি। জীবনের শুরু হয়েছিল তাঁর রোমান্টিসিজমের রঙিন পটভূমিকায়। তার একটি প্রধান দিক ছিল সংগীত। সেই সংগীত চিরাচরিত রীতিতে চলে নি; যে বিকাশ ওস্তাদ বা গড়পড়তা গাইয়েদের পরিকল্পনার বাইরে, তিনি প্রখর ইনটেলেক্ট দিয়ে সেই বিকাশকে নানান ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর গানে। কলকাতার লোক ভেঙে পড়ত তাঁর অনুষ্ঠানে। কাব্যসংগীতের এই ধরনের রূপায়নে তিনি লিরিকগানে একটি নতুন পর্যায়ের সূত্রপাত করেন, যাকে বর্তমান সংগীতের পটভূমিকা বলা যায়। তখনকার যাবতীয় সুরকারের গানই তিনি গাইতেন, কিন্তু সেই গাওয়ায় একটি বস্তু ছিল, যা অনন্যসাধারণ। সুরকারের ওপরেও তিনি স্রষ্টার ভূমিকা নিতেন, যাকে বলে ইম্প্রভাইজেশন। একে তিনি বলতেন, সুরবিহার। শিক্ষিত শ্রোতারা রোমাঞ্চ অনুভব করতেন তাঁর এই স্বকীয়তায়। শিক্ষিত বা সফিস্টিকেটেড শ্রোতা বলছি এই কারণে যে, তাঁর গান গড়পড়তা শ্রোতার অনুভূতি বা উপলব্ধিতে ততটা প্রবেশ করতে পারত না, যতটা তাকে গ্রহণ করতে পারতেন বিদগ্ধ এবং রসজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দ। এই কারণেই তিনি বরাবরই একটা অসামান্য স্তরে রয়ে গেছেন। তাঁর জীবনে, যাঁদের আমরা কমার্শিয়াল আর্টিস্ট বলি, তাঁরা অনেকেই তাঁর সান্নিধ্যে আসেন নি, অথবা তিনি তাঁদের তেমন আপন করে নিতে পারেন নি; অপরপক্ষে, তাঁর নিজের পক্ষেও সাধারণ স্তরে নেমে আসা সম্ভব ছিল না বা অভীষ্ট ছিল না। ফলে একটি বিশেষ মহলে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল; সেই মহলের অনেকেই আজ গত হয়েছেন এবং মধ্যে বহু বৎসর তিনি নিজেকে প্রকাশ্য গানের জগৎ থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য বহু রেকর্ড তিনি আবার করেছিলেন এবং তাঁর ছাত্রীদের মধ্যে উমা বসু বা মঞ্জু গুপ্ত খুব নাম করেছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে আগের মতো গানের জগতে ফিরে আসেন নি। গাইতেন এবং তাঁর গান শুনতে ভিড়ও হতো প্রচুর, তথাপি ঠিক আগের পরিবেশ আর সৃষ্টি হয় নি। সাধনার কাল থেকেই তিনি প্রবাসী বাঙালি, ক্রমে বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগ বহুল পরিমাণে ক্ষীণ হয়ে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত আসতেন কালে ভদ্রে। অতএব, তাঁর মৃত্যু বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটি খবর মাত্র;

তাঁরা এইটুকু জানেন যে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সুরকার এবং গায়ক; কিন্তু এঁদের পূর্বযুগের ব্যক্তিদের কাছে তিনি একজন পার্সোনালিটি, যাঁর তিরোধান তাঁদের কাছে একটা বিপুল শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। আমরা এই আগের যুগের লোক, চোখের সামনে কতবার দেখেছি তাঁর কমনীয় রূপলাবণ্য এবং রমণীয় সংগীত। দিলীপকুমার যখন গাইতে আরম্ভ করেন, তখন সংগীত-শিল্পীদের নির্ভর ছিল তান, বিস্তার, যার ফলে সবরকম গানই খানিকটা রাগ-সংগীতের আদলে আসতে বাধ্য হতো। কিন্তু, দিলীপকুমার ফুটিয়ে তুললেন সেন্টিমেন্ট, আবেগ, আকুতি তাঁর গাইবার পদ্ধতিতে, কবিতার বিন্যাসের ওপর জোর দিয়ে। তান অবশ্য তিনি খুবই করতেন, কিন্তু তার ধরন ছিল আলাদা—সেদিকে তিনি পা বাড়িয়েছিলেন মধ্যবয়সে আর এক পরিকল্পনা নিয়ে, যখন তিনি আখরও প্রয়োগ করতেন দ্বিধাহীনভাবে।

দিলীপকুমারের প্রথম এবং অতুলনীয় কীর্তি আমার মনে হয় একটি যথার্থ সংগীতসাহিত্যের সংগঠন। কেমব্রিজ থেকে ইউরোপ হয়ে যখন তিনি ফিরলেন, তখন পাশ্চাত্য সংগীত তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে; কিন্তু ভারতীয় সংগীতের প্রতি তাঁর আসক্তিও কম প্রবল ছিল না। অথচ, সংগীতজ্ঞদের অবস্থা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল শোচনীয়। অধিকাংশ গায়ক-গায়িকা বা বাদনগোষ্ঠী তাঁদের ঘরের প্রচলিত ধারাকে অবলম্বন করে চলেছিলেন; অশিক্ষা এবং 'আইসোলেশন' তাঁদের নতুন সৃষ্টিতে তেমন উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। অনেকের মধ্যে অনেক প্রতিশ্রুতি তিনি দেখেছিলেন, কিন্তু সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টন থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার ছিল। সারা ভারত টহল দিয়ে বেড়ালেন তিনি এইসব গায়ক-গায়িকাদের গান বা বাদকদের বাজনা শোনবার উদ্দেশ্যে। সেইসব ধারণা প্রতিফলিত হতো তাঁর 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা'য়। আজকের দিনে এত যে রিভিউ, পত্র-পত্রিকায় মিউজিক-ক্রিটিকদের কলমের পর কলম জুড়ে এত লেখনী চালনা,—এ জিনিসটার যথার্থ সূত্রপাত তাঁর এইসব লেখা থেকেই শুরু হয়। অর্থাৎ ভারতীয় সংগীত যে একটা আর্ট এবং তার যে একটা প্রথম শ্রেণীর সমালোচনার দাবি আছে—এর একটি বিপুল স্বীকৃতি দিয়েছিলেন দিলীপকুমার। সংগীতের শিক্ষার দিকটাও তাঁর চিন্তাকে কম প্রভাবিত করে নি। ভাতখণ্ডে যখন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তখন

অনেকেই তাকে একটা ব্যর্থ চেষ্টা বলে মনে করতেন; কিন্তু দিলীপকুমার ছিলেন এ-বিষয়ে একজন অসামান্য উৎসাহদাতা। সারা ভারত ঘুরে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ওস্তাদদের কাছে বছরের পর বছর পড়ে থাকলেও বিশেষ কিছু লাভ করার আশা সুদূরপরাহত; তাই একাডেমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে তিনি আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের পরিচয় তিনি বিস্তৃতভাবে লিখেছিলেন পত্র-পত্রিকায়, যার ফলে বহু বাঙালি ছেলে গোয়ালিয়র, লখনউয়ে গিয়ে সংগীতে অধিকার অর্জন করে ফিরেছিলেন। এঁদের মধ্যে একাধিক কৃতী শিল্পী আজও বর্তমান।

দিলীপকুমার বরাবরই আত্মসমালোচনা করে গেছেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি অনুভব করেছিলেন কম্পোজারের নির্দিষ্ট পথটুকুই যথেষ্ট নয়, গায়কেরও কিছুটা দেবার আছে। পাশ্চাত্য সংগীতে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত পদ্ধতি বাহাল থাকুক—এটা চান নি। বাংলা গানকে তিনি নানাভাবে লীলায়িত করতে চাইতেন। অনেকের ধারণা, দিলীপকুমার বড় বেশি নমনীয়, তাঁর গায়কিতে কান্ত কোমলতার প্রাবল্যই সমধিক, কিন্তু এ-ধারণা ঠিক নয়, তিনি যখন তাঁর পিতৃদেবের স্বদেশ-সংগীতগুলি গাইতেন তখন ফুটে উঠত একটা অসামান্য তেজ দৃঢ়তা এবং ওজঃশক্তি। তাঁর কণ্ঠ ছিল উদাত্ত এবং সেই কম্বুকণ্ঠ অনুপম গাম্ভীর্যে ধ্বনিত হয়ে উঠত যখন তিনি গাইতেন, 'বঙ্গ আমার জননী আমার' 'ভারত আমার ভারত আমার', 'ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে' ইত্যাদি গান। আবার সেই গাম্ভীর্যেরই আর একটি শান্ত রূপ দেখা যেত যখন তিনি গাইতেন 'ধন ধান্যে পুষ্প ভরা' বা 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে'—এই জাতীয় গান। পরবর্তীকালে যখন তিনি নিশিকান্তের গান গাইতেন তখন এই উদাত্ত কণ্ঠ অবলম্বন করেছিল আর এক ধরনের মহিমান্বিত রূপ। প্রবীণদের মধ্যে অনেকের হয়তো মনে আছে তাঁর গাওয়া নিশিকান্ত-রচিত দু-খানি গান—'জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে' এবং 'এই পৃথিবীর মাটির পরে'। এই গানগুলিতে তিনি একটা স্বকীয় তানের রীতি উদ্ভাবিত করেছিলেন। এ-তান ঠিক ওস্তাদী তান নয়, যাঁরা উৎকৃষ্ট 'অপেরা' শুনেছেন তাঁরা একজাতীয় ঊর্ধ্বগামী কল্পিত তান লক্ষ করে থাকবেন। উৎকৃষ্ট ইতালীয় বা রুশ অপেরায় বহু গানে এই ধরনের তানের কাজ দেখা যায়। আমার মনে হয়, দিলীপকুমার ভারতীয়

তান-পদ্ধতির সঙ্গে এই টেকনিকও অবলম্বন করেছিলেন। এই সুযোগে কবি নিশিকান্তের কথাও কিছুটা বলবার স্পৃহা সম্বরণ করতে পারছি না। অনেকের ধারণা, তিনি একান্তভাবে রবীন্দ্রপন্থী লিরিক কবি। কিন্তু, এই ধারণা অনেকটাই ভ্রমাত্মক। তিনি কাব্যসাহিত্যে এ-যুগের একটি উত্তুঙ্গ প্রতিভা। পদান্তে মিলযুক্ত ছন্দপ্রধান লিরিক তিনি প্রকাশের অবলম্বনরূপে বেছে নিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুকৃতি তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিল না। তিনি যেদিকে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেদিকে যান নি। লিরিকের এত মহিমা বাংলা সাহিত্যে ঠিক তাঁর মতো করে আর কেউ সৃষ্টি করেছিলেন বলে মনে হয় না, অন্তত রবীন্দ্রযুগে। তাঁর এক একটি কবিতাকে এক একটি স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা চলে এবং সে স্ফুলিঙ্গ যেন সুশোভনভাবে খচিত একটি উজ্জ্বল তারকা। শুধু কি গম্ভীর কবিতা, কত স্যাটায়ার, হাসির কবিতা, ব্যঙ্গ রচনা তিনি অল্পবয়সে সৃষ্টি করেছিলেন, তা তাঁর বন্ধুমহলে সুবিদিত। কিন্তু, এই দুর্লভ প্রতিভাই তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। যেখানে তাঁর প্রেরণার সূত্র আছে বলে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেখান থেকেই তিনি পেলেন নিষ্ঠুরতম আঘাত। তাঁর নিজের আঁকা (অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য শিল্পী ছিলেন তিনি) ছবির সংগ্রহ, কবিতার খাতা, সব কিছু এক বন্ধুকে সমর্পণ করে পকেটে যা ছিল কেবল তাই নিয়ে চলে এলেন পণ্ডিচেরিতে। পরের কথা বিস্তারিতভাবে লিখেছেন স্বয়ং দিলীপকুমার যাঁর ওপর একান্তভাবে নির্ভর করেছিলেন তিনি সেই বিদেশে। দিলীপকুমার খুলে দিলেন তাঁর কাব্যরচনার উৎসকে নতুন করে। কিন্তু এই ধরনের প্রতিভার ক্ষেত্রে যা ঘটে নিশিকান্তের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি তাঁর অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে 'সাবলিমেট' করে দিলেন অধ্যাত্ম সাধনায়। ভাগ্যের বিড়ম্বনা যদি তাঁকে এপথে টেনে না আনত, তবে তিনি চিত্রশিল্পে, কবিতায় হয়তো একটা স্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে যেতে পারতেন। তথাপি, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মূল্যায়ন হয় নি, কাব্যজগতে যে পদে তাঁর অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল তা তিনি লাভ করেন নি। যাই হোক, দিলীপকুমার তাঁকে পরিচিত করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। হিমাংশুকুমার যেমন সুবোধ পুরকায়স্থ বা অজয় ভট্টাচার্যের মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি দিলীপকুমার তাঁর প্রেরণাকে খুঁজে পেয়েছিলেন নিশিকান্তের উদ্দীপনাময় অতুলনীয় লিরিকগুলিতে। কিন্তু নিশিকান্ত

অদ্বিতীয়, তুলনা দিতে গেলে তাঁকে নিষ্প্রভ করতে হয়। ভাগ্যবিড়ম্বনায় দিলীপকুমার পণ্ডিচেরি পরিত্যাগ করলেন, নিশিকান্ত দিন দিনই রোগজীর্ণ শরীরকে অপরিসীম ক্লান্তি সহকারে বহন করে চললেন। আজ দুই প্রতিভাই ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। যতদিন বেঁচেছিলেন দুজনেই যেন একটা জ্বালা নিয়ে পরিভ্রমণ করেছিলেন, অধ্যাত্মজীবনের শান্তির প্রলেপও বোধ করি সেই দ্যহনকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

যাই হোক, সংগীতের তত্ত্বেই আবার ফিরি। দিলীপকুমারের একটা মহাগুণ ছিল তাঁর রচনা স্বরলিপি করে রাখা। শুধু কি তাঁর? দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অতুলপ্রসাদ—এই দুজনের বহু গানই আমরা পেতুম না, যদি তিনি স্বরলিপি করে না রাখতেন। অতুলপ্রসাদের মূল্যায়নেও তিনি কম যত্নবান হননি। আজ অতুলপ্রসাদ সমধিক জনপ্রিয়, কিন্তু এর মূলে ছিলেন দিলীপকুমার। একসময় তিনি প্রতিটি আসরে অতুলপ্রসাদের গান গাইতেন মর্মস্পর্শীভাবে। আজ যখন সেইসব গান বেতার, টেলিভিশনের ফ্যাশান-সর্বস্ব গায়ক-গায়িকাদের কণ্ঠে শুনি, তখন এই ভেবে কষ্ট হয় যে একদা যে রচনা দিলীপকুমারের প্রতিভায় রূপায়িত হত, তা আজ যাঁদের কণ্ঠে রূপায়িত হচ্ছে, প্রতিভা তাঁদের (সুকান্তের ভাষায়) 'সেলাম তোমায় সেলাম' বলে লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, এঁরা বুঝতেও পারেন না ক্ষমতা এঁদের কত সীমিত, আর লজ্জা হয় এই ভেবে যে এই অকিঞ্চিৎকর সামর্থ্য নিয়ে তাঁরা কতখানি স্পর্ধা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন! এ যুগে পাশ্চাত্য সংগীতের কায়দাকানুন নিয়ে এক্সপেরিমেন্টের অবধি নেই। এই গবেষণার মূল্যাবধারণের মধ্যে যাচ্ছি না, কিন্তু এরও সূত্রপাত করেছিলেন দিলীপকুমার। বহু কম্পোজিশন তাঁর আছে, যা পাশ্চাত্য সংগীতের ভিত্তিতে রচিত। ইংরেজি, জর্মন, ফরাসী, রুশ—এসব দেশের বহু সুর তিনি আনতে চেয়েছিলেন বাংলা গানে। বহু গানের স্বরলিপিও করে ছাপিয়ে রেখে গেছেন তিনি। তাঁর সেই সুবিপুল স্বরলিপি আজ অনেকাংশে দুষ্প্রাপ্য। কবে আবার সেগুলি প্রকাশিত হবে কে জানে? পল রোবেসন-এর নামটা আজও জগৎবিখ্যাত। দিলীপকুমার তার গানের অনুসরণেও সুর বসিয়েছেন এক সময়। এই মহান শিল্পী বেশিদিন হল গত হন নি; তিনিও শেষ জীবনটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিলেন। প্রচণ্ড বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ইনটেলেকচুয়াল ছিলেন তিনি, তাই হয়তো আদর্শের জন্য আত্মসম্মানকে কম্প্রোমাইজ করতে পারেন নি।

এঁদের সবাইকার একই গতি হয়েছে শেষ পর্যন্ত। আবার, একেবারে প্রাচ্যধারার কীর্তনেও দিলীপকুমার কম আকৃষ্ট হন নি। সাধনার জীবনে তিনি আকুতি প্রকাশ করতেন আখর দিয়ে। এ নিয়েও কম বাক্-বিতণ্ডা হয় নি, কিন্তু নেহাৎ সুরের কাঠামো থেকে রিলিফ হিসাবে দিলীপকুমার বরাবর প্রয়োগ করে গেছেন আখর। যখন অন্য গানে আপত্তি উঠেছে, তখন নিজের গানেই তা প্রয়োগ করেছেন। মতের অমিল নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু এটাও তো একটা পথ। আমাদের কম্পোজার-রাই তো একদা এই আখর প্রয়োগকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন যেখানে আর কিছু প্রয়োগ করবার সুযোগ ছিল না।

এত সব করবার মাঝখানেও তিনি মনের খোরাক সংগ্রহ করেছেন বহু মনীষীর সংস্পর্শে এসে। সংগীত তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর সহচরদের কাছ থেকে তাঁর প্রখর ইনটেলেকটের পুষ্টিসাধন হয় নি। এটা তাঁর চরিত্রের আর একটা দিক। নিরন্তর এই যে তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, চিন্তার খোরাক সংগ্রহ করেছেন—এর একটা আত্মসমালোচনার দিকও আছে। অনেকে অভিযোগ করেন, এসবের উদ্দেশ্য আর যাই থাক, নিজেকে গৌরবযুক্ত করবার প্রবৃত্তিটাও অনেকাংশে প্রকট। আমার কিন্তু মনে হয়, তাঁর আসল উদ্দেশ্য মহত্ত্বকে উপলব্ধি করা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তাঁর মনে হতো, সংগীত ছাড়াও তাঁর আরও অনেক কিছু দেবার আছে এবং পাবারও আছে। মানুষ কতভাবে মহান হতে পারেন, কত পথে তাঁরা সিদ্ধির শীর্ষে আরোহণ করেন—এ ছিল তাঁর অন্বেষণের মধ্যে একটি প্রধান অনুসন্ধিৎসা। এ থেকেও তিনি বহুভাবে সান্ত্বনা লাভ করেছেন, শান্তিলাভ করেছেন এবং অনেক প্রশ্নের সমাধানও খুঁজে পেয়েছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ছিলেন তাঁর আদর্শের ঠিক বিপরীত; অথচ তাঁর প্রতি ভক্তি দিলীপকুমারের শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল; কিন্তু তাঁর অধ্যাত্মপন্থী আদর্শ আমি গ্রহণ করতে পারি নি। তিনি সেটা জানতেন, তাই শেষ জীবনে আমার সঙ্গে সংযোগ খুবই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল (অবশ্য পরিচয়ও তাঁর সঙ্গে হয়েছিল তাঁর শেষ জীবনেই)। তথাপি মনে রেখেছিলেন। 'তীর্থঙ্কর'-এর একটা কপি নিজে থেকে উপহার দিয়েছিলেন, যখন শেষ সংস্করণ বের হয়। এই মহান গ্রন্থ যত পড়ি তত ভাবি দিলীপকুমার কি চেয়েছিলেন? সন্ন্যাস-জীবন কি সত্যই তাঁর অভিপ্রেত ছিল, না তিনি ছিলেন এসকেপিস্ট? কিন্তু এ এক আশ্চর্য চরিত্র, মনুষ্যত্বের একটা আশ্চর্য বিকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছে। সে শুধু সংগীতজ্ঞ বলেই নয়, প্রজ্ঞার আলোকই ছিল তাঁর পথ-প্রদর্শক, ভাস্করবর্তিকা।

তাৎক্ষণিকের নবব্যঞ্জনা

প্রদোষ দাশগুপ্ত-র সাম্প্রতিক ভাস্কর্য

অজিতকুমার দত্ত

ক্ষণকালের ছন্দ জাগে স্ফুলিঙ্গের পাখায়। অসীম রূপ পায় জীবনের বাধাময় সীমায়। সুন্দর উদ্ভাসিত হয় স্বমহিমায়। কোনও পূর্ব-কল্পনা, কোনও হিসাব-মিল ছাড়াই প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারে দেখা মেলে অসংখ্য রূপরহস্যের। কয়েকশ বছর আগে ইতালির যুগন্ধর প্রতিভা রেনেসাঁস-আমলের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির লেখায় এই রূপবিচিত্রার উল্লেখ মেলে। তাঁর মতে ছাতা-পড়া-দেওয়ালের গায়ে, পাথরের সহজ গঠন বা প্রকৃতিদত্ত নক্সায় নানা অজানা, অদ্ভুত সব আকৃতি ও সাদৃশ্য নজরে পড়ে। কোনোটা দেখে মনে হবে সেনাদল, কোনোটায় মেঘের সারি বা এমন আরও কিছুর কথা মনে আসবে। বলা যায় এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আজকের পশ্চিমী জগতে সুবিদিত অ্যাকসন পেন্টিংয়ের মর্মমূল। অবশ্য দ্য ভিঞ্চি তাঁর জানা-চেনা জগৎ নিয়েই শিল্পসৃষ্টিতে লিপ্ত থেকেছেন। এদিকে নজর আর দেন নি। আবার অ-পূর্বকল্পিত শিল্পরচনা রবীন্দ্রনাথও করে গেছেন। নিজের ছবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে ছবি আঁকতে বসে কোনও পূর্বনির্দিষ্ট চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেত না। কলমের ডগা থেকে কত অচেনা ফর্ম আর চেহারা আকার নিতে থাকত। নিজেই তিনি আদৌ অনুমান করতে পারতেন না যে কিভাবে শুরু হয়ে কি চেহারায় ছবি শেষ-আকার ধারণ করবে। অ-কল্পিতভাবে কলমের মুখে ফুটে-ওঠা এই ছবিকে তিনি হলকর্ষণকালে জানকীর আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পূর্বপরিকল্পনাবিহীন এই রূপসৃষ্টি এ-যুগের পশ্চিমী এ্যাকসন পেন্টিং-এ যেমন প্রতিভাত, হালফিল ত্রিমাত্রিক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ-ধরনের পরীক্ষার খবর মিলেছে। অন্যত্র এ-ধরনের চেষ্টার কথা জানা না গেলেও, অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে নতুন এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে আমাদের দেশেই এবং নিঃসন্দেহে তা বিশেষ অর্থবহ।

আধুনিক ভারতশিল্পে প্রদোষ দাশগুপ্ত একটি সুপরিচিত নাম। শিল্প-আন্দোলনে নবীন চিন্তা ও প্রযুক্তির স্বাঙ্গীকরণে তাঁর ভূমিকা অন্যতম পুরোধার। আধুনিকতার পথিকৃৎ ক্যালকাটা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-

প্রদোষ দাশগুপ্ত

সদস্য হিসাবে তাঁর অবদান নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। ভাস্কর হিসাবে যেমন এক নতুন দিশারী তিনি, তেমনি সফল শিক্ষক হিসাবেও। মাঝে কিছুকাল জাতীয় নবকলাবীথি (সরকারি নাম ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ণ আর্ট হিসেবেই বিশেষ পরিচিতি)-র অধিকর্তা থাকায় সব কিছু প্রায় ফাইলবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অবসরান্তে তিনি প্রমাণ করেছেন যে নিষ্ক্রিয় হবার ধাত তাঁর নয়। সজীব চিন্তা ও কাজের ছাপ আবার লক্ষ করা গেছে তাঁর অবসরোত্তর দিনের প্রদর্শনীতে। সম্প্রতি তিনি ফেলোশিপ নিয়ে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। রসিকজনকে এবার উপহার দিলেন তিনি এক নবপর্যায়ের কাজ—মনন ও করণকৌশল উভয় দিক থেকেই তা উল্লেখনীয়। ব্যাপকার্থে এ-কাজ এ্যাকসন পেন্টিংয়ের সমগোত্রীয়, তবে সর্বতোভাবে নয়।

হঠাৎই এটা ঘটে গেল। শিল্পী বসেছিলেন—সিটিং দিচ্ছিলেন স্ত্রী কমলা দেবীকে। পোর্ট্রেট তৈরি হচ্ছিল শিল্পীর। কি খেয়ালে কখন হঠাৎ একমুঠো নরম ভিজে প্রাণময় মাটি উঠে এল হাতে। শুধু কি আর বসা যায়। আঙ্গুলগুলো নৃত্যরত সঙ্গী মাটির তাল পেয়ে। হঠাৎই শিল্পী চোখ খুলে বলেন—একি, একি হল? এরা কোথায় ছিল—কেমন করে এল। একবার, দুবার, বহুবার চলতে লাগল শিল্পী আর শিল্পের খেলা। প্রতিবারই তারা আসে। আসে নয় শুধু, বয়ে আনে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয়। আর অবহেলা করা যায় না।

ভাস্কর তাঁর নতুন কাজকে চিহ্নিত করেছেন ইনস্টান্ট এক্সপ্রেসনিজম বা ইনস্টান্ট স্কালপচার বলে। বাংলায় তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য। অনেকটা আকস্মিকতার যোগাযোগেই এর সূত্রপাত। তা বলে ব্যাপারটা নিছকই কল্পনার আকাশে ডানা মেলা নয়। পেছনে এর যথেষ্ট ভাবনা এবং আদর্শও কার্যকর রয়েছে।

ঘন বস্তু নিয়ে কারবার এবং ত্রিমাত্রিক বিশিষ্টতার কারণে ভাস্কর্য ব্যাপারটাই সময়সাপেক্ষ। আবার পাথর সহজপ্রাপ্য হওয়ার দরুন বড় আকারের কাজের একটা আলাদা জনপ্রিয়তাও রয়েছে এদেশে। স্মরণ করতে পারি আমরা কর্ণাটক-প্রান্তের জৈনমূর্তি গোমতেশ্বর অথবা কোনারকের সুরসুন্দরীর মতো মূর্তির। কিন্তু প্রচলিত এই ধারার সঙ্গে উল্লিখিত তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য সে-অর্থে যোগরহিত। তবে যে যোগসূত্র এক্ষেত্রে নজরে পড়ে সেটা মাটি বা পোড়ামাটির পরম্পরার। কারণ, বর্তমান

পরীক্ষায় সময় ব্যাপারটাকে যেমন সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা রয়েছে, তেমনি নির্বাচন ঘটেছে এমন উপাদানের, কাজ যাতে চটপট করে নেওয়া সম্ভব। নরম মাটিতে স্বতই সেটা চলে, অন্য মাধ্যমে নয়।

একদা বালক-বয়সে হয়তো বা মাটি নিয়ে শিল্পী কিছু গড়ার চেষ্টা করেছেন। তবে উৎসাহ ছবি আঁকাতেই বেশি ছিল। তেমনি উৎসাহী ছিলেন সংগীতে। কিন্তু শিল্প-শিক্ষা বা সেটা পেশা হিসাবে গ্রহণের কথা অল্পবয়সে কখনই মাথায় আসে নি। তবে পিতার প্রেরণাতেই স্নাতকোত্তর-পর্বে শিল্পশিক্ষা শুরু হয়। লক্ষ্ণৌতে হিরণ্ময় রায়চৌধুরী ও পরে মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কাছে তালিম গ্রহণ করেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার্থে সাগরপাড়ি এবং যুক্ত হন লণ্ডনের রয়েল অ্যাকাডেমির সঙ্গে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে এবং আকস্মিকভাবেই আবার মাটির তালেই নতুনভাবে তিনি আকৃষ্ট হলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন এক নতুন সম্ভাবনা।

কোমল পেলব মাটি সহজেই সাড়া দেয়। ভাস্কর, প্রায় যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকেই চাপ দিয়ে, দুমড়ে, চেপ্টে, লম্বাটে করে কেবল আঙুল আর হাতের তেলো ও চেটোর সাহায্যে বহুবিধ আকারদানে সম্ভব করে তোলেন মাটির তালকে। নানা সব ধাপ পেরিয়ে সেই মাটি বিমূর্ত ও ক্রমে পরিচিত বা সদৃশ-চেহারা নিতে থাকে। কখনও সেটা পাখির, জন্তুর বা বাস্তবজগতেরই অন্য কিছুর। আর এই রূপ পরিগ্রহ কয়েক মিনিট বা সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘটে। যুক্তিযুক্ত কারণেই ভাস্কর নতুন সৃষ্টিকে তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য বলে অভিহিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে কাজের প্রারম্ভিক পর্বে শিল্পীর মন বা চেতনা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকছে। অর্থাৎ, পূর্ব-নির্দিষ্ট কোনও ধারায় বা রাস্তায় চলার চেষ্টা আদৌ এক্ষেত্রে নেই। সহজাত প্রবণতা বা ইনটিউসন-নির্ভর হয়ে হাত কাজ করছে। মস্তিষ্কের চালনা বা ইনটেলেকটের অনুসরণ সে-সময় আপাতস্থগিত।

রূপাপোপে অচেতনের পালা শেষ হতেই শুরু হয় সচেতনের ক্রিয়াকলাপ। সেটা অবশ্য সামান্যই। প্রাথমিক চেহারায় কখনও কখনও খানিকটা যোগ-বিয়োগ বা 'সম্পাদনা'র কাজ থেকে যায়। বলা যায় সেটা শেষ ছোঁয়া বা ফিনিশিং টাচ্। এই সমগ্র ব্যাপারটা, অর্থাৎ শিল্পীর অচেতন থেকে সচেতনে পৌঁছনোকে অতি যথার্থ-ভাবে তুলনা করা চলে মুক্তা-আহরণকারী ডুবুরির সঙ্গে। ডুবুরি জলের তলদেশে গিয়ে ঝিনুক তুলে এনে এক নজরে

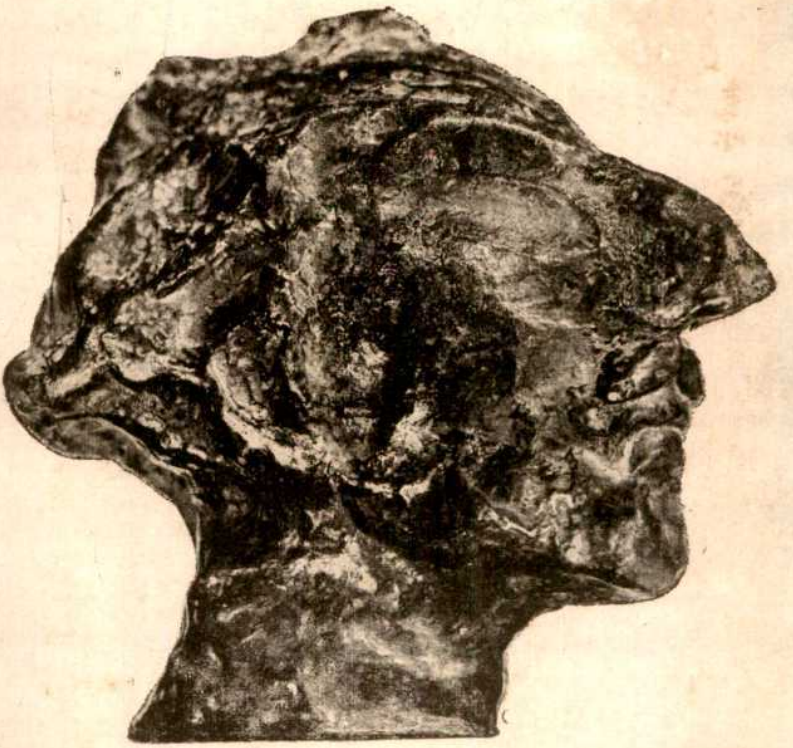

'প্রদোষ দাশগুপ্ত' ভাস্কর : শর্বরী রায়চৌধুরী

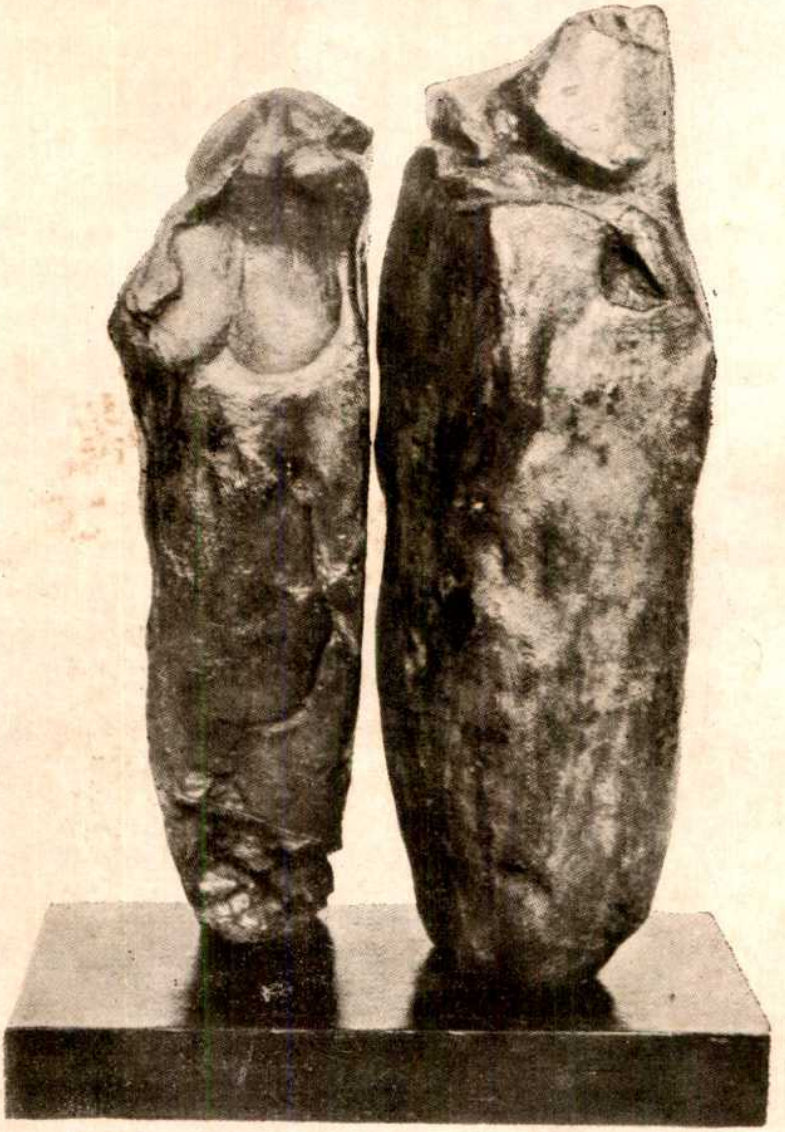

প্রদোষ দাশগুপ্ত

দেখেই বোঝে তাতে মুক্তা মিলবে কিনা। অপ্রয়োজনীয় ঠাহর হলে সেটা আর রাখে না, ফেলে দেয়। আমাদের ভাস্করও প্রাথমিক চেহারায় আকৃষ্ট-বোধ করলেই সে কাজটি রেখে দেন, নয়ত আবার তা মাটির জমানো ডাঁইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা হয়।

পোলকের কাজের ধরন বা চিন্তাবিষয়ে খানিকটা প্রাসঙ্গিক অবতারণা এখানে করা যেতে পারে। আঁকিয়ে প্রায় বিনা ব্রাশেই কাঠি দিয়ে গলে-পড়া রঙ-প্রয়োগে লিপ্ত হতেন। তাঁর কাজের শুরুতে পূর্ব-কল্পনা বলে কিছু থাকত না। পোলক ও প্রদোষ দাশগুপ্তের মিল এখানেই। অন্যান্য প্রায় সব কিছুতেই অমিল। যেমন আকস্মিকতার ব্যাপারটা। প্রথমজন মানতে চাইতেন না, যে তাঁর ছবি কোনও ভাবে আকস্মিকতা-উদ্ভূত। কিন্তু দ্বিতীয়-জন এর গুরুত্ব আছে বলেই মনে করেন। তাঁর মতে কাগজ সেঁটে কোলাজ করার প্রকরণে এটা স্বীকৃত এবং এই তথ্যের সমর্থন হান্স আর্পও করে গেছেন।

পূর্ব-কল্পনার কোনও আশ্রয় ছাড়াই যদিও দুজনের কাজের শুরু, কাজের অন্তিম চেহারা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুক্ষেত্রে দুরকম। বিশেষ আঙ্গিক অনুসারী হয়ে প্রথমজনের শিল্পকৃতি বিমূর্ত আকার পেয়েছে, আর দ্বিতীয়জনের বেলায় তা চেনাজানা জগতের পরিচিত বস্তুর বেশ খানিকটা অনুরূপ হয়েছে। মজার কথা, সাদৃশ্য যেখানে একেবারেই নেই, সেখানে আঁকিয়ের নামকরণ-গুলো লক্ষণীয়। কোনও ছবি 'ক্যাথিড্রাল', কোনটা 'ফরেস্ট' বা অন্যটা 'বার্ড অব প্যারাডাইস' নামে অভিহিত। অবশ্য সাদৃশ্যহীন চেহারার দরুন বিরূপ সমালোচনার ফলে শেষ অবধি শিল্পী ছবিকে আর কোনও অভিধায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন নি। নাম-বিহীনই থেকে গেছে সব। আবার দ্বিতীয়জন সাদৃশ্যহেতু কেবল নামকরণই নয়, সময়ের স্তর অতিক্রম করে চাপা পড়ে যাওয়া বহু ব্যক্তি বা ঘটনাকে স্মরণে আনতে পেরেছেন। হয়ত সাধারণভাবে কাজগুলো 'পসারিণী-ফলওয়ালা', 'বিমান আক্রমণ', 'নিপতিত যোদ্ধা' ইত্যাকার নাম নিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে, তবুও এর অনেকগুলোই বেরিয়ে এসেছে অবরুদ্ধ স্মৃতির পথ বেয়ে। তাই বিশ বছর আগে সুদূর প্রাগ শহরের বাজারে দেখা দুই রমণী অবয়ব পায় দীর্ঘ-উজান ঠেলে। তেমনি 'শাপ-মোচন'-এর নৃত্যরতা অবলীলায় ছন্দময় হয়ে ওঠে নতুনভাবে। স্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় নি বহুকিছুই।

তাৎক্ষণিক পর্যায়ের আলোচ্য কাজ নিঃসন্দেহে মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কাজ করেছে হাত, (হয়ত কেন অবশ্যই) অবচেতন মনও। তবে স্বয়ংক্রিয়তার ভূমিকাও অপ্রধান নয়। এই বিষয়টার প্রতি বছর চল্লিশ আগে সুররিয়েলিস্টরাই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফ্রয়েড-জং বা মনঃসমীক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ছোট আঁচড়কেও বোধহয় স্বয়ংক্রিয়তার এলাকায় এনে ফেলা যায়। অর্থাৎ, বলা যায় ব্যাপারটা মনের অবচেতনস্তর-উদ্ভূত। আবার পল ক্লে-র মতো শিল্পী সম্পর্কেও বলা হয় যে তাঁর কাজ আধা-জাগরণ আর আধা-নিদ্রার অবস্থায় করা। বলা হয়, এ-ধরনের শিল্পীরা সচেতন জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনে আগ্রহী। তবে বর্তমান আলোচনায় হয়ত এত বিস্তার বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়।

বিভিন্নভাবে বিচার করে একথা অনুমান করা কঠিন নয় যে, তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে। যুক্তি-বুদ্ধি-গ্রাহ্য এই ব্যাপারটি যথেষ্ট রকমের স্বতস্ফূর্ত। এই স্বতস্ফূর্ততা প্রসঙ্গে সহজেই স্মরণ করা যেতে পারে ভ্যান গঁগের বিখ্যাত উক্তিটি, ইচ্ছা করে আমার হৃদয়খানা দিয়েই ছবি আঁকি। একটা বিশেষ অনুভব—বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো—এখানে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে এ্যাকসন পেন্টিং যেন ছড়ানো ব্যাপার। অগ্রগমন সেখানে ধাপে ধাপে। তাই সম্ভবত প্রশ্ন জেগেছিল আলডুস আক্সলির মনে, থামছেই যদি, হঠাৎ এখনই কেন? অন্য কথায়, ধাপ ধরে এগিয়ে যাওয়ার যদি ব্যাপার হয়, তবে আবার থামা কেন?

যে কোনও সৃষ্টিরই মূল কথা স্রষ্টার অন্তরের আকুতি। এক্ষেত্রে যেন একটা অসহ, দুর্গম চেহারা তার। সেটা এক্ষুনি এক্ষুনি যেন মুক্তি চাইছে হৃদয়ের দ্বার ধরে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে একটা মিলও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় এ ব্যাপারে, সবার উপরে লক্ষণীয় একটা সহজিয়া সৌন্দর্য। সব মিলিয়ে তাৎক্ষণিক ভাস্কর্য বা তার উপপত্তিক দিকটা অবশ্যই তত্ত্ব ও যুক্তিসহ।

এই ভাস্কর্য নিঃসন্দেহে পরিণত চিন্তার ফলশ্রুতি। আশা করা যায় এই নব-দিকদর্শন ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম সম্পর্কে নতুন চিন্তার সহায়ক হবে। অবারিত হবে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ।

যজ্ঞনাথের মই

রুশতী সেন

সে বংশের কোনো বউ ওষুধ খেয়ে মরে নি ; সুতরাং তৎকালীন নব্য বৃন্দাবন কুণ্ডের বউই বা বেশি ঘটা করে মরবে কেন? বৃন্দাবনের বাপ যজ্ঞনাথ ডাক্তার ডাকে না, ছেলের বউ মরে। বৃন্দাবন বাপকে স্ত্রী-হত্যাকারী বলে গালি দিল, তারপর ছেলে গোকুলচন্দ্রকে নিয়ে বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। যজ্ঞনাথ সর্বসমক্ষে বললেন, বৃন্দাবনকে কখনো যদি এক পয়সা দেন, তবে তা গো-রক্তপাত তুল্য হবে।

শূন্য গৃহে পৌত্র গোকুলের উৎপাত নেই, বৃদ্ধ যজ্ঞনাথের দিন আর কাটে না। বেশ কিছুকাল পরে গাঁয়ের ছেলেদের খেলার মধ্যে নিতাই পাল নামে এক ভিন্‌দেশি বালককে দেখেন তিনি। ছেলেটি অন্যদের মতো বৈদ্যনাথকে ভয় পায় না। জিজ্ঞাসা করে তিনি শোনেন বালক বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে, কারণ তার বাবা তাকে পাঠশালায় পাঠাতে চায়। গ্রামের লোক অবাক হয়ে দেখে কৃপণ বৃদ্ধের গৃহে অচেনা বালকের সস্নেহ জায়গা হয়। নিতাই পালের বাপের কথা ভেবে তাদের শোকের অন্ত নেই। অবশ্য ছেলেটির বাপ উপলক্ষ মাত্র ; গ্রামবাসীরা বোঝে বৃদ্ধ আর বেশিদিন বাঁচবে না, এই অজ্ঞাতকুলশীল বালক যজ্ঞনাথের সব সম্পত্তি লাভ করবে ; দুঃখের কারণ এটাই।

একদিন শোনা যায় দামোদর পাল নামে একটি লোক নিজের ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে এ-গাঁয়ের দিকে আসছে। এ-খবরে নিতাই অস্থির ; 'দাদা'র বিষয় সম্পত্তির লোভ ছেড়ে সে পালাতে চায়। যজ্ঞনাথ আশ্বাস দিল, এমন জায়গায় তাকে লুকিয়ে রাখবে যে কেউ খুঁজে পাবে না। রাত্রির অন্ধকারে বালককে এক ভাঙা মন্দিরে নিয়ে যায় বৃদ্ধ। মাটি থেকে প্রস্তর খণ্ড সরিয়ে মই বেয়ে সুড়ঙ্গপথে নিচে নামে, পিছনে পিছনে ভয়ার্ত নিতাই। সেখানে কয়েকটি ঘড়ায় যজ্ঞনাথের সব সম্পত্তি ; নিতাই-এর গলায় মালা, কপালে চন্দন দিয়ে পূজো হয় তার। এ পূজোর মন্ত্র বড় অদ্ভুত, বিষয় সম্পত্তি যদিও নিতাই সব পেল, যজ্ঞনাথের উত্তরপুরুষ বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র অথবা তারও কোনো উত্তরপুরুষ যদি আসে, এ-সব টাকা গুণে তার হাতে দিতে

হবে। ভীত বালক মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে যজ্ঞনাথকে ডাকে, বাবার কাছে যেতে চায়। কিন্তু যজ্ঞনাথ উপরে উঠে এসে মই সরিয়ে নেন। ছিদ্রমুখে আবার পাথর চাপা দিতে দিতে বলেন 'তুই এখানে থাক্—তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস বৃন্দাবনের পুত্র, যজ্ঞনাথের পৌত্র গোকুলচন্দ্র।' বালকের 'বাবা' ডাকের আর্তি পিছনে ফেলে পাথরের উপর মাটি চাপা দিয়ে মন্দিরের বাইরে আসেন যজ্ঞনাথ; কিন্তু আবার 'বাবা' বলে কে ডাকে। তাকিয়ে দেখেন নিজপুত্র বৃন্দাবন। কাছাকাছি সর্বত্র যজ্ঞনাথের খ্যাতি আছে তাই সে দামোদর পাল নাম নিয়েছে, ছেলের নাম নিতাই। হারানো ছেলেকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আকাশ-বাতাস আঁকড়ে ধরতে ধরতে বৃদ্ধ চৈতন্য হারিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। জ্ঞান লাভ করে ছেলেকে নিয়ে গেল সেই মন্দিরে, মাটির ওপরে কান পেতে বৃন্দাবনকে শুধোয় 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?...'বাবা' বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?' বৃন্দাবন কিছু শুনতে পায় না।

তারপর থেকে বৃদ্ধ সবাইকে শুধিয়ে বেড়ায়, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?' লোকে বলে বুড়ো পাগল হল। মৃত্যুর আগে শেষ কথা বলে যজ্ঞনাথ, 'নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।'

১২৯৮-এ 'সম্পত্তি সমর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল। এ-কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পের জগৎ এক বিশেষ অধ্যায়ে প্রবেশ করল। সে-অধ্যায়ে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ সমাজের গভীরকে বিশ্লেষণ করতে পরি-পার্শ্বের ক্লিন্ন, বীভৎস চেহারাটা এড়িয়ে যান নি। সভ্যতার অনেক স্তর পেরিয়ে এসেছে মানুষ, একেবারে আদিম সমাজ ছাড়া, সব সময়েই সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তিতে অধিকারবোধ জড়িয়ে থেকেছে ব্যক্তির সঙ্গে। একদিকে সে-বোধ যেমন তাকে অবলম্বন দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নিরুপায়, অসহায় করেছে। বিত্ত আর বিজ্ঞতার চেতনায় সে নিকটতম সম্পর্ক থেকে, এমন কি নিজের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ একা, দীন।

সম্পত্তির মূল মানবিক অসঙ্গতি নিয়ে একটা পরিচিত রূপ আছে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক জীবনে উনিশ শতকের বাঙলাদেশে সম্পত্তির এক বিশেষ অবস্থার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, জমিদারি অথবা তেমন কোনো ভূমিস্বত্ব, যেখানে উৎপাদনের উন্নতি অথবা অন্য কোনো সামাজিক ভূমিকার প্রশ্নটি বড়ই ক্ষীণ, অথচ ঠাকুরবাড়ির অতুল ভূসম্পত্তির

তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রনাথের উপর অনেক দায়িত্বই তো একসময় বর্তেছিল। সময়সূত্রে দেখি, 'সম্পত্তি-সমর্পণ'-এর মতো গল্প যখন তাঁর কলমে, তার অনতি আগে-পরে জমিদারি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াতে তিনি যথেষ্ট তীব্র। 'পঞ্চভূত'-এ পুণ্যাহের বর্ণনায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ 'আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বররেশ-ধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সেদিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনার দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে নীচ লোভ, অপরদিকে হীন ভয় নাই।' আগের দিন রাতে কোথা থেকে একটা ব্র্যাস-ব্যাণ্ড এনেছে লোকে। বাজনাবাদ্যের মধ্যে 'খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।'

সম্পত্তির সামাজিক প্রভাব আর মানুষে মানুষে সম্পর্কে তার অবরোধের রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্পষ্ট হয় এক নির্দয় ক্রূর অধিকারবোধের বিন্যাসে, যা মানুষকে দখল করার প্রবৃত্তিতে মাতিয়ে তোলে। অধিকারবোধের আধিক্যে মনুষ্যত্ব থেকে সে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ায় আর-কোনো আনন্দই অবশিষ্ট নেই। এই বোধের সুদূরপ্রসার লেখকের একাধিক গল্পকে বিশিষ্টতা দেয়। আরো অভিভূত হই ভেবে যে, মানবতা ও অধিকারের এই মুখ্য দ্বন্দ্ব শুধু সম্পত্তিবান মানুষের সমস্যায় সীমাবদ্ধ নয়। কখনো বিত্তশালীর সংরক্ষণের লোভে, কখনো বিত্তান্বেষীর উন্মাদ খুঁজে ফেরায়, কিংবা হয়ত দরিদ্র নিঃস্বজনের প্রতিষ্ঠালাভের প্রয়াসে অথবা বিত্তহীনের সর্বনাশা লোভের তাড়নায়, সমাজের নানা স্তরে জীবননাট্যের ভিন্নমুখী আবেদনে মূল যন্ত্রণার প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি বারবার আমাদের স্পর্শ করে, স্তব্ধ করে।

ধন-সংরক্ষণের নেশায় মানুষ অমানুষ হয়। মানবিকতা থেকে তার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কাহিনী পরিপূর্ণতা পায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের সামনে। আগলাবার পাগলামিতে আচ্ছন্ন যজ্ঞনাথের ভবিতব্য সামাজিক নিয়মেই অনিবার্য ছিল। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে এমন ভাবে তুলে ধরেন লেখক, যে সম্পত্তির মূল মানবিক অসঙ্গতি সম্পর্কে তাঁর তিক্ততা গ্রহণযোগ্য প্রকাশ খুঁজে পায়।

'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পে 'পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বি.

বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সবাই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইত।' অথবা ভিনদেশি বালক নিতাই পাল যজ্ঞনাথের ঘরে স্নেহ ও যত্ন পেলে, 'যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশিদিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল, এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, 'ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।' বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, 'আহা, বাপ-মার মনে না-জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়।'

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।'

'পুত্রযজ্ঞ' (১৩০৫) এমন আর একটি গল্প যেখানে এক বিত্তবান জ্ঞানী ধন সংরক্ষণ করে প্রাণপণে, আর অপেক্ষা রাখে এক উত্তরপুরুষের আগমনের। বিজ্ঞ বৈদ্যনাথ তাঁর স্ত্রী বিনোদাকে পরিত্যাগ করেন ব্যভিচারের অপরাধে। কিন্তু হতভাগ্য জানত না যে তার আদর্শ শ্লোক 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' তখন বিনোদার শরীরে একটু-একটু করে সার্থকতা পাচ্ছে। প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে বৈদ্যনাথ পুত্রার্থে একাধিকবার দারপরিগ্রহণ করেন; কিন্তু পুত্র না জন্মে কেবলি কন্যা জন্মায়। শেষে তাঁর চতুর্থ পত্নীর পুত্রলাভার্থে ব্রাহ্মণভোজন

অনুষ্ঠানেব দিন বৈদ্যনাথ অজান্তে নিজেব একমাত্র বংশধবকে পুত্রযজ্ঞেব অন্ন থেকে বঞ্চিত কবেন। এই মহাকাণ্ডেব সূত্রপাত বহুবছর আগে। আজ 'পুত্রযজ্ঞ'ব নাযক যে বর্তমান পবিণামে এসে পৌছল, তার পিছনে আছে এক ক্লেদাক্ত সমাজের উপাখ্যান।

'কুসুম (বিনোদাব সখী) যেদিন তাস খেলিবাব সাথী না পাইত সেদিন তাহাব তরুণ দেবব নগেন্দ্রকে ধবিযা আনিত। নগেন্দ্র ও বিনোদার আপত্তি হাসিয়া উডাইয়া দিত।·· এইরূপে বিনোদাব সহিত নগেন্দ্রেব প্রাযই দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল।···একদিন দুপুববেলায় বিনোদা, কুসুম ও নগেন্দ্র তাস খেলিতেছিল। কিছুক্ষণ পবে কুসুম তাহাব রুগ্ন শিশুব কান্না শুনিযা উঠিয়া গেল। নগেন্দ্র বিনোদাব সহিত গল্প কবিতে লাগিল।··

হঠাৎ একসময তাহাব (নগেন্দ্রর) উদ্দাম যৌবন বিনযেব সমস্ত বাঁধ ভাঙিযা ফেলিল, হঠাৎ বিনোদাব হাতদুটি চাপিযা ধবিযা সবলে তাহাকে টানিযা লইযা চুম্বন কবিল। বিনোদা নগেন্দ্র কর্তৃক এই অবমাননায ক্রোধে ক্ষোভে লজ্জায অধীব হইযা নিজের হাত ছাডাইবাব জন্য টানাটানি কবিতেছে এমন সময তাহাদেব দৃষ্টিগোচর হইল, ঘবে তৃতীয ব্যক্তিব আগমন হইযাছে। নগেন্দ্র নতমুখে ঘব হইতে বাহিব হইবাব পথ অন্বেষণ কবিতে লাগিল।

পবিচারিকা গম্ভীব স্ববে কহিল, 'বৌঠাকরুণ তোমাকে পিসিমা ডাকছেন।'

পবিচাবিকা যেটুকু দেখিয়াছিল তাহাকে হ্রস্ব এবং যাহা না দেখিয়াছিল তাহাকেই সুদীর্ঘতব কবিযা বৈদ্যনাথেব অন্তঃপুরে একটা ঝড তুলিযা দিল। বিনোদাব কী দশা হইল সে কথা বর্ণনাব অপেক্ষা কল্পনা সহজ। সে যে কতদূব নিবপবাধ কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা কবিল না, নতমুখে সমস্ত সহিযা গেল।

বৈদ্যনাথ আপন ভাবী পিণ্ডদাতাব আবির্ভাব-সম্ভাবনা অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন জ্ঞান কবিযা বিনোদাকে কহিল, 'কলঙ্কিনী তুই আমাব ঘর হইতে দূব হইযা যা।'···

'সেই বাত্রে বিনোদা স্বামীগৃহ ত্যাগ কবিয়া গেল। কেহ তাহাব খোঁজও কবিল না।'

বিপুল বিত্তেব অধিকাবী বৈদ্যনাথেব পবিপ্রেক্ষিতে, এই কাহিনীতেই বহুবছব পবেব বর্ণনায দেখি দেশব্যাপী এক মর্মান্তিক অভাব আব মুখোমুখি ধনবানের সম্পত্তি নিযে সমস্যা।···তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষে বঙ্গ বিহাব

উড়িয়া অস্থিচর্মসার হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যনাথ যখন অন্নের মধ্যে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, আমার অন্ন কে খাইবে, তখন সমস্ত উপবাসী দেশ আপন রিক্তস্থালীর দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কী খাইব।

ঠিক সেই সময়ে চারিমাস কাল ধরিয়া বৈদ্যনাথের চতুর্থ সহধর্মিণী একশত ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিতেছিল এবং একশত ব্রাহ্মণ প্রাতে প্রচুর অন্ন এবং সাহাহ্নে অপর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান পাইয়া খুরি সরা ভাঁড় এবং দধিঘৃতলিপ্ত কলার পাতে ম্যুনিসিপালিটির আবর্জনা-শকট পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছিল। অন্নের গন্ধে দুর্ভিক্ষকাতর বুভুক্ষুগণ দলে দলে দ্বারে সমাগত হইতে লাগিল, তাহাদের সর্বদা খেদাইয়া রাখিবার জন্য অতিরিক্ত দ্বারী নিযুক্ত হইল।'

ধনীর বিত্তরক্ষার নেশা চারদিকের কুসংস্কারে মিলেমিশে যজ্ঞনাথ অথবা বৈদ্যনাথের কঠিন নিয়তি নির্মাণ করেছে। তাদের পরিণামের কাহিনীতে আশ্চর্য আয়রণির মতো আসে সহসা ঘটনাসমূহের যুগপৎ সংঘাত। অথচ পরিণামের কার্যকারণ গোটা কাহিনীর ব্যঞ্জনা ব্যেপে প্রস্তুত ছিল। তাই সহসা ঘটনাসমূহের যুগপৎ সংঘাত এখানে কোনো সহজ হিসাব মেলাবার ফাঁকি নয়; বরং জীবনের পরিহাসকে তার নির্দয়তম রূপটি দেওয়ার অসামান্য বিন্যাসমাত্র। 'যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড, তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ড কিংবা তাহার পুত্র অথবা প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।' এই মন্ত্র পড়তে পড়তে পূর্বপুরুষের ধনলালসার নিশ্ছিদ্র গুহায় স্বয়ং গোকুলচন্দ্র নিজেই যখন যখ হয়ে যায়, যজ্ঞনাথের পরিণামের বীভৎসতম আবেদন এখানে। উত্তরপুরুষের ধন রক্ষার্থে উত্তরপুরুষকেই সে যখ করে দেয়; তারপর উন্মাদের মতো বেঁচে থাকে ক-বছর, সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে। সেই জানার যন্ত্রণাই তার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তের উক্তিতে, 'নিতাই আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।'

অথবা বৈদ্যনাথের পুত্রলাভার্থে যজ্ঞকালে 'একদিন প্রাতে বৈদ্যনাথের মার্বেল-মণ্ডিত দালানে একটি স্থূলোদর সন্ন্যাসী দুই সের মোহনভোগ এবং দেড় সের দুগ্ধ-সেবায় নিযুক্ত আছে, বৈদ্যনাথ গায়ে একখানি চাদর দিয়া জোড় করে একান্ত বিনীতভাবে ভূতলে বসিয়া একান্ত ভক্তিভরে পবিত্র ভোজন ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় কোনোমতে দ্বারীদের

দৃষ্টি এড়াইয়া জীর্ণদেহ বালক সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, 'বাবু, দুটি খেতে দাও।...ওগো এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাই নে।'

গুরুদয়াল আসিয়া বালক ও তাহার মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।

সম্পত্তিকে জড়িয়ে ব্যক্তির নিজের হাতে নিজে বাঁধা নির্মম পরিশিষ্ট শুধু সংরক্ষণের লাভে সীমাবদ্ধ নেই। 'গুপ্তধন'-এর (১৩১৪) মৃত্যুঞ্জয় বিত্তের অন্বেষণে সংসার ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল। তার ওই উন্মাদ খুঁজে ফেরায় সম্পত্তির আরেক বীভৎস অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করলেন রবীন্দ্রনাথ।

গুপ্তধন খুঁজতে গেল গ্রামের গৃহস্থ মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পিতামহ হরিহর এক সন্ন্যাসীকে সেবায় তুষ্ট করে গুপ্তধনের সংকেত লেখা তুলট লিখন লাভ করে। কাগজ পাওয়ার পর থেকেই হরিহর আর তার ছোট ভাই শঙ্করের মধ্যে নীরব দ্বন্দ্ব শুরু হল। সন্ন্যাসী বলেছেন এ পরিবারের কেউ একজন এ সংকেত ভেদ করবে, সে ছাড়া আর কেউ পারবে না। পাছে শঙ্কর গুপ্ত সংকেত ভেদ করে সম্পত্তি পায়, হরিহর তাই তুলট কাগজ লুকিয়ে রাখে। এই তুলট লিখনের নকল গোপনে তৈরি করে শঙ্কর। তারপর একদিন সন্ন্যাসীবেশে গৃহত্যাগ করল। এসব বহুদিনের কথা, মৃত্যুঞ্জয় তখন শিশু।

মৃত্যুঞ্জয়ের আমলে আসল তুলট লিখনটি গৃহদেবতার পায়ের কাছে রাখা চাবি বন্ধ বাক্স থেকে চুরি যায়; কাজটি করেন আবার শঙ্কর। যে নকল লিখন নিয়ে বহুকাল আগে সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন তিনি, সে-কাগজ আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন এক গুরুর মুখে ত্যাগের মহিমা শুনতে শুনতে। কিন্তু লালসার অত সহজে নিবৃত্তি নেই। তাই এক গভীর অরণ্যের ভিতর মন্দিরের গায়ে সেই তুলট কাগজে আঁকা চক্র আবিষ্কার করে পুনরায় গুপ্ত সংকেত লেখা কাগজের জন্য ব্যাকুল হন তিনি। অবশ্য মৃত্যুঞ্জয় সন্দেহবশে সন্ন্যাসীর পিছন পিছন পথে বেরোয়; সেও আসে সেই গভীর অরণ্যে। গুপ্তধনের কাছাকাছি। যে মুহূর্তে শঙ্কর প্রাচীন মন্দিরের শেষ সংকেত পর্যন্ত ভেদ করে 'পাইয়াছি' বলে চিৎকার করে উঠলেন, সে সোল্লাসধ্বনি মৃত্যুঞ্জয়ের ধনলালসায় আচ্ছন্ন দুর্বল মনকে স্থির রাখতে পারে না; পাথর

ছুঁড়ে মারতে যায় সে সন্ন্যাসীকে। সে পাথর শঙ্করের দেহ স্পর্শ করে নি, কিন্তু তার মোহাবরণ ভেদ হল, 'তুমি ঐ যে পাথর ফেলিয়া আমাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলে তাহার আঘাত আমার শরীরে লাগে নাই, কিন্তু তাহা আমার মোহাবরণ ভেদ করিয়াছে। তৃষ্ণার করাল মূর্তি আজ আমি দেখিলাম।' এই চেতনায় উত্তীর্ণ হতে মৃত্যুঞ্জয়ের আরো কিছু দেরি ছিল; তাই সে আর্তনাদ করে' আমি যক্ষ হইয়া এই ধন আগলাইব—কিন্তু তুমি ইহা লইতে পারিবে না—কোনোমতেই না। যদি লইতে চেষ্টা কর, আমি ব্রাহ্মণ, তোমাকে অভিশাপ দিয়া এই কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। এ ধন তোমার ব্রহ্মরক্ত গোরক্ত-তুল্য হইবে—এ ধন তুমি কোনোদিন সুখে ভোগ করিতে পারিবে না।'

কিছু পরে মৃত্যুঞ্জয় জানতে পারে এই সন্ন্যাসী তার পূর্বপুরুষ শঙ্কর, অর্থাৎ এ গুপ্তধনে সন্ন্যাসীর ও মৃত্যুঞ্জয়ের সমান অধিকার। শঙ্করের সাহায্যেই 'মৃত্যুঞ্জয়·· একটা ঘরে প্রবেশ করিল।··চারিদিকে দেয়ালের গায়ে মোটা মোটা সোনার পাত ভূগর্ভরুদ্ধ কঠিন সূর্যালোকপুঞ্জের মতো স্তরে স্তরে সজ্জিত। মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। সে পাগলের মতো বলিয়া উঠিল, 'এ সোনা আমার—এ আমি কোনোমতেই ফেলিয়া যাইতে পারিব না।' ··মৃত্যুঞ্জয় বারবার করিয়া এই স্বর্ণপুঞ্জ স্পর্শ করিয়া ঘরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ছোট ছোট স্বর্ণখণ্ড টানিয়া মেঝের উপরে ফেলিতে লাগিল, কোলের উপর তুলিতে লাগিল, সর্বাঙ্গের উপর বুলাইয়া তাহার স্পর্শ লইতে লাগিল।···কখনো বা দাঁত দিয়া দংশন করিয়া সোনার পাতের উপর দাগ করিয়া দিল। কখনো বা একটা সোনার পাত মাটিতে ফেলিয়া তাহার উপর বারম্বার পদাঘাত করিতে লাগিল। · মৃত্যুঞ্জয়ের যেন একটা প্রলয়ের রোখ চাপিয়া গেল।' মৃত্যুঞ্জয়ের এই উন্মাদনায় বৃদ্ধ যজ্ঞনাথের সেই যক্ষের হাতে সম্পত্তি সঁপে দেওয়া মনে পড়ে। বিকৃত মোহের দুটি ভিন্ন রূপ একই অবলম্বন ধরে চরম পরিণামের কাছে আসে।

অনেক যুগের মরাধন, পৃথিবী যাকে কবর দিয়ে রেখেছিল, সেই মরাধনের শব-সাধনায় উন্মাদ মৃত্যুঞ্জয়, যজ্ঞনাথ। এ উন্মাদনা নিজস্ব বৃত্তিতেই একসময় মানুষকে ক্লান্ত করে, সচেতন করে। সে অবসাদে লোভী জন্তুর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মানুষটা। কিন্তু তখন কি মানুষ হয়ে পারে সে বাঁচতে। যজ্ঞনাথের কাছে বাঁচা যেন মৃত্যুযন্ত্রণার

অধিক। আর মৃত্যুঞ্জয় স্বর্ণক্রীড়ায় ক্লান্ত হয়ে একসময় সোনার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল; জেগে উঠে এই বদ্ধ স্বর্ণ-আগারকে তার ভয় করে। মৃত্যুঞ্জয়ের মনে হয় 'এই সোনার পিণ্ডগুলো আলোক চায় না, আকাশ চায় না, বাতাস চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। ইহারা এই চির-অন্ধকারের মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া, কঠিন হইয়া, স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়।...

গ্রামের ঘরের অতি ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ধরণীর উপরিতলে এক বিচিত্র বৃহৎ চিরচঞ্চল জীবনযাত্রার মধ্যে তুচ্ছতম দীনতম হইয়া নিজের জীবন মিশাইবার জন্য শতস্তর-মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তাহার কাছে লোকালয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।'

আকুল এই চিন্তার পরে মৃত্যুঞ্জয় সেই স্বর্ণকারাগারের বাইরে আসতে পেরেছিল। সর্বনেশে তুলট লিখন ছিঁড়ে ফেলে কৌপীনপরা ভিখারীর জীবনকেও এই স্বর্ণাগারে আবদ্ধ পরাধীনতার চেয়ে আনন্দের ভাবতে পারে সে। 'গুপ্তধন' তাই কণ্ঠরোধ করা বীভৎস অভিজ্ঞতা পেরিয়ে তবু কিছু মুক্তির আস্বাদে শেষ হয়। মানুষ যখন ধনের অন্বেষণে উন্মাদ, সম্পদের আশা তার ভবিতব্যকে ভাঙে গড়ে। সে ভাঙা-গড়ার শেষে 'গুপ্তধন'-এর মৃত্যুঞ্জয় নিজের পরিণামে তবু বাঁচার কিছু অর্থ অবশিষ্ট দেখেছিল। কিন্তু বিত্তহীন নিঃস্বজনের ধনলালসা নিয়ে লেখক আরো কিছু কাহিনী নির্মাণ করেন, যেখানে দরিদ্রজনের অবস্থা ফেরানোর আশা ও তার ব্যর্থতার পরিশিষ্ট কঠোর বাস্তবকে চেনায়। সে-বাস্তব নির্মমতর। দারিদ্র্য কখনোই কাম্য হতে পারে না। নিঃস্বজন তার প্রতিকার চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-প্রতিকারের সার্থকতা দাবি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান। 'বাশিয়ার চিঠি', 'সমবায়নীতি', এরকম একাধিক লেখায় রবীন্দ্রনাথ এ-বোধের খুব কাছাকাছি আসেন। সে বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পায় 'পণরক্ষা' অথবা 'রাসমণির ছেলে'র পরিণাম; যেখানে তিনি সম্পত্তির বাঁধাধরা নিয়মের ভিতরে দরিদ্রজনের প্রতিকার খোঁজার বিভ্রান্ত অসহায় রূপটি তুলে ধরেন। গ্রামের ছেলে তার পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে কলকাতায় আসে। নিজের পায়ে

নিজে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা তার, হয়তো দাঁড়ায়ও, কিন্তু বিনিময়ে নিজের সর্বস্ব কলকাতা শহরের টাকার হাড়কাঠে বলি দেয়। ভুল করেছে, এ অনুভূতি যখন স্পষ্ট হয় মনে, তখন সে নিজেই নিজের ফিরবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

তাঁতির ছেলে রসিক তাঁতের কাজেই যত অসুবিধা দেখেছিল ; কাজকে হেয় করতে গিয়ে বুঝি ভুলেছিল সে, যে, তাঁতই তাকে এত বড়টি করেছে। তাই যে মুহূর্তে রসিককে বলতে হয় 'আমি তাঁতির ছেলে, আমি আপনার মোট বহিব, আমাকে কলকাতায় লইয়া যান', তাঁত যেন এতদিনের অবহেলার প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। রসিকের বলি আরম্ভ হয়।

দাদা বংশীলাল রসিকলালকে তাঁত বুনে মানুষ করেছিল। রসিকের বিয়ের জন্য প্রাণপাত করে বংশী টাকা জমাচ্ছে ; হঠাৎ রসিক একটি বাই-সাইকেল কেনার আবদার ধরল। এদিকে দাদা এবার রসিককে উপদেশ দেয় তাঁতের কাজে হাত লাগাতে। তাঁত বোনা ছাড়া আর যে-কোনো কাজেই রসিকের পরম উৎসাহ। দাদার সঙ্গে মান-অভিমান বচসায় বংশীর স্নেহময় আশ্রয় ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ব্রত নিয়ে রসিক একদিন বেরিয়ে পড়ে। দাদার অক্লান্ত পরিশ্রমে ফুরিয়ে আসা প্রাণটার দিকে ফিরেও দেখে না। কিন্তু নিজের কাছে নিজের প্রাত্যহিকের হিসাব দিতে গিয়ে রসিক দেখে, তার যেটুকু বাজারদর, তা ওই তাঁতের জোরেই। সমস্ত লজ্জা স্বীকার করে দাদার কাছে ফিরে যাবার জন্য প্রাণটা হাঁফিয়ে ওঠে। তখনই রসিক গ্রামে ফেরার স্বপ্ন দেখে। ' ·যখন মনটা অত্যন্ত যাই-যাই করিতেছে এমন সময় তাহার বাসার কাছে খুব ধুম করিয়া একটা বিবাহ হইল।···সেই-দিন রাত্রে রসিক স্বপ্ন দেখিল, তাহার মাথায় টোপর, গায়ে লাল চেলি, কিন্তু সে গ্রামের বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা 'তোর বর আসিয়াছে' বলিয়া সৌরভীকে খেপাইতেছে, সৌরভী বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছে—রসিক তাহাদিগকে শাসন করিতে ছুটিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কেমন করিয়া কেবলি বাঁশের কঞ্চিতে তাহার কাপড় জড়াইয়া যায়, ডালে তাহার টোপর আটকায়, কোনোমতেই পথ করিয়া বাহির হইতে পারে না।'

কিন্তু সত্যিই যেদিন সে গাঁয়ে ফিরে যেতে পারে, তখন তার আত্মা, তার অনুভব, প্রেম সবকিছু গ্রাস করেছে কলকাতা। গ্রামের পছন্দ করা পাত্রী সৌরভী আজও আছে। দাদা আর নেই, রেখে গেছে সৌরভীর পণের টাকা

আর একটি নতুন বাই সাইকেল, কিন্তু সেদিন উপহার গ্রহণের পথ রসিকের বন্ধ। জানকী নন্দী, একদা যে ভ্রমক্রমে নিজের সমাজের বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, আজ সে কলকাতার মস্ত ধনী। পুরনো সামাজিক বৈষম্যটুকু ঢেকে সনাতন সমাজেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়; ফলে প্রয়োজন একটি একান্ত নির্ভরশীল অসহায় তাঁতির ছেলে। সে বিয়েটা রসিক করে এসেছে। বিয়েতে দানসামগ্রীর প্রথম দাবি ছিল বাই সাইকেল।

সমাজ পরিপার্শ্ব যে মোহজাল বিস্তার করেছিল, তার শিকার হয়ে গেছে রসিক। নিজের পরাধীনতার বোধে তখনই তার চৈতন্য হয়, যখন সে সম্পূর্ণ পরাজিত, বিগত কৃতকর্মের বন্ধনে বাঁধা নিজেরই অভিজ্ঞতার বলি। 'রসিক তাহার দুই হাত ছড়াইয়া দিয়া' দাদার শূন্য গৃহের বন্ধ 'দরজার সামনে উপুড় হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দাদা! দাদা! দাদা! যে দাদা তাহার পায়ের শব্দটি পাইলে আপনি ছুটিয়া আসিত কোথাও তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।' রসিকের ওই নিষ্ফল জান্তব হাহাকারে ধ্বনিত হয় বুঝি বুড়ো যজ্ঞনাথের উন্মাদ কণ্ঠ 'কান্না শুনিতে পাইতেছ? কান পাতিয়া শোন দেখি 'বাবা' বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?...কান্না শুনিতে পাইতেছ? নিতাই, আমার মইটাকে উঠিয়ে নিলে।'

প্রতিষ্ঠার মোহ গ্রামের ছেলেকে শহরে টানে। বড়লোক হতে সে শহরে আসে। রসিকের ক্ষেত্রে সম্পত্তির আশ মিটেছিল। কিন্তু ঢাকাই ধুতি পরিহিত, বোতাম খোলা কালো বনাতের কোট, পায়ে রঙিন ফুল মোজা ও চকচকে কালো চামড়ার বিলাতি জুতোর সমাহারে বাবু হওয়ার জাঁকে প্রকৃতির নিয়মে গড়া মানুষ সমাজের বে-নিয়মে অমানুষ হয়ে গেছে। নিজের ভুলের পরিতাপে রসিক তাই যখন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে, তার জন্যে করুণা থাকে হয়তো, কিন্তু কোনো প্রেরণা অবশিষ্ট নেই আর। 'পণরক্ষা' (১৩১৮) ছাড়া আরো এক কাহিনীতে নিঃস্ব মা-বাপের ছেলে ভাগ্য ফেরাতে কলকাতায় এসেছিল। শানিয়াড়ি চৌধুরি বাড়ির কালীপদ,—'বাসমণির ছেলে' (১৩১৮)।

এ-গল্পে রবীন্দ্রনাথ অসীম নৈপুণ্যে সমাজের বহু স্তরের মানুষকে ছুঁতে পারেন। এবং প্রতিটি মানুষের ট্র্যাজিডি সমন্বয়ে যে মর্মান্তিক কাহিনী গড়ে ওঠে, তা এ-দেশের সমাজইতিহাসের একটি রূপক। কালীপদর বাবা ভবানীচরণ নিঃস্ব হয়েছিলেন এক পারিবারিক ঘটনায়; উইল চুরি যায় এবং নকল উইলে পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাঁর একমাত্র পুত্র ভবানীচরণ সহ

শানিয়াড়ি চৌধুরীবাড়ির বৈভব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন। ভবানীচরণ আজও বাঁচেন সেই হারানো ঐশ্বর্যের স্মৃতিতে। হারিয়ে যাওয়া উইল একদিন পাওয়া যাবে, এবং সে উইল উদ্ধার করবে কালীপদ—এ-আশাই ছিল তাঁর প্রাণের উৎস। ভবানীচরণের স্ত্রী রাসমণি দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে। স্বামী যে বৈভবের স্বপ্নে জীবনধারণ করেন তার কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। প্রাপ্য সম্পত্তির প্রতি আসক্তিও নেই কোনো। ছেলে কালীপদ তাঁর হাতে সাধারণ বিত্তহীন পরিবারের ছেলের মতোই মানুষ হয়। কিন্তু আর পাঁচজন দরিদ্র বাপ-মা-র মতো রাসমণিও এটা ভাবে যে ছেলে মানুষ হবে, এ-সংসারে ভাগ্যপরিবর্তনের মূলকেন্দ্র হবে সে। এ-আশায় কোন সম্পত্তির লালসা জড়িয়ে ছিল না ঠিকই। তবু এই নিরাসক্ত মন নিয়েও রাসমণির সামনে ছেলে মানুষ করার একটা পথই খোলা থাকে—ছেলেকে কলকাতায় পাঠানো। কালীপদ মা-র আশীর্বাদী পঞ্চাশ টাকার নোট, বহু সদুপদেশ, ঘরের তৈরি মার হাতের আচার সহ আসে শহরে, ওঠে এক ছাত্রাবাসের বিনা ভাড়ার জীর্ণ ঘরে।

ছেলে পড়িয়ে খরচ চালায় কালীপদ, বাকি সময়টা পড়াশুনো করে বড়-লোকের ছেলেদের সংসর্গ বাঁচিয়ে। মা বারবার বলে দিয়েছেন এদের সঙ্গে না মিশতে; কালীপদকে তো মানুষ হতে হবে, ভাগ্য ফেরাতে হবে মা-বাপের। কিন্তু রাসমণি বা কালীপদ কেউই জানত না গ্রামের ছেলে কলকাতায় এসে মায়ের সদুপদেশ আর নিজের অতুলনীয় অধ্যবসায় সম্বল করে শহরের প্রতিযোগী জীবনে লড়তে পারে না।

শৈলেন্দ্র আর তার বন্ধুদের সঙ্গে কালীপদর যে বিবাদ, তা সামাজিক কারণেই অনিবার্য ছিল। কালীপদ রাসমণির ছেলে, দারিদ্র্যের অহঙ্কার তার ভূষণ; অন্যদিকে শৈলেন্দ্র, ধনীর ঔদার্যে সে দরিদ্রকে সাহায্য করে, দয়া করে; তাই যে নিঃস্বজনের দারিদ্র্যই অহং, তার সঙ্গে শৈলেন্দ্রর বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। কালীপদ তার বশীভূত না হয়ে প্রতিযোগী হতে চাইল। এ প্রতিযোগিতায় গ্রামের নিঃস্ব বাপ-মা-র ছেলে বাঁচে না। বহু কালীপদ শহর জীবনের বলি হয়, রাসমণির ছেলের মতো। আর শৈলেন্দ্র জানতে পারে কালীপদ তার সেই কাকা, যাকে অথবা যার পূর্বপুরুষকে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে আজ তাদের অযাচিত বৈভব। কিন্তু তখন হয়ে গেছে বহু দেরি; কালীপদকে শৈলেন্দ্রর অশেষ চেষ্টাতেও বাঁচানো গেল না। ভবানীচরণ আসল উইল ফিরে পেলেন কালীপদর মৃত্যুর পরে, শৈলেন্দ্রর সঙ্গতিতে;

কিন্তু তখন সে-দলিলের মূল্য পুত্রহীন পিতার কাছে এক কানাকড়িও নয়। তাই মূল্য দেয় সবাই, কিন্তু মুক্তি হয় না কারোর। শৈলেন্দ্রও বড় দেরি করে ফেলে নিজের রক্তের সম্পর্ককে চিনতে। শুধু শেষ পর্যন্ত কথা বলে যেতে পারে ভবানীচরণের গুরুপুত্র বগলাচরণ, ভবানীর মোকদ্দমা চালিয়ে যার ঘরে অর্থ সমাগম হয়েছে। বগলাই বলেছিল কালীপদকে দিয়ে আসল উইল উদ্ধার হবে। কালীপদর মৃত্যুর পরে সেই উইলপ্রাপ্তি যখন ভবানীকেও সম্পত্তিতে আর আসক্ত করে না, তখনও বগলাচরণ আত্মগরিমায় স্ফীত যে, সে-ই প্রথম বলেছিল কালীপদকে দিয়ে উইলের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটবে। অথচ ভবানীচরণের সাধের উইল তখন তার নিজের হাতেই বিনষ্ট আর কালীপদ নিঃস্ব বাপ-মায়ের সব আশা-আশ্রয় শূন্য করে চলে গেছে।

ভবানীচরণের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে কাহিনী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার সামাজিক পরিপার্শ্ব নতুন নয়। কিন্তু উইল চুরির ইতিহাস আর আসল উইল ফিরে আসার কাহিনী একত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপটকে এক নতুন তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করে। 'রাসমণির ছেলে'র নির্মম পরিশিষ্ট কিন্তু গ্রাম্য নিঃস্ব মানুষের প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, কিংবা শহরের প্রতিযোগী জীবনে নিজের জায়গা খোঁজার আত্মাহুতিতে সীমাবদ্ধ নেই। শহরের মধ্যবিত্ত, সাধুতার জেলখানায় সততার বেড়ি পরে যে মানুষ হয়, সে-ও বিত্ত আর প্রতিষ্ঠার সর্বনাশা তাড়নায় একই সমাজের বলি, আবার খুনীও একই সঙ্গে।

'ভাইফোঁটা' (১৩২১) গল্পের সেই মানুষটির কথা; 'পিতার আমল হইতেই আমাদের বাড়িতে পাড়ার কোনো কোনো বিধবা মেয়ে টাকা গচ্ছিত রাখিত। তারা সুদের আশা করিত না; কেবল এই বলিয়া নিশ্চিন্ত ছিল যে, মেয়েমানুষের সর্বত্রই ঠকিবার আশঙ্কা আছে, কেবল আমাদের ঘরেই নাই।' সেই গচ্ছিত টাকায় খোলা স্বদেশি এজেন্সি ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। ছোটবেলার সাথী অনু, যার সঙ্গে বিবাহের ইচ্ছায় একদিন রঙীন হয়েছিল আমাদের লোকটি, সেই অনু বর্তমানে একমাত্র পুত্র নিয়ে বিধবা; অকালমৃত্যুর আগে অনু তার টাকা, অর্থাৎ তার পুত্র সুবোধের সম্পত্তি আর সুবোধের দায়দায়িত্ব দিয়ে যায় স্বদেশি এজেন্সির সাধু মালিকের হাতে। সুবোধের মধ্যে ছিল তার মায়ের সেই প্রকৃতি, যার অবলম্বনে অনু বাল্যকালে অনেক কাল্পনিক সুখ-দুঃখ-ভয়ের জগতে বাস করত। অথচ সুবোধ আজ যে সংসারে এসে পড়ল, সেখানে প্রখর ন্যায়-অন্যায় ও সত্যমিথ্যার

বোধ বালকের কল্পনাকে হত্যা করতে অদ্বিতীয়। শুরু হয় বালকের অগোছালো স্বপ্নময় স্বভাবটাকে কর্মপটু করে তোলার জন্য তাকে দিবারাত্রি খাটিয়ে নেওয়া।

তারপর আসে সেই গুরুত্বপূর্ণ দিন, যখন, '...সময়টা বড় খারাপ পড়িয়াছিল। সুরোধের টাকা কিছুতেই লইব না পণ ছিল, অথচ ও টাকাটা না লইলে নয় এমনি অবস্থা। শেষকালে একদিন মহা বিপদে পড়িয়া কিছু লইলাম। ইহাতে আমার মনের কল এমনি বিগড়াইয়া গেল যে, সুরোধের কাছে মুখ দেখানো আমার দায় হইল। প্রথমটা উহাকে এড়াইতে থাকিলাম, তারপর উহার উপরে বিষম রাগিতে আরম্ভ করিলাম।'

অন্যদিকে নানা বিষয়ে ফাই-ফরমাস খেটে খেটে সুরোধ এজেন্সি আর তার মালিকের বিভিন্ন কাজকর্মে পাকা হয়ে উঠেছিল। এজেন্সির মালিকও মাতৃহীন বালকের রুগ্ন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তার মায়ের শেষ সময়ের উদ্বেগ প্রায় ভুলতে বসেছিল, 'একদিন আড়াল হইতে শুনিয়াছি ডাক্তার বলিয়াছে সুরোধের যেরকম শরীরের লক্ষণ ওর বেশিদিন বাঁচার আশা নাই। শুনিয়া অবধি ভয়ে ভয়ে আছি, পাছে আমার মরিতে দেরি হয়। আজ অন্তত আশা লইয়া মরিব যে, ডাক্তারের কথা ভুল হইতেও পারে।' কিন্তু অনু যার হাতে ছেলেকে দিয়ে গেল তার ঘরে সুরোধের যত্ন ছিল না, আরামও নয়। 'ছেলেবেলা হইতে আরাম জিনিসটাকে অন্যায় বলিয়াই জানি, বিশেষত ছোট ছেলের পক্ষে। তাই এ সম্বন্ধে আমার মনে কোন পরিতাপ ছিল না।'

সেই পরিতাপ এল ; কিন্তু তখন ক্লান্তির শেষ সীমায় সুরোধের জীবনশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। যে গৃহে যত্ন ছিল বাহুল্য মাত্র, সেখানে সুরোধের সেবার অন্ত রইল না। স্ত্রীর গহনার বাক্সে হাত পড়ল তার চিকিৎসার জন্য। 'কিন্তু টাকায় তো মানুষ বাঁচে না। উহার প্রাণ যে আমি এতদিন ধরিয়া দলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি। যে স্নেহের অন্ন হইতে উহাকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি আজ যখন তাহা হৃদয় ভরিয়া তাহাকে আনিয়া দিলাম তখন সে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না।' সুরোধ মরল। রেখে গেল তার মৃত্যুর অভিশাপ।

স্বার্থপর জীবনের কুৎসিত ব্যর্থতার পরিণামে মানুষ কেমন করে নিজের হাতে নিজেকে বলি দেয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরে জীবনের সেই পরিহাস কয়েকটি কাহিনী ব্যেপে বিন্যস্ত। সম্পত্তি অথবা প্রতিষ্ঠার যে বোধে মানুষ অভ্যস্ত, তা মানুষকে কখনো লোভ, কিংবা কুসংস্কার, এমন কি অহঙ্কার নিজের

ক্ষমতা নিয়ে, হয়তো আত্মগরিমা নিজের আদর্শ নিয়ে, এর কোনো একটির কাছে নত করে। ব্যক্তি অজান্তে এর কোনো এক বৃত্তিকে আঁকড়ে ধরে পরম অবলম্বন ভেবে।

এইভাবে বিত্তবান পৌঁছয় 'সম্পত্তি-সমর্পণ' কিংবা 'পুত্রযজ্ঞ'র নিয়তিতে। 'গুপ্তধন'-এ দেখি অন্বেষণের উন্মাদনা পেরিয়ে তবু বাঁচতে পারে মানুষ। রবীন্দ্রনাথের সংজ্ঞায় খুঁজে ফেরার ক্ষেত্রে অন্বেষণের নিষ্ফলতাই কঠিনতম পরিশিষ্ট ; সম্পত্তি না পাওয়ার হতাশা সেখানে থাকে না, বরং খোঁজার কঠোর অভিজ্ঞতা তার উত্তরণ ঘটায়। দরিদ্র হয়তো খুঁজে ফিরে দরিদ্রতর হয়, কিন্তু বীভৎস আর আরো নির্দয় পরিণাম দেখি নিঃস্বজনের ভাগ্য ফেরানোর ইতিহাসে, শহরের হাতছানির গল্পে—'পণরক্ষা' বা 'রাসমণির ছেলে'। রসিক তার সাফল্যে ব্যর্থ ; কৃতকার্য হয়েই তার শাস্তির বিপর্যয়। আর কালীপদ শানিয়াড়ির পিতৃপরিচয় আর রাসমণির অসামান্য মাতৃপরিচয় নিয়ে প্রতিপদে পরাজিত ; হেরে গেছে বিত্তশালী শৈলেন্দ্রও। কথা বলে শুধু বগলাচরণ, ভবানীর মোকদ্দমা যাকে অর্থ দিয়েছে। আবার স্বদেশী এজেন্সির সেই সত্যবাদী ব্রাহ্ম মালিক ধনের স্পর্শে প্রথমে হয় অন্ধ, লোভী, নির্দয়, তারপর অনেক দেরিতে অনুতপ্ত। রবীন্দ্রনাথ 'সম্পত্তি-সমর্পণ' থেকে 'ভাইফোঁটা'য় বারবার সম্পত্তি আর সম্পত্তিতে অধিকারবোধকে তার সম্পূর্ণ অমানবিক, ভয়াবহ চেহারা দিয়েছেন। মানুষ সম্পত্তি নিয়ে খেলা করতে চায় ; কার্যত, সম্পত্তিই তাকে নিয়ে নির্মম খেলায় মাতে। বিত্ত শুধু অর্থহীন অধিকারের চোরাবালিতে ব্যক্তিকে ডুবিয়ে দেয়। সম্পত্তি প্রকৃত অর্থে সম্পদ হয়ে ওঠে না। এরই সঙ্গে একান্ত ভাবে জড়িয়ে থাকে প্রতিযোগী জীবনের ক্লিন্ন রূপ, যেখানে বিফল মানুষ তো ব্যর্থই, উপরন্তু নিঃশেষ এবং ভারাক্রান্ত সফল কৃতকার্য প্রতিযোগীও। সম্পত্তির আকাঙ্ক্ষায়, ধনলাভ করে তার সংরক্ষণে, প্রতিযোগী জীবনে প্রতিষ্ঠা কিংবা কৃতকার্যতার দৌড়ে মানুষ নিজেরই হাতে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে তার বিবেক, আর তার ভবিষ্যৎকে—নিজেকে দিনে দিনে ক্ষয় করে। তারপর সেই ফুরিয়ে যাওয়া সত্তা, সেই মরে যাওয়া ভবিষ্যের অভিশাপ তাকে লাগে। অভিশাপ যখন ব্যক্তিকে সচেতন করে, তার আগেই সে সমাজের তথা নিজের ক্লিন্নতার শিকার হয়ে গেছে। চৈতন্য তাই শুধু যন্ত্রণা তখন ; নির্দয় ভবিতব্য সে সময় নাগালের বাইরে।

যজ্ঞনাথদের কেউ কেউ মই নিয়ে জীবন শুরু করে। কেউ বা উপরে ওঠার আশায় প্রাণপাত করে মই তৈরির কাজে। তবু মইটা বারবার হারিয়ে যায়, নিষ্ফল হাহাকারে তার হদিশ মেলে না। 'সম্পত্তি-সমর্পণ' থেকে 'ভাইফোঁটা'—ছটি গল্পে মানুষের এই নির্মম ব্যর্থতা সমাজের দর্পণে অসাধারণ ব্যাখ্যা করেন রবীন্দ্রনাথ।

এখনো সে স্বাদ

রাম বসু

মুখে ঝড়ের স্বাদ এখনো
হাতের তালুতে তুলতুলে পাখি শুকিয়ে কাঠ
পায়ের ফাটা ফাটা গোড়ালিতে কাঁকর, অঙ্গার
ঋতু বদলের পৃথিবী হলুদ আলোয় অন্ধ ও উন্মাদ।

আমি কি সঞ্চয় করলাম সময়ের বিনষ্ট বন্দরে
যদিও আমার মুখে গত ঝড়ের স্বাদ

অনেক কিছু জেনে গেছি যা না জানলেও হতো
জেনেছি, বেকার বাহিনী ফুলে উঠবেই
কয়েকটা বাড়িতে পান খাবেন লক্ষ্মী
একশ কোটি মানুষকে করতেই হবে সম্ভ্রমহীন ভিখিরি
আমাদের বাড়-বাড়ন্তের জন্যে মরিয়া হবেই বিশ্বব্যাঙ্ক
জেনে গেছি কর্নওয়ালিস আর সার্কুলার সমান্তরাল
এই বয়সে চিনি আর আলু না খাওয়াই ভালো
এমন অনেক কিছু জেনে গেছি যা না জানলেও হতো

এই কি তবে সঞ্চয় করলাম হৃতগর্ব সময়ের বিনষ্ট বন্দরে
যখন আমার মুখে গতদিনের বনতুলসীর স্বাদ

অবশ্যই গভীর মনস্তাপ নেই
উঁকি দিচ্ছে আর এক দিগন্তের আভা

আকাশের বিশালতার চাপে দেহ ফলভারে নত বৃক্ষ
ভারমুক্ত আমি এখন মেঘ-বহরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি
কেননা নিশীথ-সমুদ্রের সূর্য মুছে নেয় সব কলঙ্কের দাগ
হৃদয়-স্পন্দন ছাড়া আর কোনো স্তোত্র নেই অরণ্যের মুখে

ক্ষোভ আর ক্ষতের বাগানে পরিচর্যা করি প্রতীক্ষাকে এখন
নাগ-বাসুকীর ফনার তালে তালে দুলে উঠলে মানুষ ও নক্ষত্রনিচয়
বেলে পাহাড়ের মাথায় বুনো গোলাপের জঙ্গলে আরক্ত সিংহের ডাক উঠলে
আদিম যূথ নৃত্যে আমারও সত্তা মানবিক সমগ্রতায় হিরণ্য আকাশ
প্রসারিত পৃথিবীর অণুতে অণুতে ধ্বনিত অমিত অভিযানের উপকথা

মুখে ঝড়ের স্বাদ নিয়ে প্রতীক্ষাকে পরিচর্যা করি এখন।

তুমিই কি আমার নায়ক

আবুল কাশেম রহিমউদ্‌দীন

মনে পড়ে, কোনো এক ভাঙা হাটে হাট করতে এসে
তোমাকে কুড়িয়ে পাই হে বিষাদ। গাঢ় মমতায়
সেই থেকে বুকে ধরে এতকাল করেছি মানুষ।
আজ কী সুন্দর তুমি কী আশ্চর্য মনোহর বেশে।

অথচ এখনো কেন হে আমার সক্ষম কুমার
আমাকে দিলে না মুক্তি? আমি যদি কখনো বিদেশে
একান্তে হারিয়ে যাই, তুমি ঠিক চুপিসারে এসে
বেহালার মতো তুলে রক্তবর্ণ বৈরাগ্য আমার
খেয়ালের দুর্বিনয়ী ছড় টেনে নিশ্চিন্তে বাজাও।
কখনো সন্তাপে যদি পেতে চাই নদীর বিশ্রাম,
তখনো শিয়রে থেকে সে নদীকে সযত্নে সাজাও
হৃদয়-প্রতিমা তারই, যে আমার ভুলে গেছে নাম।

আমার নির্লিপ্ত পথে জাতপত্র তোমার স্বভাব
বিজিতের মতো ফোটে আমারই প্রবীণ পায়ে-পায়ে ;
তবু যেতে যেতে ভাবি হয়তো দূরে তোমাকে ভোলায়ে
পরাবে গৈরিক বাস সময়ের প্রাচীন প্রভাব।
কিন্তু হায়, সবই দেখি আয়ত্তে তোমার। হে কুমার,
অমোঘ মৃগয়া-পথে নিষাদের অন্তিম শায়ক
যেদিন সাদরে নেব বুকে তুলে, সেদিনও দুর্বার
অন্ধকার যাত্রাপথে তুমিই কি আমার নায়ক ?

ঋতুবদলে

তরুণ সান্যাল

আকাশের মুখ বড় গম্ভীর। একটু হাওয়াও দিচ্ছে ঠাণ্ডা। এখুনি বৃষ্টি নামছে না অবশ্য। এখন তো তেমন ঋতু নয়। আজও নাকি বসন্তবেলা। সাবেকি কবিদের জন্য বৃষ্টি নয়, বকুল ঝরানোর সময়।

দেখছি ঋতুগুলি কেমন চেনা জানা ঠাঁই বদলানোর জন্যে ছটফট। এ ওর দাঁড়াবার মঞ্চ, বসবার চেয়ার দখল নিতে চায়। বছরে বছরে একই সময়ে একই ধরনের ফুল ফোটানো ফুল ঝরানোতে আপত্তি জমে উঠেছে ঘন ? এমনি কি বয়সও ?

পেছিয়ে যাবার কথাই ওঠে না, পায়ে পায়ে এগোলে ফিরতে পারে নাকি সেই তরুণ বয়স যখন রক্তের মধ্যে উচ্চাশা, রাস্তাগুলির ধারালো খড়্গে পা ফেলে পা ফেলে হাঁটা, সারা দিনমান টানটান এক ধনুকের ছিলায় প্রতীক্ষায় উদ্যত শর এই শরীর, আর বুকের মধ্যে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ফেরানো মধ্যরাতে কাড়ানাকাড়া।

পৃথিবীতে আলগোছে কেমন ঋতুগুলি ঠাঁই বদল করছে। প্রবল রোদের নীচে আঁচে গনগন কয়লাও যেমন মনে হয় ছাইচাপা নিরপরাধ মুখ, এমনিই তো বুকের মধ্যে জেগে বসে আছে এখনো তরুণ বয়স। একটু অন্ধকার টানো, হু হু দীর্ঘশ্বাসের আগুন দৌড়ে যাবে যেখানে খাড়াই খাদ, ধনুকের টঙ্কার আর যাজ্ঞসেনী।

এই মুহূর্তে মেঘ ছিঁড়ে বেরিয়ে এল জবাকুসুমসঙ্কাশ, যেমন দুর্যোগের সকাল, এক্ষুনি ওডেসিয়ুস বরুণদেবকে ফেলে দিলেন সমুদ্রে। অভিশাপ ছিটকে উঠছে, আপাত চ্ছুরনে কত হাজার বামধনু সেখানে॥

বোবা সমাচার

শিবশম্ভু পাল

আমি তো কথা বলি এখানে ওখানে
সে লোকরঞ্জন বিবিধ দোকানে
দোকানদারি বেড়ে গিয়েছে ভয়ানক
আমারও কাছে হাসি বেচেছে কত লোক।

এমনই প্রেক্ষিতে আকাশে ভাসে মেঘ
অথবা রোদ্দুর, কত না ভাবাবেগ
উজাড় করে দেয় ভাষার বন্দনা
পদ্য কতিপয় জমেছে মন্দ না।

পদ্য পড়ে, হায়, একালে কজনই বা।
সজনী স্বজনেরা এহেন প্রতিভার
বড়ই প্রতিকূল সমালোচক, হায়,
এদিকে বেলা যায়, ওদিকে বেলা যায়।

আমি তো মুখ বুঁজে থাকি বিরুদ্ধে
এমনিতর অঘোষিত এ যুদ্ধে
ঘরের ভেতরেই ভিন্ন ঘর করে
দেয়াল গাঁথি কিছু সাজানো অক্ষরে।

থামে না, শত্রুরা থামে না সহজে
মসীকে ক্ষুরধার করেছে কাগজে :
'তুমি তো বোবা সাজো, সত্যি নও বোবা'
হেসেছি মনে মনে। তাই কি? হয়তো বা।

কমিউনিস্ট পরিমল সরকার

রণজিৎ সিংহ

তুমি ছিলে সত্তরের মারণযজ্ঞের ফেরার। যে সময়ে আঠারো বছরের ছেলেদের ঘরের ভাত আর বিছানা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। যে সময়ে মানুষ চেনা জায়গায় অচেনা ছায়া দেখে আঁতকে উঠত আবার অচেনা জায়গাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় মনে করত।

তুমি অন্ধকার থেকে অন্ধকারে পিছলে যেতে নিঃশব্দে। অচেনা জায়গা-গুলোকে চিনতে তারার আলোয় আর ঝোপ-জঙ্গল-জলার নিশানায়। বিশ্বাসের পদক্ষেপে পৌঁছে যেতে ঘাম আর অশ্রু ঝরানো মানুষের আস্তানায়।

দিনের আলোয় ঝকঝকিয়ে উঠত তোমার সিধে গর্দান। খাড়া চুল, টানা কপাল আর খোঁচা খোঁচা দাড়ির আড়ালে তোমার মুখে দেখা যেত নতুন পাতার সজীবতা। তোমার হাসিতে ফুটত ফুলের প্রসন্নতা। তোমার মধ্যে আমরা দেখতাম আমাদের ভবিষ্যত।

হেরে যাওয়া মানুষেরা তোমাকে তাদের ঘরের মানুষ করেছিল। তাই মানুষখেকোদের শান্তি ছিল না। তুমি ভেড়ির চক্রান্ত থেকে লাঙলের জমি ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলে। তাই চিংড়ির সোনাকারবারিদের শান্তি ছিল না। তুমি হেরে যাওয়া মানুষদের যুদ্ধজয়ের তালিম দিচ্ছিলে। তাই সংবাদসংস্থা গোয়েন্দাদপ্তর কোষাগার দালাল সব কিছু নড়ে চড়ে উঠেছিল।

তোমার শেষ ভাবনা ছিল? কদিন পরে তোমার বাড়ি ফেরার কথা। তুমি কি মার মুখ ভেবেছিলে? নাকি ভেবেছিলে ভালোবাসার সেই মুখ, যাকে তুমি কয়েক বছরের ফেরার জীবনে এক মুহূর্তেও দেখার অবকাশ পাওনি? ভেবেছিলে জমিদখলের কাজটা শেষ হল না?

যে দিবসে তোমার রক্ত ঝরল জমির আলে। তোমাকে ওরা বল্লমের ফলায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাঁধের কাদায় পুঁতল। তুমি মুঠোয় আঁকড়ে ধরেছিলে মাটি।

তোমার শেষ ভাবনা কি ছিল আমরা জানি না। শেষ মুহূর্তে আমরা কেউ তোমার পাশে ছিলাম না। শেষ মুহূর্তে তুমি ছিলে একা, মহাকাব্যের বীরের মতো একা।

কথা আছে, দিনকাল

রত্নেশ্বর হাজরা

তোমার হাত মাখামাখি হয়েছে ধুলোয়—তোমার
পায়ে লেগেছে নর্দমার নোংরা জল
নীল ডুমো মাছি উড়ে বসছে চোখেমুখে
শরীর ভাসিয়ে এখন ডাস্টবিন-ঘাঁটা গন্ধ—
অথচ ধুয়ে দিলেই নিরক্ষরেখার উষ্ণ দাগ
তোমার হাতে—তোমার
পায়ে রয়েছে নক্ষত্রবঙের জুতো
ধুয়ে দিলেই জলপদ্মের পাপড়ি-মাখা তোমার মুখ
গায়ে পরেছ বৃষ্টিহীন মেঘের জামা।

এসব আমাকে বলেছে এক কালপুরুষ—আমি তাই
সমস্ত অভিমান বেঁধেছি ভালোবাসার রুমালে
তোমাকে দেখেই জমা করছি প্রেম এবং ঘৃণা
দিনের ধুলোবালি ভেজাচ্ছি রাত্রিবেলার শিশিরে।
কথা আছে একদিন তোমার হাতে দেখব
নিরক্ষরেখার উষ্ণ দাগ
তখন তোমার পায়ে থাকবে ধুলোমাখা নক্ষত্রবঙের জুতো—

নিঃসঙ্গ মানুষ সবই টের পায়

কালীকৃষ্ণ গুহ

সঙ্ঘবদ্ধতা থেকে দূরে যাই।
কতদূরে যাই?
যেখানেই যাই সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের স্পর্ধা এসে ছোটখাটো অসম্মান করে।

অসুস্থতার পাশে নেমে আসে মেঘ, অন্ধকার কাঠ, ঝুলি, বিবর্ণ পাপ-ঝরা
দিন, স্থির, রাত্রি।
একটি নিষিদ্ধ কাক রাত্রির ভিতর থেকে উড়ে এসে ব্যক্তি মানুষের পাশে বসে—
মানুষের চিত্রকলা ডেকে নেয় তাকে, মানুষের বোধ তাকে
কাছে ডেকে নেয়,
বধিরতা-সহ, বিষণ্ণ গানের কলি-সহ, গদ্যভাষা-সহ, মানুষের বোধ তাকে
একদিন কাছে ডেকে নেয়।

নিঃসঙ্গ মানুষ সবই টের পায়। একদিন অন্ধকার
বাড়ির গলির পাশে একলা দাঁড়িয়ে থেকে বুঝে নেয় কেন সে বধির।

আজীবন যা চেয়েছ

(দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে)

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

মুক্তি চেয়েছিলে বুঝি
মুক্ত হতে চেয়েছিলে শুধু
পাওনি তা হাতের মুঠোয়
আজীবন
গণ্ডীর ভেতরে একা
অসহায়
শুনে গেছ আর্তনাদ
বিনষ্ট ঋতুর
রাত্রির বৃষ্টির স্বর
দূরাগত ঝড়ের স্বনন

ফসলের সর্বনাশ
তোমাকে ঘিরেই ছিল
অরণ্য ও অদৃশ্য আগুন

তবু স্মৃতির শিখরে ছিল যে নৌকো
তাকে তুমি ভাসায়েছ
ভাসায়ে দিয়েছ দূরে
নির্দ্বিধায়
গাঙ্গেয় রক্তের স্রোতে
কূল খুঁজে পাবে বলে
হয়তো বদ্বীপ
রৌদ্রলীন বিকেলের সবুজ সূষমা
সে কি আজ পেয়ে গেছ
প্রার্থিত মুক্তির স্বাদ
তৃপ্তির
আজীবন যা চেয়েছ
যেখানে চেয়েছ যেতে
একা একা
গণ্ডীর শাসন ছেঁড়া
সশ্রম
শুদ্ধ স্বাধীনতা

সময় সূর্যের ঘড়ি

শিবেন চট্টোপাধ্যায়

হাতঘড়ির হাত দুটো এখন আমাকে বিভ্রান্ত করছে
আকাশে দিকনির্দেশক কোনো নক্ষত্র নেই
কালপুরুষ
তোমার তীর-ধনুক ধরা হাত একবার আমার দিকে ঘোরাও।

পায়ের তলায় পৃথিবীটা থুথুড়ে বুড়ির মতো তীব্র শীতে কাঁপছে
অথচ
এখন পৌষ বা মাঘ মাস নয়।

কাল এমন সময় শ্মশানের বুকে
একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়েছিলাম
আমার চোখে
অকালে চলে যাওয়া সেই গৃহবধূর
সিঁদুর ছোপানো লাল টকটকে সিঁথি
আর আলতা রাঙা পা।

রক্তে এখন উদভ্রান্ত ঝড়
সমুদ্রের লোনা ঢেউয়ের ধাক্কায়
উথাল পাথাল সপ্তর্ষিমণ্ডল
আমার ডানহাতে আকাশ থেকে ছিটকে আসা উল্কার আগুন।

নিভন্ত চিতার ওপর কালপুরুষ
জ্বলন্ত শরীরে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।
তার তীরের ফলা
অব্যর্থ লক্ষ্যে স্থির
অর্ধদগ্ধ নাভিকুণ্ডের দিকে।

তীব্র অপ্রেম থেকে

তুলসী মুখোপাধ্যায়

তীব্র অপ্রেম থেকে উঠে আসে প্রেমিক চুম্বন
চুম্বন? না কি তুমুল মরণ?
তবুও মানুষ-মানুষী গভীর আশ্লেষে ছুটে এসে
পরস্পর মুখ রাখে মুখে
সন্তানের চূর্ণ হাসি সারা বুকে এঁকে যায়
স্বর্গীয় গোলাপ
গানের কলির মতো একেকদিন সুন্দর আসেন
ঘরের আকাশে

শরীরে আলোক জ্বলে ওঠে
ক্রমশ পরিধি বেড়ে যায়
ক্রমশ কুয়াশা ছোটে ভিন্নতর গ্রহে
হৃদয়ে মোচড় খায়
ধরণীর মতো এক অবিনাশী বিশাল মমতা।

তীব্র অপ্রেম থেকে উঠে আসে প্রেমিক চুম্বন
চুম্বন? না কি বিপুল জাগরণ?

শরণ্যের উদ্দেশে

বিতোষ আচার্য

সেই প্রতিস্পর্ধী দিনগুলোর তীব্র গন্ধ
কালেভদ্রে জেগে ওঠে উত্তুরে বাতাসে, আর
রণপা-য় হন্যে হাতে
কি যেন হাতড়ে ফেরে সামনে পিছনে
... না না না, দাঁড়াব কোথায়:
ধূসর লণ্ঠন হাতে সূর্য নামছে পাটে, তার
পিছনে পিছনে ছোটে রক্তজবা মেঘের বহর

না না না, সবকিছু বলার বাইরে:
নিদ্রাহীন রাতগুলোয় নিরর্থক আঘাটা-উজানে নৌকা বাওয়া
হাত পায়ে খিলের কব্জা, দাঁতে চাপা দাঁত
দুর্বার আঙুলগুলো কালে কালে বিপর্যস্ত, শ্লথ:
নিরন্তর ভূমিক্ষয়ে পা-রাখার জায়গাও লোপাট

তবু সেই প্রতিস্পর্ধী আগ্রাসী দিনের ঘ্রাণ
মরেও মরে না, শুধু
মসৃণ এ লড়াই-এর কৃতপৌরুষ দরাজ হৃদয়

পার্থেনিয়ামের উগ্র বিষে
থেকে থেকে হাঁপায়, হাঁপায়....

শরণ্য হে, যাই কোথায়, কোথায় ?

অর্জুনদের জন্য

শুভ বসু

একদিন সারাদেশ
কুরুক্ষেত্র মনে হয়েছিল।
তখন কিশোর দেখলে
মনে হত নিহিত অর্জুন।

এখন আকাশ-জোড়া হোর্ডিং-এর উজ্জ্বল বৈভবে
সূর্য ঝিকিমিকি দিলে, সংবাদপত্রের কোল জুড়ে
মডেল সুন্দরীদের হাসির জৌলুষ
জীবনের সার কথা বলে আর গায়ে গায়ে ঘেঁষে
বাজার-মেয়ের-চোখে-স্বপ্ন-আনা ছিমছাম
গোয়ালিয়ার সুটিংয়ের উজ্জ্বল জোয়ান
জানায় পৌরুষ ঠিক কিসের প্রতিভা।

তারা লড়িয়েদের স্বপ্নে এসে বোনে
চিট ফাণ্ড, সেফ ডিপোজিট স্কিম, সাহেবসুবোর ঢঙে সন্তানের ছবি।

অর্জুনেরা, ভালো আছ ?
কমপিটেটিভে বসছ ? গাঁজা খাও, ড্রাগ ?

নাকি কস্টিং এ গেছ,
ফিরতে ফিরতে রাত হয়,
চিনে নিতে দুনঘরী
লেজারের রহস্যময়তা ?

কেমন আছেন দ্রোণ ? পিতামহ ?

তাঁরা খোঁজ রাখেন কি
ইদানীং তোমাদেরই দারুন কদর ?

ঐ দিব্য মুখ চেয়ে
মাল্টিস্টোরিড জাগে, পাশের বস্তিতে
চাঁদের বদলে খোকা
হাঁ করে আকাশে দেখে ছড়ানো এ্যান্টেনা।

বিভ্রমের ছানি

শুভাশিস্ গোস্বামী

চলন্ত বাসের জানলার চতুষ্কোণ আলো
ছিটকে পড়ল অন্ধকারে
তিন-জোড়া চলন্ত কাটা-পায়ের উপর।
শরীরে বিদ্যুৎ খেলে, শিরশির করে।
হঠাৎ চমকে উঠি, কেটে যায় ক্ষণিক বিভ্রম।
মনে পড়ে হাঁটুর উপরে ফ্রকের চকিত আভাস,
তিন জোড়া চলন্ত কিশোরীর পা
মুহূর্তের বিভ্রমে আজানু শরীরবিহীন।

এরকমই হয় মাঝে মাঝে,
এমন বিভ্রম থেকে ভেঙে যায় অবয়ব,
বন্ধুতা, সংসার, দাম্পত্য, এমন কি
দল ভেঙে হয় উপদল।

তাই হাঁটুর উপরে ঐ কিশোরীর ফ্রকের আভাস
অথবা তিন-জোড়া কাটা-পায়ের চলমানতাও
ঘোচাতে পারে না চোখে বিভ্রমের ছানি॥

শতাব্দীর শেষে

অনন্ত দাশ

প্রতিদিন ওরা আমাকে
একটা দুর্গের মধ্যে ঠেলে দেয়—
আমি একে একে দীর্ঘ সাঁকো, অন্ধকার গুহা,
গথিক খিলান পার হয়ে
সৈন্যদের অভ্যস্ত কুচকাওয়াজ
নিয়মানুবর্তিতার এক নিছক পাথর বুকে চেপে
স্বেদ, ক্লান্তি, অনীহা, যুদ্ধের শপথ
ব্যারাক, অস্ত্রাগার পিছে ফেলে
জাম, দেবদারু, বোগেনভেলিয়ার পাশাপাশি
ঊর্ধ্বমুখ সাতটি কামানের কাছে দাঁড়াই।

স্থবির, অশক্ত, মৃত ঐসব কামান
শতাব্দীর যুদ্ধ শেষে বধির হয়ে আছে
ওদের শরীরে গোলাবর্ষণের ক্ষতচিহ্ন
ইতিহাসের বিবর্ণ স্বাক্ষরে ধূসর, মলিন।

শতাব্দীর শেষে
আমিও কি এক ধূসর কামান হয়ে যাব ?
ভিজে বারুদের স্তূপ বুকে নিয়ে
বধির দ্রষ্টব্য হয়ে পড়ে থাকব দুর্গের ভিতরে ?

এক সূত্রে গাঁথা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমি সেই ছেঁড়া সুতো জুড়ে দেব—
এই বলে বিশল্যকরণী
ছুটে গেল পুব থেকে পুদূর পশ্চিমে
হিমালয় থেকে সমুদ্র সকাশে।

বিশল্যকরণী এক মন্ত্র শুধু
উড়ে যেতে যেতে সে কেবল আত্মস্থ করে
তাৎক্ষণিক জলবায়ু
স্পর্শাতুর মোহদীর্ণ হাওয়ার বিন্যাস।

তুই কি কেবল হাওয়া? পরস্পরবিরোধিতা?
বিশল্যকরণী কেন মধ্যরাতে আত্মহাহাকার
মানুষের মানচিত্র কে আঁকেন? কি দিয়ে আঁকেন?
তার রঙ এত দ্রুত জ্বলে যায় কেন?

এত সব 'কেন'র জবাব জানত না বিশল্যকরণী
তার উত্তরীয় যে মুহূর্তে উড়ে যায় মলয়-হাওয়ায়
তৎক্ষণাৎ ঝাপ্‌টা আসে বায়ুকোণ থেকে
সে এখন মন্ত্র শুধু—কিছুক্ষণ দেবতার, কিছুক্ষণ অসুরের হাতে।

ছেঁড়া সুতো জট বেঁধে হয়ে উঠছে নিশ্ছিদ্র গোলক:
একসূত্রে গাঁথা এক বিচ্ছিন্ন স্বদেশ।

বৌছত্রের মধ্যে বিধবা হয়ে যাচ্ছে চেলি পরা বৌটি

সত্য গুহ

এ ভাবে গন্তব্যে পৌঁছনো অসম্ভব
একজন সঙ্গী না-হলে পথ চলা ক্লান্তিকর
ঘণ্টার দূর ঘণ্টায় পৌঁছালেও মনে হয় এক যুগ গেল
মিছিলে মিছিলে হেঁটে ময়দানে পৌঁছিয়ে
মনেই হয় নি হেঁটে এলাম আটচল্লিশ মাইল কখনো
এখন কেমন যেন একটি একটি করে বন্ধু-পরিজন সরে গেছে
বান্ধব কমরেড নেই, নারী ও ঈশ্বর নেই, বৃক্ষ নেই, ক্যাকটাসও নেই
তেমন বিন্দু বিন্দু জলকণা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটার পর একটা শুকিয়ে

মরুভূমি করে

এবং মাটি ধ্বসে ধ্বসে চারদিকে গহ্বর, এখন প্রায় এক পায়ে দাঁড়িয়ে
কেউ মানুষ না অসমীয়া কিম্বা আদত ত্রিপুরী
অথবা ঝাড়খণ্ডী নয়তো সাঁওতালী আদি ওড়িয়া তামিল বা মালয়ালী
খাঁটি আর্য বা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়োর উত্তরাধিকার এবং ইত্যাদি
কেউ মানুষ না এবং ভাবনাটাই বাস্তব
এ ভাবে নৃতাত্ত্বিক মৌলে যেতে যেতে যেতে যেতে একদা
হ্যাঁ আজ কিম্বা কাল
মরীচিকার সঙ্গে জীবন বদল করে কাষ্ঠহাসি হাসবে সুখশান্তির পরিভাষায়
যাকে জাতীয় সংহতি বলেছে ভারত

অথচ, হায়রে কথা, কথা ছিল যাবো—যার সমুদ্রে এবং উচ্চারণ ছিল
সহন ববতু সহন বুনোক্ত
সহ বীর্য করবাবহৈ
তেজস্বী নবধীতমস্তি
মা বিদ্বিষা বহৈ ওঁ শান্তি
রসসিন্ধুর মুখে ছাই দিয়ে আমরা ক্রমে আমি এবং একা
এবং গন্তব্য চোরাবালি ওরফে উগ্র প্রসাধনে চাপা সিফিলিস আক্রান্ত
বেশ্যার শরীর
বৌছত্রের মধ্যে, মনে কর, চেলি পরা বৌটি সহসা বিধবা হয়ে যাচ্ছে ॥

রেসকিউ স্টেশনে আমরা

অজিত পাণ্ডে

এখানে এখন শাঁ শাঁ হাওয়ায়
দূষিত গন্ধ শব্দ উধাও।
শিরিষ বকুল দেবদারু ছায়ায় ঢাকা
রেসকিউ স্টেশন।

আমরা যার অতিথি
তার মেয়ে শ্যামা,

এক মুঠো বকুল কুড়িয়ে এনে
হাতে দিয়ে বলে গেল—
'এই নিন আপনাদেব কৈশোব'।

কাঁধ থেকে বাইফেল নামিযে
পাশে বেখে দেখলাম—
সামনে বিশাল পাহাড পাঞ্চেত
নীচে সবুজ জাজিম বিছানো মাঠ।

আমাদের শিশুকাল আর কৈশোর
সেখানে ছুটোছুটি খেলছে।

মোনালিসা

পূর্ণেন্দু পত্রী

উদ্ভট ছড়া অথবা অতুলনীয় লিমেরিক যাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছে বিশ্বখ্যাতির সোনার হার, আর যাঁর আসল স্বপ্ন ছিল ছবি-আঁকিয়ে হওয়ার, আর সেই সুবাদে একটা স্কেচের খাতা ছিল যাঁর বিশ্বভ্রমণের নিত্যসঙ্গী, সেই এডওয়ার্ড লিয়র ভারতবর্ষে এসে, তাজমহল দেখে একদম মজে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

'এখন থেকে পৃথিবীর অধিবাসীদের ভাগ করা হোক দুটো শ্রেণীতে। একদল যারা তাজমহল দেখেছে, আর একদল যারা দেখেনি।'

এইরকম একটা মিষ্টি, মুচমুচে, রসালো মন্তব্যকে মনের মধ্যে লজেন্সের মতো চুষতে চুষতে একদিন যখন তাজমহল সংক্রান্ত একটা বৃহদাকার বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, তখনই, আমাকে চমকে দিয়ে, হঠাৎ চোখের সামনে এগিয়ে এল আলডুস হাক্‌স্‌লির এমন একটি লেখা, যা লিয়রের মুগ্ধতার ঠিক বিপরীত।

তাজমহল ভালো লাগেনি হাক্‌সলির। তাজমহলের অমন সাদা হাসি, অমন যুবতী-যুবতী গড়ন, অমন ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি বিদ্ধ করতে পারেনি হাক্‌স্‌লির বুদ্ধি-ঘেরা হৃদয়কে। কেন ভালো লাগে নি তা সবিস্তারে, প্রভূত উপমা-উদাহরণ সহযোগেই আলোচনা করেছেন হাক্‌স্‌লি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণটা হল—**'Poverty of imagination'**। পড়ার পর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল অসন্তোষের একটা কালো ভোমরা। পৃথিবী যার মাথায় পরিয়ে দিয়েছে 'অত্যাশ্চর্য' বিশেষণের রাজমুকুট, তেমন বস্তুও যাঁর চোখে আলোর ফুলকি ফোটায় না, তিনি নিশ্চয়ই রূপ-কানা। হাক্‌স্‌লির দিকে ছুঁড়ে মারার মতো কোনো জোরালো যুক্তির অস্ত্র-শস্ত্র খুঁজে না পেয়ে মনে মনে উচ্চারণ করলুম টলস্টয়ের সেই উক্তি, যা তিনি পেয়েছিলেন টের-টুলিয়ান-এর মারফৎ, আর যা আমাদের কানে এসে পৌঁচেছিল ম্যাকসিম গোর্কি-র মারফৎ—'জ্ঞান শত্রু'।

এই পড়া-পড়ির বছর খানেক পরেই প্যারিস। চলেছি ল্যুভ্‌র্‌-এর প্রকাণ্ড করিডোর দিয়ে। চলেছি বিশ্বের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'মোনালিসা'-র দিকে।

বুক হয়েছে নদী। ভিতরে ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ। শরীর ধনুক। শিরায় শিরায় টান। অবশেষে সেই স্বপ্নের সামনে।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস। কিছুক্ষণ অপলক। সে যেন এক সম্মোহন। আঃ, কী সৌভাগ্যবান আমি। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সেই সৃষ্টির সামনে যার সৌন্দর্য কালজয়ী, পৃথিবী নামক গ্রহের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত জুড়ে যার খ্যাতির কিংবদন্তি, যার রহস্যময় হাসির ধাঁধা আজও উত্তরহীন অথবা নতুন নতুন উত্তরের সমারোহে ক্রমাগতই জটিল, যার উৎপত্তি অথবা বিকাশের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা এখনও অফুরন্ত, যাকে নিজের হাতের নাগালে পাওয়ার জন্যে একবারও লোভী হয়ে ওঠেনি, এমন রাজা-রাজড়া একদিন বিশ্বে ছিল বিরল।

এত কথা, এত প্রশ্ন, এত আলোচনা এবং এত বিতর্ক আর কোনো ছবিকে ঘিরে ঢেউ হয়ে ওঠেনিও বুঝি। এমন কি কে এই মোনালিসা তা নিয়েও বিতর্ক। এটা কি সত্যিই ফ্রানসেস্‌কো দেল গিওকোণ্ডোর ২৬ বছরের স্ত্রী মোনালিসা বা গিওকোণ্ডোর প্রতিকৃতি? কেউ বলছেন—না, ওটা আসলে ডাচেস অব ফ্রানকাভিলা **Costanza d'Avalos**-এর প্রতিকৃতি। কেউ বলছেন—তাও না। ওটা আসলে এক অন্য মহিলার। আঁকা হয়েছিল ধনকুবের গুইলিয়ানো দ মেদিচির জন্যে। কিন্তু পাছে তাঁর বর্তমান স্ত্রী পূর্ব-প্রণয়ীর ছবি দেখে অগ্নিশিখা হয়ে ওঠেন সেই জন্যেই ওটাকে রেখে যান লিওনার্দোর জিম্মায়। আবার আর এক পক্ষের বক্তব্য—ছবির মডেল আসলে কোনো মহিলাই নয়। মহিলার সাজে পুরুষ। হাজারো কিংবদন্তি এই একটি ছবিকে নিয়ে। আর অজস্র প্রেরণা কবি বা লেখকদের কাজে। ১৯১১-য় একজন সাধারণ ইতালিয়ান রাজমিস্ত্রী ল্যুভ্‌র্‌ থেকে চুরি করেছিল মোনালিসাকে। কেন করেছিল? তাই নিয়ে 'গ্যাব্রিয়েল দা আন্নুজিও'র রচনার নাম 'দি ম্যান হু স্টোল দা মোনালিসা'। সে রচনার বিষয় হল ছবির মোনালিসা-র সঙ্গে রাজমিস্ত্রীটির গভীর-গহন প্রণয়। ভাসারি লিখেছেন, লিওনার্দো যখন আঁকতেন তখন মোনালিসাকে মুগ্ধ এবং মগ্ন করে রাখার জন্যে বাজনাই বাজত না শুধু, বেলিবিংগার থেকে বাফ্‌নেরও আসা যাওয়া ছিল সেখানে। সমালোচকদের প্রশ্ন, যে স্বর্গীয় শ্রী এবং অপার্থিব হাসির জন্যে মোনালিসা বিশ্ববিদিতা, বাফুনের ভাঁড়ামি থেকে তার উদ্‌গার? একি বিশ্বাস করা সম্ভব? ভাসারি সম্বন্ধে অভিযোগ আরো অনেক। একালের কোনো কোনো সমালোচকদের ধারণা, জীবনে কখনো নিজের

চোখে মোনালিসাকে না দেখেই উচ্চনাদে শাঁখ বাজিয়েছেন তিনি প্রশংসার। আর সেটা করতে গিয়েই নিজের অজ্ঞতাকে সম্ভব হয় নি লুকোনো। লা গিওকোণ্ডার 'আই ল্যাশ' নিয়েও তাঁর উচ্ছ্বাস। 'হুইচ ওয়াস আনকমনলি থিক্'। অথচ মোনালিসার মুখে 'আই ল্যাশের' ইশারা নেই এতটুকু। আর তখনকার কালে ওগুলো ছেঁটে ফেলাই মেয়ে-মহলের ফ্যাশন।

বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক কেনেথ ক্লার্ক একবার লিখেছিলেন—**'Yet the Mona Lisa is one these works of art which each generation must re-interpret.'** আর ফরাসী কবি ভালেরির মন্তব্য : **'un pli de visage'.** কারো মতে মোনালিসা বিষালিস্টিক। কারো মতে সিম্বলিক। বিতর্কের শেষ নেই। এখনো চলছে।

মোনালিসাও বুঝি সেই ছবি, যার সম্পর্কে লীয়রের ভঙ্গিতেই বলা যায়, পৃথিবীর মানুষকে ভাগ করা হোক দুভাবে, যারা মোনালিসা দেখেছে আর যারা দেখেনি।

ল্যুভ্রে যেখানে যত ছবি, সব খোলামেলা, উন্মুক্ত। কেবল মোনালিসার সামনেই নিষেধের ছোট্ট রেলিং আর সতর্কতামূলক নোটিশ-বোর্ড। সামনে প্রহরারত হৃষ্টপুষ্ট ফরাসিনীর চোখে, মুখে, আঙুলে, বচনে একটিই নিষেধ—ছবি তোলার সময় ফ্ল্যাশ জ্বালানো চলবে না। ল্যুভ্রে অন্যসব ছবির সামনে যখন দু-চার জন, মোনালিসার সামনে তখন জনতা। অন্যেরা যখন একা, মোনালিসা তখন বহুবল্লভা। অন্যেরা যখন মন্দির, মোনালিসা তখন তীর্থ।

অথচ দেখা শেষ হওয়ার পর, অন্য সব ছবির বিচিত্র বৈভবের মুখোমুখি হতে হতে, ধীরে ধীরে, যেন নিভে যেতে লাগল পৃথিবীর এক পরমাশ্চর্য রমণীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার যাবতীয় উত্তাপ-উত্তেজনা। রাজেন্দ্রাণী হয়ে যেতে লাগল সামান্য নারী। দুষ্যন্ত ভুলে যেতে লাগল তার সেই সুগভীর সুখের সোনার আংটিটাকে, যার মাঝখানের বৈদূর্যমণি শকুন্তলা।

কেন এমনটা ঘটল? কেন মোনালিসা জয় করতে পারল না আমাকে? অথবা তার দিকে তাকিয়ে আমিও কেন উচ্চারণ করতে পারলুম না এমন কোনো স্তবের মতো বাণী, পৃথিবীর প্রেমিক পুরুষদের গলায় যা বহুবার বহুরূপে শুনে শুনে হৃদ্‌পিণ্ড কেঁপেছে আমাদের? কেন মনে হল না এই সেই নারী—

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি।

এর উত্তর কি তাহলে এই যে, লাভ-ম্যারেজ-এর চেয়ে কোর্টশিপ ভালো? কোর্টশিপেই প্রথম দেখা, প্রথম স্পর্শ, প্রথম আবিষ্কারের অবিস্মরণীয় যত বিস্ময়। আর লাভ-ম্যারেজ-এ বহুদিনের দেখা-জানা পুরনোর গায়েই নতুন সাজ পরিয়ে তাকে বিস্ময়কর করে তোলার চেষ্টা। কোর্টশিপ ভাঙে কিন্তু আবার জোড়া লেগে যায়। লাভ-ম্যারেজ ভাঙলে আর জুড়তে চায় না।

ছাপাখানার যুগ, চূড়ান্ত শুভদৃষ্টির অনেক আগেই, মোনালিসার সঙ্গে মুখোমুখি করে দিয়েছে আমাদের। এখানে, সেখানে, ছবির বইয়ে, প্রবন্ধে, ম্যাগাজিনে, দেয়ালে, বিজ্ঞাপনে তার ছোট, বড, রঙিন, একরঙা নানা রূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেছে হাজারবার। ছাপাখানার সৌজন্যে আর তার নকলকে আসলের মতো করে গড়বার নিখুঁত পারদর্শিতায়, অনেক দূরে বসেও মোনালিসার নিশ্বাসের স্পর্শ পেয়ে গেছি যেন। হয়তো এইসব কারণেই আসল মোনালিসার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের মুহূর্তে অঙ্গে অঙ্গে সে-রকম হৃদয়-বিদারক বাঁশী বেজে ওঠার কথা ছিল, তা আর বাজল না।

আর এই সময়েই আমার বোবা গলার ভিতরে কথা কয়ে উঠেছিলেন হাক্সলি, 'I am always a little uncomfortable when I find myself unable to admire some thing which all the rest of the world admires—or at least is reputed to admire. Am I, or is the world is fool? Is it the world's taste that is bad or is mine? I am reluctant to condemn myself, and almost equally reluctant to believe that I alone is right.'

প্রশ্নের খিদে মেটেনা তবুও। সে জানতে চায়, কোন গুণে মোনালিসা এমন চিরস্মরণীয় হয়ে উঠল বিশ্বে? এবার তবে এগোনো যাক সেই কাহিনীর দিকে, যার পিঠে ছড়িয়ে আছে বিদিশার নিশার মতোই অতল রহস্যের এলোচুল।

২

ফ্রানসেস্‌কো দেল গিওকোণ্ডো ফ্লোরেন্সের এক বিত্তবান নাগরিক। ব্যবসায়ী। গবাদি পশুর ব্যবসার ব্যাপারে নাকি বিশেষজ্ঞ। তা ছাড়া আছে জোতজমা। আগে বিয়ে করেছেন দুবার। দুবারই বিপত্নীক। মোনা-

লিসা তাঁরই তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। মোনালিসা অবস্থাপন্ন বনেদি ঘরের মেয়ে। তবে ১৪৯৫-এ, ফরাসী আক্রমণের পর ধ্বস নামে অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে। মোনালিসা সুন্দরী। বিয়ে করবে ঠিক করেছিল যাকে মনে-প্রাণে, সে বেচারী আচমকা হয়ে গেল যুদ্ধের বলি। বিত্তবান বিপত্নীককে প্রায় ধরে-বেঁধেই নিজের মেয়েটিকে গছিয়ে দিলে তার বাবা। গিওকোণ্ডোরও মনে হল, মন্দ কি, এমন একটি রূপসী তাঁর অপরিমিত বিত্তের সংসারে যদি হীরে-চুনি-পান্না বসানো গয়না কিংবা নিখুঁত কারুকাজকরা কোনো আসবাবের মতো দর্শনীয় হয়ে ওঠে, সমাজে, বন্ধুমহলে খাতিরই বাড়বে বরং। বিয়ে হয়ে গেল ৩০ কিংবা ভিন্ন মতে ২৬ বছরের মোনালিসার সঙ্গে ৪২ বছরের গিওকোণ্ডোর। **'But the charm of Monnalisa was to him less comprehensible than the merit of a new breed of Sicilian bullock, or the benifit of custom duties or undressed sheep-skins.'** রুশ লেখক দিমিত্রি মেরেজাউস্কির অনন্য জীবনী-উপন্যাস 'দা রোমান্স অব লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' থেকে এই উদ্ধৃতি। এ-রচনায় আরো বহুবার শরণাপন্ন হতে হবে তাঁর। যেহেতু রচয়িতা একজন কবি, তাই বইটিতে শুধু জীবন-কাহিনী নেই, তারই সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জীবনের রূপ-রঙ, বর্ণ-গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস।

মোনালিসা সম্বন্ধে ফ্লোরেন্সের নানা মহলে নানা গুজব। আর গুজব রটিয়ে, পরনারীর কেচ্ছা-কেলেঙ্কারিতে মাথা গলিয়ে আমোদ পায়না, এমন লোক ফ্লোরেন্সে দুর্লভ। মোনালিসার প্রণয়ী ছিল নাকি অনেক। অনেক পতঙ্গ ঝাঁপ দিতে চেয়েছে তার আগুনে। কিন্তু এসব সত্যি-মিথ্যের বাইরে বিয়ের পরে যে মোনালিসাকে সবাই দেখল, সে শান্ত, গম্ভীর, দয়াবতী, ধর্মে-কর্মে আগ্রহী, এবং সর্বোপরি নিপুণ গৃহিনী। আর সবচেয়ে আশ্চর্য করল যেটা সবাইকে, তা হল সতীন-কন্যা ডায়োনারার উপর তার উথলোনো ভালোবাসা।

ইতালি জুড়ে তখন নামডাক লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। ফ্লোরেন্সের গর্ব। নিজের বিখ্যাত কীর্তি 'লাস্ট সাপার' দেয়াল-চিত্রের পর এখন আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আরেক দেয়াল চিত্রে। আঁকা হচ্ছে ফ্লোরেন্সের গ্রাণ্ড কাউন্সিলের চেম্বারের দেয়ালে। বিষয়, এ্যানঘিয়ারির যুদ্ধ। তাঁর স্টুডিয়োয় তখন রাজা-রাজড়া, মহামান্য-গণ্যমান্যদের ভিড়। যদি রাজি হন একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিতে। রাজমহিষীদের স্বপ্ন, যদি একটু সুযোগ ঘটে তাঁর ইজেলের সামনে বসার। আবেদন-নিবেদন অন্তহীন। লিওনার্দো

নিস্পৃহ। যেন কান নেই শোনার, চোখ নেই দেখার। এই রকম একটা সময়েই লিওনার্দোর স্টুডিওয় হাজির হলেন গিওকোণ্ডো। যা সম্মান-দক্ষিণা লাগে দেব, আমার স্ত্রীর একটা প্রতিকৃতি এঁকে দিন। আপনি হ্যাঁ বললে ধন্য হই। মোনালিসার বেলায় সাড়া মিলে গেল এক ডাকে। তার কারণ কি মোনালিসার রূপ? সে-মুখে এমন কোনো অতীন্দ্রিয় লাবণ্যের ছাপ, যা আগে কোনোদিন চোখে পড়েনি লিওনার্দোর, আর যা খুঁজে চলেছিলেন তিনি বহুদিন?

মোনালিসার ছবির সর্বাঙ্গ জুড়ে রহস্য। ১৫০২-থেকে তার শুরু।

ইতিমধ্যে পার হয়ে গেছে তিনতিনটে বছর। এখনো চলেছে আঁকা। মাঝে মাঝেই লিওনার্দোকে চলে যেতে হয় এদিক-ওদিক। তাই এত দেরি।

১৫০৫। শেষ হতে চলেছে বসন্তকাল। সেই সময়ের শান্ত, উষ্ণ একটা দিন। আকাশে মেঘের জমজমাট মজলিশ। তারই ফাঁক-ফোকর থেকে মাঝে মাঝে ঠিকরে বেরিয়ে আসে সূর্যের আলো। যেন সেই মত্ত মজলিসেরই হল্‌কা হাসি। বাকি সময়টা আকাশ আর পৃথিবী যেন একটা মেঘ-ছায়ার ওড়না দিয়ে মোড়া। এই স্বচ্ছ মোলায়েম হালকা আলো আর এই কুয়াশা-ধূসর ছায়ার পরিবেশ লিওনার্দোর কাছে পরম-প্রিয়। প্রতিকৃতি আঁকার পক্ষে, বিশেষ করে সে-প্রতিকৃতি যদি হয় রমণীর, এটাই হল আদর্শ ও রমণীয় সময়।

প্রতিদিন এই সময়েই মোনালিসা আসে তাঁর স্টুডিও-য় সিটিং দিতে। মোনালিসা যাতে স্বাচ্ছন্দ্য পায়, মোনালিসার যাতে মনে না হয় যে এই বসে থাকা বড় বিরক্তিকর, তার জন্যে হাজারো রকম ব্যবস্থা। স্টুডিওর সামনেই লিওনার্দো বানিয়েছেন একটা ফোয়ারা, যা সর্বক্ষণ বাজিয়ে চলেছে মিষ্টি ঝুমঝুমি। ঝর্ণাকে ঘিরে আয়্যারইস ফুলের কেয়ারি, তাঁর নিজের হাতে সযত্নে রচনা। ঝর্ণা এবং বাগানকে ঘিরে খেলা করছে একটা শিশু-হরিণ। মোনালিসা তাকে নিজের হাতে খাওয়ায়, আদর করে। এশিয়া থেকে অনেক খুঁজে-পেতে আনিয়েছেন দুর্লভ-হাতের একটা সাদা টম-বেড়াল। তার দুটো চোখ দুরকমের। ডানদিকেরটা পোখরাজের মতো হলুদ। বাঁদিকেরটা নীলকান্তমনির মতো নীল। সেও মোনালিসার জন্যেই। মোনালিসার মুখে যাতে বিষণ্ণতার বৃষ্টি-বাদল না নামে, ঠোঁটের গোলাপী দুই পাপড়ির ফাঁক থেকে যাতে কোন সময়েই মুছে না যায় হাসি, আয়্যারইস

ফুলের মতো উৎফুল্ল-উজ্জ্বল থাকে যাতে সব সময়, তার জন্যে স্টুডিওর ভিতরেও অজস্র আয়োজন। বাজনা শোনানোর জন্যে বাজনদার। বেহালা বাজায় অঁান্দ্রে সালাইনো। আটালান্টে বাজার একটা রুপোলী বাঁশি, তার নিজের আবিষ্কার করা। দেখতে অনেকটা ঘোড়ার কঙ্কালের মতো। এই আটালান্টে লিওনার্দোরই আবিষ্কার, যখন মিলানে ছিলেন ডিউক মোরোর রাজদরবারে। সব সময় বাজনা শুনতে ভালো নাও লাগতে পারে লিসার। তাই মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিশিষ্ট কবিদের। আসেন গল্প-লেখকরাও। আবার ডাক পড়ে মজলিশি গপ্পোবাজদেরও। বসে যায় আষাঢ়ে গল্পের আসর। লিওনার্দো চান লিসার মুখে সারাক্ষণ উড়ন্ত প্রজাপতি খেলে বেড়াক আবেগ-অভিব্যক্তির নানা ঢেউ। ছবি আঁকার সময় সিটারদের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, সেই ক্লান্তি বা অবসাদের বদলে তিনি চান অবিচ্ছিন্ন হাস্যময়তা।

অবশ্য আগের মতো এখন আর কবি বা গল্প-লিখিয়েদের জানানো হয়না আমন্ত্রণ। শুধু বাজনাটাই বাজে প্রয়োজনে। এখন অনেক সহজ-স্বাভাবিক হয়ে গেছে দুজনের সম্বন্ধ। লিসার পক্ষেও আর মনে হয়না এই অবিরল বসে থাকাকে আগের মতো ক্লান্তিকর। বরং ঠিক সময়ে স্টুডিওতে পৌঁছতে না পারলে পিঁপড়ের মতো কি যেন কামড়ায় তার মনে। মোনালিসা কখনো একা আসে না। সঙ্গে সঙ্গিনী সিস্টার ক্যামিলা। জীবনের অনেক বাঁকা-চোরা এবং নোংরা পথ পেরিয়ে ক্যামিলা এখন 'নান'। ঘরে-বাইরে মোনালিসার সব সময়ের, সমস্ত কাজের সঙ্গী। ক্যামিলা স্টুডিওতে এসেই বসে পড়ে ঘরের কোণের একটা চেয়ারে। হাতে তুলে নেয় প্রেয়ার বুক। চোখ সর্বক্ষণ সেই বইয়ের পাতায় আঠা দিয়ে আঁটা। নড়ে না, সরে না। আরও আশ্চর্য, গত তিন বছরে তার মুখ থেকে একটিও শব্দ শোনেন নি লিওনার্দো।

সেদিন লিওনার্দো আঁকছেন। মোনালিসা তার প্রিয় বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। হঠাৎ হাতের তুলিটা থেমে গেল। লিওনার্দো তাকালেন মোনালিসার দিকে।

—ম্যাডোনা, তুমি কি আজ কোনও কারণে চিন্তিত?

লিসার শীতল চাউনি উঠে এল লিওনার্দোর মুখের দিকে।

—হ্যাঁ। ভিয়ানোরার শরীরটা ভালো নয়। তাই একটু অন্যমনস্ক। কাল সারা রাত ঘুমোইনি আমি।

—তুমি পরিশ্রান্ত। আজ তাহলে বন্ধ থাক কাজ। প্রতিকৃতির পক্ষে দরকারি অভিব্যক্তির অভাব রয়েছে তোমার মুখে।

—না। এ-রকম একটা দিন নষ্ট হলে আপনারই খারাপ লাগবে। আজকের দিনটা খুব সুন্দর। সূর্যের আলো ভিজেভিজে। ছায়ার রঙ কী স্নিগ্ধ। এই হল আমার দিন।

লিসা একটু থামে। চোখের পাতা নামিয়ে নেয় মেঝের দিকে।

—আজ আমার আসতে দেরি হয়ে গেছে। আমি জানি, আপনি উৎকণ্ঠ হয়ে উঠবেন। অনেক আগেই আসতাম আমি। কিন্তু ম্যাডোনা সোফোনিসবার জন্যে...

—তিনি কে? ওঃ, হ্যাঁ আমি চিনি...রাস্তার হকারদের মতো যাঁর বকবকানি আর পারফিউমের দোকানের মতো গন্ধ ছড়ান যিনি...

লিসা হাসল। বাদল-মেঘে বিদ্যুৎ রেখা খেলে গেল এক ঝলক।

—ম্যাডোনা সোফোনিসবার সব কিছু আমাকে বলা চাই, বলতেই হবে। সিগনোরা আর্জেন্টিনা, গনফালোনিয়ারের স্ত্রী, গতকাল রাত্রে পালাজু ভেসিত্তেতে একটা ডিনার পার্টি দিয়েছিলেন, কী কী খাবার ছিল মেনুতে, কে কী রকম সেজে-গুজে এসেছিল, কার দিকে কার নজর বেশি...

—তাহলে আমি যা ভেবেছিলুম, সেটাই ঠিক। দিয়ানোরার অসুখ নয়, আসলে তোমাকে বিপর্যস্ত করেছে ঐ 'চ্যাটার-বক্স'-এর গাল-গপ্পো। ম্যাডোনা, তুমি কি কখনো লক্ষ করেছ এই আশ্চর্য ব্যাপারগুলো! এঁদো লোকেরা মুখে মুখে রটিয়ে বেড়ায় এক ধরনের মিথ্যাচার, যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই কোনোরকম। তোমার মনে হয় না ম্যাডোনা যে এইসব নিম্নস্তরের আলাপ-আলোচনা আমাদের আত্মাকে মেঘলা করে তোলে আর আমরা বিদীর্ণ হতে থাকি এক গভীরতর শোকে?

লিসা স্তব্ধ। তার চিন্তা নেমে যায় তার আত্মার ভিতরে। লিওনার্দো কি বলতে চাইছেন সে জানে। এখন সে বুঝতে পারে ইঙ্গিতের ভাষা, পড়তে পারে না-বলা সংলাপ। দীর্ঘ সান্নিধ্যে তার জানা হয়ে গেছে লিওনার্দোর মুখের রেখায় ফুটে ওঠা মনের পাণ্ডুলিপি। বিনা-কথার কথোপকথন এখন সাড়া তোলে তাদের দুজনেরই মর্মমূলে। লিসা স্তব্ধ। তার আত্মার ভিতরে চঞ্চল হয়ে ওঠে এক শিশু-হরিণ। লিসার চোখে কেঁপে উঠে গিওকোণ্ডোর পীড়িত মুখের ছবি।

বিনা কারণেই, আজকাল, বুকটা জ্বলতে থাকে গিওকোণ্ডোর। সে

নিশ্চিতরূপে জানে যে শুধুমাত্র কাজের সময়টুকু ছাড়া আর কোনো সময়েই তার প্রিয়তমা সুন্দরীতমা মোনালিসার সঙ্গে দেখা হয় না লিওনার্দোর। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার জানা আছে যে কাজের সময়ও তাদের দুজনের চারপাশে থাকে অজস্র লোকজন। থাকে সিস্টার ক্যামিলার প্রহরা। তবুও বুকে জ্বলে তুষের আগুন। মন পোড়ে সন্দেহে। গিওকোণ্ডোর মনে হয়, ওরা দুজন জানে কোনো গোপন যাদুমন্ত্র। সেই যাদু ওদের দুজনকে পৌঁছে দেয় কাছাকাছি, বিচ্ছিন্ন করে দেয় চারপাশের সমবেত মানুষ-জন থেকে। অথচ গিওকোণ্ডো এটাও জানে যে ওদের সম্পর্ক সে-রকম কোনো ভালোবাসা-বাসির নয়, লোকে যাকে ভালোবাসাবাসি বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা কেচ্ছা বানাতে অভ্যস্ত।

গিওকোণ্ডো বহুবার শুনেছে লিওনার্দোর নিজের মুখের আলোচনা। তিনি বলতেন—প্রত্যেক শিল্পীই যখন যাকে আঁকে, তার মধ্যে দিয়েই ফোটাতে চায় নিজের দেহাবয়ব, নিজের মুখমণ্ডল। এর কারণ কী, তাও একবার বলেছিলেন তিনি। মানুষের আত্মাই তার শরীরের জনক। এই আত্মা একটি মাত্র শরীর পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না কখনো। তারই আদলে গড়া আরও নানা শরীরের মুখোমুখি হওয়ার বাসনায় সে নিয়ত অস্থির। আত্মার পক্ষে এই নতুন-নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল যে, যখন শিল্পী আঁকতে বসেন কারো প্রতিকৃতি, তখনও, সেই প্রতিকৃতির ভিতরে ঢুকে পড়ে শিল্পীর নিজের মুখ, আর যদি মুখ না হয় তো, আত্মা।

গিওকোণ্ডোকে স্তম্ভিত করেছে আরও একটা জিনিস। যে মোনালিসাকে তিনি আঁকছেন শুধু সেটা নয়, যে-জীয়ন্ত মোনালিসা তাঁর সামনে বসে, হুবহু তারই মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছেন লিওনার্দো। দীর্ঘদিন দুটি মানুষ পরস্পরে আচ্ছন্ন-আবৃত হয়ে বসবাস করলে সাধারণত যেমন ঘটে থাকে। দুজনের মধ্যে এই যে গড়ে-ওঠা মিল, এটা অবয়বের নয়। ওদের মিল হাসিতে, বাক-ভঙ্গিমায়, চোখের চাউনিতে। লিওনার্দোর এই হাসি, গিওকোণ্ডো আরো বিস্মিত হয়ে ভাবে, কতবার দেখেছে সে তাঁর সৃষ্টিতে, এমন কি যখন মোনালিসার সঙ্গে হয়নি চোখের দেখা। দেখেছে 'ভার্জিন অফ দা রকস'-এ, 'লিডা এ্যাণ্ড দা সোয়ান'-এ। দেখেছে তাঁর প্রথম ছবি 'আওয়ার মাদার ঈভ্ বিফোর দা ট্রি অফ নলেজ'-এ। যেখানেই মহিলার কোনো প্রতিকৃতি, দেখেছে সেইখানেই। তাহলে কি সারাজীবন ধরে, নিজের সমস্ত সৃষ্টিতেই, তিনি খুঁজে চলেছিলেন নিজেরই সৌন্দর্যের

এমন এক প্রতিফলিত রূপ, যার অবিকল দ্বিতীয় প্রতিরূপ তিনি এখন পেয়ে গেছেন মোনালিসার মুখে? গিওকোণ্ডোর আত্মা এবং শরীর শিউরে ওঠে ভয়ে, আতঙ্কে, উদ্বেগে, দুঃস্বপ্নে। কোনটা সত্য? বাস্তব? না স্বপ্ন? কোনটা সত্য? মোনালিসা গিওকোণ্ডো নামের একজন ফ্লোরেন্স-বাসী নগণ্য নাগরিকের বিয়ে-করা বৌ, না কোনো অপার্থিব অস্তিত্ব? সে কি অলৌকিক কোনো মায়া, যা শরীরময় আকৃতি পেয়েছে শিল্পীর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষায়? সেকি **'a feminine double of Leonardo himself'** ?

মোনালিসা আত্মার ভিতরকার জলস্রোত থেকে উঠে আসে ডাঙ্গায়। ভিজেভিজে দৃষ্টিতে তাকায় লিওনার্দোর দিকে। লিওনার্দো তাকান লিসার দিকে শিশিরের ভারে নুয়ে পড়া ঘাসের মতো। হাতে তুলে নেন তুলি। আবার আঁকা শুরু হবে।

লিসা বলে

—একটা গল্প বলুন।

—কোন গল্প?

লিসা একটু ভেবে নেয়।

—'বেল্‌ম অফ ভেনাস'।

গল্প বলতে জানতেন নাকি লিওনার্দো? না। তবে গল্পের মতো কিছু কিছু কাহিনী খুব প্রিয় ছিল তাঁর। শিশুর মতো সরল ভঙ্গি আর কোমল গানের মতো গলায় প্রায়ই নানাজনকে শোনাতেন সেগুলো। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কুড়োনো। কোথাও বেড়াবার সময়, অথবা প্রকৃতিকে নিবিড় করে দেখার সময়, অথবা অন্য কারো স্মৃতিকথা থেকে এক মুঠো তুলে নিয়ে, পরে সাজিয়ে-গুছিয়ে ছিমছাম করে নেওয়া।

লিওনার্দো ইঙ্গিত করলেন। সেই ইঙ্গিত দেখেই বেহালা-বাদক সালাইনো আর ঘোড়ার কঙ্কালের মতো বাঁশি হাতে আটালান্টে বুঝে গেল এখন পালকের মতো হালকা সুরে বাজাতে হবে 'ভেনাসের রাজ্য'-র আবহসংগীত। লিওনার্দো শুরু করলেন গল্প-বলা। সেও এক সংগীত।

৩

১৯১১। ২২ অগাস্ট। 'প্যারিস-জার্নাল'-এর সান্ধ্য-সংখ্যায় ছেপে বেরলো এক মর্মান্তিক সংবাদ। মোনালিসা ল্যুভ্‌র থেকে চলে গেছে। সারা প্যারিস, সারা ফরাসীদেশ প্রথমে বোবা হয়ে গেল বিস্ময়ে। তারপর ফেটে পড়ল

রাগে, ধিক্কারে। ল্যুভ্‌র থেকে চুরি যাওয়াটা ইদানীং হয়ে উঠেছিল নিত্য-নৈমিত্তিক। লোকে ঠাট্টা করে বলত—দেখ, এরপর একদিন না মোনালিসা-ই চুরি হয়ে যায়। সেই শুকনো ঠাট্টা যে এমন ফলন্ত সত্যি হয়ে উঠবে স্বপ্নেও ভাবে নি কেউ। সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল ল্যুভ্‌রের কর্মকর্তাদের ওপর। ঐ অপদার্থগুলোকে এখুনি বিদেয় করো ঝেঁটিয়ে।

মোনালিসা-অন্ত-প্রাণ ফরাসীদের। তাদের কাছে ল্যুভ্‌র্ মানেই মোনালিসা। শিক্ষিত মানুষদের কাছে মোনালিসা সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম মডেল। অশিক্ষিত সাধারণদের কাছে স্বর্গীয় দেবী। প্রত্যেক রবিবারে স্কুলের ছেলেমেয়েরা ঝাঁক বেঁধে দেখতে যায় মোনালিসা। প্রত্যেক ছুটি-ছাটার দিনে তরুণ বুদ্ধিজীবীর দল, যারা দূর-দূরান্তের গাঁ-গঞ্জ-শহর থেকে প্যারিসে এসেছে মিলিটারি সার্ভিসে যোগ দিতে, মোনালিসার সামনে গিয়ে একবার না-দাঁড়ালে সুখ নেইকো মনে। নব-বিবাহিত দম্পতি কার কাছে প্রার্থনা করবে তাদের সুখ-স্বপ্নের জীবন? সবার আগের নাম মোনালিসা। সেই মোনালিসা গেছে ল্যুভ্‌র্ থেকে চুরি হয়ে? হায়! হায়! কখন গেল? কি করে গেল? কবে গেল?

২২ অগাস্টের দুপুর বেলাতেই দৃশ্যটা প্রথম চোখে পড়ে জনৈক প্রহরী-প্রধানের। 'সালেকারে'-এর যেখানটায় সাধারণত টাঙানো থাকত মোনালিসা, সেখানকার দেয়াল ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খবর পৌঁছে দিলেন কিউরেটরকে। কিউরেটরের হাঁকডাকে ছুটে এল বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানেরা। কি করা হবে এখন?

আণ্ডার-সেক্রেটারিকে খবর দেওয়া হবে কী? মাথা চুলকে, সালকে বলতে হল—উপায় কি! কিন্তু আণ্ডার-সেক্রেটারি মঁসিয় দুজারদ্যাঁ বোমেৎ তখন প্যারিসের বাইরে। তাহলে? পাঠাও জরুরি টেলিগ্রাম। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো? হয় নি এখনো? সে কি? এখুনি পাঠাও তাহলে। খবর পেয়েই পুলিশ-দপ্তর থেকে ছুটে এলেন মঁসিয় আমার। সঙ্গে ৬০ জন ইনস্‌পেকটর আর বেশ কিছু এমনি-পুলিশ। মঞ্চে ঢুকেই তাঁর প্রথম সংলাপ, ল্যুভ্‌রের সমস্ত দরজায় তালা এঁটে দাও এখুনি। আর ফাঁকা করে দাও সমস্ত গ্যালারি। এক গুচ্ছ পুলিশকে পাঠিয়ে দিলেন ল্যুভ্‌রের ছাদে। দেখতো চোরটা পালিয়েছে কোন চোরাপথে?

এর পরে পরেই মঁসিয় লেপিন, পুলিশ-প্রধান, স্বয়ং ছুটে এলেন অকুস্থলে, মিনিস্ট্রি অব দা ইনটেরিয়রের কানে শোচনীয় সংবাদটা পৌঁছে দিয়ে। এর

পরই কানা-মাছি ভোঁ ভোঁ। অর্থাৎ তন্ন-তন্ন তদন্ত। মেঝে থেকে ছাদ সর্বত্র কড়া-নজরের মশাল জ্বালিয়ে। কিছুক্ষণ পরেই, মোনালিসা নয়, মোনালিসার ফ্রেমটাকে পাওয়া গেল ল্যুভ্রের বিশাল সিঁড়ির এক প্রান্তে, 'ভিকট্রি অফ সামাথ্রেস'-এর মূর্তির পায়ের নীচে। মোনালিসা ক্যানভাসে আঁকা হয়নি। হয়েছিল 'লিনডেল উড' প্যানেলে। অক্ষত ফ্রেমটা হাতে পেয়েই বোঝা গেল বেশ সযত্নেই ফ্রেম থেকে কাঠের প্যানেলটিকে খুলে নিয়েছে অপহারক। এটা করতে তার সময় লেগেছে আধ ঘণ্টার মতো। অতএব চোরটি একেবারেই বাইরের লোক নয়। ল্যুভ্রের মেরামতি-কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং ল্যুভ্রের অন্দরমহলের গলি-ঘুঁজির সঙ্গে পরিচিত, এমন কেউই এই দুঃসাহসী অপহরণের নায়ক।

মঁসিয় লেপিন ল্যুভ্র ছেড়ে ছুটলেন 'মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসে'। 'রোজার' থেকে অবশ্য আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে দুঃসংবাদ। মঁসিয় ক্রুপি হাঁক দিলেন পাবলিক প্রসিকিউটরকে। পাবলিক প্রসিকিউটরকে ডেকে পাঠালেন তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট মঁসিয় দ্রিউকে। দ্রিউ তখুনি কোমর বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন অপহরণ-রহস্যের অতল-অন্ধকারে।

২২ তারিখের 'প্যারিস-জার্নাল', যার গায়ে ছাপা হয়ে থাকে পরের দিনের তারিখ, খুঁচিয়ে ঘা-করার ভঙ্গিতে উস্‌কে দিয়েছিল অজস্র প্রশ্ন। চুরিটা হয় কবে? গতকাল? না তার আগের দিন? সোমবারে অবশ্যই নয়। কেননা ল্যুভ্রের দরজা সেদিন সাধারণের জন্যে বন্ধ। ভিতরে চলে ঝাড়-পোঁছের কাজ। গ্যালারিতে ঢুকতে পারে সেদিন শুধু বিশেষ সুবিধা-ভোগী অল্প দু-একজন। আবার এমনও হতে পারে যে চুরিটা হয়েছে সোমবারই। সোমবার বিশেষ সুবিধাবলে যাঁরা হাজির ছিলেন বিভিন্ন গ্যালারিতে, তাদের মধ্যে একজন মঁসিয় গ্রানিয়ে, 'ডিপার্টমেন্ট অব সেন'-এর সহকারি প্রসিকিউটর। সেদিন হঠাৎ তুচ্ছ একটা অজুহাত দেখিয়ে মোনালিসার ঘর 'সালো কারে'-র ভিতরে ঢোকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় সকলের। গ্রানিয়েরের প্রতিবাদেও প্রতিকার ঘটে নি। গত সোমবার কী ঘটেছিল ল্যুভ্রে, যার জন্যে এমন আকস্মিক নিষেধাজ্ঞা?

এর চেয়েও আশ্চর্য খবর, গতকাল যখন কিছু দর্শক প্রহরীদের প্রশ্ন করে, মোনালিসার জায়গাটা ফাঁকা কেন? ভ্রূক্ষেপহীন প্রহরীরা তার উত্তরে জানায়—মেরামতের জন্যে ছবিটা পাঠানো হয়েছে ফোটোগ্রাফিক স্টুডিও-য়। তার মানে কি এই নয় যে প্রহরী-প্রধান মুখ-খোলার আগে পর্যন্ত বিষয়টাকে

গুরুত্ব দেওয়া হয় নি আদৌ।

এইখানেই শেষ নয়। 'প্যারিস জার্নাল' আরো লিখেছিল—

খবর পাওয়া গেছে জনৈক রাজমিস্ত্রী 'সালো কারে'-র সংলগ্ন অন্য গ্যালারিতে মেরামতির কাজ করতে করতেই মোনালিসার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল—

—ঐ দেখো, ল্যুভ্‌রের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছবিটা হচ্ছে ঐ।

সে রাজমিস্ত্রি এখন কোথায়?

সবশেষে 'প্যারিস জার্নাল'-এর আরও কিছু প্রশ্ন মোনালিসা চুরি হবে কেন? চুরি করে কার লাভ? চুরি-করা ছবিটা নিয়ে কি করবে সে? বিক্রি করে মুনাফা? সে কি সম্ভব? কে এমন নির্বোধ আছে পৃথিবীতে, জেল-হাজত-হাতকড়াকে তুড়ি মেরে যে কিনে বসবে এমন বিশ্ববিদিত ছবি? সম্ভাবনা শুধুমাত্র একটা জায়গায়। চুরি-যাওয়া ছবিটা কিনতে পারে কোনো 'ফ্যানাটিক্যাল কালেকটর'-ই। কাউকে না-বেচে, না-দেখিয়ে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে সেটাকে লুকিয়ে রাখতে পারে গোপন কোনো গহ্বরে, নিজের অমূল্য সঞ্চয় হিসেবে।

পরের দিনই 'প্যারিস-জার্নাল'-এর মতো আর এক সান্ধ্য পত্রিকা 'ল্যাঁত্রাসিয়ঁ'-তে ছেপে বেরোল অ্যাপলিনেয়রের একটা বিচিত্র প্রবন্ধ। শিল্পকলা বিষয়ে মাঝে-মাঝেই এই কাগজে আলোচনার ফুল্‌কি ছড়ান তিনি।

'মোনালিসা এমনই সুন্দর যে তার পারফেকশন সন্দেহাতীতরূপে স্বীকৃত। খুব কম সৃষ্টি সম্বন্ধেই এমন উচ্চারণ সম্ভব।

দ্যা অ্যাপোলো বেলভেডিয়ার, দা ভেনাস ডি মেলো, দা মোনালিসা, দা সিস্‌টাইন ম্যাডোনা, দা লাস্‌ট জাজমেন্ট, দা এমবারকেশন ফর সাইথেরিয়া, দা এঞ্জেলস্‌, দা আইল্যাণ্ড অফ দি ডেড—এগুলো এবং এগুলোর মতোই আরো দুটো-একটা সৃষ্টিকেই, যুগ-যুগান্তরের হাজার হাজার কাজের ভেতর থেকে মহান সৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে বেছে নিয়েছে মানুষ। পৃথিবীর সবচেয়ে স্মরণীয় সম্পদ চলতে এরাই।

তার মানে এই নয় যে, এদের মধ্যে কারো কারো খ্যাতি হয়ে ওঠেনি তার শিল্প-কৃতিত্বের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত। বোরেফলিনের 'আইল্যাণ্ড অব দা ডেড' অথবা মিলারের 'এঞ্জেলস' যত না শিল্প হিসেবে সার্থক, তার চেয়ে বেশি সম্মানিত। কিন্তু মোনালিসার খ্যাতি তার সৌন্দর্যের সমানুপাতিক।

এমনকি হয়তো সেটা পাওনার চেয়ে বেশি নয়, কমই।

কিন্তু ল্যুভ্‌রের পাহারাদারদের সম্বন্ধে আমরা কি বলব?

সেখানে প্রত্যেকটা গ্যালারির জন্যে কম করে প্রহরী নেই একজনও। রুবেনস্‌ গ্যালারির লাগোয়া ডার্‌ রুমের ছোট ছোট ছবিগুলো যেন চোরেদের হবির লুটের জন্যেই থরে থরে সাজানো। বিদেশের মিউজিয়ামে যেমন থাকে, ল্যুভ্‌রে সে-ভাবে কোনো ছবিই দেয়ালে আটকানো নয়। এমন কি ছোটো-খাটো ছবিগুলোও। তার চেয়েও বড় কথা, হঠাৎ আগুন লাগলে কীভাবে বাঁচাতে হবে এই সব মূল্যবান ছবিকে, প্রহরীদের কখনো তালিম দেওয়া হয় নি সে-সব।

সব মিলিয়ে অযত্নের, অক্ষমতার, অব্যবস্থার চূড়ান্ত।

যাই হোক, একটা মাস্টারপিস হারিয়ে যাওয়ার বেদনাকে যদি হজম করতেই হয়, আমরা তাহলে স্মরণ করব উনিশ শতকের জার্মানির সেই সব কিউরেটর এবং রেসটোরারদের, পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনে যারা প্রভূত যত্ন-সহযোগে সমস্ত প্রাচীন চিত্রকলার সর্বাঙ্গ চেঁছে-পুঁছে রঙ লাগিয়েছিলেন নতুন করে। পরিণাম দাঁড়াল এই যে, জার্মান মিউজিয়ামে প্রাচীন চিত্রকলা বলতে দেখার মতো আর কিছুই রইল না, যা রইল সেগুলো ঐসব মহামান্য প্রফেসরদের হতকুচ্ছিত সৃষ্টি। মোনালিসার অপহারকের চেয়ে কম অপরাধী নন এঁরা।'

ঐ দিনের 'প্যারিস জার্নাল'-এ যেন ঠাট্টা-ইয়ার্কির হাট। পাতা-ভর্তি হরেক রকম রসিকতা। শোনা যাচ্ছে চোর-মহাশয় চুরির দিনের রাত্রিটা যাপন করেছিলেন ল্যুভ্‌রের এক টয়লেটে।

শোনা যাচ্ছে ল্যুভ্‌র্‌-কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি হাতে পেয়েছিলেন একটি ঐতিহাসিক পোস্টকার্ড। ল্যুভ্‌রের ঠিকানায় সেটি মোনালিসার উদ্দেশে এক প্রেমপত্র। তার ছত্রে ছত্রে অগ্নিবর্ণ ভালোবাসার তাপ। আর যত্রতত্র 'আই লাভ ইউ', 'আই এ্যাডোর ইউ'-এর ছড়াছড়ি।

শোনা যাচ্ছে দুজন অলোকদ্রষ্টা মহিলা মোনালিসা সম্বন্ধে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের ভবিষ্যদ্বাণী। মাদাম অব দেসিভা চুরি-যাওয়ার সময় এবং সেন্ট্রাল এ্যাসট্রোনমিক্যাল আপিস থেকে তৎকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে নিয়ে জানিয়েছেন যে, 'চুরি যাওয়া মোনালিসা এখনো রয়েছে ল্যুভ্‌রের ভিতরে। বাইরে যায় নি। চুরি করেছে একটি যুবক, মাথায়

যার ঘন চুল, লম্বা গলা, আর কর্কশ কণ্ঠস্বর।' পুরনো জিনিসকে ঘষে-মেজে ঝকঝকে নতুন বানানো তার প্যাশন। দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা মাদাম এলিসে-র বেদনার্ত বাণী—'মোনালিসা হ্যাস বিন ডেসট্রয়েড'। আর ঐ দিনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সরকারি কর্তৃপক্ষের মুণ্ডপাত। এর ফলে সাধারণ সরকারি কর্মচারী, যেমন মিউজিয়মের পাহারাদাররা, মাইনে পাবে সামান্যই, আর তাদের কোনো সময়েই ডাকাডাকি করা চলবে না।

এরই কদিন পরে মজা করেছিল আরও। নিজেদের কাগজে ছাপিয়ে দিয়েছিল একটা নোটিশের নমুনা, যেটা, 'প্যারিস-জার্নালের মতে ফ্রান্সের প্রত্যেকটি মিউজিয়ামে টানিয়ে রাখা উচিত। নোটিশের বয়ান—

শিল্পের স্বার্থে

এবং মূল্যবান শিল্প-সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্যে

জনসাধারণকে

অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অনুগ্রহ করে

রক্ষীদের জাগিয়ে দেন

যদি দেখেন যে তারা ঘুমন্ত।

আরেক দিন ছেপে বেরোল একটা মজার ফটোগ্রাফ। নোতর-দাম্ ক্যাথিড্রেল-এর ছবি ছাপা হয়েছে। কিন্তু তার একটা চুড়ো নেই। নীচে মন্তব্য :

—এমন কাণ্ড কী ঘটতে পারে না?

এইভাবে 'প্যারিস-জার্নাল' তার পাঠকদের জন্যে রোজই বিলি করে চলেছে মুখরোচক ভেলপুরি। যেন মওকা জুটে গেছে বাজার মাত্ করার। সে তুলনায় 'ল্যাত্রাসিয়ঁ' অনেক চুপচাপ, এবং মিয়োনো। মাত্র একদিন এক-টুকরো লিখে অ্যাপলিনেয়রও বোবা। যখন তাঁর কলমে প্রতিবাদের আগুনে-হল্কা ছোটার কথা, তখন তিনি ভিজে-বারুদ কেন, অনেকের মনেই এমন প্রশ্নের আনাগোনা। কেউ কেউ আবার ঐ টুকরো লেখাটুকু পড়েই বিস্ময়ে হতভম্ব। অ্যাপলিনেয়রের কলমে হঠাৎ মোনালিসার এমন স্তব-স্তুতি কি কারণে? এই লোকটাই তো ইতালীয় ফিউচারিস্ট মারিনেত্তির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছিল না যে, 'অল মিউজিয়াম স্যুড বি ডেসট্রয়েড বিকজ দে প্যারালাইস্ড দা ইমাজিনেশান'।

অ্যাপলিনেয়র বৃক্ষ হবো স্তব্ধ। বাতাসে ঝড়ের গন্ধ। আর কিসের হাহাকার। বুঝতে পারছেন একটা কালো মেঘ এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। বুঝতে পারছেন তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হবে আসন্ন এক দুর্যোগে। অ্যাপলিনেয়রের উজ্জ্বল মুখ ক্রমশ পাঁশুটে। কপাল যেন করাতের দাঁত। দুঃস্বপ্ন শুধু স্বপ্নে নয়, জাগরণেও।

৪

চমকে উঠলেন লিওনার্দো। নির্দিষ্ট সময়েই মোনালিসা এসেছে তার স্টুডিওয়। কিন্তু একা। যা এর আগে ঘটেনি কোনদিন। কি করে সম্ভব এটা?

চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। যে-রকম আলো আর যতখানি ছায়া লিওনার্দোর পছন্দ, সেই রকম আলো-ছায়া আজ আকাশে-বাতাসে। সিটিং দিতে দিতে মোনালিসাও বুঝে গেছে আলো-ছায়ার হিসেব। তারও মনে প্রসন্নতা। গত তিন বছরের সমস্ত দিনের চেয়ে আজকের দিনটা যেন অন্যরকম। সারা স্টুডিও-য় মাত্র দুটি প্রাণী। লিওনার্দো আর তাঁর মোনালিসা।

দু-এক দিনের মধ্যে জরুরি সরকারি ডাকে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যেতে হবে লিওনার্দোকে। ফ্লোরেন্স ছেড়ে যাওয়া মানেই মোনালিসাকেও ছেড়ে যাওয়া। আর যে মোনালিসাকে মৃত্যুহীনতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে তাঁর এমন প্রাণপাত শ্রম ও সাধনা, তাকে ছেড়ে যাওয়া মানেই কারাবাস কিংবা নির্বাসন।

মোনালিসা এখন ঢুকে পড়েছে তাঁর জীবনের কেন্দ্রে একটা প্রশ্নচিহ্নের মতো। আর সেই প্রশ্নচিহ্নটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ক্রমাগত দোল খাচ্ছে দুদিকে। কোন মোনালিসাকে চাই আমি? যে জীবন্ত? নাকি যে অবিনশ্বর আমার ছবিতে? কিন্তু এর যে কোনো একজনকে পছন্দ করা মানেই তো অন্যজনকে হারানো? তখন নির্মাণের সমস্ত আনন্দ নিমেষে যাবে মুছে। ভেঙে পড়বে মনোযোগের অখণ্ডতা। যাকে অমর করতে চাইছেন সে যে হয়ে উঠবে নিতান্তই মরণশীল এক রমণীয় প্রতিকৃতি মাত্র।

আমাদের ভালোবাসা বড় নীরব। আমরা পরস্পরের গোপন অভ্যন্তরে পৌঁছতে পেরেছি শুধুমাত্র কথায়, কথার লাবণ্যে, কথার স্পর্শে, কথার গভীর ইসারা-ইঙ্গিতে। যে-ভাবে ঘন কুয়াশাকে ভেদ করে সূর্যালোক,

সেইভাবে ভীষণ দূরত্বকে ভেদ করে আমরা ছুঁয়েছি পরস্পরের মন, নীরবে। আমাদের ভাষা, ঠোঁটের হাসিতে, মৃদু তাকানোয়, চোখের আলোয়, কপালের রেখায়, নিশ্বাসের স্পন্দনে, মুখমণ্ডলের উদ্ভাসে। কিন্তু হঠাৎ কোনোদিন যদি সরে যায় সমস্ত কুয়াশা? যদি জ্বলে ওঠে সূর্যালোক? সমস্ত অন্তরায় অথবা অন্তরাল যায় ছিঁড়ে? মুছে যায় দূরত্বের গণ্ডী-দাগ? যে নিরাবেগ কৌতূহলে আমি নিরীক্ষা করি কোনো যন্ত্র, অথবা গণিত অথবা বিষধর লতা-গুল্ম, সেই কৌতূহলে যদি তখন মেতে উঠি একটা জীবন্ত আত্মাকে নিয়ে?

বিকৃত মৃতদেহের ভিতরে যে-ভাবে নেমে যায় অন্বেষণের ক্ষুরধার ছুরি, লিওনার্দোর কখনো কখনো মনে হয় সেইভাবে। মোনালিসাকেও চিরে-ছিঁড়ে চলেছে তাঁর স্নিগ্ধ এবং নির্দয় অনুসন্ধান। আর মোনালিসাও যেন নিজেকে উপুড় করে দিয়েছে আত্মসমর্পণে। এই মনে হওয়ার মুহূর্তগুলো ভয়াবহ। সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে লিওনার্দোর। এর চেয়ে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যাওয়া ভালো। এর চেয়ে ঢের ভালো বিচ্ছেদ। এই জাতীয় ভাবনায় তিনি পিষ্ট এবং পীড়িত হয়েছেন গত কয়েকদিন। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, মোনালিসার মুখোমুখি বসে, উবে গেছে কামনা-বাসনার সেই উৎপীড়ক ঝোড়ো হাওয়া। তাঁর সামনে এখন আর অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। উপস্থিত শুধু বর্তমান। আর মোনালিসা, সেও যেন তাঁর সামনে বসে আছে অনন্তকাল, একই ভঙ্গিতে, একই সৌন্দর্য বিছিয়ে। পরন্তু কোনো আগমন নেই, নেই প্রস্থান। তার স্মিত হাসি, সুকুমার মূর্তি যেন পাষাণে-খোদাই ভাস্কর্য।

নিমগ্ন হয়েছিলেন আঁকায়। হঠাৎ মোনালিসার মুখে ছায়া। আয়নার কাচে জীবন্ত মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন তৈরি করে একটা আবছায়া দাগ—সেই রকমই পাতলা একটা আস্তরণ। এ ছায়া লিওনার্দোর কাছে অপরিচিত। আগে দেখেন নি কোনোদিন। তার মনের উনোনে কিছু কি ফুটে চলেছে টগবগিয়ে? অপ্রয়োজনীয় ছায়াটাকে সরিয়ে দিয়ে তার মুখশ্রীর উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্যে লিওনার্দো শুরু করলেন গল্প বলা। বেজে উঠল তাঁর গীতধ্বনিময় কণ্ঠস্বর—

—প্রকৃতির হাতে গড়ে-ওঠা অভিনব সব আকার, যা মানুষের অজানা, দেখতে দেখতে এবং দেখে-যাওয়ার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করতে না পেরে ক্রমাগত হেঁটে চলেছিলাম শুকনো অন্ধকার পার্বত্য-পথে, আর সেই পথ আমাকে টেনে নিয়ে এল একটা গুহার মুখে। কুঁকড়ে গেলাম ভয়ে। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত নিচু হয়ে, পিঠটা বাঁকিয়ে, বাঁ হাতের তালু ডান পায়ের হাঁটুতে রেখে যাতে অন্ধকারটা সয়ে যায় তাই ডান হাতের তালু দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করে, মাথাটা গলিয়ে দিলাম তার হাঁ-করা মুখের ভিতর। তারপর ঘন অন্ধকারের ভিতরে এদিক-ওদিক এঁকে বেঁকে প্রায় দিশেহারার মতো এগিয়ে চললাম ভিতরে। ভুরু কুঁচকে, চোখ দুটোকে সামনে ঠেলে, প্রাণপণে ভেদ করে চলেছি অন্ধকার, যদি দেখতে পাই কোনো কিছু। একই সঙ্গে দুটো অনুভূতির আলোড়ন চলেছে আজ আমার ভিতরে—ভয় আর কৌতূহল। অন্ধকারের জন্যে ভয়। আর এই অন্ধকারের ভিতরে লুকিয়ে আছে যে অবর্ণনীয় রহস্য—তার জন্যে কৌতূহল।

লিওনার্দো থামলেন। তাকিয়ে দেখলেন মোনালিসার মুখে তখনো এঁটে আছে সেই অশুভ ছায়া। মোনালিসার চোখে মেদুর মেঘ। মুখে প্রশ্ন।

—দুটো অনুভূতির মধ্যে শেষ পর্যন্ত জয় হল কোনটার?

লিওনার্দোর উত্তর

—কৌতূহলের।

—আপনি তাহলে শেষ পর্যন্ত গুহার ভিতরকার রহস্যকে জানতে পারলেন?

—আমি জানলাম যে ঐ রহস্যকে জানা সম্ভব নয়।

—আপনি কি এই কথা মানুষদের জানাবেন?

—সব অভিজ্ঞতা মানুষকে জানানো যায় না। বা, কি করে জানানো যায় জানি না। তবে আমি করব যাতে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয় সেই কৌতূহল যা জয় করতে পারবে ভয়কে।

—কিন্তু শুধু কৌতূহলের যদি অতখানি ক্ষমতা না থাকে? গুহার অন্ধকার ভেদ করে পৃথিবীর শেষ এবং হয়তো-অনির্বচনীয় সেই রহস্যকে জেনে ওঠার জন্যে যদি দরকার হয় আরও বড় কোনো অনুভূতির?

লিওনার্দো দেখতে পেলেন এক পলকের জন্যে ঝলসে উঠে আবার নিভে গেল এক বিদ্যুৎ-ঝলক, মোনালিসার চোখে। আর তারপরেই সেখানে ফুটে উঠল এমন এক ধরনের কটাক্ষময় হাসি, যা আগে কোনোদিন চোখে পড়ে নি।

মোনালিসা বেশিরভাগ সময়েই লুকিয়ে রাখে নিজেকে। অদৃশ্য ঘোমটা টেনে ঘিরে রাখে তার মন। কাউকেই জানতে দেয় না তার শিক্ষা-দীক্ষা। অন্যান্যদের মতো বই-পড়া জ্ঞানের কিচির-মিচির কখনোই শোনা যায়

নি তাব গলায়। সে বিদুষী কিনা জানাব উপাযও জোটে না কখনো। তাব সহজ-সাধাবণ কথাবার্তা শুনে অনেকেই ভাবে সে নির্বোধ। কিন্তু লিওনার্দোব ধাবণা ভিন্ন। তিনি আচমকা জেনে গেছেন যে ল্যাটিন এবং গ্রীক সাহিত্য নিয়মিত পাঠ কবে থাকে সে। লিওনার্দোব ধাবণা মহিলা-সুলভ ইনটেলেকটেব চেযে মোনালিসাব যেটা আছে, তা অনেক গভীব, তাকে বলা যেতে পাবে—'এ্যান ওবাকুলারি উইসডম্।'

চাঁদোযাব ফাঁক দিযে সরু একফালি ঝকঝকে আলো ঢুকে পডেছে স্টুডিওয। বাইবে বোদেব উজ্জ্বলতা প্রকট। মোনালিসাব মুখের মোলায়েম স্নিগ্ধতাব উপবে হালকা ছাযাব ছোপ। দীর্ঘ নীববতা ভেঙে মোনালিসা প্রশ্ন কবল

—কাল আপনি চলে যাচ্ছেন?

—না, আজ সন্ধ্যেয়।

আবও কিছু বলাব ছিল তাঁব। কিন্তু নীবব বযে গেলেন।

—মিস্টাব ফ্রানসেস্‌কো তিন মাসেব জন্যে কালাব্রিযা-য যাচ্ছেন ব্যবসাব কাজে। অনেক বলে-কযে তাঁকে বাজি কবিযেছি আমাকে সঙ্গে নিযে যেতে।

আবাব স্তব্ধতা। লিওনার্দো সবিযে বাখলেন হাতেব তুলি।

—আপনি কাজ করুন। এখনো তত বেলা হয নি। আমিও ক্লান্ত নই।

—ঠিক আছে। অনেক কাজ হযেছে।

—আপনি শেষ কববেন না আমাব পোর্ট্রেট?

—কেন কবব না? তিন মাস পবে তুমি তো আবাব ফিবে আসবে। ফিরে এলে কি এখানে আসবে না?

—আসব। নিশ্চয আসব। কিন্তু তিন মাস পবে আমি তো অন্য একজন হযে যেতে পাবি। আপনিই তো একদিন বলেছিলেন মানুষের মুখ, বিশেষ করে বমণীদেব, বদলে যায দ্রুত।

—আমি শেষ কবতে চাই। কিন্তু জানি না, পাবব কিনা। মাঝে মাঝেই মনে হয আমি যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, তার কোনোটাই সম্ভব হবে না আমার জীবনে।

—আমি শুনেছি যে—আপনি কোনো কাজই শেষ কবেন না। কাবণ যা অসম্ভব তাব দিকেই আপনাব টান।

—তাই হবে হয়তো।

লিওনার্দোর মুখেও এখন এক ধরনের ছায়ার মাখামাখি।

—তাহলে বিদায় মিস্টার লিওনার্দো। আমার ওঠার সময় হয়ে গেছে। ঈশ্বর আপনার যাত্রা নির্বিঘ্ন করুন।

মৃত্যুর মতো স্থির একটি মুহূর্ত। মোনালিসার মুখে তার সেই চিরন্তন শান্ত-সমুজ্জ্বল হাসি। কিন্তু লিওনার্দোর মনে হল, এ হাসি যেন এক মৃতের। মোনালিসা এগিয়ে দিলে তার হাত। চুম্বন করলেন লিওনার্দো। আর মোনালিসা, তাদের তিন বছরের অন্তরঙ্গতার অবসরে আজ প্রথম, নিচু হয়ে ওষ্ঠ দিয়ে স্পর্শ করল লিওনার্দোর মাথার চুল।

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

মোনালিসা চলে গেল। পৃথিবীতে তখন উজ্জ্বল দুপুর। কিন্তু লিওনার্দোর মনে হল—অন্ধকার মধ্যরাত। দূরে কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে গির্জায়। লিওনার্দো ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না। শুনছেন একটা পায়ের শব্দ। সময়েরই বুঝি। এক আর্ত এবং বিষণ্ণ সময়ের পদধ্বনি।

৫

১৯১১। ৯ সেপ্টেম্বর। 'ল্য মতোঁ্যা'-য় ছেপে বেরোল এক গা-চমকানো সংবাদ। ল্যুভ্‌র্ থেকে চুরি যাওয়া ইজিপসিয়ান স্টাচুয়েটস সংক্রান্ত অপরাধীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ধরা পড়েছেন এক শিল্প-সমালোচক। নাম গীয়ম অ্যাপলিনেয়র। পুলিশের অনুমান এই চক্রই 'মোনালিসা' চুরির সঙ্গে জড়িত।

৭ সেপ্টেম্বর। দুজন পুলিশ ঢুকে পড়ল অ্যাপলিনেয়রের ঘরে। তারপর পুরো এক ঘণ্টা তল্লাসি। তল্লাসির মধ্যে তারা পেয়ে গেল গেরি পিয়ের সঙ্গে আদান-প্রদান-হওয়া বেশ কিছু চিঠিপত্র। এই দলিল হাতে পেয়েই নিশ্চিন্ত হলেন তদন্তকারী ইনস্‌পেকটররা যে অ্যাপলিনেয়র সেই আন্তর্জাতিক ডাকাতি-চক্রের সঙ্গে যুক্ত, গেরি পিয়ের যার নেতা। গেরি পিয়ের-এর সঙ্গে এখনো আমাদের আলাপ হয় নি। এখন সবচেয়ে জরুরি সেটাই।

১৯০৭-এ অ্যাপলিনেয়রের সঙ্গে প্রথম আলাপ। কিছুদিনের জন্যে এই বেলজিয়ান যুবকটি হয়ে উঠেছিল তাঁর সেক্রেটারি। এক বেলজিয়ান সরকারি অফিসারের ছেলে। প্যারিসে পালিয়ে আসে বেলজিয়ান আর্মি থেকে। তারপর প্যারিসের স্যালভেশন আর্মিতে। অ্যাপলিনেয়রের সঙ্গে

যখন আলাপ, দুজনেই চাকরি করছেন 'ইনভেসট্‌র গাইড' নামের এক পত্রিকায়। দয়া করে একদিন পত্রিকাটা গেল নিভে। বন্ধ হয়ে গেল দুজনেরই হপ্তা-মাইনে। দুজনেই বেকার। পিয়ের চেপে বসল অ্যাপলিনেয়রের ঘাড়ে। অ্যাপলিনেয়রও ঘাড় ঝাড়া দিলেন না। কারণ ছেলেটাকে ভালো লেগেছিল তার। ল্যাটিন জানে চমৎকার। হাস্য-পরিহাসে দক্ষ। উদ্ভট গল্প বলার রাজা। অনেক দুর্ঘটনা ঘটায় স্রেফ মজা করার জন্যেই। বাইরে ভুল বুঝবার মতো কাণ্ড-কারখানা করলেও ভেতরে সাচ্চা। সব মিলিয়ে জ্যান্ত-টগবগে।

মারী লরেসা, অ্যাপলিনেয়রের তখনকার প্রেমিকা। পিয়ের একদিন তার কাছে এসে বললে

—মাদাম, আজ বিকেলে ল্যুভ্‌রে যাচ্ছি। আপনার জন্যে কিছু আনতে হবে কি? সবাই ভাবলে নিছক মজার একটা কথা। ল্যুভ্‌র্‌ মানেই মিউজিয়াম নয় নিশ্চয়ই। মাগাজ্যাঁ দা ল্যুভ্‌র্‌ নামের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকেও ল্যুভ্‌র্‌ ডেকে থাকে প্যারিসের লোক। কিন্তু সন্ধ্যের সময় পিয়ের যখন এল ডেরায় অর্থাৎ অ্যাপোলিনেয়রের ঘরে, তার ওভারকোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল দু-দুটো পাথর-খোদাই মাথা, আইবেরিয়ান স্কাল্‌পচার।

—একি! কোথায় পেলে এ দুটো?

—ল্যুভ্‌র্‌ থেকে সরালুম।

পিয়েরের মুখে খিলখিল হাসি।

—ল্যুভ্‌র্‌ থেকে কিছু সরানো খুবই সোজা। পৃথিবীর হাজারটা মিউজিয়ামে ঘুরেছি আমি। সব জায়গাতেই পেনটিং বা স্কাল্‌পচারগুলো আঁটা থাকে। একমাত্র ল্যুভ্‌রেই সব খোলামেলা। আর অধিকাংশ ঘরেই কোনো পাহারা নেই। আমার পরনে তো এই বক্‌স-ওভারকোট। তার উপরে আমার এই রকম রোগা পাতলা শরীর। ফুলে পেটের মধ্যে দু-দুটো স্টাচুয়েট পুরলেরও কারও সন্দেহ হওয়ার নয়।

মঁমার্তের যে কফিখানায় শিল্পীদের আড্ডা, পরে পিয়েরই সেখানে নায়ক। তার দুঃসাহসিকতার জয়ধ্বনি মুখে মুখে। আর পিয়েরের ধান্দা মূর্তি দুটোকে বেচবে চড়া দামে। পকেট গড়ের মাঠ। তাই টাকার খুব খাঁকতি। শেষ পর্যন্ত মূর্তি দুটো কিনে নিলেন পিকাশো। জন্মভূমি স্পেনের গন্ধ-মাখা মূর্তি দুটোকে হাতে পেতে-না-পেতেই পিকাশোর রক্তে যেন প্রেরণার ঝংকার। ১৯০৭ পিকাশোর শিল্পীজীবনে হয়ে উঠল স্মরণীয় বছর।

পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে প্রথম কিউবিক ছবি হিসেবে যার সমাদর, সেই 'Les Darnoiselles d' Avigon'-এর জন্ম ঐ বছরেই। আর তার পিছনে প্রধানতম প্রেরণা পিয়েরের ঐ চুরি করা মাথা দুটো।

এর পরের ঘটনা আমরা শুনবো অ্যাপোলিনেয়রের মুখ থেকে।

'১৯০৭-এ সে (পিয়ের) ল্যুভ্‌র্ থেকে চুরি করেছিল দুটো হিসপানি-রোমান স্টাচু, যা সে বিক্রি করে ক-কে, যার নাম, নিজেকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, কোনও সময়ে উল্লিখিত হয় নি এই (মোনালিসা চুরির) সংক্রান্ত ব্যাপারে। ১৯০৭-১৯০৮-এ আমি একাধিকবার ক-কে চাপ দিয়েছি—চল ও দুটো ফিরিয়ে দিয়ে আসি ল্যুভ্‌রে। তার উত্তরে ক আমাকে বলেছিল যে মূর্তি দুটো ভেঙে গেছে। দৈবক্রমে ভাঙেনি। ক নিজেই নাকি সেগুলোকে ভেঙে খুঁটিয়ে দেখতে চেয়েছিল আদিম ভাস্কর্যের ভিতরকার গোপন রহস্য। এই সব ভাস্কর্যের চিরায়ত শ্রীকে বুঝতে গেলে না ভেঙে নাকি উপায় নেই। আর এর থেকেই কিউবিজমের জন্ম। মূর্তি দুটো ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে আমি যে পদ্ধতি নিয়েছিলাম সেটা ছিল ক-এর পক্ষে খুবই নিরাপদ এবং সম্মানজনক। বোজার-এর একজন কর্তা-ব্যক্তি লুই লুমেতের সঙ্গে এই নিয়ে কথাবার্তাও হয়েছিল আমার। ঠিক হয়েছিল মূর্তি ফেরত দেওয়াটাকে নিয়ে আমরা একটা মজার সাংবাদিকতা করব। লে মত-র সঙ্গে কথাও হয়েছিল কি ভাবে তারা প্রচার করবে ব্যাপারটা। ল্যুভ্‌র্ যে কতখানি অরক্ষিত—যেন তারই প্রমাণ দেওয়ার জন্য এই চুরি। সময় থাকতে এ কাজটা করলে কোনো বিপদ ঘটত না। কিন্তু ক আসলে সেগুলোকে রাখতে চেয়েছিল নিজের কাছে। ১৯১১-য় সেই ছোকরা (পিয়ের) আবার ফিরে এল আমার কাছে, আমেরিকা থেকে। পকেট-ভর্তি টাকা-পয়সা। কিন্তু বেস খেলে দুদিনেই ভরা-পকেট খাঁ খাঁ। কানাকড়িও নেই। তখন আবার সে ল্যুভ্‌র্ থেকে চুরি করল আর একটা মূর্তি। তার তখন মাথা গোঁজার জায়গা নেই বলে, আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলাম নিজের কাছে। কিন্তু আবার মূর্তি চুরি করার পর যখন তাকে অনুরোধ করলাম মূর্তিটা ফেরত দিয়ে আসতে, আর কিছুতেই রাজি হল না সে, তাড়িয়ে দিলাম। এরই কয়েকদিন পরে ল্যুভ্‌র্ থেকে চুরি হল মোনালিসা। পুলিশ ভেবে নিলে—সেইই হচ্ছে চোর।'

মোনালিসা চুরি যাওয়ার পর অ্যাপোলিনেয়র আগাম বুঝতে পেরেছিলেন যে এবারে আর নিস্তার নেই। যে ভাবেই হোক পুলিশের নজর পড়বে

আমাদের দিকে। পিকাশোও বুঝলেন মূর্তিটাকে আগে-ভাগে ফেরত না দিয়ে খুবই ভুল করেছেন তিনি। এখন দুজনেই বিপন্ন। দুজনেরই হৃদ্‌পিণ্ডে আসন্ন সর্বনাশের দামামা।

ফার্ণান্দে অলিভার তখন পিকাশোর বান্ধবী। তাঁর লেখায় পিকাশো এবং অ্যাপোলিনেয়রের ঐ সময়কার মর্মান্তিক দিন-যাপনের ছবি—

'আমার পরিষ্কার মনে আছে যে ঐ সময়ে অ্যাপোলিনেয়র এবং পিকাশো দুজনেই দিন কাটাচ্ছিল এক ভীষণ যন্ত্রণায়। দুটি অনুতপ্ত বালকের মতো তারা তখন ফন্দী আঁটছে বাড়ি থেকে বিদেশে পালানোর। আমার জন্যে সেটা ঘটল না। প্যারিসেই রয়ে গেল আর খুঁজতে লাগল স্টাচু-দুটোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত যে, একটা সুটকেশে স্টাচু দুটো ভরে সেন নদীর জলে ফেলে আসবে গভীর রাতে। কোনো মতে পেটে কিছু পুরে, আর অর্ধেকটা রাত অপেক্ষায় কাটিয়ে মাঝ-রাতে দুজনে বেরিয়ে পড়ল সুটকেশটা হাতে নিয়ে। আর ভোরবেলায় সুটকেশটা হাতে নিয়ে ফিরে এল যখন, তখন তাদের বিধ্বস্ত চেহারা। সারা রাত তারা ঘুরেছে। কিন্তু সুটকেশটা ভাসিয়ে দেওয়ার মতো মুহূর্ত খুঁজে পায় নি একবারও। বার বার শিউরে উঠেছে হাজার রকমের দুঃস্বপ্নের মতো উদ্ভট সব আশঙ্কার। আর মনে হয়েছে কেউ তাদের অনুসরণ করছে পিছন থেকে। ওদের এই সব আতঙ্ক যদিও সংক্রামিত হয়েছিল আমার মধ্যে তবুও আমি কড়া নজর রেখেছিলাম ওদের গতিবিধির উপর। মনে পড়ছে সেন-এর উদ্দেশে বেরোবার আগে পর্যন্ত ওরা দুজনে তাস খেলেছে, ঠিক যেন কোনো বইয়ে পড়া ডাকাতি-গল্পের নকল করে। অথচ ওরা কেউ তাস খেলার অ-আ-ক-খও জানে না। অ্যাপোলিনেয়র সেদিন পিকাশোর ওখানেই রাতটা কাটাল। পরের দিন সকাল হতেই 'প্যারিস-জার্নাল'-এ ছুটল মূর্তি দুটো নিয়ে। 'প্যারিস জার্নাল' প্রতিশ্রুতি দিল নাম-ধাম গোপন রাখবে। গোপন রেখেই মূর্তি ফেরত পাওয়ার সংবাদটা ফলাও করে ছেপেছিল তারা। তবুও ধরা পড়তে হল অ্যাপোলিনেয়রকে।

দুই ইনস্‌পেকটার তাঁকে ট্যাক্‌সিতে চাপিয়ে সোজা এনে হাজির করলে ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসে। মঁসিয় দ্রিউ-এর এজলাসে শুরু হল এজাহার। ল্যুভ্‌র্‌ থেকে চুরি যাওয়া যাবতীয় স্টাচুর সঙ্গে জড়িত যে পিয়ের তার সঙ্গে অ্যাপো-লিনেয়রের ঘনিষ্ঠতার যথেষ্ট প্রমাণ এখন পুলিশের হাতে। সুতরাং চুরির লাভের বখরা অ্যাপোলিনেয়রেরও ভোগে এসেছে তাতে আর সন্দেহ কি?

ক্ষেপে উঠলেন অ্যাপোলিনেয়র এই অভিযোগ শুনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলেন যে চোরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর।

—কি নাম লোকটার?

—আইনের হাতে এমন কিছু নেই যা দিয়ে আমাকে আপনারা বাধ্য করাতে পারেন নামটা বলতে।

—এখন তাহলে একজন অপরাধীকে জেনে-শুনে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার অপরাধ আনতে পারি আপনার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে সই হয়ে গেল ওয়ারেন্টে। অ্যাপোলিনেয়র, চরম কোনো দুর্গতির আশংকায় ভীত হয়ে, সেই মুহূর্তে রাজি হয়ে গেলেন সত্য-স্বীকারে।

—হ্যাঁ, আমি ঐ স্ট্যাচু-চোরকে চিনতাম। সে বেলজিয়ামের ছেলে। কয়েক সপ্তাহের জন্যে সে ছিল আমার সেক্রেটারি। কিন্তু যখন জানলাম সে চোর, তাড়িয়ে দিই তাকে। আর তার চুরি করা জিনিস আমি নিজেই পৌঁছে দিই 'প্যারিস জার্নাল'-এ। আমার দোষটা তাহলে কি?

—অপরাধীর নাম?

—গেরি পিয়েরে।

অপরাধ স্বীকার করে অ্যাপোলিনেয়র ভেবেছিলেন মুক্তি। কিন্তু তার বদলে জুটল অন্ধকার সেল। সংবাদপত্রকে জানানো হল না সে সংবাদ। কেন? দ্রিউ-এর উত্তর—অপরাধীর ইচ্ছাতেই, যাতে কেলেঙ্কারিটা ছড়িয়ে না পড়ে, গোপন রাখা হয়েছিল। অবশ্য ২৪ ঘন্টা পরেই ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশ তার সঙ্গে জুড়ে দিলে আরও কিছু নতুন তথ্য।

অ্যাপোলিনেয়র গত রবিবার পিয়েরকে প্যারিস থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল স্টেশনে গিয়ে নিজের পয়সায় টিকিট কেটে দিয়ে।

কাগজে-কাগজে ফলাও করে সংবাদটা বেরোবার পরের দিনই 'প্যারিস-জার্নাল'-এ ছেপে বেরলো এক আশ্চর্য চিঠি। লেখকের নাম **'Baron Ignace d' Ormesan.'** আসলে গেরি পিয়েরে। নামটা অ্যাপোলিনেয়রই উপহার দিয়েছিল এক সময় পিয়েরকে, তার রাজকীয় চাল-চলন দেখে। পিয়েরে লিখছে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে। 'খুবই অনুতাপের বিষয়, এমনকি দুঃখেরও যে, অ্যাপোলিনেয়রের মতো একজন সদাশয়, সজ্জন এবং সৎ ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যেও যন্ত্রণাভোগ করবেন এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার অপরাধে, যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা পুরোপুরি সাহিত্য-ঘটিত।' এমন চিঠির পর অ্যাপোলিনেয়র মুক্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু আরো জেরার

জন্যে আটকে রাখা হল তাঁকে। পুলিশের সন্দেহের বহরটা বেশ লম্বা। গেরি পিয়ের লোকটা একটা আন্তর্জাতিক দুষ্ট-চক্রের সঙ্গে যুক্ত। ফ্রান্সে আসে লোকটা এখানকার মিউজিয়াম ফাঁকা করতে। মোনালিসা এখন ঐ লোকটারই বগলদাবায়। অ্যাপোলিনেয়রকে জেরা করলে অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে পিয়ের সম্পর্কে।

ইতিমধ্যে অ্যাপোলিনেয়রের মুক্তির দাবি জানিয়ে প্রতিবাদপত্র পৌঁছতে লাগল তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে। সে-সব প্রতিবাদপত্রে প্যারিসের নামকরা বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীদের স্বাক্ষর।

অ্যাপোলিনেয়রকে অন্ধকার সেল-এ বসিয়ে রেখে আমরা কিছুক্ষণের জন্যে একবার মুখ বাড়াব তাঁর প্রিয় সখা পিকাশোর দিকে। পিকাশোর জীবনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ার চেহারাটা কি রকম সেটা দেখে নিতে। আর তার জন্যে আবার চোখ পাতব পিকাশোপ্রিয়া ফার্ণান্দে অলিভারের স্মৃতিকথায়।

'প্যারিস-জার্নাল'-এ স্টাচুয়েট-দুটো দিয়ে আসার পরের দিন সকালেই অ্যাপোলিনেয়রের ঘুম ভাঙল পুলিশের ডাকে।...এসব ব্যাপার কেউই আমাদের জানায় নি। আমরা তার কোনও খবর পাই নি। খবর নিতেও সাহস পাই নি। হঠাৎ একদিন ঝমঝমিয়ে বেজে উঠল পিকাশোর দরজার ঘণ্টা। আমিই ছুটে গেলাম দরজাটা খুলতে। সাদা পোশাকের পুলিশ। আমাকে দেখাল তার আইডেনটিটি কার্ড। আর পিকাশোকে জানাল যে আজ সকাল নটায় তাকে হাজির হতে হবে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে। কাঁপতে কাঁপতে পিকাসো বদলাতে লাগল তার পোশাক। আমি এগিয়ে গেলাম হাত লাগাতে। ভয়ে যেন আধমরা। পুলিশের লোকটি অবশ্য বেশ ভদ্র, হাসিখুশি। কি করলে কি হবে সে বিষয়ে অনেক ভালো কথাই বলে চলল লোকটা। আমরা কান দিলাম না সেসবে। একদম বোবা। সাবধানের মার নেই। পিকাশো এরপর চলে গেল পুলিশের সঙ্গে। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পৌঁছেই পিকাশো দেখতে গেল অ্যাপোলিনেয়রকে। বিবর্ণ, বিধ্বস্ত। মুখে না-কামানো দাড়ি-গোঁফ। জামার কলার ছেঁড়া। শার্টটা ঘাড় পর্যন্ত খোলা। গলায় টাই নেই। বুনো-বুনো ভাব। দুদিন কেটেছে, আরও কিছুদিন কয়েদ-খানায় কাটাতে হবে এই আশঙ্কায় অ্যাপোলিনেয়র তখন মুক্তির জন্যে অস্থির। পিকাসো ভেঙে পড়ল এই দৃশ্য দেখে। আগে যত না

ছিল, এখন ভয়ের মাত্রা বেড়ে গেল তার দশগুণ। তারা দুজনেই শিশুর মতো কেঁদে উঠল পিতার বয়সী বিচারকের সামনে। অনেকে বলে পিকাশো নাকি ভয় পেয়ে সেদিন বলেছিলেন যে, অ্যাপোলিনেয়রকে চেনেন না। এটা সর্বৈব মিথ্যা। যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই কথা বলেছিলেন তিনি।

আদালতে পিকাশো-অ্যাপোলিনেয়র সাক্ষাৎকার নিয়ে বহুরকম মতামত। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব। এখন ফিরে যাই অ্যাপোলিনেয়রের কাছে।

১৩ সেপ্টেম্বর। বিকেল তিনটে। আদালতের বাইরে জনতা, সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর অনুরাগী বন্ধুদের ভিড়। অ্যাপোলিনেয়র সেই ভিড় ঠেলে বিচার-কক্ষে ঢুকলেন। হাতে হাতকড়া দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল অনেকেই। আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যখন জানল যে কয়েদখানা থেকে তাঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে সাধারণ বাসে। যেহেতু তিনি দরিদ্র, আর লেখাই তাঁর জীবনযাপনের একমাত্র রাস্তা, আর যেহেতু তিনি সত্যিই নিরপরাধ, সেই কারণেই সামান্য ভদ্রতা এবং সৌজন্যের ট্যাক্সি দুটোর কোনোটাই জুটল না কপালে। হয়তো ট্যাক্সি বরাদ্দ থাকে বাঘর-বোয়াল-দের জন্যেই শুধু।

জেরা আরম্ভের আগেই অভিযুক্তদের পক্ষের এ্যাটর্নিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল অভিযুক্তদের। অর্থাৎ অ্যাপোলিনেয়র ছাড়া 'মোনালিসা'র অপহারক সন্দেহে অন্যান্য ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে। পুলিশের ভাষায় 'এরা এক আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সদস্য'। এ্যাটর্নি-ত্রয় অভিযুক্তদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা তখন কানাকানি করছিল

—কী সাংঘাতিক জানো এই লোকগুলো।

—কেন?

—জেলখানায় বসে এরা উপন্যাস লিখেছে। এতেই বোঝা যায় কী রকম দাগি আসামী। সে উপন্যাসের অবশ্য মাথামুণ্ডু নেই।

জেলখানায় বসে অ্যাপলিনেয়র অবশ্য উপন্যাস লেখেন নি। লিখেছিলেন এক গুচ্ছ কবিতা।

এবার শুরু হল জেরা। প্রশ্নকর্তা মঁসিয় দ্রিউ। উত্তরদাতা অ্যাপোলিনেয়র।

—আপনি স্বীকার করেছেন যে আপনার জানা ছিল জিনিসটা চুরি

করা। তবুও আপনি তৃতীয় স্ট্যাচুটাও নিজের কাছে রাখলেন ১৪ অগাস্ট থেকে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত?

—অবশ্যই। ওটা ছিল পিয়েরের সুটকেশে। আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম সব কিছুকেই, মানুষটা, তার সুটকেশ, এমন কি সুটকেশের ভিতরে লুকনো সুটকেশ। তবে এটা আপনাকে হলফ করে বলতে পারি যে এর জন্যে মোটেই খুশি ছিলাম না আমি। আর ভাবতেই পারি নি যে এর ফলে আমি জড়িয়ে পড়ব সাংঘাতিক কোনো অপরাধের দায়ে।

—অপরাধী জেনেও তাকে এতখানি প্রশ্রয় দেওয়া আমার কাছে বেশ অস্বাভাবিক লাগছে।

—আমার বক্তব্যটা তাহলে শুনুন। পিয়ের মানুষ অল্প-সল্প, বলতে গেলে, আমারই তৈরি। তার অদ্ভুত আর খাম-খেয়ালী চরিত্রটাকে ভালোবেসেই আমার এক ছোটগল্পের নায়ক করেছি তাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে কি এক রকমের সাহিত্যিক-অকৃতজ্ঞতা দেখানো হতো না?

—আপনার সম্বন্ধে অভিযোগ—আপনি নাকি সম্প্রতি 'department of the Drôme'-এ একটি দুর্গ কিনেছেন?

—আপনি সম্ভবত স্পেনের ক্যাসেলটার কথাই বলছেন। ওরকম অনেক ক্যাসেলই আমি হাওয়া হয়ে যেতে দেখেছি।

অতঃপর দেড়ঘণ্টাব্যাপী জেরায় মঁসিয় দ্রিউয়ের শেষ মারাত্মক প্রশ্নবাণ—

—আমার কাছেই একটা চিঠি রয়েছে। সেখানে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে পড়বার জন্যে কয়েকটা বই চেয়ে নিয়ে এসে এখনও পর্যন্ত সেগুলো ফেরত দেন নি।

—আমার ধারণা বইগুলো আমাকে ধার দেওয়া হয়েছিল পড়ার জন্যেই। আমি এখনো সেগুলো পড়ে উঠতে পারি নি। যে মুহূর্তে পড়া হয়ে যাবে, ফেরৎ পাঠাব।

হাস্যকর জেরা-পাঠ শেষ হল এইখানে। অ্যাপোলিনেয়রের এ্যাটর্নি জোসে থেরী দরখাস্ত পেশ করে রেখেছিলেন আগেই। আমার মক্কেল নির্দোষ। তাকে অন্তত শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া হোক। মঁসিয় দ্রিউ অতঃপর স্বাক্ষর করলেন সে-দরখাস্তে। এখন তাঁকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হবে জাস্টিস প্যালেসে, মুক্তি দেওয়ার আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে সই-স্বাক্ষরের জন্যে। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। মুক্তি পেলেন অ্যাপোলি-

নেযার। অনুরাগীরা অপেক্ষায় অস্থির। সম্বর্ধনার জন্যে তাদের রক্তে টগবগ করছে উল্লাস।

৬

আনো-য নদী-সংক্রান্ত কাজে যখন ব্যস্ত কিংবা সরকারি গাফিলতিতে বিরক্ত, সেই সময় মনে পড়ে গেল যে তিনমাস পার। গিওকোণ্ডার অর্থাৎ মোনালিসার ফ্লোরেন্সে ফেরার সময় হয়ে গেছে। তাহলে আমি কবে ফিরব? দশ দিন পরে। দশ দিন পরে ফিরলে দেখা পাওয়াটা হবে সুনিশ্চিত।

যেদিন সকালে ফ্লোরেন্সে ফিরে এলেন লিওনার্দো, আকাশে-বাতাসে বসন্ত। আকাশে-বাতাসে সেই স্নিগ্ধতার মিশেল দেওয়া উজ্জ্বল আলো, যা ছিল মোনালিসার সবচেয়ে প্রিয়। প্রতিকৃতি রচনার জন্যে লিওনার্দোর কাছেও যা আদর্শ। এই আলো রূপসীদের মুখে মাখিয়ে দেয় এক অনির্বচনীয়তা। এই আলো এখন লিওনার্দোর চোখে এঁকে চলেছে মোনালিসার জীবন-পাত্র থেকে উপচে-পড়া নানা মাধুরী।

কি কথা হবে প্রথম দেখার দিন? কোন প্রশ্নটা হবে প্রথম? আমি প্রশ্ন করবো লিসা, সেদিন তুমি উত্তর দাওনি। আজ দিতে হবে। পৃথিবীর শেষতম সৌন্দর্য, যা নিহিত রয়েছে অন্ধকার গুহার অভ্যন্তরে, তাকে জানতে গেলে কৌতূহল ছাড়া আর কিসের প্রয়োজন হতে পারে?

লিসার সঙ্গে দেখা হবে হয়তো আজই। কিংবা কাল। সেই আনন্দে লিওনার্দো এখন বিভোর। ৫৫ বছরের প্রৌঢ় ১৬ বছরের যুবকের মতো স্বপ্নে-মাতাল। নদী-সংক্রান্ত কিছু জরুরি কাগজপত্র এখন তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে মিস্টার নিকোলোর কাছে। ফেরার পথে গিওকোণ্ডার খোঁজ নেবেন কি একবার? এসেছে কি আসে নি, বাড়ির চাকর কিংবা মালির কাছ থেকে জেনে নেওয়া শুধু।

রাস্তায় বেরনোর সঙ্গে সঙ্গেই হেঁকে উঠল হাওয়া। আচমকা এক তুমুল ঝড়। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর তারপরেই আচমকা রোদ। ভিজে, জল চিকচিকে পথ-ঘাটের উপরে রোদ যেন ছড়িয়ে দিচ্ছে গোলাপের পাপড়ি। লিওনার্দো চলেছেন। মগ্ন, আত্মস্থ। মেঘ ছিঁড়ে এক গোলাপী রঙের রোদ তাঁর ভিতরেও আলো ঢেলে চলেছে। আলো এবং সুখ। আর কিছুক্ষণ পরেই তিনি জেনে যাবেন মোনালিসার সংবাদ।

—মিঃ লিওনার্দো…মিঃ লিওনার্দো…

কাদের হাঁক-ডাকে ঘুরে তাকালেন তিনি। চেনা-অচেনা স্থানীয় লোকের জটলা। কাছাকাছি আসতেই প্রশ্ন

—মিস্টার লিওনার্দো, ডিভাইন. কমেডির এই ৩৫ নম্বর পদটা বড় খটোমটো। একটু বুঝিয়ে দেবেন দয়া করে।

আর ঠিক সময়েই কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো। লিওনার্দো ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। ঈষৎ কুঁজো হয়ে হাঁটা। যেন পিঠের উপর পৃথিবীর ভার। নিজে যে কুরূপ, সে বিষয়ে অতিরিক্ত সজাগ বলেই তিনি নিজের মুখটাকে লুকিয়ে রাখতে চান। তাঁর চোখের পাতায় চুল নেই। ফলে তাকালেই চোখের ভেতর থেকে ঠিকরে পড়ে এক ধরনের ঝলসানো অন্ধকার। আলোর দিকে তাকাতে বড় কষ্ট হয় মাইকেলেঞ্জেলোর। এমন কি রাত্রেও। কাজ করার সময় চোখের উপরে বেঁধে নেন একটা আচ্ছাদন। লিওনার্দোর সঙ্গে মাইকেলেঞ্জেলোর মন-কষাকষি বহুদিনের। বহুবার বিতর্ক বেধেছে দুজনের মধ্যে। বিতর্ক গড়িয়ে গেছে ডুয়েল লড়ায়ে। কিন্তু আজ লিওনার্দোর মন ছিল প্রশান্ত। মোনালিসার সঙ্গে দীর্ঘ তিনমাস বিচ্ছেদের পর কাল কিংবা পরশু দেখা হবে, এই বোধ তাঁর ভিতরটাকে মেঘহীন আকাশ করে রেখেছিল। অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতিময় কণ্ঠস্বরেই তিনি বললেন

—মিঃ বোনারোত্তি দান্তের কবিতা সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ। আমার চেয়ে উনিই আপনাদের পারবেন অনেক ভালো করে ব্যাখ্যা করতে। ওঁকেই অনুরোধ করুন।

মাইকেলেঞ্জেলোর বুকে বিষ মাখানো তীরের মতো বিঁধল এই কথাগুলো। লোকটা আমাকে অপমান করতে চাইছে সকলের সামনে। প্রথম কিছুক্ষণ স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে, তাঁর চেয়ে দীর্ঘ এবং বলবান লিওনার্দোর স্নিগ্ধ হাসিকে বিদ্রূপ ভেবে নিয়ে, জ্বলে উঠল যেন দাবানল।

—তুমিই ব্যাখ্যা করো ওটা। ওহে মহাজ্ঞানী। ১৬ বছর ধরে একটা ব্রোঞ্জের ঘোড়ার মডেল তৈরি করে এখনো ঢালাই করতে পারলে না। কোনো কাজই তো শেষ করতে পার না তুমি। পার?

আরো আগুন উগরোনোর ইচ্ছে ছিল মাইকেলেঞ্জেলোর। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু না আর কোনো কিছু না বলেই মাইকেলেঞ্জেলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন মৃদু বৃষ্টির সোনালী গুঁড়ির ভিতরে। লিওনার্দোও

সবটা সয়ে গেলেন নীরবে। কারণ তিনি জেনে গেছেন—'অপমানের বদলে ধৈর্য শীতের সময় গরম কাপড়ের মতো কাজ করে।'

লিওনার্দো শুরু করলেন হাঁটা। চলেছেন উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে। কে যেন আসছে পিছন পিছন। একটা হাড়গিলে মার্কা মানুষ। নাম জানেন না। কিন্তু মুখটা চেনা। গুজব আর কেচ্ছা রটিয়ে বেড়ানোই লোকটার ধ্যান-জ্ঞান। চট্ করে দেখলে মনে হবে হিক্র। আসলে ফ্লোরেন্সেরই লোক। কি যেন বলতে চাইছে লোকটা। ক্রমশ এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

—মশায়, আপনার সেই গিওকোণ্ডার ছবিটা বোধ হয় এখনো শেষ হয় নি?

—না। শেষ হয় নি। কিন্তু তাতে আপনার কি দরকার?

—না, দরকার কিছু নেই। এমনি জানতে ইচ্ছে করল আর কি। তিন বচ্ছর ধরে আপনি কাজটা করছেন অথচ এখনো শেষ হল না। কিন্তু মশাই, একটা কথা বলব, শেষ না হলেও, যা হয়েছে, এর চেয়ে ভালো পৃথিবীতে হয়নি কখনো।

লিওনার্দো ঘুরে তাকালেন। মুখে বিরক্তি। চোখে রাগ। লোকটার বদ মতলব আছে নাকি কিছু। লিওনার্দোর ভ্রুকুটি দেখেও সহযাত্রীটি দমল না এতটুকু।

—তা সে যাই হোক, ছবিটার ভাগ্যে যে কী আছে ভগবানই জানেন। তা মশাই, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন খবরটা…। হা ঈশ্বর। সত্যিই তো, জানবেনই বা কি করে। আপনি মশাই তো সবে আজ সকালে পৌঁচেছেন ফ্লোরেন্সে। ঈস্ কী দুর্ভাগ্য মিস্টার গিওকোণ্ডার, ভেবে দেখুন একবার। এই নিয়ে তিন-তিনবার বিপত্নীক হলেন তিনি। হ্যাঁ, তা প্রায় মাস খানেক হতে চলল মোনালিসা মারা গেছে। ঈশ্বরের যে কী অভিপ্রায়।

সূর্য কি ডুবে গেল নাকি? ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি পৃথিবীতে? তাহলে এত অন্ধকার কেন সামনে? কেন মনে হচ্ছে মাটিতে পড়ে যাব এখুনি। আর ঐ খেঁকুটে মার্কা শয়তানটা শিয়ালের মতো ধূর্ত চোখে কি খুঁজছে আমার মুখে? আমি কতটা শোকার্ত? আর সেটা জেনে নিয়ে কাল সকাল থেকে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে শহরময়। ওহে জান, বানিয়ে বানিয়ে যেই না বলেছি মোনালিসা মারা গেছে, লিওনার্দোর মুখটা হয়ে গেল যেন পায়রার পালকের মতো সাদা। মিথ্যে কথা বলছে লোকটা। মিথ্যে।

মোনালিসা মারা যেতে পারে না। কিন্তু আমার মুখটাকে প্রসন্ন করে রাখব আমি। একটা মিথ্যে রটনায় জড়িয়ে শোকার্তই বা হব কেন?

কিন্তু সত্য ঘটনাটা জানতে পেরে গেলেন সেদিন রাত্রেই। ক্যালাব্রিয়া থেকে মিস্টার গিওকোণ্ডা চলে এসেছিলেন ছোট্ট শহর লাগোনেগ্রোতে। ভেড়ার কাঁচা চামড়া চালানের একটা বড় রকম ব্যবস্থা করেছিলেন সেখানে, ফ্লোরেন্সে চালান দেওয়ার। ঐখানে এসেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে মোনালিসা। আর তারপরই..

আর শুনতে চান না লিওনার্দো।

ডুবে—ক্রমাগত ডুবে যাচ্ছেন তিনি কনকনে এক বরফের নদীতে। মৃত্যু-মৃত্যুভয়—মৃত্যুশোকই শুধু হতে পারে এমন শীতল—এমন সর্বনাশা শীতল—এমন রক্তচাপহীন—এমন· ·

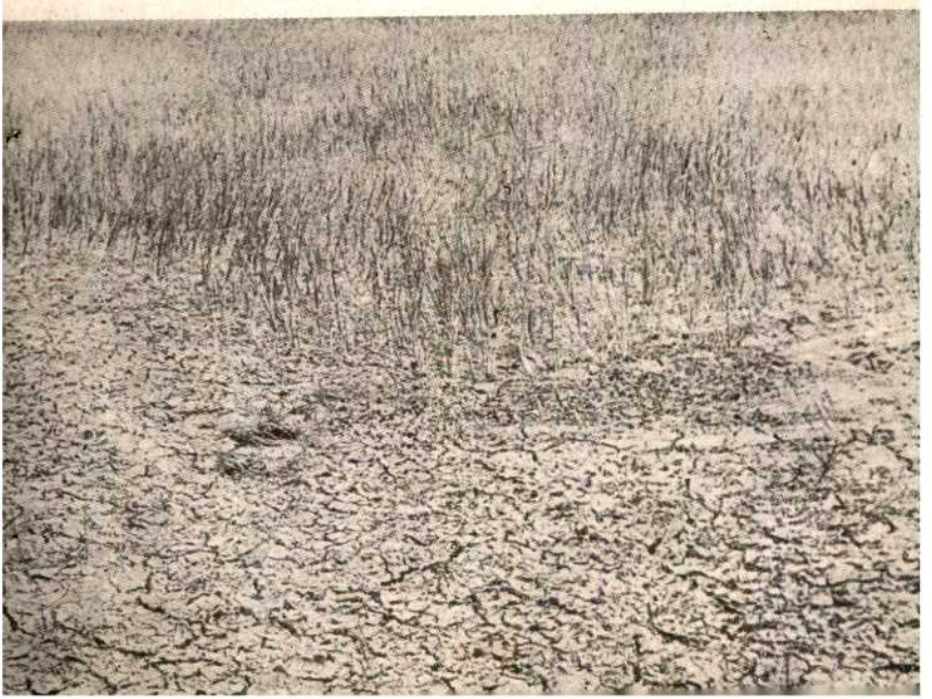

খরার ডায়রি

অজয় দে

প্রচণ্ড গরমে কলকাতায় বসেই যখন ছটফট করছি, আর গ্রামাঞ্চলের ভয়াবহ খরা ও দুর্যোগের খবর কানে এসে পৌঁছচ্ছে, ঠিক তখনই গ্রামের মানুষের দুর্দশার খবরাখবর ও তার ফটো তুলে আনার ডাক পড়ল। ফটো তোলা যার বৃত্তি, তার কপালে এরকম ঘটবেই। গত বছরই তো, আজ যাদের ফটো তুলতে যাব, তাদের অনেকেই ছিল বন্যা-কবলিত—তখনও তাদের ঐ আরেক ধরনের দুঃখের ছবি তুলতে আমাকেই যেতে হয়েছিল।

নানা সূত্রেই সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা আমাকে ক্যামেরায় ধরতে হয়। এটা আমার পেশা বলেও বটে, তা ছাড়া মানবিক টানও একটা নিশ্চয় থাকে। তবু, নিষ্ঠুর দারিদ্র্য ও কষ্টের মুখোমুখি ক্যামেরার ঐ নির্বিকার জোরদার লেন্স ফেলে ফেলে ফটো তুলে-যাওয়া স্নায়ুর ওপর মস্ত বড় একটা চাপ। নিজেদের অভাব-অভিযোগ সুবিধা-অসুবিধাগুলোকে মনে হয় তখন কি তুচ্ছ! নিজেকে মনে হয় রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছি।

কিন্তু যেতেই হয়। ক্যামেরা, বেশ কিছু ফিল্ম এবং নানা রকমের লেন্স নিয়ে ২১শে মে তারিখে ময়ূরভঞ্জের তিরিং-এর দিকে রওনা দিয়েছিলাম জিপে। কলকাতা ছেড়েছি বেলা দুটোয়, তিরিং-এ পৌঁছলাম রাত পৌনে দশটা নাগাদ। রোম্বে রোড ধরে যেতে-যেতে পথে অবশ্যই পড়েছে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পাঞ্জাবিদের ধাবা, সেই বাবদ কোলাঘাটে কিছুক্ষণ। দেখতে-দেখতে চারপাশের ভূ-প্রকৃতি পালটে যেতে থাকে, দামোদর ও রূপনারান এলাকার স্নিগ্ধ ও সজল সবুজ আস্তে-আস্তে উবে যায়, গাছপালা ক্রমশ কমে যেতে থাকে আর লোধাগুলিতে পৌঁছতে পৌঁছতে তো মাটি রুক্ষ ও লাল। সেখানেই ৫-২৫ নাগাদ চা পান সেরে নেওয়া গেল। লম্বা পথে এ-রকম মাঝে মাঝেই ড্রাইভারকে ফুসরৎ দেওয়াটা ভালো, বোধহয় দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

ক্রমে বাংলা-বিহার সীমান্তে পৌঁছলাম। বাংলার গ্রাম চিচিরা ছেড়ে, রংঘর খাল পার হয়ে বিহারের গ্রাম দারিশোলে সন্ধ্যে ৬টায়। বোহার-গোরাতে পেট্রোল ভরে নিয়ে আমরা উড়িষ্যায় এসে পৌঁছলাম জাকার-পুরিয়াতে। ৭টায় বাংরিপোসি। বাংরিপোসি ঘাটি বেয়ে রাইরাংপুরের

দিকে। এই বাংরিপোসি ঘাটির দৃশ্য ভারি মনোরম, যদিও ১৫০০ মিটার উঁচু এই পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে গাড়ি চালানো, বিশেষত রাত্রে, খুবই বিপজ্জনক। একটু ভুল হলেই জিপ গিয়ে পড়বে খাদে বা জঙ্গলে, অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যু। এখনও নাকি এই সব জঙ্গলে নেকড়ে, চিতাবাঘ, সম্বর, হাতি আছে কিছু কিছু—কিন্তু সৌভাগ্যই বলতে হবে আমাদের চোখে পড়ে নি। বোধহয় রাত তখনও বেশি গড়ায় নি বলেই। বিসোই দিয়ে আমরা এলাম ময়ূরভঞ্জের জেলা সদর বাইরাংপুরে, ৮-৪৫ নাগাদ। ওখানে রাতের খাওয়া খেয়ে নিয়ে আবার চলা। সারা শরীরে ক্লান্তি। রাত ৯-৪৫-এ তিরিং-এ এসে আজকের মতো যাত্রা শেষ। ওখানেই ঘুমোব। যদিও গরম, দামি ক্যামেরা ও লেন্স নিয়ে দরজা-জানলা খুলে শোব কিনা ইতস্তত করছি, স্থানীয় ব্যক্তিরা আশ্বাস দিলেন, এখানে ওসব ভয় নেই। এ সব কথা শোনাও কানের আরাম।

তিরিং, ২২শে মে

সকালে পাত্র করে জল নিয়ে মাঠে যেতে গিয়ে একটু বিব্রত, কারণ এপাশে-ওপাশে কিছু অল্পবয়সী মেয়েরা বেশ গল্পগুজব-হাসাহাসি করতে করতে কাজ সারছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। যস্মিন দেশে যদাচার, অতএব অকুতোভয় এগোতেই হল। ওরা কিন্তু নির্বিকার। এই অনিবার্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় বিকার চলে না।

৬টা নাগাদ বেশ ভালো নাস্তা সেরে ক্যামেরা নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রে ঢুঁ মারতে যাওয়া হল। যে-সংস্থার উদ্যোগে আমাকে যেতে হয়েছিল, তাদের উদ্যোগে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য'র নানা পরিকল্পনা, বিশেষত দুর্লভ জল সংগ্রহের বিধিব্যবস্থা—এসব দেখতে এবং ফটো তুলতেই আমার আসা। পুরো এলাকাটায় একবারই ফসল হয়, যদি অবশ্য প্রকৃতির দাক্ষিণ্য মেলে। আর প্রকৃতি যেবার কৃপণ, দুর্ভিক্ষ হানা দেয় ঘরে ঘরে, বেহাই পায় কিছু বড় জোতদার বা কুসিদজীবী। খরার দিনে নিরুপায় মানুষ জীবিকা-অর্জনের জন্য জঙ্গলের গাছ কাটতে শুরু করে, যেটুকু জঙ্গল এখনও অবশিষ্ট আছে তা বিলীন হতে থাকে। ফলে এই হতভাগা লোকেরা জানে না আরো খরাকেই তারা নেমন্তন্ন করে আনছে।

প্রথমে গেলাম নারাদি গ্রামে ওখানে একটা 'পুষ্টি কেন্দ্র' খোলা হয়েছে। স্বভাবতই সেখানে অপুষ্ট শিশুর ভিড়—মায়েরা চর্মসার বাচ্চাদের নিয়ে,

ধুঁকতে-ধুঁকতে বুড়োরা লম্বা কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' যেখানে, সেখানে তো দেখার মতো দৃশ্য : শয়ে শয়ে স্ত্রী-পুরুষ উদয়াস্ত খেটে রুক্ষ পাহাড়ি জমি খুড়ছে, শুকিয়ে যাওয়া দিঘিকে আরো গভীর করতে চাইছে—আশা, বৃষ্টি তো আসবেই, আগামী খরাতে একটু বেশি জল জমা থাকুক। কিন্তু কে জানে, প্রকৃতি কি করবে? কতকগুলি বাঁধ বা দিঘির নাম ভারি সুন্দর—গীতিলতা, সিকদি, বসন্তপুর। যে কামিনরা কাজ করছে এখানে তাদের নামেও এরকম কবিত্বের ছোঁয়া—মালাবতী, লীলাবতী, সুন্দরী এই সব। পথে শুকনো পুকুর বা বাঁধ, অতলান্ত কুয়ো, পাহাড়ি নদীর শুকনো খাত দেখতে দেখতে চলেছি—পাহাড়ে-জঙ্গলেও গাছপালাও যেন জ্বলে গেছে। এখানে-ওখানে শুকনো নদী-খাতে গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে প্রখর রোদের নীচে ঠায় বসে-বসে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বিন্দু বিন্দু জল জমিয়ে তৃষ্ণা মেটানোর পথ করতে চাইছে।

আমাদের জিপের ইঞ্জিনের তাপযন্ত্র বিপদসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত তল্লাট যেন একটা জলন্ত চুল্লি। বাইরে একটি লোকও নেই, এমনকি রাস্তার কুকুরও নেই—তারই মধ্যে দেখা যাচ্ছে একজন নিঃসঙ্গ রমণী জলের পাত্র নিয়ে হেঁটে চলেছে, কোথায় যাবে, হয়তো এক বা দু-মাইল দূরে কোথাও জলের সন্ধানে।

জল-সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময় অবশ্য ভোরে, খুব ভোরে। কিন্তু মধ্যদিনে যদি জল ফুরিয়ে যায়, তবে তো ভুগতেই হবে।

এরকম তীব্র রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুর অবশ্য আমাদের ফটোগ্রাফারদের পক্ষেও খারাপ। ভালো ফটো তোলা যায় না। ৩-টে নাগাদ আমাদের ডেরায় ফিরলাম। বিকেলে যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে এবং আবহাওয়াও একটু ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, আমরা অন্যান্য কেন্দ্র দেখতে গেলাম। কোথাও কোথাও কাজের বিনিময়ে দেওয়া হচ্ছে গম। ১০০ ঘন ফুট মাটি খুঁড়ে ওরা পায় ৫ কে. জি. গম এবং নগদ একটি টাকা। দৈনিক মজুরির স্থানীয় হার আরো কম, যদিও সরকার নিম্নতম হার স্থির করে দিয়েছে ৫ টাকা।

রাত্রিবেলা আরো বিষণ্ণ দৃশ্য আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রায় সারা তল্লাটের লোক—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে—বসে গেল মহুয়ার পাত্রের সামনে। তিরিং-এ, এমনকি অঞ্চল-প্রধানের বাড়িতেই, তার শ্যালক এরকম মহুয়া বিক্রির দোকান খুলে বসেছে। ফলে অঞ্চল-প্রধানের সঙ্গে এ নিয়ে যখন আলোচনা উঠল, তখন তিনি কি বলবেন তা তো জানা কথাই।

২৩শে মে

সকালেই ঝাড়গ্রামে যাওয়ার পথে বোহারগোরা-তে চা খেতে নামা হল। বাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে এবং কিছু বুড়ি মাত্র দেড় টাকা শ-যে পাতায় তৈরি 'টোঙা' বিক্রি করছে দোকানদারদের কাছে। জঙ্গল থেকে পাতা কুড়িয়ে ১০০টা টোঙা বানাতে প্রায় সারা দিন লেগে যায়। উপার্জন বড় জোর দু-টাকা। ৯টা নাগাদ ঝাড়গ্রামে—গোপীবল্লভপুর এলাকার কাজকর্মের এটাই কেন্দ্র। সেই বিখ্যাত গোপীবল্লভপুর—সারা শরীরে একটা ভয় এবং বিষাদ খেলে যায়। জনসংখ্যার অধিকাংশই আদিবাসী—সাঁওতাল, মাহাতো, লোধা ইত্যাদি। কথাবার্তা চালানো খুব কষ্ট। ঐ এলাকাতে ঢোকার বা বেরোবার পথ একটাই, কিছুটা পাকা। বাদ বাকি ধূলিধূসরিত কাঁচা পথ জমির উপর দিয়ে, বর্ষাকালে দুর্গম। জলাভাব প্রচণ্ড, সেচ-ব্যবস্থা বলতে প্রায় কিছুই নেই। শুনে অবাক হলাম, জমির ৩০/৪০ ফুট নীচেই জলের স্তর। অথচ গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে কষ্টের সীমা থাকে না। খরার সময় হলে তো কথাই নেই।

আমার সঙ্গী যুবা জানালেন, এখানে কলকারখানা নেই বটে, কিন্তু রঙেড লেবার আছে ছদ্মবেশে। অদক্ষদের জন্য তার হার হল ৪০/৫০ কে-জি ধান বছরে আর দক্ষদের জন্য উপরি একপেট খাওয়া। নারীদের ক্ষেত্রে হারটা আরো কম, ৩০ কে-জি, বছরে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প তবু তো নিশ্চিত অনাহার থেকে বাঁচিয়ে রাখছে এই অঞ্চলের এই সব মানুষদের। পুষ্টি-কেন্দ্রগুলি ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অন্ধত্ব বা আরো নানা ধরনের অপুষ্টিকে দূর করতে চাইছে। তবে আসল সমস্যার তুলনায় সে কতটুকু!

২৪শে মে

তারপর যাওয়া হল মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল এলাকায়। ওখানেই রোহিণী নামক গ্রামে পঞ্চায়েতের অফিস 'যামিনী ভবনে' রাত কাটালাম। এর চেয়ে আর কি মিষ্টি নাম হতে পারে একটা গ্রামের? একদা জমিদারের ছোটমেয়ের নাম ছিল নাকি রোহিণী—যৌতুক হিসেবে পুরো তালুকটাই তার নামে দেওয়া হয়—তাই এই নাম।

সাঁকরাইল এলাকায় সুবর্ণরেখার তীরে কস্তুরিয়া গ্রাম, কুটিসাই গ্রাম ইত্যাদি জায়গায় এখনও নীলকুঠির ভগ্নস্তূপ চিহ্ন রয়েছে। এখানকার জমিদাররা অবশ্য নীলকুঠি সাহেবদের চেয়ে কম অত্যাচারী ছিল না।

সাঁকরাইল ও গোপীবল্লভপুরের জমিদার-পরিবারগুলির মধ্যে প্রায়শই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল। এখনও আছে। এই সব পরিবার থেকেই গত ৩০ বছর ধরে এ-এলাকায় এম. পি. ও এম. এল এ. হয়েছে। তার ফলে উন্নতি যা হয়েছে তা আর বলার নয়—যোগাযোগব্যবস্থা প্রায় নেই, পয়ঃপ্রণালী বা ভূমি-সংস্কার এই সব কথা এখানে প্রায় অজ্ঞাত। বিদ্যুতের কথা তো ওঠেই না। প্রকৃতির হাতেই বাঁচা মরা। জঙ্গল ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। আর মাটি ক্রমশই শুকনো।

বগরা গ্রামের ডাক্তার গিরিজা কুমার মণ্ডল - কোনো ডিগ্রির জোরে নয়, জনৈক এল-এম-এফ ডাক্তারের ছেলে হিসেবে কম্পাউণ্ডারি করার অধিকারে ডাক্তার—আমাকে বললেন, তাঁর ৫৪ বছরের জীবনে এবারের মতো খরা কখনো দেখেন নি। তাঁর চোখের সামনে থেকে শৈশবের সবুজ কিভাবে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সে কথা বলতে বলতে তাঁর চোখে বিষাদ নেমে আসে। এই মৃদু-স্বভাবের 'ডাক্তারটি' রুগীদের ওষুধ দেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বেশি নির্ভর ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানানোয়। তিনিও, যখন শুনলেন, এই বিশ্বেরই কোনো-কোনো দেশে এর চেয়েও শুকনো জমি, এমনকি মরুভূমি পর্যন্ত, সরস হয়ে উঠছে মানুষের বুদ্ধি ও কর্মপ্রচেষ্টায়, এই অশ্রুতপূর্ব কথায় হতবাক্ হয়ে যান।

২৫শে মে

সকালে আবার ঝাড়গ্রাম। লোধাগুলি আর-একবার ঘুরে আসা গেল। রাত্রে ঝাড়গ্রাম থেকে সোজা ইস্পাত এক্সপ্রেসে চড়ে আলোকিত কলকাতায়। কিন্তু মন থেকে অন্ধকার কি করে দূর করা যাবে।

মহালয়ার রাত

বিশ্বনাথ বসু

উনিশ বছর পর ও যখন ফিরে এল তখন বেশ মোটাকাটা, তরতাজা হাত-পায় পাতা আর গালে মোলায়েম আভা—ব্রণের দাগগুলো অত চোখে লাগে না ; যেন পাকা চুলে কলপ, বা পুডিং বার্নিশে জেল্লা ফেরানো ঘুনে আসবার। আর ওর তখন একমাত্র কষ্ট—সর্বক্ষণ মাথার ভেতর তুষের মতো জ্বলেপুড়ে যায়। উগ্র ওষুধ ও এতদিন ওর দেহে যে-কাটাছেঁড়া করা হয়েছিল সম্ভবত এ তারই বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ও যখন স্নান করার জন্য খালি গা হতো, তাকানো যেত না—পিঠ জুড়ে ভয়াবহ অস্ত্রোপচারের দাগ, যেন রণাঙ্গনে উপুড় হয়ে পড়ে যাওয়া সৈনিকের মেরুদণ্ড বরাবর বেয়নেটে চিরে ফেলা হয়েছিল। পরে অবশ্য শিউরে উঠতে হতো না। অভ্যাস হয়ে গেল। যেন ওগুলো ওর জন্মচিহ্ন।

কুয়োতলায় জঘন্য পেছল। এক-বিঘের পাতকুয়ো আর ভাঙা, ঠাণ্ডা, শ্যাওলা-পড়া কতগুলো ইটপাথর পড়ে আছে ও জল গড়িয়ে উঠোন স্যাঁতসেঁতে। মাটির ভাপে বুকে প্রদাহ হয়। নালার পাশে মাঝারি উচ্চতায় ঘন হয়ে ওঠা সিন্দুরা আমগাছ। বৈশাখেই আমগুলো এত রাঙা হয়ে ঝোলে যে জিভে জল আসে। কিন্তু এমন টক যেন দাঁত পড়ে যায়। ঐ আমগাছ ও কুয়োপাড়কে আড়াল দিতে টাঙানো নয়া ধারার বেড়া। তবে বেড়া ভাঙা বা টেনে নিয়ে যাওয়ার উপদ্রব নেই। তারপর চাইলা কাঁঠাল, চিনিচাঁপা কলা ও বাসক, ঢেঁকি, ডুমুর, শ্যাওড়ার জংলায় ছালা-ঝোলা পায়খানা, সুপুরির লাইন, কবমচা, মজাডোবা, ছাইগাদা, ওল, নড়বড়ে রান্নাঘর ও হরিষ্যির আংশাল আর পশ্চিম থেকে উত্তরে থাকবার ঘর, পূর্ব থেকে দক্ষিণে এককাঠা তরকারির অ-নিড়ানো ক্ষেত—স্বর্ণগন্ধা ও বিশল্যকরণীর ঝাড়।

ও অঞ্চলটা দেশবিভাগের পর বেড়ে-ওঠা উদ্বাস্তু কলোনি। ক্রমে পাকা ঘরবাড়ি—টানাটানা পিচগলি-পাঠশালা-হাইস্কুল-ডাকঘর ও মেটার-নিটি হাসপাতাল স্থাপিত হওয়ায় টাউনের আভাস এলেও বরং যেন মফস্বল : মহকুমার বড় বন্দরের মতো। সপ্তাহান্তের মতো একটা বাজারও

আছে—বউবাজার। চতুর্দিকে সকাল-সন্ধ্যার রৌদ্র বন্ধ-করা অজস্র গাছ-পালা—ঘন বর্ষায় ডিপড্রেন-রাস্তা ও ডোবা-উপচানো জল, জলে ভেলা-সাঁতার, জাল-বড়শি কোঁচে মাছ ধরা ও বৃষ্টিধৌত বাঁশবনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে ওঠা আর শীত পড়তেই ধেনো গন্ধ—খড়ো উষ্ণতার মধ্যে যাত্রাগান-অষ্টপ্রহর-সংকীর্তন-চড়ক-জপতপ-ব্রতপরব-ছুৎমার্গিতা-জেতো বড়াই-গড়িমসি-ল্যাঙালেঙিতে কলোনি এখনও যেন গ্রাম্য ও বৈষ্ণব।

আইশা, আশুর, অসুখ সম্পর্কে নানারকম কানাঘুষা বা রটনা ছিল। নাপিত বুড়ি বলে বেড়াত 'আইশাডা কিন্তু খুব ভালো আছিল্। ভালো বল খ্যালাইত। বল বেজায়গায় লাগনেই তো ওমন দুর্দশা। ধুর!—আরে বলটা গিয়া ওর শিবদাঁড়ার হাড়ে লাগছিল। হাড়েই জ্বর। অসুখডা আর ভালো হওনের না। আহা। তোরা তো দেহস নাই। কি রূপটাই না আছিল রেচারার যেন সাক্ষাৎ কেষ্টঠাকুর। কি রকম যাত্রা কইরছে আর কী চমৎকার যে বাঁশি বাজাইছে চেংড়াটা। মাইয়া বউরা উন্মনা হইত। এহনে মাগি গো কত দেমাক। ক্যারে?' আর যারা ওর সমবয়স্ক বা ছোটবড় তাদের মতে—নাপিতের মেয়েকে বিয়ে করেছে ওর এক বিলেটিভ। সে জন্যই বুড়ির অত দরদ। ব্যাটা বদ। এখান দিয়ে একটা বউ যায় না—ঘটকদের বউ? চরিত্র ভালো ছিল না। ওর সাথেই আইশার লটর-পটর। হঠাৎ মহিলার হল অসুখ। তখন তো কেউ কাছে যায় না। আইশাই যায়। কিন্তু রোগ ভালো হয়ে মহিলার বিয়ে হয়ে গেল। আর আইশাকে পাঠানো হল কাঁচড়াপাড়ায়। মানে, আইশা হল প্রায় দেবদাস। অন্যরা, বিশেষত যারা রাজনীতি ছেড়েছে বা রাজনীতির বুড়ি-ছোঁয়া হয়ে আছে, তারা বলে—আশু প্রচণ্ড রাজনীতিতে মেতেছিল। আর করত জোড়া বলদের কংগ্রেস। স্নান নেই খাওয়া নেই—এক হুজুগ। গ্রামগঞ্জে রাত বিরাত কাটাত। অসুখটা ধরল একেবারে যখা মাসানের মতো। তবে কবে থেকে তা কেউ জানে না। এমন কি যখন কাশের সাথে রক্ত পড়ছে তখনও। বর্বরের মতো চেপে রাখা হয়েছিল। কি করবে? ঘরে কুরূপা বোন আর এই শুচিবাইগ্রস্ত সমাজ। তার উপর বুড়োবুড়ির আগরম বাগরম। শেষে যখন বাড়াবাড়ি হল অগত্যা হাসপাতালেই ভর্তি করতে হয়। আর পাঁচ বৎসর পর দুরূহ অপারেশনের জন্য পাঠাতে হল কাঁচড়াপাড়া।

পাড়াপড়শিদের ওর এখন আর যেন সহ্য হয় না। ও কাউকে গ্রাহ্যও

করে না। এত বৎসর যাবৎ কলকাতার কাছে অমন হাসপাতালে থেকে ওর রুচি অভ্যাসের যে-পরিবর্তন ঘটে গেছে তা এই অবস্থান্তরে আর যেন অভিযোজ্য নয়। প্রত্যাবর্তনের পর ও একেবারে অন্য রক্তের ও একা। আইশা আসলে যেন হাসপাতালের ঘাঘি হয়ে গিয়েছিল। ওখানে ইউনিয়ন করত—গান গাইত—নার্সদের সাথে জমাত ইত্যাদি? তাই ওর মধ্যে এখনও, হাসপাতাল বয়ে গেছে যা ফুসফুসের মতো, বের করে এনে বদলে দেওয়ার মতোই দুরূহ তীক্ষ্ণ কাজ।

রোজ সন্ধ্যায় ও কড়া ইস্ত্রি করা শার্ট-প্যান্ট পরে বেড়াতে বেরুত। সারাদিন শুয়ে-বসে থাকবার অনড়তার পর রাস্তায় হাঁটতে ওর ভালো লাগত। বউবাজার ছাড়িয়ে কাদোরাড়ির নির্জন ঠাণ্ডা রাস্তায় ও চলে যেত। চলতে চলতে ধানক্ষেত-বাঁশঝাড়-লাউলতা ও মদের জগের মতো লাউ—সুগন্ধা সাবানের জলের মতো নরম নীলাভ মাঠের নদী, ব্রিজ—কত শত বছরের শান্ত উদাস মসজিদ। এবং তারপরই আচমকা হয়ত ক্ষতবিক্ষত খাদকাটা-খোপকাটা অপোড়া পোড়া ইট-ঝামা ও চোঙওয়ালা ইটাভাটা। এই সব গ্রামগুলোও একসময় ওর কাছে মেকয়াঘোনার দুধের জামবাটি ধোয়া জলের মতো ছিল। আর এখন যেন ফেনাইলের গন্ধও পাওয়া যায়। আইশা ওদের ভাষা ও ছ্যালকা প্যালকার স্বাদ সব ভুলে গেছে। তবু যেন নীল পাখি ওড়ে?

তাছাড়া ও আদরপাড়ায় যেত। রোজ সন্ধ্যায় ও-বাড়িতে আড্ডা জমত। ও-বাড়ির ছোট ছেলে ভজন, ভজনের বাইরের ঘরে সোফা-বেতের চেয়ার-টি টেবল-এ্যাশট্রে-উষা ফ্যান-রেকর্ড প্লেয়ার-রেডিও আর কুরুশের কাজ করা গিটার—জ্যোৎস্না রাতে তারের উপর দিয়ে ঘষামাজা চলে ও ঝুঙঝাঙ শব্দ হয়। এটা হল আইশার পিসতুতো বোনের ছোট ঠাকুরপোর সংসার। ভজন ওদের পার্টির লোকও বটে। ভজনের লাভম্যারেজ করা ক্লাশমেট বউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শালকুঞ্জে উদ্দাম প্রেম ও তারপর বিবাহ—এ ব্যাপারে সমসাময়িকদের মধ্যে ভজনই একমাত্র সার্থক। কারণ ভজন টাকা, রেজাল্ট, ভবিষ্যত বা জাতপাতের মায়া করে নি। বিয়ের বছরেই এরা পৃথগন্ন। আপাতত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাই সারাদিন ওদের বারান্দা-ঘরে বোবা স্বস্তি আর সন্ধ্যার পর ওরা সব আসত। দয়াপরবশত ভজনই ওকে ঐ আড্ডায় নিয়ে যায় ও আস্কারা দেয়।—'বাড়ির মধ্যে বসে থাকেন কেন? ঘুপচিতে বসে বসে থাকলে শরীর আবার নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'সন্ধ্যায় বেড়াই'।—'ওদিকটায় একা একা যান কেন? বরং আমাদের বাড়িতে চলে যাবেন। ভালো লাগবে। একটু ভেন্টিলেটিং হবে।'—'হু'। শব্দটা ভজনের কানে লাগে। তবু ও বলল—'ঊর্মিলাও বলছিল।' আড্ডায় গিয়ে আশু একটু আলাদা ও আলগা হয়ে বসে থাকত—অদৃশ্য কাঁচ-ঘেরা অসদৃশ অংশ যেন। তাতে ওর ও অন্যান্যদেরও অসুবিধা হত। তবে কটা দিন যেতেই ওরা ছিপি উপড়ানো বিষারের মতো গলা ঠোঁটে ফেনিয়ে উঠত। কিংবা ওরা যেন কথা বলে না—যেন ঘড়ির চিমটা দিয়ে জুয়েল প্লেস করে বা গোঁফের লোম তোলে। ক্রমে রোজ সন্ধ্যায় ওখানে যাওয়া আইশারও মেজাজের ব্যাপার হয়ে গেল। ও তখন বেশ কথাবার্তাও বলতে শুরু করে। দেশ-মানুষ-কবিতা-কালচার-রাজনীতি ইত্যাদি যে কোনো প্রসঙ্গেই ও কলকাতার ভাষাতে কখনো টুকটাক বা কখনো টপাটপ চালিয়ে যেত। ওর কথাতে শ্লেষের শীতলতা ছিল। আর ও কাউকে যেন বেয়াত করে বলত না। হঠাৎ অশোভন মন্তব্যও করত। যেমন—'জনতা ধ্বজভঙ্গ।' তবুও ও যেন আড্ডার ক্যারমে লঘু আঙুলে টোকা দিত আর পয়েন্ট পেত। কেবল উঠে গিয়ে যখন ও খৈনির পিক ফেলত তখনই জঘন্য লাগত।—উনি খৈনি খান কেন?—নেশা।—কাজ করেন না কেন?—কে জানে? তবে কি করেন?—কি জানি।—বিয়ে থা করেন নি? —না। কিন্তু অত আসেন কেন? খোচড় নয়ত? ওর ওই রোজ এসে পড়া ও সবজান্তা মার্কায় শেষ পর্যন্ত মহিলাদেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। খৈনির পিক গিলে ফেলেও আইশা হয়ে উঠল যেন উৎপাত।

ব্যাপারটা আরো দুর্বিসহ হল যখন ভজনের বউয়ের বুকেও ব্যথা হয়, যে ব্যথাটা নড়ে বেড়ায়। অবশ্য চেস্ট স্পেশালিস্ট গ্যারান্টি দিলেন—ওটা গ্যাসের ব্যথা। ঊর্মিলা দাঁতে ঠোঁট চেপে কাতরায়। জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পাওয়া যায় না। শেষে ভজন ননসেন্স বলে উঠে ঘস করে চারমিনার ধরায়। সারাদিন সিগারেট টেনে টেনে শরীরে বারুদে ভাব আর জিহ্বা যেন ব্লটিং কাগজের। অমন গরম মেঘালো রাত আর ঘরে ঐ সিগারেট-পোড়া নীরবতা। অগত্যা বউকে বলতে হল—'দূর, ওসব তুমি মিথ্যেই ভাবছ। ওসব তোমার কিছু হয় নি। তোমার হজমের গোলমাল।' —'আমি কি তাই বললাম।' ঊর্মিলা রেগে উঠল। বাইরে বাদুড় উড়বার সাঁই সাঁই শব্দ। ভজন ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে বউয়ের শরীরে বাতাস বইয়ে দিল। তারপর সিগারেট ফেলে বলে উঠল—'ও র সাফারিঙটাতো আনপ্যারালাল। তুমি বরং

একটা এ্যান্টাসিড খাও।'—'না।' বলেই ঊর্মিলা হু হু করে কেঁদে ফেলল। আর বাতটা যেন তেতো হয়ে গেল। এরপর আইশাকে দু-চারটা কথা বলতেই হয়। তাতে কিছুটা তিরস্কারও ছিল। কিন্তু অত সূক্ষ্ম আঘাত বা তাচ্ছিল্যগুলো ওর লাগত না।—'যা নিডল-ফোড়া চামড়া!' এই বলে অনন্যোপায় হয়ে শেষে ভজন ওর সংক্রামক ব্যাধির কথাটা আড্ডায় বলে দেয়। আর সেজন্য ভজনকে সেদিন আড়াই পেগ জিন খেতে হয়েছিল। ফলে সকলের স্বার্থ আইশার সাথে যেন জড়িয়ে গেল এবং দায়িত্বও বর্তালো। ওরা তাড়াতাড়ি করে পার্টির পাওয়ার ও ব্যক্তিগত প্রভাব কাজে লাগিয়ে আইশাকে ঐ কলোনিতেই, একটা কয়লার আড়তে খাতা লেখার কাজে এনগেজ করে দেয়। মাইনে চল্লিশ টাকা। সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা, দুটো থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি আইশা কর্মরত থাকে। তারপর শিরদাঁড়ায় সাঁড়াশি চাপা যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফিরেই আইশা জল খেয়ে খৈনি ঠোঁটে কাঠপাথরের মতো ঘুমিয়ে পড়ত।

ওর ঘুমে এখন আর সাধারণত স্বপ্ন আসে না। হাসপাতালের গোঙানি-ব্যাণ্ডেজ-ওষুধের গন্ধ-সিরিঞ্জ-সিলিণ্ডার-কাশি-রক্ত-মৃত্যু-স্ট্রেচার ও সোডাজলের মতো সারারাত আলো ও পানসে হাওয়ার মধ্যেও স্বপ্নের বিল চলত···নার্স নার্সিসাস ·নয়নাভিরাম নদী ও নৌকা···নারীর সান্নিধ্য···চড়ুইভাতির হৈ চৈ· কাঞ্চনজঙ্ঘা। হাতে টাকা পেয়ে ডিম বা মাংস খেলে এখনও ও স্বপ্ন পায়—সে নক্কারজনক, ঘুম ভেঙে অশুচির মতো লাগে। আর কতকগুলি স্বপ্ন আজও সিনেমার মতো রঙিন যেন-বা ভেজা কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা। কাঁচরাপাড়া থেকে ফেররার পরপরই ভজন ওকে একটা সিনেমায় নিয়ে যায়। হিন্দি। ঊর্মিলা সাদা শাড়ি পরেছিল আর ভজন ধুতি-পাঞ্জাবি ও শাল। কিন্তু ড্রেস সারকেলের দর্শকদের মধ্যে বসে, আইশার পিঠের উপর দিয়ে ছাঁদা হাঁটার মতো যেন—সিনেমাটা ওর যেন দেখা হয়নি।

কয়লার আড়তের কাজ ক্রমে দুটো জিনিসকে ওর ভেতরে উস্কে দিচ্ছিল: যৌন সংস্রবের বাসনা ও রাজনৈতিক রোমাঞ্চ। অথচ উভয় জৈব প্রবৃত্তি ওকে কাশে রক্তের কণার মতো চাপতে হয়। ফলে মাথার মধ্যে নতুন উপসর্গ, যেন কয়লার গুঁড়ো উত্তপ্ত বাতাসের দমকায় মগজে ঢুকে গেছে। ও রসিদ কাটত, খাতায় হিসাব তুলত, কুলিকে দিয়ে মাল পৌঁছে দেয়াত আর বেড়ার সুখা-বাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখত। একটি মেয়ে ম্যাক্সি পরে বুকে বইখাতা চেপে রোজ নটায় পড়ে ফিরত। মেয়েটি ওর চোখের উপর গ্যাঁদা গাছের মতো

তরতর করে বাড়ছিল। কিন্তু ইদানীং আইশার চোখে চোখ পড়ে গেলে হঠাৎ যেন বাসি হয়ে যেত।

ওর চেহারা পাকস্থলী পচে যাওয়া শরীরের মতো আবার ভাঙছিল। রাতে কিছু দিন হল ঘুম হয় না—কেবল যেন চৈতন্য আচ্ছন্ন থাকে। আর ও একটু একটু কাশত। ওদিকে মালিকের তিরিক্ষিপনা ও অবিরত ভর্ৎসনা আর রাস্তায় যৌবনের তরঙ্গ আর ওর চারপাশে কয়লার কালো কালো পিণ্ড। এমতাবস্থায়, একদিন কলোনি-টাউট নারায়ণ বোস এসে, জেলের অন্ধকার সেলে চাঁদি চেছে মাথায় দিনরাত ফোঁটা ফোঁটা বরফজল ফেলবার মতো করে কয়েক বছর আগে সংঘটিত হাক সা হত্যাকাণ্ডের বিবরণ উপরাচক হয়ে দিয়ে গেল। সন্ধ্যারাতে ঐ গারগাছটার কাছে। বাড়ি ফেরবার সময় আইশার ভয় ভয় করতে লাগল। গারগাছটার ওখানে একটা কানাগলি ও মেছো ডোবা। সামান্য বাতাসে জ্যোৎস্না বা অন্ধকার যেন ডালপাতা থেকে বর্ষায় জলোর জোঁকের মতো ঝুলে ঝুলে পড়ত। আর রাতগুলো যেন সব কার্ফু রাত। তার ওপর পাড়ার কতগুলো ষণ্ডামার্কা ছেলে—সম্ভবত পার্টির মধ্যে একটা ঘোঁট, কয়লার গোলার কাছে এসে ঐতিহাসিক যাত্রার পার্ট করার মতো ঢঙে, কিন্তু কাঁচা গলায়, ওকেই যেন শাসালো—বাতাস বিষিয়ে দিচ্ছ বজ্জাত। একদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। পরক্ষণেই শীল মাছের মতো, বাদামি কালো ছেলেটার হা-হা করে বিকট অট্টহাস্য। তারপর কদিন ধরে কটা পেটো বোম ফাটার আওয়াজ—নখ দিয়ে লেখার মতো অক্ষরে আবার দেওয়ালে সাবু সাটা পোস্টার—পেছনে, অন্ধকারে, পিচ রাস্তার উপর দিয়ে লম্বা লাইন টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ—কানা গলিতে কয়েকটা ছায়া-দৌড়—কার যেন চালে ঢিল। আইশা আচমকা ভয়ানক ভয় পেয়ে দরজা-জানালা-বন্ধ নোনা ভ্যাপসা অন্ধকারে পড়ে রইল যেন তেলা পোকা।

মেঝে কাঁচা মাটির, বুক পর্যন্ত ইটের ওয়াল, ধারা, কড়িকাঠ ও দোচালা। জানালার নীচে পচা কাদা জলের নালা, হিংস্র থাবার মতো কুল গাছের গোড়া শেকড় ও চালে ঘষা রুক্ষ ডাল কাঁটা। এ ঘরের কাছে সকালের রোদের তাপ পড়ে না। এ ঘরেরই সংলগ্ন পশ্চিম পাশে ইটের দেয়াল-ঘেরা জায়গায় মরাপাতার জঞ্জাল—হারিজারি-ভাঙা ঢেঁকি শ্যাওলা তেতুল পুঁড়ের আচারের মতো ও মাকড়সার জাল। এই বর্ধিত অধসমাপ্ত অংশে রৌ সন্ধ্যার রোদ লাগে। আর এই ছ-বাই-চারের ড্যাম্প ঘরটাই আপাতত ওর ঘর। অবশ্য

এ বাড়ির দলিল নানা ইতস্ততে এখনও হয়নি। ওর ঘরের পায়া-মচকানো চৌকিতে ছালা ও বন্যার পলিতে ডোবা নষ্ট ন্যাতা-পুতুলের মতো আধখানা তোষক লেপ। এক কোণে ইটের উপর রাখা একটা ট্রাঙ্ক আর তাতে জামাকাপড়, ওষুধের বড়ি, একতাড়া পাণ্ডুর চিঠিপত্র ও প্রেসক্রিপশন এবং গ্রহণ-লাগা, পূর্ণগ্রাস-গ্রহণ উত্তরণের বিভিন্ন দৃশ্যের মতো স্পষ্ট ও স্কার-সহ কয়েকটা এক্স-রে প্লেট। মেঝের উপর পড়ে থাকা এনামেলের বাটি, কলাই ওঠা থালা, ভরন কাঁসার গ্লাশ—রাস্তা-লাইটের শেডের কুড়িয়ে পাওয়ার শেড ও চৌকির পায়ার কাছে ছাইভর্তি ভাঙা গামলা। দেশের বাড়িতে ঘন ঝাকড়া তেজপাতা গাছের তলে রাতারাতি-তোলা আতুরে যেমন থাকত। রাতদিন ও বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে এবং আরাম লাগে ও-রকম পড়ে থাকতে। কিন্তু চালে কাঁটা ডালের ঘষা, আবছা সন্ধ্যায় জানালার তলায় ব্যাঙ-ছুঁচোর খসখস, আচমকা চিৎকার বা বাচ্চার কান্না কিংবা—'য্যায় ছাখ মরাডায় মরছে কিনা, আরতো রদের কাম নাই, হারাডা দিন বিছানা চটকানো আর গেলন, পাকমনা আমরা আতুররে ভাতজল দিবার'—মেজো বউয়ের এরকম মশলাপোড়া গঞ্জনায় এবং এমন কি ভাতজল দেওয়ার জন্য ফটফটা দুপুরে দরজা ঠেলার জংপড়া শব্দে ও চমকে চমকে উঠত। তাছাড়া বাচ্চারা ওর যে খৈনি এনে দিত ও পয়সা ফেরত আনত সেই খৈনির রঙে ও পয়সার শব্দে ওর ভীষণ সন্দেহের উদ্রেক হতো। যেন খৈনিতে ধুতুরার বিচি নয়ত পয়সাগুলো নকল ধাতুর। যেন ওকে পাগল করবার জন্য বা ফাঁসাবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে। যেন ওকে যে-কোনো অজুহাতে অপদস্থ করা হবে, ওকে কেউ নির্মম ভাবে আঘাত করবে, হত্যা করা হবে অথচ ওর বুকের অসুখটায় কোনো দুর্ভাবনা ছিল না। ভয়গুলো ছিল জলাতঙ্কের মতো।

ওর অসুখ বিল্যাপ্স করল। দু মাসের চিকিৎসার পর নার্স আয়া ও অন্যান্যদের প্রতি ওর ব্যবহার এবং হাসপাতালে অবর্ণনীয় চাপ ও সমস্যার দরুন নিরুপায় হয়ে ওকে ডিসচার্জ করতে হল—তখন ওর বাঁ বগলে তাজা গর্ত, উণ্ড ইন লেফট সাইনাস ওয়াল। যক্ষ্মার বীজাণু মরে গেছে—স্কার সহ আরো একটা এক্সরে প্লেট। এখন ওর প্রয়োজন প্রচুর পথ্য, ওষুধ ও উষ্ণ সেবা-শুশ্রূষার অর্থাৎ চিকিৎসকের হিসাবে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। প্লাস্টার ও তুলোতে ওর বগলে পুলটিস দেয়া আছে। পনেরো দিন অন্তর আউটডোর থেকে ওকে ওয়াশিং ড্রেসিং করিয়ে আসতে হয়।

ওর চেহারা সামান্য ফিরেছে। সাহস বেড়েছে। অবশ্য আড়তের কাজটা

আর নেই। আইশা মাঝে মাঝে আবার বেড়াতে বেরোয়। তবে আদর পাড়ায় আর যায় না। ওটা ওদের কৌলীন্যবোধ ও আত্মসম্মানের ব্যাপার। ও সন্ধ্যায় বড় রাস্তা ধরে কবলা নদীর ব্রিজে যায়, ঘন ঘন পিক ফেলে জলে ও টাটকা বাতাস-কুয়াশা নেয় আবফেরবার সময় কোনো কোনো দিন মেসোর বাড়ি হয়ে আসে। মেসোরা অত্যধিক ভদ্র, ভীরু ও একটু পরোপকারী টাইপের। ওদের যেন নানা ধরনের দায় আছে। কারো-কারো কাছে ওটা অবশ্য দাঁও হয়। আইশা গেলেই ডিম, কমলা ও হাত-খরচের জন্য দু-চারটা টাকা পায়। মাসির অমন অপরাধবোধের মতো ব্যস্ততায় আইশার যেন মজা লাগে। আইশাও একটু কায়দা দেয়, ওর কায়দাটা যেন কাগজ কাটার ছুরি। আর ও ঐ টাকা পয়সা খরচ করে খৈনি ও জামা কাপড় ধোয়াতে। আর কিছু পয়সা জমিয়ে ও এবার একটা অগুরু সেন্টও কিনে ফেলে। জামা কাপড় পরিষ্কার না থাকলে মন মেজাজও ওর অপরিচ্ছন্ন থাকে আর বগলের দুর্গন্ধ অগুরুতে চাপা পড়ে।

মেজো ভাই বাড়ি এলেই চরম ফাটাফাটি হয়—'আমার রক্ত প্যালকা করা পয়সায় মাতব্বরি কর। কার জন্য পাঠাই টাকা অত কইব্যা। কত কইব্যা না বলছি আশুর যেন কষ্ট না হয়। ওর জীবনে আর কি আছে শুনি? তা না। যত পিশাচ।' বউ উগ্রগন্ধ শেকড় বা উদ্ভট দ্রব্যের কাছে সাপিনীর মতো চুপসে যায়। কিন্তু বলে—'কি না করা হয় ওর জন্য? তাও য্যায়া হাত পাতে। রাখালও থাকবে তোমার ঘাড়ের উপর। কেন, আমাগোই সব ঝামেলা নাকি?' এতে মেজোর মেজাজ আরো বিগড়ে যায়—তেড়ে যায় বউয়ের দিকে—'চুপ! চুপ কর মাগি। তোরেই বাঁশ দেওনের কাম।' বউ তখন রান্না ঘরে চলে যায়। আর রান্নাঘর থেকে বাসন নাড়ার ঝনঝন শব্দ হতে থাকে।—'হা ভাঙ, ভাইঙা ফেলা সব। ওগুলাও তো তোর বাপের যৌতুক।' মেয়ে আর না থাকতে পেরে বাপের কাছে ছুটে আসে—'বাবা চুপ কর না তোমরা। লোকে কি ভাবছে?' বাপ মেয়ের দিকে কটমট করে লালাভ চোখে তাকায়। মেয়েটা বাপের মতোই ফরসা ও সুশ্রী। বাপ তারপর ঘেসো ফুলের মতো আঙুলের আঁচিলটা অনবরত খোঁটে ও একটার পর একটা বিড়ি খায়। মেয়ে বলে, বলে সূর্যমুখী ফুলের ভারে নোয়ানো ডালের মতো বেঁকে ও মাথা নেড়ে—'অত বিড়ি খাও কেন? তোমারও না'।—'যা ভাগ। আহ্লাদ না?' কটা দিন পরই লোকটা আবার কাজের জায়গায় তাড়াতাড়ি চলে যায়—'না যাইগা। রাখাল যে একা একা কি করতাছে?

যা বৈরাগী।' আর ও যত তাড়াতাড়ি চলে যায় বউয়েরও জেদ তত চড়ে—'আমি পেত্নি যখন পেত্নিই হইবো।' তাই নিজেও তেমন খায় না, আইশাকেও পেট ভরে খেতে দেয় না। আইশা ওদের গলগ্রহ। আইশা যেন গলায় চিতল চাপলার কাঁটার মতো। আর মেজো বউ যেন সদ্য বাচ্চা-বিয়ানো কুত্তি। বরং যেন মেয়ের মধ্যে দিয়েই সে যত শখসাধ উজার করে।

আইশাকে ক্রমে ক্রমে প্রায় সর্বক্ষণ বিছানাতেই থাকতে হয়। ওর শরীরটা দিনে দিনে পিচ রাস্তায় লেপ্টে-থাকা ব্যাঙের চামড়ার মতো হয়ে যাচ্ছে। ক্ষতর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়ার ওর একটা প্ল্যান ছিল। কারণ কাক-সকালে ঘুম ভাঙলেও মাটিতে পা দিতে রুচি হয় না—মাথার ভেতরে যেন অসংখ্য ধাবমান অশ্বক্ষুরের শব্দ। ওদিকে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেই গলায় লেগে থাকা পচা রক্ত পুঁজ মুখ দিয়ে শ্লেষ্মার মতো,বমির মতো হড়হড়িয়ে উঠে আসে। ঘর থেকে ছুটে এসে ঘাসখেকো কুকুরের মতো ওর বিশল্যকরণীর পাতা চিবুতে ইচ্ছা হয়। অন্তত একবার বিশল্যকরণীর ঝাড়ের দিকে তাকাতে হয়। তারপর কুয়োপাড়ের ওখানে বসে ওগুলো উগরে দেয়। আর দম ফিরে পাওয়ার পর চোখ খুললে ঈষৎ রৌদ্রে ঘাস-গুলোকে মনে হয় যেন টেনে ছিঁড়ে ছাড়ানো পায়রার পালক। স্নান করবার সময়ও রক্ত পড়ে। কুয়োপাড়টা যেন নরক হয়ে যায়। তাই ওকে সবার পরে স্নান করতে যেতে দেওয়া হয়। ওখানে তখন রোদ থাকে না। তা সত্ত্বেও কাশ-থুতু ও ক্ষতর রক্ত বিপজ্জনক ভাবে ছড়ানোর ব্যাপারে ওকে কে যেন নির্মম ভাবে ভর করে—ওটা যক্ষ্মার জেদ।

বাসি পেটে চিরতা জলের মতো কটু ও গরম করা চা-টা ও তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায়। ওটা ওর দেহমনে চমৎকার ক্রিয়া করে। তারপর ও যখন আবার বিছানায় উপুড় হয়ে শোয় তখন এক-একদিন সময় কাটানোর জন্য ও মনে আনতে চেষ্টা করে দেশের বাড়িতে কেমন ওরা ডোবানো নৌকার শ্যাওলা পানা কাদা থেকে চিতলের ডিম জোগার করত। উঠোন-ঘেঁষা নদী দিয়ে উজিয়ে যাওয়ার সময় তালুকের জেলেরা কি রকম হৈ হৈ করে পদ্মার ইলিশ ছুঁড়ে দিয়ে যেত। আর বাড়ির নৌকা মাঝ গাঙে নিয়ে গিয়ে চড়ুই-ভাতির মতো করে কালো নেনিয়া ও কেবলই তোলা পাপতার ঝোল। ও জামকালো জল ও মাছের উৎফালগুলো ভাবে আর ত স্রোতে ঢেউয়ে ডিঙির দোলার মতো যেন হয়ে যায়:…এহে জ্যোৎস্না গলে জল · ওই ওই বাঙ চিতল…দেখ বালি ভাঙলেই চিংড়ি…হাত পেছলানো বড় শোল…

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যা কিংবা কাৎ চালতা গাছে…জাল কাটল ল্যাজা ফলি…হেই সামলে হেই সামলে উৎফাল দেয় কই কাতল · এখানে নাও ওখানে নাও…মাঝের জল ছল ছল। আর এই ভাবেই ওই অসাড় সময় নিমজামের হাওয়ার মতো ওর চিত্ত শরীরের ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

ও সেদিন বিকেলের পর চোট-লাগা নেড়ি কুকুরের মত বউ বাজারের দিকে গিয়েছিল। দিনটা হঠাৎ এক্সরে প্লেটের মধ্য দিয়ে দেখার মতো রঙের হয়ে গেল—এলোমেলো অতি-বেগনি মেঘ ও অন্ধকারে স্ক্রিনিং মেশিনের পর্দার আলোর মতো বজ্র-বিদ্যুৎ, ঘন হয়ে ঘিরে আসা ঠাণ্ডা, পাতা-ছেঁড়া ঝড়ো বাতাস, তারপর তুষারঝড়ের মতো প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। ও লেপের মধ্যে ডুবে ভয়াল আবেগ অনুভব করল। কিন্তু বিকালে তাজা প্রকৃতির বিরুদ্ধে আর বিছানায় পড়ে থাকা যাচ্ছিল না। বছরের পর বছর নির্দিষ্ট সময়ে ইনজেকশন বা ওষুধ নেওয়ার জন্য যেমন তীব্র নেশা হয় তেমন একটা অস্থিরতা ওকে জর্জরিত করছিল। ও উঠে রাস্তায় এল। উনিশ বছর আগে ঐ জায়গাটা ভাগাড় ছিল। গরু-মোষ-বেড়াল পড়ে থাকত আর তা নিয়ে চলত সন্ধ্যা অবধি কাড়াকাড়ি। ছেঁড়া-ছেঁড়া ছায়ার মতো শকুন আর কুকুরের দাঁতে হাড় ভাঙার শব্দ। সন্ধ্যার পর ও রাস্তায় হাট-ব্যবসায়ী চোর ও মাতাল ছাড়া কেউ যেত না। ঘটা করে শশ্মানকালীর পূজা হতো অমবস্যা রাতে। তারপর কারা যেন বাজার বসালো এখানে। বউবাজার এখন বেশ জমজমাট। আইশা বউবাজারে এসেছে দেশি মদের খোঁজে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও মদ জিনিসটা আইশারও অনাস্বাদিত নয়। আজ যেন ও কোনো পৈশাচিক নির্দয়তার সামনেও দাঁড়াতে পরোয়া করে না বা ওর ঈশ্বরকেও কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য বোধ করে না। অবশ্য ও বোঝে যে ওর ঘাড় থেকে পেছনে ঝুলে আছে একটা ছায়া এবং যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সেটা জ্যান্ত হয়ে যাবে। আর সে জন্য ওকে নার্ভ নিতে হয়। ওর পকেটে আছে ছোট বউকে ভজিয়ে নেওয়া দুটো ন্যাতা টাকা। ঐ টাকা যেন সেই তামার পয়সাটার মতো, শকুনের তেড়ে আসা দেখে ভীষণ ভয় পাওয়ায়, যে পয়সাটা পুড়িয়ে জল খাইয়ে ওর কোমরে তাবিজের মতো বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। ওর কাছ থেকে লোকজন সরে সরে যাচ্ছিল—যেন আইশা মিত্র ম্লেচ্ছ। কেউ কেউ মুখ ঘুরিয়ে নিল আর একজন ওর সামনে বিড়ি সিগারেট ধরিয়ে অন্য-মনস্কভাবে নাকের কাছের বাতাস পুড়িয়ে দিল। ও ভিড় আর দোকান-পাটের ঘিঞ্জির মধ্যে ঢুকে এক গ্লাশ, গ্লাশ উপুড় করে গিলে ফেলল।

তারপর ও বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকল। কিছুদূর যেতেই ওর মাথার মধ্যে ভুনভুনি পোকার শব্দের মতো ঝিমঝিমানি, চোখে অজস্র দ্রুত ছায়াপাত আর পা দুটো যেন ক্রাচ। ওর ইচ্ছা ছিল বড় রাস্তা থেকে গলিতে নেমে আদরপাড়ায় যায় ও উল্টোপাল্টা গালিগালাজ করে করে একটা হেস্তনেস্ত করে আসে। কিন্তু অন্ধকার গলিতে নামতেই নেশাটা যেন এক হ্যাঁচকায় ওকে নীচে ফেলে দৌড়তে থাকল। ও উল্টো প্যাঁচ কষবার মতো চিৎকার করে বলল—আই সিজর এ্যাণ্ড দাউ আর্ট ব্রুটাস। ধুৎ শালা আর যাব না। ও পড়ে গেল।

রিকশাওয়ালা রিকশা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে পেছনে চলছিল গ্রুপটা। ওরা অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনো কথা বলছিল না—সিগারেট হাতে হাতে ঘুরছিল। রিকশায় যে-ছেলেটা আইশাকে ধরেছিল, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে শালা কাউঠার কলিজা। গোঙাচ্ছে। চল আইশাদাকে বাড়ুইদের বালির মধ্যে পুঁতে ফেলি। চট করে লাশ পাওয়া যাবে না।' 'ভাবা যায়? 'ব্যাটা ওরকম দেখতে। মহা খচরা। থালা বাসন বিক্রি করে। আর বাধা দিলে মেয়েদের পেটায়।' 'মা কসম?' 'আরে ওর বাল্য-বিধবা দিদি। কি সুন্দর দেখতে ছিল। বাপে টাকার লোভে চিতে বুড়োর সাথে বিয়ে দিল। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সম্পত্তির জন্য একমাত্র ছেলেটাকে পাগলা করে মেরে ফেলল। আর ইনি চ্যালা মেরে সে দিদির হাত ভেঙে দিয়েছেন। হাতটা ঠক ঠক করে কাঁপে।' 'ছাখ লোকটা কিন্তু তবু আত্মহত্যা করে না। কি জিনিস।' 'বরং বিয়ে করতে চায়।' 'ধুস্।' ওরা কজন ও রিকশাওয়ালাও হেসে ফেলল। আইশাদের বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড়াল। ওরা ধরাধরি করে ওকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল আর শাসিয়েও গেল, আর যদি ওকে বউবাজারে দেখি তো আপনাদেরই শালা গিলা বানাব। 'ওকথা আমাগো বইলা আর কি হইব? শয়তান কি কারো পরোয়া করে। তোমরাই দিলা পারতা প্যাদানি', কুপি হাতে মেজোবউ কর্কশ কণ্ঠস্বর নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। আর ওরা হঠাৎ ভড়কে গেল। 'হ্যা। শেষে হাজতে যাই। যাবত জীবন। কি খচরা মেছেলে মাইরি।' বলতে বলতে ছেলেগুলো তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আসে। রিকশাওয়ালা চলে গেছে। ওদিকে আইশার অসহ্য অস্বস্তি হচ্ছিল। বগলের ক্ষত আর মুখ দিয়ে রক্তপাত হল। ও শাড়ির চাদরটা মাটিতে ফেলে দিল ও ক্ষতর রক্ত বন্ধ করবার জন্য বন্যার বালিমাটি লাগা তোষকের তুলো ছিঁড়ে বগলে গুঁজে

দিল। ওর পেটের ভেতরে নাড়ীগুলো যেন তরল তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। ওর মাথার তলে যেন আস্ত পাথর বা পাথরের মাথা।

এরপরও একবার ও বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল। বিছানা থেকে উঠে চা খেয়েও ওর ভীষণ ঠাণ্ডা করতে লাগল। ওর দেহে বারোমাস ঠাণ্ডা। ও গিয়ে রৌদ্রে উবু হয়ে বসল। ও যেন আলো-বাতাস-শূন্য বদ্ধ গরম ঘরের টবে, অক্সিজেনের পলিথিলিন নলের মতো সাদা ফ্যাকাশে ক্যাকটাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ বৃষ্টিভেজা মাটি ; ঘাস ও হাওয়া-রৌদ্রের অন্য রঙ গন্ধ উষ্ণতা আছে। বিশল্যকরণীর ঝাড় পুড়িয়ে রোদ-বাতাস ওর ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। ও ভাবল, কলকাতায় যাব। ও উঠে তাড়াতাড়ি করে মেসোর বাড়িতে রওনা হল। পুজো প্রায় এসে গেল। পুজোর বন্ধের আগে ট্রেন গ্রাম্য প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চির মতো ফাঁকা পড়ে থাকে।

বহুদিন পর আসবার জন্য আর ভাঙনের ধাক্কা উতরাবার পর ও রীতিমতো আদর-আপ্যায়ন পেল। ও অবশ্য অবাস্তব লৌকিকতার তোয়াক্কা করার নয়। 'মেসো আছে?' 'নারে।' 'কিন্তু আমার কিছু টাকা লাগে।' এই বলে ও গট গট করে বারান্দায় উঠে সশব্দে চেয়ার টেনে নিয়ে, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে, বিড় বিড় করতে লাগল। ও যা বলছিল তা সব বোঝা দুষ্কর। আজকাল ওর যেন কোনো ভাবনা-চিন্তা আসে না। কথা বলবার সময় যেন মাথার পাথরটা গুঁড়ো-গুঁড়ো বালি হয়ে ঝরে যায় আর সে বালির উপর দিয়ে বন্যা বইতে থাকে। কিন্তু ওর প্রলাপের মধ্যে থেকে কেবল শেষ উক্তিটি উদ্ধার করা গেল, 'রাওয়া ডিম। তারপর ও বলল, 'মাসি অন্ন দাও।' মাসির চোখ পাতার মতো ভিজে গিয়েছিল। আইশার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাসি ওকে বারান্দায় পিঁড়ি পেতে খেতে দিল। ও তৃপ্তি ভরে থালা চেটে ভাত ডাল মাছ সব খেল ও হেসে বলল, 'তোমার হাতে যাদু আছে মাসি। অবশ্য তুমিও সে মায়াতেই নির্বাসিতা। ফুরেল ঠেসে ঠুসে নিলাম। কাঞ্চন-জঙ্ঘা ডিঙাবো। কিন্তু মেজোবউ পেত্নি।' মাসি এবার ওকে ধমক দেয়, 'পেত্নি। তুই কি? যা ওঠ।' ও হাসে। তারপর মুখ ধোয়া জল খেয়ে ফেলে খৈনি ডলতে ডলতে বলে, 'টাকা ম্যানেজ করে রেখো আর টাইম মতো স্নান করবে, খাবে। মাসি তোমার স্বাস্থ্য কিন্তু ধসে গেছে। জনম জনম হম রূপ নেহারুলু নয়ন না তিরপিত ভেল। কিন্তু কি হল? মাসি আমিও কিন্তু লড়ে যাব।' তারপর ও উঠোনের উপর দিয়ে গাভীন গাইয়ের মতো চলে গেল।

আরো একবার ও পেট ঠেসে গরম গরম ঝাল ঝাল ডিম ভাত খেয়েছিল, মহালয়ার রাতে। খাওয়ার আমোদে তখন আইশার জিহ্বা পেছল আর ও চোখ বুঁজে ভেবেছিল: আজ হঠাৎ? মেজোবাবুর টাকা কি এসে গেল? তবে তো যেন তেন প্রকারেণ কলকাতা। বুকে ঝাল ধরছে। আরে টাকাই তো সব। টাকার জন্য, বেঙির বিয়ের খরচের টাকার জন্য দাদা বিয়ে করেছিল। নইলে ওটা বউ? বউ নয় যাত্রার মেয়ে ছেলে। খুক খুক করে আইশা হাসল ও বুকে ব্যথা পেল। শেষে ওর মনে পড়ল: ছোটর ঘরে রেডিও আর পাড়ার মাইকে আজ মহালয়া হবে। কলকাতা গেল। যাক। বরং ঘুমিয়ে পড়া ভালো। কিন্তু আজ ওর বড় কষ্ট হচ্ছিল। শক্ত ছেঁড়া বিছানাতেও শরীর তেতে উঠছিল। আর অন্যদিকে বুকের মধ্যে, কাঁঠালের বাকল ঠুকে ঠুকে কাঠঠোকরার কীট টেনে টেনে বের করবার মতোই, ভীষণ যন্ত্রণা। ঘরে নোনা অন্ধকার ও বাইরে পেছল রাত। বাদুইদের অর্ধসমাপ্ত দালানে ইটকাঠ লোহা কংক্রিটের ভেতর হুলো বেড়াল ডাকছিল।

শেষরাতে যখন মহালয়া আরম্ভ হল, ও নাকি বাইরে বেরিয়ে পেচ্ছাব করল। উঠোনে দাঁড়িয়ে খৈনি বানালো ও কয়েকবার পিক ফেলল। ছোটর রেডিও আর পাড়ার সাউণ্ডবক্সে পাঠ ও গান হচ্ছে। ওপরে সংখ্যাতীত আলোচিহ্নিত নিয়তবর্ধিত মহাকাশ। ও আবার শুয়ে পড়েছিল।

বিছানায় আইশা নাকি এপাশ-ওপাশ করছিল। কারণ পায়া নড়বড়ে চৌকিটা মহালয়া ছাপিয়ে বিশ্রী জঘন্য শব্দ করছিল, যেন ও ঘরে বাসরের রাত।

পরের দিন আইশার ঘরের দরজা ভাঙতে হল। চৌকির কিনারে মশারিতে ঝুলে ছিল ও। ওর মেরুদণ্ডে ছিল ক্রনিক যক্ষ্মা আর বগলে পিঠে থকথকে পচা ঘা। কিন্তু মৃত মুখে ছিল অবিকৃতি ও অদ্ভুত বিভা। এ যেন এক দিব্য বা দৈব মৃত্যু।

সই

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বয়সের পক্ষে বেশ তাড়াতাড়িই হেঁটে চলেছেন হিতেন্দ্রনাথ। ভেতরে একটা জ্বালা। আগেকার দিন হলে চোখে জল এসে যেত। কিন্তু ক্রমে সব জল শুকিয়ে গেছে। ভেতরটা শুধু খা খা করে। সব বৃথা হয়ে গেছে। বাঁজা একটা প্রকাণ্ড ভূখণ্ড। সজীব কিছুই জন্মায় না—কাঁটা গাছ ছাড়া।

সব কিছু বদলে গেছে। সুধাময়ীও। অনেক দিন ধরে গজরাচ্ছিলেন সুধাময়ী। আজ ফেটে পড়েছেন: 'কবে খেয়েছ ঘি, আজো হাতের গন্ধ শুঁকছ। কবে স্বদেশী করে জেল খেটেছিলে, তা এখনো—'

হিতেন্দ্রনাথ থামিয়ে দিয়েছিলেন: 'আমি তো জেল খাটার জন্যে কোনো গৌরব দাবি করি নি।'

'ভেতরে ভেতরে করেছ। করছ। ভাবছ তুমি একটা মস্ত পীর। ঐ দরখাস্তে সই করলে তোমার জাত যাবে। ঐ তো তোমার অহংকার।'

'অহংকার।'

'হ্যাঁ। নইলে ননী ঠাকুরপোর ঐ দরখাস্তে সই করছ না কেন? দেখছ না সংসারের হাল? প্রতি মাসে দুশো টাকা—কম হল? ওটা নাকি পরে বেড়ে তিনশো টাকা হবে—ননী ঠাকুরপো বলেছে। তোমায় তো দিনরাত পাথর ভাঙতে বলা হয় নি। একটা শুধু সই, ব্যস—'

'ঐখানেই তো আমার আপত্তি। আমি কিছু কাজ করব না, আর সরকারি টাকা নেব। গরিব মানুষের ট্যাক্সের টাকা।'

'একটা কাজ তো করেছিলে—বড় কাজ—তার পুরস্কার এটা। তখন দিতে পারে নি। এখন দিচ্ছে। জাতির ধার ছিল তোমার কাছে, এখন শুধছে।'

'যে-কাজটা করেছি, সত্যি যদি সেটা বড় কাজ হয়, সেটা ভাঙিয়ে খেলে তার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়।'

'কী জ্বালা! এমন মানুষ তো দেখি নি। বিনা কাজে টাকা পেলেও আবার ফ্যাঁকড়া তোলে—!'

'আমায় একটা কাজ দিক না ননী। যা হোক কিছু করি। তার জন্যে টাকা দিক। বিনা কাজে টাকা নিলে ভিক্ষে নেওয়া হয়।'

সুধাময়ী খেপে ওঠেন : 'এবার থেকে সংসারটা তুমি চালিয়ো। এই বঙ্গে এসে তো একটি পয়সা রোজগার কর নি। খোকা বি. কম্. পাশ করে তিন বছর বসে আছে। কিন্তু গিলছে তো সবাই। যত অকর্মা হচ্ছ, মগজে তত পোকা বাড়ছে। খেতে বসে মনে হয় না ভাত জুটছে কোথা থেকে।'

ভাতের খোঁটা খাবার পর বেরিয়ে পড়েছেন হিতেন্দ্রনাথ। ননীর বাড়ি যাচ্ছেন। সই করে দেবেন। সুধাময়ীর কথায় বড় জ্বালা—বড় অপমান। কিন্তু তাঁর মতো করেই সব ভেবে নিতে হবে। সত্যি তো, হিতেন্দ্রনাথ জেল-খাটা লোক। আইন-অমান্য আন্দোলন করে জেলে গিয়েছিলেন। পেনশনটা নিতে বাধা কোথায়? অনেকেই নিয়েছে। অকাট্য যুক্তি।

কিন্তু অন্য যুক্তিও তো আছে। ননী স্বদেশী কাজে জেল খাটে নি। খেটেছে অন্য কারণে—সেটা আর তিনি মনে আনতে চান না। তবু ননী পোলিটিকাল সাফারারের পেনসন পায়। তার যোগাযোগ ভালো। সে এই বঙ্গে রাজনীতি করে। তাছাড়া তার রেশনের দোকান আছে, লরির ব্যবসা আছে, তিনতলা বাড়ি আছে—ভালো ভাড়া পায়। ননী হিতেন্দ্রনাথকে পেনসন পাইয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যাকুল। যেন এতে তার অপরাধ কিছুটা কমবে। টাকাটা যাদের প্রাপ্য তাদের একেবারে বঞ্চিত করতে চায় না ননী। সহৃদয় ননী। আর হিতেন্দ্রনাথের মনে হয় টাকাটা নিলেই তিনি ননীর পাপকে ঢাকবার ব্যাপারে যেন সাহায্য করলেন, ব্যবহৃত হলেন।

সুধাময়ী এত সব বুঝতে চান না। তাঁর কথা : 'যে জোচ্চুরি করে পেনসন নিচ্ছে, সে নিকগে। তুমি তো আর তা করছ না। তুমি তো সত্যি-সত্যিই—তুমি তো আর ননী ঠাকুরপোর মতো সদুর ওপর অত্যাচার করে জেলে যাও নি।'

'আঃ থাম তো।'

'আমার বাপু সাদা কথা। তুমি তো দেশের জন্যে কম কর নি। এখন লোকে ভুলে গেছে বলে তো আর মিথ্যে নয়।'

হিতেন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, সুধাময়ী এখন তাঁর স্বাদেশিক কাজের লম্বা লিস্টি দাখিল করে মেয়েমহলে বক্তৃতা করেন, আবার ননী এ বাড়িতে এলে তাকে বিশেষ আদরযত্ন করেন। স্বদেশী কাজটা অতি ফোতো কাজ, ফায়দা নেই কোনো, এ কথা বলে গঞ্জনাও দেন, আবার ওটা ভাঙিয়ে পয়সা বা মর্যাদা সংগ্রহেও তিনি তৎপর।

ননী বাড়ি প্রায় এসে গেছে। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে সুধীর

—হিতেন্দ্রনাথের বড় ছেলে। বড় আশা করেছিলেন তিনি ছেলেটার ওপরে। কিন্তু –

'তুই এদিকে কোথায় গিয়েছিলি?'

'ননীকাকুর বাড়ি।'

ননীর সঙ্গে সুধীরের এত ঘনিষ্ঠতা। ননীর বাড়িতে সুধীরের যাতায়াত আছে। কেন যায় ওখানে? ননীকে কি ও দেশপ্রেমিক হিরো বলে ধরে নিয়েছে? ননীর জেল খাটার কারণটা কি ওকে বলবেন?

'মা বলেছে, ননীকাকুর কাছে মাঝে মাঝে যেতে। যদি একটা চাকরি—'

'কিছু হল সুবিধে?'—বিষণ্ণ হিতেন্দ্রনাথ।

'দেখবেন চেষ্টা করে।' একটু পরে সুধীর যোগ করে, 'ননীকাকুদের যুব-সংগঠনে কাজ করতে বলেছেন।'

'ননীদের রাজনীতির সঙ্গে তুই কি একমত?'

ঝাঁঝালো গলায় সুধীর বলে, 'একমত ফ্যাকমত দিয়ে কী হবে? চাকরি তো একটা চাই।'

'কাজ শুরু করেছিস?'

'না।' একটু থেমে বলে, 'কাজ মানে সমরকে পেটাতে হবে।'

'সমর কে?'

'মোটা সমর। আমার বন্ধু।'

'কিন্তু সমর তো ননীর পার্টিরই ছেলে।'

'হ্যাঁ—তবে অন্য ফ্যাকশনের। বোমা-বন্দুক সব ননীকাকুই দেবে।'

'তার মানে তো খুন-জখম।' উদ্বেগ হিতেন্দ্রের গলায়।

সুধীর কথা না বলে নিজের পকেট হাতড়ায়। হিতেন্দ্রনাথ বোঝেন, ও সিগারেট খুঁজছে।

'তোকে এত কষ্ট করে দোকানটা করে দিলাম, রাখতে পারলি না।'

'ও কথা থাক।' ধমকে ওঠে সুধীর। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ এই অন্ধকারে?'

হিতেন্দ্র একটু থতিয়ে যান। তারপর বলেন, 'ননীর ওখানে।'

আর কথা এগোয় না। দুজনে দুই পথ ধরে।

দেশভাগের পর হিতেন্দ্র ভেবেছিলেন দেশেই থেকে যাবেন। কিছু দিন থেকেও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে আসতে হল। তবে অনেক দেরি হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে লোক তখন গিজগিজ করছে। চাকরি জোটে

না। হিতেন্দ্রনাথের তখন বয়সও বেড়ে গিয়েছে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার, তা তো চালাতেই হবে। তখন শেষ সম্বল নিয়ে সুধীরকে একটা স্টেশনারি দোকান করে দিলেন। সুধীর কী যে করল—দোকানও গেল, মূলধনও গেল। হিতেন্দ্রনাথের শেষ সম্বল সে খুইয়েছে, কিন্তু তার জন্য একটু কৈফিয়ৎ দিতেও সুধীর রাজি নয়। বরং কথাটা তুললে সে খেপে যায়। দোকানটা থাকলে আজ ননীর দ্বারস্থ হতে হতো না।

হলদে তিনতলা বাড়ি। ননী এই বঙ্গে এত বড় একটা বাড়িও করে ফেলেছে। কবিৎকর্মা। একটু হিংসেই হয় বোধ হয়। আবার পুরো হিংসেও নয়। নৈতিক যোগ্যতায় কি—?

'আরে, আসুন আসুন, হিতেনদা।' খুব খাতির করে ননী। বসায় বিলাসী আসবাবের মধ্যে। দামি, ঝকঝকে। দামি শাড়ি পরে আসে ননীর বৌ। রংটা তার বরাবরই চাপা, কিন্তু এখন কলকাতার কলের জলে আর গয়নায় বেশ ঝকঝকে। গোলগাল মিষ্টি-মুখের মেয়ে। লুচি-তরকারি-মিষ্টি খুব যত্ন করে খাওয়ায়। অনেকগুলি লুচি দেয়। খেয়েও ফেলেন হিতেন্দ্রনাথ। এখন জোটে না, কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় খাদ্য-প্রীতি তাঁর মজ্জায়।

খেতে খেতেই তাঁর মনে বিস্বাদ এসে যায়। ননীর পাপের টাকায় তিনি বসে বসে খাচ্ছেন। ননী তো তার পাপের অংশীদার করতে চায় তাঁকে। পেনসন চাইতেই তাঁর দ্বিধা—তার পর ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যেন প্রার্থনাটা ননীরই কাছে। অথবা যেন ননীর দলের লোকজনের কাছে। ঐ সব লোকদের কত কুকীর্তির কথাই হিতেন্দ্রনাথ জানেন। ঘুষ, জোচ্চুরি থেকে আরো কত কী। এইবার তিনি ওদেরই লোক হয়ে যাচ্ছেন। ওদের দলের পাবলিক মিটিং-এ ননী তাঁকে নিয়ে যেতে চায় ননী তাঁকে একজন ছোটখাটো নেতা বানিয়ে তুলতে চায়। ক্ষমতা থাকবে না এ নেতার। শুধু শো-পীস। প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী ও জেলখাটা লোক হিসেবে তাঁর একটা সুনাম আছে। এই সুনামকে ননীরা কাজে লাগাতে চায়। এদের আর সব আছে। সুনামের বড় অভাব। কিন্তু পাবলিকের কাছে একটু সুনাম তো চাই। তবে ওরা হিতেন্দ্রনাথকে পুষিয়ে দেবে। ওদের দলের হয়ে বক্তৃতা করতে হবে, ওদের গুণগান করতে হবে, ওদের চুরি-জোচ্চুরি সমর্থন করতে হবে। ওরা টাকাকড়িতে পুষিয়ে দেবে। পেনসন-টা শুরু। ক্রমে যত ভালো কাজ দেখাতে পারবে, তত উন্নতি। অভাব ঘুচে যাবে। এ সবই তিনি জানেন। জেনেশুনেই সারেণ্ডার করতে

এসেছেন তিনি। না করে উপায় নেই। সংসার চলুক। সুধীর চাকরি পাক। সুধাময়ীর গঞ্জনার শেষ হোক। পেট ভরে ভাত জুটুক সবার। সুখ হোক সুধাময়ীর। পাপের ভাগ একা হিতেন্দ্রনাথের—সেই দস্যু রত্নাকরের মতো। পাপপুণ্য বড় কথা নয়। ভাতটা সুখটা বড়—অনেক বড়।

'তারপর হিতেনদা, বল।' সব বুঝেও বলে ননী।

'সই-টা করে দিতে এলাম।'

'ও হ্যাঁ।' নির্বিকার ভাবেই বলে ননী। এই সই নিয়ে যে এত ঝুলোঝুলি তা ননীর গলা শুনে বোঝা যায় না। কাগজটা বার করে টেবিলে রাখে ননী। একটু ঠেলে দেয় হিতেন্দ্রর দিকে। ননী বলে, 'হিতেনদা, আসছে সপ্তাহে আমাদের পাবলিক মিটিং আছে একটা। ওখানে তোমার সম্বর্ধনা দেব।'

এত দিন দাও নি কেন? না, এ প্রশ্নটা করতে নেই।

'হ্যাঁ, তোমার প্রাপ্য এটা। ননী বলে যায়। 'দেশ দেরি করে ফেলেছে। অপরাধ করেছে। এখন তাকে শোধরাতে হবে। তুমি একটা ভালো বক্তৃতা তৈরি করে যেয়ো। আস্তে আস্তে তোমার একটা দারুণ ইমেজ বিল্ড্ আপ্ করব। তুমি এত বড় একজন দেশপ্রেমিক, দেশ ভাগ হয়েছে বলে তোমায় কেউই পুঁছবে না? আমরা সারা দেশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। যোগ্য মর্যাদা দেব। যাতে তুমি আবার সক্রিয় দেশ-প্রেমিক হতে পার। তোমার সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না। সে আমি দেখব।'

তোমাদের বিল্ড্-আপ্-করা একটি দেশপ্রেমিক তোমরা বাজারে ছাড়বে। রঙিন ফানুসের মতো আমি উড়ব, সুতোটা থাকবে তোমাদের হাতে। বুঝেছি। আর বেশি বলতে হবে না। সব জেনেই আমি তোমাদের দেশপ্রেমিক হব; আমার আর দেশপ্রেমিক না হয়ে উপায় নেই। দিচ্ছি সই করে। কিন্তু দরখাস্তের কাগজটা সব ঝাপসা। কোনো অক্ষরই স্পষ্ট নজরে আসছে না। জল দিয়ে লেখা। জেরডে গেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া কালো রেখা—জলে ফুলে ছেদরানো। রেখাগুলো অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন হিতেন্দ্রনাথ। নাঃ, অর্থহীন একটা গোলকধাঁধা। এই জট-পাকানো রাস্তায় কি করে যে তিনি ঘুঁটি পাকিয়ে ঘরে তুলবেন। সব অক্ষরেই এখন তিনি নরকে পতনের আশঙ্কা দেখছেন। 'চশমা-টা আনতে ভুলে গেছি, ননী।'

'তাতে কী। আমারটা নাও। একটু হয়তো অসুবিধে হবে। তবে কাজ হয়ে যাবে। একটা সই তো।' ননী পরিয়ে দেয় চশমা।

অদ্ভুত এক অস্বস্তি লাগে হিতেন্দ্রনাথের। অন্যের ঘেমো গেঞ্জি পরেছেন যেন। ননীর ঘাম তাঁর শরীর জাপটে ধরেছে। ননীর ঘাম এখন তাঁরই ঘাম। ননীর চশমা পরে এখন সব দেখছেন তিনি, অদ্ভুত, অন্য রকম। কালো কালো কতগুলো কৃমি সাদা কাগজের ওপর কিলবিল করছে। এর মধ্যে কোনখানটায় তিনি হাত রাখবেন।

'এইখানটা। এইখানে সই কর।' ননীর তর্জনি তাঁকে নির্দেশ দেয়। অন্য একটা তর্জনি হঠাৎ হিতেন্দ্রের মাথায় চমকে ওঠে।

পিস্তল সহ হিতেন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন। পুলিশ নানা জেরা নানা অত্যাচার করেছিল। হিতেন্দ্রনাথ মুখ খোলেন নি। কোনো খুন-খারাপির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে জড়ানো যায় নি। কিন্তু বেআইনী অস্ত্র রাখাও অপরাধ। জেরার সময় একটা এই রকম কাগজ তার সামনে পুলিশ মেলে ধরেছিল। একটি তর্জনি স্থান নির্দেশ করে বলেছিল, 'এইখানে সই করুন।' কিন্তু তখন তাঁর বয়স কম। চশমার দরকার হতো না। পড়ে ফেললেন এক নিশ্বাসে। কোনো অসুবিধে হয় নি। তখন চোখের জ্যোতি ছিল। তিনি আর কোনোদিন রাজনীতি করবেন না, স্বদেশীদের ধরতে ইংরেজ সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন—এই সব প্রতিজ্ঞার নিচে সই করতে হবে। সরকার খুশি হয়ে পারিতোষিক দিতে পারে। হিতেন্দ্র করেন নি সই। তার জন্য নিপীড়ন বেড়েছিল। ননীর তর্জনির দিকে তাকিয়ে তিনি ভাবেন, এ দরখাস্তে কী লেখা আছে! পড়তে পারছেন না—ননীর চশমা সত্ত্বেও। বয়স বেড়েছে। চোখের জ্যোতি গেছে। ননীর তর্জনি স্থিরভাবে পথনির্দেশ করছে।

'কী হলো, হিতেনদা?'

'চোখে ঠিক দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমার চশমা পরেও দেখতে পাচ্ছ না?'

'তোমার চশমা আমায় বোধহয় ঠিক ফিট করছে না।'

'অত আর পড়তে হবে না। সই করে দাও।'

'দেব, দেব। তাড়া তো আমারই।'

ননী চাপ দেয় না। সে সুতো ছেড়ে খেলিয়ে তুলতে জানে। বলে,

'ঠিক আছে। পরেই করো।' নির্দোষ এই উক্তির মধ্যেও যেন জেদি কণ্ঠস্বর। তর্জনি উঠেও যেন সামনে থেকেই যায়।

ননী বলে, 'একটু ওষুধ আমি মাঝে-মধ্যে খাই। শরীরটা চাঙ্গা হয়। নেশা-টেশা কিছু নয়। ওষুধের মতো। ওরে '

বৌ নয়, ভৃত্য 'ওষুধ' রেখে যায়। বোতল ভর্তি ওষুধ। হিতেন্দ্র আগেই জানতেন ওষুধের কথা। তাই শকৃড্ হন না।

'আপনার কথা বলেছি ব্রতীনদাকে।'

'উনি আমায় চিনতে পারলেন?'

'চিনতে পারবেন না মানে? খুব শ্রদ্ধা করেন আপনাকে। আপনার পেনসন পেতে একটুও অসুবিধে হবে না, ব্রতীনদাই করে দেবেন সব। উনি তো বললেন—আমাদের হিতেনবাবুর মতো অনেস্ট লোকই চাই। সত্যিই তাই। দেশ থেকে অনেস্টি তো উঠে গেল। চেয়ে দেখুন আজকালকার ছেলেদের দিকে। শুধু ছেলে কেন, মেয়েদের দিকেও চেয়ে দেখুন। কোনো অনেস্টি নেই। আর চিনেছে খালি টাকা। কোনো স্যাক্রিফাইস্ নেই। ভাবুন তো আমাদের সময়। আমার কথা বাদ দিন। নিজে মুখে —থাকগে। কিন্তু আপনার কথা। সারা জীবন—সবটাই একটা বিরাট স্যাক্রিফাইস্। কিন্তু কী পেয়েছেন। কিছু না। তবু অনেস্ট। হ্যাঁ, সেন্ট পার সেন্ট। কোনো খাদ নেই। হ্যাঁ, দাদা, আমি একাই—? এক চুমুক খেয়ে নিন। এক যাত্রায় আর পৃথক ফল কেন? শরীরটা চাঙ্গা হবে, টনিকের মতো।'

'না, না। আমি ওসব—'

'দাদা। ওষুধ। একটু খেয়ে দেখুন।' গেলাসটা এগিয়ে দিয়েছে ননী।

গেলাসে পানীয়ের রং-টা লাল। কার রক্ত পান করছে ননী।

ননীর অত্যাচারে সদুর কাপড় ভিজে গিয়েছিল রক্তে। রক্তাক্ত মেয়েটা লাঞ্ছনায় যন্ত্রণায় কাঁদছিল।

'এখনকার জেনারেশনের দিকে দেখুন। কোনো অনেস্টি নেই। স্যাক্রিফাইস্ নেই। নিন দাদা। খান একটু। ভালো লাগবে। সুখ তো চাই একটু সংসারে, তাই না দাদা? এই ছোটাছুটি—হাঁফাতে হাঁফাতে—ভালো লাগে? বোঝাটাকে একটু হালকা করুন।'

হালকা! ঠিক কথা। সই করছি, ননীদের সঙ্গে জুটে যাচ্ছি, তাহলে

আর ভাবি মন নিয়ে কেন? কোনো বাঁধ আর মানব না। এক চুমুক খেলে কী বা হয়। কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয় তা দেখতে চান হিতেন্দ্রনাথ। আর কোনো বাঁধ মানবেন না তিনি। একটু সুখ, একটু স্বাচ্ছন্দ্য, বাকি কটা দিন। সত্যি, জানাই হল না ঐ পানীয়ের স্বাদ। জীবনে অনেক কিছুর স্বাদই জানা হল না। সুধাময়ী ছাড়া অন্য কোনো নারীর অঙ্গের স্বাদ কেমন? তাও একটু জানার কি দরকার নেই? জীবন তো শেষ হয়ে এল। সততার দড়ি দিয়ে নিজেকে বেঁধে সর্বাঙ্গে আজ দাগ, ক্ষত, ঘা। দিন ফুরিয়ে এল, এটা ভাবলেই সেই ঘা টনটন করে ওঠে, ঘা থেকে হাহাকারের পুঁজ রক্ত গড়ায়। নিজেকে একটু ছেড়ে দাও হিতেন্দ্রনাথ। সবাই তো দিচ্ছে। তুমি কেন ঐ দড়িটা আলগা করে একটু সুখের নিশ্বাস নাও না? চমৎ দেখতে ঐ পানীয় লালে লাল। একটু কেন, বেশি। অল্পে সুখ নেই—উপনিষদে বলেছে। অনেকটা ঢেলে দিলেন গলায়। 'আঃ!' গলা-বুক জ্বলে যাচ্ছে।

'কী হল?' ননীর ব্যাকুল প্রশ্ন।

'বুকটা বড় জ্বলছে, ননী।'

'অতটা খেলেন কেন। একটু সইয়ে সইয়ে—'

'অত সময় নেই আমার, ননী।'

'ঠিক আছে। ও জ্বালা জুড়িয়ে যাবে দাদা। আপনার অভ্যেস নেই তো। অভ্যেস হয়ে গেলে—'

বড় উপবাসী হিতেন্দ্রনাথ। উপবাসের কী মূল্য? গোটা কত ছেঁদো কথার পেছনে ছুটে জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল। কত তেষ্টা তা কি করে বুঝবে ননী। সব তেষ্টা মিটিয়ে নিতে হবে। সময় নেই। বড় চুমুক দিতে হবে। কিন্তু বড় চুমুকে বুকটা জ্বালা করে। না, এই তো কমছে জ্বালাটা। আরো একটু দাও, ননী।

গেলাসটা চোখের সামনে টলমল করে। রক্তের চাপ বুঝি সহ্য করতে পারছে না। এ কার রক্ত? কার রক্ত পান করছেন তিনি? কার রক্তে এত জ্বলুনি?

জ্বলুক, জ্বলুক। আঃ। এতদিনে ছেড়ে দিতে পেরেছেন নিজেকে। স্রোতে ভেসে যাবেন তিনি। গেলাসে রক্তস্রোত—রুদ্ধ। কিন্তু এ রক্ত রক্তের মধ্যে ঢেউ তোলে, সব ভুলিয়ে দেয়। আর তিনি পেছন ফিরে তাকাবেন না। অতীতের দাহ সম্পূর্ণ। পেছন দিকে আর তাকাতে নেই।

এখন পৃথিবী শুধু মধুময়। আকাশে মধু, বাতাসে মধু, সাগরের জল সব মধু।

'দাদা, তাহলে সইটা—'

'দাও,' কাগজ হাতে নেন হিতেন্দ্র। কিন্তু কাগজটা সব লাল লাগছে। এ কী। লাল নেবা হল নাকি। একখানা রক্তে চোবানো কাগজ। এর কোনটা উলটো, কোনটা সোজা? মডার্ন আর্ট? কোথায় সই করবেন?

'এই যে এখানটায়।'

'হাত কাঁপছে। কলম ধরতে পারছি না।'

'আপনার হাতটা আমি ধরে করিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক এখন। কাল সকালে বরং ভালো করে পড়ে—'

'থাক। আপনি যখন বলছেন—থাক, তবে আপনার ঐ কাঁপা হাতের সইতেই আমি আপনার পেনসন বার করে দিতে পারি। আমি নিজে হাতেই যদি আপনার নামটা বসিয়ে দিই, তাহলেও পারি। হ্যাঁ দাদা, কটা টাকা খরচা আছে। না, না, ব্রতীনদাকে কিছু দিতে হবে না। কর্মচারীদের কিছু দিতে হবে। দিতে হয়। ওরা পেয়ে থাকে। ইংরেজ আমলেই পেয়েছে, আমাদের আমলেও—কিছু না দিলে ওরা কলম ধরতে চায় না। ওরা বলে—ফোকটসে টাকা পাবে, একটু কিছু ছাড়বে না, সে কি হয়।'

ফোকট। এটা ফোকট। আমাদের স্যাক্রিফাইস—। ঘুষ দিয়ে পুরস্কার পেতে হবে। কভি নেহি।

ননী বলে, 'দেশবাসীই তো টাকা দিচ্ছে। তার একটা অংশ দেশবাসীই—'

'ছিনতাই করতে পারে। করুক শালারা। দেশবাসী সবাই সবাইকে প্যাঁচে ফেলে টাকা আদায় করুক। ওদের ইউনিয়ন আছে না। আমিও দু বছরে নেতা বনে যাচ্ছি। তখন আমিও সবাইকে প্যাঁচে ফেলে টাকা নিংড়ে বার করব। শালা, দেশসেবা কাকে বলে একবার দেশবাসীকে দেখিয়ে ছাড়ব।'

'হিতেনদা, তুমি মাইরি আর খেয়ো না। বৌদি শেষে—'

'যা, যা। রাখ তোর বৌদি। দে তো চোথাখানা। কাল সই করে পাঠিয়ে দেব।'

'হিতেনদা, আমি সঙ্গে যাই। তুমি একা যেতে পারবে না।'

'খুব পারব। জীবনের এতখানি পথ যে এলাম, সে কার হাত ধরে রে শালা?'

হাঁটছেন হিতেন্দ্রনাথ। একা। রাত হয়ে গেছে বেশ। লোকজন কম। এক একটা গাড়ি হুস্ হাস্ করে চলে যাচ্ছে। তাদের চোখ দুটো ঝাপসা—লাল। অন্ধকারে হাঁটছেন হিতেন্দ্রনাথ। এক অন্ধকার পেরিয়ে নতুন অন্ধকার। সেটা পেরোলে আর একটা। অন্ধকারের শেষ নেই। একপেয়ে পোস্ট সব একচক্ষু। রক্তাক্ত চোখগুলো গলে যাচ্ছে। এখুনি বুঝি গোটা চোখটা পড়ে যাবে। চোখের শূন্য কোটরগুলো নিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকছে না। হাঁটছে, এক পায়ে। সার বেঁধে এসে দাঁড়ায়। তাঁর সামনে। জেলখানার গরাদের মতো। কিন্তু চাবিটা কোথায়। গরাদের তালা খুলবেন কী করে। তাঁকে যে বাড়ি ফিরতে হবে। পোস্টগুলো ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। হ্যাট, হ্যাট। তাদের দূরে সরিয়ে দিতে চান। গলার আওয়াজে বুঝি রাস্তাটার ঘুম পাতলা হয়। রাস্তাটা নড়ে—পাশ ফিরে শোয়। অন্যরকম দেখায় রাস্তাটা। হাতটা তার মাথার ওপরে তোলা—লীলায়িত ভঙ্গিতে। কোমরটা একটু উঁচু, বঙ্কিম। ঐ কোমরেই হোঁচট খেয়ে কোমরটাকেই আঁকড়ে ধরেন—যন্ত্রণায়, কামনায়। কোমরটা নরম নয়। কোমরে হাত বোলাতে বোলাতে তিনি বোঝেন, তিনি বাড়ির রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এমন তো কখনো হয় না। আবার উঠে হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু ঐ ডাল্-সর্বস্ব গাছটা যেন তিনি আগেও পেরিয়েছেন। কোথায় গেল বাড়ির রাস্তা। মাঝরাতে ছোটাছুটির চেষ্টা করেন। ক্লান্ত। একটু ঘুম চাই। কিন্তু এত চেনা রাস্তাটা কোথায় গেল?

অনেক রাতে বাড়ি ফেরেন হিতেন্দ্রনাথ।

'দরখাস্তটা সই করে দিয়ে এলে?' হাসি-হাসি মুখে বলেন সুধাময়ী।

হিতেন্দ্র সেই হাসির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'কী, কথা বলছ না যে!' হাসিতে একটা ধার এসে যায়।

'না। কাল দেব।'

'আবার ফেরত আনলে কেন?' ধারালো গলা-টা শুনতে শুনতে হিতেন্দ্রনাথ ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালে উঠে মাথাটা একটু ধরা-ধরা লাগে। সুধাময়ী চা এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'সই করে দরখাস্তটা দিয়ে এস।'

হঠাৎ গত রাতের কথা মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করতে থাকে। শরীরটা হঠাৎ খারাপ লাগে।

'কী, তোমার শরীর খারাপ হচ্ছে নাকি? তুমি গোঙাচ্ছ কেন?'

'না, কিছু নয়।' গোঙাতে গোঙাতেই বলেন হিতেন্দ্রনাথ। কেন গোঙাচ্ছেন কি করে বোঝাবেন সুধাময়ীকে। একটা প্রচণ্ড কান্না সমস্ত শরীরকে মথিত আলোড়িত করে প্রবল তরঙ্গের মতো তাঁর বুকে গলায় আছড়ে পড়ছে। কিন্তু সেই কান্নাটা তিনি সুধাময়ীর কাছে কাঁদতে পারছেন না। সেই অদম্য ভূমিকম্পকে রুদ্ধ করবার চেষ্টায় তাঁর গলা দিয়ে একটা রুদ্ধশ্বাস গোঙানি বেরোচ্ছে। কিন্তু পারলেন না। কান্নাটাকে থামাতে পারলেন না। বুড়ো বয়সে সবই শিথিল হয়ে যায়। সেই অপ্রতিরোধ্য কান্নার কাছে মার খেতে খেতে হেরে যেতে যেতে তিনি বললেন, 'সুধা, আমি পারব না, সই করব না।'

বলেই অপ্রস্তুত লাগে। সই না করার মানে কী? সুধাময়ীকে এ কথা বলার কোনো মানেও হয় না। বুড়ো বয়সে সবই শিথিল, সবই শূন্য। অস্থিরভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। লোকজন, বাড়িঘর, গাড়িঘোড়া —সব শূন্য। এক মহাশূন্যের মধ্যে তিনি ঘুরে বেড়ান। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হন। ক্লান্ত হয়ে অন্ধকার সন্ধ্যায় বাড়িতে আবার ফিরতে হয়।

সুধাময়ী খুব প্রসন্ন। খুব আদরযত্ন করেন স্বামীকে। হিতেন্দ্রনাথ কিছুই বুঝতে পারেন না। এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে হিতেন্দ্রনাথের ভয়-ভয় করতে থাকে। দরখাস্তের সই-এর কথা সুধাময়ী তোলেনই না। অগত্যা হিতেন্দ্রনাথ বলেন, 'দরখাস্তটা দাও।'

সুধাময়ী শান্ত গলায় বলেন, 'দরখাস্তটা সুধীর ননী ঠাকুরপোকে দিয়ে এসেছে। আজ সেটা জমা পড়েছে।'

'আমার সই?'

'সুধীর করে দিয়েছে। অবিকল তোমার মতো। ননী ঠাকুরপো বলেছেন, ঐতেই হবে।'

প্রচণ্ড রেগে হিতেন্দ্রনাথ বলেন, 'ঐতেই হবে! কী করে হয়! একটা জাল সইতে—? যাচ্ছি আমি এখনই।'

'ননী ঠাকুরপোর কাছে গেলে কিছু হবে না। আদালতে যাও। ছেলের নামে জালিয়াতির মামলা করতে হবে তো।'

শূন্যই শেষ কথা নয়। অঙ্কশাস্ত্রে শূন্যের নীচেও সংখ্যা আছে। সেই সংখ্যাগুলোর আগে থাকে বিয়োগচিহ্ন। হিতেন্দ্রনাথের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। এখন তিনি পড়ছেন—পড়ছেন—শূন্যে। তাঁর গতিরেখা এখন সুদীর্ঘ একটা বিয়োগচিহ্নের মতো। বিয়োগচিহ্নটা লম্বালম্বি- খাড়া —দ্রুতগামী।

এখন জাল সইয়ের ওপরই তাঁকে বাকি জীবনটা কাটাতে হবে।

গোনাহ্

আফসার আমেদ

ফের সে পেঁপেগাছের তলায় এসে দাঁড়ায়। উঠোন থেকে নামতেই ছাঁচতলায় পেঁপেগাছ। পাশে একটি পাতিলেবুর গাছ। ভিজে মাটি খুঁটছে একগাদা মুরগী। বাচ্চাগুলো কিচ্ কিচ্ করছে। পেঁপেগাছতলায় নরম অন্ধকার ঝুপঝুপ করে নেমে আসছে। দলিজের চাতালে ত্রিপল টাঙাচ্ছে। দু-দিকে বাঁশ পুঁতে পাড় দিয়ে মাচা তৈরি করে। ভারি ত্রিপলটাকে নিয়ে ওপরটা ছেয়ে দিচ্ছে। নীচে সতরঞ্জি পাতছে। দুটো তিনটে চারটে ছ-টা বালিশ। তার মধ্যে দুটো পাশবালিশ। শোবার ঘরের সব বালিশ চাদর তুলে এনেছে আজ। জয়নুদ্দিন কাজীর বাড়ি মিলাদ-মহফিল। কলকাতা থেকে মৌলানা আসছেন। অনেক লোক আসবে, গিজ গিজ করবে চাতাল। জোরে জোরে দরুদ শরীফ পড়া হবে। কাটা কাটা পেঁপেপাতার ফাঁক দিয়ে হাতছোঁয়া জোনাকিগুলো উঠে যাচ্ছে আকাশে। আকাশ কত বড়। কত উঁচু। সাত পর্দাতক আসমান। সেখানে কেউ যেতে পারে না। অনেকে বলে সেখানে আল্লা আছে। আল্লা সব জায়গাতেই আছে। এই এখেনে বুকের মধ্যেও তার বাস।

অন্ধকার ঘন হয়ে জমাট বাঁধছে। থিকথিকে অন্ধকারের স্তর কেটে কেটে জোনাকিরাই দিক্‌বিদিক হতে পারছে। ডুবে যাচ্ছে পেঁপেগাছ, লেবুগাছ। ফরিদার শরীরও কেমন ডুবে যায়। নিজেকে নিজে খুঁজে পায় না। হ্যাজাক জ্বলে উঠেছে। আলো ছুটে এসেছে। জোনাকিগুলো গায়ের।

একটা দীর্ঘ ছায়া কাছ থেকে সরে যেতে ফরিদা নিচু স্বরে বলে, 'কে যায়।'

'কে ফরিদা, আমি রসিদ। তোরে দেখতে পাইনি।' ছায়াটা সরে আসে।

'কাছে আসিস যে।'

'মুখটা দেখি, তুই ফরিদা কিনা।'

'আহা দেখার কি ছিরি।'

'এক গিলাস পানি খাওয়াবি।'

'দূর হ।'

তক্ষুণি মালেকের মায়ের চ্যাল্লানি, 'ফরিদা—ফরিদা।'

ফরিদা পায়ে ঘোড়া জুড়ে দেয়। রান্নাঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। মালেকের মা গায়ের কুর্তো খুলে ফেলে হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সাদা মুখে কালো স্যাৎলা পড়া। মোটা শরীরে থপাস করে মাটিতে বসে পড়ে। হ্যারিকেনের আলো লেগে কোমরের বিছেহার ঝকমক করে। 'মাগী কি চরাট খেতে ছুটে গেছলে? আর ইদিকে আমি মরি। ষোল বছরি শরীরে যোয়ানি জোয়ার পানি।'

মালেকের মা আরো অনেক কথা বলবে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই কথা। ফরিদা নিজের ছায়ার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে।

একগাদা বাসন মাজতে বাকি আছে। ঝনঝন শব্দ করতে করতে বাসনে বাসন সাজায় একটা একটা করে। চুলোয় ভাত ফুটছে, কাঠটা নেড়ে দেয়। চুলোশালে কেরোসিন ডিবে জ্বলছিল আর একটা জ্বেলে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে আসে। উঁচু ঢিপি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নামে। ঘাটে নেমে শব্দ করে বাসন মাজে। আঁচলের বাতাস লেগে কুপি নিভল। ফের জোনাকিরা আসে। কাজী-গিন্নির বিছেহারের চিকচিকিনি। সে হঠাৎ রাগে দুঃখে একটা জোনাকিকে গিনি বাঁধার মতো বেঁধে চারিগোছা ফেলার মতো আঁচলটা ঘাড়ে ফেলে। তার ঘাড়ে চারিগোছা সটকালো। সেরকম একটা যন্ত্রণা পেল। ফরিদা সংসারের চারিগোছা আঁচলে বেঁধে ঘাড়ে জোরে ফেলে দিয়েছে। ফরিদা কোনো সংসারের গিন্নি। কারো বউ। গিন্নিরাও বাসন মাজে। সংসারের কাজ করে।

ফরিদার আঙুলে মাছের সূক্ষ্ম কাঁটা ফুটছে। এই আঙুলে কলম ধরে সে নিজের নাম সই করতে পারে। ফরিদা খাতুন, পিতার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সাকিম আমডাগড়ী···মাঝে মাঝে এইসব লিখে হাতের লেখা মাজাঘষা করতে হয়। থিরি কেলাসের সেকেণ্ড মাস্টারের ছড়ি বনবন মাথার ওপর ঘুরছে। ঘষঘষ কঞ্চির কলমে হাতের লেখা করে দেখায়। নীচে লেখে ফ র-এ এ হ্রস্ব-ই দ-এ আকার খ-এ আকার ত-এ হ্রস্ব-উ দন্ত্য ন। নামের বানান ভোলেনি। খসখস করে পিতার নাম, নিজের নাম, ঠিকানা ঠিকঠাক লেখে। না হলে কাজী সাহেবের সেজ মেয়েকে যেবার দেখতে এল তখন সে সাবিনাকে সবিনা করে ফেলেছিল। একটা আকারের ভুল। কতবড় ভুল। ওখানে বিয়ে হল না। অন্য জায়গায় হল।

ফরিদাকে দেখতে আসবে দূর মুলুক থেকে। হাতের লেখা দেখাতে গিয়ে ভুল হয়ে গেলে মুশকিল।

শ্বশুরবাড়ি কনে দেখাবার সময় নতুন বউ-এর চোখ বন্ধ রাখতে হয়। কেউ যদি হাসায়। তাহলে খুব খারাপ হবে।

রান্না সব পারে। গেঞ্জি বোনা, ঝোড়া ঠেকা বোনা করে শিখেছে। উল পেলে বোনা শিখে ফেলত। ওই তো, একটা ছাড়ো একটা তোলো। দেখতে এসে যদি প্রশ্ন করে? বলে দেবে ঠিক ঠিক। যদি বলে, মুখের আর, কানের দুল, মা বলে খা, বাপ বলে লেখ, কি হয়? এটা তো মুখে মুখে। আবদুল খালেক। যদি বরের নাম আবদুল খালেক হয়? জয়নুদ্দিন কাজির বড় ছেলের নাম কাজি আবদুল মালেক। খালেক মালেক একই। খ এর জায়গায় ম শুধু। তার রুমালে এই নামটাই সে সোনামুখী সূঁচ দিয়ে তুলে দিয়েছিল। মালেকের মতো বর যদি দেখতে হয়। ধুস। মিছেকথা। কারো মতো কেউ দেখতে হয় নাকি।

তার বাঁ-হাতের তালুতে মেহেদি বাটা দিয়ে চাঁদ তারা এঁকেছে। এই মেহেদির রঙ থাকতে থাকতে যেন তার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে যায়। এই মনে করে এইসব কর্ম। কাউকে বলে নি।

মা বলে তুই শ্বশুরঘরে জোরে কথা বলবিনি। মেয়েছেলের গলার আওয়াজ এ ঘর থেকে আর এক ঘরে শুনতে পাওয়া না যায়।

সে জোরে কথা বলে বলে এত সাবধান। কাউকে তোয়াক্কা করে না। কারো খেয়ে বসে নেই। গতর যতক্ষণ খাটায় ততক্ষণ খায়।

ফরিদার সামনে একটা ঢিল পড়ল। পানিতে কুবুক করে শব্দ হল। পানিতে ঢেউ খেলল। চোখে মুখে পানি ছিটকে পড়ল। এক ঝলক বিজলি বাতির আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল। 'এই আটকুড়ির বেটা।'

তার চোখে বিজলি বাতির আলো ঘোরাফেরা করছে। গাছের ছায়াগুলো দুলছে। ছায়াগুলোকে চিরে চিরে চোখে এসে বিঁধছে আলোর সরল রেখা। বিজলি বাতি এগিয়ে আসছে। ফরিদাকে কাঁপিয়ে দেয়। বুকে ঢিপ ঢিপ। আলোর রেখা ছোট হয়ে আসছে। আসছে। ছোট। আরো ছোট। বিজলি বাতি কাছে এসে থেমে যায়। 'বাসন মাজা হল?'

'কে মালেকভাই?'

'হ্যাঁ, বাড়িতে সব মেহমানরা এসেছে, তোর দেরি দেখে মা ডাকতে পাঠাল।'

'এই তো আমার হয়ে গেছে, ফরিদা বাসনগুলো তুলে নেয়, 'কলকাতার মৌলানা এসেছে?'

'হ্যাঁ, মেটেবোরোজের।'

মালেকের বাতির আলো ঘুরছে।

সামনে এগিয়ে যায় ফরিদা। মালেক পেছু পেছু আসে।

মালেক হোঁচট খেয়ে ফরিদার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'লাগেনি তো মালেকভাই?'

'না।'

'তবে চল।'

বিজলিবাতির মতো তার মনও এদিক-সেদিক হয়ে যাচ্ছে।

মালেক পাশ দেওয়া ছেলে। খানদানি ঘরে বিয়ে হবে। গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও দোষ হয় না। সে যদি পড়ে যেত, দোষ হতো। তারের ওপর স্পর্শের মতো অনুরণন ফরিদাকে তার বানায়। কেমন জড়সড় হয়ে যাচ্ছে, আবার কেমন বিজলিবাতির মতো অস্থির এদিক সেদিক হয়ে যাওয়া।

কাজি-গিন্নি মুরগি থুরথার করছে। রুপোর বিছেহারে আলো লেগে ঝিকমিক্ করছে। 'ঘরেতে মৌলানা মেহমান এসে গেল এখুনো ঘাটে কি করছিলি লা? পান শরবৎ দিতে হবেনি?'

ফরিদা চটপট শরবৎ করতে যায়। মৌলানার জন্যে আলাদা পান শরবৎ। একটা রেকাবির ওপর এক গেলাস সাদা পানি আর অন্য একটি গেলাসে জাফরান দেওয়া রঙিন শরবৎ। খানপোশ ঢাকা দেয়।

'ও খালা!' কাজি গিন্নিকে খালা বলে। 'ও খালা, শরবৎ তৈয়ের করেচি।'

'মালেক, মালেক, মালেক কুথাকে গেল? যা তুই দিয়ে আয়।'

ফরিদা পান শরবৎ নিয়ে দলিজের দিকে এগিয়ে যায়। ওখানে আলো আছে। মৌলানার কাছে যেতে ভয় করবে। মালেককে দেখলে পান শরবৎ তার হাতেই তুলে দেবে। দলিজের দোরে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মালেককে দেখতে পেল না। ভয়ে হিম হয়ে যায়। দলিজের চাতালে শতরঞ্জি ঠিকঠাক পাতছে। আর একটা হ্যাজাক জ্বালাচ্ছে। অনেকে বসেছে সেখানে। মৌলানার জন্যে বিছানা পাতছে। ছ-টা বালিশ। দুটো পাশ-বালিশ। ফরিদা দুরু দুরু বুকে দলিজের ভেতর উঁকি দেয়। মৌলানা বিছানায় একা বসে আছে। ফরিদা পান শরবৎ নিয়ে পাটাবুকে ঢুকে যায়। বাইরে দুটো হ্যাজাক জ্বলছে। দুটো তিনটে চারটে ছ-টা বালিশ। দুটো পাশবালিশ। মালেকের হাতের বিজলিবাতি তার শরীরে ঘুরছে। মালেক

তার শরীরে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যায়। তারের শরীরে কাঁপন। ফরিদা কাঁপছে। কাঁপছে · কাঁপছে। আঁচলের গোনাকি, পিটপিট করে দুই চোখের মধ্যিখানে দপদপিয়ে উঠছে। স্পর্শ, কাঁপন। তার। কম্পন। অনুরণন।

ফরিদা কাঁপতে কাঁপতে দলিজ থেকে বেরিয়ে আসে।

সামনে রসিদ এসে খাড়া হয়।

'জানিস ফরিদা, আমার মাগকে তার ঘরকে রেখে এইচি।'

'তাতে কি হয়েচে?'

'ছাড়চিঠি দোব।'

'তারপর?'

'তারপর।'

'তারপর?'

গেলাসের ঝুটাপানি রসিদের মুখে ছিটিয়ে দিয়ে ফিরে আসে রান্নাঘরে ফরিদা। রাগে গরগর করতে থাকে। রান্নাঘরে পাক খেতে খেতে এটায় ওটায় হাত দেয়।

মৌলানার জন্য সরু চাকলির নাস্তা তৈরি করতে থাকে। সপ্ সপ্ করে ঘামছে। পিট পিট ঘামের কণায় সারামুখ ভরে গেছে। আণ্ডা ভাজে, আলু ভাজে।

জয়নুদ্দিন কাজি অন্দরে ঢুকল। ঘরে কতকগুলো মেয়ে কুটুম ঢুকল। মালেকের মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এ ওকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে।

কাজি হুঙ্কার দিল—'ফরিদা—।'

সে দরদর ঘামে। 'জি কি বলছেন?'

'এক গেলাস পানি দে।'

কাজিগিন্নি মেয়ে-কুটুমদের বাতাস না করে আগে জয়নুদ্দিল কাজিকে বাতাস করে।

রাশভারি কাজিসাহেব জিজ্ঞেস করে—'মৌলানা কখন এলেন?'

'একটু আগে।'

'পান শরবৎ দিয়েচ?'

'সে কখন?'

'নাস্তা?'

'ওই তো ফরি আণ্ডা-ভাজি সরুচাকলি করচে।'

ফরিদা এক গেলাস পানি নিয়ে জয়নুদ্দিন কাজির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাজিসাহেব লম্বা দাড়িতে হাওয়া খাচ্ছে। ওদিকে আণ্ডা ভাজা চুঁষে পুড়ে যাচ্ছে। কাজি ধীরে স্থিরে পানির গেলাস নিল। ফিরে এসে নাস্তা সাজায়।

কাজি সাহেবের চ্যাল্লানি 'মালেক—মালেক, মালেক কোথায় গেল?'

মালেক ছুটে এল, 'কি বলচ বাবাজি?'

'মৌলানা এসে বসে আছেন, এখনো নাস্তা দাওনি। একটু আদব-কায়দা শেখো। কাজি-বংশে এসে মৌলানা অখুশি হবেন তা গৌরবের কথা নয়।'

মালেক রান্নাঘরে ঢুকছে। ভিজে বেড়াল। মৌলানার নাস্তা মালেকের হাতে তুলে দেয় ফরিদা। মালেক তার মাথায় ছোট্ট চাঁটি মেরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফরিদা চুলোর জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে ছেলেখেলা করে।

নানা ফিরিস্তি নানা খানা পাকাতে পাকাতে ফরিদা হিমশিম। চুলোর আগুন শরীরের ত্বকছিদ্র দিয়ে অবিরত ঢুকছে। এলিয়ে দিচ্ছে চুলের রাশ। শরীরটাকে বাঁকিয়ে রাখছে। ঘুরে ফিরে তাপ। পুকুরে ঢিল। মালেকের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়া, দলিজে মৌলানা। রসিদ তার বউকে ছাড়চিঠি দেবে। তারপর! তারপর! তারপর!

কাজি বাড়িতে আজ মিলাদ-মহফিল। গাঁয়ের লোক সব জড়ো হচ্ছে। ছেলে-ছোকরা-জোয়ান-মদ্দ দলে দলে আসছে। মেয়েরা এসে অন্দরে ঢুকছে। কাজিগিন্নি তাদের নিয়ে পান সুপুরির আসর বসায়। মিলাদ মহফিলের আসর জমজমাট হয়ে উঠছে। জয়নুদ্দিন কাজি শাহী সুফীলেবাস পরে মাথায় টুপি কানে আতর চোখে সুর্মা লাগিয়ে, কিছু, আরবী শব্দ মুখস্থ বলতে বলতে চলে গেল। আত্মবিশ্বাসে হাতের লাঠির শব্দ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল।

রান্নাঘরে হাঁড়ির ওপর একটা কালো বেড়াল লাফিয়ে পড়ল। ফরিদা ভয়ে চিৎকার করল—'ও মাগো!' ভয়ে সে সিটিয়ে গেছে। ভয়। ভয়। ভয়। ভূতের ভয়। জিনের ভয়। শয়তানের ভয়। ঝোড়া ঝোড়া পাপ শরীরে। তাকে আলগা করতে নেই। পাপ হয়। গোনাহ্ হয়।

মিলাদের আসর বসে গেছে। মৌলানা মিলাদ করছেন।

ফরিদা কাজ সব শেষ করে হাঁফ ছাড়ল।

ঘরে ঢুকে বাতি তুলে আয়নায় মুখ দেখল। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চুলগুলো বে এসেছে মুখের ওপর। চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে নেয়। কপালে লাল

কুমকুম গোল করে। কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে।

ফের ছাঁচতলার পেঁপে গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। সেখানে হ্যাজাকের আলো এসে পড়েছে। লেবুগাছ বাতাসে দুলছে। আলোর সুতো ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। মৌলানা হাঁকছে। মুসুল্লিরা টুপি মাথায় দিয়ে বসে পড়েছে। মালেকের মা ঘরের পরচালায় পাটি পেতে মেয়ে-কুটুম এবং পাড়ার জড়ো হওয়া মেয়েদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। সামনেটা শাড়ি ঝুলিয়ে পর্দা করে দেওয়া হয়েছে। মরদ মৌলানা তাদের দেখতে পাবে না, তারাও দেখতে পাবে না তাদের। শোনা যাবে মৌলানার বক্তৃতা। শুনলে নেকি হবে।

এদিকে মেয়ে মহলের আসর বেশ জমে উঠেছে। পড়শি জামালের মা মালেকের মাকে ঠেলা দিয়ে বলে—'হেলা তোর বেটার বে দেনা।'

'দোর দোর, তুমরা ছাখো না কনে। দেখতে যেন ভাল হয়।'

'রূপ লিয়ে কি করবি লা মাগী, গুণ দেখবিনি?'

খুর্শিদের মা পানের পিক সামলাতে সামলাতে জড়িয়ে মড়িয়ে বলে, 'জহুর মাগ জহুর বুকে লাত মেরে চলে গেল কাল।'

মালেকের মা বলে 'কই শুনিনি তো বুন।'

'আর শুনবে কি, মোল্লাপাড়ার মাগী-মদ্দর কাণ্ড দেখে দেখে চোখ পচে গেল। জহুরকে মাগীর পসন্দ হয়নি। আইবুড়ো হারুন ছোঁড়াটাকে লিয়ে ঘরের ভিতরি কি সব দিশ্য।'

'হায় তওবা, হায় তওবা।' মালেকের মা গালে চড় কষায়।

'মাগীর তাগড়া মরদ দরকার। একদিন তো জহুরের চোখে পড়ে গেল।'

জামালের মা বলে, 'জহুর কিছু করলনি?'

'কি করবে, লিমরদ। ম্যাগের ভেড়ো, ম্যাগ বলচে উঠ তো উঠ, বস তো বস।'

'তওবা, তওবা। হারুনও কি ছোঁড়া, পরের মাগ লিয়ে টানাটানি।'

'হারুনের অনেক হিসটিরি, আগের বারে দুশো ট্যাকা জরিমানা দিলি, নাকখৎ-জুতোপড়া ফের সেই কাজ।'

মালেকের মায়ের কানের মাকড়ি জোড়া দুল দুল দুলছে। নাকে নাকছাবি। বাজুতে রুপোর তাবিজ। আর একটা পানের খিলি গালে ফেলে চিবোতে চিবোতে আত্মপ্রত্যয়ে নাক ফুলিয়ে বলে, 'আমার মালেকের মতন ঠাণ্ডা ছেলে হয় না, কুনু মেয়ে-মাগীর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে না,

বলেনি বংশ-বুনিয়াদ বলে একটা কথা আছে, তার দাদার কি না ছেল, পাঁচ গেরামের লোক ডেকে লিয়ে যেত বিচার কত্তে। তার বাপের সামনে মাথা তুলে কথা বলেনি কুনুদিন। বাপ বলেচে পাঁচ-অক্ত নামাজ পড বাবা, তার পদ্দিন থেকে বাবা আমার নামাজ-রোজাতে হেলা দেয়নি। বেহেডপনা দেখলে তার বাপ সন্ত পুঁতে ফেলবি।'

'বলি মালেকের বাপের সামনি দাঁয়ডে আজকের ছোঁডারা কথা বলতেই পারবেনি। ছর ছর করে মুতে ফেলবে।' জামালের মা সায় দেয়।

এদিকে মৌলানা হেঁকে চলেছেন। তাঁর ডাইনে একটা পাশ বালিশ বাঁয়ে একটা, বাবু হয়ে বসা জানুতে কনুইয়ের চাপে টোল-খাওয়া আর একটা বালিশ। দুটো তিনটে চারটে ছটা বালিশ। দুদিকে দুটি হ্যাজাক ত্রিপলের ছাউনির বাঁশে ঝোলানো। সেখানে ঝোপঝাড থেকে ছুটে এসে জড়ো হচ্ছিল পোকার দল। তিনি সুর করে যখনই গলা সপ্তমে চড়াচ্ছিলেন তখন ডান-হাতের তালু কানের ওপর উঠে আসছিল। তাঁর বাঁ-গালে একটা খয়েরি আঁচিল। তাঁর কালো কুচকুচে চাপদাড়িতে মেহেদি। তাঁর নীল পিরানের পুট হাতায় হাতের কাজকরা সাদা দোপাট্টা। তাঁর চোখে সুর্মার টান। তিনি কথা বলছিলেন মধুর সুরে। তিনি ধর্মগ্রন্থের অনেক উদ্ধৃতি দিচ্ছিলেন, ধর্মপথে চলার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সতর্ক করিয়ে দিচ্ছিলেন।

একটা গোলাপপাশ ছিল। মাঝে মাঝে তা থেকে গোলাপপানি ছিটোনো হচ্ছিল। ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সেখানে টুপিমাথা অনেক বুড়ো কচিকাচার দল জড়ো হয়েছে। যখন আসর ঝিমমারা লাগে তখন মৌলানা কোরাসে জোরে জোরে দরুদ-শরিফ পড়ান, 'আল্লাহুমা সাল্লেয়ালা, সৈয়েদানা, সফীয়ানা, মৌলায়ানা, মোহাম্মদ . '

বিজলিবাতির সরলরেখা এদিকে আসছে। ফরিদার দিকে। ফরিদা দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ে। চোখের ওপর বাতি পড়ছে। সন্ধানী বাতির রেখা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসছে। জামগাছ কলাতলা ঘুরে ঘুরে এদিক পানে। আলোর রেখা যেন কোনো ইচ্ছাকে তাড়িয়ে আনছে। ইচ্ছা অনিচ্ছার সুতোয় যেন দুলে উঠল ফরিদা হঠাৎ। বাগ অনুরাগের বিপরীত ঠোকাঠুকিতে চমক খাচ্ছে। কে আসছে? কে আসছে? মালেকভাই। মালেকভাইয়ের হাতের বাতি ঘুরে ঘুরে আসছে। বাতির সন্ধানী চোখ শরীর তোলপাড় করবে। ফরিদা দুলছে। দুল দুল। ফরিদার শরীরের কাপড় খসছে খস খস। রক্তের মধ্যে উৎসব, নৃত্য, সে এক হৃদয়-খোঁড়ার মাতন।

আলোর রেখার ঊর্ধ্বশ্বাস গতি। রেখা ছোট হয়ে আসছে। আলোর বৃত্তের মধ্যে চলে এসেছে সে।

'কে মালেকভাই?'

'হ্যাঁ, তোকে খুঁজছিলাম।'

'কেন?'

'খুঁজছিলাম।'

'কেন?'

'খুঁজছিলাম, এই দেশলাইটা দে তো একবার।'

ফরিদা মনে মনে একরাশি হেসে ফেলে। এই কথা বলতে চায় মালেক-ভাই। বুক কেঁপে ছিল। এই যদি বলে। কি বলবে? কিছু নয় কিছু নয়। ফরিদাকে কিছু বলা যায় না। মেয়ে। মেয়েছেলের জেবন। মনে মনে এক দমকা হাসি শেষ হবার মতো থমকে গিয়ে ফরিদা দৌড়ায়। আঁচলের লুটোপুটিতে অন্ধকারের অন্তরঙ্গ ফিসফাস হাসাহাসির মতো ফরিদা দৌড়ে রান্নাশালে চলে যায়। আঁচল সামলাতে সামলাতে ফের ফিরে আসে।

পেছু পেছু মালেকভাই এসেছে।

'এলাও গো বড়লোকের জামাই।'

মালেকভাই বারুদ ঠুকে বিড়ি ধরাল 'মা দেখতে পাবেনি তো।

'খালা জমে গেছে মেয়ে কুটুমদের সাথে।'

'দেখতে পাচ্ছেনি তো?'

'না না।'

ফরিদাকে ঘাম দিচ্ছে কেন? মালেকের বিড়ির আগুনের তাত লাগছেনি তো। না অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে মালেক। ফরিদা মালেক-ভায়ের বিড়ি খাওয়া দেখছে। ভুস করে টানছে। ধোঁয়া ছাড়ছে ফুস।

মৌলানা হেঁকে চলেছেন 'ভাইসব আমরা কেউ ইসলামের পথে থাকছি না, নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত সব ভুলে বসে আছি···হক হালাল বেছে খাই না, হারাম খাচ্ছি। অসৎ পথে চলছি, জোচ্চুরি, অবিচার, জেনা (অবৈধ যৌনাচার) করছি। এই গোনাহ্‌গার বান্দাদের আখেরাতে দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে·····'

'ও মালেকভাই, না থাক।'

'কিছু বলবি নাকি?'

'ভুলে গেছি।'

মালেক যেন হিস হিস করে হাসছে।

মুহূর্তে মৌলানার দলিজঘরের হাসি ঘুরে ফিরে ফরিদার বুকের ঘরে কিটকিটিয়ে উঠল। হেই ওরা ভাল মানুষ। মৌলানা কত কি জানে। খারাপ বলা যায় না। এত এই আরবি বই পড়েছে। অতবড় লোকের সামনে যাওয়া যায় না। চাপদাড়ি। গলার আওয়াজ বাঘের মতো। নাস্তা নিয়ে দলিজের দোরগোড়ায় কেঁপেছে। মৌলানা দলিজের তক্তপোষে বাবু হয়ে বসে। টিমটিমে বাতি জ্বলছে। বাইরে হাজাকের তখন বান। ত্রিপল টাঙাচ্ছে। শতরঞ্জি পাতছে। একটা দুটো চারটে ছটা বালিশ। দুটো পাশ বালিশ। ফরিদা পান সররৎ নিয়ে ঢুকছে। দুর দুর কাঁপছে। ঠোঁটের ফাঁক টিপে রাখছে। নাকের পাটা কাঁপছে।

'নাম কি?'

স্বর ফুটছেনা তার।

'হাসিনা লেড়কি বটে, খাপসুরত।'

কেঁপে কেঁপে মরে সে।

'হাতটা দেখি।'

হাত দেখছে না আরো কিছু। হাত দেখছে না আরো কিছু। হাত দেখছে না আরো কিছু · চাপদাড়ি লোকটা···না থাক। ও হ্যাঁ লোকটা অনেক কিছু জানে। হাতের মধ্যে হাত রাখা। সে জানে না। স্যাঁতানো সাপের হাত কিভাবে আদর খাওয়া ঘোরাঘুরিতে বিজলির মতো স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে ওঠে।

তার পায়ের পায়জোড় নেই তাতে কি হয়েছে। রুপোর চুড়ি নেই তাতে কি হয়েছে। নাকছাবি নেই তাতে কি হয়েছে। মাকড়ি নেই তাতে কি হয়েছে। ডুমরো নেই তাতে কি হয়েছে। গোনাহ্ গোনাহ্ গোনাহ্। পাপ পাপ পাপ।

নাম ফরিদা খাতুন, পিতার নাম ইউসুফ আলি ··সাকিন আমডাগড়ি আমাকে দেখতে আসবে। ফ র-এ হ্রস্ব-ই দ-এ আকার খ-এ আকার ত-এ হ্রস্ব-উ দন্তন্য। হেঁয়ালি, মুখের আর, কানের দুল, মা বলে খা বাপ বলে লেখ।

'ও মালেকভাই?'

'যা মনে এসেছে বল।'

'দূর ভুলে যাই শুধু।'

'বল না।'

'এখন রাত কত হল?'

'একটা।'

'চাঁদ উঠবেনি?'

'ডুবে গেছে।'

'এখনও মিলাদ হবে?'

'সারারাত।'

মালেক জ্বলন্ত বিড়ি টানছে।

ফরিদা অন্ধকারে পরচালার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

দলিজের চাতাল থেকে একটা হৈ-হল্লা বেরিয়ে এল। মৌলানার আর কোনো গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ছুটোছুটি দাপাদাপি চলছে।

জয়নুদ্দিন কাজি হুংকার দিল 'মালেক মালেক!'

ফরিদা স্থির নিস্পন্দ।

মালেক দৌড়ল।

পায়ে পায়ে দলিজের কানাচে চলে যায় ফরিদা।

মৌলানা গদিকরা বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে জয়নুদ্দিন কাজি বাকুলে ঢুকল। লম্বা লোকটার পরচালার টালিতে মাথা ঠুকে যায়। গজরাতে গজরাতে এগনেয় উঠে এল কাজিসাহেব। 'এটা কার কাজ?'

গিন্নি মাথায় কাপড় টেনে দাঁড়াল 'কি হয়েচে গা?'

'মালেকের মা, আমার মান-ইজ্জত সব গেল।'

'কি হয়েচে বলবে তো।'

'বালিশে ছুঁচ ছিল, মৌলানার বুকে '

ফরিদা পেঁপে গাছতলায় স্থির নিঃশব্দ। অন্ধকারে কেউ তাকে চিনতে পারছে না। কিন্তু ঠিক চিনে নেবে। ওরা তো দোষী খুঁজবেই। তখন? এখন ভয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে, সারাদিনের খাটুনির অবসাদে নুয়ে এতটুকু হয়ে যায়। এই সময় অন্ধকারে একটা ডাকের অপেক্ষায় বুকে হাত দিয়ে এক দুই তিন· গুনতে লাগল।

দেশ

মানিক চক্রবর্তী

শোভাদির বেলুড় যাবার কথা ছিল। নরু তা ভোলেনি। ভুলবে কেন, শোভাদিকে বেলুড় অবধি না দিয়ে এলেও হাওড়া স্টেশন অবধি অন্তত পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়। বেলা সাড়ে বারোটা-একটার পর নরু তা অনায়াসে পারে। নাকতলা জায়গাটাই আসলে নরুর কেমন যেন ভালো লাগে। আনন্দ আশ্রমের পাশ দিয়ে যখন শোভাদিকে নিয়ে আসতে গেল নরু, ঠিক-ঠিক তখন সাড়ে বারোটা। দুপুরে শোভাদির ওখানে খেলেও হতো। দূর্-বিরক্ত লাগে। আজকাল আবার খুব বেশি দৌড়-ঝাঁপও নরুর ঠিক পছন্দ নয়। পোষাক-আশাক একদমই সে আর পরতে পারে না। গলির মোড়টা যখন ঘুরল নরু, মনে হচ্ছিল স্যাণ্ডেলটা পাল্টে অন্তত কাবলিটা পরে আসলেও যেন হতো। বয়স যত বাড়ছে, নিজেকে তত কুৎসিত লাগতে শুরু করেছে। কিছুতেই মনকে আর বুঝ দেয়া যায় না। তার ওপর এদিক-সেদিক পেট মোচড়ানো, মাঝে মাঝে তীব্র ক্লান্তি বা বিরক্তি, এইসব, যেন ঘর থেকে মোটে না বেরুলেই বেশ হয়। তাছাড়াও শোভাদি, মোভাদি, এ সমস্ত হাবিজাবি সম্পর্কগুলোও আর টানতে পারা যায় না যেন। শোভাদির ছেলে সুব্রত, বেলুড়ে ওভাবে পরশু মারা না গেলে এই রোববারের বাজারে, এখন, এই ভর দুপুরে, নরু অন্তত বাড়ি থেকে বেরুত না। কিছুই না, ছুটির দিনে-টিনে একা একা বাড়িতে আরো তিতিবিরক্ত লাগে, ঠিক কথা, তবু এরকম একটা ভোগান্তির ব্যাপার নরু শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারত কিনা, সন্দেহ। এসেছে অনেকগুলো কারণে। নাকতলা জায়গাটা ভালো লাগে, বটেই, শোভাদিকেও মন্দ লাগে না, কিন্তু এত স্বাভাবিকভাবে নরু এখন এই মহিলাকে না নিয়ে যেতে পারলে শোভাদিরও হয়তো আজকে বেলুড় যাওয়া হয়ে উঠত না। সুব্রতর মৃত্যু, এ ঘটনাটা স্বাভাবিক করে ফেলা যেত না শোভাদির কাছে। নরু অফিস থেকে একটা ফোন করেছে শোভাদির পাশের বাড়িতে, যেন সুব্রতই নরু মারফত খবর পাঠিয়েছে তার মাকে বেলুড়ে একবারটি রোববারে যাবার জন্যে। বাড়ির কাছাকাছি যখন এসে পড়েছে, নরুর এখন গা ঝেড়ে নেয়া উচিত। কিন্তু আবার এ সমস্ত বাধাবিপত্তিগুলো নরুর ঠিক সয় না।

সুব্রত মারা গেছে শুক্রবার সকালে, খবর পেয়ে নরু চলে গিয়ে দেখেছিল, সুব্রতর মৃতদেহটা ঘিরে ওর ফ্যাক্টরির জনা পাঁচ-ছয়েক লোক, মেসের বারান্দায় জড়ো হয়ে আছে। আসলে খবরটা নরুও পেত না, শোভাদি-ই আগে পেত, কিন্তু যে লোকটা খবর দিতে বেলুড় থেকে কলকাতা এসেছিল, সে কেন যেন সুব্রতর মাকে গিয়ে খবরটা সরাসরি দিতে পারে নি। সোজা নরুর কাছে চলে গিয়েছে, আর নরুও একবারটি মাথা নিচু করে, খবরটা শোনার পর, ওকে নিয়েই বেলুড় চলে এসেছে। এসব আর কিছু না, স্রেফ এক ধরনের ঘটনাপ্রবাহ, যে জন্যে বেলুড়েও সুব্রতর ফ্যাক্টরির বন্ধুবান্ধব কেউ আর ও-নিয়ে মাথা ঘামায় নি, নরুকে কিছু বলেও নি। নরু ও আর সবাই সুব্রতকে দাহ করে যখন ফেরে, লাস্ট ট্রেনটা ধরে নরু কোনোরকমে বাসায় এসে নাকি গা এলিয়ে দিয়েছিল। সুব্রত নরুর বন্ধু, কিন্তু তার আগেও শোভাদি, নরুর শোভাদি, যেন আরো বেশি বন্ধু—আরো বেশি কাছের। অন্তত এ যুক্তিতে নরু এখন পর্যন্ত ওরকম উদাসীন থেকে থাকবে। অথবা, সত্যি কথা বলতে কি, সুব্রতর মৃত্যুটাই এমন একটা বোকা, হাবাগঙ্গারামের মতো নরুর কাছে পৌঁছেছিল, নরু যেন ভ্রুক্ষেপই করেনি। শোভাদির দরজার খুব কাছটিতে এসে পর্যন্তও নরু তাই কোনোরকমভাবে সাবধান হবার কথা ভাবছে না; শোভাদিদের নাকতলার বাড়ি, উঠোন আর বাঁশের বেড়া এ সমস্তই যেন বড় বেশি আচ্ছন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত নরু আর সাবধানও হয় নি, তেমন কিছু ভাবও আনেনি তার চালচলনে।

শোভাদি রেডি হয়েই ছিল। শুধু কাপড়টুকুই যা পেঁচিয়ে পরা বাকি, ঘরে ঢুকে মনে হলো নরুর। একটা প্লেটে পায়েস রাখল এমন ঠক্ করে টেবিলের ওপর, তারপর পাশের ঘরে শাড়ি পাল্টাতে গেল, নরুর আর বুঝতে বাকি নেই, সব ঠিক আছে। বারান্দায় কাগজ মুখে করে শিবেনবাবুকে আগেই দেখেছিল নরু, রোদে আর গেঞ্জিতে আর সাদা বেতের চেয়ারে কিংবা শিবেনবাবুর ফর্সা রঙে সব মিলে-মিশে একাকার। আবার দেখল। হিসেবমতো, শোভাদির বর যখন, শিবেনবাবুকে তেমনি কিছু একটা ডাকা উচিত, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে নরু তা পারেনি। নরু কেন, নরুর দলবলের মধ্যে কেউই পারেনি, সুব্রত তো জীবনে কখনো পর্যন্ত নাকি বলেনি। আসলে শোভাদি যে সময় শিবেনবাবুকে বিয়ে করেছিল, সুব্রত কলেজে পড়ে, সুব্রতর বোন পাপিয়া ক্লাস নাইনে। এটাও ঠিক যথেষ্ট নয়, কেননা বাবার মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পর মা আবার শিবেনবাবুকে বিয়ে করেছে, এর ভেতরে মার

ওপর ঐ ভাইবোনদের কোনো অভিমান ছিল না। কিছু হতোও না, যদি শিবেনবাবু লোকটা একটুখানি খোলামেলা গোছের হতো। সে গোড়া থেকেই তার বিবাহিত স্ত্রীর পূর্বতন সন্তানদের দেখেছিল অনেকটা যেন বর্তমান স্ত্রীরই নাবালক-নাবালিকা দুটো ভাইবোনের মতো, যার ভরণপোষণ, আর্থিক দায়িত্ব যেন শিবেনবাবুকে নিতে হবে। তা কেন, প্রথমেই ফুঁসে উঠেছিল পাপিয়া, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ওর মামার বাড়ি ব্যাণ্ডেলে চলে গেল, কিন্তু সুব্রত তা আর করেনি ; অতটা একগুঁয়েমি করেনি। মাকে ছেড়ে থাকার কথা কল্পনাও করতে পারেনি সুব্রত। নাকতলাতেই কাটিয়েছে সে সাতটি বছর, যতদিন না বেলুড়ে চাকরিটা পেয়েছে, আর নিজে নিজে সরে যাবার সুযোগ জুটে গেছে অমনিভাবে একটা। নরু আর সুব্রত গিয়ে দেখে আসত পাপিয়াকে, ব্যাণ্ডেলে, আড্ডা মারত তিনজনে মিলে, এটা প্রায় আরেকটা সমান্তরাল ও পারিবারিক নিয়মের মতোই হয়ে গিয়েছিল, যতদিন না পাপিয়া বিয়ে করে সোমেনের সঙ্গে ঔরাঙ্গাবাদ চলে গেছে—। এমন কি, ফি-মাসে টুকটাক সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর, টুথপেস্ট থেকে আরম্ভ করে পাপিয়ার সব কিছু সুব্রত আর নরু, অথবা কখনো নরু একা, কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শোভাদিও কি যেত না নাকি? শোভাদিকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে ওরা একজন গিয়ে পাপিয়াকে নিয়ে আসত, খুব বেশিদিনের কথাও এসব নয়। বড়জোর কুড়ি-বাইশ মাস আগেকার ব্যাপার। এর মধ্যেই সুব্রত মরে গিয়ে এমন একটা কাণ্ড করল, যে—। শিবেনবাবুর হাতে ধরা খবরকাগজের খসখস শব্দে নরু দেখল, সে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে শোভাদির দেয়া পায়েসটা আদৌ ছোঁয় নি। তাড়াতাড়ি চামচ নাড়িয়ে মুখে দিল। শোভাদির লাল আর সাদা কুকুরদুটো চেনে বাঁধা অবস্থায় বারান্দার মেঝেতে মুণ্ডু পেতে আছে। তার একপাশে, ছোঁয়া বাঁচিয়ে, চশমাসহ কাগজ পড়ছেন শিবেনবাবু। শুক্রবার মারা গেছে সুব্রত। আজ শোভাদি বেলুড়ে যাচ্ছে। নরু শোভাদিকে হাওড়া স্টেশন অবধি এগিয়ে দিয়ে আসবে। বাঃ, বাঃ, বেশ। নরু আরেকবার চেয়ারে দেখল, শোভাদি এসে গেছে বেগনি-বুটি তাঁতটা পরে।

'আজ পায়েস দিলে যে!'

শোভাদির শাড়িটা বড়ো খসখস শব্দ করছিল। 'তোর পায়েসটুকুও খাওয়া হল না রে, গাধা—নে, চ—'

'এই তো।'

'তুই যাবিনে বলিছিলি, যাবিনে কেন বেলুড়ে?'

'অমনি।' যেন বলেই একটু সাবধান হলো নরু। গলা ঝাড়ল। এবং এবার যেন করুণাবশত শিবেনবাবুকে বলল, 'কটা বেজেছে, একটা হয়ে গেল, না?'

শিবেনবাবু কাগজ সরিয়ে বলল—'একটা কুড়ি।'

শোভাদি স্যাণ্ডেল গলিয়েছে। কুকুর-দুটো ছটফট করছিল, যা করে, শোভাদিকে বেরুতে দেখলে। 'বাসনগুলো মাজিয়ে নিও।' শিবেনবাবুকে বলল, 'দেরি হয়ে গেলে মাধুকে দিয়ে রুটি করিয়ে নেবে, ওকে যেতে দিও না আটটার আগে।...চ, ওঠ্।'

শোভাদির সঙ্গে বেরিয়ে এসে নরু আবার যে কে সেই হয়ে গেল। নরু উত্তাপহীন, নির্বিকার, একটা চারমিনার ঠোঁটে ছুঁইয়ে নিল, আর দেশলাই ঠুকতে-ঠুকতে শোভাদির পাশে হাঁটতে থাকল।

'বাসে যাবি, না মিনিবাসে—'

'বাস, বাস—' নরু জোর ধোঁয়া ছাড়ল। মোড়টা পেরিয়ে, ইঁটের পাঁচিলটা ঘুরতেই শোভাদিকে বলল—'সুব্রত কিন্তু জানে না, তুমি আজ বেলুড়ে যাবে—'

'ওমা, সে কি কথা, তুই তালে আমাকে কি খবর দিলি—

'আমি দেখতে চাইছিলাম, সুব্রত তোমার জন্যে বিশ্বাস করে মেসে রয়ে যায় কিনা, বুঝেছ?'

'বুঝেছি, চ। অভিমান, অভিমান করেই তোরা মরলি।' শোভাদির ঠোঁটটা আসলে লালচে, বোধ হয় পান মুখে দিয়েও বেরিয়েছে—শুধু লিপস্টিকের ছোঁয়া না, নরু প্রায় সিওর। শোভাদির চোয়াল নড়ছে খালি।

বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে, শালটা হাতের মধ্যে পেঁচিয়ে শোভাদি আবার বলল—'আসলে তোরা সুখে থাকতে চাস না, অন্যেরও সুখ দেখতে পারিস না, সারা দুনিয়ার রকমসকম দেখছি একরকম, আর তোদের যত সব আলাদা কাণ্ডকারখানা—'

'লেকচার দিও না, থামো দেখি—' সিগারেটটা মুড়িয়ে ফেলতে-ফেলতে নরু বলল। 'এটার মধ্যে অন্যায় কি দেখলে, মাকে বলে দিতে হবে, ছেলের কাছে যাবার জন্যে—? আমি না খবর পাঠালে তুমি তো আজ বেলুড়ে যেতে না—'

শোভাদি মুচকি মুচকি হাসছে? নরুর ভেতরটা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, তাই না? একটু হল যেন। গলার কাছে দলামতো কি একটা আটকে আছে—; কান্না? সর্বনাশ। নরু মুখ ছোট করে নিয়ে একটা শিস দেবার চেষ্টা করল। তাতে করে যতটা দম বার করে দেয়া যায়—দূরে বাসের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে নরুর হয়তো সারা শরীর একবার কেঁপে উঠতেও পারে। যতই সে চেপে থাকুক। শোভাদিকে অমন সেজে-গুজে, হাসি-হাসি ভাবখানা করে যেতে দেখে নরু শেষ পর্যন্ত আবার রাখতে পারবে কি?

হঠাৎ আলগোছে শোভাদির হাতটা জড়িয়ে নিল নিজের হাতে। দোলাল। কিন্তু শোভাদির দিকে তাকাল না। আচ্ছা, মা নাকি সন্তানের মৃত্যু হওয়া বুঝতে পারে, মনে-মনে টের পায়? বাজে, যতোসব আজগুবি কথা—

'এই, শিবেনবাবুর রিটায়ার কবে গো শোভাদি, ১৯৮২? তাহলে আর দু-বছর?'

'ভাট্—আরো তিনবছর। ১৯৮৩র এপ্রিল।—ও যা লোক না, দেখবি, এক্সটেনসান্ হবে। স্বাস্থ্য ভালো।'

'কচু'। ভাগ্যি ভালো নরু আবার ঠিক করে নিয়েছে। বুকে বাষ্প জমছে না বড় একটা। দলাটা কোথায় গেল? কোথায় গেল রে সুব্রত—? হাতটা আরো ঘন করে শোভাদির কানের পাশে দু-একটা চুল যা জমেছিল, তাই ধরে নরু টানল। 'তোমার বরটা বাজে—। কতটা যে বাজে—তুমি ঠিক জানো না—; আমাদের সুখদুঃখের কোনো খবরই রাখে না সে—কি করে যে স্ট্যাণ্ড করো তুমি, এত বচ্ছর হয়ে গেল—'

শোভাদি সেই হাসছে। মাইরি, পাগলি একটা। সুন্দর চেহারাটা রেখেছে, পঞ্চাশ কেউ বলবে না। অথচ নরুর এখনই নিজেকে কুৎসিত লাগে। পোষাক-আশাকের দিকে মন নেই। সুব্রতটাও ছিল কালো, ঢ্যাঙা, মুখ ভরতি ব্রণের ফুটো-ফুটো, পাপিয়াটাও বা কি? যা একটু বঙটা মার মতো পেয়েছে। অথচ চোখদুটো যেন কুকুরের মতো—। শোভাদির কাছে ল্যাং খেয়ে গেছে ওরা সবাই। সব দিক থেকে।

কথা না বলে শোভাদির আঙুলগুলোতে হাত বোলাতে থাকল নরু। এখনো পঁয়ত্রিশ বছরই হয়নি। এর মধ্যেই হাত-পা কাঁপে। লোককে বিশ্বাস করতে ভুলে গেছে। ভালোবাসা বহুদিন আগে থেকেই উবে ভুত হয়ে গেছে।

রবিবারের প্রায় ফাঁকা একখানা বাস পেয়ে গেলে ওরা নাকতলা থেকে উঠে গেল। দুটো বাজতে দশ। বাসের এককোণে একসময় ঘুমিয়েও পড়েছিল নরু। দুটো হাওড়ার টিকিট কাটার যা অপেক্ষা। শোভাদি গেটের ধারে লেডিজদের মাঝখানে কোথায় এখন, নরু একসময় আর দেখতে চাইল না।

হাওড়া স্টেশনে নরুই কেটে দিল বেলুড়ের টিকেট। দুটো কমলাও কিনে দিল শোভাদিকে।

শোভাদিকে ছেড়ে দিয়ে একটা বিচ্ছিন্ন তারার মতই ছিটকে বেরিয়ে এল নরু, স্টেশনের বাইরে। সবই পাল্টে যাবে। নরুর কাছে তো সবই। সে এখন রাস্তায়-ঘাটে আর কোনো জিনিস মন দিয়ে দেখতে চায় না। তবু তার চেয়েও দ্রুত, অথচ উদ্দেশ্যবিহীন নরু, সামান্য তার চেহারা নিয়ে এমন আত্মগোপন ধারা নিচ্ছিল, যেন কিছু একটা তাকে তাড়া করে ফিরছে, সে ধরা দিতে চাইছে না।

কিছুটা হাঁটা শুরু করেছিল ঠিকই, তারপর একটা ট্রামে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে মাঝপথে। কলেজ স্ট্রিটে নেমে শিবুর সঙ্গে দেখা।

'পর্দার কাপড় কিনতেই হবে একটা রে, দেরি হয়ে গেল—' মাফলারটা শিবু বেশ ঝুলিয়ে পড়েছে, সোয়েটারটাও নতুন কেনা বলে মনে হল নরুর। নরু তো জানেই, এত লাফালাফি করছে শিবু এখন, পাঁচটা বাজেনি তো—তাই। একটু পরে কুয়াশায় কিছুটা ঢেকে যাবে যখন, শিবু ঘাড় গুঁজে হাঁটা ধরবে ওয়েলিংটনে—বাংলা মদের ওখানে। খামোকা এর মাঝখানে আর হাতে বোঝা বাড়ানো কেন, নরু করুণভাবে হাসল।

'রোববারে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিস, একা একা? বৌ?'

'বৌ তো হাজারিবাগে—একমাস থাকবে।' চোখ কুঁচকে শিবু জহরলাল পান্নালালের দিক থেকে রাস্তা পার হওয়া লম্বা মেয়েটাকে দেখছিল, পুলওভারে ঢাকা— লাল।

'ওরকম পর্দা কিনবি—?' নিচু করে নরু বলল। শিবু টি-ট্রেডিং-এ আছে, গত বছর ভয়ংকর একটা অপারেশান হয়েছে ওর, শিবুর কাঁধটা ঘুরিয়ে নিয়ে নরু মৃদুভাবে বলল—'সুব্রত মারা গেছে জানিস?'

তড়িতাহতের মতো শিবু চেঁচাল বড়-বড় চোখ করে, 'যাঃ সুব্রত? ইমপসিবল্—'

'স্ট্যাবিং' স্থিরভাবে নরু বলল। 'তাছাড়াও হার্ট খারাপ ছিল, বেশিক্ষণ লাগেনি প্রাণটা বেরোতে—' হাতটা মুঠো করছিল আর খুলে দিচ্ছিল নরু। বুকের মধ্যে সেই দলাটা।

'পেপারে তো কই লক্ষ্য করলুম না, বেলুড়ে—তাই না?' শিবু শুকনো মুখে বলল। 'ছি-ছি—'

'পেপার আবার কি লক্ষ্য করবি—' নরুর কথা বলার মন নেই, ঘাড় উঁচিয়ে সে রাস্তার চারদিকে দেখছিল, ছটফট করছিল।

শিবু ফিসফিস করে বলল, 'সুব্রত কি করত?'

'জানি না—কি করত, ধর্ না কিছুই হয়তো করত না, কিছুই না—'

'ধ্যেৎ, অবিশ্বাসের মতো করে শিবু বলল, 'তুই জানিস না হতে পারে, তাই বলে কিছু একটা না করলে লোকে এভাবে আচমকা মরে? ইমপসিবল্—'

'বাঞ্চোত, যা বলছি শোন না—কিছুই করত না। খানিকটা অসহিষ্ণুর মতো নরু বলল। 'এই যে, আমি আর তুই। আমরা কিছু করি, রে—?'

'আরে ধ্যেৎ, আমরা তো কমনম্যান';

'সুব্রতও কমনম্যান ছিল।'

'তুই জানিস না।'

'বলছি তোকে, সুব্রত মা আর বোন ছাড়া আর কিছু জানত না—সুব্রত এমনকি বন্ধুবান্ধবও খুব বেশি জানত না—'

'হ্যাঁ, জানত না আবার, প্রায় শনিবারে মাল খাচ্ছি আমরা কে. টিতে, আর বলে দিলি অমনি, কেন, গত শনিবার ভোটের আগের দিন, তার আগের শনিবার, তারো আগের শনিবার—তুইও তো—'

নরু চুপ করে রইল। নরু জানে, আজকের সন্ধোটা, রাত্তিরটা তার কেমন যাবে। নরু আজ বেলগেট পেরিয়ে আর বেশি দূর যেতে পারবে না।

'পর্দার কাপড় কিনবি, সত্যি? পর্দার কাপড়। নরু হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলল। আলোয়ানটা অনেক ছোট করে নিয়েছে। পৌষের শেষ-দিককার সন্ধো, তবু শীত নেই, আশ্চর্য।

'নাহ্, পর্দার কাপড়, নো—যা একখানা খবর শোনালি—মিস্টিরিয়াস—হেল্ সুব্রত—নাহ্।'

'মদ খেতে যাবি?' নরু আবার জিজ্ঞেস করল গম্ভীরভাবে। হাতড়ে একটা সিগারেট বার করল।

বোববাব, তবু যেন কেমন বই-বই গন্ধ। অথচ আমাদেব যৌবন-টৌবন, কি বলে গিযে, সব যেন শেষ হযে আসছে। কোনোকিছু কবাই বুঝি গেল না—। দেশেব সব হযে গেল এদিকে—

'তুই না বললে, জানিস নরু—আমি বিশ্বাসই কবতাম না, ভাবতাম—সুব্রতব মা-টা মাবা গেছে বোধ হয। অথবা আর কেউ।'

'মা?' হো-হো কবে সুব্রত হেসে উঠল। 'শোভাদি? ওহ্ হো হো—শোভাদি মাবা যাবে কিবে, নতুন বিযে, আব চেহাবাখানা বেখেছে জানিস, চেহাবাখানা? গোব্দা-গোব্দা হাত, খাডা-খাডা বুক, ভাবি আব ছডানো পাযের পাতা।...আব বঙ, মাইরি, তুই দেখিস নি বোধহয, দেখেছিস?'

শিবু অবাক হয়ে নরুকে শুনছিল। কিছু বলল না। শুধু হাঁটতে শুরু করল। নরু বলল, 'কিবে, চললি? মদ খাবি না?'

'নরু, তুই আনপার্লামেন্টারি কথা কইছিস, তুই ঠিক নেই। আমি এখন যাব না, পবে তুই চলে যা, পাবলে বাডি চলে যা—'

'ধ্যেৎ বুদ্ধু' নরু জোর একটা সিগাবেটে টান দিয়ে শিবুব সঙ্গে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। 'কোনো ব্যাপাবই না, বুঝলি, কোনো ব্যাপাব না, যে দেশে আমবা জন্মেছি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ না জন্মে আবো কযেকটা বেশি শুঁডিখানাব মালিক আব বেশ্যাবাডির দালাল জন্মালে বেশ হতো—একটা পথ পেতাম, জানিস?'

'নরু, তুই—' শিবুব চোখদুটো ভীষণভাবে যেন জ্বলে উঠল। তাবপব দাঁডিযে পডে চোখ দুটো কুঁচকে নরুকে বলল, 'ছি ছি, তুই নিজেই না একজন সিভিল সার্ভিসেব লোক? সত্যি—আমাদের দেশটাই না, কি যে একটা গোলমাল হচ্ছে।' কিছুক্ষণ নরুর দিকে তাকিয়ে, নিঃশব্দ থাকাব পব শিবু বলল, 'আচ্ছা—সুব্রতব মৃত্যুটা কি আমবা এভাবে ফিল্ কবব নাকি—নরু—কি হচ্ছে, সুব্রতকে অন্তত একটু চিন্তা কবতে দে—।'

নরু দাঁডিযে-দাঁডিযে একটু চোখ বুজল। বেলগেট। ক্রিং ক্রিং ক্রিং কবে অবিরাম ঘন্টা বেজে যাচ্ছে গেটেব গুমটিতে, বড একটা টাইমপিসের শব্দের মতো। গেট পডে আছে। লোকজন ঘাড নিচু কবে গেটটা পেবিযে, রেললাইন পেবিযে, আবার ট্যাংবাব দিকে চলে যাচ্ছে। কে সুব্রত? কে শোভাদি? নরুর রেলগেট ওদেব কাউকে চেনে না। শুধু নরুকে চেনে।

চোখ খুলে নরু দেখল আবার কলেজ স্ট্রিট। ওর সামনে দাঁড়িয়ে শিবু। শিবু হাত বাড়িয়ে নরুর কাঁধে হাত রাখল।

'চল্ নরু—হাঁটা যাক।'

'চল্।'

খুব সকাল-সকালই, অত সকাল-সকাল ওরা এখানে আসে না, ঘড়িতে ছটাও বাজে নি। খালাসিটোলায় আজ মনে হচ্ছে একটু ভিড় কম, তবু কয়েকজন পরিচিত কবি, তরুণ-প্রৌঢ় সবরকমের, কয়েকজন চেনা এ পাড়ার সাহিত্যিককে ভেতরে বসা দেখে নরুর যেন বিরক্তই লাগল খানিকটা। শনিবার হলে কথা ছিল—।...লেখে কখন তাহলে? কখন লেখে?

'একটা জলের বোতল নে। খুচরো চল্লিশ পয়সা আছে? নে—' নরু নিজে কাউন্টারে ফাইল একটা, আর বড় বোতল কিনতে গেল। কুড়ি টাকার নোট দিল। নিমেষের মধ্যে শিবু চারকোণা, চ্যাপ্টা আর বেঁটে জলের বোতলটা নিয়ে এসে নরুর পাশে দাঁড়াতে নরু বলল, 'জল ভরে নে।' মদভরতি ছিপিগুলো কাউন্টারে খুলে, দু-হাতে দুটো নিয়ে, নরু সারি সারি বেঞ্চিগুলোর একেবারে একমাথায় দাঁড়াল। গিসগিস করছে লোকের মাথা আর সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের গন্ধ।

'এই যে নরেশবাবু, এই টেবিলে—নরু, নরু, এই টেবিলে এস। এখানে।' উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে কয়েকজন নরুর বয়সী ছেলে, ওরা কবি, নরু আর শিবুকে ডাকল।

'ঠিক আছে—' নরু হাত তুলে ওদের বলল। বলল মানে কি, ওরা তো আর শুনতে পাবে না। ঐ, হাত তুলে দেখাল।

'কোথায় বসবি—' চাপা গলায় শিবু বলল পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে জল-ভরতি বোতলটা ধরে রেখেছে। ওটা বিলিতি একটা মদের খালি বোতল। গা-ভরতি ছেটানো, ছোট ছোট স্পট। শালা ঠিক সুব্রত—। নরু সামনেই দেখল, লম্বা বেঞ্চিটায় একজন মাত্র বসতে পারে, এমন জায়গা রয়েছে। ঠিক পেছনটা আরেকটা জলের কল। সঙ্গে চাটের দোকান।

'তুই ওখানটায় বসে পড়, শিবু। আমি দাঁড়াচ্ছি।' একটা বেঞ্চি আর হাইবেঞ্চিতে মোট চারজন-চারজন করে এপাশ, ওপাশ বসতে পারে। সবাই ঘোর মাতাল। অন্তত এ বেঞ্চিটায়, যার এককোণে শিবু গিয়ে বসল এবং জলের বোতলটা রাখল, নরুর হাত থেকে ছোট-বড় মদের বোতল দুটোও নামিয়ে রাখল ওখানে।

প্রথম-প্রথম ওদের পাড়ার দিকে, বা এখানেও, যখন সুব্রতর সঙ্গে নরু এ সমস্ত পানশালায় আসত, সমস্ত মাতালের মধ্যে নিজেদের কেমন ভয়-ভয় করত। যেন কোনোরকমভাবে কিছুটা না খেতে পারলে আর এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। এখন হাসি পায় ওসব ভাবলে। কত বচ্ছর হয়ে গেল সব।

'এই যে, ও নরেশ—নরু—এখানে এস না—এখানে?' উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আবার ওপছানো চিৎকার ওরা শুনতে পেল। 'আরে কথা আছে ভাই—কথা আছে—এখানে এস না? কাম হিয়ার—'

বোতল খুলে, ঢেলে, জল মিশিয়ে, চোখ বড়-বড় করে নরু বলল, 'খুরি নেবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, দেখেছিস্—শিবু, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিস?'

'হ্যাঁ'।'

'চিয়ার্স ফর সুব্রতস্ সোল্'

'চিয়ার্স।' প্রথম ঢোঁক গিলে, নরু পকেট থেকে সিগারেটের বড় প্যাকেট আর দেশলাইটা বেঞ্চের ওপর রাখল। চারদিক থেকে গগনফাটানো চিৎকার হচ্ছে। শালা—কিসের সুব্রতর মৃত্যু, কিসের শোভাদিকে হাওড়া স্টেশনে ছেড়ে পালিয়ে আসা, কিসের ইলেকসান, মেজরিটি, স্ট্যাবিং আর বিজয়- বা শোক-মিছিল? এ সবের চেয়ে রেলগেট এখন নরুর কাছে অনেক বেশি সত্য। আর কোনো কিছুর দিকে তাকাবার দরকার নেই—কারুর কথাই নরু ভাববে না। মরু—।

'দুটো একসঙ্গে নিলি কেন, বড়টা আনলেই হতো, পরে না হয় ছোট একটা পাঁইট আনা যেত।' শিবু মুখ তুলে নরুকে বলল। 'তুই আজ খুব খেপে আছিস নরু—আজ তোর চট্ করে ধরে যাবে—'

'না-না।'

'ঠিক কথা, সুব্রতর মৃত্যুটা খুব মিস্টিরিয়াস, আমরা হয়তো কিছুই জানিনা ঠিক, তাই?'

'ছেড়ে দে।'

আস্তে আস্তে ওরা বেশ অনেকটা খেয়ে ফেলেছিল। নেশাও যেন আসছে। বেঞ্চের আরেকটা লোক এবার গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়েছে। নরু বসতে পারে।

তরুণ কবির দলটা তখন নরুর প্রতি চিৎকার করেই যাচ্ছিল। 'আরে মশাই ডাকছি—এই নরু—এদিকে আসুন না একবার, শুনুন না—' নরু মুচকি-মুচকি হাসছিল। তার শোভাদিকে মনে পড়ে গেল হঠাৎ। শোভাদি ওদের এভাবে হাসা শিখিয়েছে। মাইরি। অথচ শোভাদি জানেনা নরুর বেল-গেটের খবর। সুব্রত জানত না। কাউকে জানাতে ইচ্ছে নেই নরুর, নাকতলা, নাকতলা সব পথ ভুলে যাবে একদিন।

কবির দলটা এবার ওদের বেঞ্চের ধারে দাঁড়াল এসে। সবাই না, দু-তিনজন। ভাস্কর আর অভীকে চিনল নরু। ড্রাংক, একেবারে ড্রাংক। কালী আসেনি—বসে আছে। আরো বসে আছে। অশোক আছে, রমানাথ আছে, অমল আছে। রমানাথ, অমল গল্প লেখে।

ড্রাংক তিনজন নরু আর শিবুর বেঞ্চ ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। বসার জায়গা নেই।

'ডাকছি শুনছেন না, একটা বেট্ লড়বেন? নরু?' নরু এখনো মুচকি-মুচকি হাসছে।

'কিসের বেট? বাজিটা কিসের?'

'গরু মেরে জুতো দান, কথাটা তো আপনি শুনেছেন? শোনেন নি?'

'শুনেছি।' মদে চুমুক দিতে-দিতে নরু বলল।

'আই সে—বঙ্। গরু মেরে জুতো দান, ইনকারেক্ট। ওটা হবে, জুতো মেরে গরু দান—রাইট?' চোখ বুজে সামান্য একটু চিন্তা করল নরু। মাথা দোলাল। তারপর বলল—'ঠিক বুঝতে পারছি না। জুতো মেরে গরু দানই হবে বোধ হয়। কি জানি—'

'আমরা ফিফ্টি-ফিফ্টি। কেউ বলছে, গরু মেরে জুতো দান, আবার কেউ—'

'বুঝেছি।' নরু বলল।

'এখন আমরা কি করব, আমি নিজে প্রবাদমালার বই দেখেছি, রিসেন্টলি, গরু মেরে জুতো নেই। আয়াম স্যুর।'

ওদের মধ্যে শুধু শিবু কিছু বলছিল না। আগাগোড়া শুনছিল। একসময় বাথরুমে একটু যাবে বলে উঠে গেল।

'এক কাজ করুন না, কটা বাজে, হুম্-ম্—সাতটা বাজতে কুড়ি, ডঃ সুকুমার সেনকে একটা ফোন করে জেনে নিন না—বাড়িতেই নিশ্চয় পাবেন।'

'রাইট্—বাঃ, বাঃ, সুন্দর বলেছেন তো—যাই, তবে বাইরে থেকে ফোন

করে জেনে নিই।' ওরা রাজি হল। একটু গিয়েই আবার ফিরে এল, 'কিন্তু ফোনগাইডে ডঃ সেনের কোনটা বুঝব কি করে, নামটা খুবই কমন্—আমরা তো ঠিক বাড়ির ঠিকানাটা জানি না, মুস্কিল—তাছাড়া, বুড়ো মানুষ, ধমকে দেবে না তো?'

'দাঁড়ান। আবার একটু চোখ বুজে নিয়ে নরু বলল। চোখ বুজতে গিয়ে মনে হল, নরুর যেন নেশা হয়েছে, বেশ নেশা হয়েছে। 'ঐ বিশ্বরূপা থিয়েটারের কাছাকাছি থাকেন ডঃ সেন, দাঁড়ান, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট—দীনেন্দ্র স্ট্রিট-ট্রিট হবে বোধহয়।'

'বেশ—বেশ।' ওরা এভাবে ওখান থেকে সরে বাইরে গেল। যেতে যেতে বলল, 'কিন্তু মশাই আপনি কোন্ দলে—?'

এবার বেশ তীব্রভাবেই হেসে ফেলল নরু। 'আরে, হবে-খন—একটা তো হবেই।'

দেখতে-দেখতে ওদের বড় বোতলটা শেষ হয়ে গেল। শিবুকে বলল নরু—'কিরে, ঠিক আছে ত?'

'আমার সুব্রতর কথা কেবলই মনে পড়ছে, নরু—মাইরি—মা শেতলার দিব্যি—'

'ছাড়্ না'

'তোর মনে পড়ছে না, সত্যি করে বল্‌তো—মাল ছুঁয়ে বল্—'

'স্টপ্। আঃ' কিছুক্ষণ আবার চোখ বুজে থাকল নরু। এখন অন্য পরিস্থিতি। দলা-টলা বুকের মধ্যে জমছে না। কান্না? ফুঃ? মাথাটা আস্তে-আস্তে ঝিম্ মেরে আছে। অথবা মাথাটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে। নরু আজ বেলগেট পেরিয়ে আর বেশিদূর যেতে পারবে না।

'খাবি তো, কিরে—?' শিবুকে যেন ধমকের সুরে বলল নরু। 'একটু চাট্ ফাট্ নিয়ে আয় না—ছোলা? তোর তো বাড়ি ফেরার কোনো তেমন ব্যাপার নেই—বউ হাজারিবাগে—বউ নেই, পর্দার কাপড় কার জন্যে কিনতে চাইছিলি, বল্ তো?'

'মা ভাববে না?' শিবু উঠে দাঁড়িয়ে কথাটা ফেরত দিল। 'তাছাড়া ট্রেনে যেতে হবে, সোদপুর।...যাকগে, ঠিকাছে—'

শিবু চাট আনতে গেলে, নরু আবার, হয়তো শেষবারের মতো শোভাদির কথা ভাবল। সাতটা প্রায় বাজে। শোভাদি এখন ঠিক কি অবস্থায় আছে, সইতে পারবে তো শোভাদি?.. শোভাদি—সবাইকে ছেড়ে সুব্রতটা চলে

গেল। কোথায় আছে, কি করছে, কি দেখছে? সব দেখতে পাচ্ছে? খালাসিটোলায়, বেলুড়ে আর ঔরাঙ্গাবাদে পাপিয়াকে? আমি বেলগেট দেখতে পাচ্ছি। সুব্রত বা শোভাদি বা পাপিয়া, ওরা কেউ কোনোদিন বেলগেট দেখতে পাবে না। বেলগেট শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি।

আবার হৈ-হৈ। শিবু তো অনেকক্ষণ চাট নিয়ে এসে বসেছে। বেশ কয়েকদানা ছোলা আর কাঠিতে তুলে আলুর টুকরো খাওয়া শুরু হল। তরুণ কবির দল ফিরে এল। হৈ-হৈ করছে নরু আর শিবুর বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে।

'পাওয়া গেছে মশাই—ফোনে পাওয়া গেছে স্যারকে - ঐ গরু মেরে জুতো দান-ই কারেক্ট; আমরা বললুম, প্রবাদমালায় জুতো মেরে আছে, বললেন ভুল, গরুই কারেক্ট।—থ্যাংকু নরু—থ্যাংকু—আরে ও টেবিলে আমাদের সঙ্গে আসুন না—কি হল আজকে—'

ওদিক থেকে ওরা চিৎকার করছে। 'কিরে ভাস্কর—এই অভী, বাব্‌লু—এদিকে আয়।'

কোথা থেকে যেন ভাঙা আর মদ-জড়ানো গলায় রবীন্দ্রসংগীত ভেসে আসছে। বোরবার বলে লোডশেডিং হল না—

নরু খেয়াল করল, অনেকক্ষণ সে ওঠেনি। একবার উঠে জল ছেড়ে এলেও হয়। শীত তেমন কই। মদ খাবার জন্যে না, শীতই নেই।

নরু একসময় বোধ হয় বলল, 'শিবু—তুই আর খাবি?'

নরু দেখল, শিবু হাসছে। বুঝল, ওর ভাষা আর কাজ করছে না। সমস্ত রকমের যোগাযোগগুলো ক্রমশই ক্ষীণতর হয়ে আসছে—

তারপর নরু একসময় ছায়ার মতো দেখল, টলতে-টলতে শিবু উঠে খালাসিটোলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

মৌলালি অবধি বোধ হয় নরু হেঁটেই গিয়েছিল। সর্‌সর্‌ করে এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে মুতে নিল। তখন বোধ হয় ও জায়গাটা জুড়ে পুরো অন্ধকারই হয়ে গিয়ে থাকবে। লোডশেডিং? হ্যাঁ, লোডশেডিংও হতে পারে। একটা দোতলা বাস আরো অন্ধকারের দিকে মোড় নিতে, কেমন করে যেন নরু ধরে ফেলেছিল। মন্দ ভিড় ছিল না। নরু বোধ হয় বসতে পায় নি। বেশ হাল্কা, বাবুর মতোই লাগছিল তার। তবু শান্ত, গম্ভীর এবং আরো বেশি লোকের মধ্যে নিজেকে সেঁটে নিতে পেরে, অনেকক্ষণ ধরে

নরু বুঝেছিল, শীতকালই হবে এটা। তাই সুবিধে হয়েছে। এ বাস তাকে রেলগেটে নামাবে না, তবে তার লক্ষ আছে, কোথায় নামলে ঠিক-ঠিক রেলগেটের মুখটায় গিয়ে পৌঁছনো যায়। একসময় সে বুঝতে পারল, শুধু বাসের শব্দটুকু, দোতলার ডেকে হলুদ আলোর পরিবেশটুকু আর কণ্ডাক্টারের ঘন্টির টুং টুং আওয়াজ ছাড়া সে কিছু শুনতে বা দেখতে পাচ্ছে না—বাইরে বেশ অন্ধকার ও লোকালয়হীন প্রায়-নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে তার বাস যাচ্ছে, এটুকু মাত্র টের পাওয়া যায়।

নামতে-নামতে, হোঁচট খেতে খেতে, সে যেন একসময় ঠিকঠাক বুঝতে পারল কোথায় সে এসেছে, এবং বুঝতে পারল, কিভাবে তাকে যেতে হবে; একবার পলকের জন্য মাত্র সে চলে যাওয়া বাসটা দাঁড়িয়ে লক্ষ করল দূর অন্ধকারের ভেতরে। বোধ হয় হাতও নেড়েছিল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র, যেন অত্যন্ত দ্রুত সে ঐ সম্পর্কটুকুও অন্ধকারে মিশে যেতে দেখল।

যতটা সম্ভব স্থির, ঋজুভাবে সে এবার হাঁটতে শুরু করল। দুপাশেই ঠাসা বাড়ি, বাড়ি তো বটেই, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমানদের, কখনো-কখনো একটানা গর্মেন্ট ফ্ল্যাট, তার মাঝখান চিরে কোথায় যে রেললাইনটা চলে গেছে, সেটুকুও ভাবতে ভাবতে সে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে দু-পা ফেলে ফেলে কোনোরকমে পৌঁছে যাবার কথা ভাবল, যদি কোথা থেকে এতটুকু ট্রেন যাওয়ার শব্দ সে পেয়ে যায়।

আরো অনেকক্ষণ, কত সে জানে না, কোনো যুমু যাবার শব্দ না পেয়েও সে একসময় বুঝল, এবার ডানদিকে তাকে যেতে হবে; বাঁদিকে ঘুরলে, কিংবা ঐ তো সে শুনতে পাচ্ছে রেলগেটের একটানা ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং আওয়াজ। দুটো বাতি জ্বলছে গেটের দুদিকে। ভূতের মতো একটা মানুষও চলাফেরা করছে, গলাবন্ধ কোট পরে।

নেশা—প্রচণ্ড নেশা, হাতড়ে হাতড়ে সে দেয়াল আর দু-চারজন মানুষের চলাফেরা সব উপেক্ষা করে একটা আধভাঙা দরজা হাতে ঠেলে উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়ল, আর সরাসরি দেখল কুপি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে। এবং ঠিক সে সময়ই প্রচণ্ডভাবে ঘরদোর কাঁপিয়ে রেলগেটের ওপার দিয়ে একটা ট্রেন, জলপ্রপাতের শব্দের মতো এক ঝলক বেরিয়ে গেল।

'আপনি?' কুপির আলোটা কিছুক্ষণ রোগা শরীরের ওপর, ডুরে শাড়িটায় স্থির হয়ে রইল। '...আসুন, ভেতরে চলে আসুন—'

মাটির ওপর দিয়ে যেন টেনে, হিঁচড়ে, দুমড়ে, নক প্রথমে সিমেন্টের

দাওযায এসে উঠল। তারপব ভেতবে ঢুকল। ছোট্ট ঘবটাব প্রায সবটাই জুড়ে একটা তক্তপোষ, তাব ওপর কাঁথামুড়ি দিযে কে যেন শুযে আছে। বোধ হয় বাচ্চা একটা ছেলে।

'এই, ওঠ্-ওঠ্', বিছানাটা যতটা পাবে, অমনি গোছগাছ কবতে-কবতে, আব হাফপ্যান্ট দুটো চাপড দিতেই ছেলেটা উঠে চোখ কচলাতে শুরু করল। 'কি ঘুম, বাবা—শুতে না শুতেই—যা, ওঘবে ঘুমো এখন মাব সঙ্গে। যা—'

নরু দেখল, মেয়েটাব ঘবে একটামাত্র ক্যালেণ্ডাব, কেরু কোম্পানিব, গেঞ্জি পবে বসে থাকা একটা মেয়েব ছবি, যেটা কিছুদিন আগে বৌবাজাবে নরু মেযেটিকে দিযেছিল।

'তোমাদেব খাওযা-দাওযা হযে গেছে?' দেখল রোগা মেয়েটা বিছানাটা ঝেড়ে, একেবাবে দেযালেব কোণে সেঁটে দাঁডাল গিয়ে। কুপিটা জানলাব ওপব বাখল। বসতে বসতে নরু আবাব বলল, 'খাওয়া-দাওযা কবেছ, না?'

মেযেটা জানালা দিযে বাইবেব অন্ধকাবটা একবাব দেখে নিল। তাবপব চাপা গলায বলল—'আপনি মদ খেযে এসেছেন?'

'হ্যাঁ সবি—। আসলে বমা, আমাব এক বন্ধু মাবা যাওযাব ব্যাপাবে এতো ভেকেন্ট লাগছিল—'

'সে আপনি খান না গিযে, আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে, এভাবে—' কুপিটা মেঝেতে নামিযে বমা জানালাব পাল্লাদুটো আটকাল। তাবপর নরুর সামনে এসে বলল, 'দবজাব খিলটা দিযে দেব?'

'এখুনি?' দু-হাতেব ওপব হেলান দিযে নরু বিছানায বসেছিল। সোজা হযে বলল—'তুমি খাবে না?'

'আমাদেব খেতে-খেতে বাবোটা—বাবা আব ভাইটা খেযে নিযেছে। মেজভাই এখনো তো পটাবি থেকে ফেবেনি—সে ফিবলে তবে।

'ও।'

নরু এবাব দু-চোখ মেলে রমাকে দেখল। ভালোভাবে। আবো ভযংকব বোগা লাগছে ঘবেব ভেতরে। এব আগে যতবাবই এসেছিল, সব দিনের বেলায, এ ঘরেও আগে ঢোকেনি। ডানদিকেব উঠোন দিযে ঐ ঘবে বসেছিল।

নরু আবাব ঘাড ঘুবিযে ক্যালেণ্ডারটা দেখছে। গেঞ্জি পবা একটা মেয়ে।

কটা চোখ। চুল এলিয়ে বুকের ওপর গিয়ে পড়ছে। অত্যন্ত পুষ্ট স্তন। ছুঁতে ইচ্ছে করে।

'পাশে এসে বোস না—ভয় করছে?'

'না, ভয় কি।' কাঁধের ওপর আঁচলটা তুলে দিল রমা। পুরো আধখানা শরীর, ব্লাউজশুদ্ধু, শাড়িতে ঢেকে ফেলল। তারপর পায়ে-পায়ে আসতে যাবে, হয়তো তক্তপোষের কোণটায়, অনেক দূরে গিয়ে বসত, নরু মেঝেতে উবু হয়ে বসে হঠাৎ কুপিটা নিবিয়ে ফেলল।

হাত বাড়িয়ে শরীরটা পেয়ে গেল নরু। সামান্য দুটো কাঁধ, মাটির প্রতিমার মতো দুই স্তন, পেট, ডানদিকের উরু মিনিটখানেক খামচে ধরে রইল। আবার বিশ্রী এক ঝলক ট্রেনের শব্দ। ক্লান্তভাবে তক্তপোষে বসে পড়ল। কপালের রগ-দুটো ছিঁড়ে যাচ্ছে।

জানালার ঠিক পাশ দিয়ে লোকজন চলাফেরার মৃদু আওয়াজ। কেউ কেউ দাঁড়াচ্ছেও যেন খানিক।

'শরীর খারাপ লাগছে? মাথা টিপে দিই?' রমা এত কাছে, আর ঘরের মধ্যে আবছা একটা আলো বাইরের রাস্তা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে আধখানা খোলা দরজার ভেতরে এসে যেন ঠোকরাচ্ছে সব।

অন্ধকারে দ্রুত মানিব্যাগটা খুঁজে পাবার চেষ্টা করল নরু। আন্দাজে দুটো নোট বার করল।

'না-না, ছিঃ—না।' খসখস শব্দে নোট দুটো মেঝেতে গড়াচ্ছে।

'পাগলামো কোরো না—রাখ।' দাঁতে দাঁত চেপে বলল। 'তোমাদের এখান থেকে লাইন ধরে-ধরে হেঁটে শেয়ালদা যাওয়া যায় না—যাওয়া যায়?'

'আপনি রাত্তিরে এ ঘরে থাকতে পারেন। মানুষে অসুখ করলে থাকে না?'

'আমার অসুখ করে নি। সামান্য একটু নেশা করেছিলাম, আস্তে আস্তে এখন একটু সুস্থ লাগছে।' অন্ধকারে মেয়েটার রেখা আন্দাজ করে নরু তারপর বলল, 'নোট দুটো তুলে রাখো, নইলে কখনো আর আসব না। এই শেষ।'

অন্ধকারেই যা হবার হল। মেয়েটা উবু হয়ে নোট দুটো তুলে কুলুঙ্গিতে নিয়ে রাখল। তারপর নরুর গা ঘেঁষে, তক্তপোষে নরুর একেবারে কাছে বসল। কি করবে কিছু যেন ঠিক করতে পারছিল না।

কোথায় যেন ঢং ঢং করে রাত এগারোটা বাজল। অনেকগুলো কুকুরের

ডাক আসছে। এখনো মাঝে-মাঝেই ট্রেনের আওয়াজ। কান পাতলে বুঝি বেলগেটের ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং অবিরত আওয়াজটাও পেয়ে যেতে পারত নরু।

অন্ধকারে ক্যালেণ্ডারটা দেখা যাচ্ছিল না। তবু ক্যালেণ্ডারের মেয়েটার মতোই কটা চোখ, চুল এলানো, লাল-বর্ডার দেওয়া গেঞ্জিটা খুলে দুটো বিশ্বাসযোগ্য স্তন আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত নয় এমন বর্তুল উদর, শক্ত পায়ে দাঁড়াবার দুটো মুগুরের মতো ঠ্যাং, তার মাঝখানে প্রদীপের মতো জীবন্ত, উদ্দীপক ভূখণ্ডটুকু যেন খুঁজে-খুঁজে ঠিক শেষ পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছিল নরু। এই আমার দেশ—ভারতবর্ষ—

এক সময় মেয়েটার খেতে যাবার সময় হল। ওর মেজভাই ফ্যাক্টরি থেকে ফিরেছে।

পবিত্রতার অদল-বদল

কেশব দাশ

এক

ছয় নয়, এখানে তিনটি ঋতু বারোমাসে, তিনটাই—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এখানকার মানুষের খিন্ন জীবনে লুঠেরার মতো হানা দেয়, তামাম এই বস্তি তল্লাটে। বছরে বাকি তিন ঋতুর লাজুক স্পর্শ, মাঠ-নদী-নগর পেরিয়ে কখন যে এই গলি ঘুপসির সংকীর্ণ জীবন ছুঁয়ে যায়, এরা মালুম পায় না।

নানির ঘুম ভাঙে। ঘুম অবশ্য ওর সারা রাতেও হয় না। শুধু ঘুমের আবেশ, বাইরে থকথকে কুয়াশার মতো, ওর চেতনায় ঘিরে থাকে। একটা খুপরি, মাটির দেয়াল, একটা জানালা, একটা দরজা। সব বন্ধই থাকে। তবু রাত বাড়ে, আর ঠাণ্ডায় ঘরের বাতাস ভারি হয়, আর নানির দলা-পাকানো ন্যাতার মতো দেহে শিরশিরানি বাড়ায়।

গায়ের তেলচিটে ভারি কম্বলটা সরিয়ে নানি উঠে বসে। ডান দিকে শরীর হেলিয়ে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়। মেঝের ওপর পাতা আর-একটা বিছানায় হাত বুলিয়ে অনুমান নেয়। না, সায়ের নেই। 'কাঁহা কাঁহা ঘুমে রাতভোর, ক্যা মালুম!' সায়েরের বিছানার দখল নিয়ে শুয়ে থাকা একটা কুকুরের গায়ে নানির হাত লাগে। কুকুরটা বিরক্ত হয়। 'গ-র-র' করে শরীর আরো গুটিয়ে ফেলে। নানি অন্ধকার হাতড়ে বিছানার পাশে রাখা লাঠিটা খুঁজে নেয়। তারপর কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দরজার সামনে নোনা ধরা ইঁটের দেয়াল, ছিটে বেড়া, টালির চাল ডিঙিয়ে ভোরের কৃপণ আভা ঘরে ঢুকে পড়ে। নানি ঘর ছেড়ে বস্তির গলিতে পা দেয়।

সমগ্র বস্তি এখনো ঘুমে বেহুঁশ। ভোর গড়িয়ে সকাল। তারপর সকাল গড়াতে-গড়াতে সূর্যটা যখন আকাশ বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠে আসে, আর সূর্যের তাপ হয়ে ওঠে গায়ে লাগার মতো, তখন বস্তির ঘুম ভাঙে। চটকলে প্রথম শিফ্‌ট্‌ শুরু হয় সকাল সাড়ে পাঁচটায়। প্রথম শিফ্‌টে যাদের ডিউটি, তেমন গুটিকয় মানুষ প্রথম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। আর তার একটু আগে নাইট শিফ্‌টে যাদের ডিউটি ছিল, তারা সারা রাতের শেষে ক্লান্ত টলমল শরীরে ফিরে আসবে ঘরে।

শীতের সকালে ঠাণ্ডার কামড়। কাঁপ ধরিয়ে দেয়। দাঁতে দাঁতে অনবরত ঠকঠকানি। শরীরের রক্ত হিম। নানি গায়ের কম্বল টেনেটুনে শক্ত করে জড়িয়ে নেয়।

সামনে গলিটা যেদিকে সোজা গিয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, নানি সেদিকে হাঁটা দেয়। হিম আর কুয়াশায় সামনের গলিপথটাও ঠিক নিরিখ করা যায় না। গলির ধারে পোস্টের বাতিগুলো এখনো জ্বলছে। জ্বলন্ত বাতি থেকে ছড়িয়ে পড়ার আগেই থকথকে কুয়াশা ব্লটিং কাগজের মতো আলো অনেকটা শুষে নিচ্ছে।

নানি ঠুকঠুক হাঁটতে হাঁটতে শুকদেবের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। দোকানের ঝাঁপ এখন বন্ধ। ভেতরে শুকদেব ঘুমায়। বাইরে ঘেঁষ-চাপা উনানে এখন লাল-নীল লকলকে আগুনের শিখা। নানি দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দেয়—'শুকিয়া উঠ উঠ। উঠবে না ক্যা! এ শুকিয়া—'

প্রথম ডাকে শুকিয়া কখনো ওঠে না বা সাড়াও দেয় না, নানি জানে। তাই দ্বিতীয় দফায় ডাকার আগে নানি উনানের সামনে এসে বসে। উনানের শিখায় হাত-মুখ শরীর মেলে ধরে। হাতের চেটো বার বার ওল্টায়-পাল্টায়, যেমন ভাবে শুকদেব সারাদিন উনানের তাপে রুটি উল্টে-পাল্টে রোস্ট করে। উনানের তাপ শরীরে সঞ্চারিত হয়, রক্তে সঞ্চারিত হয়, দেহের অস্থিসন্ধিতে সঞ্চারিত হয়। চটকলে সাইরেন বাজে, দিনের প্রথম, আর সে সাইরেনের ভোঁ বস্তির ঘুমন্ত মানুষগুলোর মধ্যে যাদের কানে পৌঁছনোর, অবধারিত ভাবেই পৌঁছে যায়। নানি উনানের গোড়া থেকে উঠে আবার দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দেয়—'ক্যা রে শুকিয়া তু উঠবে কবি না ক্যা? দেখ সবের হো গায়ি—দেখ, আভি তক তু নিদ যাতি—এ শুকিয়া—' শুকিয়া এবার সাড়া দেয়। আরো কয়েকবার ধাক্কাধাক্কির পর ওঠে। উঠে দরজা খোলে। নানি আবার দোকান ছেড়ে রাস্তায় নামে।

শুকদেবকে ঘুম থেকে তুলতে নানিকে বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয় এক-একদিন। যত ডাকো, যতই দরজা ধাক্কাও, শুকদেব আর ওঠে না। শুকদেবকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া নানির সারাদিনে প্রথম কাজ। অবশ্য এর বদলে বিনা পয়সায় এক ভাঁড় চা আর একটা নিমকি বিস্কুট নানির বরাদ্দ। মিশিরজির খাটালে কাজ সেরে এসে নটা সাড়ে-নটা নাগাদ শুকদেবের দোকানে ঐ ফোকটিয়া চা-বিস্কুটে নানি নাস্তা সারে। নানি

এখন মিশিরজির খাটালেই যাবে। খাটাল পরিষ্কার করবে। গোবর তুলে ডাঁই করবে এক জায়গায়।

বস্তির গলিটা এসে মিশেছে জি-টি রোড মূল সড়কের সঙ্গে। সড়কে উঠতেই গলির এক পাশে এক রাশ পোড়া টায়ার, টায়ারের ছাই। রাত্রে রিকশাঅলা ছেলেগুলো ঠাণ্ডায় টায়ারের আগুন পোহায়। সড়কের রাস্তা পশ্চিমে বহু দূর গিয়ে মিশেছে বোম্বে রোডের সঙ্গে আর পুবে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে ঢুকেছে কলকাতায়। রাত্রিবেলাও এ-রাস্তার বিশ্রাম নেই। কলকাতা আর পশ্চিমে ধানবাদ, টাটানগর, কটক, ময়ূরভঞ্জের ব্যবধানে মাল বোঝাই ভারি ট্রাকগুলো গাঁক গাঁক শব্দে ছুটে চলে সারা রাত।

নানি পশ্চিমে সড়কের ধার ঘেঁষে হাঁটা দেয়। ওর ডান দিকে সড়কের ওপারে চটকলের লম্বা শেড। শেডের ভেতর স্যাকিং মেশিনের সারাদিন ঘট ঘট শব্দ। মাঝে-মাঝে হঠাৎ যখন লোডশেডিং হয়, বিশেষত সন্ধ্যায়, সমস্ত আলো টুপ করে নিভে যায়, সমস্ত শব্দের অপমৃত্যু ঘটে—এবং তখন, এই বস্তি, এই কারখানা, এই নিবিড় জনবসতির সমন্বয়ে যে জগৎ, তা যেন প্রেতগ্রস্তের মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকে।

নানির বাঁ-হাতি বস্তির এলোমেলো বেঢপ ঘরগুলোর ভিড় যেন রাস্তার ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বস্তি এলাকা পার হলে কবরস্থানের দীর্ঘ পাঁচিল। তার ওপাশে শালিমার গো-ডাউনের শেড। নানি নিত্যসকালের পরিচিত এই পথটুকু পার হয়ে যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে। পায়ের সামনে লাইট পোস্টার নীচে একটা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পা দুটো ছড়ানো। হাত দুটো মাথার দুদিকে ছড়ানো। হাতের দুই মুঠি যেন সমতল মাটি খামচে ধরতে চায়। চলতি পথে বাধা। নানির রাগ হয়, ঘৃণা ধরে।

'কৌন হারামখোর দারু পিকে রাতভোর রাস্তামে পড়া হুয়া।' হাতের লাঠি দিয়ে লোকটার পিঠে খোঁচা মারে—'এ্যায় শালা শুয়ারকা আওলাদ, দেখ তোহার আউরৎ তোকে ছোড়কে ভাগল বা—দেখ উঠকে··।' তবু লোকটা নড়ে না। লোকটা নেশায় একেবারে বেহুঁশ। বাইরের এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, অনবরত শিশিরপাত ওর অনুভূতিতে কোনো সাড়া জাগায় না। নানি বিরক্ত হয়ে হয়ে কয়েক পা এগিয়ে যায়। কি ভেবে আবার ফিরে আসে। লোকটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। একটা হাত কাঁধের ওপর রেখে হেঁচকা টানে মুখটা সোজা করে দেয়। আর তখন নানির বুক আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। নানি মাটির ওপর বসে পড়ে। মাটির ওপর থেকে

মাথাটা তুলে নিয়ে নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে। 'এ তো মেরা সায়েব। মেরা রাজা সাব। মেরা লাল। এ তোহার ক্যা হইলি সায়েব...'। সায়েবের চোখ আধবোজা। চোখের মণি স্থির। ঠোঁটের কানাচ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে রাস্তার মাটি অনেকটা ভেজা, যেখানটায় সায়েব মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

নানির অনুভূতিগুলো ক্রমশ লোপ পায়। মিশিরজির খাটাল, কারখানার ঘটঘটানি, প্রাকৃতিক শীতাতপ ইত্যাকার বোধ চিন্তা-ভাবনা ভুলে যায়। নানি হিম হয়ে যাওয়া সায়েবের শরীর জড়িয়ে ধরে, আর নিজের বুক চাপড়ায়, আর কাঁদে—'তোকে অ্যায়সা কৌন মারলাস্ রে—হায় ভগওয়ান! তু বাত বোল মেরে লাল—হায় ভগওয়ান। হাম তোকে বিনা ক্যায়সে বাঁচব—হায় ভগওয়ান।'

যেন একটা প্রাচীন গাছ ঝড়ো হাওয়ায় থরথর। আচম্বিত চিন্তায় নানির কান্না ক্ষণিক থেমে যায়। নানি উঠে দাঁড়ায়। তারপর যে-পথে এসেছিল সে পথে বস্তির দিকে ফিরে যায়।

চটকলে দিনের দ্বিতীয় সিটি বেজে উঠল। নাইট শিফট্ শেষে কারখানা থেকে শ্রমিকরা বেরিয়ে আসছে একে-একে। যেন যুদ্ধ শেষে শিবির-ফেরা ক্লান্ত বিপর্যস্ত সৈনিক। নানি আবার শুকদেবের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। শুকদেব সবেমাত্র গোসল সেরে এসে ঘর থেকে ভাঙা শো-কেস, বাক্স, ডিবে-ডাবা বের করে দোকান সাজাচ্ছে।

নানির ন্যুব্জ দেহটা এখন খাড়া, একটা শুকনো সোজা ডালের মতো। চোখের দৃষ্টি উদাস স্থির। গায়ের কম্বল রাস্তায় লোটায়। মাথায় চটকলের পাটের সুতোর মতো সাদা কয়েক গাছি চুল বাতাসে কাঁপে।

'শুকিয়া, সায়েব মর চুকা।'

'ক্যায়া?' শুকদেব যেন চমকে উঠে নানির দিকে তাকায়।

'সায়েব মর চুকা...'

'ক্যায়সে?'

'ম্যায় তো না জানে শুকিয়া। ম্যায় তো দেখা, ও গোরস্থানকা বগল মেরা লাল মু গুজারকে পড়া হুয়া।'

নানির কথায় শুকদেব কি একটা অনুমান নেয়। আস্তে আস্তে ওর বিস্ময় কৌতূহল থিতিয়ে আসে। আগের মতো আবার ডিবে-ডাবা সাজানোয় মন দেয়।

নানি শুকদেবের দোকান ছেড়ে বস্তির আরো গভীরে ঢোকে। আগরওয়ালার গুদাম ঘরের পেছনে কাঁচা ড্রেনের পাশ দিয়ে লখিয়ার দোরগোড়ায় পৌঁছায়। লখিয়ার দরজা বন্ধ। লখিয়া ভেতরে ঘুমোয়। নানি অনবরত দরজা ধাক্কায়। 'লখিয়া রে দরওয়াজা খোল। সব বরবাদ হো গায়ি রে লখিয়া। তোহার বেটা মর চুকা রে লখিয়া। জলদি দরওয়াজা খুল..'

এক সময় লখিয়া দরজা খোলে। দ্বারের ও-প্রান্তে লখিয়া দাঁড়িয়ে। লখিয়া বয়সে এখন প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি—শরীরের বাঁধুনি, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ইঙ্গিত দেয়, একদা ওর রূপ ছিল।

'লখিয়া তোহার বেটা মর গায়ি..'

নানির কথায় লখিয়ার সবেমাত্র ঘুমভাঙা স্নিগ্ধ আবেশ বিঘ্নিত হয়। দু চোখে কিছু শিথিল জিজ্ঞাসা। পরক্ষণেই সে জিজ্ঞাসা মুছে দিয়ে বিকারহীন স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেয়, 'তো ম্যায় ক্যা করি।'

'মেরা সায়েব রাস্তা মে মু গুজারকে পড়া হুয়া '

'তো ম্যায় ক্যা করি?' লখিয়া নানির মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেয়। নানি দরজায় করাঘাত করে আর কাঁদে ইনিয়েবিনিয়ে।

দুই

সায়েব নামের একটা পশ্চাৎ-কাহিনী আছে।

প্রায় পঁচিশ, কিংবা তারও কয়েক বছর আগে লখিয়া স্বামীর হাত ধরে উঠেছিল এই বস্তিতে। নববিবাহিতা নিঃসন্তান লখিয়া। এসেছিল বিহারের বিলাসপুর থেকে। লখিয়ার স্বামী কাজ পেল চটকলের ডায়িং ডিপার্টমেন্টে। একদিন রোলিং মেশিনে কাজ করতে করতে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ওর শরীর সেঁধিয়ে গেল মেশিনে।

লখিয়ার জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ। এরপর নিদেন বাঁচারই জন্য করুণ চেষ্টা।

তখন চটকলে কাজ করত এক বিলিতি সাহেব। নাম ফরস্টার ম্যাকেঞ্জি। লোকে ডাকত পাগলা সায়েব বলে। লোকটার নেশা করার কোনো বাঁধাধরা সময় ছিল না। চব্বিশ ঘণ্টা তার ঠোঁটে মদের বোতল উপুড় করা। কারখানায় কাজের পর সারাদিন বস্তির রাস্তায়, দোকানে, চোলাইয়ের আড্ডায় পড়ে থাকত।

লখিয়ার স্বামী মারা যাবার পর ওর ঘরে ঢুকতে শুরু করল ম্যাকেঞ্জি

সাহেব। অবশ্য ও নিজে ঢুকল, নাকি লখিয়াই ওকে প্রবোচিত কবল, তা অনির্ণেয়। বছব ঘুবতে না-ঘুবতেই একটা ছেলে হল লখিযাব। ব্যাণ্ড পার্টি এল, ইংবেজি বাজনা বাজল আব বাজনাব তালে তালে বেটাল পায়ে ম্যাকেঞ্জি সাহেব নাচল খুব।

ম্যাকেঞ্জি সাহেব নেশাব ঘোবে একদিন নর্দমায মুখ গুজরে পডল আব মবল।

লখিযাব ছেলে বড হয় আব ওব দেহে ম্যাকেঞ্জি সাযেবের আদল হুবহু ফুটে উঠতে থাকে। সেই খাডা নাক, কটা চোখ, খযরি কোঁচকানো চুল, ফর্সা গাযেব বঙ আব পেশল তীক্ষ্ণ চেহাবা। ম্যাকেঞ্জি সাহেবেব প্রতিমূর্তি হযে লখিযাব ছেলে বেডে ওঠে আব লোকমুখে ওর নামটাও তৈবি হযে যায—সায়েব।

সাযেবেব বযস যখন বিশ, চটকলের এক বাবু ওব চেহারা দেখে কারখানায লেবাবেব কাজে ঢুকিযে নিল। একদিন সাযেবেব নাইট-শিফট্। ডিপার্টমেন্টাল সুপারভাইজাব বামচন্দ্র বেবিযেছেন শেডে টহল দিতে। সেই সুযোগে সাযেব সুপারভাইজারেব চেম্বাবে টেবিল জোডা লাগিযে শুযে পডল। এমন সময় জেনাবেল ম্যানেজাব খান্নাব কোযার্টাব থেকে আর্জেন্ট টেলিফোন এল। ফোন বেজেই চলেছে, বেজেই চলেছে অনববত। অনেকক্ষণ পবে সাযেব ঘুম চোখে উঠে বিসিভার ধবল। ওপাশ থেকে খান্নাব কণ্ঠস্বব, 'হ্যালো বামচন্দ্র...'

সাযেব জানে না। ঘুম ভাঙাব বাগে বিবক্তিতে বলে বসল, 'নেহি হনুমানচন্দ্র—'

সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে গেল। পবের দিন থমথমে মুখে জেনারেল ম্যানেজার খান্না সোজা নিজের চেম্বারে ঢুকলেন। প্রথমে ডেকে পাঠালেন সুপারভাইজাব রামচন্দ্রকে। দুজনে কি কথা হল, তারপর ডাক পডল সাযেবের। চেযাবে খান্নাব টান টান শিরদাঁডা। চশমাব ভেতব থেকে তীক্ষ্ণ সটান দৃষ্টি সাযেবের দিকে। 'ইউ দ্যাট বয়, ডেযার টু জোক মি। আই উইল সি ইউ—' কথাটা ছুডে দিলেন, শত্রুপক্ষেব দিকে গোলা ছোঁডার ভঙ্গিতে।

সাযেবেব চাকরি আর পার্মানেন্ট হয নি, তাব আগেই খতম।

চাকরি হারিয়ে সাযেবও তলিযে যেতে লাগল। ক্রমশ, সংকীর্ণ জীবন এবং জীবন-সংশ্লিষ্ট অন্ধকারে।

জুয়া, চরকি, সাট্টা—দোক্কা মে এক, চৌকা মে চার। লাগে তো আযে, না লাগে তো ভোগমে যাযে! বাত্রে বালা সিং-এব হোটেলেব পর্দা-ঢাকা ঘরে। টেবিলে বোতল, ভেজা ছোলা, আদা কুঁচি। সোডা বোতলের ছিপি খুললে ভ-স্-স্-স্। গ্লাসের মুখে মদেব বোতল উপুড করলে ক-ল্-ল্-ল। দুটো মিশিয়ে গলায় ঢেলে ঢক ঢক ঢক···। সাযেবেব শবীরে তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি। মনটা যেন চটকলেব চিমনি থেকে উদ্গাবিত ভক্‌ভকে ধোঁযা। পাক খেয়ে-খেয়ে আর ঢেউ খেযে-খেয়ে আর পাক খেযে-খেযে শূন্যে উডে যেতে চায়। আকাঙ্ক্ষাগুলো কেশর-ফোলানো লাগাম-ছেঁডা ঘোডার মতো দিক্‌বিদিকে ছুটে যেতে চায। সায়েবেব মনে হয তখন সে সবকিছু পাবে—দুনিয়াব যত খতরনাক কাম। যত দুশমন আছে সকলের পেট ফাঁসিযে দিতেও ওব হাত এতটুকু কাঁপবে না। রালা সিং তখন তাকিয়ায শরীর এলিয়ে পাখিব পালক্ কানে ঘোরায়, আর কুতকুতে চোখে দোকান নিরীক্ষণ করে, আব মাঝে মাঝে বাচ্চা চাকবদের ধমকায়, 'শালে তেরে বহিন কো—দেখ শালে তিন লম্বর ক্যা মাঙতি।' আব গ্রামোফোনের ডিস্কে তখন হিন্দি ফিল্মের চনমনিয়া সুব—'বাত সে খাযো-পিযো, দিন মে আরাম করো—লা-লা-লা, লা-লা-লা-লা—'

শালিমার গো-ডাউনে চোবা চালান করতে গিযে ধরা পডল সাযেব। ছ-মাস ফাটকে কাটিযে ছাডা পেল।

লখিয়ার সঙ্গে সাযেবের সম্পর্ক কোনো দিনই ভালো নয়। হাঁটি-হাঁটি পা-পা বয়স থেকেই সায়েব মা-ছাডা। নানিব কাছে মানুষ। নিজেব নানি নয। একই বস্তিতে থাকে। ঘুঁটে দিয়ে, কয়লা কুডিযে পেট চালায়। একক জীবনের ভালোবাসা আর মাযার টানে নানি ছেলেটাকে খাইযে পরিয়ে বড করেছে।

বড হযেও দু-একবার মাযের কাছে যাবার চেষ্টা করেছে সায়েব। লখিয়ার দোরগোডায় পা দিলেই লখিয়াব সাফ জবাব, 'আগাডি রুপেযা ফেক্, তব আন্দাব আ রোটি খা—'

এই একটা কথা, সাযেবেব রক্তে যেন বিষ ঢেলে দেয, 'বেশরম বাণ্ডি! থুক্ তোহাব বোটি মে—থু থু থু—'

লখিযাকে ঠুকবে কেউ বেহাই পায় না। বদলা ও নেবেই। এক ঝটকায় ঘব ছেডে বেরিয়ে আসে লখিয়া—'ওঃ হো-হো-রে—ম্যায রাণ্ডি! তু ক্যা—তু? রাণ্ডি কা আওলাদ, দোকলা কা বেটা—'

এ-ভাবে, ঠিক এ-ভাবেই, মা আর সন্তানের সম্পর্ক, বাস্তবজীবনে কখনোই চিরায়ত পবিত্র আদল পায় না।

তিন

লখিয়ার বন্ধ দরজায় মাথা কুটে কেঁদে নানি অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে। লখিয়া আকণ্ঠ লেপে ঢেকে খাটিয়ায় শুয়ে। ঘরের দেয়ালে ওর দৃষ্টি, স্থির। মেজাজ এমনিতেই ভালো নয়। কড়কড়ে চারশটা টাকা চোট গেল, এত হুঁশিয়ার হয়েও—ভাগ্যের মার!

স্থানীয় থানা-পুলিশ কখনো এভাবে হানা দেয় না। ওদের মাসোহারা বন্দোবস্ত। হানা দেবার আগে গোপন নোটিশ দেয়। তার আগে মাল সরিয়ে ফেললেই হল।

কিন্তু আবগারির বড় কর্তারা মাঝে মাঝে চড়াও হয়ে বড় জ্বালাতন করে। ওদের হাতে পড়লে আর ছাড়ছোড় নেই।

সেদিন রাত্রে কেমন যেন একটা গন্ধ পেয়েছিল লখিয়া। ভোর হতে-না-হতে চোলাইয়ের বোতল আর ব্লাডারগুলো উঠানের তারে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে তার ওপর একটা লেপ-চাপা দিয়েছিল। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে তারে লেপ শুকচ্ছে।

যা আঁচ করেছিল তাই। বেলা দশটা নাগাদ আবগারি বিভাগের ভ্যানটা ঢুকল বস্তির ভেতর। লখিয়ার ঘরে ঢোকার গলির মুখে ব্রেক কষল। ঝপাঝপ নেমে পড়লেন থানার ছোটবাবু, আবগারি বিভাগের এক কর্তা আর কয়েকজন আবগারি পুলিশ। লখিয়ার ঘর তন্নতন্ন করল। রান্নার একচিলতে জায়গাটায় ঝুলন্ত মাচাটা টেনে ভেঙে দিল। সারা উঠোনময় বুটের ঠোকর মেরে দেখল মাটির নীচে কোথাও মাল লুকনো আছে কিনা। একটা শূন্য জালা ছিল, লাঠির আঘাতে সেটাও ভাঙল।

শিকার ধরার ব্যর্থতায় তখন ছোটবাবুর চোখ-মুখ লাল। লখিয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'অ্যাই, মাল কোথায় রেখেছিস?'

লখিয়ার মুখে নির্দোষ হাসি, 'কি যে বলেন বাবু, ও-সব দু-লম্বরি কারবার লখিয়া করে না।'

ছোটবাবু আবগারি অফিসারটির দিকে তাকান, 'বুঝলেন স্যার, এসব খচরা মেয়েছেলের পেছনে পুরে দিতে হয় আড়াই হাত। তবে শালা সত্যি কথা বেরুবে।'

একজন আবগারি পুলিশ কি ভেবে হঠাৎ তারে ঝোলানো লেপটা সরাতেই মাল বেরিয়ে পড়ল। তারে বাঁধা লাইন দিয়ে ঝুলছে। মালও গেল, লখিয়াকেও যেতে হল থানায়। একরাত হাজতে কাটিয়ে পরের দিন কোর্টে চালান।

কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে লখিয়া। একটু তফাতে মুখোমুখি একটা বেদির ওপর টেবিল-চেয়ারে জজ সাহেব। লখিয়া যে লোকটার কাছ থেকে চোলাইয়ের চালান আনে, তার চেহারাও হুবহু এ-রকম। এ-রকম থলথলে দেহ, এ-রকম মোটা গোঁফ, মাথায় টাক। জজ সাহেবের গায়ের জামাটা খুলে নিলেই জ্যান্ত গণেশ ঠাকুর, লখিয়ার মনে হয়। হয়তো শাস্তিটা একটু কমই হবে। হয়তো বেকসুর খালাস।

লখিয়া জানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বেশি পাঁয়তারা কষতে নেই। যেমন-যেমন প্রশ্ন তেমন-তেমন উত্তর। না হলে শাস্তি বাড়ে, জরিমানা বাড়ে।

'তুমি লুকিয়ে মদ বিক্রি করতে?'

'হ্যাঁ সাব।'

'কেন করতে?

লখিয়া কাপড় সরিয়ে পেট দেখায়। বুকও দেখা যায়।

'হুঁ। কতদিন করতে?'

'লতুন বাবু।'

'লাইসেন্স আছে?'

'না হুজুর।'

এরপর জজ সায়েবের শাস্তি ঘোষণা—'বেকানুনি মদের ব্যবসা করার অপরাধে দু-শ টাকা জরিমানা, নতুবা একমাস কারাদণ্ড।'

দু-শ টাকার মাল গেল, তার সঙ্গে দু-শ টাকা জরিমানা। তিন দিন হল লখিয়া সে দুঃখে জ্বলছে।

চার

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা আর কুয়াশা কেটে গেছে অনেকক্ষণ। সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়ছে। সকাল গড়াচ্ছে বেলার দিকে। আর তপ্ত খোলায় চড়বড়িয়ে খৈ ভাজার মতো বস্তির জীবন জেগে উঠছে, প্রাত্যহিক একই ছান্দে চাপা সোরগোল আর মিশ্রশব্দের জারক কেটে।

সাযেব রাতে তার কাটতে গিযে পডে মাবা গেছে, খববটা বস্তিব কানে-কানে চাউর হয়।

কী এক আচম্বিত চিন্তায় লখিয়াব স্থিব আনমনা দৃষ্টি চকচকিযে ওঠে, অনুভূতিগুলো হযে ওঠে সজাগ। লখিযা বিছানা ছেডে উঠে দাঁডায়। গাযেব কাপড বিন্যস্ত করে বাইবে বেরিয়ে আসে।

বস্তির গলি শেষ হয, বড বাস্তায পডে। তাবপব বাস্তা ধবে সোজা হাঁটা দেয পশ্চিমে। বস্তি এলাকা পার হযে বাঁ-হাতি কববডাঙার পাশ দিযে হেঁটে চলে। লখিযাব চোখে পডে কিছুটা দূবে রাস্তার ধাব-ঘেঁষে মানুষের ছোট-খাটো সমাবেশ। বাস্তার অন্য দিকে দাঁডিয়ে থাকা একটা কালো ভ্যান। লখিয়া সমাবেশটাব পেছনে এসে দাঁডায়। দাঁডিযে থাকা মানুষগুলোব বাধা দু-হাতে সবাতে সবাতে একেবারে মাঝখানে এসে পডে। সামনে একটা সাদা কাপডে একটা মানুষেব সর্বাঙ্গ ঢাকা। একজন থানাদার বাবু লখিযাকে দেখে জিজ্ঞাসা কবে, 'এ ক্যা তুমহাবা লেডকা?'

'নেহি বাবু, এ তো মেবা পেটকা দুশমন।' লখিয়া উত্তর দেয। থানাদাব-বাবু লখিযাব বাঁকা উত্তর সোজা কবে নেয়।

লখিয়া মন্থর মাপা পদক্ষেপে কযেক পা এগিয়ে আসে। ওর পাযেব কাছে ওব ছেলের হিম হযে যাওযা দেহ। লখিযা নতজানু হয়ে ছেলের মুখেব ঢাকা সরিয়ে দেয। সাযেবেব আধাবোজা দু-চোখেব দৃষ্টি স্থিব, করুণ মুখাবয়ব বেদনাক্লিষ্ট। যেন লখিয়াব মনে বিবর্ণ সুপ্ত স্মৃতিগুলো জাগিযে, এবং সেই স্মৃতি বেদনা হযে শোক হযে—যতই হোক সায়েব তো তাবই গর্ভজ, সামনে শাযিত এই যে দেহবিস্তার, একদা যাব বীজ সে-ই ধাবণ করেছিল নিজ গর্ভে, নিজেব শরীবেব রস রক্ত তাপ দিযে যাব আকৃতিদান—মাতা-পুত্রেব চিরাযত পবিত্র উচিত-সম্পর্কটি তৈরি হযে উঠছে।

লখিয়া একবার মুখ তুলে টানটান দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় চারদিকে। একটা বৃত্ত। বৃত্তেব কেন্দ্রে শিযবে সন্তান নিযে লখিযা। বৃত্তটাকে ঘিরে গাযে-গা সারি সাবি মানুষ। এতগুলো মানুষেব কৌতূহলী দৃষ্টি অপলক।

'হায বে মেবা বেটা, তু মুঝে ছোডকে কাঁহা চলি গ্যায়ে রে··' লখিযার দেহ সায়েবের দেহের ওপর। লখিয়া কাঁদে। আব ওর সজাগ খেযালে চালিত একটা হাত সকলেব অলক্ষ্যে ঢাকা দেওযা সাদা কাপডটাব ভেতব সেঁধিয়ে যায। হাতেব পাঁচটা আঙুল হিম আব পাথব হয়ে যাওযা দেহে কিলবিলিয়ে ঘুরে বেডায়। আঙুলগুলো উঠে আসে সাযেবের বুকেব ওপব, গলাব ওপব।

একটা চেন ছিল—সোনার। পাঁচটা আঙুলে লখিয়া সায়েবের বুক গলা কণ্ঠা ঘাড় তন্ন তন্ন করে। মগর কাঁহা, নেহি তো···। বিজাতীয় এক ব্যথায় লখিয়ার বুক টনটনিয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে ওর আঙুলগুলো নেমে যায় সায়েবের বাঁ কব্জিতে। কব্জি ফাঁকা—ঘড়িটাও নেই। পুলিশ· ·পুলিশ নে লে লিয়া। বিপর্যস্ত আশায় লখিয়ার কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত কান্না, হঠাৎ থেমে যায়। ঘাড় তুলে আত্মগত ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে চারপাশে তাকায় কয়েক মুহূর্ত।

থানাদার বাবু লখিয়াকে সরে যেতে বলেন। সেপাইদের হুকুম দেন, 'লাস উঠাও—'

দুজন সেপাই সায়েবের লাস শূন্যে তুলে নিয়ে ফেলে ভ্যানের ভেতর। দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ভ্যান চলতে শুরু করে।

সায়েবের মিলিয়ে যাওয়া পথের দিকে লখিয়া তাকিয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে।

ওর বুকে এক-রকম ব্যথা জমা হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। এ-রকম ব্যথা ওর আগে কখনো হয় নি; যেমন, সায়েবের জন্মের পর দুধ জমে ওর বুক ব্যথা করত—সে-রকম ব্যথা ওর পরে কখনো হয় নি।

ফাটল

অরুণ মিত্র

ঘুষখোর কেরানীর টেবিলে হাত উল্টে রেখেছি
আর দেখছি কতক্ষণেরই বা দেখা
কেননা সময় অল্প ঘণ্টামিনিটগুলো খ'সে যাচ্ছে
দেখছি দেয়ালে পবিত্র হাসি ছড়িয়ে পড়েছে
যেমন মেঝের উপর শুক্‌নো পাপ্‌ড়িগুলো
যদিও গোল সুতোটা আহা
শ্রদ্ধাভক্তি উঁচুতেই টাঙিয়ে রেখেছে
আর ঠাসা আশীর্বাদ ঝরছে আমাদের মাথায়
খুব ঠাসা আমাদের এই এলাকায়,
কোথায় ফাঁক আমি নিঃশ্বাস নেবার জন্যে
তাকাচ্ছি ফাটলের দিকে
হ্যাঁ ফাটল ছবির ঠিক পাশেই দেয়ালের গায়ে
সেখানে দিনরাতের রোদজল ঝাপ্‌টাচ্ছে
দূর ক্ষেতের ফসল ঝল্‌কাচ্ছে
আর হৈহৈ হৈহৈ দুনিয়ার যত ঝড় দাপাচ্ছে।

গানের সেই মানুষটি

কৃষ্ণ ধর

(দেবব্রত বিশ্বাস স্মরণীয়েষু)

রক্তে তাঁর ছিল গান সারাক্ষণ জীবন্ত টগবগ
মানুষের কথা নিয়েই বরাবর নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন
হৃদয় নিঃসঙ্গ ছিল কিন্তু চিরদিন
প্রতিবেশী সুখদুঃখ ভালোবাসা শোক ও প্রার্থনা কাতর।

ভিতর ভুবন ছিল মস্তবড়, সেখানে বিস্তর ভিড়
সুর ও বর্ণের মালা, নীলিমানিহিত স্বপ্ন
অস্তিত্ব ডোবানো ছিল গানে।

দেখেছি অনেকদিন অন্যভাবে পথেঘাটে জনারণ্যে
মিছিলের বিশ্বস্ত সাথী, উনত্রিশে জুলাইয়ে ছেচল্লিশে
ইতিহাস কাঁপানো দিনে নির্ভয় সৈনিক যেন
আসমুদ্র হিন্দুস্তান সারে জাঁহা সে আচ্ছা
কলকাতা গেয়েছিল গান।

অথচ এমন মানুষ প্রতিষ্ঠান-বিবর্জিত, ব্রাত্য মন্ত্রহীন
আজীবন কবিকে জেনেছেন তাঁর গানে, মানুষের দুঃখেসুখে
শোকে ও সংগ্রামে।

এ তাঁর নিজস্বতা যেমন দরাজ গলা পবিত্র সরল তুলনাবিহীন
অন্য সব নিতান্তই কলের গান
যেহেতু স্বরলিপি আক্ষরিক ছিল না তাঁর গান ও গায়কী
জেনেছিলেন ঢের বেশি উপলব্ধি ভালোবাসা আত্মসমর্পণ॥

জ্যাম

শঙ্খ ঘোষ

ভালুকের পেটে ভালুকের থাবা।
স্থির হয়ে আছে কালের অসীম।
ঝুলে প'ড়ে আছে জিরাফের গলা
ঝাঁপ দিয়ে ওঠে জেব্রা ক্রসিং।

ঝটপট ক'রে ক'হাজার হাঁস
ছিঁড়ে নিতে চায় এ ওর পালক—

বাতুল দুপুরে ডুগডুগি নিয়ে
গান গেয়ে যায় ভিখারি বালক।

মাঝে মাঝে শুধু খ'সে পড়ে মাথা
কিছু-বা পুরোনো কিছু-বা তরুণ—
হাঁক দিয়ে বলে কণ্ডাক্টার :
পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন।

অসুখ

সুনীলকুমার নন্দী

অদ্ভুত বিভ্রমে আছি, চেনা দায়
পরিচিত মুখের আঙ্গিক—
যার যত কাছে আসি, তার মুখ তত হয় ভুল

এমন কেন যে হচ্ছে, অথচ ডাক্তার
বারবার ব'লে যাচ্ছে :
আপাতত চোখে নেই তেমন অসুখ

চোখ যদি স্বাভাবিক, তাহলে কী, হয়তো এখন
মুখের সহজরেখা
দিনদিন কুরে খায় রীতিহীন নীতিহীন গভীর অসুখ

যেহেতু ওষধিমুগ্ধ হাওয়া, নিবিড়তা
যা কিনা ভাসিয়ে তোলে রক্তের প্রতিভা, আজ
প'ড়ে আসছে, করতলে মেলানো কঠিন

বোঝা-না-বোঝার মধ্যে তিরতির ব'হে চলে
তরল আগুন—
নাড়তে-নাড়তে গ'লে যাই, গ'লে যাচ্ছে চেনা-চেনা মুখ!

বৃষ্টি

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

দাও দেখি লাফ প্রথম দু-এক ফোঁটায়,
এখানে ভিজবে শতবর্ষি ও ঘাসের যত্ন, বিদ্যুৎপ্রবণতা ··
এখানে, খেলার তিনদিক বিহ্বল :
হুইসিল বেজে ওঠে কি বয়ঃসন্ধিব, ইহচেতন জ্যোতির্লোকে ?

দাও না নতুন জার্সির আগে সর্বাঙ্গীণ দৌড ;
পেছনে-পেছনে আসুক সে-বহু-প্রতিবেশিতাব বৃষ্টি।
তার শাদাকালো মিশ্রণ, মনোভঙ্গি—
ঝেড়ে-ফেলুক না থার্মোমিটাব একঝোঁকে, এইখানে।

এদিকে একেক উল্লম্ফন, হযতো বা দৃশ্যত—
সে-দীর্ঘতম সুতোয যাবে না আঁকা,
ফোঁডটি যাহোক বুঝে নাও, পডো ঠাণ্ডা নিউজপ্রিন্ট ;
এলো হাওযা, যায বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল।

ও কি চূর্ণ অলক্তকেরই সঙ্গে এখানে এককদম
যতিচিহ্নটি, পঙক্তিবদ্ধ, ক্রমাগত আসা-যাওয়া ?
আসছে অনেক পদধ্বনিব দশদিক-ছোঁওযা কোবাস ;
এখানে একটি আলিঙ্গনেবও শর্ত রয়েছে, হে অনবগুণ্ঠিতা।

চিড়

গোবিন্দ চক্রবর্তী

চিড ধরেছে ধৈর্যে এবাব দারুণভাবে।
বলই না হে, আব কি নিপুণ,
তীক্ষ্ণ নতুন খেল্ দেখাবে ?
আমাব কথা বলব তবু আমাব মতো।

তথাগতও এই শতকে
নরকো জানি খুব স্বাগত।
সুপ্রিযেবও অপ্রিয ত এই কাবণে।
কথাই আবাব মন্ত্রধ্বনি
—উদ্ভাসিত উচ্চাবণে।
মন্ত্র মানেই ফাটিযে পাথব পদ্ম ফোটা।
মন্ত্র মানেই রাত-খানচুব
বক্তজবা সূর্য-ওঠা।
হৃদয থেকেই হৃদযসুধা উৎসাবিত।
রিক্ত যত অশ্রু সুনীল,
এই পেযালায তাই ধরি ত।
পবগাছাদেব নামাও এবাব, নামাও টেনে।
পাহাডটিলাও হাসিল কর
বুলডোজারে এবং ক্রেনে।
উঠুক ধোঁয়া আকাশছোঁযা আবর্জনায়।
প্রত্যেকে না দাঁডিযে আছি
খুন-খারাপি কসাইখানায়?

ছায়া মুকুট

সুপ্রিয চট্টোপাধ্যায়

সম্রাটদের অস্পষ্ট আলাপ অনেককাল থেকেই ভেসে
আসছিল। পুরুষ পবম্পবায় শৈশব শুনে আসছে তা।
পথে যেতে যেতে তাদেব প্রাসাদেব ছডানো ছাপ।
অনেক ঢেউপথ ভাঙাব পব ওখানেই।

স্তম্ভগুলো যেন প্রাচীন শোকেব স্মারক ভাস্কর্য। রক্তাক্ত
শব্দ মর্মান্তিক ধ্বনিব চাপচাপ আঁকা ইতস্তত। বিন্যাসেব
উঁকি মারা কোনো হাত উঁচোয আকাশের নীলে। নীলে চাঁদ।
আভা লাগে কোনো কোনো ফাটা চোখেব কোণে।

এই চেয়ে-থাকা কোনো এক মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হবে
আমাকে। বয়সের অন্ধ প্রবাহে বেজে উঠবে কখনো
খুশিমতো কোনো নুড়ির ইচ্ছা। বিরামহীন ছলছল অন্ধকারে
ক্ষতবিক্ষত হবে যাত্রা। ইচ্ছার অধীন এই যাত্রা।

হাওয়ার কন্যারা ছায়ার মুকুট নিয়ে দিনান্তে পথের শেষে
দাঁড়াবে। হয়তো। আবছা প্রাসাদ অগোছালো। শৈশবেই
বুঝেছিল সে আশ্চর্য দূর। বুঝেছিল পরিণামে পূর্ণ
চূর্ণতা পলি বাঁধবে অনেক ঢেউপথ ভেঙে, হয়তো ছায়ায়।

প্রেক্ষাপটে অন্ধকার

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

অথচ কালকেই আমি সারারাত কাটিয়েছি না-জাগা না-ঘুমের ভেতর।
কেননা, সকালে কাল তোরডানো মুখের তিন মানুষের সঙ্গে খুব
ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়েছিল। দুপুরে অফিসে উৎপাত, খবরের অনুবাদে
ঠিক শব্দ খুঁজে পাইনি পুরো দুমিনিট। বিকেলে দুতিনটে লোক
দরজায় কড়া নেড়ে বলে গিয়েছিল, ছেলেমেয়েদের দিকে তাকান মশাই,
ওরা কেউ ইংরেজি জানে না, ওরা সব বেড়ে উঠছে ভুলেভালে,
উদাসীনতায়।

কাল রাতে আমি শুধু দুঃস্বপ্নে দেখেছি পচা ফল, যুদ্ধক্ষেত্র,
তোরডানো মানুষ আর মানুষের ছন্নছাড়া পোড়ো ঘরবাড়ি।

ভৌতিক ছায়া

জিয়া হায়দার

(পংখী উইড্যা যায়, তার পইড্যা থাকে ছায়া)

খাঁচার ভেতরে অচিন পাখির ছায়া,
পাখি উড়ে গেছে অরূপ অন্ধকারে ,

রাত্রি-জঠরে সুগভীর যন্ত্রণা
সূর্য খুঁজছে গমনাগমন পথ।

গমনাগমন পথের ভেতরে কাঁটা
ছড়ানো ছিটোনো বেঢপ খোষাই বালি—
যুদ্ধ নেই তো, অস্ত্রের খেলা তবু
খাঁচা ও ছায়াতে মাখামাখি করে কাদা।

তবে কি যুদ্ধ ব্যাঘ্র ও জোনাকীতে
তবে কি কামানে বারুদ ঠাসার মহড়া
তবে কি আবার বিনিদ্র উদ্বেগ
তবে কি হিংসা কাড়বে মনুষ্যত্ব?

উড়ে যাওয়া পাখি, ছায়া তার ভৌতিক,
কৃষ্ণপক্ষে রক্তপাতের লালসা—
কোন্ অলক্ষ্যে ওঝা-ও নিরুদ্দেশ,
গন্ধমাদনে নেই বিশল্যকরণী।

যাক ভিখারিণী

কবিতা সিংহ

তোমার নিকট থেকে বাঁচাও তোমাকে নারী
ভয়
ভয় বড় ভিতরের ভিখারিণীটিকে
তীব্র বেনারসী আর হীরার গহনা যার
দীনভাব ঘোচাতে পারে না!
দিন শুরু থেকে যার চাওয়া শুরু লোভ
ভরা পেটে লোভ যার লোকমান্যে লোভ
তোষামোদে
অনৃত-ভাষণে তাকে ভয়!

ভয় তাকে, যে বসেছে লোহাব অলক্ষ্মী হযে
মান সিংহাসনে
ভয় তাকে যে বেখেছে
অমৃতে নিহিত গূঢবিষ
ভয় তাকে যে বেখেছে প্রেমেব ভিতরে ছোট
সন্দেহের কাঁটা !

সেই-ই যাক
যাক সেই বিজয়িনী ভিখাবিণী চলে যাক তাব
স্তূপাকার এঁটোকাঁটা ভিক্ষাপাত্র হীন জয নিযে
সেই যাক

যে হয়েছে আনন্দ-ভিখাবী
যে হয়েছে মানুষেব পদবজে চন্দন-মথনা ।

ঘুম

বাসুদেব দেব

ভ্রূভঙ্গিতে জেলেছিলে বাতি
জ্যোতিহীন বাংলার ঘরে
ঈশ্বরী সেজেছ বক্তে আলতায়
অর্থহীন বাচাল শব্দের
ঘুঙুব ফেলেছ খুলে
কবিতাব চূডান্ত পংক্তিতে
উডিয়েছ দূরের বলাকা
ম্লান মানুষেব হাতে দিযেছিলে
খোঁপাব গোলাপ
এখন কি কর তুমি বাঙা
নাইলন মশারি ফেলে ঈশ্বরী কি এমন ঘুমায
অবেলায় ? অন্ধকাবে ? সন্তানসম্ভবা ?

আভ্‌গিয়াস-আস্তাবল

সামসুল হক

এই ভুল অঙ্ককে আমরা মেনে নেবো না যে ১-কে ভাগ করা যায়
অংশ ব'লেও কিছু হতে পারে না
জন্ম মৃত্যু বিন্দু প্রভৃতিকে আপনি কীভাবে ভাগ করতে পারেন
কিংবা কবিতা বা বিপ্লবকে
বুদ্ধশিষ্য আনন্দের একগণ্ডূষ জল সমুদ্রের অংশ নয়
যেমন প্রোটন নয় হিমালয়ের
সিনোজোইক প্রোটেরোজোইকের

তবু হায় ভুল অঙ্কের মতো হলোসিন এসে যায় থেকে যায়
সে কি ভিখিরিবালকের কণ্ঠে বিধ্বংসী ছন্দ দেবে ব'লে
আর পিছন থেকে একজন আইজেনাখীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন
অবিকল রেকর্ডপ্লেয়ারে মেহেদি হাসান

আসল কথা ২ ৩ ৪ ৫ অংশ-টংস নয়
সংখ্যা বলুন কাজ বলুন তা একটিই
আভ্‌গিয়াস-আস্তাবলটি এই মুহূর্তে পরিষ্কার করা দরকার

জলের স্বভাব

মৃণাল বসুচৌধুরী

ওপরে শালুক ছিল
হাসিখুশি প্রেমে ও সোহাগে
শিকড়ের অত্যাচার
জল একা নীরবে সয়েছে
জলের উল্লাস নেই
নেই রক্তপাত
বীজের উত্তাপ আর প্রসবযন্ত্রণা
জল শুধু গভীরতা জানে
জানে নিবিড় আবর্ত

উদ্ধত বিষাদ কিম্বা ম্লান শোকগাথা
কখনো জলের নয়
শুধু এক অশরীরী টান
হঠাৎ নিষ্ঠুর করে তাকে
প্রচ্ছন্ন নিয়মে ভাঙে বাঁধ

প্রলুব্ধ না হ'লে
জল ভালোবাসে
অন্তর্মুখী স্রোতের বিস্তার

আদিম

অমিতাভ গুপ্ত

কঠিন হাড় রয়েছে পড়ে কঠিন মানুষের
পাথরখণ্ড—একদা ছিল খচিত তার ঘরে
তাও ছড়িয়ে আছে

শুধু সে নেই। বিশাল দু'টি বাহুর 'পরে
নম্র হয়ে, অরণ্য যার শাসন মেনেছিল
ঝড়ের ও বন্যার
প্রগল্‌ভতা যার ছিল পোষমানা ঘোড়ার মতো

এখন সে নেই। শুধু পাথর, পাথরজুড়ে তার
সবলহাতে আঁকা রেখায় একটি কথাই সে গিয়েছে রেখে,
'চলো, ছুটে চলো'।

অজাগরে

শংকর দে

স্বভাবে পাথর তুমি
অভাবে দিয়েছ জল ঢেলে।
আগুনে কবিতা কলি
প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলে।

সে কি? যন্ত্রের যন্ত্রণা
ভাষা দিয়ে বেঁধেছিলে পাখি।
আকাশের দিকে চেয়ে
তুমি আছ, তোমারই তো আঁখি।

সেই তো যেতেই হবে
ভেসে যেতে বাধা তো মানে না।
কবিতার পায়ে ফুল
কেউ দেবে, কেউ তো দেবে না।

ময়নাগুড়ি যেতে তিস্তা

রবীন সুর

সবে বর্ষার শুরু—
তাইতেই তিস্তার কি ভয়ংকর আক্রোশ।
খোঁচা খাওয়া সাপের মতো লকলকে ফনায়
সমস্ত শরীরে পাক দিয়ে আছড়ে পিছড়ে গজরাচ্ছে।

নদীর মধ্যিখানে কংক্রিট বাঁধানো ছোট্ট এক চাতালে
বিরাট কাকতাড়ুয়ার মতো দুদিকে দু'হাত ছড়িয়ে খাম্বা
আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠে গেছে
অহংকৃত মাথা উঁচিয়ে...। এপার ওপার
গ্রামে গ্রামে লোডশেডিং ছড়িয়ে দেবার জন্য।

বহুদূর থেকে গড়িয়ে আনা
গাছের বিশাল গুঁড়িটা
জলের ঝাপটানি খেতে খেতে নদীর মাঝ বরাবর
কি করে আটকে থরথর করে কাঁপছে
আর এগোতে চাইছে না,
সংসারের নাকানি চোবানি খাওয়া
গোঁ-ধরা মানুষের মতো
প্রাণান্ত পরিশ্রমে
চলতে চাইছে
কিন্তু পারছে না।

ক্রীতদাস

কিরণশঙ্কর মৈত্র

শরীরেব সবুজ গন্ধ মুছে উর্ধশ্বাস
দৌড, সূর্যোদয সূর্যতপ্ত সূর্যাস্ত
নদীব ঢেউগুলি তবঙ্গে তবঙ্গে সুদূব
দেহ-ঘামে মিশে থাকে অশ্রুত কান্না।

নিয়নেব দীপ জ্বলে বিনিদ্র চোখে
সুর-সঙ্গীত সন্ধ্যার বাতাস বহে
অদূরে গঙ্গা, সব ফেলে যাই নৌকোব
ছলছলানি—অভীষ্ট নির্দিষ্ট তীর।

শ্রম, স্বেদ শুল্ক, বহু উজ্জীবিত দিন
বিসর্জন এক বিশিষ্ট নিপুণ ক্রীতদাস।

নীলকণ্ঠ

সুমিত নন্দী

এদেশেব গাঁযে-গঞ্জে সমস্ত শরীরে
এত বিষ কারা ঢালে, এত বিষ দেখিনি কখনো—

তাহলে কি এ-ভূমিতে ক্রীতদাস আমবা সবাই, পবদেশী
কে কোথায় আছি
জানি না এখন, যেন প্রপিতামহেব সেই সাত বঙে এক সূর্য
ধ্যান, শিলাসন
বিষেব দহনে জ্বলছে, জ্বলতে-জ্বলতে ভস্মনীল।

ভস্মনীল অন্ধকারে নিহিত যে-বিষ
পান কবি, অসহায

নীলকণ্ঠ হতে-হতে, এ-ভূমিতে ধর্মহীন আমরা সবাই ?
আজ
আমরা সবাই ক্রীতদাস।

তোমাকে পাহারা দিচ্ছি

দিলীপ সেন

তোমার জন্যে
যখন আমরা একে একে সকলে এসে দাঁড়ালাম
সমুদ্রের পালে হৈ হৈ করছে বাতাস ঃ

যদিও জানতাম
যেখান থেকে আমরা আসছি
কিংবা যেখানে আমরা যাব
রাস্তাজুড়ে সারাক্ষণ হাঁটতে থাকবে
আকাশচুম্বী ভয়।

অথচ একটু আগেই
গলায় গলায় নীল আকাশ আর দক্ষিণের খোলা মাঠ
ভালোবাসায় একে অপরকে জড়িয়ে
রোদ-বৃষ্টি-হাওয়ায় তোমাকে বলেছিল।
যে অন্ধকার তোমার হৃৎপিণ্ডকে কুরে কুরে
সারারাত তোমাকে ঘুমোতে দেয়নি
সেই আততায়ীকে
পায়ে পায়ে আমরা মুছে দিয়ে আসছি।

তোমার বুকের এক ঝলক রক্তে ভেজানো নিশান উড়িয়ে
সমুদ্রের পালে এখন হৈ হৈ করছে বাতাস।
ফুলফোটা একটা আস্ত জীবনের জন্যে
নির্ভুল দৃশ্যের ভেতর চোখ রেখে আমরা
তোমাকে পাহারা দিচ্ছি।

দরজায় কে ?

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

'দরজায় কে ও ? কেউ নয় ?'
'কেউ নই, শুধু হাওয়া।'
'দরজায় কে ও ? কেউ নয় ?'
'কেউ নই, শুধু জল।'
'ঘুমের গহনে কিছু চাও ? কিছু নয় ?'
'কিছু নয়, শুধুই নগ্নতা।'
'আর নয় কিছু ? কিছু নয় ?'
'কিছু নয়, শুধুই আকাশতলে নগ্ন দাঁড়ানো।'
'তুমি হাওয়া, তুমি জল, তুমি তবে কার ?'
'কারো নই, আমি শুধু নগ্ন তোমার।'
'এই মাত্র ? আর নয় কিছু ?'
'আর কিছু নয়।'
'যাও, ফিরে যাও, মুখোশ হয়েছে করে মুখ—খুলে ফেলতে ভয়।'
'শুধু ভয় ?'
'শুধু ভয়। শোনো, দরজায় কার শব্দ ? কে ফিরে যায় ?'
'কেউ নই, আমি গভীররাতের একা মিলনপিয়াসী বৃষ্টিধারা, বিদায়।'

অমর্ত্য মানব

প্রদ্যুম্ন মিত্র

ওই দিকে ভেসে যায় শেষ শববাহকের ডাক,
গম্ভীর প্রমত্ত খর ওই দিকে ঘূর্ণিত বৈশাখ
ঝড় ও সাম্পান এসে ছুঁয়ে যায় দীর্ঘ অভিলাষ
যেভাবে ছুরির নীচে ফেলে গেছে আজও কে নিশ্বাস
মজ্জার উত্তেজে তুমি এদিকে ফেরালে মুখ ঘৃণা
ফিরিয়ে দিলেও মুখ ঝরে পড়ো বিষজ্যোৎস্না ,

উঠোনে হেলেছে ছায়া, এখনও আলগ্ন জীবনের
চতুর্দিকে উৎসবপিয়াসী রৌদ্র ওড়ায় পতাকা
এখনও মানুষ বড় যুদ্ধবাজ সৈনিকের মতো একরোখা
কেউ কি বলেছে তাকে পাথরফাটানো জল আজও এনে দিতে

কেউ তো বলেনি তাকে মারী বা বন্যার আচম্বিতে
মানুষ মরে না।

আজও তার দগ্ধ হাতে হল ও কুঠার
যেখানে শস্যের ইচ্ছা অগ্নিকীট উদ্যত হন্তার॥

ফিরে আসা

অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মগোপনের সমস্ত জাল ছিঁড়ে ছুটে চলেছি তোমার সমীপে।
পেরিয়ে এসেছি বন-বাদাড়, কাঁটাতারের বেড়া।
এখন ট্রেনে বসে দেখা—নর্তকীর মতো
অজস্র গাছ-গাছালির সমারোহ,
ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসা দূরের বনানী ছুঁয়ে ভোর চলে যায়
প্রভাতের মোহনায়, আর আমার ঘরে ফেরার আনন্দে
হয়তো তোমারই অসতর্ক পা ফেলায়
সিঁদুরের কৌটো উল্টে পুব-আকাশ ছত্রাকার।

তোমার দ্বারপ্রান্তে, আজ আমার সুধন্য প্রভাতের সমাগম,
সমস্ত ভুল প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে এইতো এসে দাঁড়িয়েছি—

বাছারে কোন দুখে

নন্দদুলাল আচার্য

হাওয়া বইছে হু হু করে
শেওলা জমা বুকে
এই বয়সে শ্মশান যাবি
বাছারে কোন দুখে

০

নৌকো বাওয়াব বয়স তো এ
স্রোতের বিপবীতে
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেভাক
কালনাগিনী চিতে

উল্টো কুলোব বাতাস দেবো
ডানযোগিনী যাঃ
বুড়ো শিবেব দোহাই বাছাব
শিলপ্রস্তর পা

ফুল দোল গাজনেব মেলা
শেওলা জমা বুকে
এই বযসে শ্মশান যাবি
বাছাবে কোন দুখে ?

একটি বেদনার্ত নস্টালজিয়া

দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায

ঐ জেগে উঠছে বাস্তা
চলুন, আব দেরি নয।

ঐ পাঁউরুটি
ঐ প্যাকেট
ঐ দুধ
ঐ লঙ্গবখানা
চলুন, আব দেরি নয।

ঐ ব্রিজ দেখা যাচ্ছে
ভোব হলো
ভোবেব জন্য কোনো মোবগ আব নেই।

এই অসময়ে

অনুরাধা মহাপাত্র

অসময়ে এভাবেই প্রতিবিম্ব পোড়ে, জ্বলে ওঠে ঘন বাদামের বন
সশস্ত্র দেশলাই।
ঘুম থেকে উঠে এসে ছেনির শব্দ ওঠে
কাঁটাতারে ধানখড় উড়ে আসে, হাত ও হাঁসের মতো বৃষ্টির গমক
ধুলোপায়ে কুকুর যদিবা ঢোকে, এত স্তব্ধ শিবস্ত্রাণ
গা ঢাকা দিয়ে এই কুকুরের মতো আত্মরক্ষা ছাড়া
নেই কোনো নিহিত প্লাবন?
এ কেমন অন্ধকার! ধানখড়ে কেঁপে ওঠে গর্ভফুল
চারিদিকে যদি আজ সশস্ত্র দেশলাই জ্বলে ওঠে?
স্বপ্নে নয় জাগরণে নিবন্ন খবার হাঁড়ি অন্নে ভরে ওঠে?
এই পোড়া অসময়ে শুদ্ধতম প্রতিবিম্ব কার?
দূরে লাল ভেড়ির মাথায় আরও লাল হয়ে ওঠে বন্যার আগে
মেঘ, খোলাখাপ কাদার মানুষ!

কেষ্টনগরের পুতুল

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পুতুল এখনো কাঁদে, কাঁদে মাটি মুষ্টিতে তোমার—
ভাষা দাও, বাংলা ভাষা, যে-ভাষায় ভালো-মন্দ বাসি,
ঘৃণা করি, ভাষা দাও, প্রাণ দাও, যে-প্রাণে সর্বদা
খিদে তেষ্টা লেগে থাকে, লেগে থাকে প্রেম সর্বনাশ।
শুধু দুটি ভাত খাবো, ঘাস নয়, বসন্তবাতাসে
ফুলের আশ্চর্য রেণুমাখা দুটি তিজেলের ভাত
খাবো—দুটি ভাত দাও, অন্নপূর্ণা, সন্তান তোমার,
কাঁদে এইভাবে।

পুতুল এখনো কাঁদে, খড়ে নদী সে-জলে উন্মাদ
এদিকে-ওদিকে বয়, নদী নয়—বাগের মত

বয় চতুর্দিকে, বক্তে শিরায় শিরায় ফাটে রাগ
শিমুলের তুলো-ফাটা রাগ নয়, রাগ গোক্ষুরের
কিন্তু, ছোবল মারবে কাকে, যে সর্বাংশে মরে আছে ?

ওর চোখে কান্না নেই, কেঁদে-কেঁদে দুচোখ পাথর,
ওর হাতে শিল্প নেই, অবহেলা পঙ্গু করে গেছে,
মুষ্টিতে একতাল মাটি, ভাতের বদলে মাটি খাবে—
নোনা সোঁদাগন্ধ মাটি, হয়তো বা কিছুটা আমিষ।
কবরখানার মাটি, কী স্বোয়াদ, পুষ্টিতে প্রখর।
মাটি চাটি খাবে, কিছু গিলে খাবে, পেট পুড়ে যায়
লালগাড়ি বেজে আসে আজো ভুল আগুন নেভাতে—
আছি ভালো।

মুখোমুখি

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রক্তচন্দনের সিঁড়ি বেয়ে
উঠে এসেছে ভৈরব,
সারা দিনরাত
চাতালে গম্ভীর শব্দ তুলে হাঁটে কাঠের খড়ম,
প্রবীণ খিলান ফাটা কার্নিশ আনত হয়ে জানায় প্রণাম,
ভয় হয় : এইবার, এইবার দিতে হবে সব।

দেবো। কিন্তু—সবটুকু নয়।
গভীর অজান্তে তার
কিছুটা উড়িয়ে দেবো মিশকালো রাত্রির হাওয়ায়,
কিছু কিছু নদীর তরলে,
তুমুল ইচ্ছার কিছু গোপন শিকড়
চুপচাপ পুঁতে দেবো
সন্ততির বুকের নিহিতে।

তারপর
রক্ত ও চন্দনে মাখা
কালভৈরবের মুখোমুখি
নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে বলব :
সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তুমি এসো।

আদিপর্ব, গাথা

সিদ্ধেশ্বর সেন

কে বলবে কেন এই গাথা কেঁদেছিল দীর্ঘশ্বাস
এ-ও তবে দেখেছে সন্ত্রাস
চাপা, অকথিত, উপশমহীনতার মতো

বেলা শেষ অগণ্য পাখির এলানো চিৎকার
পাখসাট, ওঠা-পড়া, ডানার পালক-খসা
রাত্রিও এবার

দিনমান ঠুকে-নেওয়া, খুঁটে-খুঁটে
কঠিন দু ঠোঁটে

দিনমান পেশীর জোরে বনবাসী ওরে
কাঠঠোকরার মতো কাঠুরে, কুঠার, হাটুরে, চাকমধুসন্ধানী
যাযাবর, শবরী-শবর

এই বন নাড়ী-ছেঁড়া জন্মের মতন জাতককে আঁকড়ে ধরে
অন্ধকারও জ্বেলে দেয় রাত্রি লেপে গেলে
জড়ো-করা জঙ্গলের পাতা-ডালে, ধুনির
আগুনে আদিম

কে বলবে কেন এই গাথা হানে হিম দীর্ঘশ্বাস
ও-কী জানে সভ্যের সন্ত্রাস
চাপা, অকথিত, উপশমহীনতার মতো ?

রোপণ করেছিলে জ্যা অরণ্যে ঘোর টঙ্কার
সাধ ও সাধ্যে অনন্যতা পেয়েছিল সৎ আধার

কত তিতিক্ষা, কৃচ্ছ্র, তোমার প্রযোগে লঘুতা
যেন প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ, সাত শরে বোধে বা

বাক্‌রোধ ম্লান আস্যে দেখেছিল বাজ কোঙর
পুড়ে ব্যর্থের ঈর্ষায় পোড়েও কি হস্তিনা।

ফলমূল শুধু আহারে পক্ষীপশুর সহবত
মৃগদারে জাগে ব্রাত্যের একাকীর ব্রত, তপ

এ আর্যানার্যের সংঘাত মহাভারতী স্মৃতিতে লীন
তাই নিষাদ স্বাধীন সারল্যে বা শান্ত প্রতিবাদে নেয় শহিদত্ব
আচার্যের চতুরালি সাম্রাজ্যের ছায়াতপে হীন
অর্জুনের অসূয়াও মোছে না সে সহজ বীরত্ব

অরণ্যানি, তুমিও তো সবে গেলে দূরে, অন্তর্হিতা,
তোমারো কী চাই বরাভয়
মৃগাণাং মাতরম অরণ্যানী, যা প্রাণস্থিতা,
হয়তো, এ গাথারও আশ্রয় ॥

সাইক্লোনের চোখ

দেবেশ রায়

এক

বেকালে, ঘুম থেকে উঠেই মেঘলায় কেমন মনে হয় কোথাও বেড়াতে এসেছি। কাল বিকেল নাগাদ কলকাতার হাওয়া ঝোড়ো হয়ে উঠেছিল। আর রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরতে-ফিরতে রাসে-রাসেই পরমহংসের জানা হয়ে যায় কলকাতার ষাট বা সত্তর মাইল পুবে নিম্নচাপ। তবে, তার সামুদ্রিক উৎস নাকি আরো পুবে, নাকি প্রায় ব্রহ্ম-সীমান্তে। পরমহংস তার নিজের অজ্ঞানতায় ও সহযাত্রীদের জ্ঞানে চমৎকৃত হয়ে পড়ে। উৎস, পথ—এমন সব ব্যাপারও আছে। রাতে, বিছানায় শুয়ে মনে হল সে এই সল্টলেকেই ব্রহ্মদেশ। এখানে বাতাস এত বেশি কেন? মাঠ বলে? নাকি বাড়ি-ঘর হচ্ছে বলে? কিন্তু কাল রাত থেকেই, জানলায়-দরজায়-দেয়ালে-পাশের বড় রাস্তায় বাতাসের হামলানো শুনতে-শুনতে পরমহংসের বারবারই মনে হচ্ছিল—দুর্যোগের এই আওয়াজটা তার খুব চেনা, যেন এমন দুর্যোগ তার অভ্যাস আছে—সমুদ্র বা বড় নদীর জেলেদের মতো, কত নৌকো ত কত সময় আর ফেরে না। দীঘার পারে এই আওয়াজ ছিল, সেবার? অনু জলে ভয় পায়। অতদিন আগের নয়। এ-আওয়াজটা যেন তার প্রতিদিনের কোথাও।

পরমহংস এখন দুধের কার্ডের লাইনে। এটাও তার মাসে একবার বেড়ানো। লাইনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে দু-একবার ভেবেছে কার্ডের দুধ ছেড়ে দেবে—এখন 'মাদার ডেয়ারি'-র খাশা বিলিতি বুথ হয়েছে বাজারের পাশে, একেবারে জেমস বণ্ডি নম্বর দেয়া, '001'। সেখানে ওজনের মেশিনের মতো ফাঁক। পয়সা ফেললেই বিলিতি ফিল্মের মতো ফুটো দিয়ে দুধ ঝরে। শুধু অচল ও নকল পয়সা ঠেকাতে সরাসরি না-ফেলে জমা দিয়ে টোকেন নিতে হয়। কিন্তু কোনোবারই আর তার কার্ড ছেড়ে দেয়া হয় না। শেষ পর্যন্ত এসে লাইনে দাঁড়ায়। আজ কোর্টের শেষ তারিখ। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। এখন গিয়ে স্নান-টান সেরে কোর্টে যাবে। কাল ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনেছে, অনুকে দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট যদি ছুটি নিয়ে থাকেন। তা হলে তো আবার—। ডিভোর্স করতে এত হুজ্জত জানলে কেউ বিয়েই করত না। তাও তো মামলা নেই, মোকদ্দমা নেই, মিউচুয়াল কনসেন্ট।

একটা লম্বা থলথলে ছেলে, ছেলের বাবাও হতে পারে—পঁচিশ-ত্রিশ বছর, দুধের খাঁচা দোলাতে-দোলাতে আসছে। মুখে বেশ একটা হাসি-হাসি ভাব যেন লাইনের অনেকেই তাকে চেনে। সামনে থেকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন? খবর কি বাবার?' ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে, 'বাবার তো কাল কোচিনে যাবার কথা ছিল, আমাকে আজ টিকিট ক্যানসেল করতে বললেন, যা ওয়েদার। পরশু-দিনই তো একটা প্লেনক্র্যাশ হল।'

দু-একদিনের ভেতর কাগজে একটা ছবি দেখেছিল পরমহংস—আগুনজ্বলা ভাঙা-প্লেন। কিন্তু এ-সব তো বিলেত-টিলেতে হয়—ভালো করে পড়েও দেখে নি—কোথায় কী হয়েছে। আজকাল সল্টলেকের দুধের লাইনেও প্লেনক্র্যাশ হচ্ছে? পুরো বিলেত।

'তুমি আবার কবে চললে, বাইরে?' ছেলেটি জবাবে একটু হেসে, দুলে, নুড়ে-উঠল, 'এবার বৌমাকেও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এসো', ভদ্রলোক বিরতি দিয়েছিলেন, ফলে ছেলেটি চলতে শুরু করল। তখন তিনি পেছন থেকে ছাড়লেন, 'কোম্পানির পয়সায়—'।

ছেলেটি যেন জানে তাকে সবাই দেখছে, তার কথা শুনছে। সে উঁচু গলাতেই জবাব দেয়, ঘাড়টা ঘুরিয়ে, 'গেলে, নিজের পয়সাতেই ত যেতে পারে—' ছি ছিঃ, কোথায় বিলেত, খাজা ইনডিয়ান।

লাইনটা দু-সারি বাড়ির মাঝখানে—বাতাসের ধাক্কাটা লাগছে না। কয়েক-পা সামনের মোড়টাতে বাতাসের ঘূর্ণি। মহিলা, অনু বলত, নীপুর মতো দেখতে—সব নতুন চেহারাতেই অনু পুরনো চেনা চেহারার আদল খুঁজত—ধীর পায়ে, মাথাটা নামিয়ে, বাতাসটা ঠেলে এগোচ্ছেন। সারাদিন ঘুরে-ঘুরে কাজ সারেন—ব্যাঙ্ক, ইলেকট্রিক বিল, লণ্ড্রি, ওষুধের দোকান। এতবার দেখাশোনা—পুরুষ হলে ভুরু-নাচানোর সম্পর্ক হয়ে যেত। আর এখন ত কোনো কথাই ওঠে না—ডিভোর্স করেছে যে-পুরুষ সে হয় খুনী, নয় শহিদ।

পরমহংস বা অণিমার মধ্যে কাউকেই খুনী বা শহিদ বানানো যায় নি বোধহয়। অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর সঙ্গে সম্বন্ধের টানে তাদের সম্পর্ক ভাঙে নি। মিলল না, ব্যস, এইটিই এক ও অদ্বিতীয় কারণ। পুরো

সাহেবি ব্যাপার।

অনুকে বলেছিল বাবিকে নিয়ে এ-বাড়িতে থাকতে। রাজি হয় নি। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করে পুরনো জায়গায় থাকা যায় না। এখানে বাবিকেও মুশকিলে পড়তে হত। এখন, ওখানে, গলফ-লিঙ্কে, বাবিকে কেউ বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে সে কী বলে? যে-টট্টুরি, সে হয়তো আগ বাড়িয়েই সবাইকে বলে, জানো ভাই, আমার বাবা আর আমরা আলাদা থাকি। অনু কি বাবিকে কিছু বলেছে? নাকি, বাচ্চারা এ-সব নিজেদের মতো বুঝে নেয়।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস সোজা রাস্তাটা দিয়ে, সেই চৌরাস্তারও পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসে—সামনে এসে পড়ে ধুলোমাখা টকটকে লাল পলিথিনের চাদর, কালো রাস্তাটা জুড়ে। যেন পরমহংস কোথাও দেখেছে, এই এ-রকম লম্বা লাইন, দমকা বাতাস, কালো মেঘলা, বাতাসের ঝাপট আর লাইন—দূর থেকে, ওপর থেকে, পাশ থেকে। যেন আরো একটু দেখতে পায় পরমহংস—কালো লাইন, চারপাশের শাদার ভেতর কালো লাইন, লাইনটার দুলে ওঠা, ফুলে ওঠা নৌকোর পালের মতো—কিন্তু নৌকোর পাল কি সে দেখেছে, কখনো—বাতাসের বেগে লাইনের ওপর ছিটকে পড়ে বালিকণা না বরফকণা—পরমহংস স্মৃতির স্বদেশ-বিদেশ হারিয়ে ফেলে আর বিরাট উঁচু একটা ট্রাক ধেয়ে আসতেই লাইনটা দুই ভাগ হয়ে যায়, ট্রাকটা সেই ফাঁক দিয়ে গলে দাঁড়িয়ে পড়ে দী—র্ঘ একটা ব্রেকে। আর গভীর নীল আর শাদার দেয়াল—ক্যালক্যাটা মিল্ক সাপ্লাই—খুলে কারা ঝুপ ঝুপ লাফিয়ে নামে।

এত বিদেশী-বিদেশী লাগে কেন, এই সব। এত মেঘলা আর শুকনো হাওয়ায়? বাড়িঘরের নানা নকশায়? দেয়াল-জানলা-দরজার রঙের আর গ্রিলের বাহারে?

একের-পর-এক খালি ক্রেট সাজিয়ে তলায় বাঁকা শিক লাগিয়ে আর ওপরে হাত ঠেকিয়ে দু-জন টেনে আনে। খাকি জামা-প্যান্ট, কদমছাঁট চুল আর টিকি—ড্রাইভার দাঁড়িয়ে সামাল দেয়। এর পর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে গাড়ির ভেতরে ফেলবে। দেখতে ভালো লাগে অভ্যস্ত কাজের দ্রুত ছন্দ।

একটি ছেলের ক্রেটের স্তম্ভটা ঠিক রাস্তার মুখের খোঁদলটাতে একটু জোরে পড়ল। প্রতিবারই পড়ছে। কিন্তু আস্তে দোল খেয়ে। জোরে পড়ায় ক্রেটের স্তম্ভের মাঝখানটা বেঁকে যায়। ছেলেটা ক্রেটের মাথা

ছেড়ে দিয়ে মাঝখানটা ধরতে যায়—সঙ্গে-সঙ্গে মাথাটা হেলে আসে। ডান হাতের শিকটা ফেলে দিয়ে মাথাটা ধরতে যেতেই সবগুলো ক্রেট ভেঙে পড়ে, ঝনঝন আওয়াজে বোতল ভাঙতে থাকে আর ছেলেটা নড়তে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে।

পড়ে-থাকা শিকটা তুলে নিয়ে ড্রাইভারটি ছেলেটিকে তাড়া করে। সে মাথাটা বাঁচাতে দুই হাত ওপরে তোলে। ড্রাইভারটি তাকে চুলের মুঠি ধরে পাঁজার ভেতর থেকে বের করে এনে ধাক্কা দিয়ে বুথের ভেতর ঠেলে দেয়, পেছনে শিকটা ফেলে—ঝন্ ন্ ন্। ছেলেটা শিক তুলে ভেতরে চলে যায়।

'এদের আর কি মশাই, বোতল ভাঙবে—সরকার দেবে।'

'যত ইনএফিসিয়েন্ট, কাজই হল বোতল তোলা অথচ বোতল তুলতে গিয়ে ভাঙবে—মাইনে থেকে কেটে নেয়া উচিত।'

'ওদের দোষ দিয়ে কি হবে মশাই—মাদার ডেয়ারির মতো প্লাস্টিকের ব্যাগ করতে পারে না?'

'তখন আবার দেখবেন প্লাস্টিকের ব্যাগ ফুটো হচ্ছে, ফেটে যাচ্ছে—এ মশাই আমাদের ন্যাশন্যাল ক্যারেকটার।'

যেন, মাদার ডেয়ারিটা বিলেতের।

সেই ছেলেটি আবার এক-স্তম্ভ ক্রেট আনতেই ড্রাইভার এগিয়ে ধরে, বলে, 'ছোড়ো'। তারপর, ড্রাইভার ধীরে-ধীরে সেই খোঁদলটি পার করতে থাকে। কিন্তু এবারও একটা কোণ খোঁদলে পড়তেই সবচেয়ে ওপরের ক্রেটটা ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে আসে। ড্রাইভার কনুই দিয়ে ঠেকায়। তারপর হাঁটু এগিয়ে দেয়, দোলানিটা থামে। ড্রাইভার এগিয়ে শরীর দিয়ে ক্রেটটাকে সামলে শিক ধরে টানতেই পুরো স্তম্ভটা ড্রাইভারের ডান দিক দিয়ে ঘুরে কাটা গাছের মতো রাস্তার ওপর আছড়ে পড়ল। ততক্ষণে সেই ছোকরা আর-একটা স্তম্ভ টেনে এনে রেখে দেখে ছড়ানো ভাঙা বোতল ও ছত্রখান ক্রেটগুলোর মাঝখানে শিক হাতে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে। সে দাঁড়িয়ে একবার দেখল। অপাঙ্গে। তারপর দ্রুত চলে গেল আর-একটা ক্রেট টানতে। চ্যাপলিন। পরমহংস হেসে ফেলেও তাকিয়ে থাকে। যেন, এরপর ছেলেটি ক্রমেই দ্রুততর টানতে থাকবে ক্রেটের সারি আর ড্রাইভারটি ঝাঁকার পর ঝাঁকা বোতলের নীচে চাপা পড়বে, শেষে আর ড্রাইভারটিকে দেখাই যাবে না, ঐ ছোকরাটি বেরিয়ে এসে

সর্বত্র ড্রাইভারকে খুঁজবে, বাবুদের কোটের পকেটে বা মোজায়, প্যান্টের পকেটে, মহিলাদের অস্থানে-কুস্থানে, শেষে বোতলের তলায় টিকি, বাঁকা-শিক ঢুকিয়ে টেনে বের করা, শায়িত ড্রাইভারের দুপাশে পা দিয়ে একটু নিরিখ—ড্রাইভারই তো—, ক্রেটের সারি একের পর এক ছুঁড়ে ফেলা ভেতরে, শেষে ড্রাইয়ারকেও ছুঁড়ে ফেলা, যেন সে-ও একটা ক্রেট, তারপর লাফিয়ে ড্রাইভারের সিটে আর ড্রাইভিং না-জেনেও দুধের গাড়িটি নিয়ে ছোটা পাঁচমাথা-শেয়ালদা-মৌলালি-ধরমতলা আর ড্রাইভারের জানলায় মাঝে-মাঝেই অবিনশ্বর সেই মুখের কী অসহায় আত্মবিশ্বাস, কলকাতার রাস্তা আর ট্র্যাফিকের অদ্ভুত সমস্যা আর তার দ্রুততম উদ্ভট সমাধানের যুগলবন্দীতে শেষে—

মহিলা হাত বাড়াতেই পরমহংস পুরনো কার্ডটা দিল। বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা দশ টাকার নম্বরি নোটগুলো বের করল, নতুন কেনা তাসের মতো পিছলে যাচ্ছে, আজকাল নোটে হাত দিলে তো ফিনাইলে হাত ধুতে হয় কিন্তু কাল ব্যাঙ্কের ভদ্রলোক তাঁকে দুটো একেবারে নতুন তাড়া দিলেন, একটা তাড়া অনুর, সাতাশ টাকা লাগবে—তিরিশ দিনে, পরমহংস তিনটি নোট দেয়। মহিলা গুনলেন। আবার গুনলেন। তারপর ড্রয়ারে রেখে এক টাকার একটা মুদ্রা দিলেন। তারপর আবার হাতড়ালেন। দু টাকার নোট আর পান না। শেষে এক টাকার মুদ্রাটিও ড্রয়ারে ফিরিয়ে রেখে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন, 'ভাঙিয়ে আনুন—দি-ন' বলে পরমহংসের পেছনের লোকটির দিকে হাত বাড়ালেন। পরমহংস একটু বোকার মতো পাশে তাকায়। কোথায় যাবে এখন, নোট ভাঙাতে, এতক্ষণ লাইনে দাঁড়ানোর পর। তার চেয়ে না হয় দুটো টাকা ফেরত না-দিক। গলায় কাতরতা এনে পরমহংস বলে, 'আপনি এটা রেখে দিন, আমি বরং কাল নিয়ে যাব'—

মহিলা খুব বিরক্তিতে দশ টাকার নোটটা নিয়ে ড্রয়ার খুলে, রেখে, এক টাকার মুদ্রাটা ঠকাস করে রাখেন। ড্রয়ারটা জোরে বন্ধ করেন। খারাপ কাঠের টেবিল বলেই জোরে শব্দ হয় না। পরমহংসের হাত থেকে নতুন কার্ডটা নিয়ে তার কোণায় লিখে দেন 'ডিউ দু টাকা', আবার, কাউন্টার ফয়েলের পেছনেও লিখে রাখেন, 'ডিউ দু টাকা'। 'একেবারে কিছুই আনবেন না।—' মহিলার চাপা গলায় পরমহংস খুব কুণ্ঠিত হয়ে বেরিয়ে আসে।

খোলা মাঠে হাওয়া যেন তৈরিই ছিল, বাড়ির সারির আড়াল সরে যেতেই দুদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর।

দুই

পাকা গোঁফগুলো শন দিয়ে তুলতে সময় লাগে। এক-একটি আবার বেশ দুর্গম। ফসকে যায়। ফসকানো একবার শুরু হলে বাগে আনা যায় না। যখন সবে পাকতে শুরু করেছে, তখনই বলেছিল, দিই উড়িয়ে। অনু বলেছিল, একেই তো নাম পরমহংস, গোঁফ কামালে একেবারে হনুমানবংশ মনে হবে, তোমার মোটা ঠোঁট যত ঢাকা থাকে, ততই বাঁচোয়া—। এখন কামিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু খুব হাস্যকর হবে—বউ হারিয়ে গোঁফ কামানো!

হেসে ফেলে শন সবাতে হয়। আয়নায় হাসিটা ছড়ায়। কথাটা অনুকে বলা যেত, মজা পেত। কথার মজা অনুর ভালো আসে। আজকেও বলা যায়। কোর্টে। বা কোর্ট থেকে বেরিয়ে। কিন্তু তেমন অবকাশ যে আসবেই—। ইচ্ছে থাকলে কি আর একটা কথা বলে দেয়া যায় না? পরমহংসকে আয়নায় আরো হাসতে হয়, একা-একাই। তার নিশ্চয়ই কথা বলার সঙ্গীর লোভ হয়েছে।

কিন্তু না, এখন অনুকে বলা যায় না। ভাবতে পারে সে মজা দিতে চাইছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে। অনু তার কথা বলার মজা একটু বেশি ভালো-বাসত। যদি ভাবে এখন, তাই দিয়েই পরমহংস আবার তাকে ভোলাতে চাইছে—। না। অন্তত এটুকু দীনতা থেকে পরমহংস নিজেকে বাঁচাতে, পেরেছে, এখনো, চায়ও, এর পরও। পরস্পরকে একটুও ছোট না-করে তারা সরে যেতে পেরেছে, শুধু বুঝে উঠতে একটু সময় লাগছিল, যেমন লাগে, দুজনেরই, বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজেকে, কিন্তু বুঝে ফেলার পর তারা আর চেষ্টা করে নি—সেই সব মিথ্যা চেষ্টা, পরমহংস হয়তো-বা করত—নিজের প্রতি অবিশ্বাসে, কিন্তু অনু স্থির ছিল, নিজেদের ওপর জোর করে নি, কেউ কারো দোষ খোঁজে নি, অনু কেমন দেয়ালের কোণায়, কুঁচকে, হাঁটুদুটো উঁচিয়ে, মুখটা ঢাকতে চাইছিল (?), জলে ভিজলে চোখের জমি বড় হয়ে যায় (?), সবারই না অনুরই (?), জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কোণাকুনি, তিলের চাইতেও ছোট একটা আঁচিল অনুর ডান চোখের পাতার ডান কোণে, কানের তলা থেকে চিবুক পর্যন্ত মাখনের মতো নরম রঙের

ঢালে একটু ঘোর, ছায়ার মতো, ঠোঁট কামড়েছিল কান্নাটা রুখতে (?), চিবুকটা ফেটে চৌচির—মিউজিয়ামে চিনেমাটির পুরনো বাসনের মতো,

অনুর ঐ-রকম কত ভঙ্গি তার চোখের দৈনন্দিন অভ্যাসে মিশে আছে—এমন আচমকা তা ধরা পড়ে আর ভালো লাগে। পরস্পরকে দুমড়ে-মুচড়ে তছনছ করে ঘেন্নায় তারা আলাদা হয়ে যায় নি, কিছু শূন্যতার সম্পূর্ণতা রাখতে পেরেছে, এখনো সেটাই রক্ষার।

গোঁফের নীচের লাইনটা সমান করতে ঠোঁট হাসির মতো ছড়িয়ে বাঁকা কাঁচি চালাতে হয়। ভেতরের ভেজা লালটা বেরিয়ে আসে। বিশ্রী। পরমহংস নিজেকে আজকাল এমন আচমকা দেখে ফেলছে—হাসলে তার ঠোঁট উল্টে যায়। আজকাল তাই ছড়িয়ে হাসে না, সূক্ষ্মতেই সারে।

কিন্তু সে তেমন আবিষ্কার করতে চায় না, সে তার অভ্যাস অব্যাহতই রাখে, যেন সে নিজেও জানে না সেই অভ্যাসগুলি। বাথরুম থেকে বেরিয়ে প্রথমে রবারের পা-পোষ, পা ছেড়ে মোটা ঝাড়ন, ঘসে ঘরের দিকে, ঘরের দিকে, ঘরের দরজায় তোয়ালের মোটা পা-পোষ—মেঝেতে ভেজা পায়ের দাগ যাতে না পড়ে। মাজা বাসনে জলের শুকনো দাগ পরমহংসের চোখে পড়ে যায়, ধুয়ে, শুকনো কাপড়ে মুছে রাখতে বলে। জলের লোহায় বোতলগুলো লালচে হয়, গ্লাশগুলিও, মাসে দুবার অ্যাসিড দিয়ে ধোয়া হয়—বোতল ও গ্লাসে জল টলটলই করে, এখনো। শেষমেষ অনুর পছন্দ এই শ্যাওলাসবুজের ওপর খয়েরি চৌখুপি-আঁকা মাইকাশিটে ঢাকা টেবিলে খাবার যেন ঢাকা থাকত, তাই থাকে। বাড়িটা আর সম্পূর্ণ হল না, মেঝের টাইল অনুর পছন্দ, গ্রিল পরমহংসের। বছর পাঁচেক পরে লোনটা একটু কমে এলে শোয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুম আর বসার ঘরের লাগোয়া ছোট একটা ঘর—ততদিনে বাবির তো একটা ঘর দরকার হবে—আর দরকার হল না।

বাইরে বাতাস জানলায় আছড়ায়। গা শিরশির। ভাতের দলাটা গলায় ঠেকে। জল গিলে নামায়। এত তাড়াহুড়োর কিছু নেই—বরং আধঘন্টাটাক দেরি না-করলে স্পেশ্যাল বা মিনিতেও উঠতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট না-এলে আবার একদিন যেতে হবে। তা হলে, অনু এসে শুনে চলে যাবে। তাই যদি হয়—জানতে পারবে কি করে, পরমহংস? কেরানিটি কি বলবে? 'ডিভোর্স মামলায়' 'পার্টিদের' 'হাজিরা আর গরহাজিরা' 'এত ইম্পরটেন্ট যে পার্টি অনুযায়ী রেট ঠিক হয়', 'ডিভোর্স কেস

মানেই বেট একটু হাই', 'মালকড়ি না থাকলে কি আর কেউ ছাড়াছাড়ি করতে কোর্টে আসে, হয় চলে যায়, নয় তাড়িয়ে দেয়', 'কোর্টে আসা মানেই পার্টি মালদার, কেস গড়বড়ে, যত খেলাবে তত পয়সা', 'পার্টিগুলোর জেদও বেড়ে যায়—একেবারে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল', 'স্যার, আপনার কাছে লুকবো না, তাতে আমাদের সবারই টু-পাইস হয়, না হলে, আজকালকার যা বাজার, স্যার, বোঝেনই ত সব, আপনাদের ত এডুকেটেড্ কেস, নো ঝামেলা'—সে বা অনু যে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল নয় তার মূল্য হিসেবে যেদিনই পরমহংস কোর্টে গেছে লোকটিকে দু-পাঁচটাকা দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি আর সে আজ বলবে, অনু এসেছিল কিনা—

থালা-গেলাশ নিয়ে পরমহংস উঠে পড়ে। রান্নার মহিলাটি তার আগেই একগলা ঘোমটা দিয়ে সরে এসেছেন। রান্নাঘরের বেসিনে নামিয়ে রেখে সে বেরিয়ে এলে তিনি আবার ঢোকেন। এঁর মুখটা কোনোদিন দেখে নি পরমহংস। নেহাৎ পেটের দায় না-থাকলে বৌ ছেড়ে চলে গেছে এমন পুরুষমানুষের বাড়িতে কাজ করতে আসতেন না। সকালের দু-তিনঘণ্টাতেই তাঁর কাজ শেষ হয়ে যায়। ছুটির দিন দুপুরে চচ্চড়ি, মুলো বা মোচাঘণ্ট রেঁধে চমকে দেন মাঝেসাঝে, একদিন বেগুনের পাতুরিও রেঁধেছিলেন।

ঘরে জামা-কাপড় বদলাতে-বদলাতে শোনে, বাইরে একটা মিউ-মিউ আওয়াজ উঠেই থেমে গেল। পরমহংস 'হুঁ' বলে। মহিলা চলে গেলেন। কোনোদিন না-বলে যান না। সদর দরজা বন্ধের আওয়াজ হল। আওয়াজ চুল আঁচড়াচ্ছিল। আগে নিজেকে আয়নায় অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখত। অনু খেপাত—'বিম্ববতী'।

জুতো পরার পর পরমহংস ভাবে কি কি তার নেয়ার আছে। টাকাটা? ব্যাগে ভরা হয়েছে। বাবির অ্যালবামটা—অনু ছবির কপি চেয়েছিল একটা করে, অ্যালবামটাই বরং থাক অনুর কাছে, তার কাছে ত নেগেটিভ থাকলই। উঠে, পাতা উল্টোতে-উল্টোতে অ্যালবামটা আনে—শাড়ি পরে আল্পনা দিতে-দিতে মুখ তুলে তাকিয়ে, তখন বয়স তিন হবে, কী ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, আবার বাঁ-দিকের গজদন্তটি বেরিয়ে, আমার বাবানি, গাবানি, জাবানি—পরমহংস অ্যালবামটি ব্যাগে পুরে দরজা টেনে বেরিয়ে যায়—বাবা, তুমি আমাকে আর বাবা বলবে না, মেয়েরা কি বাবা হয়, মেয়েরা ত মা হয় / কে বলেছে তোকে/কেন, ঐ যে নীতাদির বাবা নীতাদিকে মা বলল / কে নীতাদি/তুমি কাউকে চেনো না, এই যে আমাদের উল্টোদিকের বাড়ির

দিদি ; জানো বাবা, নীতাদির ভাইযেব খুব কষ্ট / কেন / আহা-হা কত ছোট, একা একা থাকে, কোথায় থাকে মা / হস্টেল / হ্যাঁ, সে, কি মা / হস্টেল / হ্যাঁ, টেলে থাকে / হস্টেল / হস ত আগেই বলেছি মা / তোকেও হস্টেলে দিয়ে দেব/আহা-হা, তোমার যা বুদ্ধি বাবা, ওখানে ত সন্ন্যাসীরা থাকে, সন্ন্যাসীরা কি মেয়েদের রাখে, মা / কেন, সন্ন্যাসীদের বৌ দবকাব হয না / হয ? মা / হলেও, তোকে নেবে না / কেন, আমি নেজে-নেজে সাজব, লিস্টিক দেব, নেলপালিশ দেব, শাডি পরব, টিপ পরব, ঘোমটা দেব /

বাবি দাঁডিযে উঠে, দু-হাত নাচের মতো তুলে, হাসি-হাসি মুখে, আবখোলা চোখে ঝাঁকডা মাথায মুখটুকুকে বাতাসে ফুলেব মতো দোলায়।

বাবি, বাবি। এক বাতেব পুবনো বাতাস পবমহংসেব চোখ-দুটোব ওপবই হু-হু ঝাঁপায—পাড-ভাঙানি স্রোতের মতো, দু-চোখই চেপে বন্ধ কবে ফেলে সে, যেন সেটাই একমাত্র বাঁধ; তাডাতাডি সিগাবেটের প্যাকেট বেব করে, সিগাবেট বেব কবে, ঠোঁটে দেয, দাঁডিযে ধবায, চোখ বুঁজেই হেসে ফেলতে চায—বাস্তাব মাঝখানে, একা-একা, এঃ, সকাল থেকে সাহেব-সাহেব কবে একেবাবে বাঙালি হযে যাচ্ছে ব্যাপাবটা। কযেক-পা হাঁটাব পর পরমহংসকে রুমাল বেব কবে নাক ঝাডতে হয।

বাবি হযত তার কাছে এসে থাকতে পাবে, সেও ত যেতে পারে মাঝে-মাঝে—কিন্তু গত দেড-বছবে ত তেমন কিছু হয় নি। দেখা হযেছে, আকস্মিকই। বাবি বড হচ্ছে, হতে থাকবে, তার কাছ থেকে দূরে, পবমহংস যেন সেই দূব থেকে দূরে সবে যাচ্ছে, যেন দূবটা ভবিষ্যতের নয, অতীতেব। তাব সরে আসাটা সে দেখতে পায। টেব পায কেমন আত্মকরুণাব ভাব আসতে শুরু করে দেয যেন। আর-একটা সিগারেট ধরিযে, বাসস্টপে দাঁডিযে, সেই দূবের দিকে তাকায, মোডের দিকে, বাসের দিকে, সোজা রাস্তা, গাছপালাগুলো এখনো বড হয নি, ছোট-ছোট, কোথাও-কোথাও সবে মানুষেব মাথা ছাডায, কাঁটাগাছ, ঝাউগাছ, ঝাউগাছের বনেব ভেতর দিযে হাই-টেনশন লাইন—গ্রিনভার্জ, ওদিকে সেন্ট্রাল পার্কেব পাশে দেবদারু-বীথি, সেগুলো ঝোপ না হয়েই ঢ্যাঙা, চন্দ্রালোকে হাঁটলে বাংলাদেশ মনে হয না, সল্টলেকেব মাটি নাকি নোনা আব বেলে—বড গাছ হবে না, সোজা তাকালে কেষ্টপুব খালের পাশে আকাশ-ছোঁযা গাছেব সাবিকে বাংলাব সীমান্ত মনে হয, তাব পব এই সল্টলেক সিটি, কলকাতা ও বাংলাব সীমান্তেব বাইবে—পাডাব নাম ব্লকে বি-ডি, সি-এ, বি-ই ;

জলের ট্যাঙ্কে নাম বাসস্টপের—দুই নম্বর, তিন নম্বর, চার নম্বর, পাঁচ নম্বর; আর বাজারের নাম—লোকাল সেন্টার। বাজারে আবার তারঘেরা চিড়িয়াখানা, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে পাখির খাঁচা, ডিয়ার পার্কে তারের জালের ফাঁক দিয়ে হরিণরা এসে হাত থেকে ঘাস খেয়ে এ-ওর পিঠে মুখ ঘসে, এর পর আবার 'সাফারি পার্ক' হচ্ছে, স্ন্যাকবার, সুইমিং পুল, কোয়ালিটি বাসস্টপ, টাঙ্গাইল শাড়ির একজিবিশন কাম সেল, কোনো বাংলা নাম নেই, নো বেঙ্গলি, অল ইংলিশ,

রাস্তা এত ফাঁকা যে 'জনহীন' বলতে সত্যি একজনও মানুষ নেই সেই বাঁক পর্যন্ত—ডাইনে বেঁকে গ্রিনভার্জের আড়ালে চলে গেছে যেখানে। আর 'নির্জনতা' এতই নির্জন যে বাতাসের হা-হা ছুটে আসার সঙ্গে মিশে আসে গাড়ির গর্জন—ট্রাক অথবা বাসেরই। সেই গর্জনটা বাড়তে থাকে। আর তার পর যখন মাঝে মাঝে থামে তখন নিশ্চয়ই বাস। বাতাসও কি রাস্তা দিয়ে ছুটে আসে, সাইক্লোনের বাতাস, সেই কাল বিকেল থেকে যা ছুটে যাচ্ছে নাকি কলকাতার ক-মাইল পুব দিয়ে, যার উৎস নাকি ব্রহ্ম-সীমান্তে। পরমহংস দেখতে পায় বাতাস বাঁক নিল গ্রিনভার্জের ঝাউবীথির মাথা দুমড়ে। এত দূর পর্যন্ত পিচ-বাঁধানো সুনসান নির্জনতাতেই বোঝা যায়, বাতাসও দেখা যায়, পরমহংস দেখতে পাচ্ছে দূরে পিচের কালোটা যেন বদলে গেল গাঢ়তর আর সেটা ছুটে আসছে, ছুটে আসছে, তার পর সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই অবিচল ঝাঁপিয়ে পড়ল পরমহংসের ওপরে—পেছনে বাস, গভীর কমলা, মেঘলায় কি রং গভীর হয়, নাকি রোদে পাতলা? স্পেশ্যাল। যে-নম্বরই হোক উঠে বসবে।

ডি-লাক্স বাসগুলো গব্‌মেন্ট খাশা বানিয়েছে। একেবারে সল্টলেকের মতোই যেন বিলিতি-ব্যাপার, কলকাতাই মনেই হয় না, শুধু নাকি বসে-বসে যাওয়া যাবে, বাইরে আবার লাল আলোতে Full লেখা জ্বেলে রকেটের মতো ছুটে বেরিয়ে যায় সারেকি কলকাতারই পাথুরেঘাটা-পোস্তা-আড়িয়াদহ-টেরিটি-বৌবাজার দিয়েই, যেন এগুলোকে রোখার ক্ষমতা কলকাতার রাস্তারও নেই। মেয়েদের জন্য সিট ছাড়ার হাঙ্গামা নেই, পুরুষদের ইকুয়াল রাইট, নো মাইনরিটি প্রবলেম নেই, ইয়োরোপ। আর মেয়েগুলোও কেমন টুপটাপ উঠে দী—র্ঘ হাত বাড়িয়ে রড ধরে ফেলে। আজকাল মেয়েদের হাতগুলো কি বেশি লম্বা। তিনজনের-দুজনের সিট হওয়ায় সামনে তাকালে শুধু মাথার সারি—সুটকেসের বিজ্ঞাপনে প্লেনের প্যাসেঞ্জার-

দের মতো, ড্রাইভারের পেছনে সাইনবোর্ড, 'সেনকো জুয়েলার্স, জ্যোতিষ বিভাগ···আমাদের কোনো ব্রাঞ্চ নাই'।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও বৌবাজারে বাস আটকে গেল, আমহার্স্ট স্ট্রিট পেরিয়ে, জ্যাম। একটু পরেই বাসের ভেতরের বাতাস সুগন্ধি হয়ে উঠল—অ্যান্টিপার্সপিরেশন ডিওডোরান্ট, আফটার-শেভ, ইনটিমেট—জ্যাম দেখতে-আসা টুরিস্ট বাসের মতো পরমহংস অন্যদের মতো জানলা দিয়ে দেখতে লাগল, দেখতে দেখতে রাস্তাটা কেমন ভরে উঠল।

সাড়ে দশটা বেজে গেল। এখনো যদি বাস থেকে নেমে এগোয় কিছু-একটা উপায় হতে পারে। শেষে যদি অনু এসে দেখে পরমহংস পৌঁছল না। ভাবতে পারে, শেষ পর্যন্ত সে পেছিয়ে গেল। ভাবতে পারে? বা, ম্যাজিস্ট্রেট যদি ছুটি নেন, তাহলে অনু এসেছিল কিনা সেটাও জানা যাবে না, অবশ্য সোমকাকু আছেন, অনুর সোমকাকু, এ-ব্যাপারে দু-পক্ষেরই এক উকিল। তাহলে কি হাঁটবে। সামনে বৌবাজারের মোড়, তারপর এ্যাভেন্যু, লালবাজার, ডালহৌসি, তারপর, তারপর।

এত হিসেব কষেও পরমহংস সিট ছেড়ে নামতে পারে না। একটা বাসে বসার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নেমে যাওয়া, মাঝরাস্তায়। কিন্তু এর ভেতর এই বাসের দু-দিকেই গাড়ির সারি। কেউই হর্ন বাজায় না। মানে সবাই-ই জানে ব্যাপারটা তাদের নিজ-নিজ ক্ষমতার বাইরে। এখন নামলেও পৌঁছতে পারত, সামান্য দেরি হলেও, কিন্তু এর পর। এখান থেকে পেছিয়ে শেয়ালদায় গিয়ে, পার্ক স্ট্রিট হয়ে—। কিন্তু শেয়ালদায় ট্যাক্সি? এখন? বাস থেকে দু-একজন নামলে পরমহংসও সাহস পেত, সিনেমার টাইমে যেমন হয়, কিন্তু এখন ত অনেকে ব্যাগ থেকে খবরের কাগজ বের করে মেলে ধরেছে, কেউ কেউ 'সানডে'।

প্রায় পনে-এগার, না, আর চলে না, না-হয় একটা রিকশা নিয়ে এ্যাভেন্যু, কিন্তু এতক্ষণে ত এ-জ্যাম বন্যার জলের মতো গলি-ঘুঁজিতেও সেঁদিয়ে গেছে, রিক্সাও আর—, তা হলে, হাঁটা, হাঁটাই, না-হয় এক ঘণ্টা দেরি হবে।

পরমহংস সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আর দু-সারি আসনের ফাঁক দিয়ে দরজার দিকে এগোয়। অভ্যাসে, নাকি প্রত্যাশায়, পরমহংস তৈরি থাকে কলকাতার, ট্রাম-বাসের সেই অদৃশ্য স্বরমালিকা বেজে উঠে, বাজতে থাকবে, 'দাদা, চললেন?', একবার শুনেছিল, 'ঝাঁপ দিলি তুই মরণ-যমুনায়।' কিন্তু

কেউ যেন তাকে দেখলই না, তাকে যে এই নিশ্চয়তা ছেড়ে নামতে হচ্ছে সেই বাগে দরজার কাছে পৌঁছতে-পৌঁছতে পরমহংসের রাগ হয়েছে, শালা সব সাহেব হয়েছে, একটা লোক বাসের সিট ছেড়ে নেমে যাচ্ছে—কোন আওয়াজ নেই।

কিন্তু বাসের দরজাটা খোলা যায় না, গা ঘেঁষে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে, দরজা খুলতেই ঠেকে যায় গাড়িটার পেছনের ডান-দরজার কাচে। বাসের দরজা বন্ধ করে পরমহংস আবার ঠেলে, দরজা খোলে না। জানলার পাশে বসা এক ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে বললেন, 'ভাই, একটু এগোন গাড়িটা, দরজা খোলা যাচ্ছে না।' ভদ্রলোক কি তার উপকারের জন্য বললেন, না-কি দরজা-খোলা যাচ্ছে না এমন-একটি বাসের ভেতরে বসে থাকার ভয় থেকে। বাইরে কোনো গাড়ির স্টার্ট নেবার আওয়াজ ওঠে না। একটু অপেক্ষা করে পরমহংস ঘড়ি দেখল। সর্বনাশ। তারপর বাসের দরজাটা জোরে খুলল, গাড়ির কাচে গিয়ে লাগল, সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ির দরজা বন্ধ করার জোর আওয়াজ। মানে, ড্রাইভার রেবল। তারপর বাইরে ইংরেজি গালাগালের তুবড়ি। মানে, ড্রাইভার নয়, সাহেব চালাচ্ছেন। পরমহংস দেখতে পাচ্ছে না। তার হাত দরজার হ্যাণ্ডেলে। এই বাসের কণ্ডাক্টার বেশ নিরুদ্বিগ্ন তাকিয়ে গালাগাল শুনছিল। থামলে, নিরুত্তেজ গলাতেই বলল, 'অত ইংরিজি না বলে গাড়িটা দু-ইঞ্চি বাড়ান—'

এ-কথার জবাবেও বাইরের ইংরিজি বেড়ে গেল। পরমহংস আর দেরি করতে পারে না, সে দরজাটা খুলে বেশ জোরে ধাক্কা দেয়, তারপর ঠেলতে থাকে। বাইরের ইংরিজিটা তখন ঝড়। এই বাসের কণ্ডাক্টার আঙুল দেখিয়ে বলে, 'যান, যান, আগে গাড়িটা বাঁচান।' তার পরই জোরে দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। মানে ইংরিজি এখন গাড়ির ভেতরে। স্টার্টের আওয়াজ। বন্ধ হয়ে গেল। সেরেছে। ডাউন নাকি? আবার স্টার্টের শব্দ। এবার বাসের দরজা একটু ফাঁক হচ্ছে, আর-একটু, আর-একটু, গলে যেতে গিয়ে ঠেকে যায় পরমহংস, আর-একটু, ব্যস, টুপ করে রাস্তায় পড়ে গেল পরমহংস আর বাসের দরজাটা আরজে দিল। তার যেন প্রতীক্ষা ছিল পেছন থেকে আওয়াজ পাবে—'দাদা, একটু কান্নি মেরে', 'একটু চেপে', 'ব্যস, গলে যান দাদা, গলে যান দাদা।' শালা, সব সাহেব হয়েছে, একটা লোক বাস থেকে এভাবে নামছে, কোন আওয়াজ নেই।

রাস্তায় পড়েই, চ্যাপলিন। তাকেও ঐ প্রাইভেট গাড়ি দেখতে পায় নি।

সে-ও ঐ গাড়ির লোকটিকে দেখল না। এর পর, আবার ইংরিজি চলবে। এই বাসের পেছন দিয়ে, একটা ঠেলার সামনে দিয়ে, প্রাইভেট, প্রাইভেট, ট্যাকসি, টেম্পো, এত রাশি-রাশি থেমে-থাকা চাকার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ভয় লাগে, যদি এই মুহূর্তে চলতে শুরু করে,

এতগুলো চাকা হঠাৎ চালু হয়ে গেছে আর লোকটি চাকাগুলোর সামনে দিয়ে, পেছন দিয়ে, পাশ দিয়ে, ওপর দিয়ে, তলা দিয়ে, চাপা পড়তে-পড়তে, না পড়তে-পড়তে, লাফাচ্ছে, গড়াচ্ছে, পিছলচ্ছে, পেছচ্ছে, এগচ্ছে আর বেরিয়ে আসছে আর প্রতিটি মুহূর্তের মৃত্যুর আশঙ্কার ভেতরও ভদ্রতার হাসি, চোখ কাপানো, ভুরু তোলা, মাথা নোয়ানো, আর সেই অবিস্মরণীয় মুখ—মৃত্যুর ভয়ে ক্রম-লম্বমান অথচ সামাজিকতায় স্মিত। টুপি এবার পরমহংসের মাথায়, যেন বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও বৌটাকে কিছুতেই ডিভোর্স করতে পারছে না, এবারও পারল না—এই জ্যামের জন্য।

তিন

কোর্টের সিঁড়ির মাথায় অনু, পেছন ফিরে. আর পুরো ফাঁকা সিঁড়িটা পরমহংসকে উঠতে হয়, একা-একা, অনুর দিকে। কিন্তু অনুর কী-একটা বদলে গেছে, বদলেছে, কী-একটা, পরমহংস বাঁক নেয় আর সঙ্গে-সঙ্গেই অনু ঘাড় ঘোরায়, এক থোকা চুল তার কানের পাশ দিয়ে সামনে এসে পড়ে। চুল কেটে ফেলেছে। তাকে দেখে অনু ঘুরে দাঁড়ায়।

আর, একমাত্র তখনই যেন পরমহংস রুমালটা বের করতে পারে। তার আগে পর্যন্ত ত শুধুই উদ্বেগ, পৌঁছতে পারবে কি না। মুখটা মুছতে-মুছতে সিঁড়ির মাথায় আসতেই অনু সোজা দাঁড়ায় সেই অস্পষ্ট মুখে, বোঝা যায় না—অনু কি কিছু জিজ্ঞাসা করছে, নাকি কিছু ভাবছে, না কি নীরবতা চাইছে। ততক্ষণে পরমহংস শুরু করে দিয়েছে, 'আর বলো না, সেই জ্যাম বউবাজারে, বাস থেকে নেমে, হেঁটে—', পরমহংস কথার মাঝখানে অনিশ্চিত হয়ে যায় শেষ করার কি দরকার আছে, কিন্তু শেষ না-করেই বা কি করে, তার গলার স্বরটা নেমে যায়, যেন ব্যাকরণের খাতিরে কোনোরকমে যোগ করে, 'প্রাইভেট বাস একটা পেয়ে বাঁচোয়া।' সে এ-প্রসঙ্গ আর বলবে না বোঝাতে রুমালটা দিয়ে চোখ-মুখ পুরোটা মোছা শুরু করতে হয় আর মোছা শেষ হয়ে গেলেও দেখতে হয় অনুর ঠোঁটে হাসিটাই আছে আর চোখে চাউনি, যেন তার আরো বলারই প্রশ্রয়। কিন্তু এখন ত আর সেই গল্প আর

শুরু করা যায় না। পরমহংসের উচিত ছিল, কোথাও থেকে মুখচোখে জল দিয়ে, ক্লান্তি ও ব্যস্ততার সব চিহ্ন মুছে ফেলে, একটা সিগারেটের শান্তি মুখে লেপে এখানে পৌঁছনো—নৈর্ব্যক্তিক। যেন সামান্য দেরিটুকুও তার সিদ্ধান্ত। সিগারেট—সিগারেট, সিগারেটেই এক হতে পারে বিপন্ন ব্যক্তিত্বের পুনরুদ্ধার। পরমহংস পকেট থেকে সিগারেট-শালাই বের করে। অনু বলে, 'সোমকাকু বলেছিলেন, তুমি এলে খবর দিতে। তাঁকে কি খবর দেব?'

পরমহংস বোঝে না, অনুমতিটা তাকে দিতে হবে কেন। সে সিগারেটটা না-ধরিয়েই বলে বসে, 'হ্যাঁ, খবর দিলেই ত হয় মানে, দেয়া যায়, এখন,'

কাঠি-জ্বালানোর ভেতরে অনু বলে, 'তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি খবর দিয়ে আসি।' পরমহংসের পাশ দিয়েই অনু চলে যায়। খানিকটা চলে গেলে পরমহংসের মনে হয়, তারই কি যেতে চাওয়া উচিত ছিল, নাকি চলো-না—আমিও যাই, বলা। অনু ত এখন তাকে বলতে পারে না—ডেকে আনো। অনু কি আগেও কখনো বলত? বলতে পারত? পরমহংসকে ঘাড় ঘুরিয়ে অনুর দিকে তাকাতে হয়। অনুর হাঁটাও কি বদলেছে। চলার ছন্দে চুলের থোকাটা দোল খাচ্ছে। ভালো লাগছে। অনু খুব সূক্ষ্মভাবে আপাদমস্তক নিজেকে বদলে ফেলছে। সে কি অবস্থার বদলের সঙ্গতিতে? না-কি বদলেরই টানে? অনু কি জানে সে বদলাচ্ছে? অনু কি বদলে গিয়ে অতীতটাকে অবাস্তব করে দিতে চায়। এতটা কবিডর সোজা পেরতে অনুর হাতগুলো দোলে, দুলে যায়, আনখবাহুমূল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এতটা হাঁটতে কি দেখেছে কখনো অনুকে, পরমহংস, স্বাধীন হেঁটে যাওয়া, শুধু হেঁটে যাওয়া, শুধু হেঁটে যাওয়া, দু-হাত দুলিয়ে হেঁটে যাওয়া।

একা-একা দাঁড়িয়ে, একটা সিগারেট খেতে-খেতেই পরমহংসের শরীর এলিয়ে যায়। ঘামতে-ঘামতে ছুটতে-ছুটতে পৌঁছনোর পর যেমন এলিয়ে থাকে। ঠোঁটের কোণে ঘামের নোনতা। যতবার লাগে—ততবারই মুছতে হয়। মুছতে-মুছতে খড়খড়ে হয়ে যায়। টাকরা শুকিয়ে আসে। চোখের পাতা নেমে আসে। দিনের শুরুতেই দিনশেষের ক্লান্তি। কোথায় সেই সাইক্লোনের হাওয়া—কলকাতার কয়েক মাইল পুব দিয়ে যা বয়ে যাচ্ছে, ব্রহ্ম-সীমান্তে যার কেন্দ্র। হাওয়া নেই, বদলে এই মেঘলা আচ্ছন্নতার গুমোট। রেলিংটাতে, যেখানে অনু দাঁড়িয়ে ছিল, হেলে কোমরটা এগিয়ে বাঁ-কাঁধের খাঁজে মাথাটা হেলিয়ে চোখ আধবোঁজা করে রাখে পরমহংস, সেই ঝিমুনির ভেতরই তার মনে হতে থাকে সে যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, নোনা জমেছে

তার কপালের দু পাশে, জামা-কাপড়ও যেন আধময়লা। আচ্ছন্নতার মধ্যেও পরমহংস টের পায় যেন শরীরের ভেতর থেকে তেলচিটে আত্মকরুণার গড়াচ্ছে। বরাবরই কি এ-রকম? অনুর সামনে কে? কোথাও একটা কিছু ছিল, যেখানে ঘটনা পরমহংস থেকেই বেরত, পরমহংসেই ফিরে আসত কোথাও একটা ছিল, যেন। কিন্তু এখন এই সিঁড়িতে হেলান দিয়ে পরমহংসের আর মনে পড়ে না, কোথায়। ঝিমুনিতে ঘাড়টা হেলে যেতে নিলে পরমহংস সোজা হয়।

সোমকাকুর সঙ্গে অনু আসছে। অনুকে সোমকাকুর সঙ্গে পা ফেলতে হচ্ছে বলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয়। তাতে, এই দূর থেকে দেখা যায়, অনুর চুল ঘাড়ের পাশে বেশি দোলে। মাঝেমধ্যে অনু মুখ তুলছে। তাতে চুলে আলাদা দোল খায়। কিন্তু ঘাড়টা নিচুই থাকে বেশি, অনুর। একবার ডান দিকে তাকায়। আবার বাঁ দিকে। তোমার ত হাঁসের গলা, কোনো সময়ই সোজা নয়। এখন, দূর থেকে তার যত কাছে আসছে অনু, তত মনে হচ্ছে, অনুর কিছু বদলায় নি, কিছু না। জামা-কাপড়-চুলের একটু-আধটু বদলের ভেতরও তার মুখমণ্ডলের সেই উদাসীন বিস্তার। সামনে এসে সোমকাকু দাঁড়ান না বা তাকান না, ডাইনে বেঁকে এজলাসের ভেতর ঢুকে যান, ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বার ওদিকের বারান্দায়, অনু এখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে। তার পর ডাইনে এজলাস, বাঁয়ে সিঁড়ির মাঝখানের করিডর দিয়ে অনু তাকিয়ে থাকে। পরমহংস রেলিঙে কোমর ঠেকিয়ে ছিল। সে সোজা হয় না বা সিগারেট বের করে না।

অনু কয়েক পা এগিয়ে আসে। পরমহংস দাঁড়িয়ে থাকে। অনু এজলাসের ডান দিকে তাকিয়ে পেছনে দু-পা সরে ঐ রেলিংটাই ধরে, পরমহংসের পাশেই। একটু বিরতি দিয়ে, এজলাসের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেরি দেখে ভাবছিলাম ও-রকম কিছু-একটা হয়েছে', পরমহংসকে একটু ভেবে বুঝতে হয় অনু সেই জ্যামের কথা বলছে—সে-কথা এখন সে ভুলে গেছে। অনু চুপ করে থাকে। সেই নীরবতায় দুজনের ভেতর জমে ওঠে পরস্পরের কাছে পৌঁছবার এক অনিচ্ছুক উদ্যোগের তাড়া—তাদের বিচ্ছেদের শান্তিপূর্ণ বিপরীতক্রিয়ায় যে-উদ্যোগের অভ্যাস ধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে নি, সম্পূর্ণ। এখন পরমহংস একটা গল্পে ঢুকে যেতে পারে, অনুর মুখের সবটুকুতে এখন আগ্রহ বিস্তারিত হবে। মনে পড়েছে, মনে পড়ে, বারবার এমনিই বয়েছে ঘটনার স্রোত, দুজনের মাঝখানে যেমন ঘটনা ঘটতে পারে, মাত্র সেইটুকু ঘটনার, সেইটুকু স্রোত। অনু পেছন ফেরে।

এজলাসের দিকে পেছন ফিরে, রেলিঙে হাতের ভর দিয়ে অনু সিঁড়ির ঘূর্ণনের অন্তর্বর্তী শূন্যতা বেয়ে তাকিয়ে থাকে। রেলিঙে পিঠ হেলিয়ে পরমহংস—সামনে ফাঁকা এজলাস। সুবাসের একটা আভাস পরমহংস কখনো-কখনো পায়। মৃদু থেকে মৃদু। দু-জনের সেই অপরিবর্তনীয়তায় সেটুকুই ছিল অস্থির।

পরমহংস যখন এজলাসের ওদিকের দরজায় সোমকাকুকে দেখে সোজা হয়ে বলে, 'চলো, চলো, ডাকছেন', তখন ঐ বাতাসটাই দোল খায়, আর গন্ধটা একটু ছড়িয়ে পড়ে, ওরা দুজন হাঁটতে শুরু করে। এজলাসের দরজায় দুজনই দাঁড়ায়, এ ওকে পথ দিতে। 'চলো'—শুনে অনু মাথাটা একটু নুইয়ে, কুঁচিতে বাঁ হাতের আঙুলগুলো মেলে ঢুকে যায়। পেছনে পরমহংস। আর ওদিকের দরজায় পৌঁছে অনু ঘাড়টা একটু ঘোরায়, ঠোঁটটা একটু ফাঁক, ঘাড়টা একটু নোয়ানো, একটু অসহায় লাগে অনুকে, কোথায় যেন একটু অনিশ্চয়তা। পরমহংস গভীর আত্মবিশ্বাসে বলে, 'চলো'—। তারপর দরজা পেরতেই বাতাসের দমকায় থমকে আঁচলটা টেনে নেয় অনু, দুজনে পাশাপাশি সোমকাকুর সামনে দাঁড়ায়। 'দাঁড়াও, এক্ষুণি হয়ে যাবে, বলে এসেছি, না-হলে এজলাসে বসে যেতেন, সেই টিফিন পর্যন্ত বসে থাকতে হতো।'

এদিকের বারান্দাটা চওড়া, ময়লা, গাছগাছালিতে ছাওয়া, সেগুলোর মাথা এখন সেই বাতাস মোচড়াচ্ছে। হাওয়াও যেন নদীর মতো, তারও খাত আছে। এই খাত দিয়ে বাতাসটা কোন দিকে বইছে?

পাগড়ি-বাঁধা বেয়ারা এসে সোমকাকুকে কিছু বলে। 'তোমরা দাঁড়াও', বলে তিনি ঘুরে ম্যাজিস্ট্রেটের চেম্বারে ঢুকে যান। অনু আঁচলটা আবার টানে। তারা বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল বলে, নাকি এখানে আলো বেশি বলে, ওপর থেকে তাকিয়ে পরমহংস দেখতে পায় অনুর কপালের ওপরের ছোটছোট চুল এত বাতাসেও কপালে সেঁটে আছে। ঘামছে? যেমন হয় ওর? পরমহংস বলে ফেলে, 'কি? হাত-পা ঘামছে?' অনু প্রথমে তাকায়। তাকিয়ে থেকে হেসে ফেলে মাথা দোলায়। তারপর ডানহাতটা তুলে এনে পরমহংসের হাত চেপে ধরে, ভেজা, ছেড়ে দেয়, ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরের পর্দা তুলে সোমকাকু কথা না বলে ডাকেন।

দরজার কাছে আসতেই সেই বেয়ারা পর্দা তুলে ধরে। যেন, অনু আগে ঢুকতে চায় না, কিন্তু ততক্ষণে সে মুখোমুখি, ফলে তাকেই আগে ঢুকতে

হয়। পেছনে ঢুকে পরমহংসকে দাঁড়াতে হয়, অনুর কাছে, পেছনে। ম্যাজিস্ট্রেট মাথা-নিচু কিছু লিখছেন, বা পড়ছেন, বা দেখছেন, সোমকাকুর নজরও সেদিকে। পেছনের পর্দা পড়ে গেছে। পরমহংস দুপা গিয়ে একটা চেয়ার, টেবিল থেকে একটু সরিয়ে, অনুকে বলে, 'বসো', নিজে পাশের চেয়ারটিতে গিয়ে বসে। ব্যাগের মুখ খুলে একবার পরমহংস দেখে নেয়, এনভেলাপের ভেতর টাকার তাড়াটা। কখন দিতে হবে? নাকি ম্যাজিস্ট্রেটই বলবে, দিতে?

ম্যাজিস্ট্রেট চোখ তোলেন, 'আমার মনে হয় না, তার বেশি দেরি হবে, আপনি একবার রেজিস্ট্রারের ব্র্যাঞ্চে কাউকে দিয়ে খবর নেবেন ত।' সোমকাকু হাসেন, 'ওখানে ত অবস্থা জানেনই স্যার, কার খবর আর কে দেয়?'

ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর চেয়ারের হাতলে দুই হাত চেপে বলেন, 'সে আর কি করবেন, সব জায়গাতেই ত ঐ, দি লণ্ডন টাউন ইজ ফলিং ডাউন এ্যাণ্ড ফলিং ডাউন', বলতে-বলতে উঠে দাঁড়ান, সঙ্গে-সঙ্গে সোমকাকু, সুতরাং পরমহংস ও অনুও, 'আমাকে একটু যেতে হচ্ছে, কোর্ট', 'হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়, নিশ্চয়', 'হ্যাঁ, চলো, তোমরা অফিস থেকে সার্টিফায়েড কপিটা নিয়ে নিও', তা হলে কি হয়ে গেল, মানে, ওঁরা অন্য কথা বলছিলেন? কিন্তু টাকাটা, পরমহংস কার দিকে তাকাবে বুঝতে না পেরে টাকার খামটা বের করে জিজ্ঞাসা করে, 'এই টাকাটা ত, কোথায়?' সোমকাকু তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'সে, এখানে কি, ওকে দিয়ে দাও'

পরমহংস এনভেলাপ থেকে বের করে টাকার তাড়াটা এগিয়ে ধরে। আর অনু হঠাৎ যেন একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। এতক্ষণ অনু আর পরমহংস ছিল যেন একপক্ষ। এখন অনু সম্পূর্ণই একা, সম্পূর্ণই। তাকে কেমন আইনি বাধ্যতায় নিতে হয়, অন্যদিকে তাকিয়ে, ততক্ষণে সোমকাকু পর্দা তুলে বেরিয়ে গেছেন, পরমহংস আর অনুও এগোয়।

এজলাসে লোক জমে গেছে। সোমকাকু পথ করে নিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। পরমহংস বুঝতেই পারছে না তাদের ব্যাপারটা চুকে গেল, নাকি কোর্টে কিছু হবে। তারা বেরিয়ে আসতেই সোমকাকু বললেন, 'পরে একদিন এসে সার্টিফায়েড কপি নিয়ে যেও', 'আর ত কিছু করার নেই', পরমহংস জিজ্ঞাসা করে।

'না, না, আর কি করার আছে। তোমরা তাহলে যাও এখন, অনু' অনু ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দেয়। সোমকাকু কয়েক-পা চলে যাওয়ার পর

পরমহংস হঠাৎ অনুকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, উনি ত আমার কেসও করলেন, আমার একটা ফি দেয়া উচিত না ?'

অনু এমনিতেই ঘটনার দ্রুততায় বেশ অগোছালো। এই প্রশ্নে হেসে ফেলে যেন একটু গুছোতে পারে—সেই আকস্মিক নিঃসঙ্গতাও, 'আমি কিছুই বুঝছি না, ত এরা এতদিন আমাদের ঘোরালো কেন ?' 'তা হলে তুমি দাঁড়াও, আমি ওঁকে দিয়ে আসি, তুমি জানো ওঁর ফিজ কত ?'

'আমি কি করে জানব, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে',

পরমহংস একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলে, 'উনি ত ঐদিকের হলটাতে বসেন, না ? প্রথমদিন গিয়েছিলাম'

'চলো না, আমি যাচ্ছি'

পরমহংস আর অনু সোমকাকুর খোঁজে চলে। অনু একটু তাড়াতাড়িই হাঁটছিল। ফলে পরমহংসও। আবার, সেই মৃদু, খুব মৃদু সুবাস পরমহংসকে ঘিরে ধরছে।

হল ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে অনু খোঁজে। পরমহংস দেখায়, 'ঐতো', অনু দেখতে পায় না, পরমহংস তাকে দাঁড়াতে বলে এগিয়ে যায়। অনু দরজা থেকে সরে করিডরের বিপরীত দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

পরমহংস ফিরে বলল, 'এমব্যারাসিং। নিলেন না কিছুতেই—'

অনু বাঁয়ের বেশ রাজকীয় সিঁড়িটা দেখিয়ে বলে, 'এখান দিয়ে বেরনো যাবে নিশ্চয়ই'।

ওরা সেই সিঁড়িটা দিয়ে নামে। সিঁড়িটা শ্বেতপাথরে তৈরি যেন, চওড়া, রেলিংগুলোও মোটা-মোটা, সরাসরি নেমে গেছে নীচের বারান্দায়। দু-পা নেমেই বোঝা যায়, এ-সিঁড়ি তাদের নামার জন্য হতেই পারে না। আর বোঝা মাত্র পরমহংস একটু তাড়াতাড়ি নামতে শুরু করে, 'তাড়াতাড়ি নামো, শেষে আবার ফিরে উঠতে হবে' সিঁড়ি যখন, কেউ-না-কেউ ত ওঠে বা নামে'

'তা হলে কি আর এত ফাঁকা থাকে'

পরমহংস দু-সিঁড়ি নেমে গিয়েছিল। অনু ছিল দু-সিঁড়ি ওপরে। সেখানে দাঁড়িয়ে অনু পেছন ফিরে একবার অতবড় সিঁড়িটার নেমে-আসা দেখে। আর পরমহংস দেখে, অতবড় সিঁড়িটার মাঝখানে অনুকে, অনু ফিরেই বাকি ধাপগুলো দৌড়ে নেমে আসতে পারে, যে-দৌড়ের টানে তাকে সামনের ঐ বিস্তারিত বারান্দারও অনেকখানি চলে যেতে হবে, অনেক দূর পর্যন্ত।

অনু নেমে আসে খুটখুট।

পরমহংস তখন দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে আবার পুরো সিঁড়িটা, ফাঁকা চওড়া দেখে। শরীর, শরীর, শরীরের কোনো স্মৃতি নেই, শরীরের শুধু বর্তমান আছে। পরমহংসের খুব আসক্ত ইচ্ছে করে—ঐ সিঁড়িটা দিয়ে আবার ধীরে ধীরে বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে ওঠার, সেই শ্বেত সোপানময় এখন অনুর শরীরের গন্ধ উড়ছে, এখনো, এখনো।

অনু বলল, 'এই দিক দিয়ে বেরনো যাবে, দেখো', যেন তারই রাস্তা চিনবার দায়। আর, তার উল্টোদিক দেখিয়ে পরমহংস বলে ওঠে, 'ঐ ত রাস্তা'। দুই সেপাই বাইরে যাবার বা ঢোকার রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে। তাদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেকেই টের পায়, এখান দিয়ে তাদের বেরবার কথা নয়,

'নেহাত লেডিজ দেখে কিছু বলল না', পথে নেমে পরমহংস বলল, 'ডাব খাবে নাকি?'

হেসে অনু বলে, 'যাক গে, বেরিয়ে ত এসেছি, হ্যাঁ'।

'দুটো ডাব দাও ভাই'

'স্ট্র নেই বাবু'

'সে কি, স্ট্র নেই কেন,'

'ফুরিয়ে গেছে, আনতে পাঠালাম'

'কি? স্ট্র ছাড়া খেতে পারবে?'

'নাও না'

ডাবটার মুখের কাছে ঠোঁট লাগাবার একটা খাঁজ কেটে দেয়। অনু তার ব্যাগটা দেয় পরমহংসকে ধরতে। তারপর দু হাতে ডাবটা ধরে ঠোঁটটা লাগায়, তারপর ডাবসহ মাথাটা উপুড় করে দেয়। একহাতে অনুর ব্যাগ, আর-এক হাতে নিজের ডাবটা ধরে পরমহংস দেখে অনুর চিবুক থেকে গলা—টানটান আর ভেতরের জলস্রোতে থিরথির। আর তার চুলের থোকা শূন্যতায় দুলে যায়। তোমার ত হাঁসের গলা, সব সময়ই নড়ছে, অনু অবলীল হয়ে উঠছে, যেন। ডাবটা, সহই মুখটা নিচু করে ঠোঁটটা তোলে অনু, একদমে খেয়েছে বলে একটু লালচে। সামনের দেয়ালটার কোণায় খোলাটা ফেলে এলে তার হাতে ব্যাগদুটো ধরিয়ে পরমহংস বলে, 'দারুণ খেলে ত?' পরমহংস ঠোঁট লোগানোর খাঁজটা দেখে, অনু বলে, 'ঐ খাঁজটার নীচে, নীচের ঠোঁটটা দাও, তার পর খাও,

দেখবে পড়বে না।'

পরমহংস টের পায় তার ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি ডাবটা নামায়। 'নাঃ হল না'।

'সাহেব, স্ট্র ছাড়া ডাব খেতে পার না?'

ততক্ষণে পরমহংস হাঁ করে ডাব থেকে জল ঢালছে মুখের ভেতর।

এখন তাদের ভেতর আরো একটা স্মৃতি তৈরি হয়ে চলেছে। ঐ সিঁড়ি, সিঁড়ির মাঝখানে অনুর ঐ থমকে দাঁড়ানো, তারপর এই রাজপথ। কেউ কি জানে, স্মৃতিতে কতটুকু থাকে, স্মৃতি কিভাবে ছিন্ন-ছিন্ন করে নেয়। স্মৃতির কোনো শরীর নেই, কোনো শরীর নেই। আকাঙ্ক্ষাতুর অশরীরী স্মৃতিতে

গির্জা, দুপুর, সারি-সারি শূন্য চেয়ার, বাইবেল, এ-পাশে ওপাশে করিডর, সিলিঙের কাচে খ্রীস্ট, অবসন্ন শরীরে আমাদের ঘুম পেয়েছিল,

ঘোড়দৌড়ের মাঠে গোধূলি, সীমানায় সন্ধ্যা, ঘাস কেটে মাথায় নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছিল, অস্থির শরীরে মাঠের ভেতরের ঘাস, গোধূলি ও বিস্তার চেয়েছিলাম, ট্যাক্সিঅলা পেছন থেকে বলল, কতক্ষণ লাগবে,

কাচের ঘরটার দরজা তুমি খুলে দিতেই সেই বুড়ো ও খোঁড়া সঙ্গিনীহীন রোমশ কুকুর ঘরটাকে আমাদের জন্য শূন্য করে ভেজা লাল জিভ ঝুলিয়ে বেরিয়ে এসেছিল,

লাল সিঁড়ির কুয়োর পাকে পাকে, তোমার কী ধীর নিঃসীম অবতরণ, খরায়, খরায়,

'তোমাকে ত এখন বাড়ি ফিরতে হবে, নাকি?'

'হ্যাঁ, তাত বটেই'

'বাবলি কেমন আছে'

'ভালো, কথা আরো বেড়েছে। চিঠি দিও ওকে, বলে বাবা কি আমার ওপর রাগ করেছে?'

'এই যে অ্যালবামটা'

'তুমি রাখো নি, ছবি?'

'আমার কাছে ত আছে, প্রিন্ট করিয়ে নেব। ট্যাক্সিতে যাবে?'

'হ্যাঁ। যাতে হয়'

'এতগুলো টাকা নিয়ে, মিনিতে যাও বা স্পেশ্যালে'

'হ্যাঁ। যাতে হয়'

'তাহলে চল, ওদিকে যাই'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তা পেরতেই পেছন থেকে 'রাণীকুঠি' 'রাণীকুঠি' টিন বাজাতে-বাজাতে এক মিনি এসে দাঁড়াল, 'আরে, এত ফাঁকা, উঠি?' 'আসুন, আসুন, উঠুন, জলদি', অনু উঠে যায়, বাসটা ছেড়ে দেয়, জানলার কাচ ধরে অনু বসে পড়ে, কাচটা কালো, অনু আচমকা ফাঁক খুঁজে পায় না বাইরে তাকাতে, পরমহংস দেখতে পায় কালো কাচে অনুর চারটি আঙুলের খোদাই আর বাইরে তাকাবার ফাঁকটার জন্য তার হাঁসের মতো গলার পেছনে বেঁকে যাওয়া। জানলায় আড়াআড়ি শিক ছিল।

চার

ভি. আই. পি. রোডের স্টপে নামে পরমহংস। রাত দশটা হয়ে গেলে ফেরার সময় তাকে বেশির ভাগ দিন এই দিক দিয়েই যেতে হয়। ব্রিজটা পেরিয়ে একটু হাঁটতেই—বাড়ি। ভি-আই-পির মাঝখানে আর পাশে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বোনা গাছগুলো একবার নুয়ে পড়ছে, আবার খাড়া হচ্ছে। বাসে-বাসেই তার জানা হয়ে গেছে, আজ শেষ-রাতের দিকেই নাকি ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিমে সমুদ্রের ভেতরে সাইক্লোনের চোখটা, আই অব দি সাইক্লোন, গলে যাবে, তার মানে, নাকি, কাল দুপুর নাগাদ সব পরিষ্কার।

বাঁ-দিকের লেনটা পেরিয়ে ডান দিকের লেনের পাশে পরমহংস দাঁড়িয়ে থাকে—গাড়ি যাচ্ছে। বড় নদীর পাশে দাঁড়ানোর মতো। গাড়ির শব্দ আর হাওয়ার শব্দ এতই মিশে যাচ্ছে, মনে হতে পারে, হাওয়াটাই মাটি কামড়ে ছুটছে। এই দুর্যোগের আওয়াজ পরমহংসের বড় দৈনন্দিন, সমুদ্রের জেলেদের মতোই, অনেক সময় তো কোনো-কোনো নৌকো ফেরেও না। রোজকার রোজকার এই ঝোড়ো আওয়াজ পেরিয়ে তাকে ফুট-ব্রিজের প্যাঁচানো সিঁড়িতে পা দিতে হয়। নিজের পায়ের শব্দ ধাপে-ধাপে অনুসরণ করছে যেন, ডাইনে-বাঁয়ে কেষ্টপুরের খালের মজা শূন্যতার খাত বেয়ে হু হু হাওয়া কলকাতার দিকে ছুটে যায়, নাকি কলকাতা থেকে ছুটে আসে। আবার সিঁড়ি ঘুরে নেমে যায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের সল্টলেকে, এখন সামনে হাওয়া, তারও আড়ালে যেন আরো কঠিন হাওয়া।

বাড়ির গেটে হাত দিতেই মনে হয় যেন গেটের ওপারে কিছু, কিন্তু বাতাসে তো সবই অস্থির। একটু স্থির হয়। ভেতরে ঢোকে না। তার পর জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

ভেতর থেকে টর্চ এসে তার মুখে পড়ে।

সেই আলোতেই দেখা যায়, তার চাইতে বেশি শোনা যায়, বুটের আওয়াজ। 'আসুন, আমরা থানা থেকে আসছিলাম',

পরমহংস ভেতরে না-ঢুকেই জিজ্ঞাসা করে, 'মানে, আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, আপনার নাম ত পি—'

'পরমহংস মিত্র'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পি, মিত্র, হ্যাঁ, আপনার কাছেই'

'কেন বলুন ত?'

'আপনাকে একটু থানায় যেতে হবে'

'থানায়? আমাকে? কি ব্যাপার?'

'আপনি ভেতরে আসুন না। অন্ধকারে আর—মানে, আমাদের ওপর অর্ডার আছে আপনার বডিসার্চের'

পরমহংস ভেতরে ঢুকেছিল। সে এবার গলার স্বর বদলে বলল, 'আপনাদের যা অর্ডার আছে করবেন, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বলবেন কি?' 'আপনি কি আজ কোর্টে শ্রীমতী অণিমা রায়কে একহাজার টাকা দিয়েছিলেন'

'হ্যাঁ'

'ম্যাজিস্ট্রেট আর একজন অ্যাডভোকেটের সামনে?'

'হ্যাঁ'

'ঐ সব নোটই জাল'

'কাল ব্যাঙ্ক থেকে ঐ নোটগুলো আমাকে দিয়েছে, নতুন নোট'

'মিস অণিমা রায় ব্যাঙ্কে ওগুলো জমা দিতে গিয়েছিলেন',

'কি করে, আমি ত ওঁকে বাসে তুলে দিলাম',

'ওঁদের ওখানে একটা ব্যাঙ্কের ইভনিং ব্র্যাঞ্চে ওঁর অ্যাকাউন্ট আছে। সেখানেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তারপর উনি টালিগঞ্জ থানায় এসে পুরো স্টেটমেন্ট দেন। ঐ অ্যাডভোকেটও আসেন। ম্যাজিস্ট্রেটও ফোনে এটুকু কনফার্ম করেন, আপনি ওঁকে একটা এনভেলাপ থেকে বের করে টাকার তাড়া দেন তা উনি দেখেছেন, কিন্তু সেই তাড়াটাই এই তাড়া কিনা তা বলতে পারেন না।'

'মানে, ঐ মহিলা, মিস অণিমা রায়কেও অ্যারেস্ট করা হয়েছে?'

'না, উনি বেইল পেয়েছেন। আমাদের ত এখন রাত্রিতে থানা লক-আপে মহিলা রাখা নিষেধ। তার ওপর অ্যাডভোকেট, ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি

কি একটু চেঞ্জ করে নেবেন—'

'না। চলুন। তাব দরকাব নেই'—গেট দিযে পবমহংসই আগে বেবলো। পুলিস-অফিসাব গেটটা সতর্কভাবে আটকে দিলেন। 'ঐ যোড পর্যন্ত, সরি, একটু হেঁটে যেতে হবে, গাডিটা আমবা ইচ্ছে কবেই ভেতবে আনি নি, আপনাব সোস্যাল পজিশনেব কথা ভেবে',

'না না ঠিক আছে, চলুন',

এতগুলো বুটেব শব্দেব ভেতর তাব নিজেব পাযেব আওযাজটা বেখাপ্পা লাগে। পুলিশ অফিসাবটি বলে, 'আপনি ত আজ দুধেব কার্ড কবিযেছেন'

'হ্যাঁ। আজ সকালে'

'ওখান থেকেও লালবাজাবে জানিযেছে আপনার নোট তিনটি ফ্রড ছিল। দুপুবে ত এই দুধেব ডিপোব ক্যাশ-ইন-চার্জ মেযেটিকে নিযে যেতে হল, সে পাডাব লোক ভেঙে পডেছে, কান্নাকাটি, নিযে ত যেতেই হল, রিসিপ্ট বই দেখে মেযেটি আপনাব নাম বেব কবে দিল—মানে দুটো কমপ্লেনই আপনাব নামে—'

টর্চেব আলোয পাগুলোই মাঝে মাঝে ছাযা ফেলে।

'দুটো কেন, দশটাও হতে পারে, টাকা ও একটা ব্যাঙ্কেরই—একটা বানচেরও'

'হ্যাঁ। তা ত বটেই। আচ্ছা সরি, কিছু মনে কববেন না, আপনি কি শুধুই পবমহংস—?'

'হ্যাঁ। অনলি পবমহংস। নো রামকৃষ্ণ।'

'মানে এ-রকম নাম ত—তাই আর কি'

'আপনাব বোধহয় বিপোর্টেব জন্যই দবকাব, না, নামের হিস্টরি'

'না। তা ঠিক নয। তবে এ-সব নোট-ফ্রড কেসে তো একজনকেই অনেক নাম, এলিয়াস, অনেক সময নিতে হয'

'ও। আমার মা হংসেশ্বরী মন্দিবে মানত কবায নাকি আমার জন্ম হযেছিল। তাই নামেব ভেতর কোথাও একটা হংস দবকাব ছিল'

'মানে হংস দিযে অন্য নামও হতে পাবত?'

'তা পারত, হংসেশ্বব, হংসধ্বজ, কিন্তু মাব বোধহয এটাই পছন্দ ছিল'

টর্চেব আলোতে চেনা গেল, বড বাস্তা।

হু হু বাতাস ছুটে আসে, ছুটে যায। অন্ধকাবে কোনো নিশানা কবা যায না—মনে হয় চাব পাশ থেকেই বাতাস ছুটছে। অফিসাব টর্চেব আলোতে ড্রাইভারেব পাশেব আসনটি দেখান। পবমহংস ঢুকে যায। আরো কাবা ওঠে। অফিসাব পবমহংসেব পাশে বসেন।

প্রথমে অন্ধকাব ভেদ কবে আলো জ্বলে।

তাব পব বাতাসেব শব্দ ভেদ কবে জিপেব আওযাজ ওঠে।

পরমহংস ভেবে,হেসে ফেলে, খাঁটি বিদেশী ফিল্ম, সল্টলেক, ডিভোর্স কেস, নোটফ্রড,সাইক্লোন,এব ভেতর শুধু তাব নামটাই তাহলে বাঙালি থেকে গেল।

পড়তে চাই ভালো বই

হিরণকুমার সান্যালের

পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র

পরিচয়-এর একদা সম্পাদক ও আড্ডাধারীর মজলিশী স্মৃতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালীর চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস। ১৫৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কবিতার জন্ম এবং অন্যান্য

তাঁর এই প্রথম প্রবন্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছে কবি-ঔপন্যাসিকের ঐতিহ্য-সন্ধান ও নিজের রচনাকর্মের নেপথ্য-ইতিহাস। কয়েকটি কবিতার নিবিড় পাঠ, বঙ্কিমচন্দ্র এবং সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনা বিষয়ে বিতর্কিত রচনাদুটির বর্ধিত রূপ বইটির অতিরিক্ত আকর্ষণ। ৯৲

পরিতোষ সেনের

জিন্দাবাহার

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের ঢাকা শহর ও তার মানুষ এক ভাবী শিল্পীর মনকে কীভাবে জীবনের পাঠ দিয়েছিল তারই প্রাঞ্জল আলেখ্য —যা একই সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসও। তেরোটি ছবি। ১৬৲

SUSOBHAN SARKAR

ON THE BENGAL RENAISSANCE

The Bengal Renaissance has with its entirety been presented in a panoramic manner dissecting at the same time the inner contradictions and limitations of the glorious movement Rs 40 00

PRAMITA GHOSH

MEERUT CONSPIRACY CASE

& the left-wing in India

An in depth study unravelling the 'Manufacture' and secret intelligence proceedings of the case from archival sources Rs 80 00

ABU SAYEED AYYUB

TAGORE'S QUEST

With Ayyub's contributions Tagoreana has entered the truly modern phase While relieving him from the crucifix of so-called modernism, Ayyub has discovered the roots in Tagore that retain his relevance and readability even to day Rs 30·00

প্যাপিরাস ॥ ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা-৪

জিনিসপত্রের দাম কমানোর জন্যে

যত দিন যাচ্ছে বাজারে জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করাই এখন দুরূহ কাজ। প্রতিদিনই সব কিছুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এর কি কোনই প্রতিকার নেই?

খাদ্যশস্য, চিনি, তেল, কেরোসিন, ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই সম্ভব নয়? আমরা মনে করি সম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা নেই—এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তাঁরা কোন কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তাঁরাই দেশের যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন - সে সবই তো তাঁদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে-রাজ্যে জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিস সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি এ. ১৫৪৯৮/৮০

দাম : দশ টাকা

পরিচয়

৫০ বর্ষ

লাউন

৪ সংখ্যা

১৩৮৭

এই স্মরণীয় মুহূর্ত
থেকেই আপনার সঙ্গী
ইউকোব্যাঙ্ক।

পদোন্নতির খবর তো পেলেন। এখন নিশ্চয়ই ভাবছেন, অনেকদিনের সাধ একটি স্কুটার কেনা কি করে সম্ভব হবে...

এই স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরাই পরামর্শ দেব, কেমন করে আপনার ইচ্ছে পূরণ হবে।

কতোদিনের ইচ্ছে, নিজের একটা স্কুটার হোক। কিন্তু দরকার মতো টাকা পাওয়া যাবে কেমন করে? ইউকোব্যাঙ্কে আপনি এ প্রশ্নের উত্তর পাবেন। হিসেব করে আমাদের বলুন, মাসের খরচ বাদ দিয়ে এবার থেকে কতো টাকা বাঁচাতে পারবেন। আমরা পরামর্শ দেব আমাদের সঞ্চয় প্রকল্পগুলির কোনটা আপনার কাজে আসবে। আপনার সঞ্চয় দ্রুত কী ভাবে বেড়ে উঠবে।

যে মুহূর্তে আপনি স্থির করলেন একটি স্কুটার কেনা দরকার, সেই মুহূর্তেই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এই স্মরণীয় মুহূর্ত থেকেই ইউকোব্যাঙ্ক আপনার সঙ্গী।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান।

UCO/CAS-63/80 BEN

প্রকাশিত হলো

দেবেশ রায়-এর উপন্যাস

মফস্বলি বৃত্তান্ত ১৫ টাকা

শঙ্কর চক্রবর্তী-র

জ্যোতির্বিদ্যার নির্ভরযোগ্য বই (২য় সংস্করণ)

সহজভাবে অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে হাজির করা হয়েছে বইটিতে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে বইটি খুবই সাহায্য করবে।

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ ২০ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

পরিচয়

নভেম্বর ১৯৮০ ৫০ বর্ষ ৪ সংখ্যা

পূরণচন্দ্র জোশী স্মরণে। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১

'পরিচয়'-এর আড্ডা। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ১৭

রবীন্দ্রনাথ : প্রত্যাখ্যান ও পরিগ্রহণ। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ২৯

মোনালিসা। পূর্ণেন্দু পত্রী ৯২

কবিতা

সিদ্ধেশ্বর সেন। ১ (ক), ১০০

গল্প

ভূমিহীন দেশ। আবুবকর সিদ্দিক ৭৫

পুস্তক-পরিচয়

অরণ্যের অধিকার / মহাশ্বেতা দেবী। রণেশ দাশগুপ্ত ১০২

বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি / অরুণ সেন। অরুণকুমার রায়চৌধুরী ১০৬

কবিতার সেতুবন্ধ / উত্তম দাশ। আশীষ মজুমদার ১১২

নাট্য-প্রসঙ্গ

ব্রেশ্‌ট-এর গালিলেওর জীবন / ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ। অরুণ সেন ১১৬

চিত্রকলা-প্রসঙ্গ

চিত্তপ্রসাদ-এর প্রদর্শনী। বিষ্ণু দাশ ১২৪

বিয়োগপঞ্জি

সরসীকুমার সরস্বতী। অশোক ভট্টাচার্য ১২৬

প্রচ্ছদচিত্র যামিনী রায়

উপদেশকমণ্ডলী
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক
দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

অন্ধ কে চক্ষুষ্মান কে

সিদ্ধেশ্বর সেন

দাও করে অন্ধ যেখানে অন্ধতাই সার
চক্ষুষ্মানও ছিল তারা অন্ধের যষ্ঠির মতন
চলত ফিরত তাও বন্দী অন্ধত্বের কারার
রক্ষীরা যেমন ফেরে
জেল গেট থেকে আদালতে

ফিরিয়ে নাও দৃষ্টি কেননা দৃষ্টিই ফুঁড়েছে
যেমন শলাকা ফোঁড়ে, সূঁচ ফোঁড়ে,
অ্যাসিড বাল্বও, তবে ফোঁড়ে নাকো সরাসরি চোখে ছোঁড়ে,
লজ্জাহীনেও লজ্জা
পাবে বলে জেল গেট থেকে আদালতে

কে অন্ধ কে চক্ষুষ্মান এ-সবও কী চেনা হবে ভার
কে তবে এ সমাজের বক্ষকের উর্দি চাপিয়েছে
গায়ে, নাকি উর্দি নেই খালি উদোম গা দগ্‌দগে ঘা
অপরাধে জেগে আছে, অপরাধীর নিস্তার
কতবার দেবে তবে
জেল গেট থেকে আদালতে

পূরণচন্দ্ জোশীকে স্মরণ করে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেশ কিছুকাল ধরে পূরণচন্দ্ জোশী জীবন্মৃত অবস্থায় দিল্লীতে পড়েছিলেন, যদিও কখনও তার পক্ষে সেই নিঃসাড় দুর্দশাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি, আর তাই মাঝে-মাঝে গোটা মনের জোরকে জড়ো করে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকল বেদনাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না দিয়ে, নিজের পঙ্গুতাকে পরাজয়ের প্রয়াসেই প্রায়-অসম্ভব প্রকরণের সহায়তায় হাজির হয়েছেন ১৯৭৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের ভাটিণ্ডা অধিবেশনে। বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বাঁধাধরা নিয়মে না হলেও প্রায়ই অকারণ পুলকে পরস্পর সাক্ষাৎকারের যে রেওয়াজ আজ কলকাতা-দিল্লীর মতো শহরে কঠিন আর কঠোর হতে হতে প্রায় খতম হয়ে এসেছে, রেওয়াজের বেশ টেনে জোশার পুরোনো সহচর, সুহৃৎ আর শিষ্য-স্থানীয়েরা অনেকে জওয়াহরলাল-নেহরু-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা দুরভিগম্য চত্বরে অবস্থিত তাঁর বাসগৃহে গত কয়েক বছর ধরে যখনই গেছেন, তখন দেখেছেন যে, জোশীর দেহ অপটু হলেও মন আর মাথা আছে তাজা, সেখানে চিরাভ্যস্ত সহস্র চিন্তার ভিড়, বাক্‌শক্তিতে প্রতিবন্ধক থাকলেও কথোপকথনের জন্য সে উদ্‌গ্রীব। বন্ধুজনকে দেখে, তাদের দুখের কথা শুনে, তাদের 'মিষ্টিমুখ' করিয়ে তার আনন্দ। জীবনযজ্ঞে কায়মনোবাক্যে যোগদানের শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েও সেখানে সদুপস্থিতির কামনা শেষ দিন পর্যন্ত সে পরিত্যাগ করতে পারে নি। আশ্চর্য নয়, কারণ এই ব্যক্তিই ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৭ সালের শেষ পর্যন্ত ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ও মুখ্য সঞ্চালক। এই ব্যক্তিই ছিলেন অজস্র প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত বৈরিতা আর কর্তৃপক্ষীয় ভ্রূকুটি ও নিষেধাজ্ঞা ও অত্যাচার সত্ত্বেও এ-দেশের সমাজদেহের গর্ভগৃহ থেকে সংহত সাম্যবাদ-সমাজবাদী আন্দোলনের আবির্ভাবের প্রধান হোতা।

দিল্লীতে তার আকস্মিক অথচ বহুদিন ধরে সবেদন-প্রতীক্ষিত জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে-অধ্যায় সাঙ্গ হল তা সর্বথা স্মরণীয় আর বিশেষত স্মরণীয় 'পরিচয়' পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সর্বজনের কাছে। এর হেতু এই যে পূরণচন্দ্ জোশী আ-কিশোর এমন এক বিশ্ববীক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিল যার অদ্বিতীয় অন্বিষ্ট হল প্রকৃত অর্থে 'যোগক্ষেম', জগতের সর্বত্র

সমসুযোগের সমাজ স্থাপনা, তুচ্ছ স্বার্থে অসম্পৃক্ত অথচ মানবমহিমায় ভাস্বর জীবনের বাস্তব আবাহন, মেহনতী মানুষের মিলিত সংগ্রামফলে 'সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে' নবজীবনের অভিষেক—'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু' বলে যে অজর কামনা সংসারবিমুখ বলে বহুবর্ণিত আমাদের এই শাশ্বত ভারতেরই মর্মবাণী, তারই সমুজ্জ্বল রূপায়ণ।

এ বড় কঠিন, জটিল ব্রত, আর ঠিক সেই জন্যেই গোটা দুনিয়ার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনার দুঃসাহসী সংকল্প যাদের টেনে নামায় কমিউনিজম-এর পথে, তাদের পরীক্ষা, তাদের দুর্ভোগ, তাদের যন্ত্রণা যাই হোক না কেন, সাফল্য-অসাফল্যের হিসাবনিকাশে ইতিহাসের দাঁড়িপাল্লায় নিজের এবং নিজেদের সংস্থার হ্রস্বতা প্রতীয়মান আশঙ্কা করে যতই মর্মবেদনা ঘটুক না কেন, সবকিছু ছাপিয়ে একটা অনন্তপার আনন্দেরও তারা অধিকারী, যে-আনন্দ আধ্যাত্মিক রসে জারিত নয়, যা তুরীয় মার্গের কল্পবিলাসে মণ্ডিত নয়, অথচ যার প্রকাশ ইতিহাসেরই বাস্তব গতিচ্ছন্দে, যেখানে ব্যর্থতা অনুষঙ্গ নেয় সার্থকতার, যেখানে দেব আর দানব মিলেই যেন মানুষকে নিয়ে চলে নব-জীবনের সন্ধানে, যেখানে মহীয়ান মানুষ স্ববলে বহুজনসংহতির কল্যাণে নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব আমাদের এই অতি প্রিয় গ্রহের ভবিতব্যকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। যে কোনো কমিউনিস্ট পার্টিতে নেতৃবৃন্দ সমেত সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সহায়কই দোষেগুণে গড়া। মানবচরিত্রের এই বৈপরীত্য বৈশিষ্ট্যে অল্পাধিক সকলেই অংশীদার। আত্মকথায় জওয়াহরলাল নেহরু যা এক জায়গায় লিখেছিলেন তা মনে পড়ে যাচ্ছে—তিনি বলেছিলেন যে হাজার দুর্বলতা আর ত্রুটি থাকলেও কমিউনিস্টরা কিছু পরিমাণে লেনিনের যে মহা-গুণে ভাগ বসাতে পারে তা হল যে ইতিহাসের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের কর্মকাণ্ড, সর্বদা নির্ভুল নির্ধারণে অপারগ হলেও এটাই তাদের সব চেয়ে সেরা হাতিয়ার। মনে আছে একদিন, বোধ হয় বছর দশেক আগে হবে, যখন পি সি জোশী কিঞ্চিৎ অসুস্থ হলেও অপটু নয়, কিন্তু পার্টি-নেতৃত্ব থেকে নানা কারণে বহুদিন বিচ্যুত, কেমন যেন অনাদৃত ও অবহেলিত, তখন পূর্ব জার্মানী থেকে পার্টি-ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের পর ফিরে আমাকে সে বলেছিল যে, 'কর্মকাণ্ডী' হয়ে থাকাই তার কামনা। এ কথা বলেছিল ভালো-ভাবে জেনেই যে, বেশ কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আমি তার প্রতি রুষ্ট না হলেও একটু যেন বিরক্ত। হয় তো পুরো 'বিপ্লবী'-সুলভ কঠোরতা থেকে আমরা উভয়ে কিছুটা মুক্ত ছিলাম বলে মতান্তর আমাদের মধ্যে মনান্তর কখনও

ঘটাতে পারে নি—অবশ্য জানি না, প্রকৃত সংকট সময়ে এটা সম্ভব বা অসম্ভব, কিন্তু জানি বহুজনকে আত্মীয় করার শক্তি তার ছিল, আর বুঝি এজন্যই জোশীর মৃত্যু অপ্রত্যাশিত না হলেও আমার মতো তার অগণিত সুহৃৎ ও সাথীর বুকে মোচড় দিয়ে অন্তত কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জানি বলে জোশীর সম্বন্ধে হাজার কথা মনে ভেসে ওঠে, যার মধ্যে বাছাই করে কিছু খবর 'পরিচয়'-পাঠকদের সামনে ধরতে গিয়ে ভয় হচ্ছে যে, খেই না হারিয়ে ফেলি। এতক্ষণ এক নাগাড়ে লিখে চলেও ঠিক খেই তো খুঁজেই বোধহয় পাই নি! মনে পড়ছে প্রথম তার সঙ্গে দেখা, যখন আমি বছর-পাঁচেক ইয়োরোপ-প্রবাস থেকে প্রত্যাগত আর আমাদের দেশবাসীর হিসাবে কিছুটা বিদ্বান্ বলে পরিচিত এক ব্যক্তি। তাছাড়া তখন আমি আন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় বছর অবস্থানকালে তেলুগু-ভাষীদের মধ্যে সমাজবাদ আর সোভিয়েটভূমি সম্বন্ধে প্রচারে লিপ্ত থাকার দরুন সরকারি কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাতেও 'বাম' রাজনীতি মহলে কিছু জল্পনার পাত্র হয়ে বসেছি। কলকাতায় এক 'নিখিলবঙ্গ' ছাত্র সম্মেলনে সভাপতি হওয়া বা স্পেনের ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে ভারতবর্ষের অভিবাদন জানাবার সভায় সরোজিনী নাইডুর মতো দেশনেত্রীর সঙ্গে এক মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার ডাকে সাড়া তখন দিতে হচ্ছে। বিলাতে বাসকালে অক্স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিল সজ্জাদ জহীর বা ইফ্‌তিয়ার উদ্দীন, যাদের ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি আকৃষ্ট করেছিল (সজ্জাদ তো সক্রিয় সদস্যই হয়েছিল)। কিন্তু তখনও কমিউনিজম্ বিষয়ে, তাত্ত্বিক দিক থেকে না হলেও, কার্যক্রম ও পদ্ধতির বিচারে, কেমন যেন আমার অনীহা ছিল—প্রায়ই মনে হতো তাদের মানসিকতায় আছে এমন অশোভন অধৈর্যের আতিশয্য এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের সম্বন্ধে এমন পণ্ডিতম্মন্য অবজ্ঞা যে, তাদের সংসর্গ আমার মতো লোকের পক্ষে সহজ নয়, স্বস্তিকর হবার সম্ভাবনা তো নেই-ই। বেশ মনে আছে যে মির্জাপুর (এখন শ্রদ্ধানন্দ) পার্কে ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সুবর্ণজয়ন্তী সভা হচ্ছে। চাঁদপুরের বয়োবৃদ্ধ নেতা, সর্বজনমান্য হরদয়াল নাগ সভাপতিত্ব করছেন। আমি গিয়েছি যেমন পূর্বে যেতাম অনুরূপ সভা-সমাবেশে। আর সেখানে দেখলাম এক প্রান্তে জড়ো হয়ে কয়েকজন অজানা (নানা ধরনের, প্রধানত অ-ভারতীয় পোশাক পরা) ব্যক্তি বলে চলেছে: 'কংগ্রেস সুবর্ণ জয়ন্তী ধ্বংস হোক্!' কাছাকাছি অনেকে বিদ্রূপ

করছে বা গালাগাল দিচ্ছে—তারা কমিউনিস্ট বা পুলিশেব চব জানিও না বুঝিও না—অথচ মনটা বিগডে গেল। যে-মতবাদেব দিকে আমাব মনপ্রাণ ঝুঁকেছে অথচ সংকোচেব বাধা কাটে নি, সেই মতবাদেব 'প্রবক্তা'-রূপে ঐ বিচিত্রমণ্ডলীকে দেখে মুষডে পডেছিলাম।

হাইকোর্টে পসাব জমিয়ে সংসাবযাত্রা কপালে ছিল না আর রোজগাবেব সহজ রাস্তা মিলে গেল বিপণ কলেজে অধ্যাপনা। সময আর সাধ্য নিতান্ত কম তখন ছিল না। কেবল চলত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীব সঙ্গে মার্কসীয় তত্ত্ব ও কর্ম নিযে, যাকে বলা চলে নিদিধ্যাসন। আর প্রায একই সময়ে ঘটল কবি বিষ্ণু দে বা তখন দর্শনচিন্তায় সদামগ্ন আবু সয়ীদ আইযুব-এর মতো সুহৃৎ-এব নির্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-এব বিদগ্ধ 'পবিচয'-গোষ্ঠিতে অপ্রতিভ সসংকোচ পদার্পণ। কদাচিৎ দেখা হলে সজ্জাদ জহীব আমাকে বলত পি-সি জোশীব কথা। সে ছিল মীবট ষডযন্ত্র মামলায অভিযুক্তদেব মধ্যে সব চেযে অল্পবযসী, যে তখনই বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টিব সাধাবণ সম্পাদক, যাব নাকি সর্বচিন্তা কর্ম আনন্দের উৎস ও সার্থকতা হল আমাদেব এই দেশে সাম্যবাদী বিপ্লবেব পথ-পবিচাযন এবং নির্মাণ প্রচেষ্টা, যে বুঝি সজ্জাদ-কে কেবলই মনে করিয়ে দিত লেনিনকে, এমনই কায়মনোবাক্যে একাগ্র ও অনলস তাব চিত্ত ও কর্ম (কেউ যেন মনে না কবেন যে লেনিনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে; কোনো মহাজন বিষযে যদি বলা হয যে বুদ্ধদেবের 'করুণা' বুঝি কাবও কর্মে ও চিন্তায দেখা যায, তা হলে বুদ্ধের সঙ্গে তুলনাব কল্পনাও আসা উচিত নয)। আন্ধ্র-দেশ থেকে ফিবে কলকাতায ব্যাবিস্টাবিব ভান কবে চলেছি, বিপণ কলেজে পডাচ্ছি, এদিক-ওদিক বক্তৃতা দিযে বেডাচ্ছি। সমাজেব কতক-গুলো উঁচুকাব মহলেও সহজ গতাযাত কবছি। মার্কসবাদে বিশ্বাসকে লুকিযে রাখার মতো মনোবৃত্তি দেখাই নি বরং তা নিযে অল্প একটু কোলাহলেও নেমেছি। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এব 'আনন্দবাজাব পত্রিকা' অফিসে যোগাযোগ বাখছি এমন কিছু লোকেব সঙ্গে, যাদেব সম্বন্ধে কমিউনিস্ট বলে সন্দেহ। সেখান থেকে মনুকে ডিঙিযে যিনি মার্কসবাদে এসেছিলেন, কৃতবিদ্য বিপ্লবমার্গী বলে ইতিমধ্যে যশস্বী সেই সুবেন্দ্রনাথ গোস্বামীব সহাযতায, নানা বিপ্লবী না হোক বিপ্লবেব অনুকূল কর্মে জোগান দেবাব মতো অবস্থায আছি এ সব, আর বহু অনুরূপ কাবণে অনিবার্য হযে উঠল বে-আইনি পার্টির সঙ্গে আমার যোগাযোগ।

অজস্র কথা মনে এসে ভিড করছে, তবে একটা দিনের ঘটনা বলব যেদিন (খুব সম্ভব ১৯৩৫-এর শেষে বা ১৯৩৬-এর প্রথম দিকে) গেলাম এক নির্বাক পথপ্রদর্শকের পিছনে পিছনে, গোয়েন্দাদের এড়িয়ে, কয়েকবার ট্রাম বদলে, ঘোরা রাস্তায়, টালিগঞ্জের (যতদূর মনে পড়ে) এক বাঙালি বস্তি এলাকায়, যেখানে মাটির মেঝের উপর চাটাই বিছানো, কয়েকখানা নড়বড়ে চেয়ার, একটা টেবিল যা হল একটা পুরোনো টাইপরাইটার-এর বাহন —দেখা হল শার্ট আর হাফ-প্যান্ট-পরা আমারই বয়সী পি সি জোশীর সঙ্গে। আর সেই 'den'-এ বসে ঘন্টাখানেক কথাবার্তার পরই আমার মন স্থির হয়ে গেল। পার্টি-পরিবারে অন্তর্ভুক্ত হলাম অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে, যে-মন বহুদিন থেকে প্রস্তুত হচ্ছিল অথচ বাধাও পাচ্ছিল, সে-মনে আর প্রশ্ন রইল না। মার্কসতত্ত্বে যাকে গুণগত পরিবর্তন হল তা-ই যেন ঘটল অভিজ্ঞতার এক নতুন স্পর্শে। এর অর্থ কেউ যেন না করেন যে জোশীর প্রভাবেই আমি এলাম কমিউনিস্ট পার্টিতে—প্রভাব নিশ্চয়ই সে বিস্তার করেছিল, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনে আমার 'দ্বিজত্ব'-প্রাপ্তির গভীরে রয়েছে আরও অগণিত উপাদান, বিশেষ করে ত্রিশের দশকের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের মুক্তি প্রয়াসের সঙ্গে জগদ্ব্যাপী সাম্যবাদ-সমাজ-বাদী অভিযানের নিবিড় নিকট সম্পর্কের সত্যতা সম্বন্ধে ক্রমশ-আয়ত্ত নিশ্চিতি। তবে জোশীকে ধন্যবাদ দিতে কুণ্ঠিত নই, কারণ, সেদিন ঐভাবে তার সাহচর্য না ঘটলে হয়তো-বা কল্পিত বৈদগ্ধ্যের জগতে বিচরণেই তুষ্ট থাকার মতো জীবনের চাকায় আটক থাকার দুর্ভাগ্য অসম্ভব ছিল না। কোথায় যেন লিখেছিলাম যে উপনয়নকালে 'দ্বিজত্ব' পাই নি, সন্ধ্যাহ্নিকের মন্ত্র কণ্ঠস্থ হয়ে গেলেও। তবে দ্বিজত্ব পেলাম কমিউনিস্ট পার্টিতে, যেখানে বহু তিক্ততা (যা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনিবার্য) সত্ত্বেও আমার মতো কিছুটা 'একলা চলো'-ধরনের মানুষের তাঁবু খাটানো রইল এবং থাকবে—যতদিন না (আজ এই জোশী-বই মতো) পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তন করি।

পার্টি ইতিহাসের অতি দুরূহ এক পর্বে তখন জোশী ছিল প্রধান নেতা। তার গুণ ছিল অনেক। যদিও হাসি পায় ভেবে যে তা অন্য কোনো পার্টির নেতৃত্বে তোলার মতো ছিল না। বেশ মনে পড়ে অনেকদিন আগে 'আর-এস-পি'-নেতা ত্রিদিব চৌধুরী একবার বলেছিলেন বহরমপুরে জ্যোতি বসুকে এক সভায় নিয়ে যাওয়ার পর—শরৎ বসু মশাইকে দেখার পরে গ্রামাঞ্চলের লোক আশা করেছিলেন যে কমিউনিস্টদের নেতাও হবেন

'দশাশয়ী' চেহারার একজন (যা আমাদের মধ্যে ছিল কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির), কিন্তু দেখল একজনকে, যে বলে বেশ ভালো কিন্তু কেমন যেন বেঁটেখাটো একটি মানুষ। জোশী ছিল এলাহাবাদে ডাক সাইটে ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সোজা বিপ্লবের সন্ধানে তার যাত্রা, মীরট মামলায় আসামী হয়ে ছেলেমানুষ বলে সকলের প্রিয়ছাত্র, আর কিছুটা তোৎলা বলে ভারি তাড়াতাড়ি কথা বলা সত্ত্বেও ইংরিজিতে তার অসামান্য দক্ষতায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত আশ্চর্য—কিন্তু এক নজরে কে বলবে তাকে দেখে যে দেশের নেতাদের মধ্যে তার স্থান! লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে কে একজন অনেকদিন আগে মজা করে বলছিলেন সাগর দত্ত স্ট্রিটে 'আজাদ হিন্দ' দৈনিকের অফিসে (যেখানে পূর্বতন ৪৬ জ্যাকারিয়া স্ট্রিট বা পরবর্তী ৭৪ চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর মতো ছিল পার্টির আস্তানা): 'দেখো দিকিনি আমাদের পার্টিনেতাদের দিকে—পি সি জোশী তোৎলাচ্ছে আর তাকে স্রেফ হারিয়েছে এই সদ্য-আসা নম্বুদ্রিপাদ, ভরদ্বাজ তো বাঁচল না আর এমন অসুখ বাধিয়েছে অজয় ঘোষ যে তা বুঝি শিবের অসাধ্য, তাছাড়া সে একেবারে অ-মিশুক এক মানুষ; মাদ্রাজ থেকে এলো তো এলো এক বামমূর্তি যার ল্যাংড়া পা দেখে ভাবি একে লোকের সামনে পাতে দিই কেমন করে...।' জোশীকে দেখে কেউ কখনও তাকে জবরদস্ত নেতা ভাবতে পারে নি—আমাদের আন্দোলনও জবরদস্ত ধরনধারণকে কখনও বরদাস্ত করে নি—তবে তার সঙ্গে কথা বলে খুশি হয় নি, একটু-বা মুগ্ধ সঙ্গে সঙ্গে হয় নি, এমন খবর যখন পূরণচন্দ্র ছিল ঊর্ধ্বগগনে, তখন (এবং যখন তার জীবনে কৃষ্ণপক্ষ অথচ তার সকল ইন্দ্রিয় সজাগ তখনও) কেউ শুনেছে মনে হয় না। মানুষটির সহজ আকর্ষণের মূল হেতু নিশ্চয়ই ছিল তার মনে শুধু নয়, তার রক্তমাংসেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং তার পরিণতি সাম্যবাদ বিষয়ে অবিরাম, একান্ত স্থিতপ্রজ্ঞা। সংগঠন বিষয়ে তার দক্ষতা সুবিদিত, কিন্তু সেই দক্ষতার উৎস ছিল তার ব্যক্তিত্বের নিছক সহমর্মিতা—যা পার্টির পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন সময়ে ব্রহ্মাস্ত্রের মতো কাজ করেছিল। অগণিত মানুষ তাই আত্মীয় আর বন্ধু বলে জোশীকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। জোশীর ঐ গুণে পার্টি যেন খোলা মনে অসংকোচে আত্মসমালোচনা ও তদনুযায়ী কর্তব্যনির্দেশকে সহজ ও সাবলীল ভাবতে পেরেছিল, গোটা পার্টি যেন হয়ে উঠেছিল বিরাট বিস্তৃত এক পরিবার। শ্রীহট্ট আর চট্টগ্রাম থেকে বিজয়ওয়াড়া আর ত্রিবান্দ্রম পর্যন্ত কমিউনিস্ট

যে যেখানে আছে তারা সবাই যেন জোশী-র শুধু সাথী নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মীয়—দেখা হলে সে চিনবে, হেসে কথা বলবে, বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করবে, বিন্দুমাত্র আয়াসবিনা বুঝিয়ে দেবে সে হল একজন বন্ধু। যদি কেউ মনে করেন এটা তো হতে পারে একধরনের 'ভাণ' ('pose')—কিন্তু জোশীকে যারা কাছে থেকে দেখেছে, তার দ্রুত কথার ছটা শুনেছে, লক্ষ করেছে তার মুখের হাসি বা দুশ্চিন্তার ছায়া বা গভীর জিনিস ভাবতে গিয়ে কপালে কুঁচকে-ওঠা রেখার ছড়া, তারা তার ব্যবহারে 'ভাণ' কখনও খুঁজে পায় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় বিশেষ করে এসেছিল নানান দেশের কমরেড (কিংবা মোটামুটি প্রগতিপন্থী বহু বিদেশী), যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জানি জোশী-র ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ, ব্যবহারের মধ্যে আন্দোলনের একটা মহৎ প্রতিফলন দেখে আকৃষ্ট।

হয়তো একদিক থেকে এর একটা উল্‌টো ছবিও ছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে জোশীর নেতৃত্বের প্রচণ্ড বিরূপ সমালোচনা হয়। সম্পাদকপদ থেকে তাকে অপসৃত করা হয়। যোশী নিজে আত্মসমালোচনা ব্যপদেশে ত্রুটি স্বীকারে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাক, কমিউনিস্ট আন্দোলনের তৎকালীন রেওয়াজ-মাফিক নিজের অপরাধ মাথায় তুলে যে-আবেগবাহুল্য দেখিয়েছিল তার মধ্যে ছিল আন্তরিক হলেও কেমন যেন অশোভন আতিশয্য। যাই হোক, পার্টি-সম্পাদক-পদে জোশীর উত্তরাধিকারী বি টি রণদিভে একটা কথা বলেছিলেন, যা ভোলা যায় না, আর যা বোধ হয় বিপ্লবের কঠোর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থও বটে। রণদিভের বক্তব্য ছিল যে জোশীর নেতৃত্বে পার্টি কাজ করত যেন তা ছিল একটি 'সুখী পরিবার', কিন্তু পার্টির ঐতিহাসিক ভূমিকা হল ভিন্ন, যা হল নতুন সমাজ সৃষ্টি-ব্যাপারে মেহনতী জনতার 'বিপ্লবী সংগ্রামী সংগঠন' রূপে কাজ করা। পার্টি সংগঠন বা অনুরূপ কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতা অল্প বলে এ বিষয়ে জোর করে কিছু বলতে চাই না, কিন্তু জোশীর গুণ আর দোষ দুই-ই সম্ভবত লুকিয়ে রয়েছে রণদিভে-র এই আক্রমণে। সচরাচর বুর্জোয়া জগতেই যাদের বিচরণ সহজ ও স্বাভাবিক, আর তাছাড়া শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী ইত্যাদি যারা মননশীলতায় ও কথঞ্চিৎ একাকিত্বে আকৃষ্ট, তাদেরও বিপ্লবব্যাপারে সহকারী না হলেও মূলগত-ভাবে সহযোগী করার মতো বিরল গুণ ছিল জোশীর চরিত্রে। মেহনতী

মানুষ সম্পর্কে তার মমতা ও নৈকট্য নিয়ে প্রশ্ন নেই; সংগঠনশক্তি ও রাজনৈতিক সাহসেও সে একটুও পরাংমুখ ছিল না; কিন্তু—জোর করে বলতে বাধে—বিশ্বযুদ্ধোত্তরযুগের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আবহাওয়াতে যে ঝড় এসেছিল তার সঙ্গে জোশীর মানসিকতার সঙ্গতি বোধহয় ছিল দুঃসাধ্য। সেই অধ্যায়ের আতিশয্য ইতিহাসের বিচারে ভবিষ্যতে বহুল পরিমাণে বর্জিত হয়েছে, কিন্তু তার নিছক নিন্দা হবে অসমীচীন—পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় চলে যে বিপ্লব, নদীরই মতো তার গতিপথ কোথাও কখনও সরল রেখায় আঁকা নয়, ভ্রান্তির অভিজ্ঞতা বিনা বাস্তব জীবনে প্রকৃত বিচারশক্তি অর্জন অসম্ভব, কমিউনিজম্-এর মতো যুগান্তকারী প্রয়াস যেন ব্যক্তিজীবনে প্রেমেরই মতো, 'it is better to have loved and lost than never to have loved at all'—মাহাত্মাগান্ধী ভারতবর্ষে ১৯৪৬-৪৭ থেকে অন্তত কিছুকালের জন্য তেলেঙ্গানা ও অন্যত্র বহু অভ্যুত্থানে অবশ্যই দেখা গিয়েছে ভ্রান্তি আর অবিমৃষ্যকারিতা, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল নির্ভয় সংকল্প, যাকে প্রচণ্ড অভিজ্ঞতায় অগ্নিশুদ্ধ না করে নিলে ভবিষ্যৎ হয়তো আরও অন্ধকার হতো।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৯৩৫ সাল থেকে ফ্যাশিজ্‌ম্-এর বিষম বিপদকে পরাস্ত করার হাতিয়ার হিসাবে সকল শুভবুদ্ধি মানুষের সমর্থন সংগ্রহে সর্বত্র যে নীতির নির্দেশ দিয়েছিল, তাঁর প্রয়োগ ব্যাপারে জোশীর ব্যক্তিগত অবদান বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। পুরোনো ভুলের মধ্যে যে উদ্দাম বাস্তববোধরহিত আবেগবাহুল্য ছিল তাকে সংযত করার কাজে জোশীর দক্ষতা ছিল স্বভাবসিদ্ধ। সাম্যবাদী বিশ্ববোধ সে আয়ত্ত করতে পেরেছিল, সন্দেহ নেই—অবশ্য ভাবার দরকার নেই যে মার্কসতত্ত্বে তার অধিকার ছিল সর্বথা সুগভীর, হয়তো প্রকৃত কর্মিষ্ঠ-পার্টি নেতার পক্ষে দিগ্‌গজ তাত্ত্বিক হওয়ার প্রয়োজন খুব বেশি নয় (জোশী হাল্‌কা মেজাজে মাঝে মাঝে বল্‌ত, 'মার্কস্' আমরা কতটাই বা পড়েছি, মার্কস লিখলেন লেনিনের জন্য। লেনিন লিখলেন স্টালিনের জন্য, আর স্টালিন, যার লেনিনবাদ-বিষয়ক রচনা ছিল তখন প্রায় আমাদের 'বেদ', লিখেছেন আমাদের সকলের জন্য।)—প্রয়োজন হল মানবিক ও রাজনৈতিক গুণাবলী, যার সমাবেশ ছিল জোশীর মধ্যে সুসমঞ্জস। যখন উদ্যোগপর্ব চলছে বিপ্লবের, যখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সমাজবাদী বিপ্লবের সমবেত প্রয়াসের যুগ, তখন চিন্তায় স্বচ্ছ,

চরিত্রে দৃঢ়, অথচ বহু বিভিন্ন মানসিকতার মধ্যে সঙ্গতি ও সহযোগিতা উদ্বুদ্ধ করার কাজে পারদর্শী ছিল জোশী।

এ-জন্যই সম্ভবত ১৯৩৬ সালে পার্টির বে-আইনী যুগে দেখা গেল সমাজবাদ-সাম্যবাদী প্রভাব সুবিস্তৃত হচ্ছে—জওয়াহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর দায়িত্বশীল পদে বসালেন এমন কয়েকজনকে যারা শুধু সোশালিস্ট নয়, কমিউনিস্ট বলেই পরিচিত। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেরই প্রাঙ্গণে বসল সারা ভারত কিসান সভা আর প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন; একত্র এলেন সরোজিনী নাইডু, প্রেমচন্দ্, হসরৎ মোহানি; এলেন সহজানন্দ, বঙ্কিম মুখার্জি, ইন্দুলাল মল্লিক। কংগ্রেসের ছড়ানো শিবিরে সদাব্যস্ত কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে জোশীর অবিরত সংযোগ—যা দেখা গেল ফৈজপুরে, আবার গুজরাটে হরিপুরা (১৯৩৮) অধিবেশনে, যেখানে জোশী নিজে হাজির এবং সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণে চমৎকৃত হয়ে বলল এ-বক্তৃতা সবার সেরা ('the best ever')। আশ্চর্য নয়, কারণ ইতিমধ্যে সব নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, এগারোটা প্রদেশের মধ্যে আটটায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় বসেছে, পার্টি বে-আইনি হলেও প্রকাশ্যে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে পেরেছে—ইতিপূর্বে গোয়েন্দা-পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে ছেপে বে-আইনি কাগজপত্র বহু ক্লেশে বার করা যেত (আর সে-কাজে 'সুড়ঙ্গ' থেকে সবকিছু করার মধ্যে একটা বিশেষ উন্মাদনাও ছিল)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় পর্যন্ত মোটামুটি বামপন্থী সবাই মিলে ফ্যাশিজ্ম্-এর তৎকালীন পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে বিরাট একটা ধাক্কা দেবার সুযোগ এসেছিল। জওয়াহরলাল আর সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল সেটা বুজিয়ে দেবার কাজে আমরা সফল হতে পারি নি বটে, কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টায় জোশীর নেতৃত্ব পিছপাও হয় নি। স্বীকার করতে হবে আমাদের সংগঠন আর প্রভাব ছিল সীমিত; ক্রুদ্ধ হবার দরকার নেই জওয়াহরলালের মন্তব্যে যে, কমিউনিস্টরা একটা 'ginger group', রাজনীতিতে খানিকটা 'ঝাঁঝ' শুধু আনতে পেরেছে। মনে পড়ছে মিশরের নেতা নাসের-কে নিয়ে গল্প—তিনি নাকি এক প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতাকে একবার বলেন যে, আরব দুনিয়ার ক্ষেত্রে কমিউনিজম্ একটা প্রকাণ্ড গাছ বা অনেক ফুলফল ফোটাতে পারবে না, তবে পারবে ক্ষেতের সার হ তে, আর তৎক্ষণাৎ জবাব আসে: 'কি ধরনের সার? রাসায়নিক না জৈব, গোময়-জাতীয়?' এভাবের রহস্য জোশীর মুখেও বেশ শানিয়ে যেতে পারত!

যদি কেউ মনে করে বসেন যে জোশী বুঝি ছিল নরমপন্থী, কঠোর কাজের কাজি তেমন নয়, তাহলেও মস্ত ভুল ঘটে যাবে। ১৯৪২ সালের জুলাই পর্যন্ত বে-আইনি পার্টিকে শুধু আগলে রাখা নয় পরিধি ও প্রভাবকে প্রচুর বাড়িয়ে তোলার কৃতিত্ব সস্তায় কিস্তি মাৎ-এর ব্যাপার নয়। যুদ্ধ বাধার পর প্রথম পর্যায়ে গান্ধীজী যখন পুলিশকে খবর দিয়ে যুদ্ধবিরোধী বাক্য উচ্চারণ করে জেল-বরণের প্রোগ্রাম দিলেন দেশকে, তখন পার্টির পক্ষ হতে এল 'সর্বহারার গতিপথ' ('proletarian path') ঘোষণা, যার ফলে আমাদের হয়েছিল সংগ্রামব্যাকুল সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পার্টি তখন বুর্জোয়া নেতৃত্বের গোড়ায় গলদ সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝাল, 'Parts and Politics unmasked' পুস্তিকায়। হয়তো এতে গান্ধীজীর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে অশক্ত ও অনিচ্ছুক জওয়াহরলাল-সমেত বহু নেতার বিরাগ-ভাজন হল পার্টি, কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না। বেশ মনে আছে ১৯৪০ সালের একেবারে শেষভাগে নাগপুরে অখিল ভারত ছাত্র সম্মেলন থেকে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের স্বার্থে 'না এক পাই, না এক ভাই।' পার্টির ক্ষমতা তখন সীমিত আর জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রতিভূরা তখন পঙ্গু—তাই সুভাষচন্দ্র গেলেন বিদেশে, আর পার্টিকে আবার অজ্ঞাতবাস থেকে কাজ চালিয়ে যেতে হল।

হিটলার সোভিয়েট ভূমির উপর হিংস্র পশুর মতো হঠাৎ হামলা করার পর থেকে ইতিহাসের যে পটপরিবর্তন হল তার বিবরণ এখানে বলতে চাই না। তবে মনে রাখতে হবে জোশীর অবদান—যখন পার্টি সভ্যদের বুকে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলছে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যন্ত্রণা যখন প্রকট, তখনই আন্তর্জাতিক সমাজবাদী-সাম্যবাদী কর্তব্যের আহ্বানে আর ফ্যাসিজম-এর শয়তানি আক্রমণ থেকে সর্ব বিশ্বের আশাস্থল সোভিয়েট দেশকে বাঁচাবার নিদারুণ তাগিদে 'জনযুদ্ধ'-এর নতুন আওয়াজকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা সহজ ছিল না। মাসের পর মাস চলেছিল পার্টির আভ্যন্তরীণ বিতর্ক, যার নিষ্পত্তিকে গ্রহণীয় করার ব্যাপারে জোশীর অবদান ছিল বিরাট। ১৯৪২-এ পার্টির পক্ষ থেকে প্রচারিত হল 'Forward to Freedom', যাতে (এবং অন্য অজস্র রচনায় ও সংখ্যাহীন পার্টি শিক্ষা শিবির মারফৎ) জোশীর অক্লান্ত অভিনিবেশ অন্তর্দৃষ্টির সমুজ্জ্বল পরিচয় মিলবে। যুদ্ধ যখন শেষ হচ্ছে তখন গান্ধীজীর সঙ্গে জোশীর সুদীর্ঘ পত্রালাপও ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট চিন্তা ও কর্মের ইতিবৃত্তে চির-

স্মরণীয় হয়ে থাকা সমুচিত—তবে সন্দেহ হয় যে, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্যাপারে বহুজনের বহু প্রশ্ন থেকে গেলেও পার্টি সদস্যেরাই অনেকে সেই পত্রাবলী পড়েন নি। জানেন না কী পরিস্থিতিতে আমাদের পার্টি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও সতেজে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কংগ্রেস আর মুসলিম লিগকে মিলাবার প্রচণ্ড অভিযানে নেমেছিল, সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার ও অব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকলকে একত্র করার প্রয়াসে নেমেছিল, দুর্ভিক্ষ ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রণা রোধ করার জন্য সর্ব অর্থে 'জনরক্ষা'র কাজে ব্যাপৃত হয়েছিল, শিল্প-সাহিত্যের মতো বস্তুকে মেহনতী মানুষের স্বার্থে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের রাস্তা হাজার বাধা কেটে বানাবার উন্মাদনায় মেতেছিল। পরম শক্তিশালী আর সহস্রমুখ শত্রুর কুৎসাকে ফুৎকারে উড়িয়ে তাই ১৯৪৫-৪৬-এর বিপুল গণ-অভ্যুত্থানে (কলকাতায় নভেম্বর ৪৫ থেকে জুলাই ৪৬ পর্যন্ত চলছিল তারাশঙ্কর-কথিত 'ঝড় ও ঝরা পাতা'-র গৌরব কাহিনী, বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহে, ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস আর লিগ-পতাকার সঙ্গে লাল ঝাণ্ডা বাঁধা ছিল) কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। অন্তহীন অপবাদ অগ্রাহ্য করে দেশের জনসাধারণ স্বাধীন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টিকে যে মর্যাদা দিয়েছে, তা বহু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সেই প্রাক্তন যুগের কৃতিত্বেরই ফল।

ব্রিটিশ সরকার বিরাট কয়েকটি খণ্ডে ভারতবর্ষে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' (Transfer of Power) বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। সেখানেই, শত্রুমুখ থেকে অসংখ্য প্রমাণ মিলবে জোশী-নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত দেশাভিমানী ভূমিকার। কোথাও যে বিচ্যুতি ঘটে নি তা নয়। কিন্তু বাস্তবিকই যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চলেছিল দেশের মুক্তি সংগ্রাম আর গোটা দুনিয়ার ভবিষ্যতকে বাঁচানো ও তার বিকাশ ঘটানোর পথ পরিষ্কার করার কঠোর কঠিন লড়াইকে মিলিয়ে রাখা। যুদ্ধকালেই পার্টির পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল আমাদের আপন দেশের পুনর্গঠন ব্যাপারে সৃষ্টিশীল প্রস্তাবাবলি, যার রূপায়ণ দূরে থাক মূল্যায়নও আজ শেষ হয় নি—জাতি, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির বৈচিত্র্যকে উপলক্ষ করে যে অনৈক্য এখনও সমস্যার স্তরেই রয়ে গেছে। তার নিরাকরণ বিষয়ে জোশী-নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা শুধু রাজনৈতিক আগ্রহ নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক আবেগের টানেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছিল—এজন্যই প্রগতিলেখকদের নিয়ে সংঘস্থাপন, এজন্যই সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘ, এজন্যই জনরক্ষা ও নারী কল্যাণ

সমিতি, এজন্যই 'মেহনৎকশ' জনতাকে নিয়ে গণনাট্য আন্দোলন, এজন্যই দেশবিভাগ রোধ করতে চেয়ে বিকল্প প্রস্তাব, বহুজাতিক ভারতরাষ্ট্রের রূপনির্ণয় প্রচেষ্টা। সবই নির্ভুলভাবে করা হয়েছিল বলা হবে মূর্খামি। কিন্তু কমিউনিস্টরাই এককভাবে তখন ভেবেছিল ভারত শৃংখল মোচনের পরবর্তী পর্যায়ের বহুবিধ বাধা ও ব্যঞ্জনা বিষয়ে।

হয়তো দাবি করা অন্যায় হবে না যে, মূলত এজন্যই লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী ও অপর বহু সংবেদনশীল মানুষের কাছে কুৎসাজর্জরিত কমিউনিস্ট পার্টি শুধু মমতা নয়, মর্যাদাও পেয়েছিল। কথা বাড়তে না দিয়ে বলা উচিত জোশীর অবদান এক্ষেত্রে শুধু প্রভূত নয়, প্রধানও। তারই আগ্রহাতিশয্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস (১৯৪৩) বোম্বাইয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে হল প্রগতি লেখক সংঘের অধিবেশন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পত্তন। যুদ্ধের পূর্বে এবং যুদ্ধকালে দেশের সংস্কৃতিজগতে দ্যুতিমান্ বহু মহাজনের সঙ্গে তাই স্থাপিত হতে পেরেছিল কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুসম্পর্ক। মহাকবি ভল্লাথোল, জোশ্ মলিহাবাদী, সুমিত্রানন্দন পন্থ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আন্ধ্র কবি 'শ্রীশ্রী', বিষ্ণু দে প্রভৃতির মতো বহুমানভাজন স্রষ্টা তাদের পূর্বসুরী প্রেমচন্দ, নিরালা এমন কি কিছু পরিমাণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কমিউনিস্টরা যে আশীর্বাণী পেয়েছিল তারই উত্তরসাধক হতে সংকোচ করলেন না। কেউ কেউ এলেন খুবই নিকটে—বলরাজ সাহনির মতো—কিংবা মেতে উঠলেন হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদাত্ত ঢঙে। আমাদের এই বাংলার লেখক-শিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে তো বিখ্যাত নামের বিরাট ফিরিস্তি বানাতে হবে, যার দরকার নেই, সমীচীনও হবে না হয়তো। তবে জোশী ছাড়া আর কেউ কি একদিকে গণনাট্য সংঘের নিশানের নিচে রবিশঙ্কর, শান্তি বর্ধন, শচীন সেনগুপ্ত থেকে ওমর শেখ, বিনয় রায়, নিবারণ পণ্ডিত, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, এমন কি দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রমুখ অবিস্মরণীয়দের একজোট করতে পারত? নিজে শিল্পজ্ঞ না হয়েও শুধু চিত্তপ্রসাদকে টানা নয়, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার প্রভৃতিকে সম্মান দেওয়ার মনোবৃত্তি তার চরিত্রেরই অঙ্গীভূত ছিল। সুভাষ আর সুকান্ত সম্বন্ধে জোশীর ছিল যেন অপত্যস্নেহ, আর শিল্পীমনের নানা অব্যক্ত বেদনা যখন তত্ত্ব আর কর্মের সম্পর্ক নিয়ে বিরস বিশ্লেষণের ফলে পারস্পরিক তিক্ততা পর্যন্ত সৃষ্টি করে ফেলবার উপক্রম করত, তখন 'আদার ব্যাপারী' হয়েও জোশী 'জাহাজ'-মাপের বিসম্বাদকে

হাল্‌কা করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখত। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আসা আর ভিতরে থেকে কাজ করে যাওয়ার মানে হল কিছু পরিমাণ উগ্রতাও মনে সঞ্চারিত করে রাখা, নইলে শ্রেণীসমাজের বহুরূপী বৈরিতার মোকাবিলা সম্ভব নয়। লেখক-শিল্পীদের মধ্যে নিয়মিত পার্টিকর্মী যারা, তাদের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে দূরাবস্থিত, 'গজদন্তমিনার' না হলেও কথঞ্চিৎ নিভৃতনিবাসী শিল্পীর মেজাজ বা কাজ সম্বন্ধে বিরক্তি দেখা গেলে জোশী কবিরাজ সেজে উপশমের ব্যবস্থা করতে পারত—হয়তো শুধু দুটো মিষ্টি কথা বলে, তা ছাড়া মতানৈক্যকে অগভীর স্থির করতে পারলে হেসে উড়িয়ে দেওয়া আর আর-হাওয়াকে আবার মধুর করে তোলার ক্ষমতা তার ছিল। সচরাচর পার্টি নেতাদের এ গুণটি খুবই বিরল। ভবানী সেন কতকটা পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু লেখক-শিল্পীদের মতো সঙ্গত কারণেই স্পর্শকাতর মানুষদের সঙ্গে পার্টি-নেতা হিসাবেই সুহৃৎ-সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে জোশীর জুড়ি ছিল না।

কোথায় আরম্ভ করেছি আর কোথায় শেষ করব, বুঝতে পারছি না। তবে বড্ড বেশিক্ষণ ধরে পাঠকদের ধৈর্য পরীক্ষা চালিয়েছি, এবার কলম সংবরণ না করলেই নয়। তবু না বলে পারছি না, ১৯৪৭ সালের শেষদিকের কথা। জোশীর বিরুদ্ধে সমালোচনা তখন তুঙ্গে ; পার্টি কংগ্রেস আসন্ন, সেখানে জোশীর পদচ্যুতি প্রায় নিশ্চিত ; পার্টি-মহলে জনশ্রুতি যে জোশী প্রখর আত্ম-সমালোচনায় প্রবৃত্ত আর বোম্বাইয়ে পার্টি অফিসের ঘরে সে প্রায় স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে কেবলই ভাবছে। আমাকে সে-সময় যেতে হয়েছিল বোম্বাই আর গেলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে (সে-যুগে পার্টির অফিসে রোজ না যেতে পারলে ভাত হজম হত না !)। দেখলাম জোশী স্বেচ্ছায় হোক-বা-না-হোক, প্রায় যেন বন্দী একটা ঘরে (সেখানে কল্পনা অবশ্য রয়েছে)। কথা বলতে বলতে বুঝলাম, কেউ বুঝি তার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করে না, সে যেন অপরাধী, দাগি আসামির মতো বর্জনীয় এক ব্যক্তি। খুব খারাপ লেগেছিল। আর আবার খারাপ লাগল যখন পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮) তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথীরাও একান্ত আতিশয্যের ভাষায় জোশীর সমালোচনা শুধু নয়, সজোরে নিন্দা করল, আর জোশী নিজে অকুণ্ঠে সকল অপরাধ স্বীকার করার আবেগাতিশয্যে অশ্রুবর্ষণ পর্যন্ত করল—হয়তো তখনই ভেবেছিলাম, অন্তত আজ তো নিশ্চয়ই ভাবি, কমিউনিস্ট বিপ্লবী মানসে পরমশ্লাঘনীয় বহু বস্তু থাকা সত্ত্বেও এ-ধরনের প্রবণতা আসে কেন। এটা কি বিপ্লবী কর্মে আত্মসমর্পণের অপরিহার্য

রূপান্তর, নেতৃত্বের সমবেত বিচারের কাছে ব্যক্তির সজ্ঞানে ও সানন্দে পরাভব স্বীকার? জোশীর অত্যন্ত প্রিয় অনুচর মোহন কুমারমঙ্গলম একেবারে অতি কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা যখন করছিল, তখন মোহনের বোন পার্বতী সইতে পারে নি, বলেছিল মোহনের সঙ্গে আর সে কথা বলবে না। যতদূর মনে পড়ে, আমিও অধিকাংশ ডেলিগেটের মতো জোশীর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু জোশীর আত্ম-সমালোচনায় এমনই বাহুল্যের ছাপ ছিল যে মন বিষিয়ে উঠেছিল। বলা দরকার যে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের অত্যুগ্র সিদ্ধান্ত কার্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার বিচারে পরিহার করতে হয়। যদিও সঙ্গে সঙ্গে বলা উচিত যে জোশী কিন্তু পরবর্তী যুগে মধ্যস্থতার ভূমিকায় বসে পার্টি নীতি নির্ধারণে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে পারে নি। ক্রমশই সে সরে গেছে পার্টির দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড থেকে, শরীরও অপটু হয়ে পড়েছে, আর তাই সে কিছুটা স্বক্ষেত্রে ফেরার মতো কাজে লিপ্ত থাকতে চেয়েছে, প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করে। এমন সীমিত ক্ষেত্রের অধিবাসী অবশ্য জোশী কখনও ছিল না। তার মনের পরিসর ছিল ব্যাপ্ত। তার মর্মের মধ্যে ছিল রাজনীতি জগতে বিরল এক গভীরতা, 'কর্মকাণ্ডী' হওয়ার উচ্চাশা কখনও সে ছাড়ে নি, কিন্তু সক্রিয় জীবনের শেষার্ধ তার কেটেছে কেমন যেন এক নির্বাসনের মধ্যে।

জোশীর কথা বলতে গিয়ে ভাবছি নিজেরও কথা; আমাদের মধ্যে অনেক গরমিল। আবার মিলও যথেষ্ট ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে নারান বাঁড়ুজ্জে মশায়ের কথা; তিনি ছিলেন সর্বান্তঃকরণে কমিউনিস্ট। কিন্তু ঠোঁটকাটা মানুষ, পরের মুখে ঝাল খেতে একেবারে গররাজি। আর তাই বলতেন, পার্টির খাতায় নাম লেখালে দুদিন বাদে তাড়িয়ে দেবে, আর তখন হবে কুলীন ঘরের 'ধাড়ি' মেয়ের বিয়ে হওয়ার দশা, যখন বুড়ো বর টুপ্ করে মরলে মাছ খাওয়াটাও বন্ধ। নারানবাবু তাই 'মানে মানে' দূরে থাকতেন। কিন্তু মুশকিল এই যে সবাই ঠিক সেই রাস্তা ধরতে পারে না। একদা জোশী যে ব্যবহার পেয়েছিল, তাতে চটে উঠে সে পার্টিদ্রোহিতার পথে যেতে পারত—তার মতো 'রুই কাৎলা'-জাতীয় বৃহৎ মাছ ধরে শিকারী শত্রুপক্ষ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জখমই করতে পারত। কিন্তু সে-কথা জোশী কখনও ঘুণাক্ষরে ভাবে নি—বরঞ্চ সব বাধা ঠেলে, অসাড় শরীরকে ধরে-বেঁধে, ভাটিণ্ডায় পার্টি কংগ্রেসে হাজির হয়েছিল। সবাই একবাক্যে

তার জয়ধ্বনি তখন দিয়েছিল। তার মৃত্যুর সময়ও দেখলাম রাজেশ্বর রাও আর নম্বুদ্রিপাদ একত্র হয়ে পার্টির প্রাক্তন নেতার প্রশস্তি করলেন, স্মরণ করলেন তার বহ্নিমান্ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, বহুজনকে বন্ধু বলে কোল দেবার ক্ষমতা, সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করলেন কঠোর বিপ্লবী প্রতিজ্ঞা পালনের পথে প্রয়োজন যে অনুভূতি, যে শিক্ষাদীক্ষা, যে সংহত কর্মশক্তি, যে একাগ্র আত্মনিবেদন, তারই অবিরাম সাধনা নানা পরীক্ষা ও পতনের মধ্যে চালিয়ে যাওয়ার অনস্বীকার্য প্রতিভা।

যোশীর জীবন আর মৃত্যু থেকে আরও অনেক কিছুই জানা আর ভাবার রয়েছে। এখানে উল্লিখিত কোনো কথার কদর্থ করা হবে না আশা করছি—সঙ্গে সঙ্গে তাই বলতে ইচ্ছা করছে যে ধর্মের কাহিনীর মতো আমাদের আন্দোলনের ইতিবৃত্তেও কেমন যেন স্বেচ্ছায় বহুজনের আত্ম-বলিদানও নিহিত রয়েছে। একটু কুণ্ঠা হচ্ছে লিখতে, কিন্তু বিদেশিনী **Taya Zinkin** তার এক বইয়ে (আমার পুরনো বন্ধু হুমায়ুন কবির-এর কণ্ঠ ধার করে) বলছেন যে, আমার মতো কমিউনিস্ট বুঝি কমিউনিস্ট পার্টি শাসন ক্ষমতায় বসলে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পাবে না। আমরা হলাম **'born liquidat-ees'**! কেউ যদি ঠাট্টা করেই বলেন যে স্বয়ং জোশী তো পার্টি সরকার দখলের কাছাকাছি না এলেও প্রায় আধা **'liqui-dated'** হয়ে পড়েছিল তো ঝগড়া করতে বসব না। এতে এমনকি আশ্চর্য হতে হয়! বিপ্লব তো সহজ ব্যাপার নয়—'শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ, সহস্র-মারী চিকিৎসকঃ', ইতিহাসের দেবতাকে নির্মম হতে হয়, করালরূপে আবির্ভূত হতে হয়, 'ছিন্নমস্তা' ভূমিকায় নামতে হয়, বিপ্লবদ্রোহিতা নিরূপণে ভ্রান্তি ঘটতে পারে, দৌরাত্ম্য দেখা দিতে পারে কিন্তু বিপ্লবদ্রোহিতার শাস্তি তো চরম (নিরপরাধের নিধন ঘৃণ্য হলেও ইতিহাসে তো প্রায় অনিবার্য রূপেই বহুবার দেখা গেছে)। ঠিক এজন্যই বোধহয় সাম্যবাদের ইতিহাসে (এবং সর্ববিধ বিপ্লবে) অবাঞ্ছিত ও মর্মন্তুদ হলেও বহু বিকট অবিচারের সাক্ষ্যত্ব মিলেছে প্রায় অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতিতে। বিপ্লবের নামে অন্যায় আর অপরাধকে সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য বলছি না। কিন্তু এটা তো সত্য যে দোষে-গুণে গড়া মানুষ তার গৌরবময় বিপ্লবী মুহূর্তেও চরম পদস্খলনের উদাহরণ বহুবার দেখিয়ে এসেছে। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া / দুর্গংপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—বিপ্লব শিবিরে সমবেত হলে যুদ্ধের সর্ববিধ সংকটকেই স্বীকার তো করতেই হয়। মানুষের অতি-জটিল মনোবৃত্তির

রূপান্তর একেবারে সহজসাধ্য নয়—বিপ্লবীকেই তো পূর্ণ আত্মশক্তির পথে যেতে হয়, যার চেয়ে কঠোর তপস্যা আর নেই।

একটু হয়তো অবোধ্য 'সন্ধ্যা'-ভাষায় লিখছি এখন। কিন্তু পোড়া স্মৃতি-শক্তির চাপে মনে আসছে বছর বারো আগে প্রথিতযশা নীরদচন্দ্র চৌধুরী বোধহয় 'কেন তিনি ভারতবাসীদের ঘৃণা করেন' শীর্ষক প্রবন্ধে (চীনের একদাখ্যাত লিন্ যু-টাং সম্পর্কে কে যেন বলেছিলেন যে কতকটা আমাদের নীরদবাবুর মতো তিনি বহু খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেছিলেন 'My Country and my People'-কে বিক্রয় করে।) উল্লেখ করেন দুজনের নাম—একজন আমার বন্ধু ত্রিদিব চৌধুরী, অপরজন আমি—আর আমাদের সামান্য লেখাপড়ার একটু তারিফ জানিয়ে হতাশ হয়েই বলেন যে, এরা ছাগলের মতো বিপ্লবের বলি হতে স্বেচ্ছায় রাজি, এদের কথা কহতব্য নয়! ধর্মানুষ্ঠানের পরিভাষা খুব মনোরম নয় কমিউনিজম সম্বন্ধে। কিন্তু সমাজবাদ-সাম্যবাদের আদর্শ যাদের আকৃষ্ট করেছে, নতুন শোষণমুক্ত মনুষ্য জীবনের স্বপ্ন যাদের ঘুম ছেড়ে বিপ্লবী কাজের ডাকে যথাসাধ্য সাড়া দিতে বাধ্য করেছে, তারা জানে নিরপরাধের বলিদান ইতিহাসে আজও অকাট্য যখন, তখন তাই ভেবে বিশ্বকে বদলাবার জগৎ জোড়া লড়াই থেকে দূরাবস্থানের মতো বিড়ম্বনা আর নেই। জোশী যে জীবনযাপন করে গেল, 'বিশ্ব মানবের লক্ষ্মীলাভ, অন্তরের এই ধ্রুব কামনাকে নিয়ত অক্ষুণ্ণ রেখে, নিজের ব্যক্তিগত দিক থেকে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মে ব্যাপৃত থাকার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সেই জীবন। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের প্রকৃত বাস্তব সংজ্ঞা ও সম্প্রকাশ দেখা যাবে ভ্রান্তিমুক্ত না হলেও মূলগত ভাবে সৎ ও সদবুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্লবকামীর জীবনে। পূরণচন্দ জোশীর জীবনকথা যেন শুধু তার দ্রুত বিলীয়মান সমসাময়িক ছাড়া অন্যান্যদের কাছে অজানা না থাকে—মানুষের আধুনিক ইতিহাসকে যে রামায়ণ-কথিত 'পুণ্যগন্ধ' দিয়েছে বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী প্রচেষ্টা, তারই সৌরভ আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অগ্রণীদের মধ্যে জোশী একজন পুরোধা বলে বন্দিত হতে থাকুক।

পরিচয়-এর আড্ডা

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

১৯৩৮

১১ মার্চ

'পরিচয়'-এর বৈঠকে বসে সুধীন্দ্রর বাড়িতে। বেশি লোক হয় নি আজকে। গিরিজাপতি, নীরেন, প্রবোধ বাগচী আর হারীতকৃষ্ণকে সুধীন্দ্র বলেছিলেন যে, প্রকাশকের কাছ থেকে বিনা মূল্যে না পেলে কোনো বাংলা বইয়ের সমালোচনা করা হবে না।

নীরেন বললেন, তারাশঙ্কর-এর জলসাঘর-এর মতো ভালো বই দরকার হলে কিনে সমালোচনা করা উচিত।

সুধীন্দ্র রাজি হলেন না।

গিরিজাপতি আর-একটা বই-এর কথা বললেন। তারপরে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা আলোচনা থেকে কেমন করে সুলেমান-এর কথা উঠল স্মরণ হচ্ছে না। সুধীন্দ্রর মতে সে হচ্ছে আস্ত একটা গাড়ল। গিরিজাপতি বললেন, মোটেই না। তাঁকে সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দিতে শুনেছেন—সেখানে বুদ্ধিমানের মতো বলেছেন।

সুধীন্দ্র বললেন, দিল্লিতে থাকতে এক ভোজসভায় তাঁর পাশে বসেছিলেন। অবশ্য বেশি কথা বলার সুযোগ মেলেনি। ভিন্ন পাশে বসে জাপানি রাষ্ট্রদূত তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন যে চীনেরা মিথ্যা প্রচার করতে ওস্তাদ। ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা হচ্ছিল। হারীতকৃষ্ণ বললেন, শ্যামাপ্রসাদ প্রতিদিন তাঁর স্পর্ধা বাড়িয়ে চলেছেন। কোনো রাজনৈতিক কারণে মন্ত্রিসভার দৌরাত্ম্যে ভাঁটা দেখা যাচ্ছে। বাগচী বললেন, যুনিভার্সিটি এখন সরকারি সাহায্যের জন্যে তোয়াক্কা করে না।

হিরণ অনেকদিন অনুপস্থিতির পরে আসরে যোগ দিয়েছিলেন। বললেন, হি সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কথায় কথায় বললেন, বাংলার সরকার বলতে নাজিমুদ্দিন, সুরাওয়ার্দি, নলিনীরঞ্জন আর বিজয়। বেশির ভাগ সময় ফজলুল হককে ঘুমিয়ে থাকতে দেখা যায়। হি স্বীকার করেছেন যে হরিজন তহবিলের তছরুপ ব্যাপারের সঙ্গে জহরলালকে জড়িয়ে দিয়ে প্রচার-কাজে তাঁরও হাত ছিল। প্রকৃত ঘটনার খবর পান

পরে। মন্ত্রী যে অভব্যভাবে মিথ্যা অপবাদটিকে প্রত্যাহার করেছেন তার জন্যে হি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সুধীন্দ্র বললেন, লোকটা একটা সোয়াইন্। হিরণের সঙ্গে গোপনে দেখা করে হামফ্রে হাউস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছিল নাকি। প্রথমে বলে—তারা একই কলেজের ছাত্র কিনা—। সুধীন্দ্র আরও বললেন, হাউসের বইতে হি সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যঙ্গোক্তি ছিল, কিন্তু মাথামোটা লোক বুঝতেই পারে নি।

হিরণ বললেন, হি-এর প্রতি তাঁর আস্থা চলে যায় সেদিন যেদিন তিনি বলেন যে ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলে সরকার তাঁর ওপর খুব খাপ্পা। এদিকে দেখা যাচ্ছে অনায়াসে ঊর্ধ্বতন অফিসারদের ডিঙিয়ে পদোন্নতি হয়ে চলেছে।

একজন প্রশ্ন করলেন নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি কবে নাগাদ আত্মপ্রকাশ করবে।

আর-একজন জানতে চাইলেন, হুমায়ুন ও বুদ্ধদেবের মধ্যে মনের মিল কোথায়? সুধীন্দ্র ঠাট্টা করে বললেন, চেহারাতে কিছু কিছু মিল আছে। তারপর তিনি জানালেন যে হুমায়ুন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নতুন পত্রিকাতে কত টাকা পর্যন্ত ঢালতে পারবেন জানতে চাইলে বলেন পাঁচশ টাকা। তিনি বলেন, পাঁচ হাজার টাকা জলে ফেলার সংকল্প না করে কোনো পত্রিকা প্রকাশ করা যায় না। হুমায়ুন তখন বলেন, দুজন ধনী সন্তানকে ম্যানেজার বা সেই রকম কোনো পদ দিলে মাসে দেড়শ টাকা করে চাঁদা দেবে, উপরন্তু উদয়াস্ত বিনা বেতনে খাটবে।

আমরা সকলে হেসে উঠতে সুধীন্দ্র বললেন, কবীর সিরিয়াসলি বলেছে।

১৮ মার্চ

আজকের পরিচয়-এর বৈঠকে নীরেন, আইয়ুব, বিষ্ণু ও হারীতদাকে দেখলাম—সুধীন্দ্রর সঙ্গে যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ করছেন। আমি বসতেই সুধীন্দ্র বললেন, 'আপনার কি মনে হয়।' আমি বললাম, গত দিন দুই যেখানে ছিলাম সেখানে পৃথিবীর কোন খবরই পৌঁছয় না। ফিরে এসে খবর কাগজ পড়বারও অবসর পাই নি।

সুধীন্দ্র বললেন, মুসোলিনি খুব বিচক্ষণ লোক। তিনি বড় একটা ভুল করেন না।

নীরেন বললেন, এ্যাবিসিনিয়ার অভিযান চালিয়ে তাঁর ক্ষতি বই লাভ হয় নি—টাকার দিক থেকে ত নয়ই। আমি বললাম, মুসোলিনির দেশের লোকেরা সে কথা মনে করে না—তাদের কাছে এই অভিযান দরকার ছিল।

সুধীন্দ্র বললেন, অর্থের দিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবস্থা কেমন দাঁড়াবে বলতে পারেন না তিনি। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলা যায় ভারতও ইংরেজদের কাছে লাভজনক থাকছে না বলে মনে হয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে এতবড় একটা দেশ দখল করে নিয়ে ইতালির প্রেস্টিজ বেড়েছে। শক্তির বিচারে ইতালি যে তৃতীয় শ্রেণীর জাতি তাতে সুধীন্দ্রর সন্দেহ নেই, কিন্তু জার্মানির সঙ্গে যুক্ত হলে সামর্থ্য হবে অন্য রকম।

আইয়ুব বললেন, তাহলে বলতে হবে হিটলারও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ।

সুধীন্দ্র বললেন, হিটলার অনেক ভুল করেছেন—বিশেষ করে অস্ট্রিয়ার মধ্যে দু-দুবার অনুপ্রবেশে তাঁর ক্ষতি হয়েছে।

হারীতদা প্রশ্ন করে বসলেন, আমরা কোন দিকে—রুশ-ইংরেজ জোট, না জার্মান-ইতালিয়ান জোটকে সমর্থন করব।

নীরেন বিরক্ত হয়ে স্থান-পরিবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে চা-জলখাবার এসে গেল।

২৫ মার্চ

আজও সুধীন্দ্রর বাড়িতে আসর বসেছিল। তাঁকে দেখি টেনিস খেলার পোশাকে বসে আছেন। সাদা প্যান্ট-শার্ট, খালি পায়ে চটি। চমৎকার মানিয়েছিল। প্রবোধ বাগচী বললেন, জার্মানি নাৎসি না হয়ে কম্যুনিস্ট হয়ে অস্ট্রিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লে তখন যদি বলা হতো যে আসলে মতলববাজ হচ্ছে রাশিয়া তা হলে কি ভুল হতো?

সুধীন্দ্র দু-পা ছড়িয়ে দিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, এক চোখ চার ভাগের তিন ভাগ ও আর-এক চোখ চার ভাগের এক ভাগ বন্ধ করে বেশ একটু জোর দিয়ে বললেন, আমি হীরেন-এর মতো কমিউনিজম্-এ বিশ্বাস করি না কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি—সেটা হচ্ছে, রাশিয়া দেশের বাইরে ক্ষমতা বিস্তার করতে চায় না। ইচ্ছা করলে তারা চীনকে সাহায্য করে জাপানকে মেরে গুঁড়িয়ে দিতে পারত, কিন্তু তা করে নি, তার কারণ বর্তমান শাসকদের সঙ্গে জার আমলের সাম্রাজ্যবাদীদের অনেক তফাৎ। সেই একই কারণে তারা মাঞ্চুকুয়ো রেলপথের সব দাবি প্রত্যাহার করেছে।

হীরেন আমার পাশে বসেছিলেন। তাঁর নাম করবার সময় সুধীন্দ্র তাঁর ফর্সা হাতের একটি আঙুল সেদিকে বাড়িয়ে দেন। হীরেন ঘাড় হেঁট করে একবার আড় চোখে তাকিয়ে দেখেন, মনে হল খুশি হলেন।

বাগচী নিজের মতামত থেকে বিচ্যুত হতে চান না। নীরেন আসতে আমি বাগচীর প্রশ্নটিকে আর-এক ভাবে পেশ করলাম। বললাম, ভারত স্বাধীন হবার পরে ফ্যাশিস্ট ও কম্যুনিস্ট সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেলে রাশিয়া কি সাহায্য করবার নাম করে এসে বসে যাবে?

সুধীন্দ্র বললেন, বড় জোর তারা কয়েকটি সামরিক বিমান পাঠিয়ে দেবে। ভারতীয় কম্যুনিস্টদের বন্ধুত্ব চাইবে, কিন্তু শোষণ করবার জন্যে বসে যাবে না।

আমি বললাম, স্বাধীন ভারতে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তখন কি মস্কোর নির্দেশ মতো চলতে হবে?

সুধীন্দ্র বললেন, কেন? এই একই অবস্থা উদ্ভব হয়েছিল চীন দেশে—চীন তাদের নিজেদের সোভিয়েট-এর মাধ্যমে শাসন চালাচ্ছে।

নীরেন বললেন, সমাজ থেকে শ্রেণীবিভাগ উঠে গেলে জাতীয় পার্থক্য থাকবে না।

সুধীন্দ্র তাঁর সুঠাম ছিপছিপে শরীরটিকে সোজা করে নিয়ে বেশ একটু জোরে হেসে বললেন, না, সে কথা আমি মানি না।

সুধীন্দ্র যখন হা হা করে প্রাণ খুলে হাসেন তখন তাঁকে মিষ্টি দেখায়। তিনি বলে গেলেন, জাতীয় পার্থক্য যেমন তেমনিই থাকবে। বড় জোর তিক্ততা কিছু কমবে।

নীরেন বলতে যাচ্ছিলেন, অর্থনৈতিক বিপ্লবের পরে সব দেশেই সামাজিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য—

বাধা দিয়ে সুধীন্দ্র বললেন, এটা ত স্বীকার করেন যে সব দেশেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি থাকবে।

নীরেন বললেন, তা থাকবে, কিন্তু শোষণের প্রতিযোগিতা থাকবে না ও সেই সঙ্গে সম্প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠবে।

কেমন করে?—সুধীন্দ্রর ভুরু কপালে উঠল।

নীরেন আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, প্রথমত জাতি, নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠায় কোনো শ্রেণীগত স্বার্থ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। খবর-চলাচল দ্রুততর হবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্ধানী দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্যে তৎপর হবে।

সুধীন্দ্র বললেন, কিন্তু পদার্থ বিদ্যার বৈজ্ঞানিক বদলে গিয়ে আর কিছু হবে না। সত্যিকারের গবেষককে তার জীবনের অনেকখানি নিয়োগ করতে হবে গবেষণাগারে—তফাৎটা কি হল?

বাগচী প্রশ্ন করলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়া জাতিতে জাতিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে কি?

সুধীন্দ্র বললেন, কেন, ভাষা, কিছুটা পরিবেশও বটে। তারপর তাঁর বোধকরি মনে হল পরিবেশের তারতম্যে অর্থনৈতিক কারণ থাকতে পারে—ঘুরিয়ে বললেন, আমি একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম, তাতে বলতে চেয়েছিলাম যে ইংল্যাণ্ড চিরকালই নৌবলে বলীয়ান থেকেছে যেহেতু সেখানকার মানুষ হচ্ছে দ্বীপবাসী এবং সেই জন্যে এক ধরনের বিশেষ জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠেছে—কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে যায়, জাভাও ত একটা দ্বীপ।

বাগচী জাপানের কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুধীন্দ্রর বলা শেষ হয় নি—তিনি বলে গেলেন, ইংল্যাণ্ডে চক্‌পিট-এ সাতটি স্তরে সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরিবেশ ত একই বলতে হবে, কিন্তু প্রতিটি স্তরের সভ্যতার সাংস্কৃতিক রূপ ভিন্ন। একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই।

নীরেন কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার তিনি জাতির চেয়ে বড় করে ধরলেন শ্রেণী। বললেন, তিনি মনে করেন, জাতি নির্বিশেষে উৎপীড়িত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নতুন ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তারপর ক্রমশ যোগাযোগ সহজ হয়ে এলে জাতিতে জাতিতে পার্থক্যও উঠে যাবে।

তার কাল্পনিক সমাজব্যবস্থার প্রতি কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সুধীন্দ্র বলে গেলেন, জীবতত্ত্ববিদ্‌রা দেখিয়েছেন, মানুষের রক্তে যে চারটি শ্রেণী বিভাগ আছে, তার বিভাজন একমাত্র অতিরিক্ত ইন্‌ব্রিডিং ছাড়া সম্ভব নয়। গুরুত্ব দিতে হবে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া লক্ষণের ওপর।

প্রবোধ বাগচীও নীরেনকে কোনো আমল দিলেন না। তিনি বললেন, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ব্যাধির কথা।

হীরেন মুখার্জিকে কিছু বলতে বলা হলে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, আজকের আলোচনায় আমি হচ্ছি একান্তই শ্রোতা। তারপর তিনি নীরেনকে বললেন, রাধারমণ মিত্রকে পরিচয়-এর আসরে আনতে বাধা আছে কি?

নীরেন মাথা নেড়ে বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না আজকাল।

সুধীন্দ্র বললেন, তিনি রাধারমণ সম্বন্ধে ভালো কথাই শুনে এসেছেন।

নীরেনবাবু তাঁকে আনতে না পারলে অন্য কোনো বন্ধুকে বলবেন।

গিরিজাপতি দেরি করে এলেন। সুধীন্দ্র বললেন, বুদ্ধদেব বলেছেন, প্রমথ চৌধুরী ও অতুল গুপ্ত নাকি 'পরিচয়' সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য সেজন্য তিনি তোয়াক্কা করেন না, কিন্তু চৌধুরী সাহেব তাঁর একটি রচনা ছাপাবার জন্যে ব্যগ্র।

ট্রামে ফেরবার সময় বাগচী বললেন, তিনি বুদ্ধদেবের কথা বিশ্বাস করেন না।

১ এপ্রিল

আজকের বৈঠক বসেছিল প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। গিয়ে দেখি প্রমথ চৌধুরী ও হারীতকৃষ্ণ দেব বসে আছেন। কথা হচ্ছিল, 'নক্ষত্র' বাক্যটি বেদে পাওয়া যায়, না পরবর্তী যুগের অবদান। ডক্টর বাগচী একটি শব্দকোষ জাতীয় গ্রন্থ নিয়ে এসে দেখে বললেন, চৌধুরী সাহেব ঠিকই বলেছেন, শব্দটা বেদের পরবর্তী যুগে পাওয়া যায়।

বোঝা গেল বেদের রচনাকাল নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। কোনো গ্রন্থে বিশেষ একটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণীত হয়েছিল পুবের দিকে এবং তাই থেকে তর্ক শুরু হয়। হারীতকৃষ্ণ আমার কানে কানে বললেন, এই একই আলোচনা চলেছে আধ ঘন্টার ওপর। আরও জানালেন যে তাঁকে গিরীন্দ্রশেখর বোস রচিত একটি বাংলা বই সমালোচনার জন্যে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে তাঁর মানসিক বিকারের উপক্রম হয়েছে।

ইতিমধ্যে নীরেন এসে চুপচাপ বসেছিলেন। প্রবোধবাবুর কথার সমর্থনে বললেন, অনেকের ধারণা ভারতীয়রা নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে অতিশয়োক্তি না করে পারে না। কথাটা কিন্তু আদপেই ঠিক নয়। তিনি মনে করেন, বাগচীর মতো আরও অনেক পণ্ডিত আছেন এ-দেশে যাঁরা অপ্রিয় সত্য কথা বলতে দ্বিধা করেন না। য়ুরোপীয় ইতিহাস-বেত্তাদের মধ্যে একটা প্রভাবশালী দল আছে যাদের বদ্ধ ধারণা হচ্ছে যে আলেক্‌জাণ্ডার আসার আগে আমাদের দেশে সভ্যতা বলে কিছু ছিল না। এদের অবহিত করার দরকার আছে।

বাগচী বললেন, ফরাসী পণ্ডিতদের বেলায় সে কথা বলা যায় না। সেখানকার ভারতীয় ও চীন-সভ্যতা সম্বন্ধে অনুশীলনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে ব্যক্তিগত পক্ষ-

পাণ্ডিত্যের কোনো স্থান নেই। বস্তুত আমাদের সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য বিদেশীরা সংগ্রহ করেছেন সেগুলি বেশি নির্ভরযোগ্য। অনেক সময় ভারতীয় গবেষকেরা কল্পনা বিস্তার করে খেই হারিয়ে বসেন।

হারীতকৃষ্ণ তাঁর একজন জ্যোতির্বিদ বন্ধুর গল্প আরম্ভ করে থেমে গেলেন। সে গল্প আমরা অনেকবার শুনেছি। তাছাড়া সুশোভন ও তাঁর পিছন পিছন সুধীন্দ্র উপস্থিত হতে বাগচী বললেন, ফরাসী ইণ্ডোলজিস্টদের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। সুধীন্দ্রর হাতে একটি ছাতা ছিল, সেটিকে সযত্নে রেখে, গুছিয়ে বসে তিনি য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের লেখা কয়েকটি বই সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। হারীতকৃষ্ণ বললেন, একবার তিনি শাস্ত্রী মশায়কে বলেছিলেন, ব্যারিস্টার সাহেব (প্রমথবাবু) সাহেবদের দ্বারা বেদের সময় ধার্য করার প্রতিবাদ করেন না, তার কারণ, তারা যাই বলুক না কেন প্রকারান্তরে স্বীকার করতে হচ্ছে যে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় কোনো যতি পড়েনি। শাস্ত্রী মশায় নাকি সে যুক্তি শুনে খুব খুশি হন।

প্রমথবাবুর মুখে হাসি দেখা দিল। মনে পড়ে গেল শাস্ত্রী মশায় এক সময় কোনো কারণে তাঁর ওপর চটে যান। তারপর যখন সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে পড়বার জন্যে তাঁ কাছে গিয়ে অনুমতি চান, তখন সব রাগ জল হয়ে যায়।

সুধীন্দ্র হারীতদার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে এমন ভাবে হাসলেন, মনে হল ইঙ্গিতে বললেন, বৃদ্ধকে নিয়ে কেন পড়লে, রেহাই দাও না বাপু—

সেদিন হারীতকৃষ্ণকে কথায় পেয়েছিল। তিনি রমাপ্রসাদ চন্দর বই থেকে দৃষ্টান্ত তুলে বললেন, অন্যের বই থেকে উদ্ধৃত করে ঋণ স্বীকার করেন নি, যেহেতু তিনি ভাণ্ডারকার, অথচ য়ুরোপীয় গ্রন্থকারদের বেলায় তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন—একেই বলে ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্স।

বাগচী ও সুধীন্দ্র একসঙ্গে বলে উঠলেন, সেটাই ত নিয়ম।

প্রমথ চৌধুরী এবার যাবার জন্যে উঠলেন। বয়সের চাপে তাঁকে কষ্টে-সৃষ্টে পা টেনে টেনে এগুতে হল।

৮ এপ্রিল

আজকের পরিচয়-এর আসরে হারীতদা তাঁর একজন আত্মীয় রবি মিত্রকে নিয়ে আসেন। একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজের ছেলে হবে। সুধীন্দ্র খুশি হন নি বুঝতেই পারলাম। আমার দিকে চেয়ে বললেন, উইণ্ড্‌হাম

লিউইস-এর সমালোচনা পেয়েছেন কিন্তু পড়বার সময় পান নি। নীরেন ও তাঁর ছাত্র বিষ্ণু এক সঙ্গে এলেন। হারীতদা বার কতক পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যের আলোচনা করতে গিয়ে সাড়া পেলেন না। সুধীন্দ্র ইচ্ছা করেই হাল্কা ভাবে বললেন আবহাওয়ার কথা, তারপর বললেন আমেরিকা-ভ্রমণের গল্প। কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর হাম্‌ফ্রে হাউস ঢুকলেন সিল্কের পাঞ্জাবি আর চওড়া পায়জামা পরে। বাঙ্গালির সাজে তাঁকে সুধীন্দ্রের চেয়ে সুপুরুষ দেখাচ্ছিল। একটু পরে জানতে পারলাম, তিনি সুধীন্দ্রর বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করছেন। নীরেনের প্রশ্নের উত্তরে হাউস বললেন, সামনের সপ্তাহে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। নীরেন বললেন, ফিরে আসুন—ফিরবেন ত? নীরেন এবার বললেন, পাঞ্জাবির সঙ্গে ধুতি ভালো মানায়। উত্তরে হাম্‌ফ্রে বলেন, চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু সামলাতে পারি নি। হারীতদা বললেন, বেল্ট দিয়ে এঁটে রাখলেই হয়। তাতেও সুবিধা হয় নি বলার পর হারীতদা কি যেন বললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চা-জলখাবার এসে যেতে তাঁর রসের কথায় কেউ কান দিল না। হারীতদা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ক্রেস্ট-এর মতো আমাদেরও একটা ক্রেস্ট থাকা উচিত—তার মধ্যে থাকবে এক কাপ চা আর একটা সিঙ্গাড়া। তাঁর কথা না শুনে সুধীন্দ্র বিষ্ণুকে লক্ষ করে নতুন ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেন। তারপর 'কবিতা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার কথা উঠল। সুশোভন এসে হাউস-এর পাশে বসলেন।

হারীতদা বললেন, 'টাইম্‌স্ লিটারারি সাপ্লিমেন্টে' রামকৃষ্ণর শতবার্ষিকী গ্রন্থের সমালোচনায় দিলীপের শরীর ও মনের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইল কে? দিলীপের নিজের ধারণা, সমালোচক হচ্ছেন ইয়াংহাসব্যাণ্ড।

সুধীন্দ্র বেশ জোরের সঙ্গে হেসে উঠে হাউসকে বললেন, আমি সেদিনই বলছিলাম, বোকার মতো হাস্যকর সমালোচনা নিশ্চয় কোনো বুদ্ধিভ্রষ্ট বাহাত্তুরে বুড়োর অসুস্থ মগজ থেকে বেরিয়েছে।

হারীতদা রসিকতা করে বললেন, দিলীপের দেহের তারিফ মহিলা ছাড়া আর কে করতে পারে, কারণ সর্বাঙ্গের কথা বলা হয়েছে, কেবল মাত্র মুখের ত নয়।

কেউ হাসল না। সুমন্ত্র কথা ঘুরিয়ে বললেন, শাস্ত্রে আছে বাহাত্তুরে ধরলে পুরুষে স্ত্রী জাতির দৃষ্টিশক্তি পায়।

সুধীন্দ্র প্রশ্ন করলেন ইয়ংহাসব্যাণ্ড-এর বয়স কত হবে? ঠিক কত

কেউ বলতে পারল না, কিন্তু আশির কম নয় সায় দিলেন অনেকে।

তারপর কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর মৌনের পর হারীতদা বললেন, ব্যাপার কি সুধীন আজ জমছে না কেন?

হারীতদা তাঁর তরুণ অতিথিকে অনেক কিছু আশা দিয়ে থাকবেন কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সুধীন্দ্র তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবেন। একবার কঠিনভাবে তাকালেন।

হারীতদা হঠাৎ বলে উঠলেন, আচ্ছা জার্মান জনসাধারণ কি স্বাধীন—তা যদি না হয় তাহলে বলতে হবে সুভাষ যে স্বাধীনতার জন্যে লড়তে চাইছে তাও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা নয়।

সুশোভন উচ্চহেসে বললেন, কে বললে জার্মানরা স্বাধীন নয়?

সুধীন্দ্র তাঁর কেদারায় নড়ে বসে বললেন, প্রশ্নটা হচ্ছে হারীশিয়ান—অর্থাৎ তাঁর বিশেষ প্রকৃতি-সূচক। হারীতদা বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় সুধীন্দ্রর টেলিফোনে ডাক এল। তিনি ফিরে এসে বললেন, সাহেদ আধ ঘন্টার মধ্যে এসে পড়বে। হারীতদা একপাড়াতে থাকেন, সাহেদ আসার পরে আসরের মর্যাদা রক্ষা হয়ে থাকবে, কিন্তু আমাকে উঠতে হল।

১৫ এপ্রিল

আসরে আসতে একটু দেরি হয়ে গিছল। শুনলাম এতক্ষণ ধূর্জটিবাবু ছিলেন, এই মাত্র চলে গেলেন। সরকারি কাজ নিয়ে পর্যন্ত তাঁর গল্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত হয়েছে—তাছাড়া এক একজন মানুষের সঙ্গ এমনিতেই ভালো লাগে। তিনি তেমনি মানুষ। সুমন্ত্র বললেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত টিপিকাল লাক্‌নৌ পোশাকে তাঁকে চমৎকার মানিয়েছিল। নীরেন ও টাক-মাথা গ্রীক পণ্ডিত কিরণ মুকুজ্জে একদিকে বসেছিলেন। নীরেন প্রস্তাব করলেন, মার্কিন দেশকে এ্যামেরিকা না বলে আমেরিকা বলা উচিত—কিরণ মুকুজ্জে সায় দিলেন।

সুমন্ত্র জীবনদার কাছে শুনেছিলেন আমি একটা ছোট গল্প লিখেছি। পড়তে চাইলে বললাম, 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে দিয়ে দিয়েছি। প্রকাশিত হলে জানাব।

Dewey নাম বাংলায় কেমন করে লেখা উচিত প্রশ্ন উঠলে সুধীন্দ্র

নীরেনকে ব্যূহ কথাটি উচ্চারণ করতে বললেন। 'উ'-এর ওপর জোর দিয়ে দুজনের শব্দপ্রকাশে তফাৎ দেখা গেল।

চা ও খাবার এসে পড়বার পরে হিরণ-এর অনুবাদ ও 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি ছোট গল্প সম্বন্ধে আলোচনা হল। নানা জনের নানা মত শুনে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হই, কিন্তু হিরণ-এর অনুবাদ সম্বন্ধে সকলেই এক মত—অনবদ্য। সুধীন্দ্র তার মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে খুব সতর্ক। কিরণ মুকুজ্জে পিছনে হেলান দিয়ে বসে প্রত্যেকটি কথা পুনরাবৃত্তি করতে বলেন। হারীতদা অবিবাহিত। অশ্লীল ঘেঁষা কথার ওপর একটা প্রবণতা আছে। বললেন, 'ভ্রান্ত অন্তঃসত্ত্বা' গল্পটি গ্রেট্।

নীরেন একজন গণিতজ্ঞকে প্রশ্ন করলেন, সত্যেন বোস-এর নতুন প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি কী মনে করেন। উত্তরে শুনলাম, এটা হচ্ছে মুখ্য প্রসঙ্গেরই একটি প্রশাখা কিন্তু দাঁড়িয়েছে ভিন্ন রূপ নিয়ে—সেই জন্যেই বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের প্রণিধানযোগ্য হবে।

গিরিজাপতি বলেছিলেন, এই প্রবন্ধের জোরে বোসের সমীকরণ বিশ্বের পাঠ্যপুস্তকে নিজস্ব স্থান করে নেবে।

সুধীন্দ্র বললেন, তিনি প্রাচীন ভারতে জ্যামিতি শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি বই পড়ছেন। তাক থেকে বার করে এনে দেখালেন, তার মধ্যে একটি ঈগল পাখির ছবি অবিকল জার্মান প্রতীক চিহ্ন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, এটা নজরে পড়লে নাৎসিরা আমাদের নিকট-আত্মীয় বলে দাবি করবে। তিনি সেদিন খুশি মেজাজে ছিলেন, বললেন, এই বইতে বলা হয়েছে যে ঋগ্বেদ রচনা হয়েছে খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে আর রামায়ণ রচিত হয় আরও দু হাজার বছর পরে। জোর গলায় বলা হয়েছে, গ্রীকরা গণিত শাস্ত্র মিশরীয়দের কাছ থেকে নেয় নি, নিয়েছিল হিন্দুদের কাছ থেকে।

কিরণ মুকুজ্জে উচ্চ হেসে খানিকটা পড়ে শোনাতে বললেন। পড়া হলে বললেন, গ্রীকরা যেখান থেকে যা নিয়েছে তা স্বীকার করেছে মুক্তকণ্ঠে। তাদের সভ্যতায় হিন্দুদের অণুমাত্রও অবদান থাকতে পারে সে কথা তিনি স্বীকার করেন না। গ্রীক সভ্যতার পরে আর কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে নি।

হারীতকৃষ্ণ রামায়ণের সময় নিয়ে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, রামায়ণে বৌদ্ধ প্রভাব সুস্পষ্ট।

সুধীন্দ্র উচ্চ হেসে ব্যঙ্গকণ্ঠে বললেন, কেন, তুমি কি জানো না আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভবিষ্যদ্ দর্শী ছিলেন।

হারীতদা বিদ্রূপ উপেক্ষা করে বলে গেলেন, ঋগ্বেদ-এর সময় হচ্ছে খৃস্ট-পূর্ব এক হাজার বছর।

সুধীন্দ্র বললেন, বেদ আরও অনেক প্রাচীন। তারপর তিনি গ্রন্থ থেকে পড়ে শোনালেন, হিন্দু জ্যামিতি যুক্লিডের মতো প্রমাণ-সম্বলিত নয়, তার কারণ, হিন্দুরা কোনো কৃতকার্যের থিওরি খাড়া করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করেছিল।

নীরেন বললেন, জ্যামিতির উদ্ভব হয় যখন নিত্য-ব্যবহৃত পথ ছেড়ে শর্ট-কাট্ করে মাঠ অতিক্রম করতে হয়।

এই ধরনের সরলীকরণে আলোচনা হয় না। সে উক্তি কেউ শুনেও শুনল না।

প্রজ্ঞাপূর্ণ মুনি-ঋষিদের অনেক নাম করা হল। কোনো আপ্তবাক্য কতকাল পরে কার মুখ দিয়ে প্রক্ষিপ্ত হয়ে কিভাবে শ্রুতির মধ্যে দিয়ে অথবা লিখিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকট হয়ে উঠল। সঠিকভাবে কোন সময় নির্ধারণ সম্ভব বলে মনে হল না। গিরিজাপতি, কিরণ মুকুজ্জে ও সুমন্ত্র একসঙ্গে উঠে যেতে আমি সুধীন্দ্রর কাছে এগিয়ে এসে মনোযোগ সহকারে 'দি যুনিভার্সাল এ্যাণ্ড দি পার্টিকুলার' সম্বন্ধে বিতর্ক শুনলাম। নীরেন-এর কী একটা কথার উত্তরে সুধীন্দ্র সুচিন্তিত ভাষণ দিলেন। তাঁর মোদ্দা কথা হল, নির্দিষ্ট অনন্য-সাধারণ বলে কিছু নেই, সবই হচ্ছে সার্বজনীন। তিনি ক্রোচে থেকে উদ্ধৃত করে বললেন, সকলের দৃষ্টি পথে সমান ভাবে দৃশ্যমান ধারণা বা প্রতিকৃতির অতিরিক্ত কিছু যদি থাকে তাহলে তার প্রকাশ সম্ভব নয়।

২২ এপ্রিল

আজ শ্মশান ঘাট ও সেখান থেকে ফিরে শোকাবিষ্ট পরিবারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যখন সুধীন্দ্রর বাড়িতে গেলাম, তখন তিনি প্রকাণ্ড বৈঠকখানার এক পাশে একটি টেবিলের ওপর কি যেন লিখছিলেন। আর কেউ তখনও আসেন নি। একটু সকাল সকাল এসে গিয়েছিলাম। বললাম, এইটা আপনার লেখবার সময় নাকি?

একটু হেসে বললেন, এত কম লিখি আজ কাল যে কোনো ধরা-বাঁধা সময় নেই। যখন ইচ্ছা হয় দু চার লাইন লিখে ফেলি।

সুমন্ত্র তাঁর বিশাল শরীরটাকে টেনে-টুনে এনে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তে সুধীন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কী?

'হৃৎপিণ্ড সব শরীরটাকে রক্ত যোগান দিয়ে উঠতে পাচ্ছে না। মাথা ঝিম ঝিম করে ; মগজে কিছু থাকছে না, দরকারি কথা ভুলে যাচ্ছি।'

সুধীন্দ্র বললেন, এই গরমে এত দূর আসা ঠিক হয় নি।

'বাড়িতে বসে থাকতে মন চায় না'—সুমন্ত্র এবার নিজের শরীর সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করে দিলীপ রায়ের কথা তুললেন। তাঁর প্রশ্ন হল, 'পরিচয়' পত্রিকা দিলীপ-এর যে কবিতাটা ছেপেছে সেটা কি প্রকাশের যোগ্য ?

সুধীন্দ্র বললেন, খারাপ না হলেই হল। কবিতা প্রকাশযোগ্য মনে হয়েছিল বলেই ছাপা হয়।

সুমন্ত্র বললেন, তার মানে দিলীপিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডে প্রকাশযোগ্য ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই সুমন্ত্র বলে গেলেন, সেদিন এক জায়গায় দেখা হতে প্রশ্ন করলাম, কি মশায়, আপনি কম্যুনিস্ট নাকি ? ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, কে বললে ?—কেন ঐ টুপি এত লাল যে !

দিলীপ গম্ভীর হয়ে বলেন, এ রঙটাকে বলে গেরুয়া।

আগের কোনো আসরে সুমন্ত্র বলেছিলেন, দিলীপ-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় বিলেতে। তিনি তখন লণ্ডনে একটি ঘর নিয়ে থাকতেন। একদিন দিলীপ পরিচয়-পত্র নিয়ে হাজির। তখন তাঁকে নিজের ঘরেই আশ্রয় দিতে হয়। নিজের বিছানা দিলেন অতিথিকে ও নিজে শুলেন সোফার ওপরে। ঘুমোতে পারেন নি অনভ্যস্ত ভাবে শয়নের জন্যে নয়। সোফাটা বেশ বড়ই ছিল। কিন্তু ঐ অতিভদ্র ভালোমানুষ লোকটি অবিরত অসুবিধায় ফেলেছেন বলে মাঝে মাঝে এমন মনস্তাপ প্রকাশ করতে থাকেন যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

এ গল্প সুমন্ত্র আজকে আবার আরও মজার করে বললেন।

সুশোভন এসে পড়তে হিরণ সম্বন্ধে আলোচনা হল। তাঁর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ফর্স্টার-এর 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া'-র অনুবাদে বড় গাফিলতি করছেন—অনুযোগ করলেন সুধীন্দ্র।

গিরিজাপতি আসতে আমি তাঁকে তাঁর বন্ধু ডাক্তার কালীপদ ঘোষের আত্মহত্যার খবর দিতে খুব বিচলিত হয়ে উঠলেন। হাজারিবাগ রোডের ভাড়া-বাড়িতে কেমন করে আকস্মিক ভাবে মানসিক রোগের সূত্রপাত হয় সেই গল্প বললাম। আমি সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম বলে কাহিনী বিস্তারিত হয়।

সুধীন্দ্র কেশরবাঈর গান শুনতে যাবেন শুনে সভা ভঙ্গ হল।

রবীন্দ্রনাথ : প্রত্যাখ্যান ও পরিগ্রহণ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

অ বয়সের যুবক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে লেখা
তাঁ লিখেছেন : 'আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ
lyri tellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার
প্রকাশ tellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হয়
চিন্তাকে চিন্তার বাহক মাত্র, চালক নয়। কাজেই চিন্তার
রাস্তা মো সহর্ল, গতি আঁকা-বাঁকা, পটভূমিকা পরিবর্তনশীল।··· কিন্তু
তার গতির একটা বিশেষত্ব আছে। চতুরায়তনিক ব্যোমে স্বনিয়ন্ত্রিত বস্তুর
মতো চিন্তাও চলে চক্রাকারে।··· চিন্তার এই গুণ থেকেই গঠনের উৎপত্তি।
গঠনের পরিচয় কবিতার পঙক্তিবিশেষের মধ্যে না-ও পরিলক্ষিত হতে পারে ঃ
কিন্তু একটা কবিতাকে পূরাপূরি নিলে তার মধ্যে একটা ঠাস বাঁধুনি থাকা
উচিত। গঠন সাম্যবাদী ঃ যে-কবিতাগুলি গানের নিয়ম মেনে চলে,
তাদের সকলের ভিতরেই একটা বিশিষ্ট ঐক্য আছে। এই ঐক্য
আয়তিতে···

'আমার থিয়োরিটা মুখ্যত এই। এর থেকে গোটা কয়েক শাখা-প্রশাখা
বেরিয়েছে। যথা ঃ অসাধারণ চিন্তার অভিব্যক্তিতে অপ্রচলিত শব্দের
ব্যবহার প্রশস্ত ; কেননা এই ধরনের শব্দ মানবমনের অলসগমনের প্রতি-
বন্ধক।··· অলঙ্কার চিন্তাকে পরিস্ফুট করবার বিশেষ সহায়।··· উপমার
ভিতরেও একটা সামঞ্জস্য, একটা ন্যায়সঙ্গতি না-থাকলে মুস্কিল। কিন্তু তাই
বলে উপমাগুলোকে গতানুগতিক হতে হবে এর কোনো মানে নেই। বরং
উল্টোটাই ভালো। সত্যকে নতুন ভাবে দেখতে গিয়ে নূতন রূপকের দরকার
হওয়া স্বাভাবিক।··· তবু পারিপার্শ্বিক প্রতীক দেখেই যে কবি তুষ্ট, সে-
কবি অলস।··· অনেক বাছাবাছির পরে মনের মতন প্রতীক মেলে। তখনই
কবিতা পৌঁছয় পূর্ণের সমীপে। simbolist [symbolist] কাব্যে এই জন্যই
বোধ হয় উপমা [উপমেয়] ও উপমানের সম্পর্ক অনেক সময় প্রথা দৃষ্টিতে
ধরা পড়ে না।·· কবিতার গঠন যেমন প্রত্যেক লাইন বিশ্লেষণ করেও ধরা
যায় না, তার ভাবাবেশও তেমনি খণ্ডাকারে দেখা যায় না, বিরাজমান থাকে

সমগ্রেব মধ্যে। ভাব তবু মেঘ বাঁশী প্রিযা বিবহ মিলন ইত্যাদি জবাজীর্ণ শব্দেব কবতলগত নয, শুধু প্রেম বেদনা ও প্রকৃতিকে নিযেই কাব্যেব কাববাব চলে না, তাব লোলুপ হাত দর্শন-বিজ্ঞানেব দিকেও আস্তে আস্তে প্রসাবিত হচ্ছে। আজকেব এই "বিশেষ জ্ঞানেব" দিনে কাব্যেব তবফ থেকে আমি পাঠকেব কাছে সেই নিবিষ্ট অনুশীলন ভিক্ষা কবি যেটা সাধাবণত অর্পিত হয অন্যান্য আর্টেব প্রতি।..' (২৭ আষাঢ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ববীন্দ্রনাথকে লিখিত সুধীন্দ্রনাথেব পত্র ১, দ্রষ্টব্য 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯, পৃ ১৫৫-৫৬)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে শুধুই যে সুধীন্দ্রনাথেব ব্যক্তিগত কাব্যাদর্শেব সুস্পষ্ট আভাস পাওযা যাচ্ছে এমন নয, ববং তলিযে দেখতে গেলে, আজ অন্তত এইটেই মনে হওযা স্বাভাবিক যে, সুধীন্দ্রনাথ তাঁব সমসাময়িকেব কাব্য-প্রকৃতিকে আবেগসর্বস্ব ভাবুকতাব ক্ষেত্র থেকে প্রতীচ্যেব বিজ্ঞান দর্শন ও কাব্যসাহিত্যেব প্রত্যক্ষ প্রভাবে অনেক বেশি যুক্তিবুদ্ধিব নন্দন দিতে চেযেছেন। কিংবদন্তিতুল্য স্বভাবকবিত্বের বিরুদ্ধে স্বশিক্ষিত কবিব অনুশীলন-সাপেক্ষ অভিযান, আমাদেব ববীন্দ্রোত্তব আধুনিকতাব সামান্য লক্ষণটিকে যে তৎক্ষণাৎ স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ কবেছে, গত পঞ্চাশ বছবেব বাংলা কবিতাব ইতিহাস ঠিক ততটাই সুগম ও সুলভ সমীকবণেব বিষয নয। তবু আটাশ বছব বযসেব কবি সুধীন্দ্রনাথেব সঙ্গে সেই সমযে কুড়ি বছর বযস্ক বিষ্ণু দে-ব নবীন বন্ধুত্ব ও প্রথম পত্রালাপেব প্রসঙ্গও যেহেতু টি. এস এলিযট (দ্রষ্টব্য: অরুণ সেন-প্রণীত 'এই মৈত্রী! এই মনান্তব!' (১৯৭৭) গ্রন্থে বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথেব প্রথম পত্র: ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ ৪৫), এবং এই যোগাযোগও যেহেতু তাঁব রবীন্দ্রনাথকে প্রথম চিঠিটি লেখাব মাস দুযেক আগেবই ঘটনা, তখন স্বভাবতই এ-অনুমান অসংগত নয যে, সুধীন্দ্রনাথ তাঁব পূর্বোক্ত কাব্যাদর্শটি নিছক পত্রসাহিত্যেব প্রেবণাতেই বচনা কবেন নি। তদুপবি, ১৯২৮-এই বিষ্ণু দে-কর্তৃক এলিযট সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে অনুরুদ্ধ হযে তিনি শেষ অবধি লেখেন 'কাব্যের মুক্তি'-নামক প্রবন্ধটি, এলিযট-উপলক্ষে প্রতীচ্য আধুনিক-কাব্য প্রভাবিত এক বিশিষ্ট কাব্যাদর্শ; তা পবে অনেক পবিমার্জিত রূপে 'পবিচয'-এব প্রথম সংখ্যায (১৯৩১) প্রকাশিত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য: 'এই মৈত্রী! এই মনান্তব!', পৃ ৪-৬)। অপব পক্ষে, 'কি কবে লেখক হলুম' (দ্রষ্টব্য: 'অমৃত', ১১ জুলাই ১৯৬৯) বলতে গিযে বিষ্ণু দে যখন এলিযট-প্রণোদিত এক 'আলোকিত ধাক্কা'ব উল্লেখ কবেন এবং সে-আলোডন, যাব মূলে শুধুই এলিয়টের প্রবন্ধ নয, কবিতার 'ভযঙ্কর লিবিকৃল্

শক্তি'-ও যুক্ত, তখন তাঁর এই অনিবার্য স্বীকরণ : 'পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে'—তথ্য হিসেবে তা পূর্বোক্ত কাব্যাদর্শেরই প্রেরণাসূত্র এতে ভুল নেই। তথাপি এলিয়ট সম্পর্কেও, সূক্ষ্ম বিচারে, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র মানস-প্রতিক্রিয়া কবিতার লিরিকাল শক্তি সম্পর্কে তাঁদের আদর্শঘটিত মিল-অমিল দুই-ই উপস্থিত করে। এবং তৎকালীন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় এলিয়ট-প্রভাবিত কাব্যরীতি সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র সে-বহুবচনাত্মক স্বীকৃতি ('আমাদেরও কাউকে কাউকে'···) যে শুধুই সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর নিজের সম্পর্কে প্রযোজ্য, এমন ধারণা ঠিক নয়।

যদিও এক দশক পরে, রবীন্দ্রনাথের সদ্য তিরোধানের উপলক্ষেই রচিত হয় জীবনানন্দের 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা'-নামক প্রবন্ধটি, তবু তার বক্তব্য সেই প্রাক্তন ধারাবাহিকতারই জের, যেহেতু সে-বক্তব্যের ঐতিহাসিকতাটুকু মানতে স্বাভাবিক কারণেই কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বস্তুত জীবনানন্দও তাঁর সমসাময়িক বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের সত্যে অনিবার্য করে দেখেন। আর সেই কারণেই যেমন মধুসূদন-বঙ্কিম এমনকি রবীন্দ্রনাথও কম বেশি তাঁদের স্বকালসম্পৃক্ত 'বহিরাশ্রয়ী' আধুনিককে গ্রহণ-বর্জনের তারতম্যে আত্মস্থ করেন, জীবনানন্দের ভাষায়, 'বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পর-নিঃসক্ত বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোর্দলেয়ার ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউণ্ড-এর কাছে গেল খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে।'

অন্তত 'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথের সে-দিব্য উচ্চারণ (···'এ পাখার বাণী'··) তৎক্ষণাৎ অপাঙক্তেয় ও অশ্রদ্ধেয় বলে গণ্য না-হলেও, 'বর্তমান সময়ের জন্য অন্তত—আধুনিকেরা—গ্রহণ করলেন এলিয়টকে', যে-এলিয়ট আমাদের রাবীন্দ্রিক পরমতার প্রতিস্পর্ধী সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিকে ১৯২৫-এর অন্তঃসারশূন্য মানবের মর্মান্তিকতায় মনোনিবেশ করেছেন। অতএব দেশীয় ঐতিহ্যে বিস্মরণ না ঘটলেও, আমাদের অগ্রজ-আধুনিকদের তরফে, সংগত ও অনিবার্য হয়ে দেখা দিল সে-বহিরাশ্রয়িতা। সুধীন্দ্রনাথও তাঁর 'কাব্যের মুক্তি'র প্রথম রচনাকালের (১৯২৮) অন্তত চার বছর পরে এই মানলেন : "যখন উপনিপাত বিশ্বব্যাপারের ছত্রপতি, যখন অতিজীবিত আদর্শকে আঁকড়ে থাকা মারাত্মক,—যেমন আমাদের যুগে—তখন স্রষ্টা আর সমালোচক প্রায়

সমার্থবাচক।' প্রধানত এই স্বকালসম্পৃক্ত বহিঃসংঘাত ও অন্তর্ভাবনায় 'স্রষ্টা আর সমালোচক'-এর দ্বৈতাদ্বৈতে, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের কয়েকজন বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। এলিয়টের উপলক্ষে, অতঃপর, বিষ্ণু দে-র ভাষায়, 'ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হলো।'

এবং সে-য়ুরোপীয় সংসর্গ প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিনি ও ফরাসী-জর্মনের পরোক্ষ দৌত্যে। প্রচলিত ও কিছুটা সুলভ প্রতিতুলনার স্বার্থে বোদলেয়ার, মালার্মে, হুইটম্যান, হপকিন্স্, ইয়েটস, রিল্‌কে, লরেন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট, অডেন প্রমুখ কবিদের আবহ-উত্তাপে বাংলা কবিতার রবীন্দ্রপরবর্তী উদ্যোগ-আয়োজন যথেষ্ট কার্যকরী হয়ে ওঠে বলেই কমবেশি রাবীন্দ্রিকতামুক্ত তিরিশের অভিযানটিকে কেউ কেউ বলেছেন বিদ্রোহ বা রবীন্দ্র-বিরোধিতা, আরো সুস্পষ্ট পারিভাষিকে—রোমান্টিক-বিরোধিতা। অবশ্য যে-সুলভ প্রতি-তুলনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তীর প্রাথমিক কাব্যকৃতির সঙ্গে যথাক্রমে হুইটম্যান, লরেন্স ও হপকিন্সের নাম যুক্ত হয়, এবং হয় বলেই যে এঁদের রচনাকর্মে এলিয়টের কাব্য ও কাব্যতত্ত্ব আদৌ কোনো কাজে লাগে না, এমন নয়। বরং এইটেই স্বাভাবিক, তখনকার বাংলা কবিতার বহির্বিশ্ব যে-অর্থে এলিয়টের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্বোধিত, তাতে হুইটম্যান, লরেন্স ও হপকিন্সও সেই প্রাসঙ্গিকতার সূত্রেই আসে। তবু প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেবের তুলনায় 'খসড়া'র অমিয় চক্রবর্তীই কার্যত অনেক বেশি এলিয়টমনস্কতার পরিচয় দেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার এই সদ্যপ্রসূত বহির্বিশ্বটি খুবই সন্তর্পণে লক্ষ করেন হয়তো। ১৯৩৩-এর এক পত্রে তিনি বিষ্ণু দে-কে লেখেন: 'নতুন কালের বিদেশী আদর্শ সামনে রেখে সযত্নে ভঙ্গি অভ্যাস করে নিজের রচনাকে নতুন হাটে চালিয়ে দেবার প্রয়াস তোমার নেই এই আশা করি।' (বিষ্ণু দে-কে লেখা পত্রসংখ্যা ৫, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২)। হয়তো স্বাভাবিক সৌজন্যবশতই তখন রবীন্দ্রনাথ একথা লেখেন না যে 'নতুন কালের বিদেশী আদর্শ' এঁদের রচনাতেই আজ সুপ্রকট এবং সে-আদর্শ টুকুর আপাতত ভঙ্গি-সর্বস্বতাই তাঁকে খুব বেশি বিচলিত করছে। অথচ ১৯৩০-এর বাংলা কাব্য যে শুধুই ভঙ্গিসর্বস্ব ছিল, ভাবে ও ভঙ্গিতে একাত্ম ও অভিনব ছিল না, ঠিক এতটা না হলেও, প্রায় এই রকম ধারণার বশেই সুধীন্দ্রনাথকে লেখা কোনো-একটি চিঠিতে (দ্র. ১২ নম্বর পত্র, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯) তাঁর সে-পরোক্ষ উক্তি: 'স্পর্ধিত আধুনিকতার তারস্বর', যা তাঁর আধুনিক কাব্য-

সম্পর্কিত তৎকালীন মানসিকতারই একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে গণ্য। সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী' পড়ে তিনি তাঁকে 'যথার্থই আধুনিক' বলে মেনেছিলেন, আর সে তো নিঃসন্দেহে এই জন্য যে তাতে 'স্পর্ধিত আধুনিকতার তারস্বরও' নেই, 'সাবেক আমলের মধুর সৌজন্যেরও অভাব' বলে। আবার বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' পড়ে কিছু-বা দ্বিধান্বিত তিনি, যদিও নবীন কবির মধ্যে 'যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যবসায়' (দ্র. পত্রসংখ্যা ৪, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২) তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না এবং পথটা 'সম্পূর্ণ সুগম' বলেও মনে হয় না তাঁর। 'প্রথমা'র কবিতাগুলি 'আগুনে ঢালাই করা হাতুড়ি পিটোনো কবিতা—' তাঁকে লিখতে হয়েছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। লিখেছিলেন: 'যেখানে ফুল ফোটে, ফল ফলে, সেখানেও কবি বাঁশি বাজাবার বাসনা পেয়েছে এ কথা মনে রেখো—কেবলি দুন্দুভি বাজাবার পালা তার নয়।' (দ্র. পত্রসংখ্যা ২, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২)। বোঝাই যায়, সুরে মিলছিল না; সম্বোধন ও উচ্চারণের মাত্রাও পালটাতে শুরু করেছিল দ্রুত। আর এইভাবে ১৯৩০ থেকে ৪১, জীবনের এই শেষ দশ বছরে পাওয়া বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক তাঁর মনঃপূত হল না, আর তা কী করেই বা হবে, যখন বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তীর তৎকালীন কবিকৃতিতে আপাত-পরিতৃপ্ত তিনি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'রস', 'স্বকীয়তা' ও 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'-সংক্রান্ত তাঁর প্রতিক্রিয়াকে গতানুগতিক একটি বাক্যে নিঃশেষ করে দিলেন। আসলে জীবনানন্দকে তিনি তেমন করে লক্ষ করেন নি, আর সে-সময়ও হয়তো তখন খুব অল্প, ফলে 'চোরাবালি' মনে হল 'দুর্ভেদ্য', এমন কি পূর্ণ অভিনিবেশের জন্য স্বাস্থ্য ও প্রহর আরো অল্প ছিল বলেই সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা'-ও থেকে গেল অনালোচিত। আর 'বলাকা'-পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর 'পুনশ্চ'র পর্যায় থেকে এই তিরিশের স্নেহবৎসল কবিসমাজ দ্বারা পুনঃপুনঃ স্বীকৃত হলেন, নিত্যনব বিস্ময়ে ও সম্মাননায় অভিভূত, তবু দ্বিধাগ্রস্ত তিনি, হয়তো উপলব্ধিও করলেন তাঁর অপরিহার্যতা, বিশেষ ভাবে তখন, যখন সুধীন্দ্রনাথ লিখলেন: ...'আকাশ প্রদীপের প্রত্যেক পংক্তিতে যে আধুনিকতা আছে, তার তুলনা অন্যত্র দূরের কথা, আপনার নিজের লেখাতে—এমন কি পরিশেষ বা পুনশ্চতেও নেই। অবশ্য আধুনিক আর বহিরাশ্রয়ী আমার কাছে সমার্থবাচক' .. কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেন এই বহিরাশ্রয়িতার মর্মকে তাঁর স্নেহভাজনদের রচনায় ঠিক মতো খুঁজে পেলেন না? এবং সুধীন্দ্রনাথই বা ঐ একই চিঠির উপান্তে কেন লিখলেন:

…'আশা হয় "আকাশ প্রদীপে"র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হলে, বাঙালী লেখকেরাও হয়তো আধুনিকতার অর্থ ধরতে পারবে। সে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এখনো আমার হয় নি। বইটি মাত্র দু বার পড়েছি।' …অবশ্য আমরা তার আরো কিছু বেশি পঠন-অভিজ্ঞতা থেকেই 'আকাশ প্রদীপ'-এর সে-আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার তুলনা করি। দেখি, সুধীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হয় না।

'পুনশ্চ'-'শেষ সপ্তক'-র পর, 'আকাশ প্রদীপ'-এ 'আধুনিকতা' আমাদের আর নতুন কোন্ দিগন্তে পৌঁছে দেয়, যেখানে সে-দীপশিখা নিতান্তই 'একটি বক্রিম মরীচিকা' নয়? 'শেষ সপ্তক'-এর ষোল নম্বর কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথ একদা যে-'রেখার মায়া'র আধুনিকত্বকে তথ্য হিসেবে উপস্থিত করেন, শুধুই তথ্য ও বিবরণমাত্র, তারপর তথ্য হিসেবেই বা আর কোন অভিনবত্ব অবশিষ্ট থাকে, বিশেষত কবি যখন শুধু এই বলেন: 'পুতুল গড়ার শূন্য বেলা কাটাই খেয়াল গড়ে।' ('সময়হারা', 'আকাশ প্রদীপ')। বস্তুত এই 'রেখার মায়া' আর 'খেয়াল' গড়ে-তোলার ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্প হয়তো ততটাই আধুনিক, যার উপলক্ষে, বুদ্ধদেবের মতো আমাদেরও স্বীকার্য—'রবীন্দ্রনাথের পরে প্রথম নতুন তো রবীন্দ্রনাথ নিজে।' কিন্তু মনে রাখা ভালো, আধুনিকতার সে-পরিমণ্ডলটি একান্ত ভাবে রবীন্দ্রনাথেরই। এবং এই দিক থেকে, 'আকাশ প্রদীপ'-প্রসঙ্গে-কথিত সুধীন্দ্রনাথের সে-'আধুনিকতার অর্থ'টি আমাদের অবশ্যই বোধগম্য হয়। কিন্তু এই রাবীন্দ্রিক আধুনিকতা ও উত্তর-রবীন্দ্র কবিতার বহিরাশ্রয়ী আধুনিকতা কি 'সমার্থবাচক'?

২

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই রাবীন্দ্রিক আধুনিকতার স্বরূপ ও প্রধান বিশেষত্বগুলি কি এমনই যে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা তিরিশের দশকের রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পূর্ববর্তী ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে সরিয়ে আনে? তাঁর কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকে ঘটে কি তেমন পালাবদল?

গদ্যছন্দের অভিনবত্ব নিয়ে যে-রবীন্দ্রনাথ দেখা দেন তাঁর 'পুনশ্চ'-এ, তার বিষয়বিন্যাসে অবশ্যই লক্ষণীয় হয় 'ক্ষণিকা'-র সে-সহজ-নির্ভার তুচ্ছতা। তফাৎ শুধু এই যে, এর গভীর শুধুই লিরিকের স্বাচ্ছন্দ্যে আবদ্ধ না-থেকে ছড়িয়ে পড়ে নানা বিচিত্রতর গল্পিকার রসসঞ্চারে। স্বভাবতই তাঁর বক্তব্যের

কোথাও নেই সে-অর্থঘন জটিলতা, নেই তত্ত্বের প্রচ্ছন্নতা বা সাম্প্রতিকের অনুষঙ্গবহুল দূরান্বয়। অন্তত বিষয়ের এই আটপৌরে বহির্মুখিনতায় তাঁর কাব্যবক্তব্য স্বত:সিদ্ধ আধুনিকের স্পর্শ পায়। আর আঙ্গিকের নূতনত্ব রবীন্দ্রকাব্যের সমসাময়িকে যথার্থই আক্ষরিক অর্থে 'পুনশ্চ'-এর প্রতিবেদনে ভাস্বর হয়ে ওঠে। তবু, 'পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা', কবিতার সে-নূতন পরীক্ষায়, রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি কৃতকার্য হন কি? বিশেষত যে-কালে তিনি 'জার্নি অব মেজাই' কবিতাটির অনুবাদ উপলক্ষে এলিয়টের রচনারীতির নৈকট্যে জেনেছিলেন ছন্দোমুক্তির অনিবার্যতাকে। পদ্যের এতাবৎকালের প্রচলিত মৌতাত ভেঙে দিয়ে তিনি যে গদ্যভাষার সাবলীলতা আনতে চেয়েছিলেন পদ্যছন্দে-লেখা কবিতাতেও, তার বহিরঙ্গ-প্রমাণ নিশ্চয়ই 'পুনশ্চ'-এ সেই 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি শব্দবর্জন, কিন্তু সেই বর্জনের দ্বারা কি তিনি তাঁর কাব্যের অতিলালিত্য থেকে আদৌ 'গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে' উত্তীর্ণ হতে পারেন? যেটুকু পারেন, সেইটুকুই বারীন্দ্রিক আধুনিকতা, অবশ্য তা-ই হতে পারত আরো সঙ্গতভাবে সুধীন্দ্রনাথ-কথিত বহিরাশ্রয়িতার সমার্থক, কিন্তু তা হয় নি।

তদুপরি, 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষলেখা' অবধি এই দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ এমন কিছুই বলেন না, যা ইতিপূর্বে বলা হয় নি। তাঁর রোমান্টিকতা হয়তো অনেক বেশি নিরলংকৃত হয়ে দেখা দেয় এই পর্বে; আর তার ফলে, ভাষা ছন্দ চিত্রকল্প ও প্রতীকেরও কমবেশি রূপান্তর ঘটে, কিন্তু বক্তব্যে ও আঙ্গিকে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সে-অর্থে, পালাবদলের প্রসঙ্গ তিরিশের দশকের প্রতিক্রিয়ায় যতটা ছিল অভূতপূর্ব, অধুনা দূরত্বের পর্যবেক্ষণে ও সমগ্রের বহিরবয়ব বিচারে, তাকে রবীন্দ্র-ধারাবাহিকতারই অন্তর্ভূত আর-এক রবীন্দ্রনাথ বলে মনে হয় না; মনে হয়, 'বীথিকা' আর 'প্রান্তিক' 'সেঁজুতি' আর 'সানাই' আর 'নবজাতক'-এর বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে 'বলাকা'-পূর্ববর্তীযুগের পুনরাবৃত্ত-রোমান্টিকতা, 'পুনশ্চ-শেষসপ্তক-পত্রপুট-শ্যামলী'-র মাঝখানে একটা গদ্য-পদ্যের বেড়া তুলেছে মাত্র, সে-আড়ালও এমন নয় যে তাতে পদ্যের প্রভাব কোথাও খুব বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুতরাং এরই মাঝখানে 'আকাশ প্রদীপ'-এর আধুনিকতাও কমবেশি পুনরাবৃত্ত।

তিরিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শাশ্বত' আধুনিকের ব্যাখ্যায় যে ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকের দ্বন্দ্বচিত্রটি তুলে ধরেন এবং 'বিশুদ্ধ আধুনিকতা'-র

সপক্ষে 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা'র কথা সবিস্তারে বলেন, বলাই বাহুল্য, এলিয়টীয় নৈর্ব্যক্তিকতায় দীক্ষিত বাঙালি কবিরা বিশ্বের প্রতি সে-'সমগ্রদৃষ্টি' যে আদৌ পোষণ করেননি এমন নয়, তবু সে-দৃষ্টি যে যুগধর্ম অনুযায়ী তখন আর খুব জরুরি ছিল না সেটা অন্তত এলিয়টের মতোই তাঁরা আন্তরিক উপলব্ধি করে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রপরবর্তী আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক প্রভেদই বাংলা কাব্যে বহিরাশ্রয়িতার অনিবার্যতাকে স্বাগত জানিয়েছে। আর তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়-রোমান্টিকতায় আত্মা-হুতির সচেতন বিরুদ্ধতায় যার জন্ম, সেই আধুনিক, বিশেষ ভাবে একটা বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বের ভাঙা, পোড়ো ও বিপর্যস্তের পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নকে সাম্রাজ্যবাদী বিভীষিকার শতেক প্রতিক্রিয়া দ্বারা মানতে বাধ্য, এবং মেনেও অন্যতর যে নির্বিকার-আধুনিকতা, তার কথা, দৈবক্রমে, আমাদের বাংলা ভাষায় বলতে পারেন তবু রবীন্দ্রনাথই, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর-কেউ নন। সুতরাং সময়ের মর্জিমাফিক আধুনিকতার দিকে, তাঁর ধারাবাহিক রচনাকর্মে 'পুনশ্চ'-র সংযোজন, তেমন কোনো 'বাঁক' আদৌ সৃষ্টি করে কি? হয়তো তা করে নিছক প্রাকরণিক স্বাতন্ত্র্যে, এবং প্রকরণ অনুযায়ী প্রসঙ্গের বিচিত্র তুচ্ছতায়। আপাততুচ্ছ বিষয়ের বহির্মুখিনতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রদৃষ্টি যেখানে আত্মগত। যে-নৈর্ব্যক্তিককে অন্তত তাঁর সমসাময়িকে তিনি লক্ষ করেন 'বিশ্বের প্রতি' 'উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি' বলে, আসলে সে-সিদ্ধান্তের মধ্যে দেশ-কালের বিশ্বগত ব্যাপক প্রতিক্রিয়াকে বড় করে না-দেখার ফলেই তাঁর এই ব্যক্তিগত বিচার বৃথা সে-নৈর্ব্যক্তিককে আঘাত করে।

বস্তুত 'পরিশেষ' থেকে 'সানাই' পর্যন্ত (১৯৩২-৪০) রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে তারই সমান্তরাল অপর যে-প্রতিস্পর্ধী আধুনিকতাকে ধীরে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেখেন, তার সঙ্গে বোঝাপড়া, দ্বন্দ্ব ও মিলনোৎকণ্ঠায়, তিনিও যে-কখনো-সখনো এই অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের শরিকানায় নির্ভর করেন কমবেশি, তার প্রমাণ, কবির এই সময়কার গদ্যপদ্যের রচনাপ্রয়াসে অবশ্যই লক্ষণীয়। সংগোপন বিরূপতা থেকে সচেতন প্রস্তুতি পর্যন্ত, তবু তিনি থেকে যান তাঁর স্বকীয় বৃত্তেরই অন্তর্গত। এবং দীর্ঘকাল ধরে, তিলে-তিলে, তাঁর নিজের হাতে গড়ে-তোলা কবিতার ডিকশন এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তা-থেকে বাইরে বেরিয়ে-আসা অসম্ভব বলেই যেন তাকে মনে হয় অসমীচীন। এই অসমীচীনতার ভাষ্য তিনিই রচনা করেন তাঁর সে-সময়কার কোনো-কোনো

প্রবন্ধে ও তরুণ স্নেহভাজন কবিদের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলিতে। 'পরিশেষ' থেকে 'সানাই'-এ সেই আত্মপরীক্ষার ও অন্তর্বিরোধের বহু বিরুদ্ধতা ও আনুগত্যের সংগোপন চেষ্টাগুলির আবর্তন আর পুনঃপুনঃ আপন কক্ষে প্রত্যাবর্তনেরই গোপন ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। রাবীন্দ্রিক আধুনিকতা এইভাবেই স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিচয় 'পরিশেষ'-'সানাই'-এ যতটা লক্ষণীয়, তুলনায় অনেক বেশি আধুনিকতার স্বভাবলগ্ন মনে হয় তাঁর 'রোগশয্যায়-আরোগ্য-জন্মদিনে-শেষলেখা'-র কবিতাবলি। তাঁর এই শেষের পর্যায়টিই, প্রকৃতপক্ষে, স্বতঃসিদ্ধ আধুনিকতায় রবীন্দ্রপ্রতিভাকে পরিণামরমণীয় করে। নিরলংকৃত ভাষায়, ছন্দে, প্রতিমায় ও প্রতীকে কবিতার সর্বাঙ্গীনতা এখানে প্রকাশের যে-পরিমিতি লাভ করে, যার ফলে ভাবসংহতি তার রূপের পরমতায় ঠিক পেয়ে যায় এক অন্তঃশায়ী গদ্যভাষা। এই ভাষা 'পুনশ্চ'-র রবীন্দ্রনাথ গদ্যেপদ্যে তৎক্ষণাৎ সফল করে তুলতে না পারলেও, পরে, সেই-সাফল্য অংশত অনায়াসদৃষ্ট। হয়তো কবির জীবৎকালের এই শেষক্ষণটুকুতে (১৯৪০-৪১), প্রকৃত অর্থে, আধুনিক কবিতার প্রতি আর-কোনো 'সময়হারা'-অভিমান বা ক্ষোভ বা তাড়না ছিল না তাঁর, যেন সমস্ত সংকল্প আর প্রতিজ্ঞার উপান্তে নির্মোহ তিনি, মুখরতার বিরুদ্ধে মৌনের ভাষা কী, তা জেনেছিলেন। আর এই নৈর্ব্যক্তিকতা, যা একদা ছিল তাঁর বহিরাশ্রয়ী-আধুনিক সম্পর্কে প্রধান সমালোচনার বিষয়, তাকেই যথাসাধ্য ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিকের তন্ময়তায় কি মিলিয়ে দিলেন?

আজ সব কথা,
মনে হয়, তবু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।

(১২, 'জন্মদিনে')

অবশ্য এ-মিলন যদিও রবীন্দ্রনাথেরই আয়ুশ্চক্রলালিত এক মহৎ অবদানের, তবু নূতন আর পুরাতনের নির্দ্বন্দ্ব রূপ, শুধুই জীবনে কেন, কবিতারও যোগ্য হয়ে উঠেছিল একদিন, এ অতি নিশ্চিত। তবু বলতে হয়, বা অন্য যে-কেউই বলবেন, নিয়ত সৃষ্টিশীল রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় শেষের প্রহরটি পর্যন্ত

বাংলা কবিতার 'আধুনিকতা' সম্পর্কে একই সঙ্গে প্রসন্নতা ও বিরূপতার মিশ্র প্রতিক্রিয়াটি বজায় রেখেছিলেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক সংকলনটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সপ্রশংস অভিমতটি বুদ্ধদেব বসুকে জানিয়েছিলেন। প্রশংসা ও প্রশ্রয়ের মধ্যেও সে-চিঠিতে কাব্যের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার প্রসঙ্গও তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন: 'এই সর্বকালীন কবিতাগুলিকে কেন তোমরা আধুনিকের কোঠায় ফেলেছ তার একটা ব্যাখ্যা দরকার।' ব্যাখ্যা সংকলনটির ভূমিকাতেই ছিল. তিনি জানতেন। অনুমান করি, পরে সময়-সুযোগ করে তিনি হয়তো সেটা পড়েও ছিলেন। কিন্তু তৃপ্ত হয়েছিলেন কি? যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে এই চিঠি লিখছেন (দ্র. ২০ আগস্ট ১৯৪০-এ বুদ্ধদেবকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, পত্রসংখ্যা ৩১, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১), তার অল্প কিছু আগে, শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে সার মরিস গোয়ায়ার, কবিকে অক্সফোর্ডের ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের 'গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক ও ভঙ্গিসর্বস্ব' আধুনিক কবিতা সম্পর্কে যে হতাশ মন্তব্যটি করেন ও তার ভদ্রতাসম্মত জবাবে, 'সর্বজনীনতার' পুনঃ প্রত্যাবর্তন কোনোদিন ঘটবে বলে যে প্রতিশ্রুতি পান, তার কথা তিনি বিশেষভাবে বুদ্ধদেব বসুকেই জানান হয়তো এইজন্য, 'তা হলে সেই [পরিবর্তনের] হাওয়া বাংলা সাহিত্যে এসে প্রবেশ করবে এই আশা মনে পোষণ করি' (দ্র. পূর্বোক্ত পত্র)। এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে। আর তারও বছর নয়েক আগে রচিত হয়েছিল তাঁর সে-প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ, 'আধুনিক কাব্য' (১৩৩৯। 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত)। বাংলা কবিতার 'আধুনিকতা' উপলক্ষে তাঁর এই দুটি রচনা এবং পূর্বোক্ত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-নামক সংকলনটি সম্পর্কে সম্ভবত কবির সর্বশেষ মন্তব্য, তিরিশের দশকের বাংলা কবিতা সম্পর্কেই একটি আনুপূর্বিক অভিন্ন মানসিকতার পরিচয় দেয়। সংকলনটি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য এই রকম: 'দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকৃতি চেনা, তার প্রকৃতিও। তাহলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে, কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মরে যায় না· ·এই সংকলন-গ্রন্থে ··এখনো [এমনও?] অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কাল-শিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব বলে স্পর্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়—যে

জন্যে আপন পোষা জীবজন্তুর মধ্যে ইচ্ছা করে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক, স্বাভাবিক চিরকালের। অদ্ভুত আর অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান' (দ্র পত্র, ২২ আগস্ট ১৯৪০। 'মাসিক বসুমতী', মাঘ ১৩৫২)। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানীর এই নির্বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পাওয়া আধুনিক কবিতার নৈর্ব্যক্তিক, বস্তু-নিরীক্ষায় অন্তত শুধুই বাছাইয়ের কাজে লিপ্ত না-থেকে, কবির সমগ্র অনুপুঙ্খটির ভালোমন্দ তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধি স্পর্শ করেছে। সুন্দরী যুবতীর বিভঙ্গিম স্বাস্থ্য বা একটা সার্ডিন মাছের নশ্বর উজ্জ্বলতা যে-বীক্ষণ-প্রসাদে লাভ করে অনুভূতির মাত্রিক সাম্য, তেমন তদগত-দেখার বহিরঙ্গটি বাংলা কবিতার চতুর্থ দশকে তাৎক্ষণিক সাফল্যে উজ্জ্বলতর ছিল না হয়তো, কিন্তু তা যে আদৌ ছিলই না, এমন কথা কেউই বলবেন না। অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর তৎকালীন 'আধুনিক কাব্য'-সংস্কারের দ্বৈত-দ্বন্দ্বে, প্রায় তাঁরই অজ্ঞাতসার-অবচেতনে মেনেছিলেন যে-গ্রহণবর্জন, অন্তত 'নেড়ী কুকুরের ট্রাজিডি' লিখতে না-পারার অক্ষমতা ও কৈফিয়ৎ, সেই নীতিগত গ্রহণবর্জনের অবশ্যম্ভাবিতারই পরিণাম। একই সঙ্গে সাধ্যমতো সংযোগসাধন ও বিযুক্তিকরণের প্রবণতায় রবীন্দ্র-স্বকীয়তা, তারই উত্তরকালীন আধুনিকের যোগ্য প্রস্থানভূমি: এ-উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী প্রধানদের পারস্পরিক বোঝাপড়াতেই যথাকালে হয়েছিল।

৩

অতএব রবীন্দ্রোত্তর বিচ্ছিন্ন সাহিত্যিক-প্রয়াসে, ১৯৩০-এর আগেই অচিন্ত্যকুমার-ঘোষিত 'দুর্দান্ত সাহসের সে ষোড়শোপদিক কাব্য-উদ্যমটিকে যাঁরা মনে করেছিলেন কল্লোল-এর তরুণদের 'ম্যানিফেস্টো' রূপে, বা যাঁরা উল্লেখই করতেন তাঁদের রবীন্দ্রবিরোধী বলে, তাঁরা হয়তো সে-ধারণার উপলক্ষে উপস্থিত করতে চাইবেন সে-রচনার এই কয়েকটি পঙক্তি:

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে' পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।

('আবিষ্কার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত; 'কল্লোল', কার্তিক ১৩৩৬)

'পথরোধ' করে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আর সে-পথের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে

হলে চাই সজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে-যাওয়া। অর্থাৎ দূরত্ব গড়ে-তোলা। তা তাঁরা গড়েছিলেন। এবং এই একটু-একটু করে দিনে-দিনে গড়ে-ওঠা দূরত্বেরই অন্য নাম উত্তরাধিকার। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে ঐতিহ্যের সঙ্গে উত্তরাধিকারের যোগ শুধুই একটা ব্যবধান গড়ে-তোলার, বরং তার নিকট-দূর সম্পর্ক-রহস্যে, খুব কাছে থেকেও নিয়ত দূরের সঙ্গ বোধ করার মতো এক অনিবার্য আড়াল এমনিতেই ঘটে গেল।

রবীন্দ্রনাথ তো চেয়েছিলেন এই আড়াল স্বচ্ছ ও সুগম হোক। চেয়েছিলেন আপ্রাণ চেষ্টায় এই আধুনিকেরই সঙ্গে যুক্ত হতে। 'পুনশ্চ' থেকে 'শেষ লেখা', তাঁর সে-শেষের প্রহর, পদ্যেগদ্যে এমনি অফুরান ঐশ্বর্যে অভিনব, যা নিরন্তর পরিগ্রহণেও নিঃশেষ নয় আজও। সুতরাং, শুধুই দূরে যাওয়া নয়, খুব নিকট-সঙ্গের বাস্তবতায় দূরের নৈঃসঙ্গ্য ও আসঙ্গ, এই দুয়েরই মিশ্র যোগে চিহ্নিত ছিল সে-যাওয়া। এবং কে না জানে, এই প্রস্থান প্রধানত উত্তরসূরীদের নিজের-নিজের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠারই আন্তরিক তাগিদে।

তা সত্ত্বেও, আপাতদৃষ্ট তুলনায়, 'মর্মবাণী' ও 'বন্দীর বন্দনা'র বুদ্ধদেব এবং 'তন্বী'র সুধীন্দ্রনাথ যে-পরিমাণ রাবীন্দ্রিক, সে হয়তো প্রসিদ্ধিঘটিত প্রসঙ্গের চেয়ে পদ্ধতিরই অবচেতন-অনুসরণে, যদিও সুধীন্দ্রনাথ সে-রবীন্দ্র-অনুসৃতিকে তাঁর সজ্ঞান অনুশীলনেরই অন্তর্গত করে প্রসঙ্গোত্তীর্ণ স্বকীয়তায় পৌঁছতে চান। সে দিক থেকে, একদা 'অমাবস্যা'-খ্যাত অচিন্ত্যকুমার, প্রসঙ্গ তথা পদ্ধতিতেও, আরো-রাবীন্দ্রিক। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এঁর বিষ্ণু দে এর বিপরীত। 'প্রথমা'-র প্রেমেন্দ্র মিত্র ও 'খসড়া'-র অমিয় চক্রবর্তীও প্রকারান্তরে তাই। এবং 'ঝরাপালক'-এর জীবনানন্দ তিরিশের বাংলা কাব্যে অবিরল রাবীন্দ্রিকতার সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ। তবু 'তন্বী'তে সুধীন্দ্রনাথের বহিরঙ্গের রবীন্দ্র-অনুসৃতি সত্ত্বেও তাঁর স্বপ্রতিষ্ঠ স্বকীয়তার বিষয়ে প্রথম বলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তেমন সুনির্দিষ্ট করে না বললেও তিনি বুদ্ধদেবের কবি-কৃতিতে আস্থাবান ছিলেন। 'বন্দীর বন্দনা'-র বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ থেকে এমন কিছু বিভিন্ন নয়, ভাষায় কতকটা অনাবৃত স্পষ্টবাদিতা প্রকট হয়েছে বলেই তাকে 'বিদ্রোহ' বলা চলে না, বলা অসংগত—রবীন্দ্র-রোমান্টিকতা থেকে 'বন্দীর বন্দনা'র রোমান্টিকতার আমূল প্রভেদ। বরং ভাষায়, ছন্দে ও অলংকরণে, এমন কি অতিকথনেও, 'বলাকা' পরবর্তী রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে এ-গ্রন্থের আশ্চর্য মিল। অভিনবত্ব শুধু এই যে, মানবিক কামনাবাসনার যে-অভিপ্রায় আযৌন স্পর্ধার প্রতিমূর্তি, তাকেই স্ফীত ও ফেনিল করে বলা

হয়েছে, বলা হয় নি সেই স্ফীতি ও ফেনিলতার প্রতিস্পর্ধী সে-অনির্বচনীয়, যা 'বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ' রূপেও ব্যর্থ। তাই কাম কি করে নিষ্কলুষ প্রেমে রূপান্তরিত হবে—তার প্রতিজ্ঞা ও প্রার্থনা, বক্তব্য হিসেবেও তিরিশের দশকে খুবই পুরনো, কিন্তু পুরনো ভাবকে নূতনতর ভাষ্যে সঞ্চারিত করার শর্তে যে-আধুনিকতা তখনই এত বিশিষ্ট, তার যোগ্য প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে কি 'বন্দীর বন্দনা'? বুদ্ধদেব যখন লেখেন:

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর— ('বন্দীর বন্দনা', ঐ)

তখন, পরিশুদ্ধ প্রেমে কবির অহং যে 'নবজন্ম' সম্ভাবিত করে, তা পুরুষকার-স্পর্ধিত বলেই তার ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ একই সঙ্গে গ্রাহ্য ও উত্তীর্ণ, এবং এই উত্তরণেরই তাৎপর্য যদি হয় দেহসর্বস্বতার মুক্তি, তবে একথা না-বললেও চলে, ভালোবাসার এ-'অস্থিমাংসসহ' আমন্ত্রণে—'বন্দীর বন্দনা', বক্তব্য হিসেবে তেমন কিছু অভিনব নয়। সে বরং 'পূরবী'র রবীন্দ্রনাথকেও মনে পড়িয়ে দেয়, শুধুই উৎস বলে নয়, আমাদের প্রেম-সম্পর্কিত আধুনিকতার পটভূমি হিসেবেও।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।
('তপোভঙ্গ', 'পূরবী')

বিশ্বগত ও বিদেহ দৈবের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগত ক্ষুৎকাতর শরীর এমনিতরো সম্ভাষণে নিঃসাড় থাকতে পারে না। সে সাড়া দেয়। আর এই প্রত্যুত্তরেরই আবেগে উন্মথিত বুদ্ধদেবের বন্দীর বন্দনা। তার প্রকরণ পর্যন্ত 'বলাকা' এবং 'পূরবী'-র সীমালগ্ন, হয়তো তার অতিরেক, তবু বন্দনার প্রতি পঙক্তির তান-প্রধান মুক্তকের অনুক্ত ও অনিয়মিত অন্ত্যমিলে, নইলে কবিতার যে-গদ্যভাষা উত্তর-রবীন্দ্র-আধুনিকতার অহংকার, তা এখানে সর্বৈব অনুপস্থিত।

অপরপক্ষে, সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী' ও 'অর্কেস্ট্রা'-য় পূর্বোক্ত পরিগ্রহণের সীমা আনুষঙ্গিক। এমন কি 'অর্কেস্ট্রা'-র পরে, 'ক্রন্দসী' থেকে 'দশমী' (১৯৩৭-৫৬) পর্যন্ত স্বভাবতই সে-পরিগ্রহণের মাত্রা উত্তরোত্তর হ্রাস পেলেও, লক্ষণীয় যে, তাঁর জীবৎকালের শেষতম রচনা পর্যন্ত রবীন্দ্র-ঋণ সচেতনভাবেই স্বীকৃত। এই ঋণগ্রহণ যে প্রধানত রূপগত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে নয়, তা নিশ্চয়ই এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবু কৌতূহলী পাঠক নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদুটির মতো এমন বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে পারবেন, যেখানে সুধীন্দ্রনাথ পূর্বাপর স্বকীয়তায় স্বরভঙ্গিম, অথচ রচনার অন্তর্গত গীত-ধর্মে, তাঁর সুনির্বাচিত শব্দসংস্থানের ধ্বনিসংগতি ও স্পন্দ খুবই আন্তরিক ভাবে রবীন্দ্ররচনারীতির সামগ্রিক ধ্বনি-অনুষঙ্গের প্রভাব-প্রতিপত্তি শিরোধার্য করে নেয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রায় প্রতিটি ছন্দ-বাক্যেরই গঠন জটিল ধরনের, এবং তার প্রত্যেকটি পদ বা উপবাক্যের অন্বয়ে এমন এক-একটা প্রত্যাশা ও পুনরাবর্তনের ধ্বনিবেগ জন্ম নেয়, যা বিস্তারে ও সংহতিতে, আমাদের বাগভঙ্গিমার স্বরবৈচিত্র্যকে (modulation) নিয়ন্ত্রণ করে তাকে দিতে চায় সাংগীতিক ঐক্য। সাধারণত এ-রকম চেষ্টার পরিচয় তাঁর পয়ারবন্ধেই বেশি লভ্য। এখানে মাত্রাবৃত্তে-রচিত দুটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল।

মিছে প্রাণপণ, স্খলিত লগন
ফিরেছে কবে?
আজিকে প্রণয় মিছে অভিনয়,
পুরানো কাহিনী তুলে কি হবে?
ডাকেনা মোদের অজানার বাঁশী;
ফুলহীন মালা সুকঠিন ফাঁসি;
দুয়ারে বিকট প্রদোষের হাসি,
শুকতারা নিবে নভে;

থেমে আসে গান ; নিমিল নয়ান ;
ঘুমাও তবে ॥
('বাৎসরিক', 'তন্বী')

সহসা সবুজে আবীরের আভা লাগে,
মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যায় ঃ
নীলের বিকার ধূসর পূর্বভাগে ;
অলস সাগর, আকাশেও তার সায় ॥
দূর দিগন্তে সংবৃত শর্বরী,
শুক্র সুদ্ধ এখনও দেয়নি দেখা ঃ
নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী ;
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা ॥
('ভ্রষ্ট তরী', 'দশমী')

এখানে দৃষ্টান্ত দুটির অন্তর্গত শব্দে, যদি অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনির অনুষঙ্গটিই শুধু অনুসরণ করা যায়, তবে বারীন্দ্রিক আবহধ্বনিটি অনায়াসেই উপলব্ধ হবে। বিষ্ণু দে-ও এমন অনেক আবহধ্বনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সে কেবল অনুষঙ্গেরই (allusion) প্রয়োজনে। তাছাড়া, এ ব্যাপারে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এইখানে যে, রবীন্দ্র-অনুষঙ্গেরই উপলক্ষে, বিষ্ণু দে গোড়া থেকেই একটা স্বকীয় ধ্বনি-উদ্‌ভাবনার পরিচয় দেন। প্রচলিত বা অতি-ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অপ্রচলিত বা আভিধানিক শব্দসংঘাতের অনিবার্যতায়, তিনি প্রসিদ্ধিসূচক প্রয়োগের পাশেই জুড়ে দেন এমন-এমন স্বচ্ছন্দ চমক, যাতে কিনা তাঁর কবিতার প্রায় বাক্‌পর্বই একপ্রকার অভিনবত্ব পায়। এবং তখন আর সে-সব রচনায় বারীন্দ্রিক-অনুষঙ্গ মূল বা সমগ্রের ঐক্যসংহতির পক্ষে, প্রগত ও প্রক্ষিপ্ত নয় মোটেই, বরং একাত্মতার নিয়মে কবির স্বাতন্ত্র্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতারই সহায়ক। যথা,

পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্ত-ফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা ?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহ-দুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে, মহাশ্বেতা ॥
('মহাশ্বেতা', 'চোরাবালি')

স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথও এই 'চোবাবালি' প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন : 'বিষ্ণু দে যখন মাত্রাচ্ছন্দের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকেও নিজের সুরে বাজিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহ, তাঁর উৎকর্ষ স্বতঃপ্রমাণ, তিনি আমাদেব কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ ছন্দোমুক্তি যদিচ সাম্প্রতিক কাব্যের মূল সূত্র, তবু একজনের আলাপ-আলোচনা অন্যের থেকে বিভিন্ন শব্দের গুণে নয়, শব্দোচ্চারণেব গুণে ; এবং এই উচ্চারণপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য পদ্যের চেযে গদ্যেই সহজসাধ্য বটে, কিন্তু পদ্যেব সার্বিক ঐকতানেও যাঁর স্বকীয কণ্ঠস্বব চাপা পড়ে না, তাঁর বৈশিষ্ট্য নিশ্চযই অবিসংবাদিত।' এই 'শব্দোচ্চারণের গুণ' সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথও পূর্বাপর অবহিত ছিলেন, বিনযপূর্বক ববীন্দ্র-ঋণ স্বীকার কবেও তিনি যে-কাবণে স্বকীয ও স্বযংসম্পূর্ণ। আর এই ভাবেই রবীন্দ্রঐতিহ্য-প্রণোদিত সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে বাংলা কাব্যে তাঁদের স্বনির্ভব প্রগতিতে নিছক অন্তঃপ্রেবণার পরিবর্তে যুক্ত করেন প্রজ্ঞাব নন্দন।

তুলনায, বুদ্ধদেব বসু তাঁব সমসাময়িক কাব্যআন্দোলনেব অন্যতম প্রবক্তা বলে যতটা প্রসিদ্ধি অর্জন কবেন, হযতো সে-অনুপাতে 'উচ্চাবণপদ্ধতিব স্বাতন্ত্র্য' খুব অল্পই অধিগত করেন। তাঁব 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তব' (১৯৫৫) পর্যন্ত সে-'আত্মকীয' শিল্পসর্বস্বতার স্ববিরোধী ভূমিকা, সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্যপ্রগতিব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত একটা মন্থব চালচলনেব চিহ্ন গড়ে তোলে। এ অতি নিঃসন্দেহ যে, বক্তব্যে বাবীন্দ্রিক অতীন্দ্রিয-বোমান্টিকতার সংশ্রব থেকে তাঁর কবিতার সশরীর মুক্তি কমবেশি তৎক্ষণাৎ ঘটে থাকলেও, সেই 'বন্দীব বন্দনা' (১৯৩০) থেকে প্রায় পঁচিশ বছর, প্রকৃত অর্থে, কবিতাব শরীবিণী সত্তা আবিষ্কাবে তিনি ঐতিহ্যানুগ পবিগ্রহণ ও পরিবর্জনের নির্দিষ্ট সীমা নির্ণযে নিঃসংশয হতে পারেন নি। তাই বচনাগত অতিশিথিলতা ও অতিকথনেব ভার তাঁকে যে-পবিমাণ বিবৃতিনির্ভব করেছে, ঠিক সেই পরিমাণেই সময ও ব্যক্তিত্বেব পরিপূরক উচ্চারণ-স্বাতন্ত্র্যে শিল্পিত কবে তুলতে পারে নি।

রবীন্দ্রঐতিহ্যে অনুগত থেকেও যে-কালে অপবিহার্য ছিল যে বহিরাশ্রয়ী আধুনিক, তার প্রতি বুদ্ধদেব তাঁব সক্রিয মনঃসংযোগ খুবই আলগা ও অসংলগ্নরূপে উপস্থিত করেন। এমন কি তখনকাব এলিযট-প্রভাবিত নৈর্ব্যক্তিকেব বিরুদ্ধে তাঁব একান্ত আত্মকেন্দ্রিক কলাকৈবল্য, বাংলা কবিতায যৌনচেতনায সাশ্রয ঘটিযে থাকলেও, সে-আত্মরতিব সম্মোহন, অন্তত পঁচিশ বছব (১৯৩০-৫৫), তাঁবই শিল্পেব বন্দীত্বকে প্রায স্থায়ী ও পাকা করে ফেলে।

ফলে, 'প্রথম দ্রষ্টা তিনি, কবিদের রাজা, এক সত্য দেবতা'-র প্রকৃত সন্ধান পেয়ে, বুদ্ধদেব যে-জন্মান্তর লাভ করেন তাঁর 'যে-আঁধার আলোর অধিক' কাব্যগ্রন্থে, সে-আধুনিকতা বহিরাশ্রয়ী বলেই তিনি কাব্যের মুক্তি সম্পর্কিত দেশীয় পুরাণ ও বৈদেশিক বিজ্ঞানধর্মের সমন্বয়রূপে, শিল্পিত অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিকতাকে অবশেষে স্বতঃসিদ্ধ করে দেখাতে পারেন।

আমি কে, তা মনে রেখো। সহজেই লক্ষ্যবেধ করে,
না-বুঝে, প্রথম বার, তারপর থেকে সহজেরে
অসহ্য আত্মীয় জেনে কেবল খুঁজেছি ঘুরে-ফিরে
মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীরে।
দেয় না সে আশ্রয়, প্রমিতি, প্রজ্ঞা ; তাই তো আমার
পৌঁছবার তৃপ্তি নেই, আছে নিত্য-আবদ্ধ যাত্রার
আবর্তন ;

* \ \

সব সত্য।—কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান,
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেইক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।
('শিল্পীর উত্তর', 'যে-আঁধার আলোর অধিক')

৪

ঈষৎ ভিন্নতর আর ব্যবহারিক তাৎপর্যে, যদি সে-রথ, রথী ও সারথির উপমাকেই রবীন্দ্রোত্তীর্ণ বাংলাকাব্যের নিয়তি বলে মানি, তো একটা সময় নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়ে ওঠে, যার একদিকে নিস্পৃহতার ও অন্যদিকে নিঃশেষিত সে-রিক্ততার রূপ অবশ্যই প্রকট হয়। ১৯৩০ আর ৪১-এর মধ্যবর্তী কুশীলবদের কে রথী আর কে সারথি তা সচেতন পাঠকমাত্রেই জানেন। সারথী রবীন্দ্রনাথের অকৃপণ স্নেহধন্য সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে হয়তো বুদ্ধদেবই সেই স্বেচ্ছানির্বাচিত রথীর ভূমিকাটি আনুপূর্বিক পালন করেন, কিন্তু 'নিস্পৃহ' সারথি ও 'নিঃশেষ অর্জুন'-এর সে-মৌষলপর্বকে তিনি স্বয়ং বিবৃত করেন এক দশক পরে। ততদিনে,

সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আর বুদ্ধদেব সে-মায়াবনবিহারিণী নিমিত্তচেতন হরিণীর পশ্চাদ্ধাবনে কেবলই বেপথুমান ও ক্লান্ত, তবু 'নিত্য-আবদ্ধ যাত্রার আবর্তন'-এ স্পন্দিত হতে থাকেন। এবং, যে-আঁধার আলোর অধিক, সেই তমসার তীরে অবশেষে উপগত হন।

অন্যদিকে, রচনার প্রাথমিক স্তরেও, অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'খসড়া' আর 'একমুঠো'-য় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীনতা ও অনিবার্য তমঃপ্রভাবে গড়ে তোলেন বাংলা কবিতার বহির্বিশ্ব, তার নেপথ্যে রবীন্দ্র-অনুধ্যান সঙ্গত কারণেই প্রচ্ছন্ন। তার অনেক বেশি প্রতিস্পর্ধিতায় যে-ছন্নজীবনের ভাষ্য রচিত হয় 'চেতন স্যাকরা'-র উপলক্ষে, সে-অনিবার্যতারও মূলে এলিয়টের কাব্যাদর্শ নিশ্চয়ই কাজ করে। এবং সে-হয়তো এমন কাজ যা একই সঙ্গে আমাদের ভাষায় পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের বাস্তবকে যুগপৎ দেশীয় ও বৈদেশিক সহাবস্থানের একাত্মতায় অপরিহার্য করে তোলে। এই অপরিহার্যতার একটি বিস্ময়কর দিক কাব্যভাষা; যা-কিনা ৪০-এর আগেই বাংলা কবিতার শরীর ও অন্তরাত্মাকে তথাকথিত রাবীন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে এমন স্বয়ম্ভর করে তুলেছিল। প্রসঙ্গান্তর ভিন্ন প্রকরণের পরিবর্তন হয় না, বিশেষ ভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, এ-তথ্য বাংলা কবিতার তিরিশের দশকে, অত্যন্ত সরবে প্রমাণের প্রয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ থেকে দূরে সরে-যাওয়ার মনোভঙ্গিটি যে সমসাময়িক দেশকাল পটভূমির ওতপ্রোত নিরীক্ষায় ও মননে, ক্রমেই কোনো অনিবার্য বহিরাশ্রয়িতায়, ব্যাপকার্থে, পরিগ্রহণের তাৎপর্যকেই পরিস্ফুট করেছে তা অতি সুনিশ্চিত। আর সেই চেষ্টার সঙ্গে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের যোগ এতই নিগূঢ় যে, তৎকালীন রবীন্দ্র-রোমান্টিকতার আপাত-বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, সে-বিরোধ প্রধানত কবির অতীন্দ্রিয়তারই বিরুদ্ধে, শুধু এ-কথা বলতেও আজ দ্বিধা জাগে। বস্তুত সে-রোমান্টিক-অতীন্দ্রিয়তার বিরুদ্ধে যে-ইন্দ্রিয়সঘন বাস্তব আমাদের রবীন্দ্রোত্তীর্ণ কাব্যে অপেক্ষিত ছিল, তার দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব রবীন্দ্রনাথ থেকে কমবেশি পৃথক হলেও, সে-নিশ্চয়ই একটা উত্তরণের পর্যায় বিশেষ, এবং রবীন্দ্রনাথই তার মৌলিক উৎস। এইদিক থেকে, আমাদের প্রাথমিক রোমান্টিক-বিরোধিতাও, প্রকারান্তরে, ধারাবাহিক রোমান্টিকতারই প্রতি ক্রমাগত আত্মসমর্পণ।

জীবনানন্দ যে-কালে লিখেছিলেন—

আমার পায়ের শব্দ শোনো,—

নতুন এ—আর সব হারানো—পুরোনো।

('কয়েকটি লাইন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

তখনো, সে-'হারানো-পুরনো'-র স্মৃতিবিজড়িত বাংলা ভাষায় নতুন পদক্ষেপের পটভূমিটি হয়তো অস্থির নয় তত। যেহেতু, সে-নব্যপ্রস্থান আমাদেরই দেশজ অভিজ্ঞানে, বোধ ও অভিজ্ঞতার পরিধিকে একই সঙ্গে সহজ ও দূরদুর্গমের বিস্তীর্ণতায় স্থিতপ্রতিষ্ঠ করে। চিরচেনা নৈসর্গিকের ভাষ্য বদলে, যে-ইমপ্রেশনিস্ট-মনোভঙ্গির প্রবর্তনা ঘটে বাংলা কবিতায়, সে-পথেরও অগ্রণী পথিক জীবনানন্দ। অবশ্য সে-পদক্ষেপও যে পুরনো পথরেখারই সূত্রে কোনো বাঞ্ছিত নূতনত্বে পৌঁছনো, এর প্রমাণ তাঁর রচনাতেও লক্ষণীয়।

নদী, তুমি কোন্ কথা কও ?
তুমি যেন ছোট মেয়ে—আমার সে ছোট মেয়ে
যত দূর যাই আমি—হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে-পিছে আস,
তোমার ঢেউয়ের শব্দ শুনি আমি : আমারি নিজের শিশু সারাদিন
নিজ মনে কথা কয় (যেন)।

('নদী', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'-তে আদিজননী সিন্ধুর কোলে এই পৃথিবী যেমন ছিল, সিতকন্যাটির মতো, তার বয়স আর কত, বছর চারেকের বয়সিনী সে, যখন তার দিব্য উচ্চারণে কোথাও অভিমানকে দেয় এক মানবীয় বাণীরূপ, তখনো, তা 'বিশ্বের অবোধ বাণী'-রূপেই ব্যাপ্ত হয়। এই উপমার অন্তর্গত শিশুটিকে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ দুজনেই 'নিজের শিশু'র মতো জানেন। এবং সঙ্গত কারণেই, উত্তরাধিকারের আত্মীয়তায় জীবনানন্দ সে বিশ্বপ্রকৃতির 'বোবার ইঙ্গিত ভাষা'টি অধিগত করেই তার অন্তর্নিহিত বাকপ্রতিমার ইমপ্রেশনিস্ট-রূপটি প্রকট করেন—

একপাল মাছরাঙা নদীর বুকের রামধনু
বকের ডানার সারি শাদা পদ্ম - নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে
মানুষেরা সেই সব দেখে নাই।

(ঐ, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত 'মানব হৃদয়-সিন্ধুতলে যেন নব মহাদেশ'-এরই মতো সে-দুর্জ্ঞেয় আর 'নিস্তব্ধ পদ্মের দ্বীপ নদীর ভিতরে'—কবিরও অবচেতন

জলমগ্ন ভূখণ্ডটি এইভাবে মানুষকে কাছে ডাকে। কিন্তু 'মানুষেরা সেইসব দেখে নাই।' সুতরাং, জীবনানন্দ তাঁর মানুষী-অভিজ্ঞতাকে পরাবাস্তবের অন্তর্গত করে, বাংলা কবিতায় এক দৃশ্যঘন আয়তন রচনা করেন, যা অতঃপর রাবীন্দ্রিক-অতীন্দ্রিয়তারও প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। কিন্তু সে অন্য অর্থে। তার আগে, প্রথম, জীবনানন্দ যথার্থই লক্ষ করেন যে, 'রবীন্দ্রকাব্যে রয়েছে একটি বিস্তৃত যুগের প্রাণপরিসর এবং এমন অনেক কিছু যা সময়াতীত।...তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে।' অপরপক্ষে, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতায় সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা, তথা ঐতিহ্যবোধের যে-ট্রাজিক চেতনা, ক্রমেই একটা বিপরীত সংস্থান ও গুরুত্ব লাভ করে, তার সঙ্গে তুলনায়, রাবীন্দ্রিক পূর্ণতার সাধনা ও আধুনিকদের ক্ষয়িষ্ণুতার সুরের বিসদৃশতা, স্পষ্টতই গড়ে তোলে একটা বিরুদ্ধতার দিক। জীবনানন্দ বলেন, 'দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্য আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে।' এবং সমকালীন প্রবণতায়, 'ভাবাবেগ ও রোমান্টিসিজমকে সংহত করে' এবং 'হৃদয়ের ঈষদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি'-র তাড়নায়, তাঁর মতো অনেকেরই যথা সময়ে এই উপলব্ধি ঘটে যে, 'রবীন্দ্রকাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে।' এই 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' সূত্রেই আমরা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিটি বিচার করতে চেয়েছি।

তিরিশের যুগেই অবশ্য আধুনিক বাংলা কাব্যে রাবীন্দ্রিক প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার যে-অবনমন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, তা সে-যুগের ক্ষয়িষ্ণুতারই এক বিধুর মনোভঙ্গি। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশকালের বিচিত্রতর সংঘাত-সংঘর্ষে উপজাত রবীন্দ্রোত্তর কবির আত্মিক সংকট প্রকট হয়ে পড়ে।

দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখে ঠোঁটে অসুবিধা,—ভিতরে অসুখ।
কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে।—
এ ঘুমোনো মেয়ে
পৃথিবীর,—ফোঁপরার মত করে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে!...

('পরস্পর', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

রূপকথা-সুলভ 'পরীর মতন এক ঘুমোনো মেয়ে'র প্রতীকে বাংলা কাব্যের

রোমান্টিকতা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে এসেছে বলে কবি তাকে এক লুপ্তপ্রায় প্রতিমার মতো লক্ষ্য করেন—

জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,—
আজো এত চুল।
চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, কখানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;
চোখ দুটো চূর্ণ-চূর্ণ,—মুখ খড়ি-খড়ি।
থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি।

(ঐ)

এই মেকি আর মৃতকল্প রোমান্টিক-আবহের ক্ষীয়মান রূপে ক্লান্ত কবিহৃদয় নষ্ট হয়ে যায়। উদ্যমহীন, নিরুৎসাহ জীবনে, মননবিক্ত অবসাদের ভারে পৃথিবী পরিণত হয় 'মায়াবীর নদীর পারের দেশ'-এ, যা-আসলে পার্থিব চেতনা ও নিশ্চেতনারই কোনো মধ্যবর্তী মানসিক স্তরমাত্র। জীবনানন্দ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র এই ধূসরতর মানসিকতার পরিচয় নির্দেশ করতে গিয়ে লেখেন—

এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর,
রাখিবে না চোখ আর নয়নের 'পর ;
ভালোবাসা আসিবে না—
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।

('অবসরের গান', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই নির্মনন ও প্রায় নিরস্তিত্বমূলক জৈবের বিরুদ্ধে মানব মনীষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার আনুপাতিক পরাভবের শোচনীয়তায় কবি যে নিশ্চেতনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, বলতে গেলে, সেও কোনো দিব্যচেতনায় পৌঁছবারই প্রস্তুতি হয়তো, যা অবশেষে কবির স্বপ্ন, প্রেম ও সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতার স্তরগুলি উত্তীর্ণ হয়ে মস্তিষ্কপ্রসূত একটি বোধের জন্ম দেয়। এবং সেই বোধও যেহেতু মস্তিষ্ক-প্রসূত কল্পনা ও মনীষারই সন্তান, তাই তাদের প্রকৃতিগত বিরোধের ধারণাটি আপাতত অবাস্তব। জীবনানন্দের এই বিশিষ্ট বোধ তার দেশকাল-প্রভাবিত সমাজবাস্তবতায় যে-বিচ্ছিন্নতার কথা বলে, তা মানুষেরই কোনো মৌলিক ট্রাজিকচেতনাসম্ভূত, যথা, 'কোনো নিশ্চয়তা কে জানিতে পারে আর ?'— তথাকথিত স্বচ্ছন্দ জীবনের অলীকতায় আস্থাহীন কবিচিত্তে, স্বভাবতই এ-যুগের জটিল ও দুর্ভেদ্য মানবিকতার বিপর্যস্ত রূপ যে ব্যক্তিমানবকে তার

একাকিত্বের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে দেয়—এই সত্য, অন্তত রোমান্টিক-অহৈতুকীর বিপরীত তাৎপর্যে, বাংলাকাব্যের রবীন্দ্রোত্তীর্ণ ভূমিকাটিকে সুস্পষ্ট করে দেয়। এই প্রবণতা যদি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার সাধনা থেকে স্খলিত নিছক ক্ষয়িষ্ণুতার অনুশালন বলেই আখ্যাত হয়, তবুও, সে-দৃষ্টিভঙ্গির আনুগত্য প্রধানত দেশকালেরই অমোঘ প্রতিক্রিয়ায়। এবং সে-প্রতিক্রিয়া আপাতদৃষ্টে নেতিবাচক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে, জীবন ও জগৎ-পরিপার্শ্বের প্রতি দ্রষ্টার নিরীক্ষাশক্তি যে নিষ্ফল নয়, সে-সংকল্পের ব্যঞ্জনা ক্রমেই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

—করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?
চোখে কালোশিরার অসুখ,
কানে যেই বধিরতা আছে,
যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নস্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।

('বোধ', ধূসর পাণ্ডুলিপি)

রবীন্দ্রকাব্যের তুলনায় জীবনানন্দ তাঁদের আধুনিকতায় যে-দৃষ্টিভঙ্গির 'ব্যতিরেকী গতি'র উল্লেখ করেন, সেটা তাঁদের 'ইতিহাসচেতনা' ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানের' অনিবার্যতায় সংঘটিত হলেও, তাঁদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক উদ্যম সংগত কারণেই রবীন্দ্রকাব্য-'অনুভাবিত'। অবশ্য এই অনুভাব তাঁদের নিত্যসঙ্গী ছিল বলেই তাঁরা রবি-প্রদক্ষিণের মারাত্মক প্রবণতায় আকৃষ্ট না-হয়ে, যথা-শীঘ্র স্বয়ম্ভব হয়ে উঠেছিলেন। তবু, 'ক্ষয়িষ্ণুতার সুর'-ই সে-স্বয়ম্ভবতার অন্যতম মূলধন বলে, আজ 'রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয় তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী ভয়াবহ ভাবে চমৎকার!'—জীবনানন্দ তাঁর সমসাময়িক অনেকের চাইতেই এই মানসিক অগ্রসরতার উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন এবং 'বর্তমান সমাজ ও ইতিহাসের দিক দিয়ে এ বিষমতা দুরতিক্রম্য হয়ে উঠেছে—' সে-কথাও পুনঃপুনঃ স্মরণীয় করে তোলেন। তথাপি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক

কবিতা শুধুই 'ভঙ্গুর বা প্রচারবিষয়ী' কেন, কেনই বা তা চূড়ান্ত রূপে নিছক পূর্বকল্পিত কোনো ধারণায় বদ্ধমূল হবে—এ-প্রশ্ন তিনি জীবন ও শিল্পের পরস্পর নিঃসক্ত প্রয়োজনেই উল্লেখ করেন। তিনি আমাদের সতর্ক করেন এই বলে—'সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হলেও কবিতা ও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়েও যদি তাকে প্রয়োগপ্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো-না-কোনো একরকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা, না দিতে পারে তাহলে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না।'

না বললেও চলে, এই 'কোনো-না-কোনো একরকম সঞ্চার' ও 'ইঙ্গিতের দিব্যতা' যে-কোনো সফল বা 'সার্থকপ্রায়' কবিতারই অন্তরঙ্গ সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ যে-বিশুদ্ধ আধুনিকতার সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করেন, তাকেও 'শাশ্বতভাবে আধুনিক' হয়ে উঠতে হয় এই 'সঞ্চার' ও 'ইঙ্গিতের দিব্যতায়'। 'ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা'-র ভিতর যে-তন্ময় নিরীক্ষাশক্তি আমাদের ক্ষয়িষ্ণুতাদুষ্ট সমাজবাস্তবকেও যথাসম্ভব শিল্পিত করেই উপস্থিত করে, রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যে তার সফলতর উদাহরণ জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথের 'শাশ্বত আধুনিকের' আশ্রয়ে পুষ্ট হতে না-পেরে একদিন অবশ্য বাংলা কবিতার বহিঃসংঘাত প্রবল হয়েছিল। তখন কারো-কারো এই মনে হতো, রবীন্দ্রকাব্যের প্রতি পরিবর্জনের মনোভঙ্গিটি সুদৃঢ় করতে হবে। না-হলে বহিরাশ্রয়িতার ধর্ম তার কোনোই কাজে লাগবে না। অবশ্য মাত্র দু-এক দশকের মধ্যেই পরিবর্জনের মাত্রা সম্পর্কে প্রায় সকলেরই মনঃস্থির হয়ে গিয়েছিল। তখন আর মনে হয় নি, পরিগ্রহণের জন্য প্রয়োজন শুধু আঙ্গিক উপমার। সে যে নিশ্বাস বা অস্ফুট গুঞ্জনেরও আবহটুকু কখনোই নিঃশেষ হতে দেয় না, রবীন্দ্রঐতিহ্যের প্রতি আমাদের এ-যাবৎ সকল প্রকার পরিণত-আনুগত্য ও মহৎ-বিরুদ্ধতা তারই বিচিত্র ও বিস্তৃত প্রমাণ দিয়েছে।

আমরা যদি চাই তো রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের বিরুদ্ধ-তুলনা দ্বারাও এমন এক সত্যের কাছাকাছি আসা যেতে পারে যা শুধুই ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সনির্বন্ধ বলে নয়, হয়তো তারও বেশি, বিরোধাভাস আমাদের গ্রহণবর্জনের নীতিকে দূরত্বভ্রমে মিলিয়ে দেয় উত্তরণযোগ্য বলে। এই সত্য রবীন্দ্র ও উত্তর-রবীন্দ্র কাব্যক্ষেত্রে যতই কেন না দৃষ্টিভঙ্গির বিষমানুপাতিক পার্থক্যে সুদূর ও বিধুর বলে গণ্য হোক, তবু এই 'ব্যতিরেকী গতিভঙ্গি' যে

আসলে একটা বড বকমেব উৎস থেকে অনেক ছোট-ছোট ভূখণ্ডসমবাযের জ্ঞাত-অজ্ঞাত দিঙমণ্ডলেব কেন্দ্রে পৌছনো, সেটা 'ববীন্দ্রনাথের নিতান্তই নিজস্ব জিনিস নিযে আধুনিকেব বোঝা-পডা'-ব মতো সংঘর্ষময অথচ অনিবার্য এক ঘটনা।

স্মৃতিজীবিতেব বোমান্টিক আকুলতায়, তাঁব পূর্ণতার সাধনক্ষেত্র থেকে যখন ববীন্দ্রনাথ লেখেন—

ছাযাতে যা লীন হল তাবে খোঁজে নিষ্ঠুব আলোতে।
শীতবিক্ত শাখা ছেডে পাখি গেছে সিন্ধুপাবে চলি,
তাবি কুলাযের কাছে সে-কালেব বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে-তাবকা অস্তে গেল দূবে
তাহাবি স্পন্দন ও-যে ধবিযা এনেছে নিজ সুরে।

('পুবাতন', মহুযা)

তখন সে-বোমান্টিক প্রতিবেশেবই প্রতিক্রিযায, পূর্ণতাব আকাঙ্ক্ষা ও আশ্বাস থেকে দূবে, জীবনানন্দ এক ভিন্নতব বিধুব অনুষঙ্গে বলেন—

সকল যেতেছে চ'লে,—সব যায় নিভে—মুছে—ভেসে—
যে-সুব থেমেছে তাব স্মৃতি তবু বুকে জেগে বয!
যে-নদী হাবাযে যায অন্ধকাবে -বাতে—নিরুদ্দেশে,
তাহাব চঞ্চল জল স্তব্ধ হযে কাঁপায হৃদয়!
যে মুখ মিলাযে যায আবাব ফিবিতে তাবে হয
গোপনে চোখেব 'পবে,—ব্যথিতেব স্বপ্নেব মতন।
ঘুমন্তেব এই অশ্রু—কোন্ পীডা—সে কোন্ বিস্ময
জানাযে দিতেছে এসে।—বাত্রি-দিন আমাদেব মন
বর্তমান অতীতেব গুহা ধ'বে একা-একা ফিরিছে এমন।

('অনেক আকাশ', ধূসব পাণ্ডুলিপি)

ববীন্দ্রনাথ ক্রমান্বযে যে-সত্য ও-বিশ্বাসেব সম্মুখীন হযে এবং তাব অনন্ত পবিধিব ভিতব উৎসৃষ্ট হতে গিযে তাঁর আত্মস্বরূপকে যে বিবর্তনশাল স্বযং-সম্পূর্ণতাব পবিণতিদান কবেন, তত বড বোধেব জগৎ অবশ্যই আব আধুনিকদেব আযত্তাধীন ছিল না। ততদিনে আপাত-গোষ্ঠীভুক্ত বিচ্ছিন্নতাব জন্ম হযেছে, যাকে জীবনানন্দ ক্ষযিষ্ণুতাদুষ্ট সমাজনিরীক্ষাব প্রতিক্রিযা বলে উল্লেখ কবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, নির্বিশেষ থেকে বিশেষেব এই একমুখিতায়, 'বিশ্ববহস্য' সম্পর্কে 'মহদুক্তি কববাব মতো ভাবনাপ্রতিভাব

একান্তই অভাব' বলে, জীবনানন্দ কি নিশ্চেষ্ট ছিলেন তাঁর 'স্বাবলম্বনের বিবর্তনে'? বস্তু থেকে যে-নির্বস্তুক স্মৃতির স্থিরতর রূপ তিনি লক্ষ করেন, তার রূপান্তর উত্তর-রবীন্দ্র যুগের মৃত্যুচেতনায় পর্যবসিত। আমরা উপলব্ধি করি এই চেতনার দেশকাল-সম্ভূত সে-অনিবার্য কার্যকারণপরম্পরা; অন্তত জীবনানন্দই তাকে এমন ভাবে 'অনন্ত সময়গ্রন্থির' আধারে স্থাপন করে তার সর্ববিধ পরাভব ও খণ্ডিত শোচনীয়তার মধ্যেও খুব ধীরে জ্বালাতে পারেন একটি দেশলাই কাঠি, এবং একের পর এক এমনিতর ব্যর্থ ও ক্ষীণ প্রজ্বলন প্রয়াসে—হয়তো কোনোদিন জ্বলে উঠবে আলো ও আগুন—এই আরাধনা-শীল প্রতিজ্ঞা। যে-আলো ও-আগুন প্রধানত আত্মসাক্ষাৎকারের, সে-বিষয়ে দিন আর রাতের আলোর রকমফের আমাদের খুব বেশি চেনাজানা রূপকের মধ্য দিয়েও কখনো সরল সত্যের রূপ নেয়। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেন—

ধীরে ধীরে দাও আঙিনায় আনি
একলারই দীপখানি,
মুখোমুখি চাওয়ার সে দীপ,
কাছাকাছি বসার,
অতি-দেখার আবরণটি খসার।
সব-কিছুরে সরিয়ে করো
একটু-কিছুর ঠাঁই—
যার চেয়ে আর নাই।

('সন্ধ্যা', সেঁজুতি)

একলার সুর ও আলোর এই অন্তরঙ্গ রোমান্টিক অভিনিবেশসহ রাবীন্দ্রিক অতীন্দ্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ না-হয়েও জীবনানন্দ সে-পরিধির গুরুত্ব ও গভীরতা অবশ্যই অনুভব করেন। এবং বিশ্বস্ত অথচ মর্মঘাতী অভিজ্ঞতার দিকে তিনি অনেক বেশি প্রজ্জ্বলন-শক্তি ঘনীভূত করেন। এই শক্তি রবীন্দ্র-উৎসজাত। অবশ্য তার বিস্তৃত ও ব্যাপক প্রয়োগক্ষেত্রে রবীন্দ্রোত্তর স্বাবলম্বিতার নিবিষ্ট উচ্চারণভঙ্গি ও স্ববিরোধী ভূমিকা তাকে স্বভাবতই জটিল পরিপ্রেক্ষিত দান করে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে;
কি এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।

('সবিতা', বনলতা সেন)

এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতটি যদি হয় এই রকম—

অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিডোনো খেতের কাজ ক'রে যায় ধীরে,
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে ব'সে।

('আবহমান', শ্রেষ্ঠ কবিতা)

তবুও,

একটি আলোক নিয়ে ব'সে থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে ;

(ঐ, শ্রেষ্ঠ কবিতা)

রবীন্দ্র-প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার সঙ্গে আমাদের একালীন প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার মৌলিক বিরোধের স্পষ্টতা সত্ত্বেও তার যোগসূত্র কোনো-না-কোনো ভাবে স্বীকৃত হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতের পরস্পর ভিন্ন জটিলতায় জীবনানন্দও নিশ্চয়ই তাঁর সমসাময়িক কবিদের মতো 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সাহিত্যস্বভাব ও সময় স্বভাবের বিরুদ্ধে' যতটা যাওয়া দরকার হয়তো অন্যদের চাইতে তিনি তার বেশিই গিয়েছেন। তবু অন্যান্য সহগামী কবিদের রচনায় যা খুবই বিরল, নয়তো অস্পষ্ট, সেই সংগতিসাধক অপরিহার্য সত্যস্বরূপ সময়চেতনাকে তিনি দিতে পারেন এমন একটা মহৎ ব্যাপ্তি, যার তুলনা রবীন্দ্রকাব্যের সময়োত্তীর্ণ বিশ্বচেতনারই সগোত্র। দেশকাল-সমাজ বাস্তবতার প্রত্যক্ষতায় কমবেশি আলোড়িত হয়েও কবিকে তাই সময়াতীত পথ প্রদক্ষিণে নেমে পড়তে হয় কবিতারই শর্তে, যেহেতু কবিতা—জীবন ও সমাজ-সম্পর্কশূন্য একখণ্ড পাথর কি আকাশের অসম্ভব ফুল নয় কখনো।

আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে,
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ্ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব।

(১১, জন্মদিনে)

জীবন ও পার্থিবতার নিম্নভূমি ছাড়িয়ে কবিতার এই ঊর্ধ্বগ পরিণতি, সেটা কেবল রবীন্দ্র-উপলব্ধিতে সান্ত ও অনন্তেরই একটা নিষ্পত্তিসূচক নির্বিশেষ রূপ বলে নয়, বুদ্‌বুদের খণ্ডিত অস্থির উপমায় সে-অখণ্ড কালপ্রবাহটিকে

কবি বিষয় ও বিষয়ীর অদ্বৈতেও পরিণত করেছেন। তুলনায়, জীবনানন্দ সে-মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজীবন-পরিধি থেকে উত্তরাধিকারবলে যা-অর্জন করেন—তা হয়তো 'ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম, যাকে তিনিও 'অনন্ত সময়গ্রন্থি' ছাড়া কল্পনাই করতে পারেন না।

এক—দুই—শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চলে গেছে কোন সব মানুষের দেহ।
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম,—
তোমরা শতকী নও;
তোমরা তো উনিশ শো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নবনারী কলরোলে আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও; অনাদির ইতিহাসসহ।
('পৃথিবীর রৌদ্রে', বেলা অবেলা কালবেলা)

'রবীন্দ্রের সৃষ্টিরহস্যোৎসারিত' সে-'দায়িত্বপূর্ণ মহদুক্তি'-দ্বারা প্রাণিত হয়েই জীবনানন্দ তাঁদের 'স্বাবলম্বনের বিবর্তনে' আধুনিক কবিতার ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিত দান করেন, এ-সত্য জীবনানন্দের পরেও, আমাদের আরো-আধুনিক হয়ে-উঠবার অন্যতম প্রধান বিষয় নয় কি?

৫

একদা সমর সেন তাঁর 'তিন পুরুষ (১৯৪৪) নামক একটি চটি কবিতা পুস্তিকায় যখন ঘোষণা করেন 'আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কসিস্ট', তখন সে-কেবল ঘোষক ও ঘোষিতের মধ্যেকার স্থায়ী বিচ্ছেদেরই সকাতর উক্তি বলে উপহসিত হয়, অন্তত হয়েছিল তখন। 'মার্কসিস্ট' কবির আত্মপক্ষ সমর্থনের সে-তির্যক কাব্যোক্তিটি ছিল তখন এইরকম—

অনেকে জিজ্ঞাসা করে; গুরুদেবের সঙ্গে
তোমার তফাৎটা কী? তফাৎ এই:
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকায়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন

কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে তাই আমার বিশ্বাস।

('সাফাই', তিনপুরুষ)

চল্লিশের কটাক্ষনিপুণ ও ব্যঙ্গপ্রবণ আধুনিক মনোভঙ্গিতে সমর সেন যে-রোমান্টিকতাকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, সে-ছিল অনেকটা অকবিতার জোর, যা-আসলে জোরই নয়। তবু তার প্রধান উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথ, যেহেতু বিপরীতপন্থার পক্ষেও সেইটেই কেন্দ্রবিন্দু। চল্লিশের দশকের গোড়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন স্বদেশে, হয়তো পরিপ্রেক্ষিতেরই অভিযানে, কবি ক্রমশ কবিতা থেকে দূরে সরে গিয়ে যে-বাকসর্বস্বতাকে প্রশ্রয় দেন, সে-প্রবণতাকে জীবনানন্দ যদি বলে থাকেন 'প্রচারবিষয়ী', তো সেটা যথার্থই বলেছেন। রাজনীতিক অভিসন্ধি থেকে প্রচারাত্মক প্রসঙ্গও যে-তির্যক বাকসিদ্ধি কমবেশি লাভ করে, সমর সেন সে-পথে খুব অল্পই অগ্রসর হন। বরং 'পদাতিক'-এ (১৯৪০) সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা কবিতার বস্তুপ্রধান চারিত্রকে তার সমানুপাতিক রূপরীতির চাতুর্য ও অভিনবত্বে রাজনীতিচেতন কবিকর্মকেও স্মরণীয় করে তোলেন। এই স্মরণীয়তায় এদেশের সামঞ্জস্যপরায়ণ তথা স্ববিরোধী রবীন্দ্র-মুহূর্তগুলিই অল্পবিস্তর যে সম্প্রসারিত হয়, সে-তথ্য 'পদাতিক'-এও লভ্য। কিন্তু সমর সেন ১৯৪০-এর আগেই তাঁর নিজের মতো করে সে-রোমান্টিক মনোভঙ্গিটি পুনরাবিষ্কৃত করেন।

কর্কশ রঙে ভরে গেল বিকেলের পৃথিবী,
অনেক কাক উৎকণ্ঠিত ফিরে এল ঃ
আসন্ন হেমন্তে
মৃত্যু সহসা ঝুঁকে পড়ে চারিধারে ;
নিঃসঙ্গ বট
যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত।

('পলাতক', সমর সেনের কবিতা)

হেমন্ত-গোধূলির কুয়াশায় বিকেলের পৃথিবী রেখে যায় যে-কাকের ওড়াউড়ি, তাঁর কালো ও ধূসর সংকেতে মৃত্যু দেখেছেন জীবনানন্দ। এই

বিশেষ চেতনার রঙকে স্পর্শসহ কর্কশ বলে অনুভব করেন সমর সেন। মধ্যবিত্ত নাগরিকতার অনিবার্য নৈঃসঙ্গ্যের চূড়ো থেকে যিনি দেখেন—

পড়ন্ত রোদে নগর লাল হল।
বহুদূর দেশে
পাহাড়ের ছায়া প্রান্তরে পড়ে;
সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধ নদীর
মদির ক্লান্ত টান।

('এবার ফিরাও মোরে', সমর সেনের কবিতা)

তুলনায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রোমান্টিক আবিষ্টতা সমর সেনের আপাত শ্লেষ বা বৈদগ্ধ্যের নৈরাশ্যময় প্রতিক্রিয়ার বদলে অনেক বেশি সংহত ও বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের ভঙ্গি জাগিয়ে তোলে এবং হয়তো সেই কারণেই সে-প্রত্যয়, তার তির্যক বাগভঙ্গি সত্ত্বেও, মাঝেমাঝেই রোমান্টিক অনুষঙ্গের প্রবর্তন ঘটায়। তথা,

গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো
পুরোনো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বলা এ দিনশেষে।

('বধূ', পদাতিক)

সাদা ডিশটায় স্বাদু হরিণের মাংস
মনের হরিণ সোনা হ লো কার নয়নে,
নরম চটির গুহায় গোপন পা দুটি
নিয়েছে কখন যাযাবরদের সঙ্গ।

('বিরোধ', ঐ)

চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হবো অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

('পদাতিক', ঐ)

সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অনুষঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্র-কাব্যপঙক্তির প্রয়োগ অনেক সময়েই ভাবনা কল্পনার বিপরীত মেরু-প্রদক্ষিণের জন্য; প্রসিদ্ধ কাব্যোক্তি দিয়ে বিষ্ণু দে যেমন তারই অনুকূল সূত্রে সমান্তরাল বক্তব্য ও পটভূমির অভিনবত্ব গড়ে তোলেন, তাঁদের প্রক্রিয়া সেদিক থেকে আপাতবিরুদ্ধতার। তবু সে-বিরুদ্ধতা যে রবীন্দ্র-

ঋণেরই আনুগত্যে জীবনানন্দ-কথিত তাঁদেরই 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' উপলক্ষে, তা বলাই বাহুল্য। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতার প্রগতিপন্থা পূর্বোক্ত শ্লেষ ও তির্যক বাগভঙ্গির জোরে যে-বক্তব্যপ্রধান প্রত্যক্ষতার সমাজবাস্তবতাকে স্পর্শ করে, তার সফল ও অসফল দিকগুলি নিয়ে তৎকালীন গোষ্ঠীচেতন কবিকর্মের বহুলাংশ রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত শৌখিনতা হলেও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। আর এইভাবে উত্তর-তিরিশের ঐতিহ্যে পুষ্ট বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র থেকে 'তিন পুরুষ'-এর সমর সেন ও 'পদাতিক'-এর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, প্রমুখ কবিদের সম্মিলিত উদ্যোগে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই গড়ে ওঠে বাংলা কাব্যে মার্কসীয় চৈতন্যবিকাশের একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা। সে-পরীক্ষায় সিদ্ধি তৎক্ষণাৎ ঘটেছে কি সাফল্য তার আজও সুদূরপরাহত, সে-মীমাংসা অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনার যোগ্য। আপাতত এইটুকুই বক্তব্য যে, বাংলা কাব্যের এই সমাজবাদী প্রগতিপন্থার ভিত যেমন তার সমসাময়িক দেশকালের বহিরঙ্গ তাগিদে প্রকাশতৎপর হয়ে ওঠে, তেমনি অন্তঃপ্রেরণারও একটি সুনির্দিষ্ট আয়তন ধরা দেয় 'জন্মদিনে'-র রবীন্দ্র-ঐকতানে। সমসাময়িক অনিবার্য উত্তেজনার বশে তখন সে-প্রেরণার ভাষা যতই কেননা সুলভ প্রত্যক্ষতায় গণ্য হোক, আজ অন্তত অনেক ঠকে ও ঠেকে-শেখার দেশী-বিদেশী নজির থেকে সে-'ঐকতান'-এর প্রকৃত মর্মোদ্ধার সম্ভবত তার সঠিক পথনির্দেশ দেয়।

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।

(১০, জন্মদিনে)

আজ দূর-দুর্গম মানব ও তার পরিপ্রেক্ষিতের খুব ভিতরে আসতে চেয়ে যে সব কবিরা শিল্পে ও জীবননাট্যে ব্রেখটীয় নিরীক্ষাশক্তির উন্মোচন প্রত্যাশা করেন, তাঁরা শুধুই কলাকৈবল্যের অসদুপায়ে কবিতাকে দেবেন সম্মোহনের দিব্যতা, এতদূর আত্মকেন্দ্রিকতা এখন আর তত প্রশংসনীয় নয়। তবু কিনা রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দও আমাদের কোনো-এক সময়ের সমাজপ্রগতির

ব্যাখ্যায় 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে ধার্য হয়েছিলেন! অবশ্য অধুনা সে-মর্মান্তিক পরিহাস পরিণত যুক্তিবুদ্ধির সংশ্রবে এতদিনে নিশ্চিত জেনেছে—

যে মানুষ— যেই দেশ টিঁকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয় - রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মত কোনো ভূমা
চায়। ব্যক্তির দাবিতে তাই সাম্রাজ্য কেবলি ভেঙে গিয়ে
তারই পিপাসায়
গড়ে ওঠে।
এ ছাড়া অমল কোনো রাজনীতি পেতে হলে তবে
উজ্জ্বল সময়স্রোতে চলে যেতে হয়।
সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।
সকলের তরে নয়।
পঙ্গপালের মত মানুষেরা চরে;
ঝরে পড়ে।
এই সব দিনমান মৃত্যু আশা আলো গুনে নিতে
ব্যাপ্ত হতে হয়।
নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে।

('জন্মান্তিকে', সাতটি তারার তিমির)

এই 'নবপ্রস্থান' সম্পর্কে কবির মনঃপ্রকর্ষ যতদূর সহৃদয় পাঠকের লক্ষণীয়, ঠিক ততদূরই ব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ তার প্রগতি; বাংলা কাব্যভাষা তার বেশি উদ্বোধন ও উত্তেজনায় যদি বাগাড়ম্বরপ্রিয় হওয়াটাই জরুরি মনে করে, তো তেমন প্রগতি সমাজবাস্তবে না-থাক কবিতায় অন্তত তন্নতন্ন করে খুঁজেপেতে তৈরি-করা অসম্ভব নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথও মানবের সে-কৃত্রিম ও আত্ম-পরিচ্ছিন্ন সত্তার ব্যর্থতাজনিত আত্মঘাতী রূপটিকে ধনতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোরই বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করেন এবং লেখেন—

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করে পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে

এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লভে নিবাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

(২১, জন্মদিনে)

সেই 'নবসৃষ্টি-ধ্যানেব আসনে' মানুষেব 'তপস্বীবেশ' যে-আত্মশক্তিবলে সম্ভব, তাকে নিছক সঙ্ঘশক্তিব ব্যর্থতায় লভ্য নয় বলেই জীবনানন্দ ইঙ্গিত করেন সে-নবপ্রস্থানেব।

অতঃপর, চল্লিশের তথাকথিত প্রগতিশীলতা থেকে যাঁরা স্বভাবতই ছিলেন বোমান্টিক উত্তরাধিকাবে প্রচ্ছন্ন—সেই নীবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, অরুণকুমার সবকাব প্রমুখ কবিগণের যথাক্রমিক 'নীল নির্জন', 'দুরন্ত দুপুব' আর 'দূবেব আকাশ'-এ ঘুবিযে-ফিবিযে দেখা দেয বাংলা কবিতাব তিবিশের দশকেবই আবহটি। উত্তবাধিকাববলে এঁবা হযতো পূর্বতন প্রবণতাগুলিকেই কিছু সম্প্রসাবিত করেন। এঁদেব তখনকার আত্মরতিপরাযণ প্রেমচেতনার একনিষ্ঠ রূপে তখনও বড হযে ওঠে নি সমযাক্রান্ত কোনো ব্যাধি ও অনিশ্চযতাব শূন্যতা, এমনকি কবিতার শব্দকে ইঁট-পাথব-জ্ঞানে ছুঁডে-মারাব অস্পষ্ট ক্রোধ ও সামাজিক নিরাশ্রয়তায বর্ধিত যৌন বা যৌব-অভিমান তখনও আব-এক দশকের অপেক্ষায।

অবশ্য নীবেন্দ্রনাথ তাঁব সতীর্থদেব তুলনায নিজেই এগিযে আসেন সে-সময় পরিধির খুব কাছে, তাব আভা ও আঁচ দুই-ই তাঁর সহ্যেব সীমায প্রবেশ কবে। এবং প্রাথমিক 'লেখা-লেখা খেলা'-র মুহূর্তেও তিনি সময সচেতন প্রতিজ্ঞায কম বেশি ভাবিত।

সাবাদিন গান বাঁধবার ছলে
কিছু না চাইতে
জীবনের কাছে যেটুকু পেলাম,
ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যাবে না, হৃদয়, তাবো পুরো দাম
দিয়ে যেতে হবে, নইলে সে-দেখা

কিছু না, সে-পাওয়া কিছু না।

('পূর্বরাগ', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই জীবনবোধের দীক্ষা রবীন্দ্র-ঐকতান-বর্ণিত প্রকৃত কবির দীক্ষা। তার বৃহৎ ব্যাপ্তরূপ দেশকালের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ঐতিহ্যবশত যে-যুগ-যন্ত্রণার স্পর্শ পায়, তা একালীন ন্যায্য উত্তরাধিকারেরই বিবর্তন বলে গণ্য।

এখন যন্ত্রণা দিবসে, আর
এখন যন্ত্রণা রাতে।
আকালী স্বপ্ন সে ছুঁয়েছে তার
মাটিতে গড়া দুই হাতে।

('মাটির হাতে', ঐ)

কোনো-একটা স্থির নিষ্কম্প বিশ্বাসে বিনত না-থেকে সংশয় যখন হয় তীব্র, তখনকার ভাষায় :

সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,

('শিশুতীর্থ', পুনশ্চ)

দুহাতের মুঠোয় স্পর্শনীয় যে-স্বপ্ন তার কোমল উদ্ভিন্নতাগুলি ছড়িয়ে যায় আকাশে। একই সঙ্গে প্রতিমা ও প্রতীকের তাৎপর্যে আলো যে প্রেমেরই দিব্য বিভা শুধু, সে-প্রত্যয় রবীন্দ্রোত্তর সমাজবাস্তবতায়ও অস্বীকৃত নয়। '১৯৪৬-৪৭'-এর আক্ষেপ ও বেদনার ভাষায় যদিও জীবনানন্দ লেখেন, 'এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো / চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের ;'—তবু তাঁকেই তো অনিবার্য আন্তরিক তাগিদে লিখতে হয়েছে 'তিমিরহননের গান'।

আর রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দেরই ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উত্তরাধিকারে নীরেন্দ্রনাথের শব্দসন্ধান যে প্রকৃতপক্ষে জীবনেরই আত্মভঙ্গি-ঘটিত কোনো বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি, সে-কথা মানতেই হয়।

'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।'
আমি একটা শব্দ খুঁজছি, মহাশয়।
নক্ষত্রলোকের দিকে যার বলে আমি
চল্লিশ বছর ধরে হাটে মাঠে টই-টই বোদ্দুরে
বিস্তর শব্দের ঘাড় মটকালুম। অথচ দেখুন,

'আচমন'-এর তুল্য কোনো সুলক্ষণ শব্দ আমি এখনো
পাইনি।
('নক্ষত্র জয়ের জন্য', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা)

সময় থেকে সময়ান্তরে যে-শব্দসংঘাত মূলত আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত চারিত্রকেই বড় করে দেখায়, সেখানে কবির ভূমিকা তাঁর কালধর্ম-অনুযায়ী এমন কোনো-একটা সত্য ও বিশ্বাসের ধ্রুব কেন্দ্রে নির্ভরশীল, যা স্বভাবতই দৃশ্যে ও দ্রষ্টায় শিল্পেরই নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের স্বতঃস্ফূর্ত আরোপে যথাসম্ভব তার মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখে। 'সুলক্ষণ শব্দ' আসলে তেমনি কোনো-এক ধ্রুব, যাকে পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বেও সকলেরই অন্বিষ্ট বলে জানি। তাহলে, সময়ানুগতির সঙ্গে আত্মক্ষয় নয়, আত্মভঙ্গিরই একটি নিগূঢ় সম্পর্কে, প্রায় নিঃসম্পর্কীয়ের মতো বিচার বিশ্লেষণে দেখতে হবে তার অন্তরঙ্গ রূপ। পঞ্চাশের দশকে স্বীকার করা ভালো, খানিকটা প্রদর্শনবাতিকি মনোভাবে, এই ভিতরের টান কিছুটা আলগা হয়ে পড়েছিল। নীরেন্দ্রনাথের 'নক্ষত্র জয়ের' বাসনা ঐ সময়ের।

জাহাজ, পতন, মৃত্যু, মাস্তুল প্রমুখ
পরাক্রান্ত শব্দগুলি
এখন ক্রমেই
ইঁদুরের মতন ছুঁচলো-মুখ হয়ে যাচ্ছে, মহাশয়।
পাউডার-পমেড-মাখা যে-কোনো ছোকরার
পুরোনো কম্বলে লাথি ঝাড়লেই 'পতন' 'মৃত্যু' 'মাস্তুল' ইত্যাদি
ইঁদুর কিচকিচ করে ওঠে।

(ঐ)

তিরিশের বাংলা কাব্যে এলিয়ট যেমন ছিলেন আমাদের কবিদের বহিরাশ্রয়িতার অন্যতম প্রধান সংযোগস্থল, পঞ্চাশে প্রায় অনুরূপ অনিবার্যতায়, ফরাসী প্রতীকী কাব্যের সংশ্রব কমবেশি কার্যকর হয়েছিল। আর সেই সংযোগ সাধনেরও প্রধান সূত্রধার ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। এবং বুদ্ধদেব ছাড়া আরো দুজন—সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। 'জাহাজ, পতন, মৃত্যু, মাস্তুল' ইত্যাকার শব্দের তৎকালীন উৎস রোদলেয়ার। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় ঐ সব শব্দানুষঙ্গ ব্যবহৃত হয় নি। কিন্তু যে-ভাবানুষঙ্গে তা বহুল পরিমাণে পঞ্চাশের কাব্যভাষার অন্তর্গত হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহেই আমাদের কাউন্টার-রোমান্টিক রোদলেয়ার-

মনস্কতারই প্রতিক্রিয়া বিশেষ। আমরা লক্ষ করেছি, বহিরাশ্রয়িতা সত্ত্বেও, তিরিশের কবিকুল রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে মনে করেন নি অবমাননাকর। প্রত্যক্ষ প্রভাব এড়িয়েও তা ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারেই আত্মস্থ হয়েছিল সেদিন।

সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল, পেল থেকে থেকে একা ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী,
রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি এই পরবাস দেশ।

('গান', তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ?)

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পঞ্চাশের বাংলা কবিতার বহিরাশ্রয়িতা, তার দেশীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী, আত্মস্থতার সে-অধিকার আদৌ অর্জন করেছে কি? না কি সে-অবিরল রবীন্দ্রমুহূর্ত শুধুই পরিবর্জনের, পরিগ্রহণের নয়?

৬

পঞ্চাশের দিক থেকে ষাটের দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে কোনো-এক 'স্মৃতিনষ্ট শীতে' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই তীব্র ছবি।

নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।
আরো নীচে, পাপোশের নীচ এক আহিরীটোলায়,
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজন্মা বালিকা—
ছাদে পায়চারি করে গিরিগিটি,
শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বলা ঘরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়—
থুতু ও পেচ্ছাপ সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে—

('পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া কিছুই
থাকে না', আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি)

এই ছবি অবশ্য এমন বলে না যে মধ্যরাতে জীবন সম্পর্কিত 'অপমান' ও 'ভয়ের' মুখোশে মুখচ্ছদ ঢাকা পড়ে যায় চিরতরে। ব্যক্তিগত শেল্‌ফ থেকে পাপোসে ছিটকে পড়েছে বলেই তো আর রবীন্দ্ররচনাবলির শেলাই-ছেঁড়া পাতাগুলি গাছের একরাশ ঝরাপাতায় পরিণত হয় না। আসলে এ পৃথিবীতে যে-কোনো ধরনের ঘটনাই তার প্রাকৃতিক নিয়মমতো ঘটে উঠতে কিছু সময় নেয়। রবীন্দ্ররচনাবলির প্রতি কারুর অশোভন শারীরিক বল-প্রয়োগও প্রকৃত অর্থে ঘটনা ও সময় বহির্ভূত একটা সাময়িক মনোভঙ্গি মাত্র। এবং বলতে গেলে, সে আত্ম-অবমাননার অসহনীয়তায় 'অভিমান' ও 'ভয়' কবিকে আদৌ কি কোথাও পৌঁছতে দেয়? 'যে-রকম শান্তিনিকেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই' বললেও সুনীল এবং সুনীলের বন্ধুরা এ-যাবৎ তারই দিকে কোনো-এক ভুবনডাঙার মাঠ অবধি এসে আজও যে খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন, সেটা ঐরকমই কোনো-এক সুদূর ভুবন-ভ্রমে। বাংলা কবিতার সে-রবীন্দ্রভুবন আজও তার প্রজাপুঞ্জকে যে কোনো-না-কোনো ভাবে কৃতজ্ঞ রেখেছে এবং রবীন্দ্রোত্তীর্ণ কবিসমাজেও যে আজও মাঝেমাঝেই তার নস্টাল্‌জিয়ার গীতগুঞ্জরণ-ধ্বনি রক্তের ভিতরে বহমান, তা কি কেউ বুকে হাত রেখে অস্বীকার করতে পারে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগীদের মধ্যেও সে-অস্বীকৃতির কাল্পনিক দিকটি তর্কেবিতর্কে যতোটা মুখরোচক হয়েছে, বাস্তবে তার সমর্থন নেই বললেও চলে। আর সেইটেই খুব স্বাভাবিক। নইলে, আমরা যাঁরা ওঁর সমসাময়িক এবং প্রায় একটু আগে পরে লেখাজোখায় লিপ্ত হয়েছি, তাঁদের কাছে জীবন যে রকম, কবিতা তার অতিরিক্ত আবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির দৌলতে সম্পূর্ণ অন্যরকম, এমন তো ঘটে নি। যেমন,

> কী করি কোথায় যাই, পকেটে কুটকুট করে টাকা
> ঠাণ্ডা ঘরে দু-ঘন্টা কাটাতে লাগে এক টাকা চল্লিশ,
> সুন্দরীর গান দিয়ে মুর্গি খেতে পাঁচ টাকা যথেষ্ট, অন্য কোনো
> প্রমোদ নিষিদ্ধ এই কলকাতা শহরে।
> অতীতে বিলুপ্ত কোনো বান্ধবীকে মনে করে, ছি-ছি,
> গণিকার কাছে যাওয়া পাপ, দুঃখহীনতার
> বেদনা গোপন করো। অসম্ভব মাদক ব্যতীত?

(উদ্দেশ পাতাল: শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

অন্ধ কিছু ছাখে না, তার কণ্ঠ পাবে
ফুল ফোটাতে অন্ধকারে।
অন্ধকারে যে-গান বানাই একলা হাতে
সুদূর সবল একতারাতে
সে গান কোথায় ভাষা পেল, স্বচ্ছ ভাষা?
মূলে আমার চোদ্দসিকের ভালোবাসা।
জলের তলায় মস্ত একটা আকাশ ধরি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি।

(পৌত্তলিক : অরবিন্দ গুহ)

রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্যোপায়—দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।
নূতন জন্ম হয়েছে যার চণ্ডালিকা
সে দিতে চায় লিখনিকা
মরণপ্রিয়—যেতেই হবে
অনুভবে
আভূমিতল থাকবে তোমার পা দুখানি।

('স্থায়ী' : শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

অমন কালো মেঘের দিনে জন্মেছিলেন আমার প্রিয় কবি
অন্য সকল দিনের মতো বৃষ্টি নামলো—রোদ উঠলো কত
উনি আমায় রক্তে নীল দেবায়তন দেখিয়েছিলেন
যদিও ঐ সিংহাসনে কুয়াশাময় সম্রাটের অস্থিরতা ছিল
তবু আমি ক্ষমাই চেয়েছিলাম—
যা আমাকে ধন্য করে, প্রিয় কবিকে, মহিষটিকে।

(নবধারাজলে : উৎপলকুমার বসু)

শাদা মেঘ দাবি করে : একমাত্র আমাকেই ছাখো,
খুব ভালো করে বোঝা আমি ছাড়া কেউ নেই তোমার,
বিমল রক্তের নিচে প্রতিশ্রুতি রাখো যে কখনো
একদিক দেখবে না, দুই দিক তিন দিক দেখবে—

কারণ সত্যের মুখ নিরপেক্ষ, আদিগন্ত, আর
তার বিকিরণ লেগে সৌন্দর্যের মুখ অপরূপ।

(শাদা মেঘ দাবি করে . অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

এখন আরো অপরিচয়
এখন আরো ভালো,
যা কিছু যায় দুপুরে যায় উড়ে।
যেমন ছিলো বাঁধা দিনের চতুঃসীমায়, বাধা,
ঝিমায় ওরা ঝিমায়,
শহর, তার বুকের মধ্যে দীর্ঘপুকুর, শোনে
দীর্ঘপুকুর, খোলা আকাশ হা-হা,
পুরোনো সব রূপোর বাসন ছড়ানো অঙ্গনে।

(মধ্য দুপুর : শঙ্খ ঘোষ)

পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই কবিতার মেদমজ্জাসহ যে-আত্মসংগঠনের রূপ বাংলা ভাষায় জেগে-উঠতে চায়, তার ভিতর তখনকার মতো অভিনব সে-রোদলেখারীয় পাপবোধের মাশুলও মাত্র 'পাঁচ টাকায়' চলতে পারে। চলে যায় একরকম ভালোবাসাহীন জীবনে আমূল 'চোদ্দসিকের ভালোবাসা।' কিন্তু অন্য ভাবে, অনিবার্য সে-মূল তার আরো গভীরতমকে স্পর্শ করেছিল। সামাজিক দিক থেকে কমবেশি উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার আবছা আঘাতে, তখনো ততো ক্রোধ জেগে ওঠেনি, এসেছে কুয়াশায় অভিমান শুধু। 'আমার অভিমানের ,বদলে আজ নেব তোমার মালা।' ঐ ফুলমালা যা-অপ্রাপনীয়তার একমাত্র নশ্বর চিহ্ন—

She slept the world. O singing god, and stayed,
While you were shaping her, with no desire
to wake, and only rose to fall asleep ?

Where is her death ? Oh, shall you find this deep
unsounded theme before your song expire ?

(Sonnets to Orphens : First Part, II, Raines Maria Rilke)

'গান শোনা শেষ করে, কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে বা ঠোঁট থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সহসা-অন্ধকার আমি কখনো দেখিনি।' (সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী, পৃ ১৪, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়) তীব্র অথচ চাপা

অভিমানের ঘোর থেকে যে-মানুষ তারই অস্তিত্বের মূল ও কাণ্ডের মধ্যবর্তী অন্তরাত্মাটিকে দৈবাৎ সনাক্ত করে, তার পক্ষে 'সহসা-অন্ধকার' অর্থাৎ মৃত্যু, অনাকাঙ্ক্ষিত। তার মানে কি এই—

অন্ধ কিছু ছাখে না, তার কণ্ঠ পাবে
ফুল ফোটাতে অন্ধকারে।

যখন এ-আপাত অন্ধতা চোখে না-দেখার চাইতেও বড় কোনো দৃশ্যময়তায় আলোড়িত হয়ে ওঠে, সে-আলোড়ন রিলকের সে-'অব্যক্ত ও অনুভূতিগম্য দূরত্বের' তারৎ ইন্দ্রিয় ভাষাকে দেয় আত্ম-আবিষ্কারের দিব্যতা। তাই কবিতার আধুনিক বিশ্বে 'প্রথম দ্রষ্টা, কবিদের রাজা'—বোদলেয়ার যখন বলেন : 'One should always be drunk That's the great thing ; the only question. Not to feel the horrible burden of Time weighing on your shoulders and bowing you to the earth, you should be drunk without respite.

Drunk with what ? With wine, with poetry, or with virtue, as you please. But get drunk,' (Paris Spleen, p. 74)

তখন, সে-ও রিলকের 'self-discovering'-এর শর্তসাপেক্ষ অন্যতর পন্থা, যার মধ্যে আপাতত ক্যাথলিক-মোহ খুঁজতে-যাওয়া বিড়ম্বনা। তাহলে, কৃষিকাজ পড়ে আছে বলেই তো জেগে-ওঠা জরুরি, কিন্তু সব জাগরণই নিষ্ফল, যদি না কেউ তাকে এমনি করে জানে : 'বৃথাই আমি জেগে আছি এতদিন, জেগে থেকে আমি কিছুই জানতে পারব না ; আমি বুঝতে পারি, প্রবহমানতায় তাকে ছুঁতে হবে, ছোঁয়া এক সংঘর্ষ, সকল অস্তিত্বের সেই-ই এক লহমার জেগে-ওঠা, যে জাগা সাপের।' (সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়)

শুকনো পাতা ধূলায় ঝরে,
নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপনহারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে ওই অশ্রু-ভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে॥

('আসা-যাওয়ার মাঝখানে', গীতবিতান ১)

সংঘাত-সংঘর্ষময় জীবনের অন্তর্গত মানব-চৈতন্যের সে-কান্তিময়ী দ্বিধায়

কবি ছুঁতে চান তাঁর পরিপ্রেক্ষিত ; এবং সে-স্পর্শও 'এক সংঘর্ষ' ছাড়া আর কী। তথাকথিত পাপ ও তমসার গ্লানিভারমুক্ত প্রত্যয়ে, এমনি করে রবীন্দ্রনাথের গান তৈরি করে আমাদের অন্তরঙ্গ আরহটি। তার 'অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে'। কোনো আরহ বলতে পায়ের তলার পটভূমি, তার শিকড় ও স্রোতস্বিনী জলধারা, নিছক অন্ধ অনুকৃতিতে দায়বদ্ধ না-থেকেও, যায় স্বকীয়তার স্বাধীন মণ্ডলে। এ-যেন কুড়িয়ে-পাওয়া 'পদচ্যুত নূপুরখানি', যখন রোমান্টিকের সারেক-স্বত্বাধিকার সে-নূপুরটিই চেয়ে বসবে, তখন তা দিতে হবে। পঞ্চাশের কবির প্রয়োজন শুধু সে-চরণচিহ্নে। নিক্কণহীন, নিরাভরণ পা-দুখানির অবিনশ্বরতা বুকে করে তার অস্থির যাওয়া-আসা যতই বলুক এ-কালীন নিশ্চিহ্নতার কথা, তবু আরহটি যে মিথ্যে নয়, এবং সেখানেই উত্তরাধিকারের প্রকৃত ঋণ, সে-তথ্য পঞ্চাশের দশকেও খুব সত্য।

'রক্তে নীল দেবায়তন দেখিয়েছিলেন' বলেই না আমাদের প্রিয় কবি তাঁর 'সিংহাসনে কুয়াশাময় সম্রাটের অস্থিরতা'-র শেষ ছবিটি রেখে যান। সে-ছবির পরিধিতে আমাদের সংস্থান হয় না-বলে সময়ান্তর বিচ্ছেদ ঘটে। তবু সম্মিলিত ক্রোধ ও অভিমানের বিপরীতে ক্ষমাশীল তিনি, রবীন্দ্রনাথ, আত্মবিস্মৃত-আমাদের না-কোনো ঐতিহ্যচ্যুতি ঘটে, সে-সম্পর্কে, তাঁর অন্তত আড়াই হাজার গানের সম্মোহন প্রস্তুত রাখেন। এবং বিচিত্র কি, কবিতায় ও গানে অভিন্ন রবীন্দ্র ঐতিহ্যে উৎপলের 'কালো মেঘে'র অনুষঙ্গটির বদলে অলোকরঞ্জন যখন 'শাদা মেঘে'র প্রতীকে বলেন নিরপেক্ষ সত্যের অপরূপ সৌন্দর্য মহিমা, তখনও সে-উক্তি ঐতিহ্যপ্রাণিত বলেই মনে হয়। 'নূপুর', 'দেবায়তন' এবং 'পুরোনো সব রূপোর বাসন'-এর প্রতীকগুলি এমন কোনো নিরাভরণ নিশ্চিহ্নতার দিকে আসে মিলিয়ে যে সেখানে আধুনিক মনন তার আবেগের মাত্রাকে দেয় সময়ের অস্থির উচ্চারণ। পূর্ণের পরিমণ্ডল থেকে ছিটকে-পড়া শূন্যতার শহরে 'খোলা আকাশ হা-হা' করে। দিন-হারানো কোমল ব্যথায় সন্দীপনের অংশু যেমন দেখে পরস্পরের পরিচয়পত্রহীন নতমুখ। 'মানুষ নুয়ে পড়ে।' এবং এইভাবে অবিরল সে-নতমুখ শোভামাত্রায় একের পর এক তারা বলে, প্রথমে অংশু, তারও পরে একে একে অংশু এবং মিছিলের শেষতম অংশু বা অংশুমান, গৌরবার্থ বহুবচনে না-ভুলেও বলে, "আমি একটু নুয়ে পড়েছি,' এই হচ্ছে অংশু বা নিরপেক্ষ সত্য বা তার চরিত্র।" এমন বলায় সময়কে

নির্দিষ্ট একটা আকার দেওয়া গেল, মুঠো উপছে পড়ছে, তবুও। এখন এ-'নিরপেক্ষ সত্যের' সম্পর্কেই না অলোকরঞ্জন তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি অনুযায়ী, আমাদের 'শাদা মেঘের' পোশাক-পরা শুদ্ধ চৈতন্যের আরোপিত-গন্তব্যটি প্রায় ঠিক করে ফেলেন। 'একদিক দেখবে না, দুই দিক তিন দিক দেখবে—/ কারণ সত্যের মুখ নিরপেক্ষ'। কিটস বা রবীন্দ্রনাথের মতো সে-শুদ্ধতার সীমায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত, যেন আমরা এইভাবেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার 'তিন দিক' কেন, আরো নানা দিক নেড়েচেড়েই হয়তো সন্দীপনের অংশু সে-নির্জলা-সত্যের চেহারা-চরিত্র বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছয়: 'ঐ ঐ-টুকু নুয়ে-পড়া সোজা হতে চায়, আবার, ঠিক অবিকল-আগের মতন সোজা। সম্ভব না। জানি; জেনেছি। তবু ঐ tension থেকে যায়। কষ্ট এই আর কী '। তাই বিমূর্ত আর নির্বিশেষ কুশল প্রশ্নের অন্যদিকে, উত্তর ভেসে যায় তার বিপরীতে; 'আমি এইরকম আছি', তার বেশি কি কম উত্তর, নুয়ে-পড়া মানুষের হয়েই মানুষ আজ সংগোপনে উচ্চারণ করে। ততদিনে, অন্তত দু-এক দশকের চেষ্টায়, সময় আরো সুনির্দিষ্টরূপে তার চলাচল ছিঁড়ে দেখায়।

এবার তবে খুলে দেওয়া, সব বাঁধনই আলগা করে নেওয়া।
যখন বলি, কেমন আছো? ভালো?
'ভালো' বলেই মুখ ফিরিয়ে নেবার মতন মরুভূমি
এবার তবে ছিন্ন করে যাওয়া।

('মনকে বলো 'না'', বাবরের প্রার্থনা: শঙ্খ ঘোষ)

যদি বলি, রবীন্দ্র কাব্যভাবনা ও ভঙ্গির এইসব স্তরেই আজ আমাদের পরিবর্জন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তো সে-ধারণা খুব ন্যূনতম সত্য। ভাষার অন্তর্গত স্বর ও একান্ত সুরে যে-অনুষঙ্গ তার ডালপালা ছড়িয়েও থেকে যায় নির্জন, তার মূল রবীন্দ্রনাথ যেমন করে প্রোথিত করেছিলেন, সত্য ও বিশ্বাসের সে-মৌলিক শীর্ষটি, আজকের দিনে সব রকম প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার ভালোয়-মন্দে মিশে মুছে গিয়েছে বা মিথ্যে হয়ে গেছে—তা তো নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্প-বলার ধরনে সত্য ও বিশ্বাসের অপেক্ষাকৃত সুদূর ও নির্বিশেষ উপলব্ধি যে-আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত, তেমন অধ্যাত্ম-জীবন স্বতন্ত্র চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বে এখনও তত 'নিরপেক্ষ সত্যের' অঙ্গীভূত হয় নি। তাই রবীন্দ্র বাগৈশ্বর্যের বিপরীত বাগধারায় আজ মেঘলা-আড়াল উঠেছে খুব ঘন হয়ে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যভাবনার আজ সে-পূর্বোক্ত ধ্রুব লক্ষ্যস্থলও ভিন্ন; তবু

এখনকার কবি আদৌ সে-নিরপেক্ষ সত্যের মুখোমুখি হতে চায় যদি, তো 'একদিক দেখবে না ; দুই দিক তিন দিক দেখবে—'। সব দিক থেকে দেখতে গিয়ে যে সমগ্রতার ঐক্যটি অন্বিষ্ট তার বর্তমান বিক্ষুব্ধ জীবনে তা নানা কারণেই ঝাপসা হয়ে আছে। সাম্প্রতিক কবিতাও সে-কারণে জটিল। অনেকটা প্রেম ও পূজার সমার্থক গুরুত্বে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ-বিশেষ গানের মতো।

মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো
যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো
এ কি সত্য।
মোর মধুর অধর বধূর নবীন অনুরাগ-সম রক্ত
হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য।

(৫২, গীতবিতান ৩)

যদিও খুবই সহজ উপমেয় আর উপমানের গভীর গোপন সম্বন্ধে বর্ণনা অপ্রধান, তবু বর্ণিত সে সরল লালিত্যটুকু কালো চোখের আলো বা আরক্তিম অধরের তুল্য অস্তিত্বসঘন আধুনিক জটিলতায় বর্ণনার উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন করে সপ্রশ্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে। কিংবা গানের এমনতর পঙক্তিগুলি, সেখানে দৃশ্যরূপ তার নিঃশরীর ধ্বনি ও গন্ধরূপে- মূর্ত করে তোলে এক একটা ভিন্নতর রূপান্তর।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর,
তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
বিচিত্র,

(৬৫, গীতবিতান ২)

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ॥

(২৭৮, প্রেম, গীতবিতান ২)

আবার স্পর্শরূপে কোনো দৃশ্যময়তারই নিভৃত ব্যঞ্জনা—যা কখনো অনিঃশেষ পান ও পানীয়ের অবিচ্ছেদ্য অনুভূতির মতো, কখনো বা অতীন্দ্রিয় দহন শুধু।

তব অধর এঁকেছি সুধারিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—

(৩৬, প্রেম, গীতবিতান ২)

আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে।

(২১২, গীতবিতান ১)

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে॥

নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে॥

(৬, গীতবিতান ১)

আমাদের সকল দিব্যানুভূতি ও প্রেরণার মূলেই হয়তো এমন এক ঐশীরূপ আছে, আধুনিকের নিরীশ্বর নৈর্ব্যক্তিকতায়ও তাকে 'সুরের আগুন' ভিন্ন অন্য কোনো রূপকে ভাবা যায় না। সুধীন্দ্রনাথের মতো প্রেরণায় অবিশ্বাসী কবি, কিংবা সাম্প্রতিকের সেইসব কবিরা যাঁরা দিব্যানুভূতি মাত্রকেই তাঁদের রচনাকর্ম থেকে দূরে রাখেন, তাঁরা কখনোই কি নিছক যুক্তিবুদ্ধি ও মননশীলতার প্রতিফলনে কাব্যসৃষ্টির সব দায় চুকিয়ে দিতে পারেন? সম্ভবত পারেন না। কবিতা যতই কেননা বর্ণনাপ্রধান হোক, সেখানেও যখন তার শিল্প দুটি আপাত বিসদৃশ বস্তুসম্বন্ধকে উপমার বিষয় বলে গণ্য করে, তখন স্বভাবতই সে-উপমালোক আমাদের ব্যবহারিক অর্থপ্রতিপত্তির সীমানা কমবেশি ছাড়িয়েই তা সিদ্ধ হতে চায়। এই উত্তরণেরই সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত-সৃষ্টির সে-মৌলিক উৎসটি, যার ফলে, কবির প্রজ্ঞা ও মননও প্রেরণাসম্ভূত। তাকে 'দিব্য' বা 'ঐশী বলে না-মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু সৃজনের সম্মোহে, কোন কবিই না অল্পবিস্তর আলোড়িত হন, যেখানে আলো বা আগুনের মতো উপমেয়কেও অপ্রধান করে সুরের উপমানই প্রধান হয়ে ওঠে? এখন, 'আগুনের কী গুণ আছে'—কে কী ভাবে কতটা তাকে তার জ্ঞান ও অনুভূতির কোন স্তরভেদ ও মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী নেবে, সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাকে যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নিতেই হবে, যে-কোনো সৃজনরহস্য তাই বলে।

রবীন্দ্রোত্তীর্ণ কাব্যেও কবি-বর্ণিত সে-'সুরের আগুন' আজ ততটাই গ্রহণবর্জনের তারতম্যে ছড়িয়ে আছে। তার মূল কতটা গভীর সেটা নির্ণয়সাধ্য। আজ যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা অপেক্ষা তাঁর গানই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর মতো, তখন তা-দিয়ে এ যুগের সমস্ত প্রতিকূল হাওয়ায় আমরা যে সে-নিশ্বাসের নিভৃতিটুকু নষ্ট হতে দেব না, এ তো বলাই বাহুল্য। তাঁর গান যে 'সুদূর'কে বলে, বিলয়াভিমানে যে গন্ধ ও স্পর্শের 'দহনদান' পরিস্ফুট করে বেদনার আলেখ্যে বিশ্বানুগত আনন্দরূপ ও পূর্ণের প্রত্যাশা, আমরা তা পারি না। সময় আমাদের উপড়ে ফেলতে চায় সে মূল; তার অন্তরীণ উৎসে অভিমান, ক্রোধ ও প্রতিবাদের ভাষা, এবং পক্ষান্তরে, প্রতিবাদ ভুলে, সামাজিক স্থিতাবস্থায় বঞ্চিত ব্যক্তির সংকট ও বিচ্ছিন্নতার তমসালিপ্ত নৈরাশ্য—কোনোটিই কি সে-মৌলিকের বিচ্ছেদ পুরো-পুরি মেনে নিতে পারে? আমাদের যাওয়া অনেকটা উল্টো পথ ধরে হলেও তার গতি, হাওয়া ও উপক্রমের তাৎপর্য নির্বিশেষ পথের বিধান থেকে যেমন বিযুক্ত হতে পারে না, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় রোমান্টিকতা থেকে আমাদের ইন্দ্রিয়নির্ভর শারীরিক দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে বলেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা খুব দূরে সরে গেছি এবং এতটা দূরে যে কখনও আমাদের দু-একজন সভাকবির ভাষণে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী (!) এই শুনে চমৎকৃত হন —রবীন্দ্রনাথের পদ্য তাঁদের কোনোই কাজে লাগেনি।

এমন উক্তি অবলীলাক্রমে পঞ্চাশের দশকেরই দু-একজন করতে পারেন। সে অনৃত ভাষণ সম্ভবত এই কারণে যে অনেক বিরুদ্ধ প্রতিবেদনেও এঁরা বাংলা কাব্যের রবীন্দ্রআবহটি আদৌ বিস্মৃত হতে পারেন না। যা মজ্জায় মিশে গেছে কোনোভাবে, তাকেই আঘাত করতে হবে নির্মম ভাবে, অন্তত জনসভায়; এবং তাহলে, বহুশ্রুত ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ক্লিশে থেকে খুব অনায়াসে মুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রপরবর্তী তিরিশের কবিদের ঋণভারও দিব্যি হজম করে স্বাধীন ও স্বয়ম্ভু হওয়া যায়। কিন্তু ব্যাপারটা কি এতই সহজ? কেন তবে পঞ্চাশেরই একজন কবি এমন লেখেন:

সর্বনাশের আশায়
আমি পোড়াচ্ছি এই বাসা
কিন্তু, পুড়েও পুড়ছে না
নকল যতো খবরদারির
মধ্যে আছেন বাঘ-শিকারী

জুড়েও জুড়ছে না
কপাল আমার কপাল
ফলে, হয় না কোনোই রূপ ॥

('হয় না কোনোই রফা',
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

আমাদের 'নকল খবরদারির' মধ্যে প্রকৃত বাঘ শিকারী যে কে এবং কারা, তা বুঝতে সুন্দরবনের বাঘ ও কবিতার সুন্দরকে বন্দুকের একই ট্রিগারে হয়তো আমরা কখনো হত্যা করে থাকব, যদিও রক্তপাতহীন সে-নিধনের অলীক ছবি ক্রমেই স্থির, স্থিরতর হয়ে আসে আজ।

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুল বনে
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম : খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না ॥

('বাঘ', শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

ফাঁদ-পাতা রোমান্টিকতায় এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে-যাওয়া নিয়তিরই বলে, পঞ্চাশের কবিতা স্বনির্ভর হয়ে ওঠে, যেন দেড় মিনিট স্বপ্নের বিরুদ্ধতা থেকে এই অনিবার্য জাগরণ আমরা কেউই লক্ষ করি না—এমনি স্বনির্ভরতা।

বাতাসে সৌরভ ছিল, ধুলো ছিল
একা অনুতপ্ত মুখে বসেছি সিঁড়িতে
কোথাও যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয় নি
এখন রাত্রিতে সব বদলে গেছে।

অমেয় ভাণ্ডার থেকে নিতে পারি
যা নেই বা কখনো ছিল না
হীরের কুচির মতো পড়ে আছে দুঃখ, স্মৃতি
কিছু তো দেবারও থাকে, এই নাও।

('এখন', জাগরণ হেমবর্ণ : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

এই দুঃখ ও স্মৃতিভার আমাদের এমন কোথাও টানে যা-আমরা স্পষ্ট করে জানিনে আজও। একথা ঠিক যে এই যাওয়া আর গন্তব্যের কোনো-খানেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের লক্ষ নন, তা হবেই বা কেন। কিন্তু সব যাওয়ারই

অন্তর্গত যে পিছুটান, সেখানে অলক্ষ্য তিনি, পেছনটা একবার দেখে-নেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তিনিই হয়তো আমাদের 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন'কে এগিয়ে দেন। আর এইভাবে, পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের দ্বৈতাদ্বৈতে, আমাদের পরবর্তী ষাট-সত্তর দশকের কবিতাও নিশ্চয়ই কম-বেশি ঋণী, যে-ঋণ উত্তরাধিকারেরই স্বাতন্ত্র্যে বলতে পারে :

'কিছু তো দেবারও থাকে, এই নাও।'

ভূমিহীন দেশ

আবুবকর সিদ্দিক

চৌধুরীবাড়ির সীমানা দশ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তার পুবে সোলিং দেওয়া কংক্রিটের রাস্তা। তার ওধারে এক ভিখিরি দম্পতির ঝুপড়ি। তার মধ্যে অ-মানুষ না-মানুষ দুটো জীবের বসত।

এই দারুণ চোত্‌মাসের গরমেও তারা আজ বিশ্রামলাভের সুযোগ পেয়ে গেছে। মোরগের ঠ্যাং, নীলসিটে নাড়ি, কচকচে পুরু গিলে; এই সব খাবার সকালে চৌধুরীবাড়ির দেয়াল পেরিয়ে তাদের গেট পর্যন্ত পথ পৌঁছুবার পেয়েছে। পরিপাটি তৃপ্তিই বলা চলে এক রকম। রাতের মাঝারি প্রহরে চ্যাটাইয়ে শুয়ে একজন ভুলে যায় পাঁচ বছর আগে রেখে আসা কোনো এক নদীখাওয়া ঝড়েপেষা গাঁয়ের কোথাও ফিরে যাবার একঘেয়ে বায়না ধরে ঘ্যান ঘ্যান করতে।

দুজনার নিম্নাঙ্গে জোড়া লাগার কথা এর পর।

ঠিক এই সময়ে, মানে এই রাত দুপুরে ঝুপড়িতে সূর্যোদয় ঘটল।

হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা লুঙি পরা শাদা ভালুক ভেতরে ঢুকে হুমড়িয়ে পড়ে গেল। শাদা দাড়ি চিনিয়ে দেয়, এ স্বয়ং চৌধুরী। শাদা মাংসের তাল কয়েক সেকেণ্ড বিরাম নিয়ে গাঁ্যা গোঁ করে ওঠে।

তোরা বাঁচা আমায়! আমায় বাঁচা রে তোদের হাত ধরি পাও ধরি।

চৌধুরীর নিশ্চয় মহাবিপদ। কিন্তু বিপদ এ দুটিরো সাংঘাতিক। অত উঁচু মানুষের এত নিচু দুর্দশা কি করে বিশ্বাস করে? কি করে সামলায়? চৌধুরীর বিপদে এদের বিপদ। চৌধুরীর আতংকে এদের আতংক। এরাও ঘেমে নেয়ে ওঠে। ঘেয়ো চ্যাটাই গায়ে মুড়ে চৌধুরী কাঁপতে কাঁপতে গালাগাল ছুটোয়,

ওরে বাব্‌রা ওরা গলা কাটতে এসেছে। শূয়াররা আমায় ঢাকলিনে এখনো? ঢাক্। ও বাবারে। ও বাবারে।

চৌধুরীবাড়িতে কান্নাকাটি ওঠে ওদিকে। শ্মশানভাঙা মড়াকান্না।

যার ছুঁড়ে দেওয়া মুরগির চামড়া নাড়িভুঁড়িতে জীবন বাঁচে, তাকে বাঁচানোর সুযোগ মুঠোয় এলে হাতছাড়া করা যায় না। কাজেই দাদ পুঁজ ঘামের ভাপে জারিয়ে সেই পৌনে দুমণ মাংস চাটাইয়ে মুড়ে তালগোল পাকিয়ে রেখে দেওয়া হল।

ইঁদুরে ঘুটঘাট করে। চৌধুরী সাহেবের বুক ধড়াস্ করে ওঠে।

তেলাপোকা ফর্‌র্‌র্ করে উড়ে যায়। চৌধুরীর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে।

ঝুপড়িতে সর্ষের তেল জোটে না। বিনা তেলেই শুধু নরম হাতে বুক ডলে দিতে হয় চৌধুরীর। মালিশ করতে করতে চৌধুরীর কাছ থেকে অনেক কথা আদায় করে নেয় মালিহা বিবি।

চৌধুরী বেঁচে গেলে : তাদের টিনের ঘর তুলে দেবে। নেছারকে একটা পানের দোকান দিয়ে দেবে। পৌষমাসের আগে আগেই বিলিফ কম্বলের ব্যবস্থা করে দেবে। নেছারের হাঁটুতে ওটা দাদফাদ নয়, আরো খবিস ঘা। ফাঁকমতো তাকে নিজে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নেছারের উপর দায়িত্ব পড়ে বাইরে বসে পাহারা দেবার। খ্যাস খ্যাস শব্দে দাড়ির খুস্‌কি চুলকোয়। তারও চেয়ে জোরে চুলকোয় হাঁটু পিঠ কোমর। মশার কামড়ে পুড়ে ওঠে ভিজে ঘা।

চোত্‌মাসের রাত কাটে।

নতুন বছর আসে। তারও নতুন মাসটা কাটে। কেটে কেটে জ্যৈষ্ঠ শুরু হয়।

ইলেকশনের গন্ধে ভ্যাপসা হয়ে ওঠে। দেওয়ালে গাছের গায়ে দালানের পিঠে বাস-ট্যাকসি-রিক্‌শার পাছায় চৌধুরী সাহেবের মুণ্ডু। স্কুল কলেজ এমন কি খেলার মাঠ সব নেড়া হয়ে হায় পড়ুয়ার অভাবে। শুধু মিটিঙের ময়দান গম গম করে। আর ভূমিকম্প হয়ে যায় অলি গলি সড়ক। লম্বা মোটা মিছিল কুঁদে চলে রাস্তা মাতিয়ে।

চৌধুরী সাহেবের এত জ্ঞান গুণ। এর অর্ধেকের অর্ধেকও লোকে এতকাল জানত না। দিনরাত আকাশ জুড়ে বাতাস ভরে একটি মুখের নক্‌শা। একটি নামের আওয়াজ। একটি পুরুষের কিস্‌সা।

রাস্তা পাকা করে দেওয়া হবে।
জিনিসের দাম কমিয়ে দেওয়া হবে।
গ্রামে গ্রামে বিজলী বাতি পৌঁছে দেওয়া হবে।
ভূমিহীন চাষীকে জমি দেওয়া হবে।
খাজনা কমিয়ে দেওয়া হবে।
আর
একটা লোককেও না খেয়ে মরতে দেওয়া হবে না।
উৎপাদন ব্যাহত হতে দেওয়া হবে না।
শিক্ষিত বেকারকে পথে পথে অকারণ ঘুরে বেড়াতে হবে না।
খাবার বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।
আরো আরো।

সাধারণ মানুষের মাথায় সব কথার সাধ্য নেই ঢোকার।

যা ঢোকে, তারো দু-এক টুকরো খোলসা হয়। বাকি সব কথা খুলির মধ্যে শক্ত নুড়ির মতো গড়াগড়ি খায়। গলে না।

তবু তর্ক বাধে নেছার ও মালিহাতে।

চৌধুরী সাহেব জিতে গেলে টিনের ঘর উঠবে। হাসপাতাল থেকে দাদের চেয়েও খরিস ঘা সারিয়ে নিয়ে এসে পানের দোকানে বসবে নেছার। আর ঘরের মধ্যে বিলিফের কম্বলে শুয়ে শুয়ে মালিহা একটা গদগদে ব্যাটাবাচ্চা বিয়োবে।

এই পর্যন্ত আসতে আসতে মালিহা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নেছারের উপর। কথা হচ্ছে বেঁচে থাকা। তার পরের কথা হচ্ছে একটু সুখে বেঁচে থাকা। তা, যদি ভূমিহীনকে ভূমি দ্যাযই, যদি আর না খেয়ে মরতে না দ্যায়, যদি খাজনা কমিয়ে দ্যায়, যদি ধানচালগমের দাম কমিয়ে দ্যায় কেন তাহলে এই বেগানা বেভূঁইতে পড়ে থেকে থেকে পাথরের পিণ্ডি চোষা? তাহলে কেন সেই চেনা নদীর ধারে পাঁচপুরুষের কবর দেয়া পুরনো গ্রামে ফিরে যাওয়া যাবে না? কেন? কেন?

মালিহা কুলোপনা ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে দুলতে থাকে সারা রাত।

রাতেরো ক্ষয় আছে। শ্বেতীর দাগ পরা শাদা আলো ফেলে ফেলে সকাল চলে আসে। কালচে বাকল ঢাকা প্রাচীন গাছের নিচে কালো

কয়লার স্তূপের পাশে আধখানা ঢাকনা খোলা পিচের ড্রাম। খুঁড়ে খুঁড়ে তারো ভেতর চলে যায় লোনা রোদ। ফোকলা মুখে কালো জিভ বের করে ঝিকিয়ে ওঠে খালি ড্রাম। তার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে কাগজের বিড়ি ফোঁকে নেছার। ভিক্ষে চাওয়াটাকে সে প্রায় শিল্পকর্মে তুলে এনেছে। একটু পরেই অভিনয় শুরু হতে যাচ্ছে। মালিহা নাকে আঁচল গুঁজে তাকে নিজের হাতে মেকআপ দিতে বসে। ওপরের গাদ চেঁছে ফেলে দিয়ে ঘায়ের গোলাপী রঙ আরো দগদগে করে তোলা হয়। কলতানির ঘাম ছাখা ছায় ফোঁটা ফোঁটা। ওটুকুতে খুব বেশি চোখের দয়া উথলে ওঠার কথা নয়। একটা শিশি থেকে মালিহা ঝপ ঝপ করে মরিল ঢেলে ছায়। দাঁতে দাঁত এঁটে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে নেছার। তারপর চোয়ালখসানো গোঙানি, উব্ রে রে রে আস্তেরে হারামজাদী, গেল গেলোরে, আরো ঢাল্।

এ তার রোজকার চেঁচানি। কান দিলে বেলা চড়ে যায়। উত্তরে মালিহা উবু হয়ে দাঁড়িয়ে নেছারের দুহাঁটুর ফাঁকে হাত চালিয়ে দেয়। অভ্যেসমতো নেছারের দুহাতও মালিহার গলায় উঠে এসে জোড় বেঁধে ঝুলে পড়ে। মালিহা তাকে টুক করে তুলে নিয়ে চারচাকার তক্তায় বসিয়ে দেয়।

ঠ্যাঙভাঙা দিনের সেই শুরু। চারচাকায় গড়িয়ে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে। মানুষের পায়ে পায়ে মাথা খুঁড়ে। দরজায় দরজায় কপাল কুটে।

একজনের পুঁজি ঘা। আরেকজনের মাংস।

আকাঁড়া খুদকুঁড়ো কুড়িয়ে দিন যায় খুঁড়িয়ে। তবু যায় না।

এমনি একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ করে বৈচিত্র্য এসে পড়ে। বাতাস গরম হয়ে ওঠে ইলেকশনের শ্লোগানে। মিছিলের ফোঁকরে চারচাকার ঠ্যালা-গাড়ি, তাও ঢুকে পড়ে। মানুষের হাতে হাতে পোস্টার প্ল্যাকার্ড। একদিকে জোয়ান ষাঁড়ের ছবি। অন্যদিকে চৌধুরীর বিশাল হুমো সাইজের মুখ আঁকা। সেই চেনা মুখের উপর চোখ রেখে মালিহা গ্রীবার রগ রাগিয়ে আওয়াজ মেলায়ঃ 'ভোট দিন ভোট দিন।' নেছারের মাথা তালে তালে বেলুনের মতো দোলে, হ হ আর ভিখ্ মাঙবা না তুমি। পথে পথে ঘুরবা না। ঘর পাবা। জমি পাবা। নিজির ধান নিজি খাবা। এ্যাঁ। সত্যি নাকি? নিজিরতা নিজি খাবা?

এমন মজা আর নেই। ইলেকশন এসে পারেনি তাইতে কতো সুখের

ঠ্যাকার। চৌধুরীর ট্রাক ওদের তুলে নিয়ে ময়দানে যায়। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে আরেক দলা মানুষ ঢেলে দিয়ে আবার ফেরে আরও মানুষ এনে জনসভার মেদ প্রমাণ করার জন্যে। কয়েক ডজন মাইক বাঁশের মাথায় কথার ম্যাজিক হাঁকে। চৌধুরীর শাদা টুপি শাদা দাড়ি দ্যাখার লোভে মানুষ গায়ের আঙুলে ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে উঁকি মারে। জুতোস্যাণ্ডেলের ফাঁকে চারচাকার গাড়িতে চুপটি করে বসে থেকে নেছার বাদামের কোষা ভাঙে। মালিহা ভিখ্ মাঙে। বক্তৃতা শোনে।

মাঠেই সন্ধে উত্‌রে যায়। ছ্যাপসা ঘামের গন্ধে সে রাত আরো গাঢ় হতে হতে ঝুঁকে পড়ে ঝুপড়ির সুড়ঙে। তারপর হঠাৎ বিকৃত ছায়া হয়ে কাঁপতে থাকে লাল কেরোসিন জ্বালা চ্যারাগের মুখে ধরা পড়ে গিয়ে।

মালিহার চাহিদা সবসময় বাড়াবাড়ি পরিমাণের। ভরা পুলক না হলে তার শরীর মন কোনটা পোরে না। মিটিঙের মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনা এক দিস্তারো বেশি পোস্টার। তাই নিয়ে মেতে ওঠে সে। ফুটোব্যাড়া চেরা-ব্যাড়া খসাব্যাড়া, যতোরকম নির্লজ্জ নগ্নতায় ঘিরে আছে চারদিকে, সব ছেয়ে ফ্যালে পোস্টারে পোস্টারে।

হাতে ব্যথা ধরে যায়। ক্ষান্ত দিয়ে বসে পড়ে নেছারের কোলের কাছে। নেশা ঘোরা চোখ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে নিজের শিল্পকীর্তি। সারা বেড়া জুড়ে ষাঁড় চৌধুরী চৌধুরী ষাঁড়। একসময় একাকার হয়ে যায় দুটো ছবি। বুঝে উঠতে পারে না কোন্‌টা চৌধুরী কোন্‌টা ষাঁড়।

মালিহার চুলের ডগা ঝুলে এসে নেছারের নাকে সুড়সুড়ি দিতে থাকে। কথা বলতে বলতে নাক ঘুরিয়ে নিতে হয় নেছারকে।

আরে বা! কি দেখে অতো? দিন না আসুক আগে।

মালিহা নবীদের মতো গলা উঁচু পর্দায় রেখে বলে,

আসবে গো আসবে। এই আসলো বলে। একটু সবুর সও।

নেছার ঠোঁট কুঁচকে বলে,

ঐ একবারই আসলো এই ঝুপড়ির মধ্যে। গলাকাটাদের তাড়া খেয়ে। আর-না।

দারুণ পুলকে শিউরে মালিহা চিৎকার দিয়ে ওঠে,

এখনো বিশ্বেস হয় না ইস্। সে এইখানে শুয়ে ছিলো, এই চাটাই-র উপরে। আমার একেবারে গায় ধারে। আর··

আদরের ভাবে নেমে আসে মালিহা। তার নিম্নচাপে নেছারের শ্বাসকষ্ট লাগে। মাঞ্জা দেওয়া সরু সুতোর মতো গরম নিঃশ্বাস শিস্ দিয়ে বেরিয়ে এসে মেটে সানকির শূন্যতায় আটকে যায়। ধাতব আওয়াজ তোলে ঃ

আমরা আবার দ্যাশে যাবো।
আমরা আবার জমি ফিরে পাবো।
আমরা আবার ঘরবাড়ি তুলবো।
আমরা আবার দু বেলা খাবো।

একদিন গুমট গরম ভেঙে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো। নেছারের মাথায় টুপি, ঠোঁটে কাগজের বিড়ি। মালিহার গালে গান, আঙুলে চুণ। চারচাকার ঠেলাকে যেন ট্রেন বানিয়ে নিয়ে ওরা ভোট দিতে ছুটলো।

সেই চলা যেখানে থামলো সেখান থেকে শুরু হলো আরেক পালা। বিড়ম্বনা ব্যর্থতা বিঘ্ন এই তিন মিলিয়ে তৈরি সে পালার ধুয়ো।

শত শত মানুষ মেয়েমানুষ পুলিশ গিজ গিজ করছে। এক কোণে সরে গিয়ে মালিহা ও নেছার দুজনা দুজনকে বোঝাতে শুরু করে।

ভোট বুঝলা? ভোট। ভোট মানে হলোগে এই এতো বড় লম্বা ছাপা কাগজ। বলদ ছাপা। হেরিকল ছাপা। পুষ্প ছাপা। ছুটকেচ ছাপা। ছারপোক ছাপা। নাউকো ছাপা। বড়মিয়া বাগ তাও ছাপা। তুমি কি করবানে? ছাপ্পা মারবা। বলদটার গায়ে ছাপ্পা মারবা। একখান মাত্তর মারবা। চৌধুরীসাব হইয়ে গেল। বাশ্। এই হল গে ভোটাভুটি।

ভোটারদের লাইন দুদিকে দুভাগ হয়ে গেছে। পুরুষদের আর মেয়েদের। নেছারের ভীষণ পণ তারি আগে ভোট দেয়া দরকার। কেননা সে হল পুরুষ। কিন্তু পুরুষদের লাইনে সে একা যাবে কি করে? চারপায়ী ঠ্যালার জন্যে মালিহাকেও যে এ লাইনে থাকতে হয়। নারী-পুরুষের সমস্যা স্বভাবত জটিল। শেষে মালিহা বললো, আমি আগে দিয়ে আসি। তুমি আমতলায় জিরোওখন।

নেছার চোখ পাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললো,

চোপ্ মাগী!

গোটা লাইন হেসে ওঠে। তখন একজন মৌলভী সাহেব তার সামনেটার ঠ্যালাশুদ্ধ ওদের দুজনকে ঢোকার জায়গা করে দেয়।

সারা পথ পেছনের দিকে মৌলভীর কঠিন উষ্ণ চাপ। ঘাম খিদে

হয়বানি। ঠ্যালার হাতলে ভর দিয়ে ঝুঁকে সামলাতে চেষ্টা করে মালিহা।

হলঘরে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বেলা উজিয়ে যায়।

টেবিলের ওপাশে ঠিক মধ্যিখানে একটা আগেরকেলে কদমছাঁট মাথা। তার চার আঙুল কপালের নিচে গোল গোল একজোড়া চোখ। আরও গোলগোল হয়ে তারা মালিহার বেদম স্বাস্থ্যের উপর ঘুরতে লেগেছে। পৃথিবীর মেয়েমানুষ যেন এই প্রথম দেখা গেল। সে দেখা ভেঙে যায় একটা বাঁশফাড়া গলার স্বরে,

ভোটার লিস্টে নাম নেই। যাও হবে না।

ওরা নিঃশব্দ চোখে তাকিয়ে থাকে সামনে। সমস্ত বিমূঢ়তা চেপে এসে ঝুলে পড়ে ঠ্যালাগাড়িকে আশ্রয় করে।

ছাঁটামাথা নড়তে থাকে ডাইনে বাঁয়ে।

ওরা বেরিয়ে আসে একই দরোজা দিয়ে।

আমতলায় ফিরে এসে দেখে, মাটিতে শোকের ছায়া টান টান হয়ে শুয়ে। পশ্চিম থেকে পুবে।

নেছার কিছুই বলে না। চেয়ে থাকে।

তখনও পথ-ঘাট-মাঠ-গলি বেয়ে পিঁপড়ের দাগের মতো গিল গিল স্রোতে ভোটাররা আসছে। নেছার ও মালিহা সমস্ত শূন্যতা ভুলে সেই শৌখীন দৃশ্য দেখতে থাকে মুগ্ধ চোখে। আটকানো ঠোঁটে বাধা পেয়ে বুকের নিঃশ্বাস পাক খেয়ে উপরে উঠে আসে। ফোঁস্ করে বেরিয়ে যায় পাক দিয়ে।

এইসময় গুবরেপোকার মতো কালো ট্যাক্সিতে চেপে চৌধুরী আসে ভোট দিতে।

একেবারে ধবধবে শাদা আউলিয়া। শাদা সার্জস্কিনের শেরওয়ানি। চিপ্পা পাজামা। নক্শি কাটা কলার তোলা পাঞ্জাবি উঁকি দিচ্ছে বুক-খোলা শেরওয়ানির ফাঁক দিয়ে। সারা মুখে পিন পিন ঘামের ফোঁটা আর মুশ্কি কিমাম দেওয়া পানের পিক।

দলীয় ভক্তদের ঘেরাও ছিঁড়ে ফেড়ে মালিহা সরাসরি চৌধুরীর গায়ের উপর এসে পড়ে। একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন ছিটকে ওঠে তার ঠোঁট কেটে,

ভোট কই আমার? ও আমার ভোট নাই ক্যান্? আমার ভোট? ও সার আমার ভোট?

চৌধুরী ধীরেসুস্থে স্নেহ লাগিয়ে বলে,

অ তুই সেই লেংড়ু ভিখিরির পরিবার না? তা তোরা ভোট দিবি ক্যামনে? তোদের তো থানা নেই।

'থানা'! এই শিক্ষিত শব্দের ছ্যাঁকা খেয়ে ভীষণ কুঁকড়ে যায় মালিহার উদ্ধত শরীর। কিছুই বুঝতে পারে না। তার মুখের হাঁ দেখে একজন যুবনেতা ব্যাখ্যা দিতে এগিয়ে আসে।

আরে মাতারি থানা চেনো না থানা? মিন্‌সিপ্যাল্‌টিতে জমি আছে তোমার? ঘর? বাড়ি? আছে কিছু?

মালিহা এবারে জমি পায় পায়ের তলায়। গম্ভীর গলায় বলে,

আছেই তো। হ।

বটে রে। কোথায়?

ক্যান্ আমাদের সে ঝুপড়িখান? এই তো ওনার দালানের সামনে।

সে কি তোমার নামে দলিল? না তোমার স্বামীর নামে?

মালিহা আস্তে আস্তে কুঁকড়ে মাটিতে বসে যেতে থাকে। শাদা জোয়ার লাগা সেই নদী। তার তীর ঘেঁষে নলবন আর বেতীবন আর কেয়াবন আর হোগলাবন আর আর দোচালা ঘর আর সরকাদা ল্যাপা তকতকে উঠোন। দক্ষিণপুরে ঢ্যাংগা এক কদমগাছ। বাঁশের আড়ায় টানিয়ে রাখা গায় দেয়া জাল। জালের শত শত ফুটো গলে চলে যাওয়া হু হু হাওয়া সারাদিন। সারাদিন ভর ধানজমির উপর দিয়ে দিয়ে নদীর দুধশাদা জমির উপর দিয়ে দিয়ে শব্দ তুলে যাওয়া হাওয়া। একটি মুহূর্তের আলিঝালির ভুলে জ্বলে যাওয়া ঝাপসা রঙ গোলা চালচিত্র ঝলসে ওঠে আকাশে। কিছুক্ষণের জন্যে শাদা পটে আটকে গিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত কনুইয়ের মতো থির থির করে কাঁপতে থাকে।

চৌধুরীর ঠা ঠা হাসিতে মালিহার আলিঝালি এক নিমেষে কেটে যায়।

আচ্ছা আচ্ছা। ভোট দেবার আউশ এই তো? হোই জানমিয়া দ্যাও এরে একটা ভোট দেবার কায়দা করে দ্যাও। অই বিটি। যা অর সাথে যাগে।

চৌধুরী মুচকি হেসে সাগরেদকে নির্দেশ দেয়। তারপর ভেতরে চলে যায় ভোট দিতে।

বাস্তবিক জানমিয়ার তত্ত্বাবধানে মালিহা বোরখা পরে পোলিং বুথে যায়। আম্বিয়া বিবি, স্বামী মৃত আবোজালি জোমাদ্দার, এই নামে ভোট দিয়ে আসে।

এর পরের দিনগুলো শুধুই চৌধুরীর। মালিহারা সেখানে ক্রমাগত গৌণ থেকে গৌণতর।

বিজয় মিছিল, মিলাদ মহফিল, সংবর্ধনা উৎসব—সব মিলিয়ে প্রচণ্ড মত্ততার রাতদিন। চৌধুরীর বাড়ি দরবারি আবহাওয়ায় গম গম। চৌধুরীর গাড়ি ভোঁ ভোঁ দৌড় পাল্লায় খ্যাপা।

কিন্তু সময় তো সাচ্চাই এসে গেছে এখন। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে দাবিগুলো জানিয়ে দিতে হবে। প্রথম কিছুদিন ওরা সবুর করে থাকে। অসম্ভব ভিড়ের ডগায় সবুর করে থাকতেই হয়। যারা দূর দূর বাইরে থেকে আসছে তাদের আর্জি আসে। তারপর ভেতরের লোকের দাবিদাওয়া।

অপেক্ষা করতে করতে যথারীতি বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টির ধারানি চুঁয়ে চুঁয়ে নেমে আসে পিজবোর্ড প্লাস্টিক আর নারকেল পাতার জোড়াতাড়া চাল বেয়ে। উবু হয়ে মাথা গুঁজে ভিজে ভিজে রাত কাটে। রাতজাগা ঘুম পুরতে না পুরতে সকাল এসে পড়ে। ভোর আঁধারে চৌধুরীর গেটে গিয়ে ওঁত পেতে বসে থাকে দুজনে। থেকে থেকে এক সময় চৌধুরীকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখে। কিন্তু বেওয়ারিশ তো ভেতরে আর যাওয়া যাবে না। হুকুম নেই। গেটে নতুন দরোয়ান বসেছে। কোমরে তকমা। হাতে রাইফেল। চৌধুরীর গুবরেপোকার মতো কালো গাড়ি বাঁই করে টার্ন নিয়ে শাঁই করে মিলিয়ে যায়। মানুষের হাতে ঠ্যালা চারচাকার গাড়ি ইঞ্জিন বসানো ট্যাক্সির নাগাল পায় না।

আর দারুণ নাগাল-ছুট্ হয়ে যায় চাল ডাল মাছ মাংস আণ্ডা আলু পেঁয়াজ তেলের দাম। বেঁচে থাকার জিনিশের দাম চড় চড় করে চড়ে। আর জীবনের দাম দ্রুত অতি দ্রুত নেমে আসে হিমাংকে।

স্টেশনের ধারে বোগেনভালিয়া ফুলে ছাওয়া দোতলা বাড়ির বিধবা বউ প্রতি শুক্রবার ভাত তরকারি দিয়ে আসছিল নেছারকে। বিনা নোটিশে সে বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। খালি হাতে ফিরে আসার পথে ঝি ছুটে এসে চ্যাঁচাতে লাগলো, অয় গস্তানী মাগী, ফের ল্যাংড়াডারে লইয়া ছ্যাখ এমুহো আইয়া। মস্তকে ইটামু। মুগুর গাছডামু। চাইল-ধানে ব্যাবাক আগুন লাগছে ছ্যাহস্?

ঝুপড়ির জীবন অসহ্য তেঁতো হয়ে ওঠে। খুনসুটি মিটিমিটি নিয়ে রাত

বাড়তে থাকে। মালিহার চুলের গোছা পায়ের তলায় চেপে ধরে নেছার তার পিঠে দুহাতে দমাদ্দম পিটিয়ে যায়।

এক ফাঁকে বাসা বদল তথা শহর বদল হয়ে যায় চৌধুরীদের। শোনা গেল, চৌধুরী সাহেব প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছে। এখন থেকে তাকে অন্য শহরে বিশাল আকারের চকমিলান রাজবাড়িতে থাকা লাগবে। সেখানে বসে বসে রাজত্ব চালাতে হবে।

ছোট শহরের ভিখিরী স্বামী-স্ত্রী কি যে করবে বুঝে উঠতে পারে না। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিখ মাঙ্গার কপাল। পিঠের কপালের চামড়ায় তামাটে ধোঁয়াটে পোঁচ ধরে। রাতে মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। ভেবে ভেবে খিদে ভোঁতা করে আনে। তাহলে কে দেবে ব্যবসার মূলধন? কে দেবে জমিজিরাত বাড়ি ঘর?

কিন্তু চৌধুরী এবারে বরং আরো বেশি করে কাছে নেবে আসার সুযোগ করে নেয়। শুধু নেছার মানিহার মতো পুরনো পড়শিরই কাছে নয়। সারা দেশের সমস্ত জনগণের একেবারে মাথার কাছে। আপিশে দোকানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্কুলে কলেজে দেয়ালে দেয়ালে চৌধুরীর হাসিখুশি মুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে। সরকারী হুকুমে ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে ঝোলে শহরে বন্দরে।

ভারি একটা মজার ব্যাপার। গোলমেলে সরল অংক যেন। জনসাধারণ যতো কাছে যেতে চায়, চৌধুরী ততো দূরে সরে যায়। চৌধুরী যত কাছে এগিয়ে আসে দেশের মানুষ তত হঠে যায়। খুন জখম ধর্ষণ ঘুষ দালালি ভেজাল নকল বক্তৃতা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন দ্বারোদ্ঘাটন তোরণ অভিনন্দন চাঁদা পরিকল্পনা বিদেশ সফর ইত্যাদি চর্মরোগ ছেয়ে ফেলল সারা দেশ। চৌধুরীর নামে থুথু দেয় মানুষ। দোকানপাটের সামনে এলে মাথা তোলা যায় না। তুললে চোখ বুঁজে থাকতে হয়। গাছে শাদা দাড়িওয়ালা ছবিতে চোখ ঠেকে যায়।

সমস্ত জলাশয়ের পানি শুকিয়ে আকাশে উঠে যায়। পোড়া বাদামী প্রান্তরে শুয়ে অনশনে মরন্ত মানুষের কংকাল নির্বাণের দূত শকুনকে ডাকে আকাশ থেকে নেমে আসতে।

এত বড় দুর্ভিক্ষে নেহারের হাঁটুর ঘা আর আগের মতো কাজে আসতে চায় না। গোটা দেশটারি কুঁচকিতে বগলে পাঁজরে কোথাও না কোথাও মাইলের পর মাইল জুড়ে কার্বাঙ্কল নয়তো ক্যান্সার বেরিয়ে পড়েছে। আর

সেই যে তার চোত্‌মাসের গোবরচাক দাদ তা ছড়িয়ে এই আষাঢ় মাসের শেষে ঘাড় থেকে তলপিঠ পর্যন্ত আস্ত শরীর ধরে ফেলেছে। খ্যাস খ্যাস দাদ চুলকোবার সুখে নেছারের রাত কেটে যায়। আর খিদের বিকারে পাগল মালিহা তলপেটে বাঁচার বীজানু পোরার তাড়নায় রাত পার করে দেয় ঝুপড়ির বাইরে স্টেডিয়ামের খুপরিতে, স্টেশনে ফেলে রাখা ওয়াগনের ভেতরে, কোর্টের বারান্দায়, শহরের প্রান্তে ইঁটের ভাঁটায়।

এক মুষলধারে ভেজা দুপুরের দিন। সারা গা জ্বরে আগুন, তবু বাজারের এমাথা ওমাথা মালিহা মেপে ফিরছে। ঠ্যালাগাড়িতে বসে নেছার তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে দশটা পয়সার জন্যে।

ঠিক এই সময় আর্মির জীপ এসে থেমে পড়ে বাজারের গেটে। একজন মেজর বেরিয়ে এসে ফুটপাথে দাঁড়ায়। সমস্ত দোকানদারদের ডেকে বুঝিয়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর হুকুম। রাস্তার দুপাশে যত সরকারী জমি বেআইনী ভাবে বেদখল করা হয়েছে দোকানপাট ঘরবাড়ি তুলে, সব চব্বিশঘণ্টার মধ্যে তুলে সরিয়ে নিতে হবে। চব্বিশঘণ্টা পার হয়ে গেলে সরকারবাহাদুর বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা আমলে আনিবেক।

তার পরদিন দুপুরের ঘটনা। স্বভাবত ব্যবসায়ীরা যথাস্থানে বসে যার যার বিকিকিনি নিয়ে ব্যস্ত। কালকের আদেশজারী তারা শুনেছে বটে, তেমন গা করেনি। দেশে এখন আকছার হুকুমজারি চলছে। নিয়মিত ব্যবসাপাটও চলছে। তো চলুক। পরে সময়মতো সঠিক জায়গাটা খুঁজে নিয়ে সঠিক লোকটির হাতে একগোছা টাকা তুলে দিয়ে আসা যাবেখন।

সেই মেজরের জীপ আবার আসে। পেছনে বাঘের মতো গর্জনশীল দুটো প্রকাণ্ড বুলডোজার। ব্যস্‌। ফুটপাথের দুপাশে পনেরো বিশ বছরে গড়ে ওঠা ঘড়িকলমের দোকান, পানের দোকান, দর্জিঘর, নাপিতের ঘর, ছিটকাপড়ের দোকান, চায়ের স্টল, তিরিশ মিনিটের অপারেশনে সমস্ত গুঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ। দুটো বুনো মোষ বেগে কুঁদে চলে গেলে যা হয়।

মালিহা ও নেছার বিকেলে ফিরে এসে ঝুপড়ির নিশানা খুঁজেপেতে পায় না কোথাও। আইনের চাকা সব ডলে পিষে একাকার করে দিয়ে গেছে এখানেও।

মালিহা কপাল চাপড়ে কেঁদে ওঠে,

আ মালিক। এ কি বিচার ছাখালা। যে ঘর তারে মরণকালে ঠাঁই দেলো, তারেই সে ভেঙে তচনচ করলো!

নেছারের মুখ দিয়ে একটি মাত্র কথা বেরিয়ে আসে,

চৌধুরীসাব এই ঘরে থাকতে আর কোনদিন ফিরে আসবে না। আমার দেলে কয় এডা।

ঠ্যালাগাড়ির জীবন এবারে শুধুপথেই গড়িয়ে চলে। যেখানে রাত সেখানে কাত। কটি তরমুজের খোসা সজনেডাঁটা কিছু জোটে তো পেটে যায়। নইলে সারা রাত কাটে হুতোশে, স্বপ্নে, ফিরে যাবার জল্পনায়।

আবার নতুন আইন জারি হতে থাকে দেশে। ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ। ভিখ দেওয়া ও চাওয়া দুইই দণ্ডনীয়।

নেছারের শেষ পৌরুষটুকু এখন চরম উদ্বেগে গলার গোড়ায় উঠে এসে খুক্ খুক্ করতে থাকে। দানা নেই। পানি নেই। তাহলে কি হবে আর শুধু শুধু হাঁটু বসানো আগুন জ্বালানো চমৎকার ঘা-টা পুষে রেখে? কি বা লাভ এই হাড়গোড়ের গোটা সঙ খাড়া রেখে? নেছারের দিন মাঙানের অভাবে চুপ্‌সে মিইয়ে আসে। মালিহার রাত ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে শিকার পাকড়াবার লোভে।

গেরস্থের দরজা বন্ধ। পথচারী লোকদের পকেট বন্ধ। দোকানের ক্যাশবাক্সের মুখ বন্ধ। সমস্ত সদর চারদিক থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ। কোথাও কোনো খাবার নেই। এখন তবে ওরাই খাদ্য। নেছারের মনকে খায় স্মৃতির বিষাদে। মালিহার শরীরকে খায় হোটেলের বাবুর্চিতে, চাউলের ফড়িয়াতে, শান্তিরক্ষী কনস্টেবলে, অক্টয় অফিসের কেরাণীতে, রেশন ডিলারে।

দিকে দিকে বিভীষিকা ধোঁয়ার মতো পেঁচিয়ে ওঠে। মৃত্যুর ফাঁদ পাতা অন্তহীন রাস্তা জুড়ে। সেই ফাঁদের উপর দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ কান্না তুলে গড়িয়ে যায় চারচাকার ঠেলাগাড়ি। সেই অশরীরী আর্তনাদের আতংকে রাস্তার পাশের দেয়াল থেকে নোনা খাওয়া পলেস্তারা ঝুর ঝুর করে খসে পড়ে।

ভিখিরী পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে। শহরের যাবতীয় ভিখিরী ট্রাকে তুলে এনে আটক করে রাখা হচ্ছে একটা অতি সেকেলে অতি বিরাট বিল্ডিংয়ে। তার কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেটে মস্ত তালা।

সেখানেও নিস্তার নেই। ডাঁশা ডাঁশা স্বাস্থ্যের ভিখিরিণীদের আলাদা

করে রাখা হয়। যাতে কর্তারা এলে তাদের খাবার টেবিলে এনে তুলে দেওয়া হয়। বিদেশী সংস্থার সাহেবরা এলে রূপীবাঁদরের মতো বের করে এনে মুখ দেখিয়ে আবার ভেতরে নিয়ে আটকে রাখা হয়। এর পর পর ঝম ঝম টাকা আসতে থাকে। সে টাকা 'মানবসেবা'র নামে পাঠানো হয়। তাই খাঁচায় আটক অমানুষ নামানুষরা তার স্বাদ পায় না। মাঝে মাঝে এ গেটও খুলে হাট করে দেওয়া হয়। যখন চুণোমন্ত্রী পুঁটিমন্ত্রী কেউ আসে। ট্রাকে তুলে মিটিঙের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই পুরনো কায়দায়। মিটিঙ শেষ হলে মাঠ কুড়িয়ে আবার ট্রাকে পুরে খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে আনে।

কিছুদিনের মধ্যেই ভিখিরী পুনর্বাসনের কাজটাকে দুরকম পর্যায়ে ভাগ করে নেবার দরকার হল। এক ট্রাকে ভিক্ষের অভাবে শুকিয়ে যাওয়া লাশ বোঝাই করে নিয়ে শহরের বাইরে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসার কাজ। অন্য ট্রাকে যারা তখনও পর্যন্ত লাশ হয়ে পারেনি, তাদের তুলে নিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্রের গেটের ওধারে চালান করে দেওয়ার কাজ।

এই দুই ট্রাকের ফোঁকর দিয়ে এঁকেবেঁকে পিছলে শেষ পর্যন্ত সরে যেতে সফল হয় নেছার ও মালিহা। হুলিয়ার তাড়া খাওয়া দেশদ্রোহী যেমন ছদ্মবেশে পালিয়ে যায় স্বদেশ ছেড়ে। যাবার পথে এতদিনের আশ্রয়দাতা ঠেলাগাড়িটাকে তারা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে মাঝপথে হুলিয়ার প্যায়দা ট্রাকড্রাইভারকে ডেকে আনতেও পারত।

পাঁচবছরের ভিখিরী জীবনে যৎসামান্য সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল তারা। সেগুলো এতদিন কাজে লাগানোর সুযোগ জোটে। মালিহার পায়ে একজোড়া গোলাপী প্লাস্টিকের স্যাণ্ডেল। নেছারের পরনে ফুল-প্যান্ট। চব্বিশইঞ্চি মুহুরি। রঙটা সম্ভবত নীল ছিল কোন এককালে। হাতে চটের ঝোলা। তার মধ্যে সেরখানেক চিঁড়ে আর পোষাটাক কুশবের গুড়। আর আছে বিশডজনের মতো পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ সরবরাহকৃত কণ্ডোমের প্যাকেট। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে পঁচিশ পয়সা করে বিক্রি করা যাবে বেলুন নাম দিয়ে।

হ্যাঁ। আজ তারা গ্রামেই ফিরে যাচ্ছে। যেখানে নতুন সরকার ভূমিহীনকে ভূমি দেবে ওয়াদা করেছে। আরো দেবে ঘরবাড়ি, বিজলী বাতি, হালের গোরু। গ্রামই শক্তির উৎস। গ্রামে ফিরে চলো। সোনার দেশ গড়ে তোলো।

অতটুকু থলি, তবু তার ভারে নেছার পায়ের কাছে নুয়ে আসে। প্যান্টের

ঘষায় ঘষায় ঘা টাটিয়ে ওঠে। জলুনির চোটে আরো একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে। তবু বড় সুখ এতদিন পরে নিজের পায়ে হাঁটতে পেরে। ভিখিরীর জীবনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে শহরে। সেই সঙ্গে চার-চাকার ঠ্যালা আর মিথ্যে পক্ষাঘাতে অচল নিম্নাংগের চালাকি।

মালিহার গায়ে চচ্চড় করে জ্বর উঠে গেছে। তবু তৃপ্তি আর আশা এই মুহূর্তে ক্লান্তি কষ্ট সব জুড়িয়ে নিয়েছে। তার বগলে চাটাইমোড়া কাঁথা-বালিশের বোঝা।

যে গ্রামের সীমান্তে পৌঁছে ওদের চোখের উপর দিয়ে সূর্য তার বকেয়া আলো সরিয়ে নেবার চক্রান্ত করে, সেখানকার পথের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মধ্যিখানে শুকনো শিরদাঁড়া জাগানো গতবছরের নতুন মাটি ঢালা কাঁচা সড়ক। তার হাঁটুসমান হাবড়কাদায় সন্ধের আঁধার অগ্রিম থুবড়ে আছে। দুপাশে বদখদ চেহারার না-পগার না-বিল ঢাউস জলভূমি। কচুরীদামে ঢাকা। তলা দিয়ে পচা পানির গ্যাস্ উপ্‌চে উঠছে। মোটা একটা ঢোঁড়া সাপ টান টান হয়ে শুয়ে আছে কচুরী পাতার উপর। বিষ্ঠার বিষ্ঠার মতো হলুদ রঙের সরীসৃপে কোন জীবনক্ষণ নেই। ল্যাজের ডগাটুকুও নড়ে না।

মালিহার স্যাণ্ডেল আর চলবে না এখান থেকে। পেড়িকাদা বলে একে। মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়ে দুপাশের পচা পানি থেকে জোঁক উঠে আসছে লক লক করে।

গুড় গুড় করে মেঘের ডাক শুরু হয়ে যায় এই সময়।

বিশহাত দূরে কালো তালগাছ। তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো মানুষ। বাজপোড়া কুঁজো খুঁটির মতো।

তারা ওপার থেকে আসছে।

নেছার ও মালিহা দম ফুরনো বুকে নতুন করে বাতাস পুরে ন্যায়। তারপর পা টেনে টেনে তালগাছের কাছে পর্যন্ত যায়। গিয়ে হাঁপ ছাড়ে।

পঞ্চাশ বছরের যে মানুষটি লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, তাকে ঠিকমতো খুঁটিয়ে দেখার পর অদ্ভুত আদুরে গলায় ডাক দেয়,

অ এ্যাচিন চাচা তুমি?

ইয়াসিনের সাথে সাথে ঘোমটা ঢাকা মেয়েলোকটাও চমকে ওঠে।

নেছাব আরও খুঁটিযে দেখে, তাদেব পায়ের কাছে মাটিতে নামানো চাটাইমোড়া বালিশকাঁথা, সানকি আব ভোঁতা দা।

মালিহা ভাব বুঝে আগেই ঘোটা টেনে মুখ ঢেকে নিযেছে।

শব্দ নেই সাড়া নেই।

ইয়াসিন নামের নডবডে কঙ্কাল এক নজবে নেছাবেব দিকে তাকিযে আছে। পলকহীন শব্দহীন বঙহীন সেই মবাচোখ নেছাবের মুখ ছাডিযে শুশুকের পিঠের মতো পাঁশুটে রঙা আকাশেব মাথায অন্য কোথাও উঠে গেছে।

নেছার আবার দরদের ডাক ডাকে,

অয চাচা চাচাগো। চাচিরে নিয়ে যাও কোন্ দিশে?

ইযাসিনেব গলনালী দিযে এবাবে ফেটে যাওযা ফোঁডাব পুঁজ গলাব মতো গল গল করে শব্দ বেরিযে আসতে থাকে,

বাপ্ নেছাবদ্দি না? ওডে মা লক্ষ্মী তাই না? তোরা ক্যান এমুখো? বাজান আমবা যে শওরে যাব। শওর কোন্ দিকি ক'দিনি বাজান?

সেই দাঁতেব ঢাকনা বর্জিত লালচে গুহা। আব সেই লালচে দেযাল ক্রমাগত হাবিযে কালচে গুহার মধ্যে মিশে গেছে। তারো গোডায লালা জডানো লকলকে আলজিহ্বা। এই ভীষণ মহাশূন্যতাব দৃশ্য দেখে ভয পেযে যায নেছার। ফিশ ফিশ কবে শুধু বলতে পাবে,

গাঁও কি হলো চাচা? গাঁও? সেখানে তো সব ছেলো।

বুডো কি যেন বিড বিড কবে বকে। বোঝা যায না। দাডি ধবে টানতে থাকে। আবাব বিড বিড করে। যন্ত্রণায অস্ফুট কষ্টের আওযাজ হয। তাবপব হঠাৎ ফটাস কবে চেঁচিযে ওঠে,

ছেলো তো। এখন কিছু নাই আর। জমি নাই। ঘব নাই। ডুডে মেইয়ে তাও নাই। না খেযে বেযাৎ দিযে গেল। কববেব মাটিটুকুও নাই। যাবে ভোট দেলাম রাজা বানালাম, সিনি এক থাবায কেডে নিল সব। আমবা গাঁওগেবামিরা এখন ব্যাবাক পথেব ভিখিবি।

আরও অবাক না হযে এবাবে আর উপায থাকে না নেছাবদের।

সেই ভোট। সেই ইলেক্শন।

কি কও চাচা? ভোটবাজি গাঁওতেও তাহলে?

ইযাসিন ঘডঘডে গলায় বলে,

হা খোদারে। ঐ ইলেক্‌শানেই তো খেয়ে নেলো সব। কিচ্ছু জান্‌তো নাই আব। অবা ঢোকে ন্যাতা হয়ে, বেরোয় শকুন হয়ে। অরগো নিঃশ্বাসে পুড়ে মাটি তামাট্‌ হয়ে গ্যাছে। ঘাস জ্বলে কটাশে। প্যাটের নাড়ি ছাইগুঁড়া। গাঁওর পর গাঁও যাও। খালি মানুষ পচা গন্‌ধো। খিদেয় মরে। রোগে মরে। হুতোশে মরে। ন্যাতাগো ব্যাতের বাড়ি খেয়ে মরে। যাবা বাপ্‌? ছাখোগে কেমোন মচ্ছোব করে খায় কুড়িক কুড়িক মড়ী।

খুব ধীর গতিতে নেছারের শিরার রক্তটুকু চলাচল করে। কেউ শুনতে পায় না।

ইয়াসিনের পঞ্চাশ বছরের বঞ্চনায় শাদা চোখের উপর নেছারের ঠাণ্ডা চোখ ধীর প্রক্ষেপে হিংসার ও ক্রোধের বিষ পাতিয়ে ধরে। সেই চাহনিতে বিদ্ধ হয়ে কালো সন্ধে নামতে গিয়ে থমকে থেমে যায়। মাথার উপরকার কালো বিন্দুতে আটকে এসে ঝুলতে থাকে।

নেছার গুম গুম স্বর তুলে বলে,

কি চাচা, শহরে যাবা?

যাবো তো বাজান। যদি বাঁচাটুকু যায়।

শহর কি ছ্যায় জানো?

ক্যান? পয়সা টাকা খাবার। জানের যা যা নিদান।

হিংসা ও রাগের তাপে সুঁচলো হয়ে ওঠে নেছারের স্বর,

গন্‌ধো পাও চাচা?

বুড়োবুড়ি দুজনেই ছোঁক ছোঁক করতে থাকে। ইয়াসিন থুথু গিলে ফেলে বলে, হয়। গন্‌ধো তো কয়। পচা নাড়ি ওল্‌টানো গন্‌ধো না?

নেছার নিঃশব্দে তার ডান পায়ের ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে উরুতে তুলে আনে। তারপর শাদা কাপড়ের পট্টি খুলতে থাকে নিষ্ঠুর হাতে। খুলতে খুলতে খুলেই চলে শেষহীন ধাঁধার মতো। একসময় বেরিয়ে পড়ে সেই এলাকাটা। ঘষায় ঘষায় ওপরের গাদ কেটে শাদা মালাইচাকির হাড় বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ঝপ করে তরল কলতানিতে ভরে যায় চাঁদের মতো ঘেয়ো জায়গাটা। মাঠের মধ্যে থেকে শেষবেলার একঝাঁক মাছি উড়ে এসে ঘা'টা ঘিরে ভন ভন করে বৃত্ত রচনা করতে থাকে।

দুর্গন্ধ সইতে না পেরে ইয়াসিন নাকে গন্ধওয়ালা গামছা চেপে ধরে।

নেছারের চোখের চাহনি আরো নিষ্ঠুর আরো শীতল। দয়ামায়াবর্জিত কণ্ঠে বলে, শহর আরো কি দেয় দেখবা না চাচা। এই দেখো ভয়।

আকাশের মেঘে চড়াৎ করে চিড় ধরে যায় সেই তীক্ষ্ণ চিৎকারে।

এক ঝটকায় মালিহার মুখের ঘোমটা হটিয়ে কাঁধে নামিয়ে ফেলে নেছার। তারপর ডান হাতের আঙুল দিয়ে থুঁতনি তুলে ধরে দর্শকদের খোলা চোখের উপর।

সেই কনেছাখা শেষবিকেলের আলোয় গ্রামত্যাগী এক বুড়ো চেয়ে দেখে, একটি মেয়ের মুখের মাংস শহরের ব্যাধিতে খুবলে খেয়ে নিয়েছে। চাকা চাকা ঘায়ের অজস্র গর্ত। পুঁজ ভরা ফুসকুড়িতে ফাঁপা। মাংসপচা গন্ধে গ্রামের মানুষের গলার গোড়ায় তরল বমি গুলিয়ে ওঠে।

মোনালিসা

পূর্ণেন্দু পত্রী

৭

রবীন্দ্রনাথের 'শেষ কথা' নামের গল্পটা শেষ হয়েছিল এই বলে—

'খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল, নড়তে-চড়তে সেটা বাজে।'

জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েও অ্যাপোলিনেয়ারের অবস্থাটা তেমনি। হাজতবাসের পরমায়ু তো মাত্র সাতদিনের। অপরাধের আকারটাও এমন কিছু পাহাড়-চুড়ো নয়। একদিনের হাসি-ঠাট্টা, এক রাতের জমাট আড্ডার হৈ-হুল্লোড়ই যথেষ্ট, এমন পলকা অপমানকে মন থেকে পালকের মতো উড়িয়ে দিতে। হয়তো সেই রকম একটা ভাবনাকে মাথায় রেখেই ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আসর পেতেছিল ব্যাঙ্কোয়েট-এর। আর সেদিনও যখন চিরকেলে ঘরানাকে বজায় রেখে অ্যাপোলিনেয়ার হাজির হলেন ঠিক সময়ের অনেক পরে, মাংসের ডিস প্রায় কাবাব হবার মুখে, বন্ধুরা ভেবে নিয়েছিল, সব ঠিক হ্যায়।

—দেরি হল কেন?

—'প্যারিস-জর্নাল' ধরলে এখুনি একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে হবে। বসে, লিখে দিয়ে এলাম—'মাই লাইফ ইন প্রিসন'।

অ্যাপোলিনেয়ারের উত্তর, তাঁর সেই দিলদরিয়া মেজাজ, না-ভাঙা শক্ত সমর্থ চেহারা, আর মুখের ফুলঝুরি-হাসি দেখে বন্ধুরা বিশ্বাস করে নিলে জেলখানার অন্ধকার অথবা অপমান আদৌ নখ বসাতে পারে নি তাদের প্রিয় বন্ধুটির চৈতন্যে।

কিন্তু অ্যাপোলিনেয়ারের ভিতর-মহলের দেয়ালে তখন বেশ লম্বা একটা ফাটল। সেই ফাটলে কখন যেন গজিয়ে উঠেছে দুঃস্বপ্নের একটা চারা গাছ। আর তার শিকড়গুলো ক্রমশ গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে, ক্রমশ চারপাশে ছড়িয়ে, দখল করে নিতে চাইছে তাঁর সবকিছু।

হাজতবাসের দিনগুলোর কবিতা লিখেছেন একগুচ্ছ। বন্ধু-বান্ধবেরা তখনো খোঁজ পায় নি সেগুলোর। সেসব কবিতা অনেক পরে বেরিয়েছিল 'Alcools' নামের বইয়ে। সেই কবিতাগুলোর দিকে তাকালেই খানিকটা

আন্দাজ মিলবে অ্যাপোলিনেয়ারের তখনকার মানসিক ছাঁচের। বাঘা বুদ্ধিজীবী সেখানে হয়ে উঠেছে নগণ্য নাগরিক। না, নাগরিকও নয়। তার চেয়েও তুচ্ছ।

'রক্তকরবী'-র গোড়ার দিকে বিশু পাগলের মুখে একটা সংলাপ ছিল—

'আমি ৬৯ ৬। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ-পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়ো খেলা চলেছে।'

নিজের সৃষ্টির এলাকায় যিনি ছিলেন প্রাণবন্ত মানুষ, জেলখানায় এসে সেই তিনিই এখন হয়ে উঠেছেন নিছক একটা সংখ্যা। তাঁর 'আইডেনটিটি' গেছে মুছে। আত্মধিক্কারে তিনি দীর্ণ। বছরের পর বছর এখানকার পাথুরে পুতিগন্ধময় অন্ধকারে পচছে যে-সব দাগী অপরাধী, যারা দেয়ালে আসবাবপত্রে আঁচড় কেটে কেটে খোদাই করে রাখে নিজেদের নাম, নামের পাশে নিজেদের অপরাধ, অ্যাপোলিনেয়ার তখন তাদেরই একজন। হাজত-বাসের কবিতায় তাই কবি অ্যাপোলিনেয়ার অনুপস্থিত। যাঁর আর্তনাদ অথবা আক্ষেপ, তিনি মূহ্যমান একটি সাধারণ মানুষ।

১। সেল-এর ভিতরে ঢোকার আগে
তারা কাপড় খসিয়ে নগ্ন করল আমাকে
আর অশুভ স্বরে কার যেন হাঁক
গীয়ম, কি হয়েছে তোমার?

২। গর্তের ভিতরে ভালুকের মতো
রোজ সকালে হেঁটে বেড়াই আমি
ঘুরি, ঘুরি, অন্তহীন সে ঘুরপাক
আকাশের রঙ শিকলের মত নীল
গর্তের ভিতরে ভালুকের মতো
রোজ সকালে হেঁটে বেড়াই আমি।

প্রত্যেকটা কবিতাতেই ভীত, সন্ত্রস্ত, পরাভূত মানুষের সোজা-সাপটা কাতরতা। তাঁর অন্যতম জীবনীকার সেসিলি ম্যাকওয়ার্থ-এর ভাষায় এসব কবিতায়—

'There is no longer any trace of the man-of-letters, but only a bewildered frightened prisnor telling of his misery—just as Villon and Verlane had told of theirs, when vice or imprudence had led them into the same plight.'

শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, অবিশ্বাসীর উদ্ধত কণ্ঠস্বর একদিন নরম হয়ে গলে পড়ল ঈশ্বরের দিকে—'করো করুণাদান'-এর ভঙ্গিতে :

৩। আমার বরাতে কি আছে, হে ঈশ্বর, তুমি জান আমার কী দুর্দশা
তুমিই তো পাঠিয়েছ তাকে
দয়া করো আমার অশ্রুহীন চোখ দুটোকে, আর এই বিবর্ণতা
আর এই শিকল-আঁটা চেয়ারের বিকট শব্দ

বন্দীশালায় আছাড় খাচ্ছে যে-সব দুস্থ হৃদয়
আর সেই ভালবাসা যা হেঁটে এসেছে এখানেও আমার পিছনে
আর সবার আগে দয়া করো আমার মচকানো যুক্তিগুলোকে
আর সেই হতাশা যা ঘাড়ে চাপতে চাইছে তার

মুক্তি পাওয়ার পর অ্যাপোলিনেয়র যেন দু-খানা মানুষ। একটা প্রকাশ্য। আর একটা গোপন। প্রকাশ্য মানুষটা আড্ডা মারে বন্ধুদের সঙ্গে, হৈ হৈ হাসে, তর্ক করে ছবি অথবা কবিতা নিয়ে, প্রেম করে মারী লরেসাঁর সঙ্গে। আর গোপন মানুষটা, বন্ধু-বান্ধবের নজর এড়িয়ে ঝোড়ো-হাওয়ার দুপুরে শুকনো বাঁশপাতার মত কেবলই কেঁপে চলে অজানা এবং আসন্ন এক বিপদ-চিন্তায়। তিনি যে মুক্তি পেয়েছেন, সেটা অনেকটা সাময়িক। যেন মুচলেকায় বেরিয়ে আসা। পাকাপাকি মুক্তি বা 'official acquittal' পেতে সময় লেগেছিল প্রায় একবছর। এই দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত সময়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত নড়বড় করছে যেন। দুর্ভাগ্য যে-কোনো সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার উপর। মুছে যাবে অর্জিত খ্যাতি, নাম, স্বাধীনতা, এমন কি প্রিয় পোশাক-আশাক। যে দেশকে ভালবেসেছেন নিজের জন্মভূমির চেয়ে বেশি, আজ সেইখানে তিনি নিরাপত্তাহীন।, শুধু যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হওয়ার স্বাধীনতাটুকু নিয়েই বেঁচে আছেন সেখানে।

প্যারিস বলতে আমরা বুঝি বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গ। শিল্প-সাহিত্য নিয়ে যা খুশী পরীক্ষা-নিরীক্ষার অফুরন্ত সুযোগ সেখানে। আর স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর ঐ দেশে শিল্পীর জাত-পাত নিয়ে হল্লা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ককতোর আত্মচরিতে আমরা পড়েছি—তাঁদের যৌবনকালের ইতিহাস :

'All of us lived in Montparnasse—lived a life of poverty unencumbered by political, social, or national problems of any kind. When asked to name the great French artists of

my time I could answer: Picasso, forgetting he was a spanish; Stravinsky, forgetting he was a Russian, Modigliani, forgetting he was Italian. We formed a common front where contention was ordinary enough but were a kind of international patriotism prevailed. Such patriotism is a privillage of Paris and renders the city, more often than not, indecipherable to the world outside.'

আর আমাদের দেশের সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্যারিস ভ্রমণের দীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী'তেও এই আন্তর্জাতিক চেতনার জয়গান :

'যতই এ জাতকে দেখছি, ততই মনে হচ্ছে যে এদের সঙ্গে বাঙালীদের নাড়ির যোগ আছে। সমগোত্রীয় না হলে মাছখোর বাঙালী কি কখনও বৈষ্ণব প্রেমের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য গীতগোবিন্দ লিখতে পারে? ফরাসী দেশের trouvere (চারণ)-এর একখানা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ছবি দেখেছিলাম,—পোশাকের তফাৎ না থাকলে নবদ্বীপের নগর সংকীর্তনরত লোকের অঙ্গভঙ্গী বলে মনে হয়।... ..'যুক্তি'-র (Reason) কেন্দ্র প্যারিস মানবতার আহ্বানে ফরাসী বিপ্লব করে; ন্যায়ের কেন্দ্র নবদ্বীপ, মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রেমের বন্যা বওয়ায়। দুই জাতিই রাষ্ট্র ও সমাজনায়কের উপর আস্থাহীন। নিরীহ হলেও মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে ওঠে শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদে। ..মানবধর্মী বলেই বাঙালী ও ফরাসী দৃষ্টিভঙ্গী এত উদার ও মধুর। বিদেশী যে কেউ এসে, কেবল স্বীকার করে নাও এদের প্রাণধর্ম। সেই মুহূর্ত থেকে তুমি এদেরই একজন হয়ে গেলে। কেবল কবিতার ক্ষেত্রেই ধর না ফরাসী ভাষায়; Guillaume Apollinaire-এর মা পোলাণ্ডের লোক, পিতা অজ্ঞাত, Miles লিথুয়ানিয়ার লোক; Jules Superville-এর জন্ম উরুগোয়েতে; Tristan Tzara রুমানিয়ার লোক; Lautremont ও Laforgere বোধ হয় দক্ষিণ-আমেরিকার। এ জাত উদার মানবধর্মী হয়ে যায় না।'

মানবতা এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের এমন ঢালাও প্রশস্তির পরও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জাতীয়তাবাদের পাগলা-কুকুরের কামড়ে এমন উদার ও মধুর প্যারিসের মহান বুদ্ধিজীবীদের মগজও বিগড়ে যেত মাঝে মাঝেই। আর এক ধরনের ঈর্ষাময় সংকীর্ণতার ধনুষ্টঙ্কারে ভুগে ভুগে ধনুকের মত উদ্যত

হয়ে উঠতেন তারা ফরাসী সংস্কৃতির গৌরবময় পাদপীঠ থেকে 'বিদেশী হটাও'-এর সোরগোল তুলে।

হয়তো একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বাঙালির মত ফরাসী জাতের উদার মানবতা বা আন্তর্জাতিকতার শতকরা হিসেবটা ৫০ ভাগ। তাই ইতিহাসের নানা স্তরেই দেখা গেছে প্যারিস তার নিজের দেশের শ্রেষ্ঠতম সন্তানের সাহস ও সত্যবাদিতাকে সহ্য করতে পারছে না আদৌ। এর সবচেয়ে জলজ্যান্ত প্রমাণ ভিক্তর উগো আর রুশোর নির্বাসন। এক্ষেত্রে বিদেশীর দাপট যে সহ্যাতীত হয়ে উঠবে, সে তো স্বাভাবিকই। এত ভালবেসেও শেষ পর্যন্ত পাসকাল ঘেন্নায় বাস করতে চান নি প্যারিসে। আর কার্ল মার্কসকে তো প্যারিস ছাড়তে হয়েছিল মাত্র দিন কয়েকের নোটীশে। লুই ফিলিপের মুখে 'we must purge paris of the german Philosophers'। গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মিনিস্টার অব ইনটেরিয়র থেকে হুকুম—বাতিল করা হল 'Vorwart' নামের দ্বি-সাপ্তাহিক পত্রিকা। সেটা ছিল র‍্যাডিক্যাল জার্মান দার্শনিকদের মুখপত্র। আর দেশত্যাগের পরোয়ানা তাদের উপর, যারা এই পত্রিকার মেরুদণ্ড। প্যারিস অবশ্য খানিকটা উদার মানবিকতা দেখিয়েছিল মার্কসের উপর। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে উপরি আরো ২৪টা ঘণ্টা সময় মঞ্জুর করা হয়েছিল তাঁকে, গোছানো সংসারকে ভেঙে বাঁধা-ছাঁদা করতে।

দীর্ঘদিন প্যারিসে না থাকলে হয়তো ৫০ ভাগ আন্তর্জাতিকতার আড়াল ভেদ করে বাকি ৫০ ভাগ জাতীয়তাবাদ সহজে কারো চোখে পড়ে না। সতীনাথ ভাদুড়ী দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন প্যারিসের আলোয়-অন্ধকারে। তাই অবশেষে তাঁকেও লিখতে হয়েছিল—'ফরাসীরা উঠতে বসতে নিজেদের মাত্রাজ্ঞানের গর্ব করে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে নিজেদের সংস্কৃতির পদমর্যাদার কথা বলবার সময় তারা নিরঙ্কুশ কবির মাত্রাও ছাড়িয়ে যায়। একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করলে ধারণা হবে যে লিয়নার্দ দা ভিঞ্চির প্রধান কৃতিত্ব যে, তিনি ফ্রান্সে মারা যান, Cellini এবং Andrea del Sarto-র মতে ইটালীয়ান শিল্পীরা বিশ্ববিখ্যাত, তাঁরা ফরাসী রাজার দরবারে জায়গা পেয়েছিলেন বলে ; ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের ছবি না আঁকলে অজ Titian-কে কে পুছতো ? চিত্রকর Van Gogh-এর হল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে আসবার আগেকার ছবিগুলো আবার ছবি নাকি। ভাস্কর Hornander স্পেনে জীবন কাটালে কি যুদ্ধরত ষাঁড়ের মূর্তি ছাড়া আর কিছু তৈরি করতে পারতেন ? ..

ফরাসী বড়লোকেরা সেকালে সুরুচি আর দুর্নীতি দুটোই আমদানি

করেছিলেন ইটালির সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছ থেকে। ফরাসী চিত্রকলা বহুকাল নকল করেছে ইটালিয়ান ও ফ্লেমিশ চিত্রকলাকে। ইটালিয়ান শিল্পীরাই এসে ফ্রান্সে সত্যিকারের সুন্দর স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য লোকের এ কথা প্রাণ খুলে স্বীকার করতে বাধে।.. ফরাসী ভাষার পুরনো গাথা-মহাকাব্যগুলোর জন্যে এরা জার্মানদের কাছে ঋণী, কিন্তু কথাটা স্বীকার করতে তারা কুণ্ঠিত। নিউটন ও লক-এর যুগে ফরাসী চিন্তাশীল লোকেরা ইংলণ্ডে তীর্থ করতে যেতেন, একথাটা কোনো শিক্ষিত ফরাসী তোমার কাছে স্বীকার করবে না, যতক্ষণ না সে জানতে পারছে যে তুমিও Voltaire-এর Les Letters Anglaises পড়েছ।.. ..

সত্যি কথা বলতে কি, ফরাসী জাতটা ঈর্ষাপ্রবণ।..'

এই পরিপ্রেক্ষিতটাকে মনে না রাখলে আমরা বুঝতে পারব না, ঠিক কী ধরনের দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় পুরুলিয়ার খবার মতো জ্বলছে অ্যাপোলিনেয়ারের দিনগুলো। ঘটনার পারম্পর্য দেখলে মনে হয় যেন শত্রুপক্ষ এতদিন ধরে খুঁজছিল একটা মাহেন্দ্র ক্ষণ। 'মোনালিসা' চুরির সূত্রে ভুল অভিযোগে সাত দিন হাজতবাসের পর প্যারিসের মুক্ত বাতাসে মুক্তি নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই শত্রুপক্ষের মনে পড়ে গেল, এইতো, অমৃতযোগ। মুখ থেকে মহান উদারতার মুখোশ খুলে বেরিয়ে পড়লেন জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী পাণ্ডারা। 'মেটেক' (meteque) অর্থাৎ বিদেশী বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গেল বিষোদ্গার। প্রধান উপলক্ষ অ্যাপোলিনেয়ার। আর এই আন্দোলনের প্রধান পরিচালক যারা, প্রবল যাদের কণ্ঠস্বর, তাদের অনেকেই অ্যাপোলিনেয়ারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই বিদেশী-বুদ্ধিজীবীনিধন-যজ্ঞের প্রধান দুই পুরোহিত হলেন লিও দোঁদে আর আর্তুর ক্রাভান। এঁরা কারা? সে পরিচয় শোনা যাক সেসিলি ম্যাকওয়ার্থের মুখ থেকে। 'French writers have always enjoyed meddling with politics and a certain number of poets and novelists had made themselves the champions of the movement. Leon Daudet was their chief, fringing with him the prestige of his father's name and his own brutal and overwhelming personality. There was the poet and critic, Arthur Cravan, with his review 'Maintenant', in which he insulted everyone and slung the epithet 'Jew' at anyone who displeased him. Why Cravan, who was an adventurer of Irish

origin and claimed to be the son of Oscar Wilde, should have made himself the champion of French nationalism is not easy to understand.'

দোদে আর ক্লাভানকে বলা যেতে পারে এই আন্দোলনের চরমপন্থী নেতা। এঁরা দুজন রচনে অগ্নিগর্ভ। রচনায় আগ্নেয়গিরি। কিন্তু এই আগ্নেয় এলাকার বাইরেও অনেক বুদ্ধিজীবী ছিলেন যাঁরা নরমপন্থী, কিন্তু ফরাসী সংস্কৃতিতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের সমর্থক। আঁদ্রে সালমঁ, আঁদে বিলি, রেনে দালিজ জাতীয় কিছু বন্ধু এই দুঃসময়ে কলম ধরেছে অ্যাপোলিনেয়ারের পক্ষেই।

অ্যাপোলিনেয়ারের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের অভিযোগ কি? সংখ্যায় অনেক।

এই লোকটার সব কিছুই গোপন। কোথা থেকে এসেছে, কি করে, কি ভাবে, তার অভ্যাস কি, কাজকর্ম কি, কিছুই ভাল করে জানবার উপায় নেই। এমন কি, কে তার বাবা, কি তার জন্ম ইতিহাস তাও অজানা।

'প্যারিস স্কুল' নামে প্যারিসে যে নতুন চিত্রধারার সূচনা হয়েছে, তার পিছনে ফরাসীর চেয়ে স্লাভ, জার্মান আর এ্যাংলো-স্যাকসনদের প্রভাবটাই বড। আর এই 'প্যারিস স্কুল' চিত্রধারার প্রধান পাণ্ডা তো ঐ অ্যাপোলিনেয়ার। 'কিউবিজম' আর 'প্যারিস স্কুল', একে অন্যের প্রতিশব্দ। এই 'কিউবিজম'-এর প্রতিষ্ঠাতা কারা? পিকাসো—তার দেশ স্পেন। জঁ গ্রীও স্পেনের। আর পিকাবিয়া তো হাফ-স্প্যানিয়ার্ড। আর আছে সেভেরিনি। সে ইতালিয়ান। মারিনেত্তিও তাই। বাকি যারা অল্পখ্যাত —তাদের কেউ জার্মানির, কেউ পোলাণ্ডের, কেউ আমেরিকার। কবিতাই বল, আর ছবিই বল, যে সব ভাঙচুর চলেছে, পিছনে মগজ তো ঐ একজনেরই।

হাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার তিনমাস পরে ছেলেবেলার বন্ধু Toussaint-কে এক চিঠিতে মনের যাবতীয় গোপন জলুনি-পুড়ুনি উজাড় করে দিয়ে অ্যাপোলিনেয়ার লিখছেন—'তোমার চিঠির উত্তর দিতে পারিনি সময়মতো। কেননা সেটা আমার লেখার টেবিলের কাগজপত্রের জটলার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। আবার এখন সব গোছাতে শুরু করেছি। আমার ঐ চলে যাওয়ার ফলেই এই সব ঘটেছিল।

তোমার ঠিকানাটাই পাই নি একদিন। পেয়েই লিখতে বসে গেছি। এখন থেকে নিয়মিতই চিঠি লিখব তোমাকে। আশা করব এর ফলে

ছেলেবেলা থেকে বন্ধু এমন দুজন মানুষ পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হবে।

আমার ঐ ঘটনার ঘা থেকে আমি এখনো পুরোপুরি সেরে উঠতে পারিনি। কবে এর সমাধান ঘটবে, তার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। 'L' Ceuvre' আমাকে আক্রমণ করেছে, একজন বিদেশী বলে। আমার অপরাধ আমি Anetino, Sade ইত্যাদির অ্যানথোলজি সম্পাদনা করেছি। ভয়ে আধমরা হয়ে আছি, মনের শুধু এইটুকু ক্ষীণ আশা নিয়ে যে একা আমাকে আবার অভিযুক্ত করবে না। এই চিঠির কথা কাউকে বলো না। অদূরদর্শিতার পরিণাম সব সময়ই ভয়াবহ।

কি করে, এবং কি ভাবে আবার স্বাভাবিক হতে পারব, এ নিয়ে একটু ভেব। যদি ফ্রান্স থেকে সত্যিই তাড়িয়ে দেয়—কি হবে আমার? এই উদ্বেগ আমাকে এখন কোনো কাজেই মন বসাতে দিচ্ছে না। আমি শান্তি চাই।° চাই অজ্ঞাত জীবন। কিন্তু আমি হয়ে রইলাম চির-নির্যাতিত।'

ভাস্কর, তোমার খোদাই ছিল

সিদ্ধেশ্বর সেন

তোমার খোদাই ছিল, ভাস্কর, তোমার মনে
তাও দেখালে আবার, কুঁদে,
বস্তুর গড়নে

বস্তুর বিম্বই ছিল তোমার মনে বা চোখ ও মননে
ধান-ঝাড়াইয়ে পেলে তুষ আর শস্যের ছড়া
আলাদা-আলাদা ধরা, যেমন পারস্পরিকে, পৃথকীকরণে

এ-ও তেমনি মনের নিজস্ব বাছাই
ঝাড়াইও বটে, এই কাজ করে-চলা, করা,
কে তা করে—চৈতন্যের অভিপ্রায় ছাড়া

চৈতন্য অর্থাৎ
প্রকৃতি যাইবা দিলে তাকে তা ফিরিয়ে
দেওয়া, অঋণী-অপ্রবাসী যেন, অথচ মনের
সোহাগা মিশিয়ে
ভিন্নতর রসে, রূপে, প্রয়াসে, রূপান্তরণে,

চৈতন্যই—
অর্থাৎ বস্তু প্রকৃতি—অবয়ব, মাত্রা, ঘনত্ব ও মাপজোকে
নানা বিভঙ্গে রেখায়, এক্ষেত্রে, নানান কোনাকুনি থেকে
উপ্‌চে দেখা

দৃশ্যটিকে
বিশিষ্ট স্থাপনে রেখে, এমনকি অতিবেকে, ব্যতিক্রমে
মূর্তে-অমূর্তে পাওয়া—যতখানি যেতে পারে
পাওয়া ততোই—
কিন্তু কম নয়

তাহলে, ছায়াআলোয় শূন্যতাও ভরে, নড়ে-চড়ে,
ছড়িয়ে-ছাপিয়ে ওঠে, গতি পায়
এমন দেখবার চোখ হলে

পাখির চোখ প্রাণীর চোখ সর্বভূমিষ্ঠের চোখ
যেমন ফোট্‌বার, বেলা আপনিই ফোটে ॥

আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্পরূপ-সন্ধান

অরণ্যের অধিকার। মহাশ্বেতা দেবী। করুণা প্রকাশনী। দাম ১৬ টাকা

গত শতকের শেষের দশকে ভারতবর্ষের বিহার রাজ্যের অরণ্যভূমি ছোট নাগপুরের মুণ্ডা উপজাতীয় আদিবাসীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিদ্রোহ করেছিলেন, তাকে মহাশ্বেতা দেবী তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। শহিদ মুণ্ডারি নেতা বীরসার নামে এই বিদ্রোহের যে-সব গাথা বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই ছোট নাগপুরের আদিবাসীদের গানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হলেও আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যের সদর পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি এতদিন, মহাশ্বেতা দেবী তাদের একটানে উপন্যাসের শিল্পরূপে এনে ফেলেছেন, এটা প্রথমেই লক্ষণীয়। বাংলা উপন্যাসের এটা গর্বের ব্যাপার। বাংলা উপন্যাসের বিস্তার ও গভীরতার এই 'অরণ্যের অধিকার'। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে চাপা পড়া ছোট নাগপুরের আদিবাসীদের মুক্তিযুদ্ধের নায়ক-নায়িকাদের পুনরুত্থান ঘটেছে এই উপন্যাসে। তার শিল্পী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী বাংলা উপন্যাসকে বাংলা ভাষীদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাষা-ভাষীদের কাছে আদরণীয় করে তোলার কাজেও বড় রকমের সংযোজন করলেন।

যে-আদিবাসী মুণ্ডাদের নিয়ে এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে, তাঁদের পরিপূর্ণ বিপ্লবী অভ্যুদয় ইতিমধ্যে নিশ্চয় আসন্ন হয়ে উঠেছে এবং তাঁদের মাতৃভাষায় বড় ধরনের কাব্য ও উপন্যাসও নিশ্চয় আসন্ন। তবে বাইরে থেকেও বিপ্লবী অভ্যুদয়ের একটা বহিরূপ রূপ দেয়া যে সম্ভব তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে দেশ-দেশান্তরের উপন্যাসের শিল্পরূপের সাধনায়। মাতৃভাষা যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত ধরনের শিল্পরূপকে দখলে নিচ্ছে, ততদিন অন্য ভাষা তার কাজকে কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কালো আফ্রিকায় বিশেষ করে মুক্তি যুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এটা ঘটছে গত কয়েক দশক ধরে। এতে অবশ্যই সমগ্র সত্যকে তার সমস্ত সূক্ষ্মতায় পাবার আশা করা যায় না। তবু, এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপক পরিচয় ঘটছে এই

সমস্ত সমস্যার। মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার'কেও আমরা এই কৃতিত্ব দেব নিশ্চয়।

আলোচ্য 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের কাহিনী নির্বাচণ সুষ্ঠু। বীরসার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ ছিল একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক রাজের বিরুদ্ধে, ও ব্রিটিশ শাসকদের ধারকবাহক মহারাজা জমিদার মহাজনদেরও বিরুদ্ধে। ব্রিটিশের বন্দুক ও বেয়নেটের মোকাবেলা করেছিল আদিবাসীদের তীর-ধনুক ও বল্লম। স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। উনিশ শতকেরই মধ্যভাগে সাঁওতাল পরগনা ও সন্নিহিত এলাকার সাঁওতাল আদিবাসীরা নিজ বাসভূমে অধিকার-পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বেলেছিলেন, তাতেও একজন তরুণ মুণ্ডা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বীরসার নেতৃত্বে আয়োজিত মুণ্ডা-অভ্যুত্থানে তাদেরও ভূমিকা ছিল। তবে অরণ্যের অধিকারের বিদ্রোহের উদ্ভব, ছাঁচ, ধ্যান-ধারণা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। মুণ্ডা আদিবাসীদের 'পুরাণ' থেকে এসেছে এই বিদ্রোহের মন্ত্র। নেতা বীরসাকে বিদ্রোহী মুণ্ডারা প্রেরিত ভগবান বলে মনে করেছেন। এই মুণ্ডা বিদ্রোহের রণধ্বনি ছিল 'উলগুলনি'। আবার বিশ শতকের শুরু হতে যাচ্ছে, তখনকার বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বীরসা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে পড়েছেন। আধুনিক শিক্ষা না হলে যে দারিদ্র্য ও পরাধীনতার জিঞ্জির ভেঙে বেরিয়ে আসা যাবে না, এই চিন্তা করে বীরসা মিশনারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন এবং খ্রীস্টানও হয়েছিলেন। কিন্তু আচারে আচরণে মুণ্ডারি না হলেও সমস্ত মুণ্ডাদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে নামা যাবে না, এ কথাটা বীরশা মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন। সেই জন্যেই দেখা গেল, হাজার-হাজার বছরের মুণ্ডা-মানস বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে প্রতীকী হয়ে উঠল। বীরশা ভগবান হিসেবে সামনে এলেন এই কারণেই।

কামান-বন্দুকের সামনে অবশ্য বীরশা ও বীরশাহিরা তীর-ধনুক বল্লম নিয়ে তাঁদের বিদ্রোহকে রক্ষা করতে পারেন নি। অরণ্যের ঘাঁটিতে বীরশা ধরা পড়লেন ব্রিটিশের সেপাইদের হাতে। শত শত মুণ্ডাও গ্রেপ্তার হলেন সংগ্রামের ধারায়। বীরসার মৃত্যু হল রাঁচি জেলে কলেরায়, বিচারাধীন থাকার সময়। যাঁরা পুলিশ কিংবা ফৌজের গুলিতে কিংবা জেলখানার নিদারুণ নিগ্রহে মরলেন না, তাঁদের তিনজনের ফাঁসি হল। অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। যাদের কম-মেয়াদের সাজা হল, তাদের

মধ্যে মেয়েরাও ছিলেন।

এই বিদ্রোহ যে প্রশমিত হয় নি, তার প্রমাণও দাখিল করা হয়েছে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে। এই সমস্ত ব্যাপারগুলোই ইতিহাসের সত্য ঘটনা। অর্থাৎ মূল ঘটনাগুলো নিয়ে যে কাঠামো, সেখানে কোনো কল্পনা স্থান পায়নি। বীরসা সম্বন্ধে ছোটনাগপুরে এবং বিশেষ করে রাঁচিতে একটা কাহিনী বিশের দশকে প্রচারিত ছিল। সেটা এই যে, বীরসার ফাঁসি হয়েছে। উপন্যাসের কোন কোন ঘটনার বর্ণনার সঙ্গে সেদিনকার লোকশ্রুতির পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর মূল কাহিনীকেই আমরা শতকরা শতভাগ সঠিক বলব।

তবে 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসকে এর রচয়িত্রী যে কল্পনায় ভরে দিয়েছেন, একথাটাও এখানে বলতে হবে। যদিও বাস্তবের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই তিনি কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছেন, তবু যেসব মুণ্ডা নরনারীচরিত্রকে তিনি সামনে এনেছেন এবং তাদের দিয়ে যেসব কথা বলিয়েছেন, তাদের অনেকটাই একান্তভাবে শিল্পমানসের ধারণা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

এদিকটা মাঝেমাঝে এত প্রবলভাবে প্রচণ্ড আবেগে উপস্থাপিত হয়েছে যে, 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাস পড়ে কোথাও-কোথাও মনে হতে পারে, বস্তুভিত্তিক উপন্যাস এক্ষেত্রে বুঝিবা অনুভূতিপ্রধান কাব্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাসটি মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের বস্তুপ্রাধান্যের পাশাপাশি একেবারে একটি ভিন্নধরনের কাজ।

মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা'র পাশাপাশি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের বীরসার মায়ের চরিত্রের একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে মাতৃহৃদয়ের তরফ থেকে। কিন্তু 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা ও তার মা করসির যে কোমল কাব্যিক রূপকথার ধরনের মমতার ছবিগুলি রয়েছে, সেগুলো কিছুটা বিস্ময়কর নিশ্চয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বোধহয় এই যে, মহাশ্বেতা দেবী তাঁর আদিবাসীদের বিদ্রোহের এই কাহিনীকে এমনভাবে রূঢ়তা থেকে মুক্ত রাখলেন কি করে?

বীরসার প্রতি সালীর ভালবাসার যে বর্ণনা এতে রয়েছে এবং সালীকে যে একটি প্রাণবন্ত রূপ দেয়া হয়েছে, তাতে কোনো বিকৃতির ছায়া পড়ে নি।

মহাশ্বেতা দেবী মুণ্ডাদের দারিদ্র্যেরও বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত জীবনকে একান্ত সত্য করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই দুর্বিপাকের মধ্যেও মুণ্ডা নারীপুরুষ কেউ অশ্লীলভাষী হয়ে ওঠে নি। এটা কি বীরসার প্রভাবে ঘটেছিল?

এর মূলে যাই থাক না কেন, এতে আশাহত হবার বদলে আশান্বিত হওয়া উচিত।

বিদ্রোহ বা বিপ্লব যখন যেখানে এসেছে, তখন সেখানে একটা সুস্থতার এবং উন্নত মানবিক মূল্যবোধের তরঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটেছে। এটা আমাদের অনেকের বাস্তব অভিজ্ঞতা। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি এই অভিজ্ঞতাকে জোরদার করবে।

যুগযুগ ধরে যারা অরণ্যের আদিবাসী হিসেবে সহজ সরল সম্পর্কের জীবনযাপন করে এসেছেন, তাদের স্বাধীনতা ও সাম্যবাদী সমাজের ধ্যান-ধারণাগুলিতে একটা স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতা থাকবে এটা স্বাভাবিক। সেদিক থেকে বীরসা এবং তাঁর সংগ্রামী সাথীরা স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতায় স্বাভাবিকভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। লোকায়ত বিদ্রোহের কাহিনীতে তাই কোমলতা একান্ত সত্য। রমাঁ রলাঁর মতো মানবিক মূল্যবোধ সচেতন কথাশিল্পীও যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে লোকায়ত চরিত্র চিত্রিত করতে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে রূঢ় হচ্ছেন, সেটা একান্ত সত্যের আরেকটি দিক। সেইভাবেই আমরা মহাশ্বেতা দেবীর অন্যান্য লেখার পাশে 'অরণ্যের অধিকার'কে দেখতে পারি।

জীবনের সত্যের একদিকে রয়েছে কোমলতা, আরেকদিকে রয়েছে রূঢ়তা। এ দুটোর কোন একটাকে কাউকে সর্বময় মনে করতে দিতে পারেন না কোন সত্যের শিল্পী।

নৈরাশ্য ও আত্মতুষ্টি দুইই জীবনে অর্ধসত্য। বস্তুবাদী এবং ভাববাদী উপন্যাস ও কাব্য পড়তে পড়তে অনেক সময় আমরা এই অর্ধসত্যের ফাঁদে পা দিয়ে বসি।

একটি ব্যর্থ বিদ্রোহের কাহিনী পেশ করতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী যে আদিবাসী নরনারীদের অন্তরের মধ্যে উলগুথানের অপরাজেয়তাকে উৎসারিত হতে দেখতে পেয়েছেন, সেটা সত্যের দ্বৈতরূপের উপলব্ধি থেকেই এসেছে নিশ্চয়।

রণেশ দাশগুপ্ত

পঞ্জি-সংকলন ও আধুনিক বাংলা কবিতা

বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি। অরুণ সেন গান্ধার। পরিবেশক : অয়ন। দাম ৮ টাকা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বছরে কোনো সমালোচককে অনুযোগ করতে শোনা গিয়েছিল, আমাদের সাহিত্যে গ্রন্থ-তালিকা যদি বা আছে গ্রন্থপঞ্জি—আধুনিক 'গ্রন্থবিজ্ঞানসম্মত পঞ্জি' নেই। প্রসঙ্গত 'বিব্লিঅগ্রাফি' কথাটির অপব্যবহারের অভিযোগও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসু করেছিলেন। ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ'-য প্রকাশিত উল্লেখিত বিভিষ্যু-নিবন্ধটি পরবর্তীকালে তাঁর 'সাহিত্য-লোক' গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

আলোচ্য বইটি ('বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি' : অরুণ সেন) হাতে পেলে তিনি (শুধু তিনিই বা কেন? আরো অনেকেই) নিশ্চয়ই খুশি হবেন। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় দুটি দশক অতিক্রান্ত। এ-সময়কালের মধ্যে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো 'গ্রন্থপঞ্জি' শাখাটিরও যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। আর তা ঘটেছেও। ১৯৭০-এ প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়'-এর আদি এবং শ্রেষ্ঠতম লেখকদের অন্যতম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর রচনাপঞ্জি ('ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : জীবনী ও রচনাপঞ্জি' : অলোক রায়); তিন বছর পর ১৯৭৩-এ ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি প্রকাশ করেছেন 'স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জি' (শ্রীঅমলেন্দু দে ও বিনয়ভূষণ রায় সংকলিত)। একই বছরে একনিষ্ঠ রবীন্দ্র গবেষক / গ্রন্থপঞ্জি-বিশারদ শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী সেন মশায়ের 'রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী' (১ম খণ্ড) তো আমরা পেয়েছি। বিব্লিঅগ্রাফি শাস্ত্রে অসামান্য সংযোজন হিসেবে তো বটেই, 'রবীন্দ্র গ্রন্থকোষ' হিসেবে এ-পুস্তক স্বীকৃতি পেয়েছে। এ-ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা / সম্মান সংখ্যায় আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের রচনাপঞ্জি সংকলিত হয়েছে। এ-ধারারই সাম্প্রতিকতম নিদর্শন 'পরিচয়' পত্রের 'গোপাল হালদার সম্মান সংখ্যা'য় সংকলিত শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার-রচনাপঞ্জি। তাঁর সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জি অবশ্য এখনও অসংকলিত।

অরুণ সেন-কৃত 'বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি'র অনন্যতা এইখানে যে তিনিই প্রথম জীবিত লেখক-কর্মীর যাবতীয় রচনাবলী গ্রন্থবিজ্ঞানরীতি অনুযায়ী সংকলন করে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন। সেদিক দিয়ে পথিকৃৎ-এর মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য। আর বলা-ই বাহুল্য এ গ্রন্থ প্রকাশের নেপথ্যে

রয়েছে সুদীর্ঘকালের একনিষ্ঠ মনন এবং পরিশ্রম। 'সাম্প্রত' [রচনাপঞ্জির পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭২] ত্রৈমাসিকের বিষ্ণু দে সংখ্যা, 'পরিচয়', 'বিষ্ণু দে-র সপ্ততিবর্ষপূর্তি সংখ্যা', [মে-জুন ১৯৭৯] এবং এরও আগে শেষোক্ত পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় [কালানুক্রমে এটিই প্রথম], একালের এই অন্যতম প্রধান কবি ও 'মননব্রতী'র রচনাপঞ্জি প্রকাশের পর, অবশেষে 'গান্ধার' প্রকাশিত 'বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি' পুস্তক।

রচনাপঞ্জি সমালোচকের প্রয়োজনে তো লাগেই। তাছাড়া পাঠক-সাধারণও এর কল্যাণে তথাকথিত সমালোচকের 'অনুমান-সর্বস্বতার দৌরাত্ম্য' থেকে রেহাই পান। এককথায়, রচনাপঞ্জি কাব্য / সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার একটা বয়স্ক পরিপ্রেক্ষিত তৈরির কাজে সাহায্য করে—একথা বললে ভুল হবে না। পঞ্জিতে পাওয়া যায়: ১ রচনা / পুস্তকের নাম; ২. প্রকাশের স্থান ও কাল; ৩. মুদ্রক, প্রকাশক (পুস্তকের ক্ষেত্রে) ও মুদ্রাযন্ত্রের নাম; ৪. পৃষ্ঠা সংখ্যার বিস্তৃত তথ্য, (সূচিপত্র, শুদ্ধিপত্র, লেখকের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি), ৫. উৎসর্গপত্রের (পাত্রেরও) বিবরণ; ৬ বিভিন্ন সংস্করণের বিবরণ। এ ছাড়া প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়া গেলে, সেটা বাড়তি লাভ। প্রচ্ছদপট সম্পর্কে তথ্যাদিও পঞ্জিতে স্থান পাবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক পঞ্জির (আমরা তারই আলোচনা করছি; বিষয়কেন্দ্রিক রচনাপঞ্জি আলোচনায় আনলে আরো উদাহরণ / উল্লেখের প্রয়োজন হতো) ক্ষেত্রে পঞ্জিকাকারের সাফল্যের জন্য চাই যাঁর রচনাপঞ্জির অবলম্বন তাঁর জীবনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়। শুধু লেখক-জীবনের নয়, ব্যক্তিজীবনেরও। অরুণ সেন-এর গ্রন্থ এ-সব শর্তাবলি পূর্ণ করেছে বলা যায়। 'পরিচয়' ছাড়াও, অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় বিষ্ণু দে-র গ্রন্থাদি (কাব্য ও প্রবন্ধ) নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন অন্তত দেড় দশক ধরে।

'বিষ্ণু দে-র রচনাপঞ্জি' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের বিবরণ এ-রকম: ১. ৮৩ পৃষ্ঠার 'পঞ্জি'। ১৯২৮-১৯৭৯ এই সময়বৃত্তের মধ্যে কবির যাবতীয় রচনা (গ্রন্থাদি ছাড়াও পুস্তক-সমালোচনা, চিঠিপত্র, মায় পাদটীকাও এখানে সংকলিত)। ২. 'মুখবন্ধ'। ৩. 'রচনাপঞ্জির সূত্রে কয়েকটি কথা' (পৃঃ ক-ট)। ৪ 'লক্ষ্য ও পদ্ধতি' (ঠ-ঢ)। ৫. 'সংশোধন ও সংযোজন' (ণ-দ)। ৬. কৃতজ্ঞতা-স্বীকার' (দ-ধ)। ৭. 'সংকেত'। এবং সবশেষে, ৮. 'বর্ণানুক্রমিক সূচি' (পৃঃ ৮৪-৯৮)। এ ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য ৪টি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে প্রচ্ছদ-পটের আলোক চিত্র। গ্রন্থগুলি হল 'উর্বশী ও আর্টেমিস্', 'চোরাবালি',

'অন্বিষ্ট' ও 'সমুদ্রের মৌন'। প্রথম ২টি গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্র দেখার সুযোগ বর্তমান আলোচকের মতো অনেকেরই হয়নি বলেই মনে হয়। সেজন্য একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে এই আলোকচিত্রগুলি এ-বইয়ের বিশেষ আকর্ষণ। তৃতীয় অর্থাৎ 'লক্ষ্য ও পদ্ধতি' অংশে অরুণ সেন একথা জানিয়েছেন: 'এক হিসেবে' এই পঞ্জি তাঁর 'মূলকাজের অংশ' বা 'বাই প্রোডাক্ট'। 'মূল কাজ', বলাই বাহুল্য বিষ্ণু দে-র কবিতাপাঠ এবং সে সম্পর্কে আলোচনা। ঐ অংশেই আবার আরো স্পষ্ট ভাবে বলেছেন 'গ্রন্থপঞ্জি শাস্ত্র অনুমোদিত নয়' এ-রকম 'স্বাধীনতা' তিনি গ্রহণ করেছেন। পঞ্জি রচনার সাধারণ পদ্ধতি অর্থাৎ 'লেখকের বিভিন্ন ধরনের রচনা আলাদা বিভাগে বিন্যস্ত করা'—তিনি এখানে অনুসরণ করেন নি। 'কালানুষঙ্গ প্রতিষ্ঠা'ই যেহেতু তাঁর 'প্রধান লক্ষ্য', সে-কারণে 'এক-একটি কালপর্বে লেখকের গৌণ-অগৌণ সব রচনাকে'ই তিনি একত্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, পূর্বে উল্লেখিত ১৯৭২-এ প্রকাশিত 'সাম্প্রত' পত্রিকার বিষ্ণু দে সংখ্যায় (সেটাই আবার ঐ কাগজের ১ম সংখ্যা) কিন্তু অরুণবাবু পঞ্জি রচনার সাধারণ পদ্ধতি, বা তাঁর ভাষায় 'গ্রন্থপঞ্জি রচনার ব্যাকরণ'ই অনুসরণ করেছিলেন। তবে সেটা হয়তো তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কাল। ইতিমধ্যে তিনি মনস্থির করেছেন যে বিষ্ণু দে-র 'সৃজনের আবহ' / 'মানসিক আবহ' ফুটিয়ে তুলে তাঁর 'সৃষ্টিকর্মের পারস্পরিকতা ও সমগ্রতা ও প্রগতিকে প্রত্যক্ষ গোচর করা'ই বেশি জরুরি। এবং সেজন্য এমনকি গ্রন্থপঞ্জি শাস্ত্রে অননুমোদিত 'গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা' গ্রহণ করা যায়। এবং তা তিনি করেছেনও।

তৃতীয় অংশে ('রচনাপঞ্জি সূত্রে কয়েকটি কথা') সংকলক সামগ্রিক ভাবে কবির সৃষ্টিকর্মের (১৯২৮-১৯৭৯) পটভূমি এবং তার বিভিন্ন পর্যায় সংক্ষেপে যে আলোচনা করেছেন তা মূল্যবান, যেমন মূল্যবান ভিন্ন কারণে অষ্টম অংশের বর্ণানুক্রমিক সূচি। পূর্বে উল্লেখিত 'কয়েকটি কথা'য় (তৃতীয় অংশ) 'বিচিত্রা', 'ধূপছায়া' থেকে শুরু করে 'কল্লোল', 'কবিতা', 'পরিচয়', 'সাহিত্যপত্র'-পর্ব পর্যন্ত এ-কালের বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান এই পুরুষের সাহিত্যরুচি ও নন্দন, বিশ্ববীক্ষা এবং ছন্দ ও অঙ্গিকের বিবর্তন ও বিকাশের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস আলোচিত, আগেই এ-বিষয়ে ইঙ্গিত করেছি। এর মধ্যে বিতর্কিত (এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ) অংশ হল 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ পর্ব। সময়ের দিক থেকে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল—যখন, অরুণ সেনের ভাষায় 'কমিউনিষ্ট জগতে বিশেষত শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারে মতান্ধতা ও একদেশদর্শিতা মাথা চাড়া

দিয়ে উঠেছিল।' আর বিষ্ণু দে-র সাহিত্য রুচি ও নন্দনে এই গোঁড়ামি ও মতসর্বস্বতা গ্রহণ করা অসম্ভব। ফলশ্রুতি: 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ, 'সাহিত্যপত্র'-র প্রকাশ এবং তাঁর 'সরকারী সাম্যবাদী মহলের দ্বারা পরিত্যক্ত ও নিন্দিত' হওয়া। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মার্কসবাদী মহলে সাহিত্যশিল্প বিষয়ে মতান্ধতা কিন্তু আজও দূর হয় নি। যদিও এ-মহলে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মশায়ের মতো মানুষকেও বলতে শোনা গেছে 'ডক্‌ট্রিনেয়ারিজম·· শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোনদিনই মেনে নিতে পারিনি। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের তত্ত্ব দিয়ে সব সাহিত্যেরই ব্যাখ্যা হয়, তা বুঝতে অসুবিধে হয়েছে। ·আলোচনা চলেছে রেবতী বর্মণের সঙ্গে।' ('সমগ্রকেই সত্য বলে মানি': সিদ্ধেশ্বর সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৯৬৬; 'কালান্তর', বিশেষ সংখ্যা)।

বস্তুত আলোচ্য পর্বে, অনেকেরই মনে পড়বে, বিষ্ণু দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের মার্কসবাদী শিবিরে 'ট্রয়ের ঘোড়া' বলে মনে করা হতো। এতটাই বিচলিত হন আক্রান্ত বুদ্ধিজীবীরা যে তাঁরা সরকারী সাম্যবাদী মহল কর্তৃক গৃহীত এ-সমস্ত তান্ত্রিক সূত্রাবলি প্রসঙ্গে রজনী পাম দত্তের মত জানতে আগ্রহী হন ('ভবানী সেন: ট্রিবিউটস্', ১৯৭২; পৃ: ৭১-৭২)।

এ-পর্বেই বিষ্ণু দে-র সঙ্গে নিবিড় পরিচয় গড়ে ওঠে চিত্র-শিল্পীদের সঙ্গে: একদিকে যামিনী রায়, অন্যদিকে ক্যালকাটা গ্রুপের নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, প্রাণকৃষ্ণ পাল প্রমুখ। এই অংশে এ দিকও আলোচিত। যেমন আলোচিত সুধীন্দ্রনাথ (এলিয়ট-প্রীতির সূত্রে) ও বুদ্ধদেব বসু-র যোগা-যোগের কথা।

মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। রচনাপঞ্জিতে উৎসর্গপত্রের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন একথা তো সুবিদিত। এই উৎসর্গপত্রকে বলা যায় কবি বা সাহিত্যিকের 'আত্মপরিচয় পৃষ্ঠা'। বিশদ বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে এই উৎসর্গপত্রের আলোকে তাঁর 'জীবন ও মানস বৈশিষ্ট্যের কিছু গূঢ় পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব'। এ ছাড়া এই উৎসর্গপত্রের সমাজ-বৈজ্ঞানিক দিকও আছে। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী শুশ্‌কিং তাঁর 'দি সোস্যিওলজি অব লিটরেরি টেস্ট' গ্রন্থে এ-বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। অরুণ সেন অবশ্যই উৎসর্গপত্রের বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু উৎসর্গপত্রের দিকে নজর সব সময় দেন নি। খুলেই বলা যাক, এই পঞ্জি-পুস্তকে আমরা

পাচ্ছি শুধু সেইসব ব্যক্তি-নামেরই উল্লেখ, যাঁদের এই কবি-সমালোচক কোন পূর্ণ গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন। কিন্তু বিশেষ একটি কবিতা বা কবিতাংশ যাঁদের উৎসর্গ করা হয়েছে, সেই ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখিত হয় নি। 'অন্বিষ্ট' কবিতাটির উদাহরণ দেয়া যায়। 'চোরাবালি' কবিতাটি আজ নানা কারণেই পাঠকমহলে অত্যন্ত পরিচিত। এ-কবিতার শিরোনামের অব্যবহিত পরেই 'বরেন্দ্রপ্রসাদ রায়' নামধেয় কোনো ব্যক্তির উল্লেখ চোখে পড়ে। কী পরিচয় এই মানুষটির, তাঁর 'স্বপ্ন কবিতা' লেখনের অব্যবহিত আগে বা পরে যাঁকে কবির মনে পড়েছে? পাঠক তো একথা জানতে চাইতেই পারেন। আর জানানোর দায় তো পঞ্জিকারেরও। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হমফ্রি হাউস, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কমলকুমার মজুমদার, সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অসীম রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পল এলুয়ার, অরুণ মিত্র, নীরদ মজুমদার ইত্যাদি কবি, চিত্রী, কথাশিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ছাড়াও প্রজ্ঞান রায়চৌধুরী, হীরেন মিত্র, প্রবীর বসু মল্লিক, সৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, স-স্বামী এমার্সন ভগ্নীবৃন্দ···বিষ্ণু দে-র রচনা উৎসর্গ-পাত্র (পাত্রী) তালিকায় স্থান পাবেন। আর এই সব নামোল্লেখে বিষ্ণু দে-র মানস-জগতের একটা বিশেষ পরিচয় অবশ্যই ফুটে ওঠে।

সপ্তম অংশে ('সংকেত') একটি প্রবন্ধ পুস্তকের নামোল্লেখ বাদ পড়েছে: 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। শুধু তাই নয়, এ-গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পঞ্জিতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'মুখবন্ধ' (২য় অংশ) সংকলক তাঁর 'মন্দ ভাগ্যে'র কথা বলেছেন: সাময়িকপত্রে প্রকাশের পর পাঠক সমাজের নিকট থেকে 'পরিপূরক তথ্য' তিনি পান নি। তাঁর পঞ্জি অসম্পূর্ণ এই মর্মে আক্ষেপও করেছেন। তাঁর আক্ষেপের কিন্তু সঙ্গত কারণ নেই। কোন রচনাপঞ্জিই কি একেবারে নিখুঁত হতে পারে? বিশেষ ভাবে বিষ্ণু দে-র মতো বহুমুখী কবি-সাহিত্যিকের রচনা যখন তাঁর পঞ্জির অবলম্বন, তখন এখানে-ওখানে অ-পঞ্জিভুক্ত লেখা চোখে পড়বেই। পরবর্তীকালে সংযোজনের সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। 'মন্দভাগ্যে'র বিষয়টি পুরোপুরি জানা গেল না। পাঠক-সমাজ কি একেবারেই অসাড়? অন্তত তিনটি লেখার (রচনা সংখ্যা ২১৬,

৩০৭ ও ৩৬৬) সন্ধান কিন্তু সেই ১৯৭২-এ প্রবীরগোপাল রায় সম্পাদিত 'সাম্প্রত' পত্রিকার ২য় সংখ্যায় জনৈক সাধারণ পাঠকই দিয়েছিলেন।

আরো কয়েকটি পরিপূরক তথ্য দেওয়া গেল। ১. ব্রেখটের কবিতানুবাদ ('জেনারেল, তোমার ঐ ট্যাঙ্কটা জবরগাড়ি বটে'। 'শারদীয় কালান্তর', ১৯৬৬ (১৯৭৩ ?)] ২. ঐ ('সত্য বটে আমি আছি অন্ধকার যুগে', 'শহরে হুইস্কি নেই ভাইরে', 'প্রেমিকেরা', 'বেচার র-র-র বিষয়ে'। 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। পৃ. যথাক্রমে ৯১-৯৪, ৯৪-৯৫, ৯৫-৯৬, ৯৬), ৩. ওয়ালেস্ স্টীভনসের কবিতানুবাদ ('মনেরই কবিতা'· । ঐ, পৃ ৫-৬)। আরো উল্লেখ করা যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে ' গ্রন্থেই এরিক এরিকসনের বিখ্যাত গ্রন্থের অংশবিশেষের কবি-কৃত অনুবাদও লভ্য। বলা প্রয়োজন, উল্লেখিত অনুবাদ কবিতাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নি, যেমন হয় নি 'ভারতপথিক ইংরেজ কবি' শীর্ষক প্রবন্ধে (দ্র. 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য') অ্যালন লুইসের ২টি কবিতার অনুবাদ। এই প্রবন্ধে তাছাড়া আছে একই কবির লেখা একাধিক পত্রানুবাদ। 'ভারতীয় অভিজ্ঞতার যন্ত্রণা' এ-পত্রাবলীর বিষয়। ঐ প্রবন্ধেরই প্রথম দিকে 'বিত্তবান ইংরেজ লেখক' মমের ভারত-ভ্রমণের তাৎপর্যময় শেষাংশেরও অনুবাদ করেছেন কবি বিষ্ণু দে (ক্লাইভ ব্র্যানসনের মতো তরুণ ইংরেজ সৈনিক-চিত্রী-কবির চিঠিতে যেমন, তেমনি এখানেও 'ভারতীয় যন্ত্রণা ও করুণা' মূর্ত হয়েছে, এ কারণে) 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য' গ্রন্থের নাম-প্রবন্ধের বিষয় : আধুনিক বাংলা কবিতা (তাঁর নিজের ছাড়াও, রাম বসু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির) : আধুনিক উপন্যাস (ধূর্জটিপ্রসাদ এবং অসীম রায়ের) ; আধুনিক সিনেমা (সত্যজিৎ রায়-এর 'পথের পাঁচালি') এবং ছবি (যামিনী রায়)। ১৯৬৭-এ এই প্রবন্ধটি যখন 'মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত হল, তখন সত্যজিতের পরবর্তী চলচ্চিত্র সম্পর্কে পাদটীকায় সংক্ষিপ্ত মন্তব্য জুড়ে দিলেন লেখক। অসীম রায়ের উপন্যাস সম্পর্কে ১৩।১২।৭৬ তারিখে ঐ ঔপন্যাসিককেই বিখিয়া থেকে বিষ্ণু দে একটি চিঠি লেখেন। 'একালের কথা থেকে গোপালদেব' এই শীর্ষকে তা 'অসীম রায় সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকা'-ভুক্ত হয়েছে। এগুলো উল্লেখ করা হল বিশেষ করে এ-কারণে যে, অরুণ সেন অত্যন্ত যত্নে বিষ্ণুবাবুর যাবতীয় লেখা—চার পংক্তির মন্তব্যও (অবশ্যই সঙ্গতভাবে) সংকলন করেছেন (৩৭৮ নং রচনা দ্রষ্টব্য)। 'বহুরূপী ইজ টুয়েন্টিফাইভ

ইয়ার্স নাউ' শীর্ষক রচনায় পরিচয়গোষ্ঠীর বন্ধু, দার্শনিক ও দিশারী বসন্তকুমার মল্লিক মশায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণার জন্য উল্লেখ্য। তা ছাড়াও পরোক্ষে (অবশ্যই সংক্ষেপে) আত্মস্মৃতিমূলক তথ্যের জন্যও এই মিতায়তন রচনাটি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহারে বলতে হয় নিরলস শ্রমের ফল এ-গ্রন্থটির জন্য সংকলক আধুনিক সাহিত্যে আগ্রহী পাঠক মাত্রেরই অভিনন্দন পাবেন। 'পরিচয়' ও 'সাহিত্য পত্র' এই দুই পত্রিকার সহযোগিতার ফলে বইয়ের দাম খুবই কম (৬ টাকা) বলতে হবে। প্রচ্ছদটি গ্রন্থের উপযুক্ত।

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

'আধুনিক' শুদ্ধতার হিড়িক

কবিতার সেতুবন্ধ। উত্তম দাশ। কবি ও কবিতা প্রকাশন।

'গ্রীক দার্শনিক প্লেটো কল্যাণরাষ্ট্র থেকে কবির নির্বাসন চেয়েছিলেন, একালের সাম্যবাদী জনগণই এই গণদার্শনিকতায় উদ্বুদ্ধ। এককালে যা ছিল বিশিষ্ট দার্শনিকের একক চিন্তার ফসল, একালে তাই হয়েছে অধিকাংশের শ্লোগান।'

সাম্যবাদী আন্দোলনের বহু আগে ধ্রুপদী দর্শনেই যে কবির সামাজিক রূপ দেখতে চাওয়া হয়েছিল প্লেটোর দর্শনই তার প্রমাণ, কিংবা স্পিনোজা, লেসিং এবং শেষ পর্যন্ত হেগেল—এঁরা কি শিল্পীর স্বাধীনতা ও প্রয়োজনকে সম্পর্কান্বিত করে দেখেন নি? আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-এর রচনায় কেন তবে নীতি, কল্যাণ, সহিতত্ত্ব প্রশ্রয় পায়? এঁরা কি সব সাম্যবাদী? বস্তুবাদী? বস্তুবাদই কি বাস্তববাদ? মেটিরিয়ালিজম কি রিয়ালিজম? সে কি বলে কবিতাকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হতে? বলেছিলেন তো লেনিন পার্টিভুক্ত লেখকদের। লেনিন কি বস্তুবাদী? না, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে তাঁর বিশ্বাস? দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ আর বস্তুবাদ কি এক? উত্তমবাবু এসব ভেবে দেখেন নি—লিখে দিয়েছেন। না হলে নজরুল আর প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাছে বাস্তববাদী লেখকের উদাহরণ হন?

কবি নাকি আর দশজনের থেকে আলাদা। তিনি জীবনের 'পূর্বাপর

সংযুক্ত নয়' ঘটনায় জোড় মেলান, 'ফলত, বস্তুবাদও আলাদা রশ্মিতে প্রাণ পায়' (এখানে বস্তুবাদ প্রাণ পায় মানে?), যে 'রশ্মি' দিয়ে বিপরীতমুখী বস্তুর জোড় মেলাতে জানায় কিছু কবি টিকে গেলেন সেটা হচ্ছে, 'যাকে এককালে লোকে কল্পনা বলত'।

কল্পনায় কি শুধু কবিদেরই মনোপলি? ইন্টিগ্রাল কি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আবিষ্কারে কি কল্পনা লাগে না? কিংবা দৈনন্দিন জীবন-যাপনেও? জামা কাপড় বাছায়? কল্পনাশক্তির অধিকার বলেই কি কবি অসামাজিক হয়ে যান? 'কবি সমাজ-সংসার থেকে যা নিচ্ছেন তা তো তিনি ব্যবহার করেন না তার স্বরূপে' (স্বরূপে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠছে কিসে, চাইলেই বা পারবেন কেন?)। 'নিজের মানস-প্রক্রিয়ায় তাকে যে রূপ দেন তা তাঁর জীবনের রসায়নে রচিত (জীবন মানে এখানে আয়ু না সামাজিক জীবন?), তা তাঁর ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি (ব্যক্তিত্ব তো সামাজিক মানুষেরই আছে, সমাজগঠনের আগে সে তো ছিল প্রকৃতির অংশমাত্র), সেখানে তুমি কে আমি কে জগতের জড়বস্তু-পুঞ্জই বা কি?' (রূপকে সত্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করাটা কি এতই সহজ?)।

'কবিতাই কারো কাছে দায়বদ্ধ নয়'—উত্তমবাবুর মতে 'সামাজিক ভাবে সমাজ সত্তা সমাজের দায় বহন করে নিত্যকর্মে। কিন্তু কবি হিসাবে তিনি একক, স্বাধীন।'—অর্থাৎ এই কবিসত্তা সমাজবিচ্ছিন্ন এক উড়ুক্ক জীব এবং কবিতারচনা সামাজিক ক্রিয়া নয়। কিন্তু উত্তমবাবুর এই কবিসত্তাটি চাঁদে ঘরভাড়া করে চলে যেতে পারছে না, কারণ ঝামেলা আছে, খেতে পরতে হয়, আর সেখানে ছাপাখানা নেই, পত্র-পত্রিকা নেই, পড়বেই বা কে? কারণ আগের প্রবন্ধেই উত্তমবাবু বলেছেন, 'পাঠকের সঙ্গে কবিতার সেতুবন্ধ রচনা কবিরই এক নিত্যকর্ম।' এ পাঠকও কি সমাজ-বহির্ভূত না সমাজ-বিরোধী?

কবি বা শিল্পী মননসমৃদ্ধ মানুষ বলেই অসামাজিক নন, শ্রেণীবদ্ধ সমাজের বিচ্ছিন্নতায় নিজেকে পরবাসী মনে হলেও। বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মত্ততা থেকে কবি কখনও নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন বদ্ধ ঘরে, না হলে 'চতুরতা'র কথা উঠত না শঙ্খ ঘোষের কবিতাটায়। শঙ্খ ঘোষ চিরন্তন অর্থে কবিকে অসামাজিক বলেন না, কখনও না।

কবিতার কাজ নাকি পাঠকমনে ভাবাবেগের আবর্ত তৈরি করা, আর

তাতেই নাকি বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন ঘটে যায়। 'সিন্ধু' বলেই উত্তমবাবু সামলে নিয়ে বলেন, 'আত্মদর্শন' কবি ও পাঠকের উভয়েরই। ভালো কবিতা নাকি একটু লাজুক বিনম্র কণ্ঠের হতেই হয়, না হলে টেঁকে না। কবিতা বিপ্লবের আওয়াজ তুললে নাকি উত্তমবাবুরা হাততালি দিয়ে দেখেছেন টেঁকে নি। অর্থাৎ কবিতায় আত্মদর্শন চাই, একটু লাজুক বিনয়ী হওয়া চাই কণ্ঠ আর বিপ্লবের কথা একেবারেই বলবে না—তবে তিনিই বলেন, বোদলেয়রে ব্যক্তিজীবনের ক্লেদ থাকলে ক্ষতি হয় না।

এই ভিত্তি থেকে সুকান্তর আলোচনায় তাই তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছে সুকান্তর কবিদৃষ্টি নাকি 'অস্বাভাবিক'। কবি আবার কমিউনিস্ট কেন? মায়াকফস্কি, এসেনিন, ব্রেখট, আইজেনস্টাইন, এলুয়ার, আরাগঁ—এঁদের সকলেরই শিল্পদৃষ্টি বা কবিদৃষ্টি উত্তমবাবুর মতানুসারে 'অস্বাভাবিক'। তাই লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে প্রায় বলেন কবিতার কোনখানটায় 'কর্মীসত্তা' প্রধান, আর কোনখানটায় 'কবিসত্তা'র প্রাধান্য—কবিসত্তাটুকুতে বেশি নম্বর দেন। 'কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি' লাইনটায় অভিমান আবিষ্কার করেন—যুক্তি কিছু দেন না। মনে হয় বালিশের তলা থেকে পাওয়া গিয়েছিল বলে উত্তমবাবুর অমন মনে হয়। ব্রেখটও বলেছিলেন 'আমাদের এ কী যুগ? যখন গাছপালার কথা বলা প্রায় অপরাধ, কারণ তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তো একরকম নীরবতাই বটে।' এ কবিতা কোথা থেকে পাওয়া গিয়েছিল জানলে উত্তমবাবু এর মধ্যেও পার্টির প্রতি অভিমান আবিষ্কার করে দিতেন হয়তো!

আসলে উত্তমবাবুর রচনাগুলো যতটা সবলমতি, ততটা স্বচ্ছমতি নয়। মাঝে-মধ্যেই তিনি 'সাম্যবাদী শিবির'কে অযথা গালমন্দ করেন, বোঝাই যায় অসাম্যবাদী শিবিরেই তাঁর বিশ্বাস গচ্ছিত। তাই সুকান্তের কাব্য-আলোচনায় কবিতায় অল্প মনোযোগ দিয়ে আজব সিদ্ধান্তে আসেন। এই শুদ্ধ স্বাধীন কাব্যের ভক্ত, সুকান্তের চিঠি আর জীবনী থেকে খুচরো উদ্ধৃতি দেন -এমন কি কমিউনিস্ট পার্টিরও পৌনে এক পৃষ্ঠার ইতিহাস লিখে ফেলেন। সে-বিবরণ পড়ে মনে হয়ই অবশ্য জনসঙ্ঘ-জাতীয় কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী রচনা থেকে উদ্ধৃতি। কারণ ৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিতর্কিত বটে, কিন্তু উত্তমবাবু তাতে যেমন সুযোগ-সন্ধানের পরাকাষ্ঠা দেখেন, সিরিয়াস ঐতিহাসিকরা তা দেখেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বলতে

গিয়ে বলছেন 'ব্রিটিশ সরকারের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই যখন জাপানীদের বিজয়-অভিযানকে অভিনন্দিত করিতেছিলেন, তখন শ্রমিকশ্রেণীর একাংশের পক্ষেও সেই মুহূর্তের প্রাথমিক ঐতিহাসিক প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ফ্যাশিস্ট-বিরোধী আন্দোলনে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা উন্নত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবি রাখে।' আর সে সময়ের ইংরেজ-বিরোধী 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে তো নেহরু-মওলানা আজাদ কারোর সায় ছিল না—আজাদ সাহেবের 'ইণ্ডিয়া টুডে'-র সাক্ষ্যে তো সে কথা স্পষ্ট।

ষাটের কবিতার ছন্দ আলোচনায় কবিতার ছন্দ মুখের ভাষার কাছে এসেই সার্থক কিংবা বাংলা কবিতার ছন্দোবিচার শেষপর্যন্ত শ্রুতিনির্ভর —এসব কথা আগে বলা হলেও হয়তো বারবার বলার প্রয়োজন আছে। ষাটের কবিতার ছন্দোমুক্তির চেষ্টার অনিবার্যতা অবশ্য প্রমাণ হয় না তাঁর আলোচনার কোনো জায়গায়।

আশীষ মজুমদার

গালিলেওর জীবন। বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট। প্রযোজনা : কলকাতা নাট্যকেন্দ্র। নির্দেশনা : ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ। আলোচিত অভিনয় : ৩০ নভেম্বর, ১৯৮০

বাংলা মঞ্চে ব্রেশ্‌ট-চর্চা যদি এর ফলে আরো পরিণতি লাভ করে থাকে, তবে তো সকলেরই লাভ। এই নাটক দেখতে-দেখতে শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিগত জীবনাচরণের আপোস এবং তাকে ছাপিয়ে ইতিহাসের পটে আশাবাদ যদি দর্শকদের মনকে কোনো-না-কোনো ভাবে স্পর্শ করে গিয়ে থাকে, তবেই তো এর সার্থকতা। ব্রেশ্‌টের নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগের নানা কথায় আমরা অস্থির। 'গালিলেওর জীবন'-কে অবলম্বন করে সেই প্রয়োগের একটা বিশ্বমান আমাদের কাছে পৌঁছেছে ভাবলে আমাদের আত্মপ্রত্যয় একটু দৃঢ়তা পায়। পূর্ব জর্মানির ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ আমাদের সেই সুযোগই করে দিলেন? শম্ভু মিত্র, মনে হয়, তাঁরই হাত ধরে সেই দায়িত্বই কাঁধে তুলে নিয়েছেন, এই বয়সেও—এমনকি অবশ্যই নিজের অভিনয়ধারার অভ্যাস থেকে অনেকটা সরে আসার ঝুঁকি নিয়েই। এই সাহসও একটা বড় ঘটনা আমাদের মঞ্চে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় ঘটনা অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। 'রক্তকরবী'-র নাট্যরূপ আবিষ্কার, গ্রীক ট্র্যাজেডির বিশ্বজনীনতার বাঙালি নাট্যমুদ্রা আবিষ্কার ও ধনতান্ত্রিক-ইওরোপের ব্যক্তি-ট্র্যাজেডির বাঙালি প্রক্ষেপণে শম্ভু মিত্র এই বাঙালি কলকাতার নাট্যমঞ্চ থেকেই নিজেকে যুক্ত করে দিতে পেরেছিলেন অভিনয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ভূমিকাগুলির সঙ্গে। মাঝখানে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের অংশটুকু ধরলে তাঁর ক্লাসিকাল নাট্যচর্চা এক সম্পূর্ণ আয়তন পায়। কিন্তু সেই সম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ঐ ক্লাসিকাল অভিনয় বুঝি-বা তাৎপর্যে আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা লাভ করত না, যদি তিনি ব্রেশ্‌ট-নাটকের আধুনিক নাট্যসংকেতকে অভিনয়ে ধরার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করেই অবসর নিতেন। প্রায় সত্তর বছর বয়সের কাছাকাছি শম্ভু মিত্র তাঁর অভিনয়-জীবনের এই আরব্ধ কাজটুকু করার

দায় মেনে শিল্পী হিসেবে নিজের মহত্ত্বেরই সাক্ষ্য রাখলেন। বার্ধক্যের এই পরিণত দুঃসাহস আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সম্পদ।

নান্দীকার, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, চেতনা, থিয়েটার কমিউন, চার্বাক, শূদ্রক—এই ছটি নাট্য-প্রতিষ্ঠানের অনেকেই নানা সময়ে ব্রেশ্‌টের বা ব্রেশটীয় নানা নাটক অভিনয় করেছেন—কখনো বাংলা রূপায়নে, কখনো-বা ব্রেশ্‌ট-অনুপ্রেরণায়। ফলে ঐ দলগুলির অভিজ্ঞতার নিজ-নিজ ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল অনেকটা। আবার কোনো কোনো দলের সাম্প্রতিক কিছু নাটকের মঞ্চরূপে আমাদের মনে যেন একটা সংশয় উঁকি দিতে শুরু করেছিল সেই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে আর নতুন কোনো সৃজনশীলতা ঘটছে কিনা। 'গালিলেওর জীবন' অভিনয় করে এঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সম্মিলিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন, নিজ-নিজ দলগত অভিমান ত্যাগ করে খোলাখুলি দাঁড়িয়েছেন, এমনকি ব্যক্তিগত অভিনয়-ক্ষমতাকেও নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন—তাঁদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে তার ফল খুব ভালো নাও হতে পারে জেনেও। আর তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এমন একটি উদ্যোগের সঙ্গে পূর্ব জর্মানির হ্বাইমার ন্যাশনাল থিয়েটার-এর রেসিডেন্ট ডাইরেক্টর ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ-এর সংযোগ। ব্রেশ্‌ট-চর্চা যে বাঙালি নাট্য-আন্দোলনের পক্ষে কতটা জরুরি আর আন্তরিক, এই সমস্ত ঘটনা তারই নির্দেশ দেয়। তাই 'গালিলেওর জীবন' হয়ে উঠেছে আমাদের এখনকার আত্মম্ভরী মূর্খতার দুর্বিনীত প্রতিবেশে আত্মস্থ শিল্পসন্ধানের বিনয়ী প্রয়াস। ছটি দল ও শম্ভু মিত্র একত্রিত হতে পারেন, শম্ভু মিত্র মেনে নেন অপর নির্দেশকের নির্দেশ, অন্যান্য অভিনেতা পরস্পরের পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় করে যান—কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকে—এত ভালো কি সত্যি ঘটছে।

এবং অবশ্যই নতুন অভিনয়। এই নতুন অভিনয়ের মূল কথাই ছিল, প্রধানত কণ্ঠস্বরের বিচ্ছিন্ন ওঠাপড়ার ওপরই নির্ভরতা নয়, শুধু ভাবমগ্নতা বা আত্মদান নয়, কতকগুলি মৌল অঙ্গভঙ্গির, ব্রেশট যাকে বলেন 'গেস্টুস', তার সচেতন প্রয়োগ ও তার সঙ্গে সম্বদ্ধ উচ্চারণের স্বাভাবিকতায় চরিত্র ও ঘটনাকে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া। শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে এরকম প্রবলভাবে শারীরিক ভঙ্গি ও মুদ্রার ওপর নির্ভরতা আগে বোধহয় দেখা যায় নি। গালিলেওর চোখ মেলে তাকানো-র নানা ধরন ও অর্থ, হয়তো কিছুটা আত্মপ্রদর্শনও, এমনকি হয়তো নিছক হাসিই কারোর

কথায়—চরিত্রটি গড়ে ওঠে এই সব মৌল ভঙ্গির মধ্য দিয়েই। শম্ভু মিত্র মঞ্চে খুব বেশি দাপাদাপি না করেও, কখনো কখনো শুধু দাঁড়িয়েই, নানা ভঙ্গির সহায়তায় বয়সের তারতম্যে এই বিচিত্র মানুষটির অস্থিরতা বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা বা জ্ঞানপিপাসার মগ্নতা কিংবা তার সমন্বয় বা পরিপূরকতাকে প্রকাশ করেন—স্বতঃস্ফূর্ততার অপরিচ্ছন্নতায় নয়—অনেকটাই বিশ্লেষণের সচেতনতায় ও আত্মবিচ্ছিন্ন অভিনয়দৃশ্যতায়। নিশ্চয় এ সবই ব্রেশ্‌টকে খুশি করত। হয়তো মাঝে-মাঝে কারো মনে হতে পারে তাঁর পুরনো সুরেলা উচ্চারণ মিশে চকিত বিসংগতির সৃষ্টি করছে না তো—ধরা যাক শেষ দৃশ্যে আন্দ্রিয়াকে বলা নির্মম আত্মবিচারের কোনো কোনো বাক্যে—গালিলেওর দীর্ঘ চমকপ্রদ সংলাপে কণ্ঠস্বরের অভিনয়ের প্রলোভন তো ছড়ানোই—কিন্তু সে-অভিনয়েও এই মিশ্রণের দৃষ্টান্ত প্রায় বিরল।

প্রশ্ন ছিল, গালিলেও চরিত্রের ইন্দ্রিয়ময়তাকে কতখানি এবং কিভাবে পরিস্ফুট করবেন শম্ভু মিত্র? চার্লস লটনের অভিনয়ের বিবরণে আচার-আচরণের যে কিছুটা অতিরেকের কথা শুনতে পাই, শম্ভু মিত্র যে ততদূর যান নি, তা হয়তো সুখেরই বিষয়। অবশ্য প্রথম দৃশ্যে তিনি যে খালি গায়ে হাজির হন, মার্কিন দর্শকদের সেই আপত্তি এখানে সম্পূর্ণ অবাস্তব। আর লটনের চেহারার স্থূলত্ব যদি তার সহায়কই হয়ে থাকে, তার অভাবে তো সুঠামদেহ শম্ভু মিত্রকে দায়ী করা চলে না। তবু, আশ্চর্য সংযত অভিনয়ে, সুনিরূপিত ভঙ্গি বা হাত পা চালানোর মধ্য দিয়ে তিনি সেই চঞ্চল ইন্দ্রিয়ময়তাকে কম স্পষ্ট করে তোলেন নি। যেভাবে তিনি যন্ত্রপাতি নাড়া-চাড়া করেছেন, কিংবা ছোট আন্দ্রিয়া যখন পিঠ ঘষতে থাকে তখন দুলে-দুলে হাঁটতে-হাঁটতে আরামপ্রিয়তার কথা জানিয়েছেন, যে ভাবে ছাত্রদের নিয়ে 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে-করতে নিজের সংলাপের সুপ্রযুক্ত ভাষারই যেন স্বাদটুকু চেখে-চেখে নিচ্ছেন, তা লক্ষ করে শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের গভীরতা ও বৈচিত্র্যে মুগ্ধতা আসে। নিজের মনের মতো কাজ করতে পারার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের উল্লাস তাঁর আচরণ ও ভঙ্গির ক্ষিপ্র স্পষ্টতায় প্রকাশ পায়—চরিত্রের মাধুর্য ও পৌরুষ দুইই ঝরে পড়ে।

এই ইন্দ্রিয়ের উল্লাস ক্রমশই কমে যেতে থাকে, যতই তিনি নিজের কাজ থেকে সরে যান—এই পরাজয় সাবলীল ফুটে ওঠে তাঁর অভিনয়ে। ৯ম দৃশ্যে বড়লোকের ছেলে ও ভাবী জামাতা লুদোভিকোর কাছ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল পোপের আসন্ন মৃত্যুর খবর শুনে গালিলেওর অভিনয়ের

আবার ছন্দ বদল ঘটে। তিনি যেন পানাহারে স্বাদ ফিরে পান, হাঁটায়-চলায় আসক্তি। যেন আবার অনিবার্যতার দিকে চলেছেন। ছোট বাগ-ভালোবাসায় তাঁর অধিকার নেই। তাই কন্যা ভার্জিনিয়ার মূর্ছার ঘটনাতেও অবিচলিত গালিলেও, কিন্তু ঠিক কঠোর নন।

এই স্নিগ্ধ উদাসীন্য শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে বহু জায়গায় সংগতভাবে আসে। ৩য় দৃশ্যে টেলিস্কোপের সাহায্যে গ্রহ রহস্য আবিষ্কারের পর সেই গা-ছাড়া ভঙ্গিতে বসে থাকা। কিংবা ৬ষ্ঠ দৃশ্যে বিদ্রূপমুখর মঙ্কদের দেখা মঞ্চের কোণ থেকে, কৌতূহল ভরে। অবশ্য পাশাপাশি ফোটে ভার্জিনিয়ার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও অসহিষ্ণুতা। ৩য় দৃশ্যে ভার্জিনিয়া টেলিস্কোপের মধ্য দিয়ে দেখতে চাওয়ায় শম্ভু মিত্র তীক্ষ্ণভাবে মেয়ের দিকে তাকান, তারপর বলেন, কেন? এটা তো খেলনা নয়। অবশ্য সেখানে, এবং অন্যত্রও, ব্রেশ্‌ট যাকে বলেন গালিলেওর 'শোম্যানশিপ', তার একটা ছোঁয়াও থাকে।

গালিলেওর আচরণের দ্বৈততা প্রতিষ্ঠাই এই চরিত্রের অভিনেতার অন্বিষ্ট। যেমন, ২য় দৃশ্যে, ভেনিসে, মাইনে-বৃদ্ধির প্রয়োজনে গালিলেও যখন লুদোভিকোর কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেকে টেলিস্কোপের আবিষ্কারক হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন, তখন শম্ভু মিত্রের কণ্ঠস্বরে কিন্তু তঞ্চকতার ভাব নেই, বরং অভিনয়ের দক্ষতা—এমনকি লুদোভিকোর বিষণ্ণ ঠাট্টার পাশে ঈষৎ বিব্রত হতে-হতেও সপ্রতিভ, আর তারই ফাঁকে বন্ধু সাগ্রেদোর সঙ্গে এই টেলিস্কোপেরই সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনা বিষয়ে ছোট ছোট আপ্লুত আলোচনা—দুয়ের বিন্যাস শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে আত্মসচেতন বিশ্লেষণে ধরা আছে। অবশ্য, এটাও ঠিক, এই দৃশ্যে শম্ভু মিত্রের ঐ বহুস্তর-অভিনয় বোধ হয় সম্ভবই হত না, যদি অতজন সহ-অভিনেতা তাঁদের নিজ-নিজ অবস্থান থেকে একটা সামগ্রিক অভিনয় গড়ে না তুলতেন। গালিলেও সেই সামগ্রিক অভিনয়েরই অংশ এখানে—শম্ভু মিত্রের ব্যক্তিগত অভিনয়ের প্রায় অন্যতম প্রধান মুহূর্ত হওয়া সত্ত্বেও।

কোনোটিকেই উচ্চকিত না করে অথচ দুটিকেই শিল্পগুণে সমন্বিত করে ব্যক্তিগতকে সমষ্টির অন্তর্গত করে নেওয়ার এই ব্রেশটীয় সংগঠনের কৃতিত্ব নির্দেশক ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ আরো কয়েকবার এই নাটকে দেখিয়েছেন। ব্রেশটের এই নাটকে গালিলেওর চরিত্রই প্রধান। দুটি-একটি দৃশ্য বাদে সব দৃশ্যেই গালিলেও উপস্থিত এবং সর্বাংশে উপস্থিত। কলেজিয়াম রোমানিয়ামে ও গ্র্যাণ্ড ডিউকের জন্য অপেক্ষার দুটি দৃশ্যে গালিলেওর উপস্থিতি সত্ত্বেও

তিনিই প্রধান নন। তিন ধরনের দৃশ্যেই—গালিলেওর প্রধান উপস্থিতি, অপ্রধান উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি—নাটকটি যে একই টেনশনে বাঁধা থাকতে পারে তা সম্ভব হয়েছে এই সমষ্টি-অভিনয়েরই গুণে। শম্ভু মিত্রের একক অভিনয় এই নাটকের অদ্বিতীয় সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকের সাফল্য শুধু সেই অভিনয়েরই ওপর নির্ভরশীল নয়—সমষ্টি-অভিনয়ই এর প্রাণবস্তু। আর বেনেভিৎজ সেই সমষ্টি-অভিনয় সম্ভব করে তুলেছেন এমন সব প্রকরণের সাহায্যে যা বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে সম্ভবত নতুন। বাক্যহীন মুভমেন্টের গতিতে নাট্যমুহূর্তটির টেনশন গড়ে তোলা এই সমষ্টি-অভিনয়ের একটি প্রধান অবলম্বন। কার্ডিনাল ইনকুইজিটরের প্রবেশ-মুহূর্তে, পোপের সঙ্গে কার্ডিনাল ইনকুইজিটরের সাক্ষাতের দৃশ্যে, গ্র্যাণ্ড ডিউকের জন্য ভার্জিনিয়া সহ গালিলেওর অপেক্ষার দৃশ্যে চরিত্রের নীরব দ্রুত চলাফেরায় এই নাটক সবচেয়ে বেশি পাকিয়ে উঠেছে। সেই চলাফেরাটাই সেখানে অভিনয়।

গালিলেও চরিত্রের আত্মবিক্রয় ও পতন যখন থেকে শুরু হয়, তখন থেকে চরিত্রাভিনেতার আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন সব থেকে বেশি। ৪র্থ দৃশ্যে ফ্লোরেন্স শহরে গালিলেওর বাড়ির দৃশ্যেই তাঁর ভয় ও খর্বতার প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল। ৮ম দৃশ্যে ছোটমঙ্কের কাছ থেকেও গালিলেও প্রথম জানতে পারেন, তাঁর আবিষ্কার কিভাবে শুধু গির্জাকেই নয়, চাষীদের পর্যন্ত কেন্দ্রচ্যুত করবে। ৯ম দৃশ্যেই গালিলেওর আপোসের শুরু, শুধু তা নিশ্চয়ই ১৩শ দৃশ্যের অনুতাপ-ঘোষণার সঙ্গে তুলনীয় নয়। ৯ম থেকে ১৩শ দৃশ্যে একে অনিবার্যতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

৯ম দৃশ্যের এক্সপেরিমেন্ট-অংশটি অসামান্য করেন শম্ভু মিত্র। কিছুটা অপ্রসন্ন বিরক্ত ছাত্রকুল, তাদের মধ্যে ভগ্নোদ্যম গালিলেও—এক্সপেরিমেন্ট ও শিক্ষণ-এর সময় সামান্য উৎসাহ-সঞ্চার ঘটে। লাতিন ভাষার বইটি ফেদারজোনি যখন ছুঁড়ে ফেলে দেন, গালিলেও তুলে দেন তা আন্দ্রিয়ার হাতে—খানিকটা পরাজিতের ভঙ্গিতেই—উদাসীনতার ভান সেখানে ব্যর্থ।

১১শ দৃশ্যে শিল্পপতিদের প্রতিনিধি ভান্নি-র কথা অগ্রাহ্য করে গালিলেও বলেন, তাঁর বিজ্ঞানের কাজ নেহাতই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার, কে কী তার মানে করবে তা তাঁর জানার কথা নয়—মনে হয়, ৯ম দৃশ্যের ঐ আভাস এবার পূর্ণতা পাচ্ছে। ১৩শ দৃশ্যে অনুতাপ-ঘোষণার পর গালিলেও যখন প্রবেশ করলেন, 'বদলে গেছেন প্রায় চেনাই যাচ্ছে না', তখনকার অত্যাচার-জর্জর ধ্বংসস্তূপের অভিনয় শম্ভু মিত্রের কোনো কোনো পরিচিত ভঙ্গির

বাইরে আসতে পারে না বলে মনে হয়। আন্দ্রিয়া সার্তির 'দুর্ভাগা সেই দেশ যে দেশে বীর জন্মায় না' এই নাটুকে ঘোষণাকে মার্কিনি প্রযোজনায় চার্লস লটন সরিয়ে আনেন আরো পরে। ব্রেশ্‌টের নাটকে তা উচ্চারিত হয় গালিলেও-র প্রবেশ-মুহূর্তে, সার্তির লক্ষ্যহীন উক্তি গালিলেও-র গোচরে আসে যদিও। ফলে নানা ঘটনার পর একেবারে শেষে গালিলেও যখন বলেন, 'দুর্ভাগা সেই দেশ যেখানে কেবল বীরেরই প্রয়োজন হয়'—তখন সেই বিলম্বিত জবাব অন্য রকমের গভীরতা পায়। লটনের অনুবাদের মুখে-মুখে জবাব একটু সহজ নাটুকে। বেনেভিৎজ অবশ্য দেখা যাচ্ছে লটনের রূপান্তরই অনুসরণ করেছেন এবং শম্ভু মিত্রের অভিনয়ে বেদনা ও প্রজ্ঞা যুগপৎ উচ্চারিত হয়।

একেবারে শেষ দৃশ্যে (১৪শ) গালিলেওর অভিনয়ে শম্ভু মিত্র আবার অনেকগুলি স্তরে কাজ করেন। 'ডিসকোর্সি' কপি করার সংবাদ শুনে আন্দ্রিয়ার উল্লাস তাঁকে নাড়া দেয়, অথচ তিনি শীতল কণ্ঠস্বরে লেখার অভ্যাসিকতার কথা শুধু বলেন। ৯ম দৃশ্যের উদ্বোধন তো এখন আর সম্ভব নয়—পরাজয় এখন সম্পূর্ণ—জবুথবু বসে থাকেন চেয়ারে, সক্রিয়তা শুধু কাঁটাচামচ নাড়ায়। শেষ উক্তিতে দর্শকদের মনে পৌঁছে দেন বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্বপালনের ব্যর্থতার কথা। স্পষ্ট উচ্চারণে সততাই ফুটে ওঠে। আন্দ্রিয়ার হাতে তখন সেই বিজ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠ কীর্তি, যা তিনি রাত্রে বসে-বসে দুর্বল দৃষ্টিতে কপি করেছেন, এখন পাচার করবেন বাইরে। আন্দ্রিয়ার উচ্ছ্বাসের পাশে বৃদ্ধ শুধু বই-পাচারের ঝামেলা ও দায়িত্ব-অস্বীকারের কথাই আলোচনা করতে চান। বীরত্ব ও পতনের দুটো ছবিই রয়ে যায়।

গালিলেওর চরিত্র এবং সেই সূত্রে নাটকটিরও মর্মকথা অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল সফল এখানে। ব্রেশ্‌ট গালিলেও চরিত্রের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই প্রতিপাদন করতে চান নি। গালিলেও সম্পর্কে শেষ কথা তাঁর কিছু নেই। আন্দ্রিয়ার শেষ-উক্তিতে যে কিছু বিমূঢ় মুগ্ধতা তাতে তো বটেই, এমনকি গালিলেওর আত্ম-অস্বীকৃতিতেও ব্রেশ্‌টের মতামত অনুক্ত। ফলে, চরিত্রটির প্রতি দর্শকের সহানুভূতি বা বিরাগ কোনোটাই লক্ষ্য নয়। ব্রেশ্‌ট বারবার এ-কথা বলেছেন। লক্ষ্য শুধু নাটকটির ঘটনাগত বিষয়—বিজ্ঞানীর প্রয়োগ-সাফল্যের মুহূর্তেও সামাজিক দায়িত্বহীনতার বাস্তবতা।

তারপর যেটুকু শিক্ষণীয় দর্শক তা আলাদা করে নেবেন—মার্কিনি প্রযোজনার প্রোলগে ব্রেশ্‌ট যেমন বলেছেন, গালিলেওর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যদি না শিখি, তবে হিরোশিমার বোমাটা আমাদের মাথার ওপরেও পড়তে পারে।

এই নাটকের অধিকাংশ প্রযোজনাতেই শোনা যায় প্লেগের দৃশ্য ও ১৫শ দৃশ্যটি বর্জিত। চার্লস লটনের প্রযোজনাতেও তাই। আমাদের আলোচ্য প্রযোজনাতেও। ভাবতে একটু কষ্ট হয়। ১৫শ দৃশ্যতে পরিণতি আরো ব্রেশ্‌টীয় হতে পারত। আর প্লেগের দৃশ্য ছাড়া সিনোরা সার্তির চরিত্র কিভাবে ফোটে? এ তবু মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু যখন দেখি বেনেভিৎজ-এর এই বঙ্গীয় প্রযোজনায় কার্নিভালের দৃশ্যকেও (১০ম) বাদ দেওয়া হয়েছে, তখন একটু স্তম্ভিতই হতে হয়। ফলে ১৪শ দৃশ্যে গালিলেও যখন বলেন তাঁর একসময়ের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকার কথা, তখন কোনো ছবি ফোটে না, ব্রেশ্‌ট অন্তত তা চেয়েছিলেন। তাছাড়া এই নাটকে জনগণের ইতিবাচক ভূমিকার যে কথা ওয়াল্টার বেঞ্জামিন বলেন, কিংবা আমাদের ফ্রিৎজ বেনেভিৎজ বলেন আশাবাদের কথা, তা কি করে দানা বাঁধবে এই কার্নিভাল-দৃশ্যটি ছাড়া। মস্ত ক্ষতি হয়েছে এই বর্জনে।

না হলে এই প্রযোজনার সংহতি বিষয়ে প্রায় সবটাই মুগ্ধতার কথাই বলতে হত। বোধহয় একমাত্র সংগীত ছাড়া। ব্রেশ্‌টের নাটকে সংগীতের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, সেটা মনে রাখলে সুবারোপের এই দারিদ্র্য খুব পীড়াদায়ক। মঞ্চসজ্জা, আলো, পোষাক-আষাক সব কিছুতেই দুরন্ত কল্পনার ছোঁয়া আছে। লটনের প্রযোজনায় অর্থবহ রঙ-ব্যবহারের যে খবর শুনি, ততটা না হলেও, বেনেভিৎজ-এর নির্দেশনায় সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন ধূসর কয়েকটি মাত্র দেয়াল ও দরজা এবং অনিবার্য ও স্পষ্ট-চিহ্নিত কয়েকটি আসবাবের সাহায্যে বাস্তব ও ছিমছাম যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে, তার মাঝখানে দিয়ে সাদা বা কখনো তীব্র রঙিন পোষাক-আষাক সম্পূরক বা বৈপরীত্যের বিন্যাসে বারবার চিত্রকলার প্রবাহ আনে। অবশ্যই রঙ-ব্যবহারের একটা আসল উদ্দেশ্যই ছিল বিভিন্ন চরিত্রের অবস্থানগত ব্যবধানকে আভাসিত করা। তাই গির্জা বা অথরিটির রঙিন ঝলমলে পোষাকের পাশে ফেদারজোনির পোষাক বিবর্ণ। গালিলেওর পোষাকও 'দুইপা মাটিতে নামানো' মানুষের। সমস্ত প্রযোজনাই আশ্চর্য সরলতার অভিমুখী। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা সহজ ও সুবোধ্য। এমনকি

কার্ডিনাল বাবেবিনি যখন পোপের পোষাক পবে, তাব বিস্তারিত জাঁক খুব সহজবোধ্য ও স্বাভাবিক ব্যঙ্গের আমেজ আনে।

মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চব্যবহারের কথা আবাবও তুলতেই হয। এরকম সাদা-সিধে, কযেকটি মাত্র উপকবণেব সাহায্যে নাট্যবস্তুব গভীব ব্যঞ্জনা এবং সবচেযে বড কথা মঞ্চেব বিস্তৃত শূন্যতাব ব্যবহাব- এই বাঙ্ময পরিচ্ছন্নতা ইওবোপীয মঞ্চস্থাপত্যের আধুনিকতাব শিক্ষণ ছাডা সম্ভব ছিল কিনা জানি না।

যৌথ অভিনযেব কথাও অনেকবাবই বলা হযেছে। প্রযোজনার শেষ ও চূডান্ত কৃতিত্ব তো এখানেই। গালিলেও তো প্রাধান্য পাবেই। কিন্তু শম্ভু মিত্রেব ব্যক্তিত্বেব পাশে অন্য অভিনযেব খঞ্জতা যে এবাব এখানে চোখে পডল না, ববং প্রত্যেকেই তাঁব দাযিত্ব পালন কবেছেন যথাযোগ্যেব চেযেও কিছু বেশি, একথাও বাববাব বলা দরকাব।

দুটি নাবী চবিত্রেব অভিনযই মনে পডে সর্বাগ্রে। সিনোরা সার্তিব চবিত্রে স্বাতীলেখা চট্টোপাধ্যায ও ভার্জিনিযা চরিত্রে শাঁওলী মিত্র সত্যিই নিপুণ। প্লেগেব দৃশ্য বর্জিত হওযায স্বাতীলেখাব অভিনযেব সুযোগ তবু সীমিত—শাঁওলী কিন্তু ভার্জিনিযা চবিত্রেব নিঃশব্দ ও সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা দৃশ্যগোচব কবেন। তাঁব অভিনযের গুণেই আমরা বুঝতে পাবি ১৪শ দৃশ্যে, ব্রেশ্‌ট যে-কথা বলতেন, যতটা বোকা ভাবা হয ততটা বোকা মেযে সে নয। শাঁওলী যেন শুধু তাকানোব ভঙ্গিতেই ১ম দৃশ্য থেকে ১৪শ দৃশ্যের কালান্তবে তাঁব ভেতবকাব ঝডঝাপটাকে বোঝাতে পেরেছেন। ১৩শ দৃশ্যে শাঁওলীব প্রার্থনা-উচ্চাবণেব উত্থান-পতনকে নির্দেশক প্রায আবহসংগীতেব কাজে লাগান।

পুরুষ চবিত্রও প্রায প্রত্যেকটিই সু-অভিনীত। তাবই মধ্যে কার্ডিনাল বাববেরিনি চবিত্রে অশোক মুখোপাধ্যায, কার্ডিনাল ইনকুইজিটব চবিত্রে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সাগ্রেদো চবিত্রে বিভাস চক্রবর্তী এবং আবো অনেকেব কথাই এখন মনে পডছে।

আমবা আশা কবে থাকব, কলকাতা নাট্যকেন্দ্র 'কমার্শিযাল থিযেটাব, যাত্রা এবং বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীব প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ সমর্থনে জনরুচিকে বিকৃত কবাব যে প্রচেষ্টা চলছে, তাব পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতিব প্রসার ও প্রচাব'-এব কর্মসূচি আবো চালিযে যাবেন।

অরুণ সেন

চিত্তপ্রসাদের চিত্রপ্রদর্শনী

এই দুর্ভাগা দেশে বামপন্থী শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অনেক দুঃখ কষ্ট যে সহজে বরণ করতে হয় তা জানতেন চিত্তপ্রসাদ, আর সেইজন্যে নিজের বিশ্বাসে অটল থেকে আজীবন তুলিকালির মাধ্যমে জনগণের খুব কাছাকাছি গিয়েছেন শিল্পী এবং চিত্র রচনা করে নিষ্পেষিত মানুষের কথা দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন বামপন্থী আত্ম-বিশ্বাস এবং সম্মানের সঙ্গে। তাঁর কাছে এর থেকে আর কিছুই গর্বের ছিল না।

গ্রামীণ ভাস্কর আর পুতুল-নাচিয়েরা ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। গ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন জন্ম থেকেই—তাই বোধহয় তাঁর চিত্ররচনার শেকড় ছিল গভীরে। দুর্ভিক্ষের চিত্রকর হিসেবে গ্রামেগঞ্জে পরিচিত হয়েছিলেন। তুলিকালি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামেগঞ্জে আর চিত্রিত করেছেন 'দুর্ভিক্ষের বাংলা'। সময়টা ছিল ১৯৪৩ ও তার পরবর্তী কাল। নিজের প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো চাওয়াই তাঁর কাছে ছিল বিড়ম্বনা। আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী চিত্তপ্রসাদ ১৯৪৯-এ বিশ্বশান্তি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। গ্রামীণ ভারতের চিত্রকর চিত্তপ্রসাদ ১৯৬৯-এ ইউনিসেফকে উপহার দিলেন তাঁর দরদী রচনা 'ভারতীয় শিশুদের চিত্র'। লিনোকাট মাধ্যমে তৈরি এই চিত্রসম্ভারটির নাম দিয়েছিলেন 'এ্যানজেলস উইদাউট ফেয়ারি টেলস'।

চিত্তপ্রসাদের মোটামুটি সব কটি মাধ্যমই করায়ত্ত ছিল—কিন্তু ছাপাই চিত্রের মধ্যে লিনোকাট বেছে নিয়েছিলেন এবং এতেই সবচেয়ে বেশি রচনা করে গেছেন।

সম্প্রতি তাঁর রচনার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন চিত্তপ্রসাদ আর্ট আর্কাইভ, চিত্তভারতী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে। এই প্রচেষ্টার জন্য তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর অন্তত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-পিপাসু জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হলেন।

এই প্রদর্শনীটিতে তাঁর অসংখ্য কাজ থেকে সুনিপুণভাবে নির্বাচন করে মোট ১১টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। তাতে প্রমাণিত হয়েছে চিত্তপ্রসাদের সমস্ত বিভাগে স্বাভাবিক বিচরণ। এখানে ছিল পোস্টার, কার্টুন, হিউম্যানিটি ডিসঅনার্ড, অন ফ্রিডম স্ট্রাগ্‌ল, এ্যানজেলস উইদাউট ফেয়ারি টেলস, পিস্। মাদার অ্যাণ্ড চাইল্ড, পিসফুল রুরাল সাইটস্, ফোক ডান্সেস অফ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি। এছাড়া প্যাস্টেল আর তেলরং ইত্যাদিতে চর্চিত কিছু চিত্র। লিনোকাট—সাদা-কালো আবার রঙিনও, সব মিলিয়ে তাঁর মূল্যায়ন করতে কাউকে অসুবিধায় পড়তে হয় নি এই প্রদর্শনী দেখে। ছোট বড় সব নিয়ে মোট ৬৪টি রচনা।

সাদা-কালোর চিত্রপরিস্ফুটন সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সুদৃশ্য এবং উপভোগ্য করে তুলতে পেরেছেন তাঁর বিশেষ প্রিয় 'লিনো'তে।

চিত্তপ্রসাদের এই প্রদর্শনীতে যে তাঁর কতকগুলি কাজ দেখা গেল শুধু তাই নয়, যদিও কেবল সেটুকুও যথেষ্ট। এই কাজগুলি দেখতে-দেখতে চিত্রশিল্পচর্চার সামাজিক সংহতির এক সার্থক রূপ দেখা গেল। মহৎ শিল্প তার সার্থকতাতেই অতি সাবলীলতায় প্রমাণ করে দেয় প্রকরণ আর বিষয়ের ঝগড়া কত অবাস্তব—চিত্তপ্রসাদের রেখার বহুবৈচিত্র্য, রেখাগুলির পারস্পরিক সন্নিবেশের কমপোজিশন, চিত্রক্ষেত্রের ভেতর স্পেসের ব্যবহার, পটভূমি আর পুরোভূমির বিন্যাস সেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা আরো একবার দিল।

বিষ্ণু দাশ

সরসীকুমার সরস্বতী

অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটল ২২শে সেপ্টেম্বর। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় শিল্পের বিভিন্নধারার ইতিহাস-কে সমৃদ্ধ করে, তার পঠন-পাঠন ও গবেষণাকে বহুধা বিস্তৃত করে, মৃত্যুকালে এক অনন্যসাধারণ মর্যাদা লাভ করে গেলেন তিনি। তাঁর জন্ম ১৯০৬ সালের ১৪ই নভেম্বর, রাজশাহী জেলার আদ্রাই গ্রামে তাঁর পিতা সতীশকুমার সরস্বতী ছিলেন জেলার এক বিশিষ্ট আইনজীবী। সরসীকুমারের জ্ঞান-পিপাসা সহজাত। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলেই ছাত্র হিসাবে তিনি সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী কালে রাজশাহী সরকারি কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলীর কাছ থেকে ইতিহাসে পাঠ নেওয়ার সুযোগ লাভ করেন তিনি। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম. এ. ক্লাসে যোগ দেন। ঐ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩০ সালে তিনি তাঁর কলেজপাঠ সমাপ্ত করেন।

সরসীকুমার গবেষণার কাজ শুরু করেন রাজশাহীতে ছাত্র থাকাকালীন সময়েই। সেখানকার বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও দুই মনস্বী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রমাপ্রসাদ চন্দ্র ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। প্রথম জীবনে অক্ষয়-কুমারের কাছে মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় তাঁর হাতেখড়ি; আর বৈজ্ঞা-নিক দৃষ্টিতে শিল্প-ইতিহাস রচনার শিক্ষা সম্ভবত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের কাছেই। রাজশাহীতে যেমন তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে, কলকাতায় এসে তেমনই তিনি জড়িত হলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে। এশিয়াটিক সোসাইটির বৈতনিক গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করলেন তিনি (১৯৪৯-৫৪), তারপর একসময় হলেন তার সম্পাদক (১৯৬০-৬৩), তারপর তার সহ-সভাপতি এবং সবশেষে সভাপতি

(১৯৭৫-৭৬)। এই মহান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন মর্যাদায় এতখানি সংযুক্ত ছিলেন কেবল আর এক বাঙালি মনস্বী—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অন্যান্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। যেমন 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সহকারী সম্পাদক ছিলেন ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত; আর 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত।

তাঁর কর্মজীবনের বৃহত্তম অংশ কেটেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ফেলো, তারপর উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে আমন্ত্রণ করেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস এবং ইসলামীয় ইতিহাস বিভাগে পড়ানোর জন্য (১৯৪০)। ১৯৫৪ সাল থেকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সর্বক্ষণের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। শেষের দিকে, ১৯৬৩ থেকে ৬৭ পর্যন্ত, তিনি ছিলেন আর্কেওলজি বা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান। মাঝে ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর সেক্রেটারি-কিউরেটরের পদ অলংকৃত করেছিলেন। শেষ জীবনে প্রশাসনিক ব্যাপারে তৎকালীন উপাচার্য বিধুভূষণ মালিকের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান—সেখানে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক হিসাব পাঁচ বছর 'শিল্প ও স্থাপত্য ইতিহাস' বিভাগের অধ্যক্ষতা করেন (১৯৬৭-৭২)।

সরসীকুমার তাঁর এই দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে একাধারে পঠন-পাঠনের উন্নতি বিধান এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে গেছেন। তাঁর গবেষণার ফল ১৫টি গ্রন্থ এবং দুই শতাধিক প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'-এ বাংলার স্থাপত্য সম্পর্কিত নিবন্ধ লিখে গবেষক মহলে তার প্রথম স্বীকৃতি। এই প্রবন্ধে পাহাড়পুরের মন্দির যে তখনাবধি জানা মন্দিরগুলি থেকে বিভিন্নরীতির—এবং সেই রীতি শিল্পশাস্ত্রে 'সর্বতোভদ্র' নামে স্বীকৃত এই সত্য উদ্ঘাটন করে, এবং পাহাড়পুর মন্দিরের প্রভাব কিভাবে বার্মা ও জাভায় ছড়িয়ে পড়েছিল সে দিকে নির্দেশ দান করে তিনি অচিরে খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তারপর রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত ও বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রি অ্যাণ্ড কালচার অব দি ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল'-এর প্রায় সব কটি খণ্ডে তিনি আনুপূর্বিক ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস লিখে, ঐ বিষয়ের পঠন-পাঠনে যুগান্তর

আনেন। তা ছাড়া পৃথকভাবে 'বুদ্ধিস্ট স্রাইনস ইন ইণ্ডিয়া' (১৯৫১), 'গ্লিমসেস অব মুঘল আর্কিটেকচার' (১৯৫৩) এবং 'আর্কিটেক্‌চার অব বেঙ্গল' (১৯৭৬) গ্রন্থেও তিনি তাঁর স্থাপত্য-বিষয়ক বিশেষজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের বিবর্তনকে চিহ্নিত করে বিষয়টিকে তিনি এক পরিপূর্ণতা দান করে গেছেন।

স্থাপত্য ছাড়া ভাস্কর্য ও চিত্রকলাতেও তাঁর মৌলিক গবেষণাজাত গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থটিই হল রাজশাহী থেকে ক্ষিতীশচন্দ্র সরকারের সহযোগে প্রকাশিত 'বুদ্ধগয়া এ্যাণ্ড কুর্কিহার' (১৯৩৬)। গ্রন্থটিতে তিনি বুদ্ধগয়া ও কুর্কিহারে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের শৈলী ও মূর্তিতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর ভাস্কর্য-বিষয়ক সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'আর্লি স্কাল্‌পচার অব বেঙ্গল' (১৯৩৭, ১৯৬২)। এই গ্রন্থে বাংলার পোড়ামাটি, প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত ভাস্কর্যের প্রাথমিক বিকাশকে তিনি অসাধারণ নিষ্ঠায় তুলে ধরেছেন। তাঁর 'এ সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌পচার' (১৯৫৭, ১৯৭৫)-এ ভারতের প্রাচীন কাল থেকে মুসলমান অধিকার পর্যন্ত কালের ভাস্কর্য-ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এই বইটি ভারতে ও বিদেশে ভারতীয় ভাস্কর্যের ওপর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে বিশেষভাবে পঠিত হয়ে আসছে। বিভিন্নযুগের ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। তবে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত অধিকার ছিল আদি-মধ্যযুগীয় পুঁথি-চিত্রের ওপর। কিছুদিন আগে 'পালযুগের চিত্রকলা' নামে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের চিত্রকলা সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহ ছিল সমান উদ্দীপ্ত। 'এইটিন্থ সেঞ্চুরি নর্থ ইণ্ডিয়ান পেইনটিং' (১৯৬৯), 'ইণ্ডিয়ান আর্ট এ্যাট ক্রশরোডস' (১৯৭৩) নামক গ্রন্থ দুটি এবং অন্যত্র তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সরসীকুমারের অপর প্রিয় বিষয় ছিল মূর্তিতত্ত্ব, বিশেষ করে বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত 'তন্ত্রযান আর্ট—এ্যান এ্যালবাম' (১৯৭৭) গ্রন্থটির নোটগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তা ছাড়া 'ইণ্ডিয়ান টেক্সটাইল' (১৯৬১) কিংবা 'এ সেঞ্চুরি অব হিস্টোরিক প্রিন্টস' (১৯৫৪)-এ পাওয়া যাবে তাঁর কারুশিল্পের প্রতি অনুসন্ধিৎসার সাক্ষ্য।

মানুষ হিসাবে সরসীকুমার ছিলেন দৃঢ়চেতা এবং পরিশ্রমী। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন। পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁর ছিল, কিন্তু উন্নাসিকতা ছিল না। ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর সহমর্মিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মনে করতেন, গবেষণার ব্যাপারে নিজেকে ছাত্রদের কাছাকাছি নামিয়ে আনলেই তাদের প্রতি সুবিচার করা যায় বেশি। অথচ গবেষণার মানের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোসহীন—ফলে অনেকের কাছে কিছুটা নির্দয়ও। আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র; অপর পক্ষে এঁদের প্রত্যেকের আস্থাভাজনও ছিলেন তিনি। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়, দেবপ্রসাদ ঘোষ ও দীনেশচন্দ্র সরকার ছিলেন তাঁর সহযোগী ও সহকর্মী। বলা বাহুল্য, সরসীকুমার সরস্বতীর জীবনাবসানে ভারতের শিল্প-ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা দেখা দেবে, যা কোনো একজনের দ্বারা নয়, বহুজনের সমবেত প্রচেষ্টাতেই কেবল পূর্ণ হতে পারবে।

অশোক ভট্টাচার্য

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে ঃ গোলাম কুদ্দুস ১৫ টাকা

লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতই এটিও একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা। ধরলে শেষ না করে পারা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা দিক যা সাধারণভাবে চোখের আড়ালে থেকে গেছে লেখক সেদিকটিকেই সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মানুষ খুন করে কেন ঃ দেবেশ রায় ৩০ টাকা

চা-বাগানের সমাজকে নিয়ে লেখা একটি চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী উপন্যাস। লেখককে এজন্য অনেক প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোনো সমালোচকই লেখকের সাহস ও বলিষ্ঠতাকে প্রশংসা না করে পারেন নি।

মানুষের গল্প ঃ সম্পাদনা সুনীল জানা/সৌরি ঘটক ১৫ টাকা

বিগত পঞ্চাশ বছরের আন্দোলনের মধ্যে যে কজন উল্লেখ্য কথাকার বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন শক্তিতে শানিত করে তুলেছিলেন তাঁদের ছোট গল্পের সংকলন।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

গ্রাহক সংক্রান্ত

ডাকখরচ সহ বার্ষিক গ্রাহকচাঁদা : তেইশ টাকা
ডাকখরচ বাদে গ্রাহকচাঁদা : কুড়ি টাকা
ডাকখরচ সহ আজীবন গ্রাহকচাঁদা : দুশো টাকা

বর্ধিত মূল্যে বছরে অন্তত তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। গ্রাহকদের সেজন্য কোনো অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না। বছরের যে-কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

এজেন্সি সংক্রান্ত

অন্তত ৫ কপি নিতে হয়
কমিশন শতকরা ২৫ টাকা
পত্রিকা ভি পি-তে পাঠানো হয়। ডাকব্যয় আমাদের।

ব্যবস্থাপনা দপ্তর
কর্মাধ্যক্ষ 'পরিচয়'

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা-৭৩

দাম : দুই টাকা

পারিচয়

৫৫ বর্ষ
৫ সংখ্যা

পঞ্চাশ-বর্ষে 'পরিচয়'-এর আবেদন

'পবিচয'-এব এখন পঞ্চাশ চলছে—শারদীয থেকে। এতদিন ধবে প্রায় তো নিযমিতই বেবিযে আসছে 'পবিচয'—তবু মনেই হতে চায না 'পবিচয' এতই পুবনো। এই প্রায পঞ্চাশ বছব ধবেই 'পবিচয'-এব একটা চেহাবা সকলেব চোখ-সওযা—শীর্ণতা কোনোদিনই আব ঘুচবাব নয, ছাপা-বাঁধাইযেব বাহাব কোনোদিনই জুটল না, আর কখনো-কখনো একটু উনিশ-বিশ সত্ত্বেও, বিক্রি প্রায একই বকম।

চেহারাব মতোই, 'পরিচয়'-এব একটা ধাতও যেন সবাব জানা। গল্প-কবিতাই হোক, আব প্রবন্ধ-আলোচনাই হোক, কোনো-একটা লেখা ভালো লাগে নি বোঝাতে সবচেযে বেশি যে-কথাটি শোনানো হয, 'পবিচয'-এব মতো হয নি।'

'পবিচয'-এব মতো হওযাটা যে কী ব্যাপাব, সেটা অবিশ্যি কাবো কাছেই কোনো সময খুব স্পষ্ট নয। বলা যায না বোঝা যায, দেখা যায না ধবা যায—এমন নিবিখ ব্যবহাবে সব সময় সুফল ফলে তা-ও নয। কিন্তু না-হলেও 'পবিচয'-এ লেখাব এটাই লোভ—তরুণতম থেকে প্রবীণতম লেখকের—'পবিচয'-এব মতো লেখা। 'পবিচয়'-কবাবও এটাই বোমান্স—'পবিচয'-এর মতো কাগজ কবা। আব পডাবও এটাই প্রত্যাশা—'পবিচয'-এব মতো কাগজ-পডা। পঞ্চাশ বছর ধবে 'পবিচয'-এব সঙ্গে এই মাপেব বোধটাই জডিযে গেছে—বচনাব মাপ, মননেব মাপ, পঠনেব মাপ। তাতে ভালো হযেছে না খাবাপ হযেছে, সে-তর্ক এতগুলো বছবে অবান্তব হয়ে গেছে। এটাই 'পবিচয়'-এব ভবিতব্য।

পঞ্চাশ বছবকে উপলক্ষ কবে আমরা 'পরিচয'-এব পুবনো সব কপি দেখছি। তাতে মনে হয, সৃষ্টি ও মননেব বিভিন্ন দিকে 'পাবচয'-এব বিভিন্ন প্রবণতা ও ভূমিকাব একটা আঁচ পাওযা যাবে। মে-জুনে সেই সব নিযে একটা বিশেষ সুবর্ণ-জযন্তী সংখ্যা প্রকাশ কবাব তোডজোব চলছে।

এই উপলক্ষেই আমবা 'পবিচয'-এব গ্রাহক-তালিকা, গত প্রায বছব দশ-পনেবোব, দেখছিলাম। একটা খুব ওপব-ওপর দেখাতেও আন্দাজ হল, 'পরিচয়'-এর বর্তমান গ্রাহকদের বারো-আনাই পুবনো। বাকি চার-আনি

A

BOOK

অনিয়মিত—তাঁদের ভেতর কেউ-কেউ মাঝে-মধ্যে ফাঁক দিয়েছেন, কেউ-কেউ আবার বছর-খানেক চালিয়েই বন্ধ করেছেন। তাতে বোঝা যায় 'পরিচয়'-এর নতুন গ্রাহক তুলনায় কম। তার মানে নতুন পাঠক কি 'পরিচয়' পড়েন না? তা হলে, গ্রাহকের বাইরে যে-তিনগুণ আমরা ছাপি তা কেনেন কারা। এই নতুন পাঠকরাই কেনেন, কিন্তু তাঁরা গ্রাহকের বাধ্য-বাধকতার মধ্যে যাবেন না।

'পরিচয়'-এর পুরনো সংখ্যা আর পুরনো গ্রাহক-তালিকা দেখে আমাদের সামনে সেই বহু পুরনো কথাটাই নতুনভাবে প্রমাণিত হয়ে উঠছে, 'পরিচয়' এতদিন বেঁচে থাকতে পারছে লেখক-পাঠক ও সংগঠকদের ভেতর এমন এক বোঝাপড়ায় যাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য। গ্রাহক-পাঠক-দের এই সমাজ খুব অনির্দিষ্ট নয়। সমর্থনই শুধু নয়, সংগঠিত চেষ্টা ছাড়া 'পরিচয়' কোনো অবস্থাতেই চলত না। আবার, কেবল তাঁদের নিজেদের তাড়াতেই এই সংগঠিত চেষ্টা ঘটে উঠত না—যদি তাঁদের পক্ষে 'পরিচয়' অপরিহার্য হয়ে না উঠত।

এই কথাগুলো লিখতে-লিখতেই চোখের সামনে ভাসছে এমন অনেকের মুখ, যাঁরা প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে আট-দশ-পনের-বিশ-পঞ্চাশজন গ্রাহকের টাকা জমা দিয়ে যান, টেলিফোন করে বিজ্ঞাপন নিয়ে যেতে বলেন, নিজেরা এসে বিজ্ঞাপনের চেক দিয়ে যান। 'পরিচয়'-এর কাছে তাঁদের আর-কোনো প্রত্যাশা নেই—'পরিচয়' যেন 'পরিচয়ই'-ই থাকতে পারে এটুকু ছাড়া।

পঞ্চাশ-বছর এমন-একটা প্রায়-দুর্লভ উপলক্ষ যাতে আমরা—'পরিচয়'-এর সংগঠক-লেখক-গ্রাহক-পাঠক সমাজ—আমাদের নানা উদ্যোগকে একত্রিত করতে পারি। উদ্দেশ্য একটাই—সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ করে 'পরিচয়'-এর এই সমাজকে এত বিস্তৃত করা যা থেকে 'পরিচয়'-এ নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হতে পারে ও 'পরিচয়'-এর ওতপ্রোত যে-মাপের বোধ—মননের, রচনার, পঠনের—তা আরো অনেকের ভেতর ছড়িয়ে পড়তে পারে। একজনের জায়গায় দুজন গ্রাহক হলে তার সঙ্গে অন্তত পাঁচজন পাঠক বাড়ে। একজনের জায়গায় পাঁচজন পাঠক পড়লে তার সামাজিক ক্রিয়া হয়, পাঁচগুণ নয়, শতগুণ।

সুবর্ণ-জয়ন্তীর এই বছর জুড়ে, আগামী শারদীয় সংখ্যার আগে পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছে কয়েকটি কাজের অনুরোধ করছি। এই কাজগুলো আমরা সকলে করে উঠতে পারব ভরসাতেই আমরা আমাদের গ্রাহকচাঁদার

হার এই মুহূর্তে বদলাচ্ছি না—যদিও কাগজের দাম ও প্রেস-খরচা যা দাঁড়িয়েছে তাতে এখনকার চাঁদায় কাগজ দেয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে। কিন্তু সেই অনিবার্য চাঁদা-বাড়ানোও আমরা পেছিয়ে দিচ্ছি এই ধারণা থেকে যে আগামী শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের আগেই, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই, গ্রাহক সংখ্যা আমরা এতই বাড়িয়ে ফেলতে পারব যে ঘাটতির পরিমাণ কমে আসবে ও দাম কমই বাড়াতে হবে। এই কাজ করে ওঠা একমাত্র সম্ভব যদি 'পরিচয়'-এর বর্তমান গ্রাহক-পাঠকরা এই কাজগুলোর দায় নিজেদের ওপর নিজেরা চাপান।

সুবিধের জন্য কাজগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট করে নিচ্ছি :

যাঁরা 'পরিচয়'-এর লেখক কিন্তু গ্রাহক নন,
তাঁরা প্রত্যেকে গ্রাহক হন।
যাঁরা 'পরিচয়'-এর পাঠক কিন্তু গ্রাহক নন,
তাঁরা প্রত্যেকে গ্রাহক হন।
যাঁরা গ্রাহক ছিলেন কিন্তু এখন নন,
তাঁরা নতুন করে গ্রাহক হন।
যাঁরা গ্রাহক আছেন তাঁরা প্রত্যেকে
আর-একজনকে গ্রাহক করুন।

বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা—হাতে—২০ টাকা, ডাকে—২৩ টাকা। আজীবন—২০০ টাকা।

মনীষা গ্রন্থালয় বেলা ১১টা থেকে ৬টা
পরিচয় অফিস সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৯টা

সম্পাদক, পরিচয়
৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৭০০০০৭

প্রকাশিত হলো

দেবেশ রায়-এর উপন্যাস

মফস্বলি বৃত্তান্ত ১৫ টাকা

শঙ্কর চক্রবর্তী-র

জ্যোতির্বিদ্যার নির্ভরযোগ্য বই (২য় সংস্করণ)

সহজভাবে অত্যন্ত কঠিন বিষয়কে হাজির করা হয়েছে বইটিতে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতে বইটি খুবই সাহায্য করবে।

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ ২০ টাকা

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

আপনার জীবনের কোনো
কোনো মুহূর্ত একান্তভাবেই
ইউকোব্যাঙ্কের জন্য

যন্ত্রপাতি নিয়ে খেলতে পারলে ও আর কিছু চায়না। আপনি নিশ্চয়ই চান ছেলে আপনার বড়ো ইঞ্জিনিয়ার হোক।

আপনার ভাবনার সেই স্মরণীয় মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমরা সাহায্য করব।

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ওর সব খেলাই যন্ত্রপাতি নিয়ে। এমনই কোনো মুহূর্তে ওকে দেখে নিশ্চয়ই আপনার মনে হবে কি করে ওকে বড়ো ইঞ্জিনিয়ার করা যায়!

অথচ সম্বল তো মাত্র ওকে ঘিরে আপনার স্বপ্ন আর মাসগেলে মাইনে।

অবশ্য এ ব্যাপারে সাহায্য করতে আছে ইউকোব্যাঙ্ক। মাসের খরচ বাদ দিয়ে যেটুকু বাঁচাতে পারেন, তাই নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। ইউকোব্যাঙ্কের দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় প্রকল্প আপনার কাজে আসবে।

যে মুহূর্তে আপনি স্থির করলেন আপনার ছেলে বড়ো কিছু হবে, তখন থেকেই তার ভবিষ্যতের সূচনা। আপনার জীবনের এই স্মরণীয় মুহূর্তে ইউকোব্যাঙ্ক আপনার সঙ্গী।

UCO/CAS-64/80 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

প্রেমচন্দ : শতবার্ষিকী সংকলন সম্পাদনা : প্রদীপ দাশগুপ্ত
জীবনকথা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও
নানালেখার এক অনবদ্য সংকলন ॥ এক খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১৬৲

চীনের শ্রেষ্ঠ গল্প সম্পাদনা : রমা ভট্টাচার্য / সিদ্ধার্থ ঘোষ
লু সুনের সঙ্গে চীনা সাহিত্য বিষয়ে এডগার স্নো-র
আলোচনার দুষ্প্রাপ্য অংশ ও লেখক পরিচিতিসহ। ১৪৲

অনন্ত উদ্ভিদ রক্তে (কবিতা) সুনীলকুমার নন্দী ৫৲

॥ প্রকাশের অপেক্ষায় ॥

দুই দশক (গল্প-সংকলন) : দেবেশ রায়
মহিষকুড়ার উপকথা ও আরো দুটি উপন্যাস :
অমিয়ভূষণ মজুমদার

অন্বেষা ॥
কলকতা-৪২

কলেজ স্ট্রিটের সম্ভ্রান্ত দোকানে
খোঁজ করুন।

এর পরের সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)

পরিচয়

বিশেষ ছোটগল্প সংখ্যা

ফেব্রুয়ারির শুরুতেই বেরবে।

লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে : গোলাম কুদ্দুস ১৫ টাকা

লেখকের অন্যান্য উপন্যাসের মতই এটিও একটি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা। ধরলে শেষ না করে পারা যায় না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা দিক যা সাধারণভাবে চোখের আড়ালে থেকে গেছে লেখক সেদিকটিকেই সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

মানুষ খুন করে কেন : দেবেশ রায় ৩০ টাকা

চা-বাগানের সমাজকে নিয়ে লেখা একটি চাঞ্চল্য-সৃষ্টিকারী উপন্যাস। লেখককে এজন্য অনেক প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কোনো সমালোচকই লেখকের সাহস ও বলিষ্ঠতাতে প্রশংসা না করে পারেন নি।

মানুষের গল্প : সম্পাদনা সুনীল জানা/সৌরি ঘটক ১৫ টাকা

বিগত পঞ্চাশ বছরের আন্দোলনের মধ্যে যে কজন উল্লেখ্য কথাকার বাংলা কথাসাহিত্যকে নতুন শক্তিতে শানিত করে তুলেছিলেন তাঁদের ছোট গল্পের সংকলন।

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

পরিচয়

ডিসেম্বর ১৯৮০ ৫০ বর্ষ ৫ সংখ্যা

নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু। দেবেশ রায় ১ক

অন্য ভুবনের বিনোদবিহারী। রুচিরা মুখোপাধ্যায় ১

রামকিঙ্কর ও তাঁর কাজকর্ম। কে. জি. সুব্রহ্মনিয়ম ৫৯
অনুবাদ: শিবশম্ভু পাল

'পরিচয়'-এর আড্ডা। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ৩৯

মোনালিসা। পূর্ণেন্দু পত্রী ৪৭

কবিতাগুচ্ছ

কার্ল মার্কস, অনুবাদ: সিদ্ধার্থ রায় ৩১, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৯, অমিতাভ দাশগুপ্ত ৮৫, রবি ভট্টাচার্য ৮৬

গল্প

দাম্পত্য। সুদর্শন সেনশর্মা ৭০

আলোচনা

বনবিহারী মুখোপাধ্যায়: সংযোজন। জীবানন্দ চাট্টোপাধ্যায় ২২

শতবর্ষে ব্লক। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৭

পুস্তক-পরিচয়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। অমিতাভ দাশগুপ্ত ৮৭

পেজান্ট্রি অব বেঙ্গল / আর. সি. দত্ত। শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত ৯১

নাট্যচিন্তা: শিল্পজিজ্ঞাসা / দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৫, সাংস্কৃতিক আন্দোলন—অতীত ও বর্তমান। দেবেশ রায় ৯৭, এসো, মিলেমিশে থাকি/অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল ১০৫, 'তীর্থদর্শন'-এর পঞ্চাশ বছর / শৈলেন চৌধুরী। অরুণ সেন ১০৮

আলোকচিত্র

সংবাদচিত্র প্রদর্শনী অজয় দে ১১৩

মতামত

গোপাল হালদার, কাজী আব্দুল মান্নান, বিমলচন্দ্র ঘোষ, অনিলেন্দু ধর, বিমল মিত্র, তপন বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৫

বিয়োগপঞ্জি

শৈলেন মোহান্ত কালী চৌধুরী ১২০

প্রচ্ছদচিত্র

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দেবেশ রায়

পরিচয়-এর পক্ষে দেবেশ রায় কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেণিয়াটোলা লেন থেকে মুদ্রিত ও পরিচয় কার্যালয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

৮ জানুয়ারি আরো অনেকের সঙ্গে আপনারা এসপ্লানেড ইস্টের সেই দৃশ্যটিতে ছিলেন, 'আনন্দবাজার'-এর ভাষায় যা নাকি, 'কলকাতার পক্ষেও অভূতপূর্ব'। কেন 'অভূতপূর্ব' অবশ্য বোঝা যায় না ঐ একটু নাটুকে অতিশয়োক্তিতে। আপনারা এমন কেউ-কেউ ওখানে ছিলেন, যাঁরা সাধারণত অমন বারগায় থাকেন না? কিন্তু কলকাতা তো এমন-কি রবীন্দ্রনাথকেও মনুমেন্টের তলায় দেখেছে।

সে যা হোক। বাংলা ভাষা ও আনন্দবাজারের সম্পর্ক তো শব্দ ও অর্থের নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, রাজ্য সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির যে-প্রতিবাদ ছিল সেদিনের ঐ অবস্থানের উদ্দেশ্য, আপনাদের উপস্থিতি তাতে নতুন মাত্রা এনে দিল। পরদিনের ইংরেজি-বাংলা সব কাগজেই তা তো বেশ স্পষ্ট। এখন এই সব কাগজে শিক্ষা ও ভাষার প্রসঙ্গ ধরে বামফ্রন্ট সরকারের সাংস্কৃতিক নীতি নিয়েও লেখালেখি শুরু হয়ে গেছে। আর বামফ্রন্টে যেহেতু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিরই গুরুত্ব, তাই এই প্রসঙ্গে চীন ও সোভিয়েতের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, অর্থাৎ কমিউনিস্টদের সাংস্কৃতিক নীতি নিয়েই আবার নতুন করে পুরনো গবেষণা শুরু হয়েছে। এই সব গবেষণায় কী থাকে, তা জানতে অবশ্য আজকাল এগুলো আর পড়ারও দরকার হয় না। শ্রেণী-সংগ্রামের নামে কমিউনিস্টরা জাতীয় ঐতিহ্য নষ্ট করছে—এই জিগিরই হয়ে ওঠে সবচেয়ে কার্যকর। নানা রকমফেরে এই কথাটিই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়ে থাকে। পশ্চিমবাংলায়ও সেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আগুনে ফুঁ দেয়া শুরু হল। ৯ জানুয়ারি আনন্দবাজারে আপনাদের অবস্থানের রিপোর্ট আর দীর্ঘতর সম্পাদকীয়, স্টেট্‌সম্যান কাগজের সম্পাদকীয়, ঐদিনই কলকাতার বিভিন্ন মোড়ে কংগ্রেস আই-এর ব্যানারের নীচে সারাদিনব্যাপী পথসভার বক্তৃতা ও চলমান পোস্টার, ৮ নভেম্বর তারিখ দেয়া যে-'দেশ' সাপ্তাহিক ১০ জানুয়ারি বেরল তার সম্পাদকীয় ও একটি প্রবন্ধ—মাত্র একদিনের মধ্যে এই এতগুলি লেখালেখি ও সভা-সমিতির জন্য প্রস্তুতি দরকার হয় অনেক দিনের।

৮ জানুয়ারি আপনাদের অবস্থানই এই কাজ শুরুর যোগ্য পরিস্থিতি তৈরি করে দিতে পারবে—সে-বিষয়ে কাগজের কর্তৃপক্ষ থেকে রাজনৈতিক দল পর্যন্ত একটা হিসেব ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে।

যে-সামাজিক সম্মতি প্রমাণ করা যায় না কিন্তু থাকে, আপনারা সেখানে ছিলেন তারই প্রতিনিধি। কবি ও বুদ্ধিজীবী তাঁদের সৃষ্টি ও মননের শক্তিতে যে-প্রজ্ঞার অধিকার পান, আপনারা সেখানে ছিলেন তারই প্রতীক। এ তো আপনারা অর্জন করেছেন আপনাদের সারা জীবনের দুশ্চর ব্রতে ও কঠিন কর্মে, যা এখনো অব্যাহত। আপনারা একজন বাঙালি জাতির ঐতিহাসিক, একজন বাঙালির সাহিত্যের ঐতিহাসিক, আর-দু জন বাংলার কবি। আপনারা যখন কথা বলেন তখন তাতে অনুরণিত হয় আমাদের অজ্ঞাত অতীতের কোনো ব্যঞ্জনা, আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোনো চেতাবনী। কবিতা ও ইতিহাসে সত্যের কোনো বিকল্প নেই। আপনারা সৃষ্টিতে মননে সেই সত্যকেই তো খুঁজে ফিরেছেন। আর আমাদের ভাষাকে, সত্তাকে সেই সত্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

অথচ আপনাদের উপস্থিতিকে উপলক্ষ করে আমাদের বর্তমান-অতীতের সেই সত্যকেই ঘোলাটে করে দেবার সুযোগ তৈরি হল। আপনাদের 'অবস্থান'-এই সত্যের নামে সত্য-গোপন বা সত্যের অংশকেই সমগ্র করে দেখানো হল। অথচ আপনাদের উপস্থিতির ফলে সেই পরিকল্পিত অসত্য এখন কাগজে-মিডিয়ায় এই মুহূর্তের চরম সত্যের ছাড়পত্র পাচ্ছে।

একেবারে শুরু থেকে ধরা যাক।

সেদিনের সেই অবস্থান ছিল রাজ্য সরকারের ভাষা ও শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু সমগ্র সত্যের প্রয়োজনে এ-কথা কি স্বীকার করা উচিত ছিল না বামফ্রন্ট সরকার শাসন-ক্ষমতা পেয়েই বাংলা ভাষায় সরকারি কাজকর্ম করার নীতি কার্যকর করেছেন? এ-কথাও কি একবার উচ্চারণ করা দরকার ছিল না যে এই রাজ্য সরকারই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে দিয়েছেন? এ-কথা কি বলা উচিত ছিল না যে কলেজের শিক্ষার সমস্ত ব্যয় এই রাজ্য সরকার বহন করছেন? এ-কথাও কি কোথাও-না-কোথাও একবার মেনে নেয়া উচিত ছিল না যে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার স্কুলে দুপুরের খাবার দেবার চেষ্টাও এই সরকারের পক্ষ থেকে শুরু করা হয়েছে। এই চারটি কাজ গত তেত্রিশ বছরের আর কোনো সরকারই করে নি। প্রাথমিক শিক্ষা

থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত এই সরকারের ভাবনা-চিন্তা ও উদ্যোগেরই নিঃসংশয় প্রমাণ এই তিনটি কাজ—যদি সমগ্র সত্যই লক্ষ হয়।

সেই উদ্যোগেই আবার এমন কতকগুলি ব্যবস্থা এমন পদ্ধতিতে নেয়া হয়েছে যে-বিষয়ে সকলে একমত হতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত সংস্থাকে বাতিল করে এতদিন ধরে মনোনীত সংস্থা কেন কাজ চালাবে? প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তনের প্রয়োজন কেন হল আর সে-পরিবর্তনের দায়িত্ব কাদের ওপর দেয়া হল? কলেজ-শিক্ষায় বাংলা-ইংরেজিকে আবশ্যিক পাঠ্য তালিকা থেকে বাদ দেয়া হল কেন ও কাদের সুপারিশে? এই প্রশ্নগুলির সৎ ও পরিষ্কার উত্তর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সময়ই দেয়া হয় নি। নানা সময় নানা মুখপাত্র নানা-রকম পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও বারবার অপ্রয়োজনীয় বাক্‌যুদ্ধের সূচনা করছেন। তার ফলে অকারণে জল ঘোলা হয়েছে।

কিন্তু আপনাদের অবস্থান তো ছিল না এই কতকগুলি আপত্তিকর কাজের বিরোধিতামাত্র। বরং এই কয়েকটিমাত্র কাজকেই রাজ্য সরকারের ভাষা- ও শিক্ষানীতি বলে ঐ অবস্থান থেকে ঘোষণা করা হল। আর তার খেই ধরে এখন কাগজে-পত্রে এই তালিকাকে লম্বা থেকে লম্বা করা হচ্ছে। বিভিন্ন কলেজের স্থানীয় গভর্নিং বডির ওপর অধ্যাপক-নিয়োগের দায়িত্ব না রেখে রাজ্যভিত্তিক কলেজ সার্ভিস কমিশন গঠন কি অন্যায়? এই কমিশন গঠনের প্রস্তাব তো এর আগের সরকারের আমলেই হয়েছিল। তখন তো কোনো আপত্তি হয় নি। কলেজে পড়ানোর চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় নম্বর তো কার্যত এর আগের সরকারই কমিয়েছেন। তখন তো কোনো আপত্তি হয় নি। সরকারের একই আইনে পরিচালিত প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকরা একই পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ও তাঁদের বৈশিষ্ট্যপ্রমাণের কোনো বিশেষ ব্যবস্থা না-থাকা সত্ত্বেও কার্যত কেন এমন বিশেষ মর্যাদা পাবেন যাতে তাঁদের বদলি করা যাবে না—এই প্রশ্ন তুললে সরকার কি অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে।

অনুমান করতে পারি, অন্তত আপনারা নীতি হিসেবে এগুলোর বিরোধিতা করতে পারেন না। এমন-কি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, প্রয়োগের কিছু অনাচার যদি আপনাদের জানাও থাকে, এ-কথাও আপনাদেরই সবচেয়ে বেশি জানা এই ধরনের নীতিতেই অনাচারের আশঙ্কা সবচেয়ে কম থাকে। কোনো-কোনো কাগজে অভিযোগ করা হয়েছে যে অনেক কলেজে

গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে নিযোগ করা হযেছে কম-বযেসি কোনো জন-নেতাকে। স্বাধীনতার পরে বিশ বছর ধরে তো দেখেছি দক্ষিণ বাংলায ভেডির মালিক, মধ্য বাংলায চালকলের মালিক আর উত্তর বাংলায চা-বাগানের মালিক হযেছেন কলেজের গভর্নিং বডির মেম্বার ও সেই সুযোগে কেউ-কেউ এমন-কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও মেম্বার। তখন তো কোথাও কোনো আপত্তি ওঠে নি। তাঁরা শুধু দলনিরপেক্ষ মালিকই ছিলেন না—ছিলেন আবার শাসকদলেরই এম-এল-এ, এম-এল-সি, এম-পি। আজকের গভর্নিং বডির মেম্বার জননেতা অথচ মালিক নন—আপত্তির কারণ কি সেখানেই?

কিন্তু এগুলো তো অনেকটাই বাইরের তর্ক। আপানারাও এই তর্কে ততটা জড়িত নন—অনুমান করি। আপনারা নিশ্চযই মূল সত্য বা মূল নীতিটাকেই বিচার করতে চান। কিন্তু সেদিনের অবস্থান থেকে, আপনাদের উপস্থিতির সমর্থনে, এই আনুষঙ্গিককেই প্রচারে বক্তৃতায মিডিযায কাগজে এমন বড করে তোলা হচ্ছে যে আনুষঙ্গিকই হযে উঠছে প্রসঙ্গ, মূল সত্যকে ঢেকে ফেলা হচ্ছে দৈনন্দিনের এই সব জটিলতায। তাতে আবার এমন সব স্বার্থ জড়িযে যাচ্ছে যে স্বার্থের কাছে কোনো সত্যই অলঙ্ঘনীয় নয ও সব সত্যই ব্যবহারের কৌশলে বিকারযোগ্য।

আপনাদের অবস্থানের পরদিন থেকে কাগজপত্রে লেখা হচ্ছে ও পথ-সভার বক্তৃতায বলা হচ্ছে যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরেও ইংরেজিকে আবশ্যিক বিষয হিসেবে রাখতে হবে। কোনো একটি বামপন্থী দল এই কথাটি অনেক-দিন ধরেই বলে আসছে। কিন্তু এটাকে এমন সার্বজনীন দাবির চেহারায উপস্থিত করা শুরু হযেছে আপনাদের ঐ অবস্থানের পর থেকেই। আর তারই সূত্র ধরে কাগজের সম্পাদকীযতে, সম্পাদকীযতুল্য প্রবন্ধে, সাপ্তাহিকের রচনায, পথসভার বক্তৃতায এখন এই ১৯৮১ সালে আমাদের অবিরত পড়ে যেতে শুনে যেতে হচ্ছে যে বাংলা একটি পেছিযে থাকা ভাষা, ইংরেজির সম্পর্ক নিরপেক্ষভাবে বাংলা ভাষার কোনো ভাববহনের ক্ষমতা নেই, বিজ্ঞান-চিন্তা ও তত্ত্বচিন্তার যোগ্যতা বাংলাভাষার নেই, প্রাথমিক শ্রেণী থেকে মাতৃভাষার স্তন্যপানের সঙ্গে ইংরেজি ভাষার 'ফিড্' না মেশালে বাঙালি শিশুর হাড়ে মজ্জায ঘুন ধরে যাবে। আর বাংলাভাষার এই অসম্মাননায শুধু যে আপনাদের অবস্থানকেই ব্যবহার করা হচ্ছে তা নয, আনন্দবাজারের সম্পাদকীয়তে, সেই বামপন্থী দলটির মুখপত্রে ও কংগ্রেস-ই দলের ভাষণে-পোস্টারে রবীন্দ্রনাথের বিভ্রান্ত উদ্ধৃতিও ব্যবহৃত হচ্ছে।

'বাঙ্গালির ইতিহাস' আমাদের জাতীয় আত্মমর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল শুধু ইতিহাসচর্চার মাহাত্ম্যেই নয়, সে-ইতিহাস বাংলা ভাষাতে লেখা বলেও। যে-ভাষা ইতিহাসের ঐ বিস্তারকে ধারণ করতে পারে—সে ভাষা মানব-বিদ্যাচর্চার যোগ্য ভাষা—'বাঙ্গালির ইতিহাস'-এ তা প্রমাণিত হয়েছিল। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' আমাদের সাহিত্যমর্যাদাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল শুধু পাণ্ডিত্যের বিস্তারেই নয়, সেই পাণ্ডিত্যের আধার হিসেবে মাতৃভাষাকেই বেছে নেয়া হয়েছিল বলেও। আমাদের সাহিত্যের গভীর সামাজিক মূল, Matter of Bengal, যে তাতে উদ্ঘাটিত হল, শুধু তাই নয়, সেই উদ্ঘাটন সম্ভব হল আমাদেরই মাতৃভাষাতে—'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর কয়েক খণ্ডে তা প্রমাণিত। প্রেমেনদা, আপনি একদিন বাঙালির ঐতিহাসিককে ভাষা যুগিয়েছিলেন,—আমাদের সীমা দক্ষিণে সুন্দরবন উত্তরে তরাই।' সুভাষদা, আপনি একদিন 'আমার সোনার বাংলা'-কেও ছোট করে আর-এক ডাক শিখিয়েছিলেন, সোনাও তার কাছে তুচ্ছ, ভালোবাসার গাঢ়তায় 'আমার বাংলা' এই দুটোর বেশি শব্দ আর বলা যায় না, গলা বন্ধ হয়ে আসে।

আমাদের খুব গোপন দুঃখ হয় যখন আপনাদের উপস্থিতি আর বক্তৃতার অবলম্বনে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির বিভ্রান্ত প্রয়োগে, আজ পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক খেলায় বাংলাভাষাকে আবার দুই-শতাব্দীর সেই অমর্যাদাকর তুলনায় টেনে নামানো হয়—বাংলা ভাষা নাকি যোগ্য নয়। ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবির উত্তরে অবিকল এই যুক্তি দেয়া হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে—ভারতবাসী নাকি স্বাধীনতার যোগ্য নয়। আমার ভাষা যে-বিদ্যার যোগ্য নয় আমারাও তো সে-বিদ্যার যোগ্য নই। পশ্চিমবাংলার বাংলা কাগজে, কলকাতার কোনো রাজনৈতিক দলের বাঙালি যুবকদের বাংলা ভাষার বক্তৃতায় এই কথা পড়তে-পড়তে ও শুনতে-শুনতে পরাজয়-বোধে ও আত্মগ্লানিতে মনে হয়—এতটা বোধহয় আমাদের প্রাপ্য ছিল না। কিসের যোগ্য নয় বাংলা ভাষা? এমন-কি প্রাথমিক শিক্ষারও যোগ্য নয়? শুধু বাংলাভাষাতেই প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হবে—এই সিদ্ধান্তটিতেও সমস্ত বাঙালির সম্মতি জুটবে না, বাংলাভাষার আজ এমনই হাল? এমন-কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও নানা আদিবাসী গ্রুপের মাতৃভাষার লিপি তৈরি করে তাদের প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাতেই সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে—সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা নাই তুললাম কারণ সেখানকার

'সাংস্কৃতিক বিপ্লবই'-ই তো এখানকার ভাষার লড়াইয়ের অন্যতম লক্ষ। তা হলে, বিশ শতকের শেষ পর্বের এই বিশ্বে একমাত্র বাঙালি শিশুরই অধিকার থাকবে না বছর-দশেক বয়েস পর্যন্ত শুধু তার মাতৃ-ভাষাতেই ছড়া বলার, পড়া শেখার? এক আমাদের এই হতভাগ্য বাংলা-ভাষী খোকনেরই শুধু টিয়ে পাখি, রোয়াল মাছ আর ভোঁদড় নাচের সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য কালো ভেড়াটির উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত পশমের হিসেব কষে যেতে হবে ইংরেজি ভাষায়? শুধু বাংলা-ভাষী বাপ-মায়ের সন্তান হওয়াটাই এত বড় নিষ্ঠুর পশ্চাৎপদতা? আমার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষা-হীন পিতা, যে তার সন্তানের জন্য কোনো সর্বভারতীয় পরীক্ষার ফললব্ধ উচ্চ চাকরির ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে অপারগ, তার ছেলেকে, এই পশ্চিম-বাংলাতে, শুধু বাংলায় ক্লাশ ফোর পর্যন্তও পড়ানোর অধিকার পাবে না? অথচ যাঁরা মাতৃভাষার বুলি ফোটার সঙ্গে-সঙ্গে পুত্রকন্যাকে ইংরেজিও শেখাতে চান তাঁদের জন্য খোলাই আছে অলিতে-গলিতে ইংরেজি স্কুলের স্বাধীনতা। সুভাষদা, আপনি 'আমার বাংলা'-তে গারো পাহাড়ের এক হাজং কৃষকের কথা লিখেছিলেন, সে মহাজনের ধারের হ্যাণ্ডনোট পড়তে পারে না বলে বাপের ঋণের সুদের সুদ শুধে যাচ্ছে। গত প্রায় ৪০ বছরেও সেই কৃষক সন্তান অপরিবর্তিতই আছে। তার মতোই একজন কৃষকের ছেলে, এই পশ্চিমবাংলার, যদি চায় শুধু বাংলা ভাষাটুকু শিখতে, যাতে সে নিজেকে বাঁচাতে পারে মিথ্যা মামলা আর মিথ্যা কবলার জাল থেকে, পড়তে পারে খবরের কাগজ আর ইস্তাহার, লিখতে পারে দু-এক পাতা দরখাস্ত—তাহলে এই ইচ্ছার মূল্য হিসেবে তাকে বইতেই হবে ইংরেজির বোঝা? বাংলা শিখতে হলে ইংরেজিও পড়তে হবে—একমাত্র এই শর্তেই হবে নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা? শুধু মাতৃভাষাই পড়তে চাই—এই নাগরিক অধিকার তা হলে কোনো অধিকারই নয়?

একসময় মনে হত এই কথাগুলি বুঝি খুব জোরালো যুক্তি। আজ সে-ভরসা আর নেই। বরং ভয় হয়, বুঝি এতে কোনো বাঙালি আবেগের অতিরেকই ধরা পড়বে। ভয় হয়, কিন্তু আবার একটু গোপন গর্বও বুঝি হয়—বাঙালি আবেগের এইটুকু অহঙ্কার এখনো রাখতে পেরেছি বলে। সেই অহঙ্কারের জোরেই আপনাদের কাছে দাবি করি বাংলা ভাষা ও বাঙালি মননের এই রাজনৈতিক অবমাননা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিন। বামফ্রন্ট সরকারের কোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনাদের সমালোচনা ও আপত্তি আপনারা নিশ্চয়ই

জানান। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থাকে সমগ্র সত্যের মোহ সৃষ্টিতে আপনাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি বা পরোক্ষ নীরবতা দিয়ে সাহায্য করবেন না। অন্তত এটুকুও জানান যে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ভাষা বাধ্যতামূলক না-ও হতে পারে, মাতৃভাষাই সে স্তরে একমাত্র অবলম্বন হতে পারে। এটা বামফ্রন্টের স্বার্থের কথা নয়, সরকারের স্বার্থের কথাও নয়; বাংলা-ভাষীর আত্মসম্মানের ও বাঙালি সংস্কৃতির আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। সেই সম্মানবোধ ও মর্যাদা বোধ সৃষ্টিতে নিজ-নিজ রচনায় আপনারা যেমন সাহায্য করেছেন, তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও এখন তেমনি আপনাদের আছে। আমি সেই দায়িত্বের আশ্রয়ই চাইছি। বিনীত

দেবেশ রায়

অন্য ভুবনের বিনোদবিহারী

রুচিরা মুখোপাধ্যায়

শিল্পী বিনোদবিহারী বা সাহিত্যিক বিনোদবিহারী সম্বন্ধে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে বা হবে, আমি তা নিয়ে এই মুহূর্তে কিছু লিখতে চাই না। মানুষ বিনোদবিহারী বা বিনোদবিহারীর দৈনন্দিন জীবনের কোনো-কোনো কথা কিছু লিখতে চাই।

আমি সাতবছর বিনোদদার সহকারিণী হিসেবে কাজ করেছি। এই সাতবছরে আমি দেখেছি শিল্পী হিসেবে শান্তিনিকেতনেই সাধারণের মধ্যে বিনোদবিহারী প্রায় অপরিচিত, ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই তাঁকে চেনে না, জানে না। তারপর কয়েকটি লেখার সুবাদে ও প্রধানত সত্যজিৎ রায়-এর ডকুমেন্টারির বিষয় হয়ে পড়ায় তিনি কেমন রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। এখন চারদিকের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয়—ঐ অপরিচয়ের অতীত যেন অলীক। আমি এই অসাধারণ শিল্পী-ব্যক্তিত্বের যে-পরিচয় পেয়েছি তারই কিছু বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রসঙ্গ প্রকাশ করতে চাই। এই একান্ত আলাপচারিতে ব্যক্তিগত কথা এসে পড়বে। কিন্তু বিনোদবিহারীর সূত্রেই সে-সব প্রাসঙ্গিক।

এক

তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। আমার পিতা ও তিনি একই সালে অর্থাৎ ১৯১৭-তে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে এসেছিলেন। কলাভবনের বিনোদবিহারী ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সুজিতকুমারের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগে নি। বিনোদবিহারীর দৃষ্টিশক্তি কম থাকলেও ধীশক্তি এতই প্রখর ছিল যে সুজিতকুমার তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এই আবাল্য সুহৃদ্‌দের প্রণয়প্রীতির সম্পর্কে আমরণ অটুট ছিল।

বিনোদবিহারী আমার পিতৃবন্ধু হলেও কাছ থেকে তাঁকে কোনোদিন দেখি নি। আমার জন্মের আগেই তিনি প্রথমবার শান্তিনিকেতন ছেড়ে যান। যখন তিনি শান্তিনিকেতনে আবার ফিরে এলেন তখন কৈশোরের অহেতুক সংকোচে তাঁর কাছে যাই নি। দূর থেকে তাঁর কালো চশমা-

পরা গম্ভীর মুখে এক কাঠিন্য দেখেছিলাম। আসা-যাওয়ার পথে মানুষটিকে প্রায়ই চেয়ে-চেয়ে দেখতাম। কৈশোর উত্তীর্ণ হলে তাঁর সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মেছিল কিন্তু কাছে যাবার কল্পনাও করতে পারতাম না। মনে হত, তিনি তাঁর চারদিকে একটা দুর্ভেদ্য আবরণ সৃষ্টি করে রেখেছেন যা আমার মতো অর্বাচীন ও স্বভাবলাজুক মেয়ের পক্ষে অভেদ্য।

আমার বাবা তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রায়ই বিনোদদার কাছে যেতেন। নতুন রচনা লিখেই বিনোদদাকে না-পড়ানো পর্যন্ত তাঁর শান্তি থাকত না। বাড়িতে এসে বলতেন—'বিনোদের মতো রসবোধ আমাদের মধ্যে কারোই নেই'। শুনে একটু অবাকই হতাম। ঐ কালো চশমা-পরা ফরসা মুখে কপালের স্পষ্ট বলিরেখার রুক্ষতা ছাড়া আমি কিছুই দেখতে পেতাম না। এর মধ্যে রস কোথায়?

হঠাৎ একদিন বাবা এসে বললেন—'বিনোদ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন'। আমার হৃদ্‌কম্প শুরু হল। ক্ষীণকণ্ঠে বললাম—'কেন?'—'তোমার সাহায্যে কিছু ইংরেজি বই পড়তে চান। দেখা করো অবশ্যই।'

দুরু-দুরু বক্ষে গেলাম। খোলা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকবার উপক্রম করতেই 'কে' বলে বিনোদদা চেঁচিয়ে উঠলেন। অত্যন্ত অমসৃণ কণ্ঠস্বর। প্রথম অভ্যর্থনায় হতাশ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লাম। মিয়নো গলায় নাম বললাম। 'এসো, এসো। তোমাকে তো কখনোই দেখি নি। কেমন দেখতে তুমি? মা-র মতো, না বাবার মতো?' আবার, আমার জবাব শুনে, 'মায়ের মতো? তাহলে তো ফরসা আর বেশ সুশ্রী। তোমার মাকে আমার বেশ মনে পড়ে। ছোটখাট সুশ্রী মানুষ—কিন্তু তুমি তো ছোটখাট নও আদৌ।'

আমার মনে হল, বিনোদদা একটু-আধটু তাহলে দেখতে পান। কিন্তু উনি একবারও মুখ তুলে আমার দিকে তাকান নি। ডানহাতে মোমের একটা ছোট তাল—বাঁ হাতে চায়ের পেয়ালার হাতল। কালো চশমা পরা মুখটা টেবিলের ওপর বেশ কিছুটা ঝুঁকে। মাঝে-মাঝে বাঁ-হাতের পেয়ালা নামিয়ে সেই হাত দিয়ে টেবিলে কি যেন হাতড়াচ্ছেন। কিছু খুঁজছেন, কিন্তু কী তা আর জিজ্ঞেস করবার সাহস হল না। মোমের তালটা দু-হাতের আঙুলে টিপছেন, তালটার আকৃতি পাল্টে গেল, আবার টিপলেন, একটা ছাঁদ বেরোল, আবার টিপলেন, তাকিয়ে দেখলাম—একটি নিখুঁত নারীমূর্তি।

'দাঁড়িয়ে কেন? আমার ডানদিকে একটা খাট আছে ওখানে বসো। সংস্কৃত জানো? তোমার বাবা দিদি তো সংস্কৃতে সুপণ্ডিত।' একটু থেমে, আবার—'জানো না? আমিও জানি না। ঠিক আছে, ইংরেজি জানলেই হবে। মনুসংহিতা পড়েছ? বাৎস্যায়নের কামসূত্রের নাম শুনেছ? আমি এ সমস্ত পড়তে চাই। এ সব বই জোরে-জোরে পড়ে শোনাতে হবে। অসুবিধা হবে কিনা ভেবে বলো। জানো না এতে সেক্স সম্বন্ধে মারাত্মক কথাবার্তা আছে। তোমার বাবাকে বলেছি। সে প্রকৃত সংস্কৃতজ্ঞ ও শাস্ত্রবিদ্, বলল তার কোনোই আপত্তি নেই। তোমার আপত্তি আছে?'

আমার এমনই 'কান-গরম' অবস্থা যে মুখে কোনো কথাই জোগাল না। তখন আমার বিশ-একুশ বছর বয়স। জীবনের গূঢ় বিষয় সম্পর্কে বয়সের তুলনায়ও অপরিণত। বিশেষ সেক্স-সম্বন্ধে গোপনীয়তা রক্ষা করাই রীতি—এরকমই একটা মনগড়া ধারণা কেমনভাবে জানি দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল। আমার জগৎ তখন শান্তিনিকেতন, শুদ্ধতা ও রবীন্দ্রকবিতার মধ্যে আবর্তিত হত। বাস্তবতার সামান্য অভিজ্ঞতাও আমার ঘটে নি।

'এখন যাও। পরে তোমার মতামত জানিও।'

প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা যাকে বলে।

দুই

কয়েকদিন পরই বাবার তাড়নায় তাঁর কাছে আবার যেতে হল। বেশ অনিচ্ছা সত্ত্বেও। বাইরে বাগানে বসে ছিলেন। পাশে তাঁর স্ত্রী শিল্পী লীলাদেবী।

বললাম, 'আপনাকে পড়ার বিষয়ে সাহায্য করতে চাই।'

'আমার মনে হয় এ বিষয়ে তুমি reluctant, ইচ্ছা না-হয় বাপু এসো না। বাবার তাড়ায় আদৌ রাজি হয়ো না। ইচ্ছা-অনিচ্ছা একান্ত ব্যক্তিগত, সেখানে বাবা-মার ইচ্ছার দৌরাত্ম্য সহ্য হবে না।

'আমারই ইচ্ছা। এখন আমার প্রচুর অবসর।'

'রিসার্চ করবে তো? মোটামোটা বই ঘাঁটতে হবে। অবসর কোথায়?'

'রিসার্চ করবার ইচ্ছা নেই। জ্ঞানবুদ্ধি আরও বাড়াতে হবে'—সাহস করে বলে ফেললাম।

'জ্ঞানবুদ্ধি কম কী! এম. এ. পাশ। আমরা ব্রহ্মচর্য আশ্রমের ছেলে। পাস-টাস কিছুই করি নি। যাও। কবে থেকে আসছ দয়া করে

বলে যাও।'

'কাল থেকেই।'

বিনোদদার সাহায্যকারিণী হিসেবে ১৯৬৬-তে বহাল হলাম। তারপর সাত বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতেও পারি নি। তাঁর আপাত-রুক্ষ আকৃতি-প্রকৃতির কাঠিন্য সহসা আমার সম্মুখে দীর্ণ হয়ে গেল। এমন কিছু দেখলাম সকলে যার সন্ধান পায় নি। তার কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝি নি।

ভারতীয় ক্লাসিক্‌সের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল গভীর। তিনি আমার সাহায্যে বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে ভারতের ধ্রুপদী রচনা পড়বার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমদিকে অবশ্য তিনি এগুলি আমাকে পড়তে দেন নি। হয়তো আমাকে তাঁর কাছে সহজ হবার সুযোগ দিচ্ছিলেন। প্রথম-প্রথম প্রাচ্যশিল্পের ইতিহাস সম্বন্ধে বেশ কিছু ভারি বই পড়ে শুনিয়েছিলাম। শুধু যান্ত্রিকভাবে পড়া নয়—পড়ার বিষয় নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন, এমনভাবে, যেন আমি তাঁরই মতো শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বোদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে, শিল্প সম্পর্কে এর আগে খুব-একটা কিছু পড়ি নি, তবে শিল্প-শিল্পী সম্পর্কে আগ্রহ ছিল প্রবল। বিনোদদার সাহচর্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের শিল্পী ও তাঁদের কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। তাঁর প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে টিশিয়ান ছিলেন অন্যতম। এ ছাড়া মিকেল এঞ্জেলো, রোদাঁ, রেমব্রান্ট, পিকাসোর ছবির কথাও তিনি প্রায়ই বলতেন। আমার নিজের ধারণা টিশিয়ান তাঁর সর্বাধিক প্রিয় শিল্পী।

বিনোদদা টিশিয়ানের চিত্রাবলি দেখবার জন্য আমাকে কলাভবনে পাঠিয়েছিলেন। অনেকগুলি প্লেট দেখেছিলাম। তার মধ্যে অর্ধশায়িত বিবসনা নারী,-হাতে রুমাল, পেছনে একটি বিড়াল ও এক মহিলা—এই ছবিটি আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। বিনোদদাকে সে-কথা বললাম। জানলাম ওঁরও ঐ ছবিটি বিশেষ প্রিয়।

বললেন—'তোমার সঙ্গে তো কিছুদিন কাজ করলাম, এখন অনেক কথাই বলতে পারি। ধরো, তুমি যদি হঠাৎ কোন বন্ধ ঘরের দরজা খুলে টিশিয়ানের এইরকম জ্যান্ত-ছবি দেখতে পাও তাহলে তোমার রি-অ্যাকশন কেমন হয়।.. আমার যখন বয়স খুব কম—তখনও নারীদেহ সম্বন্ধে কৌতূহলের নিরসন হয় নি—কী উপলক্ষ্যে একদিন একটা খালি বিল্ডিঙে ঢুকে একটা ঘরের ভেজানো দোর খুলে ফেললুম। দেখলুম, আধ-অন্ধকারে অর্ধশায়িত সম্পূর্ণ নগ্ন নারীমূর্তি। বলতো আমার রি-অ্যাকশন তখন কী রকম

হয়েছিল? ভয়, অপরাধবোধ, লজ্জা-সঙ্কোচ, উত্তেজনা না অদম্য কৌতূহল? প্রথম চোটে ভয় যে হয়েছিল তা মনে আছে। দরজাটা টেনে দিয়ে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। পরে অবশ্য কৌতূহল অদম্য হয়েছিল। উত্তেজনাও। পরে সেই দৃশ্যের মানসচিত্র আমার শিল্পসত্তাকে যথেষ্ট খোরাক দিয়েছিল। সেই অল্প বয়সে অপ্রত্যাশিতভাবে ও-রকম আনইউজুয়াল একটা ব্যাপার দেখে ফেলে মহিলাটি সম্পর্কে ব্যক্তিগত কৌতূহল যে খানিকটা হয় নি তা নয়, তবে, পরে শুধুমাত্র আর্টিস্টের চোখেই স্মৃতিচিত্রটা উপভোগ করেছি। মানুষের পার্সন্যাল ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার দিন বহুদিন চলে গেছে। কিন্তু একটা মজা—সবাই তাদের গোপন খবর আমাকে বলে—খুব আশ্চর্য। বুঝলে, এখন চোখ নেই। ইচ্ছা হলেও নারীদেহ দেখবার উপায় নেই। দেখতে পারি, কিন্তু সে-রকম দেখা দেখতে গেলে মেয়েরা আমায় চড় মারবে।' হেসে উঠলাম, 'কেন?' 'বলবে বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। বস উথলে উঠেছে! যদি আমি তোমাকে দেখতে চাই.'

বিনোদদার হাত টেবিলের উপর দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছে লক্ষ্য করলাম।

'কী খুঁজছেন?'

'কিছু খুঁজি নি। হাতড়ালে আমি সব কিছু বুঝতে পারি। আমার জগৎটা ট্যাকটাইল সেনসেশনের। ভিস্যুয়ালি যা-কিছু জানবার সবই আমায় স্পর্শে জানতে হয়। তোমার কালুকে মনে আছে? সেই যে অন্ধ আশ্রমিক?'

শিশুকালে কালু বলে এক অন্ধ ভদ্রলোককে আশ্রমে দেখেছিলাম। তিনি চলতে-চলতে হাততালি দিয়ে উঠতেন। বললাম, 'হ্যাঁ মনে পড়ে। চলতে-চলতে হাতে তালি বাজাতেন বলে খুব মজা লাগত।'

'হ্যাঁ, আমারও অদ্ভুত লাগে। তখন দৃষ্টি ক্ষীণ হলেও ছিল। ওকে একদিন জিজ্ঞেস করলুম—কালু তুমি চলতে-চলতে হাতে তালি বাজাও কেন? ও বলল, তালি বাজালে আমি দেখতে পাই। কথাটা মনে গেঁথে গিয়েছিল। পরে চোখ যখন হারালুম মর্মে-মর্মে কালুর কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করলুম। শক্ত টেবিলের উপর হাতড়ালে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারটা নড়েচড়ে ওঠে। তোমাকে বা অন্য কাউকে দেখতে হলে তার সমস্ত গায়ে হাত বোলাতে হবে। সেটা মেয়েরা কি বরদাস্ত করবে? দৃষ্টি চলে যাবার পর থেকে মানুষ দেখা, বিশেষ মেয়েদের দেখা আমার হয় না।'

আমার তখন বিনোদদা সম্পর্কে অহেতুক ভীতি কেটে গেছে। বললাম, 'আমাকে দেখলে বরদাস্ত করতে পারব।'

'ভরসা পেলাম। ইচ্ছা হলে দেখব।'

'আমার তো মনে হয় আপনি একটু-আধটু দৃষ্টি দিয়েও দেখেন। প্রথম-দিন আমি ভেবেছিলাম আপনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন নন। আমার নিঃশব্দে ঘরে ঢোকা, দাঁড়িয়ে থাকা, শরীরের দৈর্ঘ, এ-সবই আপনি বুঝলেন কী করে?

'রুচিরা অন্ধ হওয়ার চেয়ে বধির হওয়ার দুঃখু বেশি। চোখ গেছে বলে কানটাও আমার সজাগ হয়েছে বেশি। এখন মনে হয় কালা হলে আমার বেশি অসুবিধা হত। এক বধির ভদ্রলোক একবার বলেছিলেন—এর চেয়ে চোখ গেলে ভাল হত। তখন ভেবেছিলুম—অদ্ভুত কথা। এখন মনে হয়, যথার্থ।...অবশ্য লোকে বলবে আর্টিস্টের চোখ গেলে রইল কী। কিন্তু এই যে কঠিন-মসৃণ, গোল-চৌকো-তেকোণা নিয়ে একটা জগৎ আমার কাছে নতুন করে ধরা দিল—নতুন করে একটা শিল্পমানস গড়ে উঠল—যে-জগতে রঙ নেই কিন্তু আকার-প্রকার-শব্দ-গন্ধ সবই আছে, সে জগৎটা তুমি কল্পনা করতে পার? কোন শিল্পী পারেন? অবশ্য প্রথম প্রথম অ্যাডজাস্ট করতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছিল। একটা অর্থহীন কোলাহল সর্বক্ষণ চারপাশে—হাঁপিয়ে উঠতাম। সামান্য বাসন পড়ার আওয়াজকে বাজ পড়ার আওয়াজ মনে হত।'

তিন

বহুবখানেক শিল্পসম্বন্ধীয় বই নিয়ে কেটে গেল। পরে শ্রীঅরবিন্দের 'হিউম্যান সাইকল্', এস. সি. দাশগুপ্তের সৌন্দর্যতত্ত্বের ওপর বাংলা বই ও প্রবাসজীবন চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ইংরেজি বইখানি একে-একে পড়া হল। শ্রীদাশগুপ্তের বইটি সম্পূর্ণ পড়া হয় নি। খানিকটা পড়ে বিনোদদা বলেছিলেন—'খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষা, এ আমার চলবে না।' শ্রীঅরবিন্দের 'Life Divine' পড়বার চেষ্টা করেও বিরত হন—'এ আমাদের মতো শিল্পীর পক্ষে ডাইজেস্ট করা শক্ত।'

তাওইজমের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তার উপর বেশ কিছু বই পড়া হয়। তাও-এর একটি প্রবচন তিনি বলতেন খুব বেশি। তাঁর রচনায় সম্ভবত তা ব্যবহার করেছেন। 'Know the white, follow the black'।

তাও-এর হাজার কবিতার ইংরেজি সংকলন পড়া হল। এরপর তিনি রুশ-সাহিত্য কিছু-কিছু পড়লেন। পূর্বে তিনি প্রচুর রুশসাহিত্য পড়েছিলেন এবং প্রত্যেকটি গল্প-উপন্যাস তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। সেগুলির কিছু-কিছু আবার পড়ার ইচ্ছা হত তাঁর।

নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে রুশসাহিত্য তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। তিনি চেকভের ছোটগল্প ও নাটক নিয়ে বারবার আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রিয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন টলস্টয়, গোর্কি, টুর্গেনিভ। তবে চেকভই তাঁর অধিকতর প্রিয় লেখক। চেকভের উচ্ছ্বাস-বর্জিত ভাষা, পরিবেশনরীতির ঋজুতা, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং রচনার সুসংহত শৈলী বিনোদদাকে আকর্ষণ করত। তিনি নিজে সংহতি, কম্প্যাক্টনেস, পছন্দ করতেন।

তাঁর মুখের ভাষা ছিল চুম্বকধর্মী। পরে যখন তিনি লিখতে শুরু করলেন তখন তাঁর লেখা প্রায় প্রতীকী ও সুসম্বদ্ধ হত। তিনি অত্যন্ত যুক্তিবাদী ছিলেন, তাঁর হৃদয়ে প্রক্ষোভ ছিল অবশ্যই কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ পেত কদাচিৎ। তাঁর মতো উচ্ছ্বাসবিহীন ব্যক্তি সাধারণত দেখা যায় না। তাঁর একটা-দুটো কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হত কোনটা তিনি তারিফ করছেন, কোনটা করছেন না। তিনি আদৌ হাসিখুশি মানুষ ছিলেন না। বস্তুত, সাত বছরে হাসতে তাঁকে খুব কম দেখেছি। কিন্তু তাঁর রসবোধ এত তীক্ষ্ণ ও গভীর ছিল যে তাঁকে আমার সবসময়ই রসিক ব্যক্তি বলে মনে হত।

ব্যঙ্গাত্মক রচনার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' খুব পছন্দ করতেন, মাঝে-মাঝে দু-একটা লাইন বাগ্‌ধারা হিসেবে ব্যবহার করতেন। এ ছাড়া 'পরশুরাম' তিনি পছন্দ করতেন। তাঁর রচিত 'চিকিৎসা সংকট', রবীন্দ্রনাথের 'রোগীর বন্ধু', সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' তাঁর খুবই মনে ছিল। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতকের' উল্লেখ তিনি বহুবার করতেন। যৌনবিকৃতির প্রসঙ্গে 'মহাস্থবির জাতক'-এর কয়েকটি ঘটনা বা চরিত্রের কথা তিনি বলতেন। 'মহাস্থবির জাতক' আমারও খুব ভালো লাগে শুনে তিনি খুশি হয়েছিলেন। অবশ্য আমি বলেছিলাম, কয়েকটি ঘটনা ও চরিত্র আমার কাছে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য লেগেছে। সে কথাটাও তিনি উপভোগ করেন। বলেছিলেন—'তোমার 'জীবন' 'চরিত্র' জানতে ঢের দেরি।'

রবীন্দ্রনাথের 'বীথিকা' কাব্য তাঁর প্রিয় ছিল এবং গোধূলি-পর্যায়ের প্রায় সব কবিতাই তিনি বিশেষভাবে পছন্দ করতেন। দু-তিনটি কবিতার উল্লেখ তিনি প্রায়ই করতেন। সেগুলি হল—প্রথমদিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল (শেষ লেখা); নব পরিচয়, প্রণতি, ব্যর্থমিলন, রূপকার (বীথিকা); অমৃত (শ্যামলী); স্বর্গ হইতে বিদায় (চিত্রা); আশা (পূরবী); দুঃসময়, অসময় (কল্পনা), গানভঙ্গ (কাহিনী), সুরদাসের প্রার্থনা (মানসী), সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি (বলাকা); সোনার তরী (সোনার তরী), ঝুলন প্রভৃতি। 'পুনশ্চ'-র বেশ কিছু কবিতা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছিলেন বিশেষ করে এর মধ্যে বাঁশী, ক্যামেলিয়া, খোয়াই, সাধারণ মেয়ে, শিশুতীর্থ।

হৃদয়গ্রাহী পংক্তিগুলি তিনি আবৃত্তি করতেন—'হে প্রেয়সী, এ জীবনে তোমারে হেরিয়াছিনু যে নয়নে / সে নহে কেবলমাত্র দেখার ইন্দ্রিয় / সেখানে জ্বেলেছে দীপ বিশ্বের অন্তরতম প্রিয়'।...'জেনো মোরে প্রেমের তাপস / সুকঠোর ব্রত ধরে / কবির সাধনা / আশাহীন ক্ষোভহীন / বহ্নিতপ্ত ধ্যানাসনে রব রাত্রিদিন / ছাড়িয়া দিলাম হাত'।

এই পংক্তির 'প্রেমের তাপস' কথা দুটি তার মনে বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তাঁর ভালো লাগত। 'যোগাযোগ' সম্পর্কে তাঁর খুব উঁচু ধারণা ছিল। আমি 'যোগাযোগ' মন দিয়ে পড়েছি শুনে তিনি অবাক হলেন এবং 'যোগাযোগ' থেকে আমি বেশ কিছু সংলাপ গড় গড় করে বলাতে বুঝলেন 'যোগাযোগ' আমার প্রিয়। 'আমার ধারণা ছিল আজকালকার ছেলেমেয়েরা 'যোগাযোগ' পড়ে না, 'শেষের কবিতা' অনেকেই পড়ে। বন্ধু সৈয়দ (সৈয়দ মুজতবা আলি) বলে—যারা সাহিত্যচর্চা করে তাদের প্রথমেই 'যোগাযোগ' পড়া উচিত। 'যোগাযোগ' ভালোভাবে পড়লে সাহিত্যচর্চার বুনিয়াদ শক্ত হবেই। আদতে আমারও সেই মত।'

'চতুরঙ্গ', 'মালঞ্চ', 'দুই বোন' তাঁর ভালো লাগত, কিন্তু 'চার অধ্যায়' তাঁর একেবারেই মনে ছিল না। আমার মুখ থেকে 'চার অধ্যায়'-এর বিষয়বস্তু ও সংলাপ শুনে তাঁর কৌতূহল হয় এবং তিনি আমার সাহায্যে 'চার অধ্যায়' পড়া শুরু করেন। কিছু-কিছু সংলাপ এবং প্রেম-কর্তব্যের টানাপোড়েনের চিত্রকল্প তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে গুরুদেবের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ ছিল যদিও তাঁদের পথ ও মতাদর্শ

নিয়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড দ্বিধা ও সংক্ষোভ ছিল। আমার ধারণা এই রকম। তাঁর 'প্রশ্ন' কবিতা পড়ে কি মনে হয়?'

নানা বিষয় নিয়ে তিনি অনুপুঙ্খ আলোচনা করতেন। তাঁর আলোচনার ভাষা ছিল ঋজু চুম্বকধর্মী, বাহুল্যবর্জিত। প্রথম দিকে অনেক সময়ই আমি তাঁর আলোচনার ধারা ঠিক ধরতে পারতাম না—খেই হারিয়ে যেত। ক্রমে-ক্রমে তাঁর প্রকৃতি ও বাচনরীতির সঙ্গে পরিচিত বা অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। অমন অনাড়ম্বর প্রকাশভঙ্গি ও অলঙ্করণবর্জিত ভাষা আমি বিনোদদা ছাড়া আর-কারো মুখে আজ পর্যন্ত শুনি নি।

চার

মনে আছে, তাঁর কাছে মাঝে-মাঝে নানা বিচিত্র ব্যক্তি আসতেন। যাঁরা বেশি কথা বলতেন তাঁদের তিনি থামিয়ে দিতেন—'বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন। আমি কানা মানুষ। লোকের সাহায্যে কাজ করি। এই ভদ্র-মহিলা (অর্থাৎ আমি) আমার জন্য নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন'।

তাঁর কথা শুনে অনেকেই ভীষণ থতমত হয়ে পড়তেন। অনেকেই জানতেন না যে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। আগন্তুক অচেনা ব্যক্তি, যাঁরা তাঁর সঙ্গে বড় জোর পাঁচমিনিট কথা বলতেন, তাঁদের চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দিতে পারতেন। যেমন, লোকটি বেশ লম্বা, দোহারা, নাক তীক্ষ্ণ। বা মেয়েটি মোটা, গ্রীবা হ্রস্ব, কথা বলতে বেশি ঘাড় নাড়ে। গায়ের রঙ কেমন তা আমাকে জিজ্ঞেস করে নিতেন।

আমার বিস্ময় লাগত। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম। বললেন—'ও কিছু নয়—কান সজাগ রাখলে অনেক কিছু বোঝা যায়। তোমরা চোখকে এত বেশি এনগেজড রাখো যে কান প্রায় কিছুই নেয় না। আমার চোখ নেই বলে কান অতি সক্রিয়। স্পেস সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমার ধারণা স্পষ্ট। স্পেসিয়াল পারসেপশন সম্পর্কে আমি প্রায় নির্ভুল। ...এই সব চেহারার ডেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে খানিকটা আন্দাজও আছে বোধহয়।'

আমার মনে হত, অন্তর্দৃষ্টি ও ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিনোদদা অনেক অজানা-অদেখা বস্তু, মানুষ ও তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করতেন। আমার চরিত্রের এমন কিছু দিক নিয়ে বলতেন যা জানার কোনো সুযোগ তাঁর ছিল না।

আমি তখন গোপনে একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করতাম। একদিন বিনোদদার এক প্রশ্নের ফলে তা ফাঁস হয়ে যায়।

উনি বললেন—'তুমি সাহিত্যচর্চা করছ কিন্তু তোমার তো মহা মুস্কিল। সমাজে তোমার 'ভালো মেয়ে' বলে নাম আছে। সেই সুনাম রক্ষার্থে যাকে বলে 'ভাল্‌গার' কথাবার্তা তা তো তুমি লিখবেই না। জেনে রাখো রুচিরা, শিল্পের সত্যরক্ষার জন্য 'ভাল্‌গার' জিনিসেরও প্রয়োজন আছে। ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ। সাহিত্যে বা শিল্পে অসুন্দর সেটাই যেটা সমস্ত বিষয়টার সঙ্গে খাপ খায় না। টেনশনের বাংলা কি? চিত্র বল আর সাহিত্যই বল সমগ্র কম্পোজিশনের সঙ্গে অংশের টেনশন যদি রক্ষা না-হয় তাহলেই তা অসুন্দর। ধর, একটা রঙ তোমার খুবই সুন্দর লাগে, কিন্তু সমগ্র চিত্রের মধ্যে লাগালে তা হয়তো খাপ খাবে না। তাহলে তোমাকে সেই রঙ ব্যবহার করবার প্রলোভন সামলাতেই হবে। তেমনি, সাহিত্যে একটা বর্ণনা, কোনো শব্দ বা বাক্য যদি আদিরসাত্মক হয় এবং সমগ্র বিষয়বস্তুর সঙ্গে টেনশন ঠিক থাকে অর্থাৎ অংশ ও সমগ্রের ভারসাম্য রক্ষা হয় তবে 'ভালো মেয়ে'র সুনামের কথা ভেবে তা ব্যবহার করতে যদি ক্ষান্ত হও তাহলে সাহিত্যের সত্যমূল্য তুমি দিচ্ছ না…তবে সাহিত্যিকদের একটা বিপদ আছে। এই ধর, তুমি যদি কোনো উপন্যাসে লেখো একটি কম-বয়সি মেয়ে এক বুড়োর প্রেমে পড়ল তাহলে তোমার চেনা লোকেরা বলবে—রুচিরা নিজেই নিশ্চয় ঐ উপন্যাসের কম-বয়সি মেয়ে। অচেনা পাঠকও ভাববে, লেখিকার ব্যক্তিগত ব্যাপারই হয়তো উপন্যাসের থিম। বুঝলে, এ বিপদ আর্টিস্টদের কম।'

কোনো বিষয়ে তিনি 'অব্‌সেশন' পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে সাত বছর কাজ করে মনের বহু সংস্কার, ভ্রান্ত নীতিবোধ, দৃঢ়মূল ধ্যানধারণা চুরমার হয়ে গেছে। কী বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা, কত ভিন্ন রুচির ও মানসিকতার মানুষের তিনি সংস্পর্শে এসেছিলেন। আমার সাহিত্যচর্চার খবর পাবার পর তিনি নাম উল্লেখ না-করে বহু ব্যক্তির আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য জীবন-কাহিনী শুনিয়েছেন।—'কোনো মানুষকে তার অভ্যাস ও আচরণ দিয়ে বিচার করতে নেই। কোন পরিস্থিতিতে, কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফলে বা প্রচণ্ড কোন মানসিক সংঘাতে মানুষের জীবন কোন দিকে মোড় নেয় তা কেউই বলতে পারে না। কারো সম্বন্ধেই চরম কথা বলা যায় না। অমুক ওটা করতে পারেই না, বা অমুক কী-করে এমন কাজ করল, এ-

কথা আমি কখনও বলি না।...লিখবার সময় এই সব মনে রেখো।'

তাঁর পরিচিত এক সদ্য তরুণ-তরুণীর সহসা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং স্বল্প ব্যবধানে তাদের মনোমালিন্যের সংবাদে তিনি বেশ মর্মাহত হন।

'এ সমস্ত ট্রাজেডি ঘটত না যদি আমাদের সমাজে বিবাহের পূর্বে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার অনুকূল পরিবেশ থাকত। প্রাক্-বিবাহ দৈহিক ঘনিষ্ঠতা এতই নিন্দনীয় যে অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে তড়িঘড়ি বিবাহে আবদ্ধ হয়ে ফিজিক্যাল গ্রাটিফিকেশন চায়। এ সমস্ত বিবাহ প্রেমঘটিত বলে অভিহিত হয় বটে, তবে এগুলিতে কতটুকু প্রেম থাকে তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের বই তিনি বহুবার পড়েছিলেন এবং তাঁর মত, যুক্তি ও বিশ্লেষণ তাঁকে অভিভূত করত। তিনি প্রায়ই তাঁর লেখা বই উল্টে-পাল্টে দেখতে বলতেন এবং নানা আলোচনা করতেন। রাসেলের লেখা 'কনকোয়েস্ট অব হ্যাপিনেস', 'ম্যারেজ অ্যাণ্ড মোরালস', এবং তাঁর আত্ম-জীবনী তিনি বহুবার পড়েছিলেন। প্রথম বইটি থেকে কিছু-কিছু পংক্তি তিনি কথা-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করতেন। রাসেলের নির্ভীকতা, স্বকীয় বিচার-ধারা ও যুক্তিপূর্ণ প্রতিবেদন বিনোদদার খুব পছন্দের ছিল।

তিনি নিজেও প্রেমজ বিবাহ, ডিভোর্স, পণপ্রথা, নারীর অধিকার, নীতি-দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নানা কথা বলতেন। বলতেন—'তুমি লেখক হচ্ছ। তোমার এইসব জানলে কাজ হবে। ব্যক্তিগত কেচ্ছা করার উদ্দেশ্য নেই। তুমিও আশা করি সেইভাবে গ্রহণ করবে।'

পাঁচ

মেয়েদের সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন যদিও মেয়েদের 'মেয়েলিপনা' এবং কতকগুলি অভ্যাস তাঁকে পীড়িত করত।

একবার তাঁর এক পূর্বপরিচিতা তরুণী, সদ্য-জননী বিনোদদার সঙ্গে দেখা করতে এল। সঙ্গে স্বামী। তরুণীর সর্বাঙ্গে চটক।

বিনোদদা তরুণীকে বললেন—'তোমার বাচ্চাকে আনলে না কেন?'

'ঈশ্। কেমন যেন কুকুরের মতো কেঁউ-কেঁউ করে। বিচ্ছিরি লাগে।'

বিনোদদার মুখের ভাব পাল্টে গেল। এরপর কথা আর বেশি এগোল না।

'রুচিরা, তুমিও তো মেয়ে। কুকুরের মত কেঁউ কেঁউ এক্সপ্রেশন কেমন লাগল?'

আমি নির্বাক। বিনোদদা আর-কিছু বললেন না।

আর-একবার একটা ঘটনা ঘটে। আমি বিনোদদাকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছি হঠাৎ দুই কেতাদুরস্ত বয়স্কা মহিলা প্রবেশ করলেন। বিনোদদা যথারীতি 'কে' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ভদ্রমহিলারা নিজেদের পরস্পরের আড়ম্বরপূর্ণ পরিচয় দিলেন। চিনলাম। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, সংস্কৃতিসম্পন্ন দুই নারী।

'বসুন। কাজ করছি আমি। ব্যস্ত।'

'আপনাকে 'অমুক'-অ্যাওয়ার্ড দেবার ব্যাপারে আমরা এসেছি।...ও এই মেয়ে (আমার দিকে তাকিয়ে) বুঝি আপনার কাছে কাজ করে?

'ইনি সুশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা। আমাকে লেখাপড়ায় সাহচর্য দিয়ে থাকেন। এঁর বাবা আমার বাল্যবন্ধু সুপণ্ডিত সুজিত মুখোপাধ্যায়। জানেন নিশ্চয়।'

'সুজিত মুখোপাধ্যায়? তিনি কে। কী জানি কত লোকই তো আছেন।'

বিনোদদার কপাল আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

'আপনি একেবারেই দেখতে পান না বিনোদবাবু? একটু-আধটু পান বোধহয়?'

'না। আমি একেবারে কানা। অন্যের সাহায্য ছাড়া সব কাজই করতে পারি—পড়ার কাজ ছাড়া।'

'ছবি তো আঁকতে পারেন না।' (এক মহিলা অন্যের উদ্দেশ্যে) 'আর্টিস্টের চোখ যাওয়া মানে সব যাওয়া—না ভাই। খুব কষ্টকর। তাই না বিনোদবাবু? আপনার তো বড় কষ্ট। আপনার স্ত্রীও আবার কাছে থাকেন না—তাই তো? থাকলে আপনার কত সুবিধে হত। তিনি এখানে এসে থাকতে পারেন না বুঝি?'...ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আচ্ছা দয়া করে আপনারা এবার আসুন। ইনি কাজের মানুষ। এঁকে আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারি না।'

'আপনার অ্যাওয়ার্ডের ব্যাপারে আমরাই দুজনে সব ব্যবস্থা করছি। আমাদেরও কাজ আছে, আচ্ছা চলি', ইত্যাদি (আরও ১০/১৫ মিনিট সময় নিলেন)।

তাঁরা চলে গেলে বিনোদদা বললেন—'কিছু মনে করো না রুচিরা। তোমরা মেয়েরা প্রচুর ডিগ্রি নিয়ে ফেললে মুস্কিল হয়ে যায়। বিশেষ কারো যদি সমাজে পণ্ডিত বা ইন্টেলেক্চুয়াল বলে নাম হয়ে যায়—আর

কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি। আমার মনে হয় ইতিহাসে ক্ষমতার অপব্যবহার পুরুষরা যত করেছে, মেয়েরা তার থেকে বেশি বই কম করে নি। ··আমাদের 'জীবনী' (তাঁর রান্না করতেন যে-মহিলা) তো আমাকে কখনো প্রশ্ন করে নি—বাবু আপনি একেবারে কানা বা আপনার বড় কষ্ট বাবু। শিক্ষা-অশিক্ষার সঙ্গে মেয়েলি-স্বভাবের কোনো সম্পর্ক নেই, যেমন নেই কালচারের সঙ্গে শিক্ষার।—সুজিত মুখুজ্জেকে না-চিনলে এই মহিলার পাণ্ডিত্য আরো উচ্চকোটির প্রতীয়মান হতে পারে—বিদ্যা বিনয় দেয়—কথা আছে না? তুমি এঁদের ব্যবহারে কিছু মনে করো নি তো?'

'না। আমার ভীষণ অবাক লাগছে।'

'তোমার জীবন-দেখা এখনও অনেক বাকি। শুধু দেখে শুনে যাও। আমি অনেক দেখেছি। আর দেখার কৌতূহল বিশেষ নেই।'

ছয়

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। বিনোদদা সম্পর্কে অহেতুক ভয়-সংকোচ সবই আমার চলে গেছে। বিনোদদাও আমার ধাত বুঝে নিয়েছেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' পড়া শুরু হল। আমার তখন আর জড়তা নেই। পড়া হত, আলোচনা হত। বিনোদদা কোণার্ক, খাজুরাহোর এরোটিক আর্টের সঙ্গে বাৎস্যায়নের বর্ণিত কামাদি ও সংগমের বিভিন্ন প্রকারের মিল খুঁজে পেতেন এবং আমাদের দেশে কাম বা যৌনতাকে কত সহজভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল দেখে বিস্মিত হতেন।

'আমেরিকান পর্নোগ্রাফি তো কিছু পড়েছ। এটা কি পর্নোগ্রাফি। পাশ্চাত্য দেশে সেক্স-রিলেশন নিয়ে দুঃসাহসী পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে নাকি। ভারতীয় প্রাচীন রচনাকারদের কাছে এখনও তারা শিশু।'

এরপর মনুসংহিতা, পুরাণ, বিদ্যাসুন্দর, আলালের ঘরের দুলাল, জাতকের ৬।৭টা খণ্ড প্রভৃতি পড়া হল। জাতকের যে গল্প থেকে রবীন্দ্রনাথ 'শাপ-মোচন'-এর বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন সেটি বিনোদদার খুবই ভালো লেগেছিল।

'এখনকার বাংলা উপন্যাসে পর্নোগ্রাফি আছে? আচ্ছা সমরেশ বসুর লেখা কেমন? শুনছি 'বিবর' উপন্যাস লিখে আলোড়ন এনেছেন। মামলা টামলা চলছে। একেবারে নিউ অ্যাপ্রোচ বুঝি। আমার এক বন্ধু বললেন —খুবই ভালগার, কমবয়সি মেয়েদের দিয়ে জোরে পড়ানো যাবে না। শুনে আমার কৌতূহল হচ্ছে।'

পরে বিনোদদা ঐ উপন্যাসটি খানিকটা পড়েছিলেন। বললেন—'রুচিরা, এতো বিদেশী উপন্যাসের মতন। ঠিক এ-রকম উপন্যাস আমি পড়েছি।' উপন্যাসকারের নামও বলেছিলেন।

'বাংলাদেশে ভালো নাটক লেখা হয় না কেন?' 'আমাদের জীবনে নাটকীয় সংঘাত নেই বলে।' 'তা হয়তো খানিকটা। কিন্তু মূল কারণটা ঠিক তা নয়।'

এই সময় তিনি ব্রেশ্‌টের নাটক আমার সাহায্যে পড়েছিলেন। বেশ উপভোগ করতেন। দু-একটি সংলাপ তিনি প্রায়ই বলতেন। যেমন, 'গুড থিংস আর নট ইন ডিম্যাণ্ড।' প্রায়ই সেটি উদ্ধৃত করতেন। নাটক তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। ইবসেন, চেকভের নাটক তিনি খুব বেশি পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রাজা, রক্তকরবী তাঁর ভালো লাগত। বিনোদদার নিজের নাটক লিখবার বিশেষ ইচ্ছা হত। আমাকেও লিখবার জন্য বার বার বলতেন। তিনিও পরবর্তীকালে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক লেখেন এবং সেটি 'সপ্তাহ' শারদীয় সংখ্যায় 'লৌহপক্ষী' নামে প্রকাশিত হয়।

বাংলা আধুনিক সাহিত্য তিনি পড়েন নি। কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের রচনার পর কোনো লেখাই তাঁর পড়া হয় নি। তারাশঙ্কর, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁদের লেখা তাঁর ভালো লাগত।

পরবর্তী লেখকদের রচনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জন্মায়। আমার সাহায্যে ষাটের দশকের রচনাকারদের বেশ কিছু লেখা তিনি পড়েছিলেন। কমলকুমার মজুমদারের লেখা পড়ে তিনি বিশেষভাবে অভিভূত হন। পরবর্তীকালে তাঁর লেখাপত্রেও তার উল্লেখ পেয়েছি। আধুনিক গল্পের আঙ্গিক তাঁর ভালো লেগেছিল। তবে আঙ্গিক-সর্বস্ব রচনা বা অতি-আভাসধর্মী রচনা তাঁর সবসময় ভালো লাগত না। তাঁর মতে সাবজেক্ট ও ফর্ম দুটোকে নিয়েই শিল্প। তবে যে-কোনো একটার প্রাধান্য নিশ্চিত শিল্পী বা সাহিত্যিকের রচনায় থাকবে। গল্পের মধ্যে লেখকের অবজার্ভেশনের সূক্ষ্মতার প্রকাশ থাকলে তাঁর বিশেষ চিত্তগ্রাহী হত। ষাট দশকের একটি গল্প-সংকলন তাঁকে পড়ে শোনাই। অধিকাংশ গল্পই তাঁর ভালো লেগেছিল। দু-একটি গল্প সম্বন্ধে তিনি খুব প্রশংসা করেন। লেখকদের কারো নাম তিনি পূর্বে শোনেন নি। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প তাঁর ভালো লেগেছিল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দুটি উপন্যাস তিনি পড়েছিলেন আমার

সাহায্যে। উপন্যাস দুটি তাঁর ভালো লেগেছিল। তবে তাঁর মত হল—'বাংলাদেশের উপন্যাসে কমপ্লিকেটেড চরিত্র ঘটনা ও সাসপেন্স কম থাকে। টলস্টয়ের 'ওআর অ্যাণ্ড পিস' বা দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেন্ট' প্রভৃতির মতো বিচিত্র চরিত্র, ঘটনা-সংঘাত—ঠিক এরকমটি বাংলা উপন্যাসে বেশি আছে কি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এসব উপাদান কিছু আছে। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এসব চমৎকার। বাঙালি লেখকদের অবজার্ভেশন ভালো।'

'তবে—রাগ করো না রুচিরা—মেয়েদের অবজার্ভেশন কম অবশ্য একসেপশন নেই যে তা বলছি না। আশাপূর্ণা দেবীর খুব নাম-ডাক—এখনকার মেয়েদের খুব প্রিয়। একটা লেখা পড়িয়ে শুনিও তো।'

আশাপূর্ণা দেবীর একটি ছোটগল্প পড়ে শোনাই। তাঁর ভালো লেগেছিল এবং তাতে লেখিকার অবজার্ভেশনের ঘাটতি আদৌ তিনি দেখেন নি।

মাঝে-মাঝে আমাকে একান্ত মেয়ে হিসেবে কিছু-কিছু উপদেশ দিতেন। লেখিকা হিসেবেও উপদেশ দিতেন প্রায়ই। —'সকল রকমের ট্র্যাডিশন ভাঙা যায় কিন্তু নিজের অর্জিত সংস্কার ভাঙা বড়ই কঠিন। সেটা লেখার মধ্যে ভাঙতে চেষ্টা করবে।...ছবির ক্ষেত্রে যে ট্রেড মার্ক-এর জন্য আমি শিল্পী সমাজে পরিচিত সেই ট্রেড মার্ক এখনকার ছবি ড্রয়িং ইত্যাদি থেকে কি করে মুছে ফেলা যায় তারই সাধনা চলছে...রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ দিকের লেখাতে নিজের গড়া সাহিত্যের সংস্কারকে যেমন নির্মমভাবে ভেঙেছিলেন তার তুলনা বিরল।'

সাত

তাঁর নিজের সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারতেন। একটি ঘটনা ও সেই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছিল।

আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলেই আমাকে জিজ্ঞেস করত, শান্তিনিকেতনেই, যে আমি যাঁর কাছে কাজ করতে যাই তিনি কে! আর্টিস্ট বিনোদবিহারীর নাম কেউই শোনে নি দেখতাম। তাঁর সম্পর্কে কারো কোনো আগ্রহও লক্ষ করি নি—আমার দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এর ব্যতিক্রম ছিল।

সহসা একদিন আবিষ্কার করলাম বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে সকলের ঔৎসুক্য জেগেছে। কী ব্যাপার। সত্যজিৎ রায় বিনোদদাকে

নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করবেন, তারই বার্তা রটে গেছে। আমাকে সকলে ধরল চেপে। সে এক মহা বিপদ। বিনোদদার কাজে যাবার পথে অবরোধ সৃষ্টি হতে লাগল। উৎসাহী তরুণ-তরুণী পিছু নেয়। কোনোরকমে তাদের এড়িয়ে যাই। ফলে প্রায় রোজই বিনোদদার কাছে যেতে দেরি হতে লাগল। খুব লজ্জা হয়। বিরক্তিও। বিনোদদা পাংচুয়ালিটি পছন্দ করেন। যাদের সেটা নেই তাদের সঙ্গে তিনি কাজকর্ম করতে পারেন না। দু-চারদিন দেরি হবার পর একদিন প্রায় খেপে গিয়ে বিনোদদাকে বললাম, 'আপনার সম্বন্ধে লোকের বড্ড কৌতূহল জেগেছে।'

'কেন? আমার সম্বন্ধে তো কারো কৌতুহল জাগার বিশেষ কারণ নেই।'

'আছে। আপনাকে নিয়ে সত্যজিৎদা ছবি করছেন। আপনি তো এখন মহানায়ক।'

বিনোদদার স্ত্রী লীলাদি কাছে ছিলেন। হেসে বললেন—'সত্যজিৎ তাহলে তোমার চেয়ে বিখ্যাত।'

'সে বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? ছবি এঁকে আমি কখনই প্রশংসা পাই নি—বিখ্যাত তো হই-ই নি। তাহলে সত্যজিৎ আমায় ফেমাস করবে দেখছি। ও তো এক ছবি করেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে। তবে ও সত্যই শিল্পী। জীবনের গভীর দিককে ফিল করেছে এবং সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পেরেছে। আমি ওর বই দেখি নি। তুমি দেখেছ? 'অপুর সংসার'? অপুর স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে এল যে, অর্থাৎ তার শ্যালক, তাকে অপু এক চড় মারল—এটা অনেকের অত্যন্ত অস্বাভাবিক, অবাস্তব ও বিসদৃশ লেগেছে। কিন্তু আমার শুনেই মনে হয়েছিল ইউনিক, অপুর প্রকৃতির পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়েছিল।'

'অমুক ভদ্রমহিলাকে তুমি ভালই জানো। কত শান্ত, ধীরস্থির, বুদ্ধিমতী। তাঁর জামাইয়ের মৃত্যুসংবাদ আনল তাঁর ছেলে। তিনি দুঃসংবাদ শুনেই ছেলের পরনের জামাটা খামচে ধরে ছিঁড়ে ফেললেন। জামাটাকে ফালা-ফালা করে ছিঁড়তে লাগলেন। এটা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয় কি? আরো নজির আছে।...সত্য কঠিনই। তার কাঠিন্য মানতে আমরা চাই না বা পারি না।'

সর্বশেষে কালীপ্রসন্ন সিংহর 'মহাভারত' পড়া হল। মহাভারত পড়া শুরু হয়েছিল ৬৯ সালের গোড়ার দিকে—শেষ হল ৭২ সালের মাঝামাঝি। 'মহাভারত' তিনি পূর্বে একবার ভালো করে পড়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন

সিংহের সমগ্র মহাভারতের খণ্ডগুলি তাঁকে উপহার দেন তাঁর বন্ধু সৈয়দ মুজতবা আলি। বিনোদদার কাছে শুনতাম সৈয়দদার মহাভারত সম্পর্কে উঁচু ধারণা। ঐ মহাভারত-খণ্ড তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে ছিল। দেখতাম, বহু জায়গায় দাগ দিয়ে, পাশে নোট লিখে সৈয়দদা মহাভারত পড়েছিলেন। বিনোদদা বলতেন—'সৈয়দের মহাভারত প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল।' বিনোদদার নিজের কাছেও মহাভারত বেদ বা বাইবেলের মতো ছিল। তিনি প্রায় সময়ই মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত দিতেন। মহাভারত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিনোদদা বলেছিলেন। 'গুরুদেব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন, মহাভারত ভাল করে পড়—অনেক কিছু শিখতে পারবি। আমার মহাভারত নিয়ে লিখবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর কি পারব! আগামী কালের লেখকরা লিখবে।'

বিনোদদারও মহাভারত নিয়ে লিখবার ইচ্ছা হত। তিনি নল-দময়ন্তী উপাখ্যান সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং বলতেন—'সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে আর-এক মহাকাব্য লেখা হল, নল-দময়ন্তী নিয়ে হল না কেন! আমার খুব ইচ্ছা করে লিখতে।'

এ ছাড়া অর্জুন-উর্বশী, ঋষ্যশৃঙ্গ, সুরথ-পিঙ্গলা, জনক-সুলভা, সুকন্যা-চ্যবন প্রভৃতি উপাখ্যানগুলি তাঁর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। এইসব উপাখ্যান নিয়ে সুবোধ ঘোষ 'ভারত প্রেমকথা' গ্রন্থ রচনা করেছেন এ-কথা আমার কাছে শুনে বিনোদদা অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎসুক হয়ে উঠলেন। ফলে মহাভারতের এক-একটি উপাখ্যান পড়ার পরই সেই উপাখ্যান-কেন্দ্রিক সুবোধ ঘোষের লেখা প্রেম-কাহিনী পড়া হত। পরে তিনি বলেন—'তুমি যখন সুবোধ ঘোষের বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলে তখন আমার যথেষ্ট সংশয় ছিল, ভেবেছিলাম, রুচিবা ছেলেমানুষ, প্রেম-কাহিনী পড়েই মুগ্ধ। না—স্বীকার করছি লেখকের মুন্সিয়ানা আছে।'

বিনোদদা সহজে কোনো কিছুর মৌখিক প্রশংসা করতেন না। কিন্তু সুবোধ ঘোষের 'ভারত প্রেমকথার' ভাষা, শৈলী ও উপস্থাপনার খুব প্রশংসা করেন।

ময়দানব কর্তৃক নির্মিত যুধিষ্ঠিরদের প্রাসাদের স্ফটিকখচিত সোপানে বা অলিন্দে দুর্যোধনের আছাড় খাওয়াটা তাঁর মনে দারুণ ঔৎসুক্য জাগায়। বিনোদদার ধারণা ছিল, দুর্যোধনের দৃষ্টিশক্তিতে কিছু ত্রুটি ছিল। হয়তো তার ডাবল ভিশন হত বলে সিঁড়ির ধাপে ঠিক-ঠিক মতো পা ফেলতে পারত

না। 'আমার নিজের সেই রকম ছিল। সিঁড়ির ধাপে বা চকচকে মেঝেতে আছাড় খেয়েছি একাধিকবার।'

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির পরিণত বয়সে অনভিজ্ঞতাপ্রসূত যৌন-অচেতনতা এবং যৌবনোদ্ভিন্না অপ্সরাকে দেখে বিস্ময় এবং তাঁরই পিতার নিকট নারী-দেহের অভূতপূর্ব বর্ণনা বিনোদদাকে অভিভূত করেছিল।

মহাভারতে বহু উল্লিখিত একটি বাক্যও বিনোদদার চিত্তকে আকর্ষিত করত। 'তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নিদারুণ অনঙ্গবাণে নিপীড়িত হইয়াছি'। কোনো ঋষি বা পুরুষ কোনো নারীকে দেখে আকৃষ্ট হলে এই কথাগুলি তাকে বলে থাকে। এই প্রসঙ্গে বিনোদদার মত—নারী-পুরুষের সম্পর্কের সূক্ষ্মতা, রোমান্টিকতা বা প্লেটোনিক প্রেমের ধ্যানধারণা সাম্প্রতিককালের—সে যুগে নিতান্ত জৈবিক তাড়না বা 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র ভাবনাটাই নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা হয়েছিল। 'ধরো, এখন যদি কোনো প্রেমিক আধুনিক ভাষায় ঐ 'মদনবাণে আক্রান্ত' কথাটি প্রেমিকাকে বলে তো তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়। হয়তো তা নগ্ন সত্য, তবু কেউ বলতে পারে না বা বলে না। এটাই এ যুগের নতুন ও মধুর ভাবনা। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' প্রেমিক গোপনে প্রেমিকাকে এই কথাটাই বলে। দেহ-ক্ষুধার প্রবল তাড়না থাকুক বা না থাকুক তবু 'আমি ভালবাসি' এই কথাটিই নারীকে বলতে হয়।'

'রুচিরা, শাস্ত্র তো পড়লে কিছু, নারীর 'সতীত্ব' বলতে এ যুগে যা বোঝায় তা কোথাও পেলে কি। যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া তাঁদের তো জানলে। ঐ যে তুমি কোন্ মেয়ের অভিভাবকের কথা সেদিন বলছিলে, মেয়েকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন 'পুরুষের হাওয়া গায়ে লাগিও না', এখনকার মেয়েদের শিশুকাল থেকে 'সতীত্ব' সম্বন্ধে এইরকম সব জ্ঞান দেওয়া হয় যে সারাজীবন ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক 'সতীত্ব' রক্ষার সাধনা করে তারা—নারীসত্তা স্ফুরিত হয় না। মানবিক গুণাবলি না থাক্—'সতী' হলেই সে মেয়ে সমাজে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকবে। এ যুগে আমাদের সমাজে এটাই মস্ত ট্রাজেডি। আমাদের সুনীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে ধারণা বড় সংকীর্ণ। আমাদের চরিত্র-সংজ্ঞার চরম মাপকাঠি হল দেহের শুচিতা। ওষুধে ভেজাল মেশানো যতটা অপরাধ, তার থেকে বেশি অপরাধ ব্রথেলে যাওয়া।...মহাভারত আশাকরি তোমার অনেক নীতিবোধকে ভেঙে দিয়েছে। লেখিকা হিসেবে এইসব কাজে লাগাবে।'

'সতীত্ব' আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্প ও 'সতী' কাহিনী-কাব্যের উল্লেখ করেছিলেন।

মহাভারতকে কেন্দ্র করে বিনোদদা বহু সামাজিক ধ্যান-ধারণা, সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন।

আট

বিনোদদা ৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যচর্চা শুরু করলেন গভীর-ভাবে। তিনি 'কত্তামশাই' লিখবার আয়োজন শুরু করলেন। সে সময় তাঁর মেজাজ চড়া সুরে বাঁধা থাকত। কেউ দেখা করতে এলে তাঁকে ধুলো পায়ে বিদায় নিতে হত। কারো পায়ের শব্দ শুনলে তিরিক্ষি হয়ে উঠতেন। আমি সামাল দেবার চেষ্টা করতাম নানাভাবে।

সে সময় ওঁর সঙ্গে আমারও 'টেনশন' হয়েছিল খুব। তাঁর সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাময়, প্রায় রূপকধর্মী মুখের ভাষা আমি লিখতে পারব কিনা! লিখতে পারলেও তার বিচ্যুতি ঘটবে কিনা—এই ছিল আমার বিরাট দুশ্চিন্তা। ঘরে-বাইরে সকলেই সে সময় আমার চিত্ত-বিক্ষেপের আভাস পেতেন। বিনোদদার দুশ্চিন্তার কারণও খানিকটা বুঝতাম। ক্ষীণ হলেও আলোর জগতের যে-মানুষটা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে চির তমসাচ্ছন্ন জগতে নিক্ষিপ্ত হলেন তাঁর চিত্তে যে প্রচণ্ড সংক্ষোভ হয়েছিল—যে তীক্ষ্ণ বিস্ময়াবিষ্ট বেদনা তিনি অনুভব করেছিলেন তা ভাষার মাধ্যমে কীভাবে প্রকাশ করবেন! এইসময় বিনোদদা বলেছিলেন—'চিত্রকলা চর্চার চেয়ে সাহিত্যচর্চা করা কঠিন বুঝতে পারছি। সাহিত্যিকের প্রকাশ-মাধ্যম বড়ই সীমিত—কয়েকটা গুনতি করা শব্দের মারপ্যাঁচে তোমাকে প্রচণ্ড ভাব-অনুভবের রূপ দিতে হবে এবং অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনাকে কনভিনসিং করতে হবে। কঠিন কাজ সন্দেহ নেই!' আবার,

...'চোখে দেখে বা অনুভবে প্লাস্টিক আর্ট-এর রস গ্রহণ করা যায় কিন্তু সাহিত্যে ভাষার দুস্তর বাধা অতিক্রম না-করলে কে রস গ্রহণ করবে! ভাষাটাই একটা গোলমেলে উপাদান—রঙ মাটি ইঁট কাঠ পাথর—এই সমস্ত গুলোকে অপেক্ষাকৃত সহজে বাগে আনা যায়। সাহিত্য ও ললিতকলার মধ্যে এটাই মৌলিক পার্থক্য।'

'কত্তামশাই' লিখতে এবং শেষ পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে তিন মাস মত সময় লেগেছিল। সেই সময় সত্যজিৎ রায় লেখাটি পড়ে বিমুগ্ধ হন এবং

'এক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় সেই বছরই (১৩৭৯ বঙ্গাব্দ) 'কত্তামশাই' প্রকাশিত হয়। 'এক্ষণ'-এ প্রকাশ হবার পূর্বে বিনোদদা বলেছিলেন—'একটা কথা শুধু তোমাকেই বলে রাখি, পরে মিলিয়ে দেখো। চিত্রকলার চর্চা করে আমি সামান্য কিছু প্রশংসা পেয়েছি বহু দেরিতে। সাহিত্য করে প্রশংসা পেতে তত বিলম্ব হবে না বোধহয়।'

'কত্তামশাই' প্রকাশ হবার কয়েকদিনের মধ্যে অচেনা হাতের লেখায় বিনোদদার নামে একটি চিঠি এল। পড়ে দেখলাম জনৈকা পাঠিকা 'কত্তামশাই' পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। উক্ত পাঠিকা এখন স্বনামধন্যা। তখনও অবশ্য তিনি বাংলাদেশে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ লেখিকাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

—'বিনোদদা আপনার ভবিষ্যদ্বাদ ফলল বলে'—রহস্য করে বলি।

উনিও সরস উক্তি করলেন—'ছবি করে এ-রকম জলদি প্রশংসা লাভ করলে হয়তো আমার মাথাটা ঘুলিয়ে যেত। কাজকর্ম যেটুকু নিষ্ঠা নিয়ে করেছি—তাও হত না।'

বিনোদদা অরবিন্দের একটা কথা প্রায়ই বলতেন 'প্রোটেক্ট থাইসেলফ'। আত্মরক্ষা করতেই তিনি একদিন শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার সংকল্প করলেন। অটল সংকল্প তাঁর গুণমুগ্ধদের একান্ত অনুরোধে টলল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে কখনও সে অনুরোধ করি নি যদিও বিনোদদার চলে যাবার ক্ষতি মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতাম।

বিনোদদার চলে যাবার প্রস্তুতি চলছে। একদিন বললেন—'মহাভারতের বাণপ্রস্থর ধারণাটা একটা ইউনিক ব্যাপার। এটা আমি জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছি। কর্মক্ষেত্র, সংসারধর্ম নির্মমভাবে ত্যাগ করে দিতে হয় একটা বয়সে, নয়তো পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে স্বকর্ম। সোনার তরীতে তোমার সবই কুলোবে কেবল তুমি কুলোবে না।' আবার,

.. 'এই চলে যাওয়ার জন্য অনেকদিক থেকে ব্যক্তিগত লোকসান হবে তাও জানি। বারো বছর বয়সে ব্রহ্মচর্য আশ্রমে যোগ দিয়েছিলাম। তারপর জীবনের সকল রকমের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধ যেমন গভীর তেমন দৃঢ়। শেকড়শুদ্ধ বটগাছ টেনে তোলবার মতই অসম্ভব। তবু উৎপাটন করার প্রয়োজন হয়েছে'।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাবার কিছুদিন পর তিনি পত্রে লেখেন—'আমি দেখছি জীবনের পরিবর্তনের মুহূর্তগুলো এক একটা হার্ডল, মাঝে

মাঝে এসব হার্ডল তথা বাধা এমনই দুর্লঙ্ঘ্য যে সেই বাধা থেকে পিছিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। এরই নাম স্ট্যাগনেশন বা ইনারটিসয়া, এইসব বাধাকে অতিক্রম করবার শক্তিই বা কে দেবে? সহায় বা কে?

বিদায়ের পূর্বে তিনি তাঁর আলঙ্কারিক ক্যালিগ্রাফিক হস্তাক্ষরে আমাকে দুটি গান লিখে দেন, তার একটি হল 'ভরা থাক স্মৃতি-সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি'। তিনি আমাকে গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। গানটি গাইতে গাইতে আমার চোখ শুকনো থাকে নি, তাঁরও আবেগ-উচ্ছ্বাসহীন মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। খানিক চুপ করে থেকে বলেছিলেন—'যদি আবার ফিরে আসি তাহলে তোমার এই গান গাওয়া মাটি হয়ে যাবে'।

তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তিবলে কাউকে কাউকে অতি নিকটে টেনে এনেছেন, যদিও অধিকাংশই তাঁকে সহ্য করতে পারত না। তাঁর কাছে বাইরের আলো চলে গিয়েছিল, কিন্তু অন্তরের আলো ছিল তাঁর মর্মভেদী। মানুষের ভেতরটা তিনি পড়ে ফেলতে পারতেন। তাঁর কাছে হৃদয়ের দৈন্য বাহ্যাড়ম্বর দিয়ে ঢাকা যেত না। হয়তো অনেকেই এই জন্য তাঁর কাছে যেতে ভরসা পেত না। তবে এ কথা সত্য যে বিনোদদার নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন যাঁরা তাঁরাও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা করতে পারতেন না। অতি নিকট-বন্ধুও তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করতেন।

প্রায়ই তিনি বলতেন—আমি নির্মম হবার সাধনা করি (যাকে ফসিল হবার সাধনাও তিনি বলে থাকতেন)। সেই সাধনাই তাঁকে চতুষ্পার্শ্ব থেকে ভিন্ন স্থানে এনে দিয়েছিল। সবার মধ্যে থেকেও তিনি 'একলা মেজাজের' তালগাছের মতো। ঋজু, অভঙ্গুর, তুলনারহিত। তিনি ও আমরা দুই ভুবনের মানুষ। আমরা জোড়া চোখে দেখতাম, দেখি 'বহুরূপীর নৃত্য', তিনি দশ আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে পেতেন 'কঠিন ধারালো মসৃণ বর্ণহীন জগৎ'—সেই তাঁর 'দ্বিতীয়' ভুবনে তিনি সম্পূর্ণ একা।

বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঃ সংযোজন

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (মার্চ ১৯৮০) পত্রিকায় 'বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঃ একটি বিস্মৃত নাম' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়লাম। লেখক শ্রীসুকুমার মিত্র সম্প্রতি অনালোচিত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখককে পাঠকের কাছে তুলে ধরে একটি প্রশংসনীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

বনবিহারীর পুত্র ডঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তাঁর কাছে বনবিহারীর বংশ-পরিচয়, রচনা-নিদর্শন ইত্যাদিও কিছু সংগ্রহ করছি। প্রসঙ্গত বলে রাখি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সাহিত্যসাধক চরিত-মালায় বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জীবনীও আশু প্রকাশিতব্য। সেখানে ডঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রাপ্ত প্রামাণিক তথ্যগুলো সংকলিত করা হবে।

শ্রী মিত্র বনবিহারীর ছয় ভাই-এর তালিকায় বড়দার নাম সংগ্রহ করতে পারেন নি। তাঁর নাম ব্রজবিহারী। ছোট ভাই শিল্পী বিনোদবিহারী।

এবার একটি অনালোচিত প্রসঙ্গে আসা যাক। বনবিহারী আমাদের 'গুরুবাদী' দেশে কারো গুরু হতে চাইতেন না এবং নিজেও কাউকে গুরুর পদে আসীন করতে চাননি, এটাই প্রচলিত তথ্য। কিন্তু বনবিহারীর চরিত্রে সংস্কৃত জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ সরস ব্যঙ্গবোধ এই দুটির মিলন হবার কারণ বাল্যকালে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের স্নেহলাভ। আমার আত্মীয়াকে লিখিত পত্রে বনবিহারীর ছোটভাই শিল্পী বিনোদবিহারী জানিয়েছেন, 'হেমচন্দ্রের সঙ্গে বনবিহারীর সম্পর্ক শৈশবকাল থেকে। আমিও হেমচন্দ্রকে দেখেছি। তিনি আমাদের পরিবারের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে আমি তাঁকে জ্যাঠামশাই বলতাম। অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি জানতে পারিনি যে তিনি আমাদের সত্যিকারের জ্যাঠামশাই নন। বলা যেতে পারে হেমচন্দ্রের প্রভাব ডঃ বনবিহারীর জীবনে খুবই প্রবল ছিল।' এবার বলা যাক হেমচন্দ্রের সঙ্গে কিভাবে বনবিহারীর

প্রাথমিক পরিচয়। কিন্তু তার আগে সংক্ষিপ্তাকারে হেমচন্দ্রের পরিচয়টুকু তুলে ধরা দরকার। হেমচন্দ্রের পরিচয় প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত'-অনুবাদক মণ্ডলীতেও বিদ্যাসাগরের নির্দেশে তিনি যোগ দেন। সেকাজ শেষ হতেই হেমচন্দ্র জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেই বেতনভুক পুরোহিতের কাজে যোগ দেন। এই সময় তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের কাজেও যোগ দেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকও হন। এই সময় হেমচন্দ্র 'রামায়ণ' মূলসংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদেও ব্রতী হন। কিন্তু এ-সবই তার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয়। এ ছাড়া হেমচন্দ্র তখন সুরসিক দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মার আত্মীয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরে তখন সরস আড্ডায় এই দুজনের কড়ি-ফাটান হাসিতে তর্জন-গর্জন গজকচ্ছপের যুদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রকে ডাকতেন 'ভড়জি' নামে।

'ভড়জির অট্টহাসি বড্ড জমকালো
বুড্ডার সদনে তার আড্ডা জমে ভাল।'

এই হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন বনবিহারী। বনবিহারীর আর-এক ভাই বিজনবিহারী (গিরিডি) চিঠিতে পরিমল গোস্বামীকে জানিয়েছেন, 'বাল্যকালে মেজদা (বনবিহারী) জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেও পরিচিত ছিলেন এবং শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহপাত্র ছিলেন।'

১৩০৭ বঙ্গাব্দে ১ বৈশাখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারিতে ব্রাহ্মমতে পুণ্যাহের কাজ শুরু হয়। নদীয়ায় বিরহানপুর পরগনায় শুভ-পুণ্যাহ করতে গেলেন জমিদার রবীন্দ্রনাথ আর পুরোহিত হেমচন্দ্র। সেখানে গিয়ে মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন হেমচন্দ্র যে-অবস্থায় তাঁর মনে পড়ে অসমাপ্ত 'রামায়ণ'-অনুবাদ ও পুঁথিপাণ্ডুলিপির কথা। তিনি সঙ্গী জমিদার রবীন্দ্রনাথকে বলেন 'রবিদাদা, আমি ত চলিলাম, আমার সকলই তোমরা জান তবে আমার একটি প্রার্থনা এই যে, আমার কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি ও পুস্তক আছে সেইগুলি যাহাতে আমার ছাত্র ও পুত্রপ্রতিমের হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করিও।'

এই ছাত্র ও পুত্রপ্রতিম সম্ভবত স্বয়ং বনবিহারী। কারণ সাহিত্য সাধক চরিতমালায় হেমচন্দ্রের জীবনী লিখতে ব্রতী হয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল বন-বিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বনবিহারীর কলমে জানতে পারেন 'তিনি (হেমচন্দ্র) ছিলেন আমার বন্ধুশ্রেষ্ঠ গুরু ও শিক্ষাদাতা।'

বনবিহারী হেমচন্দ্রকে জ্যাঠামশাই বলেই ডাকতেন। আলাপটা শৈশবেই

শুরু। বনবিহারীর ঘনিষ্ঠসঙ্গী ও ভাই বঙ্কুবিহারীর কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী হেমচন্দ্র ও বনবিহারীর প্রাথমিক পরিচয়ের সূত্রটি আমার আত্মীয়াকে জানিয়েছেন বনফুল। 'বনবিহারীবাবু যখন শিশু ছিলেন তখন বাড়ির এক ঝি বনবিহারীবাবুকে কোলে করে হেদোয় বেড়াচ্ছিল একদিন। হেমচন্দ্রও হেদোয় বেড়াচ্ছিলেন সেখানে। শিশু বনবিহারীর রূপ দেখে তিনি আকৃষ্ট হন এবং তাকে আদর করে কোলে নেন। বনবিহারী কিছুতেই তাঁর কোল থেকে নামতে চান নি। জোর করে ঝি যখন তাকে বাড়ি নিয়ে গেল তখন বনবিহারী নাকি ক্রমাগত কান্নাকাটি করেছিলেন। পরদিন আবার হেদোয় তাদের দেখা হল। হেমচন্দ্র তখন তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই ভাবেই প্রথম আলাপ, পরে তা খুব ঘনিষ্ঠ হয়। বনবিহারী বাল্যকালে কিছুদিন তাঁর বাড়িতে ছিলেন শুনেছি।'

বনবিহারীর জন্ম ১৮৮৪ সালে। উপরোক্ত ঘটনাটি আনুমানিক ১৮৯০ সালের কাছাকাছি। এসময় বনবিহারীর পিতা বিপিনবিহারী থাকতেন আতাবাগানের ভাড়া বাড়িতে। গবলগাছার জমিদারি ছেড়ে এসে তিনি বড়িশা বেহালায় বাড়ি তৈরি করে এতদিন সেখানে ছিলেন। সেখান থেকে আতাবাগানে যখন আসেন তখন তিনি মাসিক চারটাকা বেতনে স্কট টমসন কোম্পানির বড়বাবু। আতাবাগান অঞ্চলেই হেমচন্দ্রেরও বাসা ছিল।

কিন্তু হেমচন্দ্র তখন জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতেই থাকতেন। মূল লক্ষ্য রামায়ণ অনুবাদের কাজ আর ঠাকুর বাড়ির বেতনভুক কাজকর্ম ত ছিলই। ১৮৮৩ সালে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছে। গ্রাম থেকে নিয়ে আসা কবিপত্নী মৃণালিনীকে সংস্কৃত শেখানোর দায়িত্বও পড়েছিল হেমচন্দ্রের। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের কাছে 'রামায়ণ' অনুবাদ করাও শিখেছিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের অবসর বিনোদন হত দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সরস আড্ডায়। 'রামায়ণ' অনুবাদ করে ছাপানো শুরু হয় মির্জাপুরের বাল্মীকি যন্ত্রে। সেখানেও 'স্থূলাঙ্গর যন্ত্রে যমসম পুরুষ'। হেমচন্দ্র বাল্মীকি যন্ত্রের কর্মাধ্যক্ষ। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাই লিখেছেন।

'পাষান মুরতি-মদ্দ সর্দারের প্রায়,
লাঠি হাতে ভাবে ভোর বাল্মীকির জয়।'

এই বাল্মীকি প্রেস থেকেই ১৮৮৪ সাল থেকে প্রকাশ শুরু হয় 'রামায়ণ' অনুবাদ। হেমচন্দ্র যে সপরিবারে রবীন্দ্রনাথকে (রবিদাদা) খুব ভালবাসতেন সে কথাও আগে বলেছি। বনবিহারীর মত সতর্ক লেখকও রবীন্দ্রনাথকে

খুবই পছন্দ করতেন। সম্ভবত এ জন্যও তিনি হেমচন্দ্রের কাছে ঋণী। বনবিহারীর চিঠিতেই একটি গল্পের উল্লেখ আছে—'একবার আমরা (বনবিহারীরা) সরস্বতী পূজা করি। প্রতিমা কিনিয়া আনা হয়। আনিবার পর দেখা গেল দেবীর হাতে বীণা নাই। দেখিয়া বিদ্যাযত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন—'জোড়াসাঁকো থেকে আসবার পথে রবিবাবু বীণাটা কেড়ে নিয়েছে।' সেটা বোধহয় ১৯০১ সাল যখন রবীন্দ্র লাঞ্ছনায় বঙ্গভাষা শতমুখী। তখনকার দিনে টুলোপণ্ডিতের মুখে ওরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত।'

এই হেমচন্দ্র সম্পর্কে বনবিহারীর ধারণা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু বাল্যজীবনের অপরিমিত স্নেহ নয়, পরবর্তীজীবনে সংস্কৃত শিক্ষায় বনবিহারী হেমচন্দ্রের অজস্র সাহায্য পেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক রসিকতার সান্নিধ্যও বনবিহারী অর্জন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হেমচন্দ্রের মারফতে। বনবিহারীর সংস্কৃতজ্ঞান ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-রসিকতার পশ্চাৎপটটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গড়ে উঠেছে। বনবিহারী লিখছেন 'তাঁহার (হেমচন্দ্রের) দীর্ঘ-গৌর সুসমঞ্জস দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রকাণ্ড মাথা, বিশালচক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এবং অভ্যুন্নতাপৃষ্ঠ সুগঠিত দুই চরণ সবকিছুই অনন্যসাধারণ মনে হইত। চিত্তের সারল্যে দাক্ষিণ্যে, ঔদার্যে ও অলোভিতায় তিনি ছিলেন আমার কাছে মহাপুরুষ।'

তাঁর দৃষ্টিতে এই মহাপুরুষ হেমচন্দ্রকে বনবিহারী বলেছেন 'আমার গুরু, বন্ধুশ্রেষ্ঠ ও শিক্ষাদাতা।' গুরুবাদীর দেশে বনবিহারী কাউকেই গুরু মানতে চাইতেন না অথচ 'জ্যাঠামশাই' হেমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর এই স্বীকৃতির সুগভীর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। সংস্কৃতজ্ঞান এবং সরস ব্যঙ্গবোধে হেমচন্দ্র ও বনবিহারী পরস্পর আত্মার আত্মীয়। তাই হেমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সরস সান্নিধ্যের প্রভাব বনবিহারী কতটা সংগ্রহ করেছিলেন যে কথা আজ ভাবা দরকার।

হেমচন্দ্রই যে বনবিহারীর সংস্কৃতজ্ঞান এবং রসিকতা বোধের উদ্‌গাতা এই তথ্যটি বনবিহারীর কাছ থেকে জেনে আনন্দ হয়। বনবিহারীর গুরু হেমচন্দ্রই যে 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' বইটির সম্ভাব্য লেখক কথাটাও প্রসংগত স্মর্তব্য। বনবিহারীও কৈশোর থেকে সংস্কৃত শিক্ষায় কেন এ-বিভোর ছিলেন সেই প্রশ্নটিরই উত্তর স্বয়ং হেমচন্দ্র। যৌবন থেকে বনবিহারীর ব্যঙ্গ-বজ্রপানি রূপ নিয়ে পরিমল গোস্বামী সাধ্যমত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বনবিহারীর বাল্য কৈশোর সংস্কৃত শিক্ষা ইত্যাদি আজও অন্ধকারে। বন-

বিহারীর সংস্কৃত কলেজে সহপাঠী ছিলেন তুলসী ভট্টাচার্য। তিনক্লাস নীচে তারকনাথের ভাই পড়তেন বিষ্ণুচরণ। এই দুই ভাইয়ের বাবা 'বঙ্গে রত্ন-মালা'র লেখক কালীকৃষ্ণ দেবশর্মণ। আদি, মধ্য ও কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বনবিহারীর সঙ্গে তুলসীও পরবর্তী জীবনে ডাক্তারি পড়তে চলে যান। তুলসী ভট্টাচার্য, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং বনবিহারী এই চারজনে পরবর্তী জীবনে যে-'অসাময়িক' পত্রিকার তিনসংখ্যা প্রকাশ করেন সেই বেপরোয়ার সম্পাদক ছিলেন বিষ্ণুচরণ।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ছাত্র বনবিহারীকে খুবই ভালবাসতেন। বনবিহারীর শেষ জীবনের ক্লান্তি অপনোদনে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র ড তারকনাথের ভূমিকা কম নয়। ১৯৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে বনবিহারীর ভাষণ টেপ করে রেখেছিলেন তারকনাথ।

আদি, মধ্য ও কাব্যতীর্থ পাশ করার পর সংস্কৃত কলেজেই উচ্চশিক্ষা নেওয়ার কথা ছিল বনবিহারীর কিন্তু কেন যেন তিনি হঠাৎ ডাক্তারি পড়তে গেলেন সে স্বতন্ত্র এবং সরস অধ্যায়।

বনবিহারীর আরেক ভাই গিরিডির বিজনবিহারীও পরিমল গোস্বামীকে জানিয়েছেন বনবিহারীর জীবনের প্রথমভাগে তিনি দুটি উদার মহাপ্রাণ ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন এবং এঁরা দুজনেই এখন বাংলা দেশের বিস্মৃত ব্যক্তি। 'একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আমাদের জ্যাঠামশাই...আর একজন সংস্কৃত কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক ... শ্রদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ।'

হেমচন্দ্র নিয়ে আগেই আলোচনা করলাম কারণ ১৯০৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর ৭৫ বছর বয়সে হেমচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তার আগে তিনি পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হয়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে আশ্রিত হয়ে ছিলেন।

বনবিহারীর জীবনের শেষের দিকের বেশ কিছু অংশই দেবেন্দ্রনাথের ও পুত্র ডঃ তারকনাথ ঘোষের আন্তরিক সান্নিধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। ডঃ বনবিহারার জীবনে তাই হেমচন্দ্রের সংস্কৃত জ্ঞান ও রসিকতা দিয়ে শুরু হলেও শেষ জীবনের সঙ্গী ছিলেন সংস্কৃত জ্ঞানের অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র ডঃ তারকনাথ ঘোষ।

উপরোক্ত তথ্যগুলো সংগ্রহ করার সময় বনবিহারীর পুত্র ডঃ কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক সাহায্য পেয়েছি।

শতবর্ষে ব্লক

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হয়তো দেরি হয়ে গেছে কিন্তু হঠাৎ মনে হল 'পরিচয়'-কে পাঠাই একটা খবর, যা শুধু হরেক রকম খবরের মধ্যে একটা নয়, কারণ তার একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। খবরটা হল সোভিয়েট দেশে রুশ কবি আলেকজান্দার ব্লক্-এর জন্মশতবার্ষিকী পালন নিয়ে। ব্লক্ জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালের ২৯শে নভেম্বর তারিখে; মৃত্যু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, ১৯২১ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে।

অভিজাতই বলা যেতে পারে। অথচ বাস্তবিকই বুদ্ধিদীপ্ত এক পরিবারে ব্লক-এর জন্ম। বিবাহ হয় বিশ্ববিদিত রসায়নশাস্ত্রী মেণ্ডেলিয়েভ-এর কন্যার সঙ্গে। জীবনকাল স্বল্প হলেও কাব্যকৃতি প্রভূত; গদ্যও লেখেন কম নয়, তবে তিনখণ্ডে কাব্যগ্রন্থে স্বাক্ষর রেখে গেছেন স্বকীয় অনুভূতির। যার মধ্যে গূঢ়ার্থবাদের গন্ধ পেয়ে কিছুকাল স্বদেশে তাঁর অবদানকে হেয় মনে করার একটা ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল। তবে লেশমাত্র প্রশ্ন নেই অক্টোবর বিপ্লবের প্রতি তাঁর অখণ্ড অনুরাগ নিয়ে। একদা বিতর্কিত 'বারো' (The Twelve)-শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি তিনি লেখেন ১৯১৮ সালে, নিজের ধ্যানের চোখ দিয়ে দেখেছিলেন যেন নবজীবন সৃষ্টির জন্য বিপ্লব আসছে যেমন একদা দ্বাদশ সহচর নিয়ে যিশুখ্রিস্ট এসেছিলেন। সেই বৎসরই লেখেন অবিস্মরণীয় 'The Scythians' কবিতা—দুনিয়ার চার কোণ থেকে বুর্জোয়া বৈরীরা সদ্যজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রকে পিষে মারার দানবীয় দৌরাত্ম্যে যখন প্রবৃত্ত, তখন দৃপ্তকণ্ঠে বলেন:

> "You are millions. We have hordes,
> and hordes and hordes.
> "Just try, fight us!
> "Yes, we are Scythians! Yes, we are Hiatics
> "With slanting and greedy eyes!"

পুশকিন, গোগোল, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয় প্রভৃতি মহান স্রষ্টাদের সম্বন্ধে ব্লক একবার লেখেন যে 'তাঁদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল অন্ধকারের গহ্বরে, কিন্তু আলোকে বিশ্বাস কখনও হারান নি বলে সেই অন্ধকারকে সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাঁদের ছিল—আলো যে কি বস্তু, তা তাঁরা জানতেন।'

বিপ্লবের রাস্তায় অনেক খাদ আর খোন্দল না থেকে উপায় নেই বলে

ব্লক-এর মতো সমাদৃত শিল্পীরও বিরূপ সমালোচনা কিছুকাল ধরে রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রয়াত, প্রমুখ সোভিয়েট কবি ৎভার্দভস্কি (Tvardovsky) বলতে কুণ্ঠা করেন নি যে সে দেশের 'সংস্কৃতি জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হল ব্লক-এর কবিতা, যা বেঁচে রয়েছে এবং থাকবে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে, যিনি রুশ ভাষায় সবচেয়ে প্রিয় কবিদের মধ্যে জায়গা নিয়ে আছেন।'

ব্লক-এর কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে এজন্য যে বর্তমানে বিস্মৃত অথচ বাস্তবিকই অবিস্মরণীয় আমার বহুদিন-প্রয়াত বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সহযোগীরূপে তখন ১৯৩৮ সালে (তখন প্রায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত) প্রগতি-লেখক-সংঘের পক্ষ থেকে 'প্রগতি' নামধেয় সংকলন সম্পাদনা করি। তখন সেই গ্রন্থে ছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত (মূল রুশ থেকে) অনুবাদ-করা ব্লক-এর 'বারো' কবিতাটি। সবাই জানি সোভিয়েট বিষয় সৌম্যেন্দ্রনাথের একদা-প্রবল অনুরাগ পরে প্রচণ্ড বিরাগে পরিণত হয়েছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি নিজেকে নিখুঁত সাম্যবাদী বিবেচনা করলেও সোভিয়েট ব্যবস্থা বিষয়ে একান্ত রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তবুও তখন স্বদেশের মুক্তি-প্রয়াস আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের সহায়তাপুষ্ট ফ্যাশিজম্-এর বিপক্ষে সকল সৎ মানুষের সংহতিকে ভিত্তি করে লেখক-শিল্পীদের সম্মিলিত করার প্রযত্নে লিপ্ত থেকে আমরা 'প্রগতি' সংকলনে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার থেকে সজনীকান্ত দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সমর সেন প্রভৃতির রচনা একত্র সন্নিবদ্ধ করতে পেরেছিলাম।

'প্রগতি' এখন দুষ্প্রাপ্য। আমাদের যে দুরবস্থা, তাতে এর পুনর্মুদ্রণের কোনো আশা নেই। ইচ্ছা করে যে অন্তত ঐতিহাসিক দিক থেকে এর কদর যেন কিছুটা মেলে। আর এর বহিরাবরণে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কম্যুনিস্ট পুত্রবধূ স্টেলা ব্রাউনের যে অপরূপ কৌতুক চিত্র ছিল, অন্তত তার খাতিরেও কি কেউ এ-বই আবার ছাপাবে না? প্রগতি লেখক আন্দোলন তো মাঝে-সাঝে বেঁচে থাকার একটু-আধটু লক্ষণ আজকাল দেখায়—তার কর্তাব্যক্তিরা এ-বিষয়ে একটু ভাববেন কি? ইতিমধ্যে, আলেকজান্দার ব্লক-এর জন্মশতাব্দী পালনের সংবাদ যেভাবে সোভিয়েট থেকে তাদেরই পত্রপত্রিকা মারফৎ এসেছে তা যে শুভ ও অর্থবহ, তাতে সন্দেহ নেই।

নরক প্রকাশ্য হোক

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছিল
যা থাকার। তুমি
কঠোর হাতে
তখনও
সেই মানুষের হাটে
তোমার দীর্ঘ ছায়া দেখাও নি।

তারপর
যা থাকতে নেই
তা নেই। তুমি তখন
ভীষণ ঘুশি।

আমরাও নিশ্চিন্ত,
কেননা
ভয় বলে এখন আর কিছু নেই।
নরক
এখন আমাদের চোখের সামনে।

এখন
যা আসবার
আমাদের মানব জীবনে
তারও অভিনয় হবে। আমরা
দেখবো,

সময় কীভাবে
তোমার কাছ থেকে নিষ্ঠুরতা শিখে
তোমাকেই ধ্বংস করছে।
তারপর
আবার মাটির ভিতর থেকে

অঙ্কুরিত হবে
পুনর্জন্ম ;

মানুষ
তার চোখের জলে পরিশুদ্ধ হয়ে
নতুন করে শিখবে
তার হারিয়ে যাওয়া বর্ণপরিচয়

তার অক্ষরগুলিতে
হয়তো তখনও
আমাদের নিহত ভাইয়েদের-রক্ত
লেগে থাকবে।

তা থাকুক ;
রক্তেরও একটা শুদ্ধ উচ্চারণ
কোথাও রয়ে গেছে,
আমাদের ভয় আর তোমার স্পর্ধা
যাকে আড়াল করতে চেয়েছিল।

এবার আমরা মানুষের হাটে, মাঠে
সেই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনতে পাবো :
যেমন তুমি নও।

আমরা আরও শিখবো :
গাছ পাখি ফুল আর ফল অমর,
ছয় ঋতু অমর, আর
মানুষ অবিনশ্বর, প্রতিটি হত্যার পর
তার নবজন্মে।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮০

কার্লমার্কস-এর প্রেমের কবিতা

১৯৭৫-এ মস্কোর প্রোগ্রেস পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত মার্কস-এঙ্গেলস-এর রচনাসংকলনের (লণ্ডনের লরেন্স অ্যাণ্ড উইশার্ট, নিউ ইয়র্কের ইনটারন্যাশনাল পাবলিশার্স ও মস্কোর ইনস্টিট্যুট অব মার্কসইজম-লেনিনইজম-এর মিলিত উদ্যোগে) প্রথম খণ্ডে মার্কস-এর ১৮৩৫ থেকে ৪৩-এর ভেতর রচিত ও প্রকাশিত লেখাগুলি সংকলিত হয়েছে। এর 'প্রথম দিকের সাহিত্য-প্রয়াস' বিভাগে মার্কস-এর লেখা কিছু কবিতা আছে। সূচিপত্রে নির্দেশ আছে কবিতাগুলি মার্কস-এর স্ত্রী জেনিকে উপহার দেয়া অ্যালবামগুলি থেকে ও মার্কস-এর পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ-বিষয়ে টীকায় বলা হয়েছে—১. ১৯৫৪ সালে মার্কস-এর দৌহিত্র এডগার লঙ্গেত এর কাছ থেকে দুটি অ্যালবাম ও ১৯৬০ সালে মার্কস-এর প্রদৌহিত্র মার্সেল চার্লস লঙ্গেত-এর কাছ থেকে একটি তৃতীয় অ্যালবাম মস্কোর ইনস্টিট্যুট অব মার্কসইজম-লেনিনইজমের কাছে আসে। ২. এই অ্যালবাম তিনটির ও পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কাব্যগ্রন্থটির কিছু-কিছু কবিতা মার্কস-এর জীবনী-রচয়িতারা আগে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু অনেক কবিতাই ইতিপূর্বে ইংরেজিতে অনুবাদ হয় নি আর সমগ্র কবিতা এই প্রথম মুদ্রিত হল। এই রচনা-সংকলনের সম্পাদকীয় টীকার নির্দেশ-অনুযায়ী অপ্রকাশিত ও অননুদিত কয়েকটি মাত্র কবিতা এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হল।

জেনির জন্য কয়েকছত্র

১

যে সব বিনীত গান
তোমার পায়ের কাছে রেখে গেছে প্রেম—
তুমি নাও,
সে আমারই দান।
যেখানে বীণার গাঢ় তানে
খুব কাছে আসা যায় কিরণদীপ্ত খোলা মনে,
সুর থেকে উৎসারিত বর্ণনে বাসনা যদি জাগে

সুন্দর গাথায়, যদি নাড়ী কাঁপে আকুল আবেগে
দোলে দৃপ্ত বুকে মহিমায়,
দূর থেকে দেখে নিয়ে তোমাকে বিজয়ে উদ্দীপিত,
তখন প্রবলতর আরও দৃপ্ত এ যুদ্ধ আমার—
তখন আমার গান ছড়াবে অপার,
মুখর সঙ্গীত পাবে রূপান্তরে স্বাধীন ব্যঞ্জনা
মধুর আর্তি নিয়ে ঝরে যাবে বীণার মূর্ছনা।

২

দৃষ্টি মুখর ঐ তোমার চোখের কাছে
পৃথিবীর খ্যাতির বিলাস—
দূর প্রসারিত যার তরঙ্গের অভিঘাতে
নানা দিকে রোমাঞ্চিত দেশ অভিভূত—
কিছুই লাগে না—
যখন তোমার বুক ভরে থাকে উল্লাসের ভিড়ে
অথবা দুচোখ বেয়ে ঝেঁপে আসে গভীর গহন
দু ফোঁটা অশ্রুজল গানের আবেগে।
বীণার মন্ত্র ছন্দে
আনন্দেই করে দেব হৃদয় বিলীন,
দীর্ঘতর শ্বাসে।
শেষ হয়ে যাবে এক প্রকৃত নায়ক
বাঞ্ছিত লক্ষ যদি একবার ছুঁয়ে নিতে পারি,
যদি আমি জিতে নিই উজ্জ্বল সেই পুরস্কার—
তোমার ভেতরে মিশে দুঃখ সুখ সব একাকার।

৩

এ সব লিখন আহা উড়ে যেতে পারে
এখন তোমার কাছে, কেঁপে কেঁপে, ফের।
বোকার মতন ভয়ে, বিরহ ব্যথায়
আমার হৃদয় খুব ঝুঁকে আছে।
যে-সব কল্পনা

আমাকে প্রবঞ্চনা করে ঠিক পথে দিশেহারা
যা কিছু মহান, আমি পাই নি তা,
হারাবে আশাও।
দূর দেশ থেকে ফিবে আকাঙ্ক্ষায় ভবা প্রিয ঘরে
তোমাব দযিত এসে আলিঙ্গন করে
গর্বিত বাহুব বেড়ে, সে এক সুন্দবী
এখন আমাবই
বুকেব ওপব দিয়ে বযে যায
হতাশা-বিস্মৃতি
অশনিব দ্যুতি।

৪

বুকেব গভীব ইচ্ছে যে-ঘৃণার স্বীকাবোক্তি চায়
সে খোলা ঝুঁকিকে তুমি ক্ষমা কবো।
ব্যথাব আগুন তাব প্রশমিত হবে
গায়ক পোড়ায ঠোঁট যদি।
তাহলে কী ফিবে যেতে পাবি
নিজেব নিজেব দিকে এবং নিজেকে
স্বস্তিহীন হাবাতে বেবাক?
গাযকের নামই পাবে অবহেলা,
দেখেও তোমাব মুখ
তোমাকে ভালো না বেসে যাব?
বুকেব ইচ্ছেগুলো এত বেশি দূবে যেতে চায়
হয়ে ওঠো মহিমান্বিত;
তোমাব অশ্রু শুধু আমি চাই
আমাব যে-গান শোনো—তাকে
দিও তুমি সুষমা-সম্ভার
যাতে তাবা উড়ে যায শূন্যে অপাব!

অক্টোবরেব শেষদিকে লেখা, ১৮৩৬

জেনি-কে

শব্দ—সে তো মিথ্যে, কেবল শূন্য ছায়া
আর কিছু নয়,
জীবন ঘিরে চতুর্দিকে ভিড় করেছে।
আমায় মধ্যে যা কিছু আছে উদ্দীপনা উথালপাথাল
সে সব ভরে দিতেই হবে ক্লান্ত মৃত প্রাণের ভেতর ?
অথচ কিনা এই পৃথিবীর হিংসুটে সব ঈশ্বরেরা
সত্তাজোড়া আগুন আলোকদৃষ্টি নিয়ে যাচাই করে ;
এবং হতভাগ্য মানুষ চিরটা কাল বাধ্য হয়ে—
বুকের দীপ্ত প্রভাব মধ্যে শব্দরাশি মাত করেছে,
তাই তো যদি আবেগ আসে, স্পন্দিত ও দুঃসাহসী
প্রাণের ভেতর মাধুর্যময়, উজ্জ্বলতায়, সে উদ্ধত
তখন তোমার মুক্ত আকাশ রুদ্ধ করে, আসনচ্যুত
নামিয়ে আনে অনেক নীচে, বাতাস নৃত্য ছাপিয়ে ওঠে,
টুসটুসে এক অন্য বিশ্ব তোমার ওপর পূর্ণতা পায়।

জেনি-কে

১

জেনি ! পেছনে লেগে তুমি
জানতে চাও যদি
এত যে গান আমি 'জেনি'-কে কেন দিই—

যখন শুধু একা
তোমারই কথা ভেবে
প্রবল টানে দোলা নাড়ীতে তাতাথৈ,

তোমারই বিরহে যে
হতাশা সঙ্গীতে
যখন তুমি পাবো জাগাতে ফের ?
প্রতিটি অক্ষরে

নিহিত স্বাক্ষরে
যখন প্রকাশিত তোমারই নাম—

যে-নামে সুরতান
ছন্দে ভরে, কেউ
দেবীর থেকে নয় বেপথুমান ?

কারণ সেই নামে
মধুর ধ্বনিমালা
কত যে ব্যঞ্জনা মূর্চ্ছনে,

পূর্ণ, গম্ভীর,
বর্ণিত দূরাগত
যেমন স্পন্দিত প্রাণ শোনে,
যেন তা সেতারের
সোনার ঝংকারে
সুরবলয়, যেন ইন্দ্রজাল

অবাক-করা এক জীবনকাল !

২

তাহলে দেখেছ শুধু 'জেনি' লিখে লিখে
ভরাতেও পারি হাজার কয়েক খণ্ড
তবুও লুকোবে তারা এক গূঢ় কথা
স্থির বিশ্বাস, শাশ্বত কোনো কর্ম,
পদ্যের মিঠে, পরিশ্রুত যা ইচ্ছায়
প্রভা যত আছে ঈথারের ঔজ্জ্বল্য,
নিদারুণ ব্যথা এবং পরমানন্দ—
পূর্ণ জীবন, আমার লব্ধ জ্ঞানে
দূরের তারাতে যেন সব আমি দেখি ;
হাওয়ায় হাওয়ায় তারা ফিরে ফিরে আসে

বন্য ঢেউয়ের বজ্রের বুক থেকে।
সত্যি, এবার লিখে রাখি এই ধুয়া
তাদের জন্যে, যে শতক আজো আসে নি—
জেনির অন্য নাম হল ভালোবাসা,
ভালোবাসাই তো জেনি।

নভেম্বর, ১৮৩৬

জেনির জন্য গান

যা কিছু বন্ধন ছিল, সব ছিঁড়ে আমার উত্থান
'কোনদিকে যাবে?' 'আমি খুঁজে নেব নিজের পৃথিবী।'
ছড়ানো খুশিতে ভরা প্রান্তরের গান,
আকাশে তারার নৃত্য, নীচে ঐ সমুদ্র অপার।

তুমি তো জান না, আমি চাই না পেরোতে
সেখানে পাহাড় ছুঁতে, বাজাতে ঈথার,
আমার চলার ছন্দ বাঁধে তারা মূক বেদনাতে
প্রেমের যত না কথা হয়ে ওঠে শৃঙ্খলের ভার।

আমাকে মন্থন করে যে-পৃথিবী জাগে—
সে আমার বুকে লগ্ন থাক,
তটিনী উৎসারিত এ বুকের রক্ত সংরাগে
ঈথারে মিনার তার আমার শ্বাসেই প্রাণ পাক।

উধাও হয়েছি দূরে দূরে,
ত্রিলোকে, ফিরেছি তার স্মৃতি নিয়ে মনে
সূর্যতারারা নাচে নেচে যায় সেই বিশ্ব জুড়ে—
অশনি ঝলসে উঠে নিভে যায় আবার গগনে।

একজন বীর নায়কের প্রতি

এখানে-ওখানে খোঁড়ো, তবু সর্বদা
বীর ও নায়ক মিশে আছে তুমি দেখবে,
তার ভাষা পায় আধুনিক মর্যাদা—
বাতভোর তাকে পুরোনো পোকায় কাটবে।

কেতাদোরস্ত রোমান্স

যেমন সকলে জানে, গ্যেটেকে যে-মেয়ে লিখেছিল
ভেবে নিতে তাকে তাঁর বঁধু, সে-ই গেল
একদিন থিয়েটারে—
কে যেন উর্দি পরে
পরিচিত হেসে পথ আগলে দাঁড়াল।
'হে প্রিয়, তোমার বুকে
গভীর মধুর সুখে
বেটিনা কোঁকড়া মাথা এলাবে, কী রাজি ?'
'সেটা তো তোমার ইচ্ছে'—
লোকটা যেই বলেছে,
বেটিনা অমনি বলে, 'আচ্ছা বাবাজি—
আমার চুলেতে ঐ
উকুনের ঝাড় নেই
এতটাই ? নিশ্চিত বুঝি ?'

রাস্তার ওপারে আমার প্রতিবেশীর প্রতি

এ-সব আমার সহ্য হয় না আর
আমাকে এভাবে দূর থেকে দেখা তার।
হলদে বাড়ি ও বেঁটে লোক,
গা-গুলনো ঢ্যাঙা মেয়ে হোক,
উড়ে যেতে পারে আবেগ—এ কথা জেনে
ভালো করে তাই পর্দা নামাই টেনে।

অঙ্কের জ্ঞান

সব কিছুই তো সংকেতে আজ বলে
আঙ্কিক মতে যুক্তিতক্ক চলে,
ভগবানকে কী নল বলা যাবে বাছা,
শীর্ষাসন কী পারবে—যখন ঠেকিয়ে বসেছ—?
ক যদি প্রেমিক, খ যদি প্রেমিকা হবে
এই ধরলাম দশগুণ বাজি তবে,

যদি ক-এ আব খ-এতে দুজনে মিলে
এক জোড়া হয় আহ্লাদে গ্যালগেলে ।

*

রেখা দিয়ে যদি পৃথিবী জরিপ করো
উদ্যম তার ফুরোবে সাধ্য নেই,
ক-খ-রা ঝগড়া মেটালে, আদালতেরও
টাকাটি না-দিয়ে কলা তারা দেখাবেই ।

ডাক্তারি ছাত্র ঃ নৃতত্ত্ব

অসুখকে যে হারাতে চাও
পেছনে কষে তেল লাগাও,
বাতাস খরা পগার পার
ভয় নেই আর শীত লাগার,
এবং যদি সমঝে খাও
জীবনে তাহলে সবই তো পাও,
সঙ্গে জোলাপ একটু করে—
সংস্কৃতি উপচে পড়ে ।

ডাক্তারি ছাত্র ঃ মনস্তত্ত্ব

রাতের বেলা সিমুই পায়েস আহার্যে—
ভুগবেই দুঃস্বপ্নে, দেহের প্রাচুর্যে ।

ডাক্তারি ছাত্র ঃ নীতিশাস্ত্র

ঘাম যদি হয়, হোক না,
বেড়াতে বেরুলে দু-একটা জামা বেশি চাপানোই থাক না,
পাচকরসের গোলমাল করে এমন আবেগ যাক না,
চোখ যদি পোড়ে, তাই অবাধ্য দৃষ্টি পোষ মানুক না,
মদে জল আর দুধে কফি দেয়, কথাটা মনে থাকুক না,
সে কথাই তবে রইল—শ্রাদ্ধে খাওয়াটা ধরছি পাওনা ?

১২ এপ্রিলের আগে লেখা, ১৮৩৭

অনুবাদ ঃ সিদ্ধার্থ রায়

পরিচয়-এর আড্ডা

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

১৯৩৮

২৯ এপ্রিল

আজকের আসরে সত্যেন বোসকে দেখে খুব ভাল লাগল। তাঁর সঙ্গে তখন সুধীন্দ্র ও নীরেন গল্প করছিলেন। আমি বললাম, বুক কোম্পানি থেকে বেরিয়ে বৌদ্ধ মিশন হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম বিনয় সরকার বক্তৃতা দিচ্ছেন ও সভাপতির আসনে সন্তোষ বোস বসে রয়েছেন।

সত্যেনবাবু আমাকে সস্নেহে পাশে বসিয়ে কিছু কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কোথায় যেন যাবার ছিল। তিনি চলে যাবার পরেই গিরিজাপতি, তুলসী গোঁসাই ও অপূর্ব চন্দ এলেন।

নীরেন আর সুধীন্দ্রর মধ্যে তর্ক বেধে গেল সমাজপরিবর্তনের থিওরি ও প্র্যাকটিশ নিয়ে। দেখলাম, য়ুরোপের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সুধীন্দ্র ঢের বেশি জানেন। তাঁর যুক্তিতে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের লেশ ছিল না আজকে।

অপূর্ব চন্দ দুঃখ করে বললেন তিনি বড় মোটা হয়ে যাচ্ছেন। সুধীন্দ্র বললেন, সে কথা দশ বছর ধরে শুনে আসছি।

চন্দ সাহেব বললেন, তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ আছে—সব কটা স্যুটই ছোট হয়ে গেছে। বাতিল করে দিতে হচ্ছে। পোশাকের কথা ছেড়ে তিনি দিল্লির গল্প শুরু করলেন। তারপর ঠোঁটের মধ্যে একটি সিগারেট পুরে আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, কে জানে কে মেয়র হল—মজা হচ্ছে দশজন মুসলিম কাউনসিলারই আলাদা আলাদা টেলিফোন করে বলেছেন যে তাদের ডেপুটি-মেয়র করলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন, তবে কেন মেয়রের পদ নেবার জন্যে এত পীড়াপিড়ি।

চন্দ সাহেব-এর গসিপ্-এ অবশ্য কিছুটা রঙ চড়ে কিন্তু তিনি অনেক খবর রাখেন যা আমাদের মধ্যে কারও কানে আসে না।

চা-এর স্বাদ ও গন্ধ যেন ক্রমশ নিরেস হয়ে আসছে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা

যখন পুরোপুরি বহাল আছে, তখন বুঝতে হবে 'ধনীগৃহের ভৃত্যদের হাত টান' বাড়ছে। সুধীন্দ্রর অত খেয়াল থাকে না।

অপূর্ব চন্দ এবার দপ্তরের চর্চায় মন দিলেন। শাস্ত্রীর ক্ষমতা ছাড়ার ইচ্ছা ছিল না। জাকারিয়াকে ওসমানিয়া কলেজের অধ্যক্ষ করে দেওয়া হয়। মন্ত্রী তাঁর স্নেহভাজন একজনকে আড়াই শ টাকা বেতন থেকে তুলে দেড় হাজারের কোটায় তুলে দিয়েছেন।

এইসব খোকা গল্পে কেউ তেমন মন দিল না। স্বজনাপোষণ এখন ধাতস্থ হয়ে গেছে সকলের।

সুধীন্দ্র বললেন, হাউস আমাদের দেশে পড়াতে চান না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব তাঁর মনে পীড়া দেয়। তিনি মনে করেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যনির্বাহ ব্যাপারে এতই মশগুল থাকেন যে তাঁর পাণ্ডিত্যের অপব্যয় হয়।

৬ মে

আজ পরিচয়-এর আসর বসেছিল প্রবোধ বাগচীর বাড়িতে। আমি দেখি সুধীন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, আইয়ুব, নীরেন ও হেমেন্দ্রলাল বসে আছেন। একটু পরে গিরিজাপতি, জীবনময় রায়, হিরণ ও সুশোভন এসে পড়লেন। সুধীন্দ্রকে উঠতে হল—তাঁর কোথাও যাবার ছিল।

বাগচী আইয়ুবকে পি. ই. এন. ক্লাবের এক সভায় ইকবালের কবিতা সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, কবিতা পড়ে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে পারেন কিন্তু বক্তৃতা দিতে পারবেন না।

প্রমথবাবু বললেন, উর্দু কবিতার সঙ্গে বাংলা কবিতা তুলনা করে কিছু বলুন।

আইয়ুব বললেন, উর্দু কাব্যে বাক্যকে সুন্দর, সরস অথবা মজার করে বলবার প্রবণতা দেখা যায়। কোনো আইডিয়াকে নিবিড় করে প্রকাশ করবার প্রয়াস বা প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

তারপর তিনি ইকবাল-এর বিখ্যাত কবিতার একটি লাইন আবৃত্তি করলেন যেখানে দ্ব্যর্থক অর্থে আল্লাকে সর্বশক্তিমান ও বারাঙ্গনা দুই বলা হচ্ছে। ব্যাখ্যা করবার সময় বললেন, উর্দু কবিতার প্রণয়ী সকল সময় প্রণয়িনীর নিষ্ঠুরতার কথা বলে থাকে। সেইটাই হল প্রথা। কবি ভগবানের ওপর অভিমান করে দোষারোপ করছেন যে তিনি ইসলাম বহির্ভূত মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন।

আলোচনা প্রসার করে আইয়ুব আরও বললেন, বাঙালিরা হচ্ছে স্বভাবতই তাদের কথাবার্তা ও দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে কিছুটা অগোছালো, যেন গা-ছাড়া, কিন্তু উর্দু ভাষাভাষীরা নিকটতম আত্মীয়ের সঙ্গেও কথা বলে মার্জিত ভাষায়। ভদ্র আচরণ হচ্ছে তাদের মজ্জাগত। শব্দের বিন্যাসে, বিনয় ও ভদ্রতার অভ্যাস আশৈশব।

হেমেন্দ্রলাল উৎসাহের সঙ্গে আইয়ুব-এর কথা সমর্থন করলেন। তিনি আমাদের শোনালেন বড় বড় অভিজাত পরিবারের ঐতিহ্যের নানা দিক। আরও বললেন লাখনৌর সংগীতজ্ঞ ওস্তাদরা গানের আসরে অবসর সময় কী ধরনের উচ্চাঙ্গের আলাপ-আলোচনায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতেন।

প্রমথবাবু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁর ঘরের অংশীদার ছিলেন একজন উর্দুভাষী মুসলমান। তাঁর কাছে তিন বছর পাঠ নিয়েও ভাষা রপ্ত করতে পারেন নি। তারপর তিনি পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সব যেন গুলিয়ে ফেললেন। ওস্তাদের সম্বন্ধে কী বলতে গিয়ে তাঁর এমন একটি উর্দু কবিতার পদ মনে পড়ে গেল যার মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের শ্লেষ সুস্পষ্ট। আইয়ুবকে অস্বস্তি বোধ করতে দেখা গেল। বৃদ্ধের স্মৃতি থেকে কখন কী ভেসে ওঠে তার ঠিক নেই।

নীরেন খাড়া হয়ে উঠে বসে হাঁটুর ওপর হাত দু-খানা উপুড় করে রেখে আইয়ুবকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার বলুন আপনি বাংলা সাহিত্যে উৎসাহী হলেন কেন, কেমন করে?

আইয়ুব আমাদের আশ্চর্য করে দিয়ে বললেন, আমি কলেজে ঢোকার পরে প্রথম ভাগ থেকে শুরু করি। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরিজিতে পড়ে মুগ্ধ হই, তারপরে মনে হয় বাংলা ভাষার ভেতরে না ঢুকতে পারলে কবির মনের যথার্থ পরিচয় মিলবে না। কলেজে যখন পড়তাম তখন আমার পোশাক ছিল খাঁটি উত্তরপ্রদেশীয়। ফিরিঙ্গি স্কুল সেন্ট এ্যান্টনি থেকে পাশ করে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ঢুকে বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে মিশে বাংলা কথা বলতে শিখি। সাহিত্যে উৎসাহ হয় সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠবার পরে।

সুধীন্দ্র যাবার পরেই বৃষ্টি নামল। প্রমথ চৌধুরী চলে যেতে আমরা জমিয়ে বসে বেসিক ইংলিশ প্রসঙ্গে এক বিতর্কে মেতে গেলাম। নীরেন

প্রস্তাবের সপক্ষে, বাগচী বিপক্ষে। প্রবোধবাবুর যুক্তি অনেক সময় মনে হয় গাজোরি। জীবনদা (কবি জীবনময় রায়) বললেন, কোনো ইংরেজের পক্ষে বেসিক ইংরেজি গ্রহণ করা কঠিন হবে।

হিরণ কোনো পক্ষ না নিয়েই মজার মজার মন্তব্য প্রক্ষেপ করে ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। সুশোভন-এর অভিমত সকল সময় সুচিন্তিত হয়। তাঁকে কখনও উত্তেজিত হতে দেখিনি, তবে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গোক্তি করতে শোনা যেত। আজ তিনি ধীর নিরপেক্ষভাবে কথা বলছিলেন।

নতুন করে ঝেঁকে বৃষ্টি নামতে হিরণ খিচুড়ি খাবার প্রস্তাব করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের মনে পড়ল অমিয় সেন একসঙ্গে পঁয়ত্রিশটা চিংড়ির কাটলেট খেয়েছিলেন—তার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নিরামিষ খাওয়াই শ্রেয়—জীবনদা উপদেশ দিলেন।

হিরণ বললেন তাঁর এক বন্ধু নিজেকে নিরামিষাশী বলেন, তার কারণ তিনি নিরামিষাশী পশু ছাড়া আর কোনো পশু খান না।

হেমেন্দ্রর মনে পড়ল, তাঁর এক পরিচিত লোক গরুর খাদ্যের সঙ্গে পচা ডিম মিশিয়ে দিত। সুশোভন একটি দুষ্টু ছেলের গল্প করলেন যে বাহাদুরি করে কুক্কুরীর দুধ খেত। নীরেন বিশ্বাস করলেন না কিন্তু নিজে আরও অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। তখন বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে সবে-মাত্র উঠে এসেছেন। বাড়ি-সংলগ্ন পাঁচিল ঘেরা মাঠে বসে চুল কাটাচ্ছেন। খবর-কাগজে মাথা গলাবার মতো গর্ত করে জামা ঢাকা হয়েছে। নরসুন্দর নতুন খদ্দেরকে খুশি করবার মতো জমকালো গল্প ফেঁদেছে। অন্যমনস্ক হয়ে থাকবে। হই হই করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে টান পড়তে দেখা গেল একটি ছাগল তার অর্ধেক ছিঁড়ে নিয়ে চলেছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কর্তিত চুলের একটুও দেখতে পেলেন না। নাপিত বললে এ পাড়ার ছাগল সর্বভুক্।

হিরণ আমার ইন্দ্রলুপ্ত মাথার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, শ্যামলবাবুর বেলায় ছাগলটার তর সয় নি।

১৩ মে

আজ শুক্রবারীয় আসরে যেতে দেরি হয়ে গিছিল। দেখি সুধীন্দ্রর প্রশস্ত ঘর ভরে গেছে। যামিনী রায় সেদিন প্রথম এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেওয়া হল। বাকি সকলে পরিচিত। একদিকে সত্যেন বোস, সমর সেন, অপূর্ব চন্দ, বিষ্ণু, নীরেন, কিরণ মুকুজ্জে ও

হিরণকে দেখলাম। মনীশ ঘটক আমার পরে এলেন এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে।

অপূর্ব চন্দ কথা বলছিলেন। কোনো-এক ব্যক্তি পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনে ঢুকে কেমন করে দেড় হাজারের কোঠায় উঠে যায় সেই নিয়ে আলোচনার পরে চন্দ সাহেব ফজলুল হক-এর সাম্প্রতিক ঘোষিত উক্তিতে এসে গেলেন। বললেন তিনি সরকারি খরচে সিমলা হয়ে লণ্ডনে যাবার মতলবে আছেন। সাহেদের ভাই সাহিদ-ও সঙ্গে যাবেন। মুশকিল হবে যদি গভর্নর সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেস গভর্নর-এর ক্ষমতাকে নীতিগতভাবে বর্জন করতে চায় অথচ এ ক্ষেত্রে খুশি হবার কথা। কংগ্রেসের কথায় তাঁর মনে পড়ল সুভাষ সম্বন্ধে তাঁর বউদির লেখা একটি চিঠির কথা।

সুধীন্দ্র বললেন, সুভাষ সম্বন্ধে কোনো কথায় নীরেন আর আমি বিশ্বাস করি না—আমরা ঘটনা দিয়ে দেখি।

চন্দ সাহেব তাঁর কথা কানে না তুলে বলে গেলেন। এক শিক্ষকের কথা। নোটস-এর বই নিয়ে নাকি পরীক্ষার হলে ঢুকেছিলেন। নীরেন এবার নীরব থাকতে না পেরে বললেন, শিক্ষক হলেই সে সমাজের বাইরে পড়ে না। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সামান্য স্কুল পর্যন্ত সব প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে একই সমাজভুক্ত। সবই যখন দূষিত, যখন মুনাফা করে নেওয়া হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন শিক্ষক মাত্রই যে আদর্শ-চরিত্রের মানুষ হবে সে আশা করা অন্যায়।

২০ মে

আজও পরিচয়-এর বৈঠকে ভিড় হয়েছিল। যামিনী রায় নীরেনকে বলছিলেন নন্দলাল ও অবনীন্দ্রনাথ মহৎ শিল্পী হতে পারেন নি, তার কারণ মনের পরিণতি ও প্রস্তুতি সত্ত্বেও তাঁরা ভুল টেকনিক অনুসরণ করেন। সুধীন্দ্র ও প্রবোধ বাগচী দুজনেই সে মন্তব্য সমর্থন করতে নীরেন বললেন, এঁরা দুজনেই মহৎ ছবি এঁকেছেন, সুতরাং টেকনিকে কিছু এসে যায় না। তাঁর মতে শিল্পবস্তু যথার্থ মহৎ বলে স্বীকৃত হলে সৃষ্টির পদ্ধতির কথা অবান্তর।

সুধীন্দ্র প্রশ্ন করলেন, কোন ছবির কথা বলছেন? নীরেন বললেন, 'লষ্ট কাও' আর প্রশান্তর ঘরে যে ছবি আছে। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথের 'অশোকের বানী' ছবির উল্লেখ করলেন। আরও বললেন নন্দলাল-এর আঁকা কুরুক্ষেত্রের দুই জোড়া পা-ও বিশেষ আকর্ষণীয় ছবি।

সুধীন্দ্র হেসে বললেন, এগুলো সবই হচ্ছে কোনো ঘটনাকে বিবৃত কবা ছবি। সমালোচকেবা যাকে বলে 'লিটাবাবি আর্ট'। তিনি বলে গেলেন, প্রশান্তব বাড়িব ঐ ছবিব বেখা এত ক্ষীণ যে খুব কাছে না গেলে দেখাই যায না—তাব মানে শিল্পী একটানে অন্তবেব ভাবকে বাব করে আনেন নি —অনুপ্রেবণাব প্রবল তাডনা ছিল না সে বেখাব পিছনে। ও ছবি হচ্ছে অলংকাব জাতীয। অন্য যে-ছবির কথা বললেন সেগুলো গল্পেব মাধ্যমে দর্শকেব হৃদয স্পর্শ কবে, সৃষ্টিব প্রভাবে নয়। যামিনী বায সেই কথাই বলতে চেযেছিলেন, কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এবাব খাডা হযে বসে বললেন, ঠিক কথা, আমাদেব দেশে বেশিব ভাগ ছবি পৌবাণিক গল্প অবলম্বন কবে আঁকা হযে থাকে। সে সব ছবিব বর্ণনা মহাকাব্যের শ্লোকে বা পববর্তী যুগেব বড কবিদেব বচনায প্রকাশ হয়েছে। সেই প্রভাবে ছবি আঁকতে গেলে সে ছবি যে দ্বিতীয শ্রেণীব শিল্পবস্তু হযে দাঁডাবে তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পাবে না।

নীবেন যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে কোমবে হাত দিযে বলে উঠলেন, আপনি বলতে চান যুবোপীয চিত্রকবেবা বিষয-প্রসঙ্গ থেকে অনুপ্রেবণা পায না।

সুধীন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে বললেন, নাম করুন একটা ছবিব।

কেন? সমস্ত ইটালিযান স্কুলেব ছবিই তো ধর্মীয সাহিত্যে অনুপ্রাণিত —উত্তব দিলেন নীবেন। আব কে বললেন, 'ম্যাডোনা'।

সুধীন্দ্র বললেন, সেটা হচ্ছে মা ও ছেলেব কনসেপসন—যদি তাকে ধর্মও বলা যায, তাহলেও মোদ্দা কথা হচ্ছে সেটা সাহিত্য নয। প্রতিটি শিল্প-প্রকাশেব মূলে বিশ্বাসেব ভূমিকা যে বড সেকথা অনস্বীকার্য কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি পৃথক কবে দেখালেন সাহিত্যেব প্রভাব হচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা। সুধীন্দ্রব যুক্তিতে কোনো গলদ আছে বলে মনে হল না।

হিরণ এখন এলেন। তর্কেব বিষযবস্তুটি ওঁব প্রিয এবং চট কবে বুঝে নিযে আসবে নামলেন—তাঁব প্রথম প্রশ্ন হল 'লাস্ট সাপাব' ছবিটা কী?

এবাব তর্ক সপ্তমে উঠল। কিছুটা উত্তাপও সঞ্চাবিত হল এবং সুধীন্দ্রকে একাধিকবাব বলতে শোনা গেল, 'হাবল, ইযু আব টকিং ননসেন্স।'

হিবণ অবশ্য সুধীন্দ্রব উষ্মা গাযে মাখেন না। ববং নিজের বক্তব্যকে আবও সবস কবে ব্যক্ত করেন।

আমাব মনে হল দুটি যুক্তিব মধ্যে তফাতটা এতই সূক্ষ্ম যে উত্তাপটা বাহুল্য। প্রথম দিকে সাহিত্য কথাটিব অর্থ-নির্ধাবণে কোনো গোল

বাধে নি কিন্তু পরে দেখা গেল কল্পনার প্রসারে অতিরিক্ত গুণ প্রযুক্ত হয়েছে।

যামিনীবাবুর একটি যুক্তি কেউ খণ্ডন করলেন না। তিনি বললেন, টেকনিকের যে-দোষের কথা বলছিলেন সেটা হচ্ছে সত্য ও কল্পনার সংমিশ্রণ। এর বৈফল্য অনেক সময়ে হাস্যকর রূপে প্রকট হয়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ দেখালেন নন্দলাল-এর 'মহাদেব'। শিল্পী ভূমির উপর যে শিলাখণ্ড আঁকলেন সেটা হচ্ছে বাস্তব কিন্তু যে দেবতা তাঁর তুলির অগ্রে বার হলেন তিনি হলেন একেবারেই কল্পনায় গড়া অবাস্তব। ছবিতে দেখেন কানের কুণ্ডল অতি সযত্নে সঠিক আঁকা অথচ অঙ্গবস্ত্রে কোনো ভাঁজ বা ছায়া নেই। বিভ্রান্ত হয়ে অবনীবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেলেন। তাঁর প্রশ্ন ছিল ছবি থেকে যদি দেশ ও কাল নির্বাসিত হয় তাহলে নিত্য দেখা দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রব্য-সামগ্রী কেমন করে ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাকে অর্ধেন্দু গাঙ্গুলীর কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনিও বোঝাবার চেষ্টা না করে অনেকগুলি গ্রন্থের নাম লিখে নিতে বলেন, তারপর উপদেশ দেন কোনো সুযোগে রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে তাঁর মতামত শুনে নিতে। মোট কথা, এত বড় সমালোচক ও চিত্রকর তাঁর সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হন। এবার যামিনীবাবু একটু থেমে হিরণকে প্রশ্ন করলেন—আপনার কি মনে হয় নন্দবাবু শান্তিনিকেতনের ছেলেদের পাতা আর গাছ আঁকতে শিখিয়ে উঁচুদরের শিল্পীতে পরিণত করতে পারবেন। গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র মাত্রই পাতা আঁকতে পারে।

হিরণ-এর ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝলাম একটা চোখা উত্তর তৈরি হয়েছে কিন্তু ঠিক সেই সময় সাহেদ এসে গেলেন এবং গিরিজাপতি খবর দিলেন যে সাহেদ-এর একজন ভক্ত তাঁকে সুরভারতী আখ্যা দিয়েছে।

সাহেদ আমাদের এক মজার গল্প বললেন। লণ্ডনের এক ধনীগৃহে নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলে বাটলার সমবেত অতিথিদের শুনিয়ে নাম ঘোষণা করে মিস্টার 'সোডা-ওয়াটারি' এসেছেন। তারপর একের পর এক বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়। প্রথমে পা হড়কে সটাং পড়ে গেলেন। মহিলারা ভদ্রতা করে হাসি চেপে যাওয়াতে তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। তারপর দেখেন ড্রেস স্যুটের প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে ছিটকে পড়েছে।

ভেবেছিলাম হাসির হুল্লোড় কমলে চিত্রকলা সম্বন্ধে বিতর্কে সাহেদের মতামত শোনা যাবে, কিন্তু মনীশ ঘটক এক তরুণ বন্ধুকে নিয়ে ঢুকলেন।

নবাগতর পরনে খাকি কোট, মুখে পাইপ।

হারীতকৃষ্ণ তাঁর পাশের লোকের কোনো কথার অশ্লীল-ঘেঁষা দ্ব্যর্থক অর্থ করে সুধীন্দ্রকে চটিয়ে দিলেন।

মোট কথা আসর আর জমল না। বিষ্ণু পাশে বসেছিলেন, বললেন, আমার এবারের সমালোচনা খুব পরিষ্কার হয় নি। কোথায় বেধেছে প্রশ্ন করে উত্তর পেলাম না।

মোনালিসা

পূর্ণেন্দু পত্রী

৮

দুর্ভাগ্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে লিওনার্দোর জীবনে। আর সারা জীবনটাই তাঁর অকৃতকার্যতায় ভরাট। যখন যা করতে চেয়েছেন, হয়নি। যখন যে কাজে মগ্ন হয়েছেন, অসমাপ্ত। যতদিন মোনালিসা ছিল, মেতেছিলেন এমন এক সৃষ্টিতে, মনে হয়েছিল এটাই হবে তাঁর জীবনের সেই কাজ, যা সমাপ্ত এবং সম্পূর্ণ। মোনালিসা মৃত। লিওনার্দো আর সে-ছবির দিকে তাকান না। ঢাকা পড়ে আছে কফিনের ডালার মতো শক্ত আচ্ছাদনের আড়ালে। মোনালিসার মতো, লিওনার্দোর কাছে, তার প্রতিকৃতিও মৃত্যুর মতো সুদূর এবং ধূসর এখন।

যতক্ষণ মোনালিসা ছিল, নিজের অকৃতকার্যতাকে ভুলে ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের অচরিতার্থতাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার পক্ষে উপযোগী একটা দোলনা খুঁজে পেয়েছিলেন যেন এই কটা বছর। মোনালিসা-র প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে লিওনার্দোর বুকের গভীর কোটর থেকে ঘুমনো সাপগুলো জেগে উঠেছে এখন। যখন যে-বাতাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, মনে হয় ঘূর্ণি। আর সত্যি সত্যিই এক ঘূর্ণি-মাতন জেগেছে তখন বাতাসে, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা-কলঙ্কের, নিন্দা-অপবাদের ধুলো উড়িয়ে। ফ্লোরেন্সের অলি-গলি-রাজপথে লিওনার্দোই যেন এখন একমাত্র আলোচ্য। ফ্লোরেন্সের অলি-গলি-রাজপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আর কেউ মাথা নুইয়ে সম্মান জানায় না লিওনার্দোকে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সংখ্যা, এক নয়, একাধিক। তাঁর অপরাধের মাত্রা বোঝাতে গেলে নদী ছেড়ে যেতে হবে সাগরে।

পিসা থেকে আর্ণোকে আলাদা খাতে বওয়াবার জন্যে যে-বৃহৎ খাল খোঁড়া হচ্ছিল, আর লিওনার্দোই ছিলেন যার প্রধানতম পরামর্শ-দাতা, সে পরিকল্পনা শুরুতেই ব্যর্থ। হেমন্তকালীন বর্ষণের জলোচ্ছ্বাসে, যতখানি কাজ এগিয়েছিল, ধ্বসে ভেসে ভেঙে একাকার। অসংখ্য মানুষের

শ্রম, অপরিমিত অর্থ, আর অসংখ্য শ্রমিকের জীবন, সবই এখন জলের তলায়।

সের পিয়েত্রো, যার জারজ সন্তান লিওনার্দো, মারা গেছেন দু বছর আগে, ৮০ বছর বয়সে। মৃত্যুর আগে, নানা সময়ে এবং বহুবার তিনি জানিয়ে গেছেন তাঁর অভিপ্রায়—অন্যান্য ছেলেদের মতো লিওনার্দোও পাবে সম্পত্তির অংশ। আর্থিক দুর্দশার দিনে লিওনার্দো জনৈক সেয়ানা হিব্রু সুদখোরের কাছ থেকে টাকা কড়ি ধার করতেন অদূর ভবিষতে মৃত পিতার সম্পত্তির পাওনা-অংশকে জামিন রেখে। হঠাৎ একদিন সেই হিব্রু সুদখোর এসে বললে—তোমার সম্পত্তি আমার নামে লিখে-পড়ে দাও। কোর্ট-কাছারি আর ভায়েদের সান্নিধ্য—দুটোকেই যমের মতো ভয় পান লিওনার্দো। তাই বাধ্য হয়েই রাজি। অমনি ঘি পড়ল মরা আগুনে। ভায়েরা বুঝে গেছে লিওনার্দো এখন আর আগের মতো সম্মানিত নন। লোকে তাঁর আচার-আচরণে বিরক্ত। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েই তারা দু হাতে আর দশ মুখে ছড়াতে লাগল কুৎসার কাদা। সে কুৎসাগুলো এইরকম—

১. লোকটা অধার্মিক।

২. লোকটা রাষ্ট্রদ্রোহী। যুদ্ধবাজ সিজার বর্জিয়া-র সামরিক বিভাগে চাকরি নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নিজের জন্মভূমির প্রতি।

৩. লোকটা যাদুকর, ডাকিনী-বিদ্যা জানে।

৪. লোকটা খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা হেনে কবর খুঁড়ে তুলে এনেছে মরা মানুষ, এ্যানাটমিক্যাল ডিসেকশানের জন্যে।

এর পরও আছে। যে-অপবাদ ২৫ বছর আগে চাপা পড়ে গিয়েছিল বিস্মৃতির তলায়, কবর খুঁড়ে সেই মৃতকেই পুনরুজ্জীবিত করে, তার পুতি-গন্ধটাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল বাতাসে।

"They even resurrected the slander which had been buried twenty-five years ago, concerning his unnatural vices; they dishonoured the memory of his dead mother, Caterina Accattabrighe."

লিওনার্দোর মা ছিল ষোলো বছরের চাষির মেয়ে। সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে সের পিয়েত্রোর কাছে দুধের ছেলেকে বেচে এক চাষির ছেলেকে বিয়ে করে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।

অপবাদ-অপমানের তালিকাটা এইখানেই ফুরলো না। এর সঙ্গেই যোগ হল, কাউন্সিল হলের মুরাল 'ব্যাটেল অব এ্যানঘিয়ারী' যথাসময়ে শেষ করে উঠতে না পারার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। এমন কি প্রকাশ্যে জানানো হল, অগ্রিম হিসেবে প্রচুর টাকা নিয়েও যথাসময়ে কাজটা শেষ না করাটা রিপাবলিকের প্রতি এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। এক বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করে লিওনার্দো ছুটে গেলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। অগ্রিম হিসেবে আমি যা নিয়েছিলাম সেটা ফেরত নিন। কর্তৃপক্ষ কর্ণপাতহীন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, এমন অপমানিত হয়েও ম্যুরালটা শেষ করতে পারলেন না বা চাইলেন না কেন? এর সদুত্তর পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে এই মানুষটির একেবারে মর্মমূলে, যেখানে অবিরল স্পন্দিত হয়ে চলেছে এক অনিঃশেষ কাতরতা, পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে জানার, অন্বেষণের আবিষ্কারের আগ্রহে। আর সব কিছুই তার জানা চাই পুঙ্খানুপুঙ্খ। নিজের নোটবুকে তাই তিনি লেখেন:

'Abreviation do harm to knowledge and to love...of what use, then, is he who abridges the details of those matters of which he professes to give thorough information, while he leaves behind the chief part the things of which the whole is composed ?'

তিনি ছাড়া, পৃথিবীর আর কোন্ শিল্পী সমকালীন কোনো এক রাষ্ট্রনায়কের উদ্দেশ্যে লিখতে পেরেছেন:

'শত্রুকে আক্রমণ, অথবা শত্রুর আক্রমণের সময় পিছুহাটার পক্ষে উপযোগী স্থানান্তরের পক্ষে সহজ এমন হালকা সেতু তৈরি করতে পারি আমি। আবার এমন সেতুও বানাতে পারি, আগুনও পোড়াতে পারবে না যাকে। ঘেরাও বা দখল করার সুবিধের জন্যে আমি পরিখা থেকে জল সরিয়ে ফেলার কৌশল জানি। জানি আরও নানান ধাঁচের মই বা অন্যরকম সব যন্ত্র বানাতে।

আমি এমন বোমা তৈরি করতে পারি যা ছুঁড়লে শত্রুদের ওপর টুকরো-টুকরো অস্ত্র-বৃষ্টির মতো ঝরে আর ঘন ধোঁয়ার জাল ছড়িয়ে আতঙ্কিত করে তুলবে শত্রুপক্ষকে।

আমি নিঃশব্দে পথ বা পরিখা খোঁড়ার কৌশল জানি। আর যে কোনো জায়গায় পৌঁছতে পারি—নদীর তলায় সুড়ঙ্গ কেটে।

আমি তৈরি করতে পারি এমন গাড়ি, যা শত্রুপক্ষের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ব্যূহকেও ভেদ করতে পারবে সহজে, আর সেই যানের পিছন পিছন পদাতিক বাহিনী শত্রু-শিবিরের মুখোমুখি গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে। যুদ্ধে যে-সব অস্ত্র সাধারণত ব্যবহার হয়, তার চেয়ে অনেক সুন্দর আর দরকারি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারি আমি। যুদ্ধ যখন জলপথে, তখন আক্রমণ আর আত্মরক্ষা দুটোর জন্যেই অনেক রকম অস্ত্র বানানো আমার পক্ষে অসম্ভব নয়। বারুদ আর বাতাস দিয়ে আমি ধোঁয়ার পর্দা তৈরি করতে পারি প্রয়োজনের মুহূর্তে।

শান্তির সময় আমি তৈরি করতে পারি পৃথিবীর যে-কোনো স্থাপত্যের সমকক্ষ স্থাপত্য। এ ছাড়াও পারি মাটি, ব্রোঞ্জ বা পাথরের ভাস্কর্য গড়তে। চিত্রাঙ্কনে আমার পারদর্শিতা পৃথিবীর যে-কোনো শিল্পীর সঙ্গে তুলনীয়।

এসব অসম্ভব মনে হলে আপনার আদেশে যে-কোনো জায়গায় আমি পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত।'

দিনের পর দিন তিনি ঝুঁকে থাকেন ফুলের ওপর। পাপড়ির গড়ন, রঙের বৈচিত্র্য, স্তরে স্তরে তাদের ফুটে ওঠার দিকে তাঁর দৃষ্টি ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির।

দিনের পর দিন তিনি ঝুঁকে থাকেন নদীর উপর। নদীর উৎস মুখ, বাধা পেলে নদী কেমন ভঙ্গিতে বদলায় তার গতি, জলরেখার গতি কত রকমের, প্রলয়ের মুহূর্তে তার ছোবলগুলোর আকৃতি হয়ে ওঠে কেমন ক্রুর, এর প্রত্যেকটি পর্বকে তিনি পর্যবেক্ষণ করে যান পলকহীন।

দিনের পর দিন, এইভাবেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে পাহাড়ে-পাথরে, উড়ন্ত পাখির ডানায়, আলোর চলাফেরায়, বাতাসের গতিবেগে, মেঘের আকৃতি বদলে, আর মানুষের মুখে, এমন কি যে মানুষ চলেছে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে, যে মানুষ করবে ঘুমন্ত। মানুষের অস্থি-মজ্জা, মানুষের শিরা-উপশিরার সংস্থান, শিরায় শিরায় রক্তের চলাচল, মাতৃগর্ভে কেমন করে পরিণতি পায় শিশু, এসবও তাঁকে জানতে হয় নিজস্ব তাগিদে। নিজের হাতে কাটতে হয় মৃত মানুষ। তাঁকে তাকাতে হয় গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে। আর নিজের নোটবুকে, কোপারনিকাশ কিংবা গ্যালিলিওর অনেক আগেই, লিখে রাখেন, 'সূর্য স্থির, তার গতি নেই'। তিনি নিঃসংকোচে ঘোষণা করেন, পাখির মতো, যন্ত্রের পাখিও একদিন উড়ে বেড়াবে আকাশে।

'He was not content to record how a thing worked, he wished to find out why. It is this curiosity which transfor-

med a technician into a scientist. We can watch the process at work in the manascripts. First, there are questions about the construct of certain machines, then, under the influence of Archimedes, questions about the first principles of dynamics, finally, questions which had never been asked before about winds, clouds, the age of the earth, generation, the human heart. Mere curiosity has become profound scientific research, independent of the technical interest which had preceded it. In this gradual change of attitude towards the objects of his curiosity Leonardo preserved an unusual capacity of self-education.'

—Kenneth clark

লিওনার্দোর নোটবুকের পাতার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে লক্ষের দিকে। এ্যামব্রোসিয়ান লাইব্রেরিতে যে নোটবুক, তার পাতার সংখ্যা চারহাজার। ফ্রান্সের লাইব্রেরিতে, A থেকে K চিহ্ন দেওয়া তেরোটা নোটবুক। এ ছাড়া পকেট-বুকের মতো নোটবুক রয়েছে বেশ কিছু। আরো নোটবুক রয়েছে ভিকটোরিয়া এ্যাণ্ড এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে। এ ছাড়াও কিছু নোটবুক রয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, আর নানা ব্যক্তিগত সংগ্রহে। এমন, লিওনার্দো যে ম্যুরাল করার করণ-কৌশল জানতেন না, সেটা ভাবলে মূঢ়তাকেই মালা পরানো হবে। জেনেও, তাঁর অনুসন্ধানী-সত্ত্বা খুঁজে বের করতে চেয়েছিল ভিন্ন-জাতীয় মাধ্যম। আবিষ্কারের এই অপ্রতিরোধ্য নেশাই একবার তাঁকে আছড়ে ফেলেছিল সর্বনাশের পাথরে। সেবারের বিষয় ছিল 'দি লাস্ট সাপার'। সেবারেও প্রথাসিদ্ধ বা প্রচলিত পদ্ধতি ছেড়ে পা ফেলেছিলেন অন্য এক করণ-কৌশলের দিকে। প্রথাগতভাবে কাজের পদ্ধতি ছিল সদ্য প্লাস্টার লাগানো ঈষৎ ভিজে জায়গায় রঙকে ডিম ও আঠায় মাখিয়ে কাজ করা। জল রঙ। তাই তাড়াতাড়িই শুকিয়ে যেত সেটা। লিওনার্দো চাইলেন শুকনো জমিতে তেল রঙে কাজ করতে। 'দি লাস্ট সাপার'কে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি টিকিয়ে রাখা গেলেও, তার জেল্লা-জৌলুষ সবই প্রায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিবর্ণ। প্রথম বারে পরাজিত হয়েও লিওনার্দো তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়। আবার প্রায় একই পদ্ধতিতে শুরু করেছিলেন 'ব্যাটেল অব এ্যানঘিয়ার।' পরিবর্তনের মধ্যে ছিল, রঙের সঙ্গে তরল মোম মিশিয়ে

নেওযা। এঁকেও ছিলেন অনেকটা। কিন্তু বঙ শুকোতে দেবি হচ্ছে দেখে আগুনেব তাপ দিতে গিয়ে সমস্ত আঁকাটাই গেল গলে। ফ্লোবেন্সের মানুষ আরো একবার ক্ষুব্ধ হযে উঠল এক মহান সৃষ্টির অকালমৃত্যুতে।

লিওনার্দো বড ক্লান্ত। মনের মতই, শবীবও যেন আচ্ছন্ন সংগোপন কোনো বিষাদেব ভারে। ঘুমোতে চান, ঘুম আসে না। বই পডতে চান, হাত থেকে খসে পডে বই। ছবি আঁকতে বসেন, আঁকা এগোয় না। চতুর্দিকে ছডানো রয়েছে বই, এ্যাসট্রোনমি, ফিজিকস, হাইড্রোলিকস, অপটিকস্, এ্যানাটমিব যন্ত্রপাতি। লিওনার্দোব মনে হয, ওগুলো কোনো মৃত জীবের হাড-পাঁজর। আর কোনদিন ওদেব মধ্যে প্রাণ ফিরিযে আনতে পারবেন না তিনি। একদিন বাত্রে দুর্যোগেব দারুণ দাপাদাপি। নিঃসঙ্গতা যেন পাথরেব চেযে ভারি। যে ভাবে বৃষ্টি আর বরফের কুঁচি আছডে পডছে জানলাব কাচে, যেভাবে বাতাস তাব অমানুষিক কণ্ঠস্বরে হুমকি দিয়ে চলেছে অন্ধকাবেব ভিতব, লিওনার্দোর মনে হল, এব সঙ্গে সঙ্গতি রয়েছে তাঁব বর্তমানের। পৃথিবীব বিশৃঙ্খল উন্মাদনা এখন তাঁব এই অর্থহীন, সার্থকতাহীন, পবিণামহীন জীবনেবই উপযুক্ত উপমা।

ভারাক্রান্ত শবীবটাকে কোনমতে টেনে টেনে, একটা মোমবাতি হাতে নিযে, চললেন পাশেব ঘবেব দিকে। দবজা খুলে ঢুকলেন ভিতরে। তেপাযা ইজেলেব উপব পুরু আচ্ছাদনে ঢাকা একটা ছবি। আচ্ছাদনটা সবিয়ে নিতেই ছবিটা উঠল জেগে।

মোনালিসা গিওকোণ্ডাব ছবি।

লিওনার্দো জানতেন, ছবিটা কার। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁব মনে হল, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বমণীব সঙ্গে এই যেন প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ। আর সেই রমণীব সজীবতা, প্রাণবন্ত চাউনীর সামনে লিওনার্দো তৃণের মতো অবনত। ক্ষুদ্র আব ক্ষমতাহীন তাঁব অস্তিত্ব। তিনি ভুলে গেলেন যে, ঐ মূর্তিমতী তাঁব সৃষ্টি।

কবে যেন শুনেছিলেন এক অলৌকিক কাহিনী। কোনো এক আঁকা প্রতিকৃতির গাযে ছুঁচ ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গেই যার প্রতিকৃতি তাব মৃত্যু ঘটে। লিওনার্দোব ভাবনা ঠিক এব উল্টোটাই। যার প্রতিকৃতি, তাকে হত্যা কবেই যেন তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা কবেছেন এই ছবিতে। নইলে ছবির প্রতিকৃতি এমন জীবন্ত হয় কেমন কবে? যেন বক্তেব চলাচল প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তার গলায়। নিশ্বাসে ওঠানামা করছে বুক। ধীবে ধীরে লিওনার্দোর

মনে পড়তে লাগল পুরনো সব স্মৃতি। আর ধীরে ধীরেই বুঝতে পারলেন সারা জীবন ধরে যা কিছু অন্বেষণ করেছেন তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিতে, সব এসে মিলেছে এই একটি ছবিতে। **'the mystery of the universe was the mystery of Monalisa'.**

একটা সময় ছিল, যখন তিনি উঁকি মারতেন মোনালিসার গভীর অভ্যন্তরে। এখন ঘটছে তার উল্টোটাই। মোনালিসাই তার রহস্যময়ী হাসি, তার তেরচা চাউনী দিয়ে, নিরীক্ষণ করছে লিওনার্দোকে। কিছু যেন বলতে চাইল সে। কোন কথা? শেষ দেখার দিন একেবারে শেষ কথায় এসে সে জানতে চেয়েছিল পৃথিবীর অনির্বচনীয় রহস্যকে জানতে গেলে শুধু কি কৌতুহলেই কুলোবে? এখন যেন সেই প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে এবং চোখে।

আমি যদি শুধুই কৌতুহলী দূরের দর্শক না হয়ে, আরও কাছে, আরও ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতাম, হয়তো বাঁচানো যেত তাকে। যতই আকস্মিক মনে হোক, ওর মৃত্যুটা যে ঘটবে, আমি জানতাম।

এখন বড় মৃত মনে হচ্ছে ওর চোখ দুটো। মৃত মনে হচ্ছে মোনালিসাকে। ঠাণ্ডা, হিম, ঝড়ের রাতের তুষারপাত, হাওয়া, অন্ধকার, বৃষ্টি, ঝড়ঝাপটা সবই যেন ঝেঁকে উঠছে ঐ মৃত চোখ, মৃত মুখের আদল থেকেই।

হাত কাঁপছে লিওনার্দোর। সমস্ত শরীর কাঁপছে। চৈতন্যও। এখুনি পড়ে যাবেন বুঝি। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবেন হয়তো। পায়ের তলা থেকে উপরে উঠে আসতে চাইছে শূন্যতার এক হিম হাওয়া।

লিওনার্দো হাত বাড়ালেন আচ্ছাদনের দিকে। এখুনি ছবিটাকে ঢেকে ফেলতে না পারলে তাঁর পরমায়ুর শেষ মুহূর্তটুকুও ঝরে পড়বে, এমনি ব্যস্ততায় লিওনার্দো মোনালিসার শরীর, মুখ, হাসি, হাত, রক্তস্রোত, আর চোখের নীল চঞ্চলতার উপর চাপিয়ে দিলেন সেই পুরু আচ্ছাদন। আর ঝোড়ো হাওয়ায় নিবু-নিবু দীপশিখাটি হাতে নিয়ে ফিরে চললেন নিজের শয্যার দিকে, যেখানে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে নিদ্রা নয়, নিরবচ্ছিন্ন জাগরণ, দুঃস্বপ্নে জড়ানো।

৯

দুরপনেয় দুঃস্বপ্নের মধ্যে অ্যাপেলিনেয়ারের একমাত্র সান্ত্বনা মারী লরেসাঁ। মারী-ই এখন তাঁর জীবনে 'ছোট্ট সূর্য'—**'little sun'**। মারী ছবি আঁকে।

সেলাই করে। অ্যাপেলিনেয়ার তাকে উৎসাহিত করেন প্রেরণা দিয়ে, ছবির ভুল ত্রুটি বাৎলিয়ে। মারী গান গায়। বন্ধুদের নিয়ে সেই গানে নিজের চ্যাপটা ফুসফুসটাকে ফুলিয়ে নেন অ্যাপেলিনেয়ার। মারী-র মা পছন্দ করেন না তাঁর বাড়িতে এইসব হতচ্ছাড়া যুবকের দাপাদাপি। হাল আমলের ছবি, যা নিজের মেয়েও আঁকছে আজকাল, তাঁর দু-চোখের বিষ। আর অপছন্দ অ্যাপেলিনেয়ারকে, মারীর বন্ধুদের মধ্যে যে ছেলেটা সবচেয়ে টগবগে। একবার তো ছুঁচে কালো সুতো পরিয়ে কাপড়ের উপর সেলাইও করেছিলেন নিগ্রো-নিগ্রো একটা মুখ। সেটা অ্যাপোলিনেয়ারেরই। তাঁর চোখে অ্যাপোলিনেয়ার নিগ্রোর মতোই। তবুও, মায়ের কড়া নজর এড়িয়ে, গোপন ভালোবাসাবাসি সরু ঝর্ণা থেকে উতল নদী হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পিকাসোই প্রথম প্রস্তাবক :

—তোমার জন্যে জোগাড় করেছি এক সুন্দরী সখী।

প্রথম আলাপ পিকাসোর দৌত্যেই, 'Volard'-এর দোকানে। রোগা, লম্বা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, ত্রিভুজ গড়নের মুখ, একটু বাঁকা জলজলে পটলচেরা চোখ। অ্যাপেলিনেয়ার আর সব জায়গায় সহজ, স্বচ্ছন্দ, আত্মবিশ্বাসী এবং অকুতোভয়। কিন্তু মেয়েদের মুখোমুখি যখন, বৃক্ষ হয়ে যায় বাঁকা-চোরা লাজুকলতা। আসলে, সেই কুড়ি বছর বয়সে, এ্যানি প্লাইডন নামের ইংরেজ তরুণীর সঙ্গে জীবনের প্রথম সোনালী রঙের ভালোবাসাবাসিটা অ-বনিবনার আগুনে পুড়ে তামাটে হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মেয়েদের সম্বন্ধে ফণীমনসার কাঁটার মতো ধবালো হয়ে উঠেছে তাঁর উদাসীনতা। বৈরাগ্যে মিশেছে বিদ্রূপ।

কিন্তু দিন-কয়েকের আলাপের পরই মারী যেন অ্যাপোলিনেয়ারের ভাঙা বাড়িটাকে সাজিয়ে দিলে ইমারত। আর নারী অথবা ভালোবাসা সম্পর্কে সেই বোবা মানুষটা হয়ে উঠলেন বাচাল। মারী তখন :

—'ছোট্ট একটা সূর্য। আমারই নারী-সংস্করণ। খাঁটি প্যারিসের মেয়ে বলতে যা বোঝায়, ও তাই। যেমন ঝলমলে, তেমনি রসিকা, আর হৃদয়বতী। আর প্রতিভাময়ী তো বটেই। অথচ যেন শিশুটি। ভাবতে পারো, ও যখন রু গ্র-তে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, বাগান পার হয় দুহাতে দড়ি নিয়ে স্কিপ করতে করতে।'

মারীকে যে আরো বেশি করে কাছের লোক মনে হয়, তার কারণ ওদের দুজনের জীবনেও খুব মিল। অ্যাপোলিনেয়ারের মতো মারীও

জারজ। তাদের দুজনেরই বাবা অজ্ঞাতনামা। অ্যাপোলিনেয়ারের মতো মারীরও মা-সর্বস্ব জীবন, আর দুজনেরই মাকে বড় ভয়।

এমন যে মারী, ব্যক্তিত্ব যার শিহরণময়, পবিত্রতা যার সৌরভ, পুরুষালি কিছু খুঁত সত্ত্বেও লাবণ্যে যায় ফরাসী মাদকতা, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার কিছুদিন পরেই, ক্রমশ সরে যেতে লাগল দূরে।

রু গ্র-এ অ্যাপোলিনেয়ারের নিজের ঘরে সেদিন বেশ কিছু বন্ধুর নিমন্ত্রণ। মারী এসে রান্না-বান্না করবে বিশেষ ধরনের খাবারগুলো। অ্যাপোলিনেয়ার সকাল থেকেই রান্নার জোগাড়-যন্ত্রে ব্যস্ত। বন্ধুদের সঙ্গে দু-দণ্ড কথা আবার রান্নাঘর। বেলা বাড়ছে। অথচ মারীর পৌঁছবার নামগন্ধ নেই। বন্ধুরা উস্‌খুস্‌। অ্যাপোলিনেয়ারের কপালে দুশ্চিন্তার থাক থাক ভাঁজ। অপেক্ষা যখন পৌঁছল চূড়ান্ত পর্বে, সার্ন ফের্ত, বন্ধুদের একজন, ছুটলো মারীর বাড়িতে। বাড়িটা কাছেই। মারী সেলাই করছিল একমনে। শান্ত। মুখের আনাচে-কানাচে কোথাও নেই কোনো রকম মানসিক তোলপাড়ের ছাপ। যাচ্ছ না কেন, প্রশ্ন করতে মারী যা বললে, ওদের প্রণয়-পর্ব যে চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে সেটা বুঝতে বাকি রইল না আর।

কেন ভাঙল? তার প্রধান কারণটা হল, মোনালিসা চুরির অপবাদে হাজত বাস। ম্যাদাম লবেসাঁর কাছে অ্যাপোলিনেয়ার আর কবি নন, কয়েদী, **'Jail-Bird'**

এরই কিছুদিন পরেই অ্যাপোলিনেয়ারের সেই গুমরোনো কান্নার বিখ্যাত কবিতা—'মীরাবো সেতু':

'মীরাবো সেতুর নীচে বয়ে যায় সেন্‌
কেন বারবার মনে পড়ে যায়
ভালবাসা নিয়ে সেদিনের লেনদেন।
বিষাদ থেকে কি সুখেরা জন্মাবেন?
এসো হে রাত্রি, প্রহর ধ্বনিত হোক
দিন চলে যাক, আমি একা রই শোক।'

মোনালিসা-প্রসঙ্গ কিন্তু অ্যাপোলিনেয়ারের মুক্তির পরও প্যারিসের বাতাসে মুছে গেল না একেবারে। ছাই-চাপা আগুনের মতো ধিকধিকিয়ে চলল তার গুঞ্জন। আর ক্রমশ সেটা হয়ে উঠল গোটা পৃথিবীর আলোচনার, রচনার, উদ্বেগের বিষয়। জর্জ হ্যোম জার্মানীর লেখক। **'Der Dieb'** নামে লিখে বসলেন একটা ছোট গল্প। একজন লোক মোনালিসাকে চুরি করে নিজের

বাড়িতে রেখেছে। এখন সে আর ছবিটার দিকে তাকাতে পারে না। মোনালিসার কাছে তাই তার অবিরল প্রার্থনা—দয়া করে বন্ধ করো আমার দিকে তাকিয়ে তোমার হাসি।

ম্যাকস জ্যাকব লিখলেন একটা সুর-রিয়ালিস্ট গদ্য-কবিতা। নাম 'L' Ame de la Joconde'। লা জোকাণ্ডে নামের একটা এ্যালার্ম ঘড়ি। এই ঘড়ির মধ্যে রয়েছে মোনালিসার আত্মা। চুরি করা ছবিটির গতিবিধির সঙ্গে তাল রেখে সে-ঘড়ির চলা-হাঁটা অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এক ব্যারনেসের শিয়রে তার আশ্রয়। ১৭ সেপ্টেম্বরের নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ ছেপে বেরোল মোনালিসা-অন্তর্ধানের সংবাদ। 'এম. অ্যাপোলিনেয়ার নামে একজন খ্যাতনামা রাশিয়ান লেখককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে।' কোথাও কোথাও প্রচার চলল যে লোকটা ইহুদী। অ্যাপোলিনেয়ারের ছোটভাই অ্যালবার্ট একবার প্যারিসে এসে 'L' Aurore'-র সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন :

—আমরা রোমান ক্যাথলিক। অভিজাত পরিবারের ছেলে। আমাদের পূর্বপুরুষ রাশিয়ান আর্মিতে কাজ করেছে। আমার মা লেখাপড়া শিখেছে রোমের 'Trinita dei Monti' নামের সেই কনভেন্টে, যেখানে ভদ্র পরিবারের মেয়ে ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

অ্যাপোলিনেয়ারের ধারণা, যেহেতু পোলিশ সেহেতু ইহুদী এইভাবেই ব্যাপারটা রটেছে। আর এ-সব রটনার পিছনে তার কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও অবদান যথেষ্ট।

১৯৪৫-এ Louise Faure-Favier লিখছেন :

'গীয়স অ্যাপোলিনেয়ার রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল সারা পৃথিবীতে। লোকে জানত মোনালিসা চুরি করেছে সেই-ই। এমনকি আজও প্যারিসের কিছু লোক সেটা বিশ্বাস করে। আর হতাশ হয়, যখন শোনে ঐ ব্যাপারের সঙ্গে আদৌ কোনো সম্পর্ক ছিল না তাঁর।' কিছু বন্ধু যেমন বিদ্বেষের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে পিছনে, কেউ কেউ তেমনি এগিয়ে এসেছে নিমগ্নকে ডাঙায় তোলার দরদে। আঁদ্রে বিলি তাদের একজন। Le Figaro দৈনিক-পত্রের সাহিত্য-সমালোচক। তিনি বুঝলেন অ্যাপোলিনেয়ারকে বাঁচাতে গেলে দরকার একটা পত্রিকার। সেই-ই হবে সম্পাদক। কাজের মধ্যে ডুববার সুযোগ পেলেই মনের ঘাগুলো শুকোবে। ফিরে আসবে উৎসাহ-উদ্দীপনার তোড়। বিলির নিজের কথায় :

'He was marked for life, and even the war; his courage, and his wound would never succeed in silencing certain persons who, out of ignorance, envy, stupidity, or self-interst, banded against him and continually attacked him as an artist and as a man. He was harassed by slanders to the end of his days ..'

পত্রিকার নাম দাঁড়াল, 'Le Festin d' Esope'। ১৯ ফেব্রুয়ারিতে বেরোল প্রথম সংখ্যা।

কয়েদী আবার চলল কবি হতে। আর এবার যেন নতুন চেহারার কবি। সমস্ত পুরনো ভাবনাকে ভাসিয়ে ফরাসী কবিতায় এক নতুন আলোর ঝলকানি তোলার জন্যে প্রস্তুত তিনি। তুলেও ছিলেন। কবিতাকে টেনে এনেছিলেন দৈনন্দিনে, রাস্তায়, অলিগলির বাঁকে, জীবনের প্রাত্যহিক সংলাপে, জীবনের গভীরতর অজানায়। আর সুখের কথা, প্রিয় প্যারিস থেকে বিতাড়িত হতে হয়নি তাঁকে। হয়তো বা সেই কৃতজ্ঞতাতেই ফরাসী সৈনিকের ইউনিফর্ম গায়ে এঁটে ছুটে গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে, জার্মানদের বিরুদ্ধে। বিদেশী হিসেবে প্রথমে হটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অ্যাপোলিনেয়ার চিৎকার করে জানিয়ে দিলেন, 'আমি ফরাসী নাগরিক'। আমৃত্যু ফরাসীই রয়ে গেলেন তিনি। ফরাসী শিল্প-সাহিত্যের অগ্রগতির এক বিশেষ পর্বের পথ-প্রদর্শকের সম্মান চিরস্থায়ী হয়ে রইল তাঁর জীবনে। মৃত্যুর পর, শোকগাথায় বন্ধু কবি Blaise Cendrars লিখলেন, গোটা প্যারিস এখন কথা বলে অ্যাপোলিনেয়ারের ভাষায়।

'They all speak the language of Apollinaire.'

১০

১৫১৫। ১ জানুয়ারি। মারা গেলেন ফরাসী-রাজ দ্বাদশ লুই। অপুত্রক। তাই জামাই, প্রথম ফ্রান্সিস নাম নিয়ে, বসলেন সিংহাসনে। আর সিংহাসনে বসেই যুদ্ধ। দখল করলেন হাতছাড়া হয়ে যাওয়া লোম্বার্ডি। রোমে থেকে আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই জেনে গিয়ে লিওনার্দো পা বাড়ালেন নতুন শাসকের রাজদরবারে। সেদিন চলেছে শাসকের প্রতি শাসিতদের সম্মান জ্ঞাপনের উৎসব। লিওনার্দোর আমন্ত্রণ জুটল একজন 'মেকানিক' হিসেবে। লিওনার্দো নতুন রাজাকে সম্মান জ্ঞাপনের জন্যে বানালেন একটা যন্ত্রের সিংহ। গোটা

রাজদরবার প্রদক্ষিণ করে যন্ত্রের সিংহটা এসে থামল রাজার কাছে। পা তুলে সম্মান জানাল রাজাকে। তারপর খুলে গেল তার বুক। সেখান থেকে ঝরতে লাগল ফরাসী দেশের সাদা লিলি। রাজা মুগ্ধ।

প্রথম ফ্রান্সিস পোপের কাজে আবেদন জানালেন বেশ কিছু বাছাই-করা পণ্ডিত আর শিল্পীকে ফ্রান্সে পাঠাতে। র‍্যাফেল এবং মাইকেলেঞ্জেলোকে পাঠাতে পোপ অসম্মত। ফরাসী-রাজ জানালেন, তাহলে লিওনার্দোকেই পাঠান। দক্ষিণা পাবেন ৮০০ ফরাসী রৌপ্যমুদ্রা, আ-কু। থাকার জায়গা Amboise শহরের কাছে Du Cloux নামের ছোট্ট দুর্গে। লিওনার্দো রাজি।

রাজি কেন-না জীবনের প্রায় শেষ পর্বে পা দিয়ে তিনি আরেকবার মাততে চান সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে। নিজের জন্মভূমিতে তিনি অনাহুত, অপমানিত। রোমের জীবন তাঁর কাছে অসহ্য। এই তো কদিন আগে ভাটিকানে পোপ দশম লিও-র দরবারে মাইকেলেঞ্জেলো প্রমাণ করে দিল যে আমি বিশ্বাস-ঘাতক। র‍্যাফেল আমার পাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে চলে যায়, সামান্যতম শ্রদ্ধা না জানিয়ে। প্রায় সকলের কাছেই আমি এখন মৃত, অস্তিত্বহীন। মাত্র কিছুদিন আগে দশম পোপ, আঁকতে দিয়েছিলেন সামান্য ছোট্ট একটা পেনটিং। আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম একটা বিশেষ ধরনের পিগমেন্ট আবিষ্কারে। তাই দেখে পোপ বটিয়ে দিলেন—এ লোকটাকে দিয়ে কিছু হবে না। হাসা-হাসি শুরু হয়ে গেল সারা তল্লাটে। কেউ কেউ কথাটাকে এমন ভাবে চালাচালি করল যার অর্থ র‍্যাফেল আর মাইকেলেঞ্জেলোর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাবাড় করে দিয়েছেন পোপ।

সেদিন রাত্রে লিওনার্দো নিজের ডায়েরিতে লিখলেন :

'অপমানিতের কাছে ধৈর্য শীতে কাঁপা মানুষের কাছে গরম কাপড়ের মতো। শীত যত বাড়বে, পোশাকও ততটাই বাড়াতে হয়। তাহলে শীত লাগবে না আর। ঠিক তেমনি, অবিচারের সময় বাড়াতে হবে ধৈর্য। অবিচার স্পর্শ করতে পারবে না তোমার হৃদয়।' জন্মভূমি ছেড়ে ৬৪ বছর বয়সে ফ্রান্সে পাড়ি দিতে রাজি হয়ে গেলেন লিওনার্দো। চিরপথিকের জীবনে জুড়ে গেল আর এক অভিযান। সঙ্গে পুরনো ভৃত্য ভিলানিশে, পরিচারিকা মাতুরিনা, ফ্রানসেসকো সেলজি আর অ্যাসট্রো দা পেরিতোলা। আর আঁকাজোকার জিনিসপত্র। আর? জীবনের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ, কিংবা জীবনেরই অংশ, মোনালিসার অসমাপ্ত ছবি।

রামকিঙ্কর এবং তাঁর কাজকর্ম

কে. জি. সুব্রহ্মনিয়ম

সদ্যপ্রযাত রামকিঙ্করের শিল্পসৃষ্টি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে গেলে স্মৃতি-চারণা এড়ানো মুশকিল। বিশেষত শিক্ষক এবং বন্ধু হিসেবে আমাদের কারও কারও ওপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল যথেষ্ট। তিনি আমাদের কাজ শিখিয়েছিলেন, সেইসব কাজে উৎসাহ দিয়ে অনুপ্রাণিত করেছিলেন; এবং সর্বোপরি তিনি নিজেই তো ছিলেন একটি মূর্তিমান আদর্শ। আমরা যখন নতুন কলাশিক্ষার্থী ছিলাম তখন আমাদের কল্পনাপ্রবণ মনে শিল্পীর একটা ভাবমূর্তি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সেটি এরকম, শিল্পী হবেন তন্ময় বা ভূতগ্রস্ত। তারই সাদৃশ্য খুঁজতাম বাস্তব জগতে। যাঁদের দেখা পেয়েছিলাম তাঁদের মধ্যে এই ছবিটা পেতাম না। তাঁরা যেন বড় বেশি আত্মসচেতন, বিন্যস্ত, সম্বৃত, বড় বেশি পেশাদারি কিংবা বেশ নাটকীয় রকমের উৎকেন্দ্রিক আর নয়তো মেয়েলি ধরনের। কিন্তু যখন আমরা শান্তিনিকেতনে এলাম তখন তিনজন শিল্পীকে দেখেছিলাম, যাঁরা আমাদের অন্বিষ্ট শিল্পীর কল্পনাকে ছুঁতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে রামকিঙ্করই বিশেষভাবে আমাদের তরুণ চৈতন্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন। কারণ নন্দবাবু আর বিনোদবাবুর মতো তিনি নিভৃতচারী ছিলেন না, বেশ সহজগম্য আর বহির্মুখী। তিনি ছিলেন আ-মর্ম শিল্পী, কোনরকম মেকি ব্যাপার তাঁর মধ্যে ছিল না। যা দেখতেন তাতেই মেতে উঠতেন, এবং এই মত্ততায় তিনি ছিলেন অনুক্ষণ আক্রান্ত। কর্মরত অবস্থায় তাঁকে দেখাটাও এক মস্তবড় শিক্ষা। কিংবা আমরা যখন কেউ-কেউ দুপুরের খুব রোদ্দুরে খোয়াই পেরিয়ে তাঁর সঙ্গে স্কেচ করতে যেতাম তখন এই সহযাত্রাও ছিল একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার। আমার মতো একজন তরুণ শিক্ষার্থীর চোখে, যার শৈশব কেটেছে কেরালায়, তখনকার শান্তিনিকেতনের নিসর্গ ছিল মর্মান্তিক রিক্ত, ফাঁকা। আমি তো ভেবেই পেতাম না আঁকার মতো বস্তু এর মধ্যে কি আছে। পরে দেখলাম, আছে। কেউ কেউ তা খুঁজে নিতে পারে। স্কেচপ্যাডটি নিয়ে রামকিঙ্কর যখন বসতেন, তখন যে কোনো একটা সাধারণ তুচ্ছ দৃশ্যও অন্যরকম হয়ে যেত। প্রতিটি ছোটখাট খুঁটিনাটিও কেমন প্রাণস্পন্দিত

হয়ে উঠত। একটা সাদামাটা সামান্য গাছ যেন স্ফূর্তিতে ফুঁসে উঠত, তার পাতাগুলোয় উদ্‌ভাসিত হত নতুন চেকনাই আর সজীবতা। ঊষর মাটির সঙ্গে আকাশ লুকোচুরি খেলত। কখনও ঝুঁকে আসত একটুকরো নীল নিয়ে, কখনো-বা ধূসরিমার আড়ালে সরে যেত। অত্যন্ত প্রামাণিক হয়ে ধরা দিত বিভিন্ন ঋতুর চরিত্র। তাঁর সাহচর্যে আমরা প্রকৃতিকে নতুন করে দেখতে শিখলাম। তাঁর কথাবার্তা অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করত। শিল্প ও জীবন, রচনার পদ্ধতি, তার উদ্দীপন ও ব্যর্থতা নিয়ে তাঁর চিত্রল পর্যবেক্ষণ আমাদের চোখ খুলে দিত। এর ভেতর দিয়েই তিনি তুলে ধরতেন জীবন-বীক্ষার একটা রূপরেখা যা একদিকে প্রাতিস্বিক, অন্যদিকে উদার।

এইরকম বেড়ানোর ফলেই সম্ভব হয়েছিল অজস্র গোছাগোছা ড্রইং। আর এটাই ছিল তাঁর প্রায় দৈনন্দিন কৃত্য। চারবছর আমি তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। তখন তিনি রোজই একটা করে জলরঙা ছবি শেষ করতেন। ইতিমধ্যে প্রথম জীবনের আঁকা ছবিগুলি তো স্তূপ হয়ে পড়েছিল। মধ্যপঞ্চাশ পর্যন্ত এই হারেই তিনি কাজ করতেন, এমন বিশ্বাসের সঙ্গত কারণ আছে। এমন কি শান্তিনিকেতনের বাইরে ছোটখাট ভ্রমণে কি ছুটি কাটাতে কোথাও গিয়েছেন, সে কাঠমাণ্ডু, শিলং, রাজগীর, ভিমবাঁধ, বৈদ্যনাথ, গয়া, পুরী যেখানেই হোক, ফিরে এসেছেন রাশিরাশি ড্রইং আর জলরঙা ছবির বোঝা নিয়ে। এইগুলি ছিল তাঁর একরকম দিনলিপিই। এ-সবের মধ্যেই তিনি ধরে রাখতেন বিভিন্ন মেজাজ, সম্ভাব্য কোনো রচনার খশড়া, আঁকাকালীন কোনো ছবির বিশ্লেষণ আর পুনর্বিবেচনা। আজ তাদের কয়েকটি মাত্রই দেখা যাবে। অধিকাংশই এতদিনে হয় বিক্রি নয়তো দানসত্র হয়ে গেছে। এইসব ছবি একসঙ্গে পাওয়া গেলে তার ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে একটা চমৎকার শিল্পাবয়ব।

এমনকি তাঁর একেবারে প্রথম দিকের পেন্সিল আর ক্রেয়নে আঁকা যেমন ড্রইং দেখেছি তার মধ্যেও একটা নিজস্ব ছন্দোময় প্রাণবন্ত ভাব ছিল। তিনি ছিলেন স্বজ্ঞাপ্রণোদিত শিল্পী ; যে কোন দৃশ্যে তিনি সঙ্গেসঙ্গেই হয়ে উঠতেন প্রতিক্রিয়াময়। শিকারী জানোয়ারের মতোই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন তিনি। উপমাটা তাঁর নিজের, আবার, প্রায়ই যাঁর কথা তিনি বলতেন, সেই রবীন্দ্রনাথেরও হতে পারে। একদা ইনিই তাঁকে এই তত্ত্বে মজিয়ে ছিলেন যে, হাতের সামনে পড়ে থাকা কাজের জন্যে দরকার একটা একরোখা আক্রমণাত্মক ভাব পোষণ করা। এরই ফল হচ্ছে তাঁর ঘনপিনদ্ধ স্পন্দিত

চিত্রকল্পগুলি। অনেকেই জানেন, নন্দবাবুর ড্রইংগুলোয় একটা ঋজু টানটান ছন্দের কাঠামো রয়েছে এবং সেইজন্যেই তাঁর অনেক কাজে দেখা যাক এক লিপিচিত্রশোভন প্রমিতি। এই ছন্দোময় গঠনের দিকে রামকিঙ্করের ঝোঁক তাঁকে আরও দূরে, দিগন্তচারী, করে তুলেছিল; প্রান্তরব্যাপ্ত সমগ্র চিত্র-রূপের এক ধরনের কিউবিস্ট বিশ্লেষণে তাঁকে প্রণোদিত করেছিল। এই গোত্রের ছবির সবচেয়ে পুরনো উদাহরণ সম্ভবত মধ্য-তিরিশের দিকে আঁকা শাদাকালো ড্রইংগুলোয়। এতে দেখব, পাখিরা ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঝোঁকটা পাখির ওপর ততটা নয় যতটা ওড়া এবং এই উড়াল দেওয়ার ছন্দিত আবহের দিকে। কোনটার দেখব সরাসরি গৃহের প্রেক্ষিতে পাখিদের উড়ে যাওয়া। এতে স্থিতির পাশাপাশি গতিই যেন লীলাময়। আবার কোনটায় বৃক্ষসমূহের মাঝখানে কয়েকটি বাড়ি। এই পর্যায়ের পরবর্তীকালে কি ড্রইং, কি পেইন্টিং, কি ভাস্কর্যে একটা কিউবিস্ট ধরন আমরা লক্ষ করে থাকি। কিন্তু এই বিশিষ্টতা স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। কিউবিস্ট রীতির মৌল বিধানের সঙ্গে তাঁর চিত্রভঙ্গির কোনো মিল পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ বলতে পারেন, এই বিশেষ শৈলী তো দৃশ্য আর স্থানের বহুধাবিভক্ত প্রেক্ষণের সঙ্গেই যুক্ত। যে-সমস্ত উপাদানে দৃশ্য ও স্থানের সমবায় ঘটে তাদের বিশ্লেষণ শুরু হয় এই দুটি বাস্তব সম্পর্কনির্ণয়ের পরই। এবং পরে কোন বিশেষ দৃশ্যে বা স্থানিক চিত্রকল্পে এইসব উপাদানগুলির পুনর্বিন্যাস ঘটে। পূর্ববর্তী দৃষ্টি-গ্রাহ্যতার কার্যকারণবিধির জায়গায় নতুন একটা ন্যায় তৈরি হয়ে যায়; আর এভাবে একটা ভিন্নতর অভিব্যক্তি বা মাত্রা সংযোজিত হয়। যদিও কেউ কেউ জানেন, রামকিঙ্কর পিকাসোর মতো মৌলিক কিউবিস্ট শিল্পীর কাজের বিষয়ে বিলক্ষণ অবহিত এবং তাঁর অনেকানেক কাজে যে ধরনের প্লাসটিক বৈপরীত্য কিংবা আমূল অতিকৃতি দেখা যায় তার সঙ্গে পিকাসোর সাদৃশ্য মেলে, তবুও তাঁর কর্মকাণ্ডের বেশ খানিকটা অংশেই দেখা যায় যে, কিছুটা নিজের মতন করেই তিনি কিউবিজম ও তার পূর্ববর্তী বিভিন্ন রীতির পাঠ কাজে লাগিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত এটাও বিবেচ্য, শান্তিনিকেতনের প্রথম দিকের চিত্রীরা কবে এবং কতটা আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। জানা যায়, অন্তত দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে ড: স্টেলা ক্রামরিশ শান্তি-নিকেতনে এসে তদানীন্তন নতুন শিল্পীদের (যাঁদের মধ্যে রামকিঙ্কর অন্যতম) য়ুরোপের কলাজগতের হালচাল সম্পর্কে অবহিত করার সময় এই পরিচয়ের

সূত্রপাত ঘটে। এই সময়ে কলকাতায় আধুনিক জার্মান চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীও হয়েছিল। রামকিঙ্করের মতো শিল্পীরা যে-রকম নির্বাচনপ্রখর ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এইসব চিত্রের অভিঘাতে সাড়া দিয়েছিলেন তাতেই বোঝা যায় প্রতীচ্য শিল্পকলার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় কতটা ব্যাপক ও মননঋদ্ধ। এর প্রতিক্রিয়া ছিল একটা বিশেষ ধরনের; কারণ ইস্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীদের মতো শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা সরাসরি বাস্তবানুগ চিত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রত্যক্ষের সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না তাঁদের। স্কুলপাঠ্য বাস্তববোধে স্পৃষ্ট না হবার ফলে তাঁরা ইমপ্রেশনিস্ট বা কিউবিস্ট ধারার মতো কোনও উত্তরবাস্তব রীতির কবলে ধরা দেন নি। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাতে পারে যে তাঁরা ইম্প্রেশনিজম ও কিউবিজম বিষয়ক পড়াশোনা কাজে লাগিয়েছিলেন এক্সপ্রেশনিস্ট উদ্দেশ্যে। ইমপ্রেশনিস্ট কাজকর্মের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁদের রং তুলি আর কাগজ চঞ্চল হয়ে উঠল। ইমপ্রেশনিস্ট পর্বের পরবর্তী কালের সৃষ্টিগুলির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় প্রথাসিদ্ধ দৃশ্যভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যের দিকে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলল। ঘনমাত্রিক কাজের বহুতর রকমের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাঁদের মনোযোগ নিবদ্ধ হল প্রতিরূপের ক্রম-পরিবর্তনে। সেজানের ছবি তাঁদের সুচিন্তিতভাবে প্রণোদিত করল সুপ্রসর অঙ্কনে, আর ভ্যান গগ আবেগদীপ্র বর্ণাঢ্য ট্যাপেস্ট্রিতে। ভারতীয় পূর্বসুরিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক তো এতে ছিন্ন হলই না, বরং তার উল্টোটাই ঘটল। নতুন চিন্তাভাবনার ফলে এই সম্পর্ক হয়ে উঠল আরো জোরাল। অবশ্য বিভিন্ন শিল্পীর প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন হবে, সেইসঙ্গে তাঁদের বোঝাপড়া আর আয়ত্তের গভীরতাও।

রামকিঙ্করের ক্ষেত্রে কারুরই নজর এড়ায় না যে, আধুনিক য়ুরোপীয় কলাপ্রকরণে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণই নিজস্ব ধরনের। এই প্রতিক্রিয়া যে দৃশ্যবস্তুসঙ্গত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মিলবেই এমন নয়। আপনারা অন্যত্রও তা লক্ষ করেছেন। ওপরে যে-সব কিউবিস্ট খুপরিবিশিষ্ট ছন্দোময় অঙ্কনের উল্লেখ করেছি তাতে রামকিঙ্কর ইমপ্রেশনিস্ট, কখনো-বা পয়েন্টিলিস্টিক রং চাপিয়ে অভিনবত্ব আনলেন। এর আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে সম্ভবত দিল্লী আর্ট কলেজের সংগ্রহে যে বড় জলরঙা ছবিটি আছে তার উল্লেখ করা যায়। এতে দেখানো হয়েছে পাখার আকৃতির গাছের ছায়ায় বসে লোকেরা চা খাচ্ছে। পরবর্তী কয়েকবছর তিনি অনেক নিসর্গচিত্র

এঁকেছিলেন যেখানে ছন্দোময় আয়তনিক সংগঠন জীবন্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশ-এর সুচিন্তিত প্রয়োগে আর মাঝে মাঝে রঙের চমৎকার টানে। তল আর ঘনত্বের মাত্রা বদলে ছবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে গতি। বিষয়-বস্তুর দিক থেকে এদের অবলম্বন শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি, নেপালের পরিব্যাপ্তি, শিলঙের হ্রদ আর পাহাড়তলি, যদিও স্থান ও বিষয়ভেদে এদের ছন্দেরও রকমফের দেখা গেছে। ধরনটা কিছু পরিমাণে সেজান-ঘেঁষা। সবদিকে সমানভাবে ওয়াশ চালিয়ে একটা সামগ্রিক আয়তন তৈরি করা হয়েছে আর জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন ঝোঁক আর মেজাজে আগুপিছু করে রঙের তুখোড় প্রলেপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও রৈখিক বৈচিত্র্যটুকু ফুটেছে।

কয়েক বছরের মধ্যে রামকিঙ্কর এই আঙ্গিকে আরও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন। বীরভূমের রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে, কি খেজুরগাছের সারির ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান ধোঁয়া-ওগরানো ট্রেন, রাজগীরের বাজারে ঘোড়ার গাড়ি বা কোপাইয়ের খাড়া পাড়ে শিমুলগাছের ঝাড়—যে কোনো বিষয়কেই তিনি অনায়াসে কব্জা করতে পারেন। রীতিমতো উল্লেখযোগ্য এই স্বাচ্ছন্দ্য, যা একজন অনুশীলিত বাজিকর, ভারসাম্যপটু খেলোয়াড়, কি দড়ি-হাঁটিয়েরা আয়ত্ত করে থাকে। উত্তেজক, ঘুরেফিরে দেখবার মতো। কিন্তু যে কোনো উদ্দীপকে তাঁর তীব্র আবেগার্ত প্রতিক্রিয়া কাজগুলিকে নিছক কারিগরিতেই পর্যবসিত করে নি, তার চেয়ে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। যেখানে তাঁর চরম উৎকর্ষ ঘটেছে তাতে—সে জলরঙা, পেইন্টিং কি ভাস্কর্য যাই হোক, আবেগোচ্ছলতা ও গঠনশৃঙ্খলার মধ্যে একটা গতিশীল সংহতির বৈশিষ্ট্য অবধারিতভাবে চোখে পড়বেই। অবশ্য কখনও কখনও তাঁর কাজে আবেগের অতিরেক ঘটে গেছে। রঙের ব্যবহারে তিনি ক্ষিপ্র, রেখাগুলো তাঁর ঝড়ের মতো বেগবান, ভঙ্গি হয়ে ওঠে অতিনাটকীয়। সে যাই হোক, গঠনগত শাস্ত্রবিধি তিনি লঙ্ঘন করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

তাঁর ড্রইংগুলো যতটা সংরক্ষণ করা গেছে, রঙিন ছবিগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। দোষ বহুলাংশে তাঁরই। ছবি আঁকার পর সেদিকে তাকাতেন না একবারও, এমনকি জমিয়েও রাখতেন না। এমন কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনও তাঁর নেই যিনি তাঁর হয়ে এই কর্মটি করবেন। এইসব কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করা যায় নি। আর যেভাবে তাঁর ছবিগুলি এদিক-ওদিক হয়ে গেছে তাতে এরকম একটি সুবিধাজনক চিত্রপঞ্জি সঙ্কলন

করা সহজ ব্যাপার নয়। শান্তিনিকেতনে প্রথম দিকের ছবিগুলিতে তিনি বিশিষ্ট ঢঙে ওয়াশ আর টেম্পারা ব্যবহার করতেন। এগুলোর নির্মাণনৈপুণ্য ও ছাপাই (graphic) পরিপাট্য দেখার মতো। যদিও প্রথমে তিনি পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু রঙিন ছবি করেছিলেন, চোখ ছিল তাঁর চতুর্দিকের দৃশ্যমান ঘটনায়, নিসর্গে, গ্রামের নরনারীদের দিকে, যারা চাষ করছে, গরু চরাচ্ছে, গরুর গাড়ি চড়ছে। সাঁওতাল আদিবাসীদের ইন্দ্রিয়চেতন সৌন্দর্য, সংক্রমণময় উল্লাস, সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করত। সেইসঙ্গে আশ্রমিক পরিপার্শ্বের মধ্যে যেসব মানুষ আর দৃশ্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তারাও। কিন্তু যেখানেই কোনো প্রত্যক্ষ উদ্দীপকের দেখা পেয়েছেন সঙ্গে-সঙ্গে তাকে রঙিন চিত্রে রাখার তীব্র তাগিদে নান্দনিক বা আবেগভিত্তিক শাস্ত্রবিধিকে ছাড়িয়ে যেতেন। এভাবেই তাঁর জলরঙা ছবি থেকে এগুলো আলাদা। প্রতিটি রঙিন ছবি তিনি পত্তন করতেন অবশ্যই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যা প্রায়শই আবেগে নিষিক্ত ; কিন্তু তাকে দিনের পর দিন ভিন্নতর অভিজ্ঞতায় রঙেরেখায় পুষ্ট করতেন, লালন করতেন, যাতে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি হয়ে ওঠে। এতে সময় লাগত। প্রাথমিক বিষয় অনেক অদলবদলের ফলে অন্যরকম হয়ে যেত। অচেনাকে চিনতে চাইতেন তিনি, ধরতে চাইতেন কিংবদন্তির সোনার হরিণটিকে। এ ব্যাপারে কোথাও কোন আপোষ ছিল না। রোজ একটা করে ছবি শেষ করতেন, আবার তাকে মুছেও ফেলতেন। এর কারণ যা দর্শাতেন তাও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ, যেমন, কাজটিতে ভাবালুতা বড় বেশি, নয়তো বড় বেশি সুন্দর, বা, বড় বেশি তথ্যপ্রধান , যদিও আমাদের কাছে সেটি জীবন্ত মনে হতে পারে। ভাবতে খারাপ লাগে, তাঁর কোন কাজের শুরু আর সারার অন্তর্বর্তী পর্বগুলিকে ধরে রাখা গেল না, যেমনটা সম্ভব হয়েছে মাতিস আর পিকাসোর বেলায় ; কেন-না প্রত্যেকটি পর্বই ছিল নিজেই নিজের তুলনা। কিন্তু নিজের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত নিস্পৃহ। আপন স্বজ্ঞাপ্রসূত ভাবোদ্‌গারকে তিনি চাইতেন একটি সুসংহত বক্তব্যে বিন্যস্ত করতে, এক ধরনের মন্ত্রঘন রহস্যময়তায় তাকে ব্যবহার করতে। তাঁর মতো ব্যক্তির কাছে—যাঁর আবেগ মানুষটিরই সমান প্রচণ্ড—এটা ছিল যেন দৈত্য ও দেবদূতের লড়াই।

রামকিঙ্করের রঙিন ছবিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এদের মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তির পোর্ট্রেট, ব্যক্তিগত হয়েও অনন্যসাধারণ। 'স্বপ্নময়ী', 'সোমা যোশী', 'বিনোদিনী', 'নীলিমা দেবী'—প্রতিটি অবয়বের রয়েছে স্বতন্ত্র

চরিত্র। অধিকাংশ পেশাদারি শিল্পীই তো মুখ আঁকতে এঁকে ফেলেন ঝকঝকে মুখোশ। রামকিঙ্কর এইরকম মুখোশ আঁকেন নি। তাঁর প্রতিকৃতিগুলি যে শুধু চরিত্রেরই অনুধ্যান, তা নয়। এখানে বিষয় বদলে গেছে প্রতিমায় (Icon), যার সঙ্গে অন্বিত হয়ে আছে একটা ব্যক্তিগত নিরিখ। 'স্বপ্নময়ী' আয়তলোচনা অভিসারিকা, 'বিনোদিনী' বিহ্বলতায় ছায়াচ্ছন্ন যেন-বা হ্যামলেটের নারীরূপ, এবং 'সোমা যোশী' নিষ্পাপ ইন্দ্রিয়চেতন বর্তুলাকার পুতুল। 'নীলামা দেবী' মনে করিয়ে দেয় কোনো উপজাতিক চৌকোণা দেবীমূর্তিকে। এছাড়া রয়েছে আঞ্চলিক প্রতিবেশনির্ভর কতিপয় রঙিন ছবি, যেমন পাড়াগাঁর ঝড়, সান্ধ্য হাওয়ায় একটি বালিকা ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কর্মরত ও বিশ্রান্ত খামার মজুর, ঘরামি, ফসলতোলা চাষী ইত্যাদি। কিন্তু এইসব সাধারণ আটপৌরে বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কাশিত হয়ে এসেছে কোনো-না-কোনো রূপক বা নিগূঢ় বিমূর্তন। 'পাড়াগাঁর ঝড়'-এ আসন্ন রাত্রিতে ঘরের চালা ঘেঁষে বিদ্যুতের সর্পিল ঝলকানিতে ঝড়টা কেমন তন্ময় নির্বস্তুকতা পেয়ে গেছে। ছাগল তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া বালিকাটির ভাবসার কেমন বীরোচিত। ঘরামিদের মধ্যে যাদের দেখি, সেই পুরুষ, রমণী আর একটি শিশু (সেইসঙ্গে মাটি খুঁড়ে বার করা একটা কঙ্কাল)—দেখামাত্রই জন্ম, অস্তিত্ব এবং মৃত্যু নিয়ে একটা মধ্যযুগীয় রূপকের মতোই মনে হয় তাদের। যারা ফসল কাটছে কি ধান ঝাড়াই করছে তাদের মধ্যেও পাই এক ধরনের মহাকাব্যিক মাত্রা। তাছাড়া আরও কিছু রং-তুলির ছবি আছে, যেমন, শিরীষ গাছের নিসর্গদৃশ্য, যেখানে চিত্রকল্প আরও আত্মময়, অথবা কিমাকার আধাকিউবিস্ট মা-মেয়ে-শিশু, অথবা বৃক্ষশ্রেণীর ফাঁক দিয়ে দেখা কয়েকটি নারীর মনোরম সমাবেশ, যেখানে বেশ সূক্ষ্মভাবে যৌনাত্মক সেই 'পিকনিক' নামের ছবিটি। তবে এই যৌনতা সৃষ্টিকাতর অবয়বভঙ্গির মতো দূরান্বয়ী, কামোদ্দীপক শরীরসর্বস্বতা নয়।

রমণীচিত্রণে রামকিঙ্করের একটা বিশেষ দ্বিধাবিভক্ত মানসতাই ধরা পড়ে। একদিকে রমণী তাঁকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে উদ্রেক করে ভয়। সেইজন্যে এইসব চিত্রে তারা যেমন সুন্দর মার্জিত, তেমনই ভয়ানক, পরাক্রান্ত। তাঁর বহু ছবিতে এবং ভাস্কর্যে রমণীরা মনোহর নারী থেকে ভৌতিক অপচ্ছায়ায় পালটে যায়; তাদের করাল দন্তপংক্তি থেকে ঝলসে ওঠে সম্মোহক হাসি। এর ফলে ছবিতে ঘনিয়ে ওঠে রহস্য। রক্তমাংসের নারী হয়ে যায় আমাদের আরাধ্য মাতৃরূপা ঈশ্বরী, যুগপৎ ভয়ঙ্কর ও সুন্দর। এই দৃষ্টিভঙ্গি আর

চিত্রকল্পের সঙ্গে যে আমাদের সাবেকি চিন্তধারার সাযুজ্য আছে তা বলাই বাহুল্য।

পরবর্তীকালে রামকিঙ্করের কিছুকিছু রঙিন ছবি বেশিমাত্রায় বিষয়মুখী হয়ে পড়েছিল। সামাজিক সমস্যাবলির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বদাই আশু-চেতন। মানুষের বিবিধ সংকটে সাড়া দিতে তিনি ছিলেন তৎপর। দুর্ভিক্ষ বন্যা মৃত্যু তাঁকে প্রাণোদিত করত তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায়। এই কারণে সমাজবাস্তববাদীদের একটা ছোট গোষ্ঠী এবং খবরের কাগজের সমালোচকদের কিছুটা সুনজরে তিনি পড়েছিলেন। এঁরা প্রতীকবৈভবের চেয়ে চিত্রায়িত সাময়িক প্রসঙ্গকেই অধিকতর সুবোধ্য মনে করতেন। এঁদের স্তুতিবাদের ঠেলায় রামকিঙ্করকে এক ধরনের বাস্তবানুগ ছবি করতে হয়েছিল বটে; কিন্তু তাতে যতই গ্রাফিক বেগ আর গাঠনিক সংবদ্ধতা থাকুক, সেই পুরনো অনু-সঙ্গবহ আমেজটুকু পাওয়া যেত না।

তাঁর রঙ-তুলির কাজ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও বৈচিত্র্যময়, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্য আরো অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতীয় ভাস্কর্যে তিনিই তর্কাতীতভাবে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর আগের যুগে ভাস্করেরা ছিলেন বেশির ভাগই পেশাদার, পৃষ্ঠপোষিত। তাঁদের কাজে যতই মৌলিকত্ব আর মুন্সিয়ানা থাক না কেন, পৃষ্ঠপোষকদের রুচি ও ফরমাশেই সেগুলি তৈরি। তাই ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে রামকিঙ্করই, বলা যেতে পারে, সম্ভবত প্রথম সৃজনশীল ভাস্কর। কারুর ইচ্ছাপূরণে নয়, স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দেই তিনি ভাস্কর্য রচনা করতেন। বস্তুত, যে অল্প কয়েকটি আয়োজিত কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন তাতে, বলতে গেলে, ব্যর্থই হয়েছিলেন। সেগুলো শেষ করার ভার সহকারীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। পৃষ্ঠপোষকতার বেড়ি শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর সেইসব চমৎকার আবক্ষ মূর্তি, আজকের দিনে সবচেয়ে গতিস্পন্দিত বলে যেগুলি প্রতিভাত হচ্ছে, তার কোনোটাই কিন্তু আয়োজিত নয়। কোনো-না-কোনো দিক থেকে বিষয়ের প্রতি তাঁর টানই এইসব কাজের প্রেরণা। রঁদ্যা ও এপস্টাইনের কাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঠিকই, কিন্তু এইসব কাজে তিনি গাঠনিক আবিষ্ক্রিয়ার এক ব্যাপকতর পরিধি দেখাতে পেরেছিলেন। এবং বর্ণলেপিত ছবিতে যেমন, এখানেও তেমনি প্রত্যেকটি মডেলকে এক বিশেষ আবেগের বিভায় বিশেষ কোনো দৈবী প্রতিমায় রূপান্তরিত করেছেন। গাঙ্গুলিমশায়, মীরা চ্যাটার্জি, মাধুরী সিং, ইরা উকিল আর রবীন্দ্রনাথের মুখাবয়ব—একটিকে অপরের সঙ্গে

দেখতে হয়। প্রত্যেকটিই নানান দিক থেকে স্বতন্ত্র। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে মডেলের শরীর ও চরিত্রকে ধরে রাখা হলেও দৃশ্যমান সৃষ্টি থেকে তারা সরে গেছে। কেউ আয়তচক্ষু ও রোম্যান্টিক (প্রীতি পাণ্ডে), কেউবা প্রাণোচ্ছল ও জাগতিক (মাধুরী সিং)। ইরা উকিলের মুখটিতে (এখন খুঁজে পাওয়া যায় না) রোম্যান বালকের আদল, আলাউদ্দিন খাঁ-এর মুখে সন্ন্যাসীর রেখাভাস। অধুনা যে কাজটি নিয়ে বেশ বাদানুবাদ চলছে সেই রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আবক্ষ মূর্তিটি তাঁর বলিষ্ঠ সৃষ্টিক্ষমতার পরিচায়ক। এখানে বহুচেনা মুখের আদলকে একপাশে সরিয়ে কবিকে সংবেদন আর শক্তির এক যুগল মহিমায় উপস্থিত করা হয়েছে। পৌত্তলিকের কুলুঙ্গিতে রাখার মতো সস্তা খেলনার জিনিশ এটা নয়। একটি প্রাণবন্ত মানবিক দলিল এই মূর্তি, সেখানে কবি পরিণতপ্রজ্ঞা, আর্ত, মোহমুক্তির বোধিতে স্থির; তাঁর শেষজীবনের কবিতাবলিতে যে মুখচ্ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তিনি এখানে তা-ই।

রামকিঙ্করের ভাস্কর্যে মুখাবয়বের সংখ্যা বেশি নয়। আরো অনেক কাজ তিনি করেছিলেন। দুর্ভাগ্য, তার মধ্যে খুব অল্পই চোখে পড়ে। এমনকি তাদের ফটোও পাওয়া যায় না। প্রথম দিকের কাজে তিনি ছোটখাট দৃশ্য নিয়েই মেতে উঠতেন, যেমন, ঘাসে খরগোসের ছুটোছুটি, বাচ্চাকে চাকাগাড়িতে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে নারী, কিংবা কিছুটা বদাঁর ধরনে কোনো নাটকীয় রোম্যান্টিক দৃশ্য। কালক্রমে এরকম সরাসরি বিবরণ-ধর্মিতা থেকে সরে এলেন তিনি; উত্তরোত্তর তাঁর কাজ হয়ে উঠল আরও ত্রিমাত্রিক এবং অভিব্যক্তিমূলক। এক-একটা রচনা নানান পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে একটা চূড়ান্ত, প্রায়শই দুর্জ্ঞেয়, পরিণতিতে পৌঁছাত। মা ও ছেলের মূর্তিটির শুরু মাডোনার স্নিগ্ধতায়, পরে একটু একটু করে সেই স্নেহময়ী মা হয়ে যায় আর্ত রাক্ষসী আর কোমল শিশুটি এক নৃশংস প্রেত। আদর ও মমতার চেহারা বদলে যায় আনগ্ন হিংস্রতায়। দেখানো হয় নতুন পুরাতনকে গ্রাস করছে। একটি কামমোহিত যুগল-মূর্তি দ্বিপুটক বীজের মতো উঠে গেছে আর মাঝখানে উচ্ছ্রিত লিঙ্গস্তম্ভ যেন বা বীজ থেকে সমুত্থিত হয়েছে একটি উদ্ভিদ। ইন্দ্রিয়চেতন নরনারীর আবেগার্ত উদ্দীপনে সৌন্দর্য ও আশ্চর্যময়তার মধ্যে সমর্পিত একটা টান টান ভঙ্গিমায় পর্যবসিত হয়। এখানেও তলেতলে কিছুটা প্রথাসিদ্ধ ব্যাপার থাকলেও তাঁর চিত্রকল্প একান্তরে কাব্যময় ও আত্মকীয়। এদের মধ্যেও তাঁর সেই

ত্রিমাত্রিকতা নিয়ে লুকোচুরি খেলা। সেই প্রতিটি কল্প প্রতিমার গাঠনিক উপাদানগুলি ভেঙে দিয়ে তাদের জায়গায় একটা নতুন আদল গড়ে তোলা। নিঃসন্দেহে এদের অনেকগুলিই নাটকীয়; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নাটকীয় চালের একধরনের রহস্যঘন রেশ থেকে গেছে যা দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বকে ঘিরে আবর্তিত। এই দ্বন্দ্ব প্রেমের সঙ্গে ঘৃণার, সূক্ষ্মতার সঙ্গে স্থূলতার, জন্মের সঙ্গে অবক্ষয়ের।

অবশ্য রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের সবচেয়ে দর্শনীয় অবদানগুলি রয়েছে শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত চত্বরে। এসব কাজ সিমেন্ট জমিয়ে করা। বিরাট, অভিভূত করার মতো। শান্তিনিকেতনের প্রধান ফটকের সামনেই দেখা যাবে তাঁর প্রথমতম সিমেন্ট ভাস্কর্যটি। রং আর পালিশের কায়দায় মনে হয় একটা সবুজ রত্নকেই যেন খোদাই করা হয়েছে। এরপর কলাভবন এলাকায় দেখব ছিপছিপে 'সুজাতা' (যখন প্রথম দেখি তখন লম্বা সরু সরু ইউক্যালিপটাস গাছের সারি থেকে মনে হয়েছিল আচমকা রহস্যজনকভাবে উঠে এসেছে); চোখে পড়ার মতো 'সাঁওতাল পরিবার' (সেইসময় ন্যায্যতই লম্বা ঘাসের ঝাড়ের মধ্যে বসানো হয়েছিল); এবং সেই বিতর্কিত 'ফসল-কাটা' যার নগ্ন দেহভঙ্গি গোঁড়া আশ্রমিকদের হতবুদ্ধি করলেও অভ্রান্ত ছন্দের জন্যে গ্রামের সাঁওতালদের নজর কাড়ে। 'কারখানার আহ্বান'-এ বলিষ্ঠ সরবতা ও স্ফূর্তির মেলবন্ধন। এছাড়া বুদ্ধ আর গান্ধিজীর জনপ্রিয় মূর্তি তো আছেই। এদেরও সাধারণ পারিপার্শ্বিকতা থেকে ব্যাপকতর কোনো প্রসঙ্গের প্রতীকত্বে উত্তরণ ঘটেছে, যেমনটা তাঁর অন্যান্য কাজেও দেখা গেছে। ফটকের সিমেন্ট ভাস্কর্যটি উড়ন্ত পাখি আর নারী দেহের একটি সমন্বিত রচনা যা আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। মনে হয় একটা ঘোরানো সিঁড়ির তরঙ্গে নবপ্রস্তর যুগের ভিনাস আবির্ভূত হয়েছে। 'সুজাতা' ছিপছিপে দারুভূত কোনো ছায়ামূর্তি বলে মনে হয়। 'সাঁওতাল পরিবার' পোড়খাওয়া শ্রীমণ্ডিত, হৃতসর্বস্ব হয়েও অবিনাশী ভারতীয় গ্রামীণ মানুষের একটি মনোগ্রাহী প্রতীক। 'ফসল-কাটা' উর্বরতার বিগ্রহরূপেরই কাছাকাছি এবং 'কারখানার আহ্বান' সাঁওতাল পল্লীবাসীর দুর্বার আনন্দোল্লাসের উৎসব। যে-সময় খেটেখাওয়া মানুষ আনন্দ কাকে বলে তা-ই জানে না, তখন এরা সঙ্গীতকে মেলাচ্ছে জীবনে। এই সমস্ত মূর্তিতে তাঁর মাত্রাবোধ, স্থাননির্বাচন, দৃশ্যনাট্য অনিন্দ্য। এরকম আরো কিছু কাজের পরিকল্পনা তাঁর ছিল। যেমন, পীয়ার্সনপল্লির

প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজীর একটি বিরাট যুগলমূর্তি, গান্ধীজীর একটি কল্পমূর্তি—ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে দীর্ঘ পদক্ষেপে বিজয়ীর মতো এগিয়ে চলেছেন তিনি। এর যে খশড়া রেখাচিত্রটি আছে সেটিও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মনোজ্ঞ রচনা। কিন্তু কোনোটাই হয়ে উঠল না।

রামকিঙ্করের কাজকর্মের ওপর এ হচ্ছে ওপর-ওপর সমীক্ষা। তাঁর শক্তিমত্তা, বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য এবং অভ্যন্তরীণ জটিলতা আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় কলাজগতে তাঁর সমকক্ষ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সহজে মিলবে না। তাঁর অবদান প্রচুর; কিন্তু কখনোই তা নিয়ে ঢাক পেটাতেন না। কাজে তিনি ছিলেন মন্ময়, যদিও পরিণামে দেখাতেন দার্শনিক নিরাসক্তি। যে-জগতে সাফল্য যশ অর্থের জন্যে এত মারামারি সেখানে তিনি ছিলেন একেবারেই সংসার উদাসীন; এতটাই, যে মনে হোত, পাগলাটে। যাপন করতেন সন্ন্যাসীর জীবন, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দে ছিলেন বিগতস্পৃহ। মাটির গন্ধ, আকাশের আলো আর সৃষ্টির মনমাতানো দৃশ্য—প্রকৃতির এইসব নিঃশুল্ক দানেই চরিতার্থ হতো তাঁর বাঁচার আর্তি।

নানান পরস্পরবিরোধী ভাবের টানাপোড়েনে তিনি ছিলেন বিচিত্র। একদিকে গাঁ-গঞ্জের মানুষ হিসেবে তাঁর ছিল অহঙ্কার, অন্যদিকে তেমনি ছিল অত্যন্ত পরিশীলিত একটি মন। একই অন্তর্দৃষ্টি আর অনুভূতিতে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন লোকসঙ্গীতের টানে বা জেমস জয়েসের 'ইউলিসিসে'র কোনও কোনও অংশে। অদম্য ছিল তাঁর প্রাণোল্লাস, কিন্তু সেইসঙ্গে সুচিন্তিত বাক্-সংযমও ছিল। প্রথানুগত্যে চূড়ান্ত বিরাগ সত্ত্বেও তাঁর ব্যবহারে ছিল সুরুচি ও নম্রতার পরাকাষ্ঠা। যা কিছু সুন্দর তাতেই তিনি তীব্রভাবে প্রতিক্রিয়া-প্রবণ ছিলেন, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়াও শাসিত হতো সমানভাবে তীব্র অনাস্থায়। তাঁর বিদ্রোহী চৈতন্য সংহত হয়ে যেত এক ধরনের দার্শনিক স্থৈর্যে। তিনি উৎকেন্দ্রিক ছিলেন, কিন্তু এই উৎকেন্দ্রিকতা সন্ন্যাসীপ্রতিম। অন্তত মরমী ও আবেগপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও পছন্দ করতেন না ভাবালুতা ও আবেগের আতিশয্য। এইসব বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর জটিল ও গহন কাজ আর ব্যক্তিত্ব। তিনি এ-রকমই মানুষ, তবে মানুষের প্রচলিত পৃথিবী থেকে একটু দূরেই তাঁর মাটি।

অনুবাদ: শিবশম্ভু পাল

(গত ২৪.৮.৮০ তারিখে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত রামকিঙ্কর স্মরণ সভায় প্রদত্ত লিখিত ভাষণ)

দাম্পত্য

সুদর্শন সেনশর্মা

তাযেব আমাকে দেখেই ডেকেছিল। বল্ল, যা চাইবেন তাই। গর্দান থেকে কেটে দেই? শিনা, গর্দান, বাঙ যা বলবেন।

দেখে দিও।

আমার রাগ হচ্ছিল। এতবেলায বাজাব থাকে না। আমি বাজাবের ব্যাপাবে বরাবরই নাদান। বাবা-মা বাজাবে পাঠিযে হেসে গডিযে পডতেন। নমিতাও। আসলে আজকে ওব ভাই-এর সামনে বেইজ্জতি কবাব জন্যই কি নমি ঠেলে বাজাবে পাঠাল। নমিতাই বাজাবহাট সামলায। এখন অবশ্য ওকে আমিই বারণ কবেছি। কাজের মেয়েটাকে দিযেও নমিতা বাজাব তো কবিযে নেয এক-আধদিন। আজ আসেনি?

চাতালে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। ওপবে পা ঝোলান। সামনের দুটো পা হাওয়ায দুলছিল একটু-একটু। কাটা মুণ্ডটা গোল মতো কাঠের তক্তাটুকুব পাশেই। সকাল থেকে একটাই শেষ হয় নি। অন্তু, যে দুটো পাঁঠা দোকানেব লাগোযা ফুটপাথে জডো কবে দেযা ঘাসপাতা চিবুচ্ছিল আর ঘাড উচু কবে তাদেব ভবিতব্য এবং ঘাতককেও স্থিব চোখে দেখছিল মবা চাউনিতে, সে দুটোকে দেখিযে বলল, সুধাদা এদেব নিশ্চযই কোন প্রিমোনিশন হয না, হয কি? ব্যাপাবটা আমাব কিন্তু খুব ক্রুযেল মনে হয। আপনার?

—মাংস কিনতে এসে এসব বললে লোকে কিন্তু হাসবে।

—লোকেব কথা তো বলি নি, আপনাব কথা বলেছি। ওবা নিশ্চযই বুঝতে পাবে না। তাহলে ঠিকই ব্যাব্যা কবে চেঁচাত।

—গোট ফিলসফি তো ভাই কোর্সে ছিল না। বলতে পাবব না। ওদেব কথা বুঝতে হলে তো পাঁঠা হতে হয।

খেতে বসে নমিতা বলল, অন্তু তুই এইখানে থেকে পডবি? থাক না সুবিধেই হবে, তোর জামাইবাবু দুদিনে সিধে হযে যেত।

অন্তু বলে, দিদি হস্টেলে না থাকলে হবে না বে।

—তোব সুধাদা কবে হস্টেলে ছিল জিজ্ঞাসা কব?

—তুই তো সুধাদা কোয়ার্টার পেলেই ডায়মণ্ডহারবার বলে যাবি। তখন ?

—আরে রাখ ওর কোয়ার্টারের কথা। ছ-মাস ধরে শুনছি। সব মুখেই। আসলে কেউ তোর জামাইবাবুকে পাত্তাই দেয় না।

নমিতা হাসতে হাসতে উঠে গেল। কিছুই খায় নি। আসলে এখন খেতেই পারে না। আয়রন ক্যাপসুলটাই পজিটিভ ব্যালান্স। একটু খেলেই নাকি বসতে পারে না, শুতে পারে না। আমার হিসেবে এখনও দিন পঁচিশেক বাকি আছে। সামনের সপ্তাহেই নার্সিং হোমে নিয়ে যাব। যা ভীতু। ভাই-এর সামনে বাজা উজির মারছে। আসল সময় কত সাহস বোঝা যাবে।

নমিতা বলল, মুন্নি তো এল না।

—দাঁড়াও ডেকে নিয়ে আসি। নীরাদিকে বলেছিলাম পাঠিয়ে দিতে। মেয়েটা দিন রাত কাকীমা কাকীমা করে।

অন্তু বলল, মুন্নি কে ?

আমাদের পাশের বাড়ির প্রফেসরের মেয়ে।

নমিতা বলেছিল, জানো নীরাদি আজকাল মেয়েকে একদম ছাড়তেই চায় না। কোথাও বেরুলে আমার কাছে রেখে যায়। সেই লোকটা আজকাল প্রায়ই আসছে।

নমিতা মুন্নিকে গিয়ে নিয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সেই লোকটাকে ডায়মণ্ডহারবার হসপিটালে একদিন দেখেছি। ওর বৌকে নিয়ে এসেছিল। বৌটার হরেকরকম অসুখ ছিল। সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল। লোকটাকে একদিন বললাম, তুমি ঐ ভদ্রলোককে জ্বালাতন করছ কেন ? লোকটা কেঁদে ফেলল। বলল, ডাক্তারবাবু ঠিক আছে আর যামুনা। মেয়েটারে হাসপাতালে ফেইল্যা গেছিলাম। প্যাটের দায়। মাইয়াডার হাসপাতালই ঘরদোর হইয়া গেছিল গা। খাইতে দিমু কি। নিজেরাই খাইতাম কি কিছু। মাইয়াটা পড়ল অসুখে। হাসপাতালে দিয়া আইলাম। আর খোঁজ লই নাই। বছর দুই বাদে একদিন লুকাইয়া গেছিলাম। দেখি মাইয়াডা বড় হইয়া গ্যাছে। কেমন সুন্দার শিউলি গাছের লাহান। হ্যার পর প্রায়ই যাইতাম। মাইয়া বাপেরে চেনত না। বাপত চেনত। দিদিমণিগো সাথে ঘুইরা বেড়াইত মাইয়া আমার। ডাক্তার

বাবুবা জামাজুতি দেত। তা একদিন গিযা দেখি নাই। ঐ বাবু মাইয়াডাবে নিয়া নিল। খোঁজ কইবা হ্যাসে·

—আর যাবে না। মেযে ত তোমাব দুঃখে নেই। তুমি খাওয়াতে-পবাতে পাববে?

লোকটা পাযের দিকে হাত বাডাল আমাব, ছুইযা কইতেছি, আব যামু না।

কিন্তু লোকটা আসে। নমিতা বলছিল, মাঝেমাঝেই প্রফেসব গিন্নীব ভয় বেডে উঠছিল। মেযেটাকে এখন পাবতপক্ষে বেরুতেই দেয না। দেবীবাবু সেদিন বলছিলেন, দেখুন আব এক অশান্তি। আপনাব দিদিব আবাব স্ট্রোক না হয়ে যায। আমি মানি দেবীবাবুবও হতে পাবে। লোকটা এখনও আসছে। বাডিব দবজায় নমিতাব কোলে মুন্নিব একটা ছবি আছে। এক-সময় মুন্নি আমাদেব পেসেন্ট ছিল। বছব দুযেক কেউ ওকে নিতে আসে নি। মেযেটা বড হচ্ছিল নার্সদেব আদবে। দেবীবাবু অনেকদিনেব বন্ধু। স্ত্রীব সঙ্গে মানসিক সংঘাত শুরু হযে গেছিল। বুদ্ধিটা আমিই দেবীবাবুকে দিযেছিলাম। কিন্তু বুডো হাডগিলেটা আবাব

নমিতা যাবেই। ছবিঘবে 'গণদেবতা'। অন্তু ছিল। নীবাদিবও যাবাব কথা ছিল। মাথা ধবেছে বলে আসতে পাবেন নি। দেবীবাবু মুন্নিকে কোলে নিযে ঘব অব্দি এসে বললেন, 'কি ভাযা, স্ত্রীব প্রক্সিটা দিযে আসব নাকি? মুন্নি খুব জেদ ধবেছিল, ও যাবে। অন্তুব সঙ্গেও ভাব হযে গেছে। দেবীবাবু মেযেকে নিযে বাসায চলে গেলেন।

ফেবাব পথে বৃষ্টি নামল। বিভ্রাট। দু-পা হেঁটেই নমিতা হাঁপাচ্ছিল। বলল, বিক্সা নাও।

বিক্সাব ঝাঁকুনি ডেঞ্জাবাস।

আমি বললাম, চল ট্যাক্সি ধবি।

নমিতা ভুল বুঝল। বলল ঠিক আছে হেঁটেই যাচ্ছি।

অন্তু বলল, দিদি, সেটাই সেফ। দেখিস আছাড খাসনি।

আমি তবু রিক্সা খুঁজতে গেলাম। শেযালদাব মুখটায দু-তিনটে বিক্সা দাঁডিযে। কেউ যাবে না। নাইট শোতে নমিতাকে নিযে এই অবস্থায আসা ঠিক হয় নি। একটু এগিযে একটা বিক্সাব দিকে তাকিযে ফেব দু-পা পিছিয়ে এলাম। পেছন থেকে বুঝতে পারি নি। পা-বাখাব জায়গায় একটি

বাবুজীবী বসে পা নাচাচ্ছিল। বিস্কাওযালা একটু দূবে এক ডিমওয়ালিব সঙ্গে পঁচাচ্ছে। হাতে ঘুঙুব ঘন্টিটা। সিটের দিকে তাকিযেই মুখ সরিযে নিলাম। যাকে দেখলাম সেও। তাযেব বসে আছে। আব তাব পাযেব কাছে বাবুজীবী মেযেটি পা দোলাচ্ছিল। তাযেবেব জীবনযাত্রায অনেক গোলমাল আছে। এক ববাব, আগে যখন বাসায কযেক ঘন্টা রুগী দেখতাম, একদিন তাযেবেব বৌ এসে হাজিব। সাবা শবীবে ক্ষত। শঙ্কব মাছেব লেজ দিয়ে তাযেব পিটিযেছিল। বিকেলে বাজাবে তায়েবকে খুব গালমন্দ কবলাম। তাযেব ঘাড নিচু কবে সব শুনল, শেষে বলল বাবু ঘবেব কিস্যা নাইবা শুনলেন। আমি দেখলাম কসাই-এব চোখে জল। তাযেবেব এক পার্টনাব ছিল। সে লোকটাকে আজকাল আব দেখা যায না। চেহাবাটা জগাব মতই কালো খ্যাপা মতন মাবকুটে গোছেব। জগাকে চাক্ষুষ এখনো দেখিনি। তা সেই পার্টনাব নাকি অলক্ষে তাযেবেব অন্দব মহলেও চৌকি দেওযা শুরু কবেছিল। মুশকিল হল তাযেব বৌটাব সঙ্গে ওব ছেলেটাকেও ধবে পেটাত। ছেলেটাও মনেপ্রাণে কসাই হযে উঠছে। নীবাদিদের মাদি বেডালটাকে একদিন সামনেব টগব গাছটায সাডে ছ বছরের ছেলেটা উলটো ঝুলিযে একটা ভোঁতা ছুবি হাতে ধবে পেটে ছুঁইযে চেঁচাচ্ছিল জবাই কবেগা। জবাই কবেগা। জবাই কবেগা। কিলো চৌদা রুপিয়া, চৌদা রুপিযা। মুন্নিব সে কী কান্না। আমি ছেলেটাব হাত থেকে ছুবিটা কেডে নিযেছিলাম। তাযেব বলেছিল, বাবু বক্তের দোষ। কোন রক্ত?

নমিতা আস্তে আস্তে বলল, শুনলে?

অন্তু একটু এগিযে গিযেছিল। শিযালদা স্টেশনেব পাশেব সেই নতুন বাস্তাটায বৌবাজাবেব দিকে হেঁটে আসছিলাম। 'বন্ধুগণ' কথাটা শুনে উৎকর্ণ হতেই চাপা মেযেলি কণ্ঠটি সুব কবে ফেব বলছে শুনলাম, 'আমবা বৌবাজারেব লোক। কিন্তু বাবুদেব ন্যাকডা বেডেছে। ঘবেব লক্ষ্মীই তাদেব ঠাণ্ডা বাখছে। আমাদেব কেউ চাইছে না, নিচ্ছে না·· হিঃ হিঃ আমবা না খেতে পেযে কি মবে যাব? আমবাও ছিনতাই কবব ছিনতাই কবব'···শেষেব কথাগুলি হাসিব বেশেব সঙ্গে মিলিয়ে যেতেই দেখলাম গুটি তিনেক মেযে এ-ওব গাযে হেসে গডিযে পডছে। বন্ধুগণ কথাটাব কি ডাযমেনশন!

নমিতা ফেব বলল, শুনলে?

—শুনেছি।

—ভয় করছে!

—এই অন্তু তোমার দিদির ভয় করছে। এদিকে এস।

মাঝখানে নমি ডাইনে অন্তু বাঁয়ে আমি। ফুটপাথের দোকানীরা শোয়ার আয়োজন করছে। কোলে মার্কেটের গলিতে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল। প্রাচী সিনেমা হলের লাইট নিভে গেছে। সামনের মিষ্টির দোকানটায় ধোয়াধুয়ি চলছিল। মোড়ের ফুলওয়ালা এই রাত্রে তারই পাশের নিম-দাঁতনওয়ালীর সঙ্গে গল্প করছে।

নমিকে বললাম, তোমার ফুলওয়ালা।

এ পাড়ার পাগলটিকে সবাই ভয় পায়। আজকে আমিও পেলাম। এমনিতে কেউ ওকে দেখে না বড় একটা। কোথায় থাকে কোথায় যায় কেউ জানে না। হঠাৎ একদিন মাঝরাতে চিৎকার করে জানান দিয়ে যায় সে এসেছে। কেউ তখন জানলা-দরজা খুলে দেখতে যায় না ওকে। জানলায় ঢিল ছোঁড়ারও অভ্যেস আছে। তার বাণীও মর্মস্পর্শী। প্রথমে সে উপদেশের সুরে বলে, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। তারপরে অস্ফুটে নাচের মুদ্রায় কী সব বলে। শেষের কথাগুলো খুব খারাপ। নমি এই নিয়ে হাসাহাসিও করেছে কয়েকদিন। কথাগুলো হল, প্রথমে উচ্চস্বরে, ধোপামাগী কাপড় বাচে ঠ্যাং তুলে তার বাবলা গাছে। তারপর খাদে, গলা নামিয়ে বলে, তার যে মোড়ল যাত্রাদলে / কাছা দোলায় পাছার কাছে হিঃ হিঃ

কথার কোনো সংগতি নেই। পাগলের রোজকার শ্লোগান এই-ই। ও নাকি কোনো সময় যাত্রার একটা দলে কাজ করত। পাড়ার অনেকের কুসংস্কার এই যে জগা পাগলা যেদিন আসে তার পরদিনই একটা কিছু অঘটন ঘটে। যেমন নমিতা বলে এর আগের সপ্তাহে নীরাদি দোতলার সিঁড়িতে পড়ে গেছেন। প্রফেসরের কী একটা পেমেন্ট আটকে গেছে। তার আগের সপ্তাহে যেদিন রাতে জগা এসেছিল, তার পরদিনই আমি বাড়ি ফিরতে পারিনি। সকালে ফেরার কথা ছিল। একটি ভাল পেমেন্ট দুম করে খারাপ হয়ে গেল। আজকেও জগা কুড়াক ডেকে গেল, কাল কিছু হবেনা তো!

নমি আমাকে ঠেলল, অ্যাই ঘুমুলে? আমি পাশ ফিরে বললাম, জেগেই আছি।

—জগাটা আজকে আবার এল।

—হু

—কেন?

আমি কি করে জানব।

নমিতা অস্ফুটে একবার আহ্ বলল।

আমি বললাম, কি হল?

বাচ্চাটা আজকে খুব লাথাচ্ছে। মিনিট দশেকের মধ্যে তিনবার গোত্তা মারল।

আমি আর নমিতা মুখোমুখি। ইদানীং রাতে আলো না জ্বালিয়ে নমি ঘুমোয় না। একটা ছোট আলো জ্বলছে। নমির মুখটা সেই আলোয় ফ্যাকাশে লাগছিল। ঘরের হাওয়ায় একটা গুমোট ভাব। আমি জগা চেঁচিয়ে যাবার পর জানলাটা দিয়ে দিয়েছি।

আমাদের খাটের নিচে আর-একটা ছোট্ট খাট আছে। আমার জন্মের আগেই ঠাকুর্দা মনোরঞ্জন মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। এখন ঠাকুর্দাও নেই। মনোরঞ্জন মিস্ত্রিও নেই। আমি আছি। নমি আছে। আর আমার ঠাকুর্দার আমাকে দেওয়া সেই বেবিকটটি আছে। ঠাকুর্দার ভালবাসায় তো খাদ ছিল না। সেই বিত্তহীন হেডমাস্টারটি তাঁর কর্মজীবনের প্রান্তসীমায় এক অনাগতের জন্য অগাধ ভালবাসায় শাল কাঠের সুদৃশ্য খাটটা বানিয়েছিলেন। সেই খাটটাতেই মনে মনে আমি আমার সন্তানের স্থান করে দিয়েছি। কিছুদিন আগে আমি এক রাতে চুপি চুপি খাটের নিচ থেকে ছোট খাটটি বের করে আনতে গিয়ে নমির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। হেসে নমি বলেছিল, তোমায় অপত্য পেয়ে বসেছে। আমি নমির কোলে মুন্নির ছবিটা দেখিয়ে বলেছিলাম, ও ছবিতে অপত্য নেই?

নমি বলল, সত্যি সুধা, আজ ভয় করছে।

আমি মুন্নির গলাটা নকল করে বললাম, ভয় করছে।

—তুমি তো কাল ভোরে উঠেই ডায়মণ্ডহারবার চলে যাবে। না?

—আমি নমির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, একমাসের ছুটি নিয়ে এসেছি।

—এক মাস? যাহ্ মিথ্যুক

—নতুন ভাড়াটে না-আসা অব্দি আমি নড়ছি না।

নমি আর একটা গোত্তা খেল। 'আহ্' করল একবার। বলল, কি কথার ছিরি। নমি উঠে বসার চেষ্টা করছিল।

বললাম, উঠছ কেন?

ও বসল বলল, তুমি মিথ্যে বলেছ। ছুটি তুমি নাওনি।

আমি বললাম, তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ওরকম ফিসফিস করে কখনও মিথ্যে বলেছি।

—বলনি?

—ভেবে দেখ।

নমি পাশ ফিরল। ফের বলল, ভয় করছে।

আমার একটু চিন্তা হচ্ছিল জগাটা সত্যিই—। আর বেশিদিন বাকিও নেই। একদিন আবার ডায়মণ্ডহারবার যেতেই হবে। নমিকে একা ফেলে···। মা-ও অভিমান করে এলেন না, ওকে মায়ের কাছে পাঠাই নি বলে। আমি খাট থেকে নেমে পড়লাম। উবু হয়ে বসে খাটের তলায় হাত ঢুকিয়ে ছোট খাটটা টানলাম। শব্দ হল। নমি আস্কারার গলায় বলল, পাগলামি হচ্ছে মাঝরাতে!

খাটটা বাইরে টেনে আনতেই বেড়ালের মিঁউ শুনলাম। নীরাদির মাদি বেড়ালটা আমায় হুলো ভেবে রাগে ফুঁসে উঠল। বেড়ালের কোলের কাছটায় আর-তিনটে অপগণ্ড বেড়ালশিশু। চিঁ চিঁ করে ডাকছিল। নমিতাকে ডাকলাম, নমি দেখ তোমার আগেই নীরাদির বেড়ালটা··

—আমি আজ সন্ধ্যায় বেড়ালটাকে দেখেই বুঝেছি ফাঁক খুঁজছে। মুন্নি ভীষণ বেড়াল ঘাঁটে বলে দেবীবাবু ওটাকে দূর করে দিয়েছেন। তুমি উঠে এস—

—দেখ না আমার জায়গায় বাচ্চা নামিয়ে আমাকেই রাগ দেখাচ্ছে।

নমি তাড়া দিচ্ছিল, খাটটা ঠেলে দাও। ওদের তাড়িও না প্লিজ। তুমি উঠে এসো তো।

বাজারটা কাছেই। আরো কাছে তায়েবের বাড়ি। আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে কয়েক পা হাঁটতেই ভিড়টা চোখে পড়ে। ততক্ষণে পুলিশ কর্ডন করে ফেলেছে। দেবীবাবু সকাল বেলাতেই দরজা থেকে নাম ধরে ডাকছিলেন। আমি আর দেবীবাবু ব্যাপারটা সত্যি কী, জানতে এগিয়েছিলাম। তায়েবের নিঃসঙ্গ ছেলেটা মাঝে মাঝে মুন্নির সঙ্গে খেলতে আসত।

আমাদের দেখে সেই ছেলেটা করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। ছেলেটার আরও সামনে ঘরের চৌকাঠ ছাড়িয়ে দৃষ্টি ভেতরে যেতেই তায়ের আলির নির্মম পরিণতি দেখে আমি আর দেবীবাবু গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম তড়িতাহতের মতো। ঘরের সামনের চাতালে তায়ের আলির ছেলেটা বসা। ছেলেটাকে নাকি বেঁধে রাখাছিল। ছেলেটার পাশেই তায়ের আলির তিনটে পাঁঠা নির্বিবাদে কেনা ঘাস চিবিয়ে খাচ্ছিল। উদাসীন তায়ের-তনয়ের হাতের পাতা থেকে ঘাস তুলে নিচ্ছিল একদম ছোট পাঁঠাটি। এই অবলা চতুষ্পদেরা কি তাদের ঘাতকের পরিণতির কথা বুঝতে পারছে?

দেবীবাবু একবার অস্ফুটে বললেন, হরিবল।

কাল রাতে জগা পাগলা জ্বালিয়েছে। তখনই জানা ছিল এরকম কিছু ঘটবে। তায়ের আলির দুটো পা সিলিং-এর আংটা থেকে ঝুলছে। কণ্ঠার কাছটায় রক্ত জমে আছে। ঠিক তায়ের যেভাবে পাঁঠা মারে সেভাবেই কেউ তায়েরের কণ্ঠার কাছটুকু চিরে দিয়েছে। মেঝে রক্তে ভাসছে। তায়েরের মাথাটা মাটির দিকে ঝুলছে। ঝোলানো হাত দুটিতেও অনেক আঘাতের চিহ্ন। একটু দূরে একটা ছাগল দাঁড়িয়ে আছে। এই ছাগলের দুধ বিক্রি করে তায়েরের বৌ। সবচাইতে বুড়ো পাঁঠাটি দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যেতে চাইছে সেই দিকে। শিং দুটো শানে ঘষছিল, চার পা-ও। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়েও এই চতুষ্পদটি রমণার্ত। থানার বড়বাবু এগিয়ে এসে দু-একটি কথা বললেন। তায়েরের বৌকে পাওয়া যাচ্ছে না। তায়েরের ছেলেটি এইবার কেঁদে ফেলল। দেবীবাবু পা বাড়ালেন, আমিও। তায়েরের নিঃস্পন্দ শরীরটা এইবার নামিয়ে আনা হচ্ছে—

ছেলেটার কি হবে? ফিরতে ফিরতে খেয়াল হল। দেবীবাবু বললেন, ও চিন্তা পুলিস করুক।

আমি ভাবছিলাম এ বেলাটা নিয়ে এলেই হতো। দেবীবাবু আমার দিকে তাকালেন। চোখে বিস্ময়। আমরা বাড়ির দিকে হাঁটছি।

ন মতা খুব রাগারাগি করল। ওকে তো সবটা বলাই হয় নি।

—ঐসব দৃশ্য স্ট্যাণ্ড কর কিভাবে তোমরা?

—ছোটলোকদের ব্যাপারে কেন যে নিজেদের জড়াতে যাও নীরা দেবীও দেবীবাবুকে দুষবেন জানাই আছে।

মনটা খুব খারাপ হয়েছিল, থাকবেও। নমি আজ প্রায় সারাক্ষণ শুয়েই

আছে। সন্ধ্যের দিকে নীরাদি এসে আবহাওয়াটা সহজ করতে চাইছিলেন। কিন্তু আমি আলটপকা কী অলক্ষুণে কথা বলে ফেললাম।

নীরাদি আমার সামনেও ক্র্যাঙ্ক। বলছিলেন নমিতাকে, মুন্নিটার আর তর সইছে না। ভাই কবে আসবে, ভাই কবে আসবে বলে যা জ্বালাচ্ছে না অহরহ।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, কবে আসছে? দেরি আছে নাকি?

আমি হাসলাম, তা মুন্নির ভাই তো আসবে, কিন্তু ভাই রাখার জায়গাই নেই। ভাই-এর থাকার জায়গায় তো মুন্নির বেড়াল

নীরা প্রথমে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে-হাসতেই বললেন, রামো, কথার কি ছিরি। ভাই এলেই আমি মুন্নির জন্য নিয়ে যাবনা।

নমিতা খুব আহত হল। মুখ ফিরিয়ে নিল আমার দিক থেকে। আমার মুখ খুব খারাপ। কিছু যদি হয়ে যায় তখন? নমিতা তো আমায় আস্ত রাখবে না। না কাল সকালেই···

রাতে শোয়ার পরেও নমিতা গোঁজ হয়েছিল। খোঁচালাম। রাগি গলায় বলল, ওভাবে কেউ বলে নাকি?

—কি ভাবে?

—তুমি যা বললে।

—ও তো কথার পিঠের কথা। ধরতে নেই।

—ধরতে নেই? নাহ্।

নমিতা চিৎ হয়ে শুয়েছিল। চোখ সিলিং-এর দিকে। খাটের তলা থেকে নীরাদির মাদি বেড়ালটা অপত্যের ডাক পাড়ছিল। বাচ্চাগুলোর আওয়াজ, ফ্যানের শব্দ আমাদের কথায় চাপা পড়ে যাচ্ছিল। নমিতা ছাদের দিকে তাকিয়েই বলল, আজ যেন একটু কম নড়ছে। আমার মোটেই ভালো লাগছে না। কবে নিয়ে যাবে?

—কালকেই। এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন বল তো? বাচ্চাটার তো ঘুমও পায়। সারাক্ষণ দাপাবে নাকি।

নমি বুঝলাম আমার কথায় খুশি হল না।

আমি স্টেথোটা নামালাম। স্টেথোটায় আজকাল অসুবিধে হয়, জোড়ের কাছটা ভেঙেছে। ওটা নমিতা ফেলে দেবে বলেছিল। বাড়িতে বড় একটা লাগে না। নমি বলে মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয় সত্যি তুমি ডাক্তারি কর কিনা?

বাপের বাড়ির দিকে ব্রজ ডাক্তার বলে একজনের কথা বলে নমিতা। পসার ছিল না, স্টেথোস্কোপ সে নাকি ভাড়াও দিত কখনও ভুঁইফোঁড় হোমিও-প্যাথকে, কিংবা যাত্রা পার্টিকে, মাঝে-মাঝে ক্ষেপে গিয়ে আমাকে ব্রজ ডাক্তারও বলেছে দু-একবার নমিতা।

ভাঙা স্টেথোটা নামাতেই নমিতা রেগে বলল, ঐ ঘোড়ার ডিমে কিছু শোনা যায়? ওটা না পাল্টালে এবার দেখ ঠিক আমি ফেলে দেব।

কোমরের দড়িটা ঢিলে করল নমিতা। আমার হাতের নীচেই দু-বার ছেলেটা লাফাল। স্টেথোটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে, নমিতার পিঠে সাপোর্ট দিয়ে ওকে বসিয়ে বললাম, তোমার বাচ্চার হার্টবিট তুমিই শুনে নাও।

আহ্লাদীর মতো কানে ইয়ার পিস লাগিয়ে শুনল নমিতা। বলল, এই অওয়াজ? ঘড়ির শব্দে।

আমি বললাম, হ্যাঁ ওইরকমই তো।

নমিতার ভয়টা মরে আসছিল। হাসতে-হাসতে বলল, বাচ্চার কিছু হলে তোমার ডাক্তারি করা বের করে দেব।

নমিতার সারা শরীরে এখন সুখী ভাব। শীতের দুপুরে শরীর-ফোলানো পায়রার মতো।

নমিতা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমারও ঘুম আসছিল। কিন্তু এই এখনই জগা পাগলা ফের খেউর করে গেল। নমি শুনতে পায় নি বোধহয়।

ভোর বেলাতেই আমার শরীরে ঘাম ফুটে উঠল। নমির শরীরময় একটা শব্দকে আমি খুঁজে যাচ্ছি। সেই রাতের শব্দটা। পাচ্ছি না তো! তবে কি?

নমিতা ঠেলে তুলেছিল আমাকে, এই একদম নড়ছে না ভোর রাত থেকে।

হাতের নিচে বাচ্চাটা নড়লও না। শব্দটাও খুঁজে না পেয়ে স্টেথোটা সরিয়ে রাখলাম। নমি বলল, আমায় শোনালে না।

আমি বললাম, তুমি তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নাও। নার্সিং হোম যেতে হবে।

নমিতা সাজগোজ করতে করতেই ড্রেসিং টেবলে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলল। দেবীবাবু ট্যাক্সি ডাকলেন। আমি ওঠার পর নিজেও গাড়িতে উঠে বসলেন। আমার কাঁধে এখন প্রফেসারের হাত।

নমি ভর্তি হল। ডাক্তার বিশ্বাসকে বললাম, পাঁচ ঘণ্টা আমি বাইরে থাকব। একবার ডায়মণ্ডহারবার যেতে হবে।

ডাক্তার বিশ্বাস গভীর প্রত্যয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, পাঁচ-ছ ঘণ্টায় কিছু হচ্ছে না।

ডাক্তার বিশ্বাসের হাতের নিচে হারামজাদা নড়ে উঠেছিল। হৃদ্‌স্পন্দনও শোনা গেল। কালকে ওরকম একটা ছেঁদো কথা বলেছি। ডায়মণ্ড-হারবারে কাজটা একবারে সেরে রাখা ভাল। দেবীবাবু তো আছেন। না বললেও থাকবেন। নমিতা বলছিল, পালিয়ে যেওনা যেন।

কিন্তু কাজটা সেরেই আসা যাক।

সিস্টার কাকে ধমকাচ্ছিল, আজব বাক্যবিন্যাসে। 'বুঝলেন এখানে কেউ ভদ্রলোক নেই। ডাক্তারবাবু আছেন।' আমি তাজ্জব। বলে কি মেয়েটা। কেউ ভদ্রলোক নেই। সবাই ডাক্তারবাবু। মানে কি? কাছা-কাছি যেতে দেখলাম একটি মহিলাকে সিস্টার ধমকাচ্ছে। মহিলাটি আমার চেনা।—এই তো আমাকে এ বলছিল, ঐ ভদ্রলোককে একটু ডেকে দেবেন? এরা ডাক্তারবাবু বলতে পারে না?

মহিলাটি করুণা চাইছে। আউটডোর এখন বন্ধ। ইমার্জেন্সিতে সে রোগী নিয়ে এসেছে। আমাকেই দেখতে হবে। আমার যে তাড়া আছে। কলকাতায় কি হচ্ছে কে জানে। কেউ ভদ্রলোক নেই! সবাই ডাক্তারবাবু। মেয়েটা পাগল নাকি? নার্স-এর এই কথাটি কলকাতার কোনো কাগজ যদি কালই ছাপিয়ে দেয়। সবাই ডাক্তারবাবু। কোন ভদ্রলোক নেই। পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখি মুন্নির বাবার নাভিশ্বাসের মতোই। আমার তাড়া আছে। সেই লোকটা, যে গিয়ে কলকাতায় দেবীবাবুদের জ্বালাত। খস খস করে লিখে দিলাম, সিস্টার অ্যাডমিট হিম। নাথিং কুড বি ডান এক্সেপ্ট অ্যাকোয়াগ্যাঞ্জেস। চলি সিস্টার বাই। অ্যাপ্লিকেশনটা অফিসে জমা দিয়ে দেবেন। কেউ ভদ্রলোক নেই সবাই ডাক্তারবাবু।

নার্সিং হোমের গেটের কাছটায় দেবীবাবু, নীরাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেবীবাবু বললেন, লেবার রুমে নিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন তো কাল সকালের আগে কিছু হচ্ছে না।

আমি হেসে দেবীবাবুকে বললাম, মরে যাচ্ছে।

দেবীবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, কি যা-তা বলছেন।

সেই লোকটা, ডায়মণ্ডহারবারের। মুন্নির

'বাবা' কথাটা ওদের সামনে উচ্চারণ করতে পারলাম না। নীরা বললেন, তাই নাকি? কখন?

এতক্ষণে নিশ্চয়ই মরে গেছে। আমি যখন এসছি তখন তো খুব খারাপ অবস্থায়—

বাঁচা গেল—নীরার গলা।

দেবীবাবু বললেন, ছিঃ ওভাবে বলবে না।

নীরাদি বললেন, বলব না? কম জ্বালিয়েছে? নিজের মুরোদ নেই আমার মেয়েকে এখন কাড়তে চাইলেই দিয়ে দেব।

দেবীবাবু বললেন—আর চাইবে না।

রাত বাড়ছিল। দেবীবাবু আর আমি। আমি আর দেবী বাবু। নমিতা ভেতরে আছে। ভেতরের কোনো খবর নেই। দেবীবাবু সিগ্রেট টানছেন। কৃতজ্ঞতা জাগছে দেবীবাবুর জন্য। এখনও আমার জন্য না ঘুমিয়ে বসে আছেন। নীরা চলে গেছেন। দেবীবাবু কিছুতেই গেলেন না। নীরা বলছিলেন, না না ও আজ থাকবে।

জগা পাগলাটাকে দূরে কোথাও তাড়াতে হবে। তায়েবের বাচ্চাটার কী হবে? কোথায় আছে ছেলেটা। খাওয়া দাওয়া। নার্সটা যেন কি—! এখানে ভদ্রলোক নেই, ডাক্তারবাবু আছেন।

আচ্ছা মারল কে তায়ের কে? বৌটাই বা গেল কোথায়? 'বন্ধুগণ' মনে হতেই সেই মর্মস্পর্শী বাক্যবিন্যাস, 'আমরা বৌবাজারের লোক .'।

আমাদের খাটের তলার খাটটাকে বেড়ালটা নোংরা করে রেখেছে। বেড়ালটা নবজাতকদের সঙ্গে নিয়ে খাট থেকে নেমে এল কি? মুন্নি কি করছে এখন? নমি তোমার কি খবর? কতটা প্রগ্রেস করলে? খবর নেই। মনের মধ্যে যাবতীয় দুর্ভাবনা এ সময় বটের ঝুরি নামিয়ে ফেলছে যে। চোখ বন্ধ করে ফেলি। এখন সব অন্ধকার। সেই অন্ধকার ধরে রক্তাক্ত তায়েবতনয় হেঁটে আসছে যে। সেই বুড়োটাকে আমি আজ ফেলে পালিয়ে এসছি। লাল শাড়ি পরা মহিলাটি আমায় শাপান্ত করছে না? জগা পাগলার মতো সেও আঙুল তুলে আজগুবি কী সব বলছে। খাটের তলার ছোট খাটটায় একী, নীরাদির বেড়ালটা মরে কাঠ হয়ে আছে। দূর শালা। কি উল্টোপাল্টা ভাবনা দেখ। প্রফেসর ঘুমিয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক নেই। ডাক্তারবাবু আছে। বোগাস। উদ্ভট ভাবনা সব।

পালা পালা। ঘুম আসছে। প্রফেসর আমিও ঘুমুচ্ছি। ফানি থিঙ্কিং। যাহ্। নমি গুডনাইট।

…সিস্টার বলল—কংগ্রাচুলেশনস্। সেই নার্স। ভদ্রলোক নেই ডাক্তার বাবু আছেন। এ কথা-সে কথার পর বলল—আপনি যাকে গঙ্গাজল দিতে বলে গিয়েছিলেন সে চিনির জল পেয়ে চাঙ্গা হয়ে বাড়ি চলে গেছে। —মানে? লালাদা পাশেই ছিল, বলল, ওর বউ-এর এই এখন-তখন অবস্থা তাই তো বেচারা নাভিশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাসে গুলিয়ে ফেলেছিল। আরে সেন, ইন্ট্রাভেনাস গ্লুকোজ দিতেই ভেউ ভেউ করে সেকি কান্না। পাঁচ-ছদিন নাকি প্রায় কিছু খায়ই নি। ওদের এক বাচ্চা…

ভালো খবর। আমি উঠতেই লালাদা বলল—এখনই পালাচ্ছ। খাওয়াবে কবে।

খাওয়াব। পরশু আসছি।

বাড়ির কাছাকাছি কালো জালওয়ালা গাড়ির জানলা থেকে একজন বলে উঠল, শুনছেন?

ড্রাইভারের পাশে, ও.-সি বন্ধুটি।

—এই বলেন আমরা কিছু পাবি না? দেখবেন?

গাড়িটা থামল। আমি খুনীকে দেখলাম। চমকে উঠেছিলাম। জগা পাগলাকে ধরেছে।

—করেছেন কি! পাগলটাকে!

তায়েবতনয় ঘুমের মধ্যে ভয়ের চোটে থানায় প্রথম দিন রাতে কেঁদে উঠেছিল। বড়বাবু কাছে যেতেই নাকি চেঁচিয়ে বলেছিল—জগা পাগলাকো কোতল করেগা। বড়বাবু বলল—কিউ! তায়েবতনয় পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল। থানার বড়বাবু বলছে—ঐ যে খেউড় করত না ও, ওটা হল ওর ইশারা, শ্যামের বাঁশি আর কি। এই হারামজাদা এদিকে আয়।

—লোহাপুলের কাছে জগার আখড়া খুঁজে পেয়েছি। সেখানে যাত্রার গোঁফ দাড়ি, টিনের তোরঙ্গ ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। একটু খোঁজা-খুঁজি করতেই যাত্রার কোনো এক অভিনেত্রীর ছবি পাই। দেখুন দেখুন। ভাল না? বুঝতে পারেন এ এখন ছাগলের দুধ বেচে। মেলে তো। মিট চপারটা পাওয়া গেছে একটু দূরে লাইনের কাছাকাছি। চম্পাহাটি

স্টেশনেই আজ জগা পাগলাকে পাকড়াও করা গেছে তাযেবগৃহিণী সমেত। এই হারামজাদাই তাযেবের পার্টনার ছিল। তাযেব আলিও এলেমদার মশাই। যাত্রার মেযেকে কেমন ফুঁসলে……জগার খিস্তির লাইনদুটো মনে করতেই এখন দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

বড়বাবু আমার কথায় বলে উঠলেন, কেন মিছিমিছি ঝামেলা করবেন।

একথা-সেকথার পর বলে উঠলেন—ঠিক আছে পাঠিযে দেব খন, আপনি যখন বলছেন। এসব দাতব্য তো আপনাদেরই পোষায়। খুনী ঠিক কিনা বলুন। ধরেছি তো। জগা অবশ্য স্বীকার করে নি। ওর বাপ স্বীকার করবে। বামাল ধরেছি। হেঃ হেঃ।

গাড়িটা চলে গেল। নীরুর জামা প্যান্টের দোকানের কাজ সেরে বাড়ির গলিতে ঢুকতেই শুনলাম ঢোলের আওযাজ। অন্যের বাড়িতে দেখলে আমার হাসিই পেত—নিজের বাড়ির দরজায হেঁড়ে গলা আর ঢোলের আওয়াজে যুগপৎ লজ্জা এবং রাগ হল। হিজড়ে সর্দারের সঙ্গে দেবীবাবু! হেসে-হেসে কীসব বলছিলেন। আমাখে দেখেই বললে, এই যে ছেলের বাবা।

কি করে যে খবর পায এরা! সর্দার বলছে—ছেলে হযেছে, পাঁচটাকায় হবেন্যি অ্যা হা অ্যা। অহ্ দিদিমণি—দিদিমণিগো—সন্ততির নপুংসক সম্বর্ধনার আয়োজন হচ্ছে। হিজড়ে সর্দারের পাশে দাঁড়িয়ে, আমার রাগ হল, অসমর্থ অ্যাজোস্পারমিক দেবীবাবু কেলিযে যাচ্ছেন।

—এই প্রফেসর কি হচ্ছে কি! তাড়াতাড়ি বিদেয করুন।

—অহ্ দিদিমণি ছেইল্যা কই? দেবীবাবু এগিযে আসতে-আসতে বললেন —চটছেন কেন? খোঁজ নিযে দেখুন আপনার জন্মের সময়ও নেচেছে।

নীরা ছোটখাটটা পরিষ্কার করছিল। ঠোঁটে টেপা হাসি—সুধাবাবু, আমার বেড়াল ভদ্র—সময় মতো জায়গা ছেড়ে দিযে গেছে।

নমিতা হাসল, উবু হযে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে ঢোলের আওয়াজ। হাতের মোড়কটার দিকে তাকিযে হঠাৎ চমকে ওঠার ভান করল নীরা।

—দেখি দেখি কি এনেছেন। এমা এত বড় জামা প্যান্ট দিযে কি হবে?

—নমি বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হারা ঠাউরে আমার দিকে দেখল।

দেবীবাবু বুদ্ধুর মতো বলে উঠলেন—ওকি মশাই ও জামা প্যান্ট পরতে তো ছেলের অনেক দেরি আছে।

আমি বললাম—এ বাড়িতে আর-একটি ছেলেও আসছে দেবীবাবু।

সব বললাম। ডায়মণ্ড হারবারের গল্পটা বাদে। লালা বলে ভাল, ক্ষুধার্তর দীর্ঘশ্বাসকে নাভিশ্বাস বলে ভুল করেছি। এই সময়ে নীরাকে বিষণ্ণ করে দিতে ইচ্ছে হল না আমার। মুন্নির বাবাও ফের আসবে দেবী বাবু। আমার নতুন সন্ততির নপুংসক সম্বর্ধনা চলছে। আমি আড়ালে সরে আসি। হিজড়ের নাচ, ঢোলের আওয়াজের মধ্যেই অসমর্থ দেবীবাবুর পাশে আমার পৌরুষ হঠাৎ পায়ে পা ঠুকলো।

—তায়েরের ছেলেটাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

আর আমার এই আলোকিত সংসারে আজ কিংবা কাল মা-ও এসে পড়বেন।

চণ্ডীমঙ্গল

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এবার তোমাকে বেঁধেছি প্রখর তূণে।

খরায় জ্বলেছে পাপিষ্ঠ বৈশাখ,
সে লি লি আগুনে তুমি নর্তকী মায়া,
মৃগয়ার রাতে নিষ্ঠুর লুব্ধক,
লুঠেরা গানের মোহন ফাঁসের
মিহিন তন্তু, রশ্মি,
অন্তিমে যাদু দুহাতে ছিঁড়েছি, তৃষ্ণা—

এবার তোমাকে বেঁধেছি নিজের গুণে।

অপরাধী মেঘ দীর্ঘ সজল ছায়া
হেনেছে পাথরে, টিলায়।
তুমি জানো,
শুধু তীর ছুঁড়ে এ তো আকাশ-নামানো খেলা,
তুমি ভাবো,
আঁচে-রাঙা চোখে মাটি শাসানো,
আসলে প্রগাঢ় চাপে চাপে, প্রিয়,
ফিনিক দিয়েছে ইচ্ছে—

তাই মুখোমুখি দেখা ঘন ফাল্গুনে।

ধরা পড়ে গেলে। মৃদু মায়াটুকু থাক,
বিছিয়ে দিলাম নিভৃতে উত্তরীয়,
তার নীচে, ভীরু বাসনার তৃণ ছুঁয়ে
দ্যাখো, বিষে নীল উন্মাদ উত্তীয়,

তুমি নও, আমি সজল করেছি পৃথা
দীর্ঘ বিরহ-তীক্ষ্ণ চোখের তীরে,
নাচাক সবুজ খড়ি-ওঠা ঘুণে ঘুণে,
ও লি লি আগুন-রাঙা নর্তকী মায়া
এবার তোমাকে বেঁধেছি প্রখর তূণে।

গল্পের গরু

রবি ভট্টাচার্য

আমার একটা গল্প ছিল
গল্পে এক গরু
কিন্তু হায় ঘাসের দুর্ভিক্ষ

তবে
গল্পটা আমার
গল্পে গাছ ছিল গাছে পাতা
পাতায় প্রোটিন

লাল প্রবোচনা, প্রার্থনার
সিঁড়ি
অথবা আবব্য রজনীর
উড়ন্ত গালিচা আশৈশব
যে ভাবেই হোক গরু
গাছে ওঠে
গল্পটা আমার

সময়-অসময়ের কবিতা

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (দ্বিতীয় সংস্করণ)। বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। বারো টাকা। ১৯৮০

১৯৭০ সালে 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র প্রথম সংস্করণ 'ভারবি' প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর পর 'বুক ট্রাস্ট' ছেপেছেন বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ। মধ্যবর্তী পর্বে কবির আরো কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত প্রচুর কবিতাও রয়ে গেছে। নতুন সংস্করণটি হাতে নিয়ে দেখা গেল ভারবি-সংস্করণের বেশ কিছু কবিতা বাতিল হয়েছে, নতুন বই ও বইয়ের বাইরের অনেক কবিতা জায়গা পেয়েছে। সব মিলে দুটি সংস্করণের আয়তন কম-বেশি প্রায় একই।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা রচনার অজস্রতা তাঁর যে-কোনো পাঠকের মতো আমাকেও বিস্মিত করে। কাব্যচর্চার প্রথম পর্ব প্রেম ও উন্মাদনায় টইটম্বুর—যাকে কবি 'ধর্মীয় উন্মাদনা' আখ্যা দেন। তীব্রতা, তন্ময়তা ও সমর্পণ—এই তিনটি বিষয়ই বোধহয় কবিকে অমনতর শব্দ-ব্যবহারে প্ররোচিত করেছে। 'একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল'—জাতীয় কিছু অসামান্য স্বাদেশিক পংক্তি অসহ গতিতে তাঁর এ-পর্বের কবিতায় ছুটে এলেও প্রথম দুটি বই 'গ্রহচ্যুত' (১৩৪৯) ও 'রাণুর জন্য' (১৩৫৮) বস্তুত স্নিগ্ধ, কুসুমগন্ধী প্রেমার্তিরই কবিতাবন্ধ। 'রাণুর জন্য'র অন্তর্গত সুপরিচিত 'মুখোশ' কবিতাটিতে যেটুকু লুপ্তধৈর্য মাথানাড়া আছে, আজ মনে হয়, তার জন্য সাগরপারের হাওয়া যত বেশি দায়ী, কবির সময় ও স্বকালের অনুভব ততখানি নয়।

তাই বেশ খানিকটা প্রস্তুতিবিহীন অবস্থাতেই ঠিক এর পরের পর্বের পরপর প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হয়। প্রেমিক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যান এবং সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ তাঁর জায়গাটি দখল করেন। 'উলুখড়ের কবিতা' (১৩৬১), 'মৃত্যুত্তীর্ণ'

(১৩৬২) ও 'লক্ষিন্দর' (১৩৬৩)-এ আমরা আমাদের চোখে মুখে সেই গরম হাওয়ার ঝাপটা অনুভব করি, যা কি না সদ্য-স্বাধীন দেশের আশাহত এক তরুণের সুর-সঙ্গতিভ্রষ্ট, বিদীর্ণ স্বরাঘাত। একান্ত ব্যক্তিগত নারীর জন্য সাজানো যৌবন-স্বপ্নের আকাশকে চৌচির করে প্রায় শূন্য থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে 'শিশুর কান্না' 'রুটি দাও' 'বেহুলা-নাচানো স্বর্গ'-র মতো সরাসরি এবং আরেকটু স্থিত, মেধাবী 'প্যারীর আগুন' ও 'জীবনানন্দের মহাপৃথিবী'র মতো কবিতাবলি। কবির এই প্রাথমিক ক্ষুব্ধতা অন্তর্জ্বালাকে ঢেকে দিয়ে অসম-দ্বৈরথে ক্লান্ত ও হতাশ মানুষের নিবিড় উচ্চারণও উঠে আসে না, তা নয়। বহুপঠিত কবিতা 'প্রভাস'-এ তো তিনি লিখেই ফেলেন—'ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে / মরণ চাই আমি আকাশে বুক রেখে ; / তবুও হাঁটে তারা—ক্ষুব্ধ বলরাম, / অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র।'

আত্ম-উন্মোচনের এই দ্বিধা, অস্থিরতা ও সংকট বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অন্ধকারের ভিতর লালিত রাখে নি, এ আমাদের সৌভাগ্য। 'অমল' শব্দটি তাঁর বড় প্রিয়। শব্দটিকে যতখানি আয়তনবান অর্থে নেয়া যায়, সে-প্রচেষ্টায় আজও তিনি ক্লান্তিহীন। এই শব্দটির হাত ধরেই তিনি এলেন 'জাতক' (১৩৬৫) কাব্যগ্রন্থের 'ভিসা অফিসের সামনে' ও 'মায়ের মুখ'-এর চিরজায়মানতায়। আর এখান থেকে শুরু এবং আজও—তাঁর অন্তহীন স্বদেশযাত্রা। বলা বাহুল্য, এই দেশ কাঁটাতার-ও পাশপোর্ট-বিহীন।

অবশ্য বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই গতি যত না পদাতিকের তার চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রমী শেরপা-র। কবিতা লেখার যে-সব পন্থা তিনি গ্রহণ করেন, তা অনেক সময় রীতিমতো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় অ-কবিতার সীমারেখায় চলে যাওয়ার ঝুঁকি তিনি নিতে পারেন যখন-তখন, শুদ্ধ লিরিকের মান্য খাঁচাকে যে-কোনো সময় তছনছ করে দিতে তাঁর কলম এতটুকু কাঁপে না। প্রত্যাশিত ফুলের জায়গায় বহুসময় তিনি আমাদের হাতে তুলে দেন কর্কশ পাথর, অবশ্য, এ-পাথরে তাঁর কাঁচা, তপ্ত অনুভূতির অশ্রু ও রক্ত প্রায়শ লেগে থাকে।

এইসব লক্ষণগুলি আস্তে-আস্তে মাথা তুলছিল 'সভা ভেঙে গেলে' (১৩৭১) ও 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' (১৩৭১)-তে। চাপা নৈরাজ্য ও নন-কনফর্মিজম—যা কমবেশি চিরকালই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কখনো সদর্থে উত্তেজিত, কখনো-বা প্রতারিত, করেছে, 'মুখোশ' কবিতাটিতে যার উন্মেষ

এই নতুন পর্বে তা ক্রমশ গাঢ় ও তিক্ত চেহারা নিতে লাগল। 'সভা ভেঙে গেলে'-র 'অনেক রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় তিনি লিখে ফেললেন, 'এক লক্ষ বছরের পর / রবীন্দ্রনাথের গান ইঁদুরের আত্মার ভিতর।' আর-একটি কবিতায় ফেটে পড়ল প্রখর আত্মদ্রোহ, 'আমরা সবাই ক্ষুদ্র ইতর বামন / চাঁদের আলোয় যে যার মুখ দেখে / অন্য সময় মাথার চুল ছিঁড়ি / আয়না ভাঙি, তবু এখন অবাক / ঘাসের ওপর মার্কাস স্কোয়ারে' ('কবিতা পরিষদের বইমেলায়')।

বাঙালি মধ্যবিত্ত লেখক-কবিদের একটি অতি প্রিয় বিষয় আত্মসমালোচনা বা আরও ভালো ভাবে বলতে গেলে, তুমুল অনুশোচনা। এর অতিরেক কত ভয়াবহ হয়ে ওঠে, কতখানি দায়িত্বহীন ও মন্তব্যপ্রধান—তার নজির আমাদের সাহিত্যে ছড়ানো। আমাদের ভাগ্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার কাঁটা যতবারই এ-দিকে হেলেছে, বিপরীত মেরুর টানে আবার শুশ্রূষার ইতিবাচক দিক-সন্ধান করেছে। ফলে, ওপরের পংক্তিগুলি লিখে ফেলার পর মুহূর্তেই যেন কৃত্য করেন তিনি—'সারা অঙ্গে মন্ত্র হচ্ছে; তোর বুকের মাঝখানে / দেখতে পাচ্ছি নবজন্ম, শুনতে পাচ্ছি শিবের নিঃশ্বাস। / কোথাও সধবা নাচছে, / নেচে উঠছে মৃত লখিন্দর; / চন্দন নিমের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস' ('তোর বুকের মধ্যখানে')।

তবু, এই পর্ব থেকেই সামাজিক, রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক সহজ-সাধনের বিরুদ্ধে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শরসন্ধান শুরু হয়েছিল। এই সন্ধানের সার্থকতা-ব্যর্থতাই তাঁকে শেষ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় চিহ্নিত করেছে। 'মুখে যদি রক্ত ওঠে' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতায় আমরা প্রথম এ-পথে কবির পদচিহ্ন আবিষ্কার করি, 'মুখে যদি রক্ত ওঠে / সে-কথা এখন বলা পাপ। / এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদের চোখে ঘুম নেই, / এ-সময়ে রক্তবমি করা পাপ, যন্ত্রণার ধনুকের মতো / বেঁকে যাওয়া পাপ; নিজের বুকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ।' অথচ, আশঙ্কার মেঘ কেটে যায় না' যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যান করার পর প্রায় একই নিশ্বাসে তিনি দক্ষিণ হাতে মাইকেলকে অঞ্জলি দেন, 'কাঁটা সাপ, নরকের বমন মাড়িয়ে / তীব্রজ্বালা যদি কোনো ধুতুরা, অর্কিড / একদিন বুকে করে আনতে পারি, পাষাণ-পুরীতে আমি তোমাকে প্রণাম করতে যাব' ('মাইকেলের সমাধি')। যদিও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা এ-ধরনের কবিতা রচনাতেই, তবু মনে

হয়, তাঁর প্রকৃত সিদ্ধি মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিবিড় ও শুদ্ধ রচনায়, যা একই সঙ্গে দেশের শিকড়-লীন দুঃখ ও আকাশের বিপুল বিস্তারের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটায়। খুব মনে পড়ে যায় 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ', 'রূপসী বাংলা'-র মতো কবিতা, ভোলা যায় না এরকমের চিরায়ত পংক্তিমালা, 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে / কারা যেন আজো ভাত রাঁধে / 'ভাত বাড়ে, ভাত খায়। /আর আমরা সারা রাত জেগে থাকি/আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,/ প্রার্থনায়, সারা রাত' অথবা 'চোখের জল শুধু চোখের জল / চুমার দাগগুলিকে ধুয়ে দেয়,/তুমি মিছেই বুকে টেনেছ, তার মুখ / চোখের জলের সাগর।' আর কবি যখন এই প্রার্থিত ভূমিতে পৌঁছতে পারেন না, তখনও একান্ত সততার সঙ্গে শিশুর সারল্যে বলে ওঠেন, 'স্পর্শ করলে পুনর্জন্ম হতে পারে / কিন্তু মাঝখানে / বাতাসে শূন্যতা, চোখের জল ঝরে / যেন শীতের হলুদ পাতা' (বন্ধুর হাত)। আর এই সততায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় আমাদের ঈর্ষিত সফলতায়, 'ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে / একে একে তার রূপের অলঙ্কার / খুলে ফেলে, আর গভীর রাত্রি নামে / তিন ভুবনকে ঢেকে , / সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে / দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ। / যায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল-নিরুদ্দেশে / দেখি আর ঘুম পায় ।।' (ভুবনেশ্বরী যখন)।

পরবর্তী পর্বের তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'মহাদেবের দুয়ার', 'তৃণ তরঙ্গ রৌদ্রে / রাত্রি শিবরাত্রি', 'হাওয়া দেয়'—এ-জাতীয় ধ্রুবপদেরই ক্রমান্বয়িক সংযোজন দেখতে দেখতে আমাদের প্রত্যাশা ও তৃষ্ণা সমান্তরাল ভাবে বেড়ে যেতে থাকে।

কিন্তু ষাটের দশকের শেষ দিক থেকে যে ছিন্নমস্তা রাজনীতি সব কিছুকে ছাপিয়ে খরসান হয়ে ওঠে, তা কবিকে লুপ্তধৈর্য করে দেয়। অবশ্য 'মানুষের মুখ' কাব্যগ্রন্থে এর পূর্বাভাস যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তার চেহারা ছিল বিমূর্ত। 'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা', 'রাস্তায় যে হেঁটে যায়' বা 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে' কাব্যগ্রন্থগুলিতে অসংখ্য প্রাণের অপচয়ের প্রতিবাদে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরাসরি একমাত্রিক ও তাড়িত কবিতা-রচনায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। আমার ধারণা, বেশ পরিকল্পিতভাবেই তিনি এ-পথে সদম্ভে পা দিলেন, মনে করলেন, এ কাজ তাঁর ধর্মযুদ্ধ। শিল্প হল, কি না-হল সে-বিষয়ে কিছুমাত্র এসে যায় না তাঁর, বিশেষত এমন রাক্ষসী বেলায়। অবশ্য এই পর্বেও তিনি লিখছিলেন 'সত্যকাম', 'পৌষ' 'মদনভস্মের পর', 'রাত্রি শিবরাত্রি'-র মতো আশ্চর্য নিটোল কবিতাবলি।

মঙ্গলকাব্যের ভিখারি শিব ও দারিদ্র্যের চাপে দিশেহারা পার্বতীর ছন্নছাড়া ঘরকন্না—যা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বরাবরের প্রিয় বিষয়, তারও উজ্জীবন মাঝে-মাঝে আমাদের অনুভূতিকে দুর্লভ আলোয় উজ্জ্বল করে তুলছিল। তবু, তাঁর লক্ষ্যবেধের কেন্দ্র ছিল অন্যত্র, যেখানে উচ্চারিত হয়, 'রূপসী তুই রাজনীতি, দিস / ছেলে-ছোকরাদের মাথা ঘুরিয়ে ; / কিন্তু বুড়ো-শয়তানদের সঙ্গে থাকিস রাত্রে শুয়ে' ('রূপসী রাজনীতি'), বা 'শিশুরা যায় হাটে / শিশুরা যায় মাঠে ; / দিনদুপুরে তাদের বাবা / মায়ের গলা কাটে' অথবা একেবারে ১৯৮০-তে লেখা 'মুঠো খালি রাখতে নেই। / ফুল-বেলপাতার কাজ শেষ হয়ে গেলে / হাতের কাছে যা পাওয়া যায় পথের, ধুলো, একটা মরা ইঁদুর/তাই আমরা আমাদের জাগ্রত শালগ্রাম-শিলাদের জন্য / দু-হাত ভর্তি করে নিয়ে আসি / তাঁরা প্রসন্ন হন' ('মুঠো খালি রাখতে নেই')।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখন প্রবীণ। জানি না, তাঁর ছটফটে অফুরন্ত আবেগ এর পর তাঁকে কোথায় নিয়ে যাবে। মনে হয়, 'ভিসা অফিসের সামনে' ও 'মহাদেবের দুয়ার' কাব্যগ্রন্থে তিনি যে-মানসিকতায় লালিত ছিলেন, সেখানে, আরও পরিণত এবং অবশ্যই, খানিকটা ভিন্ন পথে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে তাঁর মধ্যে আবার মাথা তুলছে। অথবা এ কি আর-এক রণক্ষেত্রে তাঁর পদসঞ্চার? এই প্রশ্ন প্রায় উত্তরে রূপান্তরিত হয় যখন আমরা 'জন্ম পূর্বজন্ম'-র মতো হালের কবিতায় পাঠ করি—'কঠিন থেকে কঠিনে তার উত্তরণ / যতদিন না পথের শেষ হয়। / সেখানে নিঃসঙ্গ মানুষ দেখে জীবন আর মরণ / এক হয়েছে আলিঙ্গনে।'

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো জীবন্ত কবির কাছে আমাদের বিস্ময়ের প্রত্যাশা সহজে ফুরতে চায় না।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ইংরেজ, কৃষক ও রায়ত

The Peasantry of Bengal—R C Dutt, Edited with an Introduction by Narahari Kabiraj, Manisha, 1980. Rs 40/-

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত *The Peasantry of Bengal* ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় ১০৬ বছর পরে ১৯৮০ সালে বইটি অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বাংলার কৃষকদের

ইতিহাস এবং রমেশ চন্দ্রের ভাবনা আটটি অধ্যায়, তিনটি *Appendix*, এবং সম্পাদককৃত সংযোজন অংশে বিধৃত আছে।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে রমেশচন্দ্র হিন্দু ও মুসলমান শাসনে বাংলার কৃষকদের সার্বিক অবস্থার যে বিবরণ দেন তাতে জানা যায় যে সেই সময়ে এক একজন জমিদার ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের রাজা, জমিদার ভালো হলে কৃষকরা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারত, আর অত্যাচারী হলে তাদের বেঁচে থাকাটাই দায় হয়ে পড়ত। বাংলা অঞ্চলে এই রকমটি কেন হল—তার উত্তরে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন বাংলার লোক আসলে খুবই শান্ত স্বভাবের; তাই অত্যাচারিত হলেও তাদের রক্ত গরম হয় না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের কৃষক এমন নিরীহ নয়, তারা অত্যাচার-প্রতিবাদের নিয়মে সাড়া দেয়। মুঘল আমলে টোডরমল এবং মুর্শিদকুলি খাঁ জমিদারদের এলাকা-ভিত্তিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছু বেঁধে দেন, এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত কিছু পরিবর্তন ঘটান।

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভূমি-ব্যবস্থার যে-সব পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অন্যতম এবং অন্তত রমেশচন্দ্রের জীবদ্দশায় এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে জমিদার শ্রেণী; চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঐ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী একটি পাট্টা স্বরূপ। রমেশচন্দ্র মনে করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যেমন ভারত সরকারের সঙ্গে জমিদারদের একটা প্রায় অনন্তকালের সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা হয়, তেমনি জমিদারদের সঙ্গে কৃষকদের একটা অনুরূপ নির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। তাঁর আফশোস শহরের শিক্ষিত এবং গ্রামের বিত্তশালী ভদ্রলোকেরা কৃষকদের সর্বৈব দুরবস্থা সম্পর্কে নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন। কৃষিকার্যে পরিশ্রমী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটিরে বনবাসকারী এবং কর্ষণসম্পৃক্ত ধর্মে বিশ্বাসী সরল কৃষকদের উপর জমিদারদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক অত্যাচারের কথা সকলের বিদিত থাকলেও শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো জনমত সৃষ্টি হয় নি—সংবাদপত্রগুলি এ-বিষয়ে আশ্চর্যভাবে নীরব কিংবা নিষ্ক্রিয়, কারণ অধিকাংশ সংবাদপত্রের পরিচালক জমিদার-সমর্থক, এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। রমেশচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচক; তিনি কর্ণওয়ালিসকে কৃষকস্বার্থবিরোধী এই আইনের জন্য দায়ী করেন, কিন্তু তিনিই আবার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একজন নিষ্ঠাবান সমর্থক। তাঁর ধারণা ব্রিটিশ সরকারই কৃষকদের দুর্দশা থেকে মুক্ত করতে পারে।

১৮৫৯ সালের দশ আইন কোনো-কোনো শ্রেণীর কৃষকদের জমির উপর কিছু অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। তিনি আশা করেছেন এই আইন কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ এবং সরকার ভবিষ্যতে আরো ব্যবস্থা নিয়ে সর্বশ্রেণীর কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

The Peasantry of Bengal-এ রমেশচন্দ্র কৃষকদরদি—কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট এবং সাংগঠনিক রাজনীতিতে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তিনি সর্বদাই কৃষকদের পক্ষেই আছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব নীতি, দেওয়ানি আদালত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোনো কিছুই তিনি সমর্থন করেন না। এমন কি তিনি অত্যাচারিত, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপে ন্যুব্জ কৃষকদের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য 'বেঙ্গল মেগাজিনে' কলম ধরেন, এবং বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' ইংরেজিতে আংশিক অনুবাদ করেন। তবু রমেশচন্দ্র মনে করেন যে জমিদারদের কবল থেকে একমাত্র ব্রিটিশ সরকারই কৃষকদের উদ্ধার করতে পারে; তিনি যেন ব্রিটিশ সরকারকে এই উদ্ধারকার্যে টোডরমল বা মুর্শিদকুলির ভূমিকায় দেখতে চান। রমেশচন্দ্র বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে তাঁর মত পরিবর্তন করেন, এবং তিনি ঐ বন্দোবস্তের সমর্থক হয়ে ওঠেন—এর কারণ কি তা আমাদের যথেষ্ট ভাবার।

অধ্যাপক কবিরাজ তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রমেশচন্দ্রের কৃষকদরদি মনের পরিচয় অনেক উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন। তাঁর বই-এর *Appendix B*-র দুইটি অধ্যায়ে রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের কৃষক' এর 'প্রথম পরিচ্ছেদ—দেশের শ্রীবৃদ্ধি' এবং 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জমিদার' অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। অধ্যাপক কবিরাজ এই বিষয়টির ওপর কিছু আলোচনা করলে পাঠক লাভবান হত নিঃসন্দেহে কারণ এই সূত্রে পাঠক বঙ্কিম-রমেশের কৃষকচিন্তার সঙ্গে পরিচিত হত। প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বলেন 'যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটিয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।·· দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে, আমি কাহারও জয় করিব না।' দ্বিতীয়টিতে জমিদারদের বিষয়ে বঙ্কিম বলেন

তিনি 'জমিদারের দ্বেষক' নন, তবে একথাও কিছু সত্য বটে যে 'জমিদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে'। বাস্তবিক পক্ষে, রমেশচন্দ্র তাঁর বই-এর পঞ্চম ও সপ্তম অধ্যায়ে আইন-আদালত এবং সরকারের পরোক্ষ করনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে জমিদারগণ আইন-আদালত ও পরোক্ষ কর-নীতির সাহায্যে কৃষকদেরই ওপর অত্যাচার করে। ন্যায় বিচারের জন্য আদালতের সাহায্য নেওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি কম কৃষকেরই থাকে, এবং পরোক্ষ করের বোঝা কৃষকরাই বহন করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রামের শিল্প আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র তাঁতিদের ম্যাঞ্চেস্টার মিলের সস্তা কাপড় আমদানিজনিত দুর্ভোগের জন্য কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন না। অথচ ভারতীয় তাঁতিদের অবলুপ্তির জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককেও (১৮৩৪-৩৫ সালে) বলতে হয় যে তাদের অস্থিতে ভারতের মাটি সাদা হয়ে আছে, রমেশচন্দ্রের এ বিষয়ে অনুৎসাহ আমাদের দুঃখ দেয়। রমেশচন্দ্র বিদেশ থেকে মেশিন আমদানি করে ম্যাঞ্চেস্টারের প্রভাব হ্রাস করার পরামর্শ দিয়েছেন; এবং এই প্রসঙ্গে *Appendix-C* অংশে যোগেশচন্দ্র দত্তের *Indian Mirror*-এ প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধ সংযোজন করেছেন। '*Manufacture*' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র বলেন যে তিনি ইংরেজদের সততা এবং ন্যায়নীতিবোধে বিশ্বাস করেন, তবু তিনি জানেন যে তাদের স্বার্থ একান্ত অর্থনৈতিক, তাই ইংরেজদের ওপর নির্ভর না করে ভারতীয়দের নিজেদের চেষ্টায় শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে মনোযোগী হতে হবে। '*Agriculture*' প্রবন্ধে যোগেশচন্দ্র দত্ত শিক্ষিত যুবকদের কৃষিক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদর্শনের পরামর্শ দিয়েছেন।

যোগেশচন্দ্র দত্তের সব মতামত রমেশচন্দ্র মানেন না বটে, তবে তার গুরুত্বও অস্বীকার করেন না। ভূমিকা অংশে ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের কৃষক ও গ্রাম বিষয়ে ভাবনার যে উপকারী আলোচনা আছে সেখানে যোগেশচন্দ্র দত্ত স্থান পেলে ঔপনিবেশিক দ্বিধাগ্রস্ত চিন্তার মধ্যে মুক্তির বাতায়নও এক ঝলক দেখত পাঠক।

রমেশচন্দ্র শেষ বা অষ্টম অধ্যায়ে কৃষক শ্রেণীর সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যত অবস্থা বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর বিশ্বাস ব্রিটিশের অধীনে কৃষকরা যদি লেখাপড়া শিখতে পারে, কৃষির উন্নতির জন্য যদি সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় এবং যে কোনো আকালের কথা চিন্তা করে শস্যের মজুতভাণ্ডার

যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে কৃষকরা সুদিনের মুখ দেখবে। আর কৃষকদের জন্য এইসব ব্যবস্থা ব্রিটিশ ছাড়া অন্য কোনো শাসক গ্রহণ করবে না বলে তাঁর বিশ্বাস।

রমেশচন্দ্র ব্রিটিশ শাসন তুলে নিলে কৃষকদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে শিহরিত হন, এবং এইখানে যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের মতপার্থক্য দুস্তর।

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ *Bengal Magazine* থেকে রমেশ চন্দ্রের পাবনা কৃষক আন্দোলনের (১৮৭৩) ওপর আলোচনা এবং ১৮৫৯ সালের দশ আইন বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা পুনর্মুদ্রণ করে আমাদের ঋণী করেছেন।

শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত

নাট্যবিশ্ব : নাট্যভাবনা

নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইম্প্রেশন সিণ্ডিকেট। ২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৬। ১৯৭৮ ত্রিশ টাকা।

বছর দু-এক আগে প্রকাশিত হলেও সম্প্রতি বইটি পেয়েছি আর পড়ে আনন্দ পেয়েছি। উপকৃত বোধ করেছি। লেখক আমাদের অনেকেরই বহুদিনের বন্ধু ও বিবিধ প্রয়াসে বিশিষ্ট সহযোগী। একাধারে রচনা, ভাষণ, অভিনয়, মঞ্চ-প্রযোজনা, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী বললে দিগিনবাবুর বহুমুখী কৃতিত্বের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। নাট্যচিন্তায় প্রায়-একাগ্র তাঁর যে অনুরাগ তা কখনো রসাস্বাদের একক অনুভূতি-বিলাসে নিজেকে বাঁধতে দেয় নি। বহুজনের প্রকৃত 'সাহিত্য'-বিনা নাটক পরিকল্পনা, রচনা, প্রযোজনা, পরিবেশনা সম্ভব হয় না। নৃত্যে যেমন এক বা অনেকের পদক্ষেপে সঙ্গতি, সৌকুমার্য এবং ধ্বনি, তাল ও অঙ্গভঙ্গির সংহতিতে রসঘন অথচ শক্তিপুঞ্জ আলেখ্যের দৃষ্টি, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি বহুজনের মিলিত অভিনিবেশ ও প্রযত্ন হল প্রধান ও প্রমুখ প্রযোজন। চলমান জীবনেরই সত্য অথচ কঠোর, সুষ্ঠু অথচ প্রায়শ প্রশ্নাতুর, মনোহারী অথচ চিত্তোদ্দীপক টীকা না হলে নাটকের প্রকৃত সাফল্য ঘটে না। হয়তো বাগাড়ম্বর বলে মনে হবে, কিন্তু দিগিনবাবুর মতো মানুষ বাস্তবিকই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের ফলে নাট্যবিষয়ে সহজাত আকর্ষণকে ছাপিয়ে গভীরতর

অন্বিষ্ট নিয়ে নিবিষ্ট মনে পরিশ্রম করে চলছেন। আর সেজন্যই অনেক ঘাত-প্রতিঘাতকে তুচ্ছ করে আমাদের দেশের গণনাট্য আন্দোলনের শুধু নিষ্ঠাবান কর্মী নয়, তিনি হয়েছেন তার অন্যতম পথ-পরিচায়ক, তার প্রতিভূ, তার প্রবক্তা।

বহু অধ্যয়ন ও চিন্তার ফল যে এই বইটি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে, অনেকটা অকারণে, কিংবা অক্লেশে নিরুদ্ধ ব্যক্তিগত উষ্মা প্রকাশের তাগিদে, অথবা স্মৃতিভ্রংশ আর হয়তো বা বিচারবুদ্ধির স্বল্পতায় গণনাট্য আন্দোলন বিষয়ে অসার্থক আলোচনা হতে দেখেছি। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে দিগিনবাবু এই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। আজও সীমিত পরিস্থিতিতে যথাসাধ্য সেই আন্দোলনের সৌষ্ঠব ও সৃষ্টিগুণকে সার্থক চর্চা ও কীর্তির পথে নিয়ে যাবার প্রয়াসে তিনি লিপ্ত। একেবারে নৈর্ব্যক্তিক না হলেও গণনাট্যের ঐতিহাসিক ভূমিকার যে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাতে তুচ্ছ কিছু ভ্রান্তি হয়তো খুঁজে বার করা শক্ত নয় কিন্তু তাতে আছে সামগ্রিক সত্য। ঠিক এজন্যই গ্রন্থটি সমাদর পাবে ভরসা করি।

রচনার বিস্তৃতি অবশ্য এমন যে বিশেষত নানাসময়ে রচিত প্রবন্ধ একত্রিত হয়েছে বলে মাঝে মাঝে লেখার ঢঙে যেন তরলতা এসেছে। আধুনিক নাট্যসাহিত্যের প্রায় এক বিশ্বকোষের মতোই যেন এর পরিধি, তাই খুঁত বার করা খুব কঠিন হবার কথা নয়। কিন্তু আমার জানা আর-কোনো বই নেই যাতে এমন সুপরিব্যাপ্ত আলোচনার মাধ্যমে বর্তমান জগতের নাটক বিষয়ে দিগ্‌দর্শনের বিস্তৃত সুযোগ মেলে। গোটা আধুনিক দুনিয়ার ভাণ্ডার থেকে নাট্যরত্ন বাছাই করে তার যাচাই করেছেন লেখক। বাঙালি পাঠকের চিত্তোৎকর্ষ আর নাট্যামোদবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। ইবসেন, চেকভ থেকে শুরু করে ব্রেখট, সার্ত্র, গার্সিয়া লর্কা শুধু নয়, 'উদ্ভট নাট্যচিন্তা' নিয়ে ভাবতে আর সঞ্চরমান সংসারে তার প্রাসঙ্গিকতা বিচার করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। স্বীকার করব যে থেকে-থেকে তাঁর বিবরণ মনে একটু খটকা তুলেছে। এত বিপুল তাঁর চিত্রপট যে অতৃপ্তি এসে গেছে। কিন্তু এটা অনুযোগের সুরে বলছি না। প্রকৃতই দিগিনবাবুর রচনা থেকে আধুনিক নাট্যসাহিত্যের বিস্তার আর জটিলতা আর সর্ববস্তুর আচ্ছাদন ভেদ করে গভীরে প্রবেশের প্রায় অসম্ভব প্রযত্ন বিষয়ে আমাদের চেতনা স্পষ্টীকৃত হতে সহায়তা পাবে, আমাদের নাট্য রচনা ও সর্ব সমক্ষে তার রূপায়নের নব নব উন্মেষ হয়তো ত্বরান্বিত হবে।

দিগিনবাবুর লেখার একটি গুণ যে নাকতোলা ভাব কোথাও নেই, ভাষায় জাড্য নেই, পাণ্ডিত্য বাহুল্যের বড়াই নেই। আর আছে আমাদেরই বাংলা নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে শ্রদ্ধা—যেখানে মতানৈক্য সেখানেও শ্রদ্ধা। ইতিহাসবোধের গুণেই এই শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ মহাজন যে পরম্পরা সৃষ্টি করে গেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শচীন সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র প্রভৃতিকে উপস্থাপিত করেছেন। সমসাময়িক জীবনের যে সাযুজ্য-বিনা নাটকের সার্থকতা কণ্টকিত সেই সাযুজ্যের সন্ধান ও বিবরণ তিনি দিয়েছেন।

গণনাট্য আন্দোলনের অধ্যায়ে তার কীর্তি সম্বন্ধে অসূয়াবিক্ত সহজপাঠ্য এমন বৃত্তান্ত বিরল। লেখকের মানসিকতা থেকে কথঞ্চিৎ পার্থক্যবোধ যে আমার কখনও কখনও ঘটে নি তা নয়, কিন্তু এ হল তুচ্ছ। প্রকৃতই আজকের দিনে ত্রিশ টাকায় এমন একখানি বই তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করার সুপারিশ আমি খোশ মেজাজে করতে পারছি বলে সুখী।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লেখকের দায়ঃ সময় ও ব্যক্তি

সাংস্কৃতিক আন্দোলন—অতীত ও বর্তমান। সংকলন। গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সম্মিলনী, কেন্দ্রীয় কমিটি, ১৯৮০, জুলাই ১৯৮০। বারো টাকা।

দুশ পৃষ্ঠারও বেশি এই সংকলনে সম্ভব পৃষ্ঠা মতো বিবরণ আছে সংগঠনটির আট বছরের কাজকর্মের, নানা বিষয়ে নানা প্রস্তাবের পাঠসহ—সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনই এই সংকলনের উপলক্ষ—কিন্তু বাকি শ-দেড়েক পৃষ্ঠার গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ও কিছু ছবিতে এটি হয়ে ওঠে একটা রচনাসংগ্রহই। এত পরিচ্ছন্ন, বিন্যস্ত, সুমুদ্রিত বই পড়তে পাওয়া আজকাল তো সৌভাগ্য—নানা তাড়াহুড়োয় ও জিনিসপত্রের অভাবে ভালো ছাপা-বাঁধাইয়ের বই বের করা যখন বেশ দুর্ঘট। শুরুতে প্রকাশকের আক্ষেপ, 'নানা বাধাবিপত্তির জন্য, প্রকাশের বিলম্ব, তাই মনে হয় যেন শাপে বরই।

'সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এই ধরনের স্বতন্ত্র সংকলন প্রকাশ'—

প্রকাশক-সংগঠনের ঘোষিত উদ্দেশ্য। তার সঙ্গতিতেই প্রবন্ধ-গল্প-কবিতাগুলি সংগৃহীত।

এই ধরনের খুব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হয়তো সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বেলায় একটু অনড় ঠেকতে পারে কারো-কারো। সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অব্যবহিত চাপ ব্যক্তিজীবন বা ব্যক্তিসম্পর্কগুলিকে সরল করে দেয় না বরং যেন আরো জট পাকিয়েই যায় সেই বাস্তব। ব্যক্তি-সম্পর্ক আর সামাজিক-সম্পর্কের সেই জটিল বাস্তবতাতে ভয় পেয়েই এক ধরনের লেখক ব্যক্তিকে সমাজ থেকে সরিয়ে নেন। তেমনি আবার তার বিপরীতে ব্যক্তিকে শুধুই সময় আর সমাজের ভেতর আটকে নিলে ব্যক্তির রহস্য আর থাকে না—অথচ সেই রহস্যের টানেই তো লেখালেখি, আঁকাআঁকি।

সমাজ আর সময়ের দুই মাত্রায় বাঁধা মানুষের ব্যক্তি-রহস্যভেদে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষ পর্বের গল্প-উপন্যাসে নানারকম চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। তাঁর 'উত্তরকালের গল্প-সংগ্রহ' থেকে পরবর্তীদের চর্চার একটি আরম্ভ হতে পারে। এই সংকলনটির অনেকগুলি গল্প পড়েই মনে হয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এঁরা সেই আরম্ভ বিন্দু হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

তাতে ছবি বসু-র 'ধ্যামো'-র মতো গল্পে মানিকবাবুকে বড় বেশি মনে পড়ে যেতে পারে বটে, কিন্তু রাজনৈতিক দাঙ্গায় নিজেদের বাসস্থান থেকে উৎখাত এক দম্পতি, বিশেষ করে বউটি, তাদের বড় ভাই-মেজ ভাই আর ভাসুর-জা-দের সংসারে সম্পর্কের যে-টেনশনে পড়ে যায় তা হয়ে উঠতে চায় আমাদের এখনকার সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতেরই টেনশন, আর বউটির নেহাত ব্যক্তিগত এক অসুখ—মনের বা মাথার—ক্রমেই ব্যক্তি থেকে ছড়িয়ে পড়ে সমাজে আর তার আরোগ্যও ঘটে সামাজিকের মোকাবিলায়। এই বউটি যত বেশি ব্যক্তি হয়েছে, সামাজিক তত বেশিই প্রত্যক্ষ হয়েছে।

ব্যক্তি-সামাজিকের ঠিক এমনই দ্বন্দ্ব-সমন্বয় সব গল্পে ঘটে না হয়তো। 'নূতন জীবন'-এ (রামশঙ্কর চৌধুরী) আহ্লাদীর বাচ্চা হওয়া আর ধানের লড়াই এক সময়ে ঘটাতে ঘটনা বানাতে হয় বা 'পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭৩'-এ (কৃষ্ণ চক্রবর্তী) দুই প্রতিপক্ষ, দুই রাজনীতি, বাপ-ছেলের সম্পর্কের ব্যক্তিগতকে অতিক্রম করে যায় একটু সরল ভাবেই, 'গোলক'-এ (সাধন চট্টোপাধ্যায়) মতীশের পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে তার বদহজমি-রাতজাগার আত্মচিন্তার ধাক্কাতেই বা 'মুক্তি চাই'-এ (তপোবিজয় ঘোষ) রাজনৈতিক বন্দীর মায়ের

সাহিত্যিক আঁদ্রে জীদ্-এর ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাও তো সাব্‌জেকটিভ ও অনির্ভর-যোগ্য। কিন্তু তিনি যখন বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি যত না সোভিয়েতের পরিচয়, তার থেকে ঢের বেশি 'রবীন্দ্রনাথের মনের পরিচয়' তখন এই আপেক্ষিকতার বিচারে আমাদের মন সায় দেয় না। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত যে 'রাশিয়ার চিঠি' 'তথ্যগত সাক্ষ্য' ঠিক নয়, এবং এও সত্য যে এখানে আছে 'একটি অসামান্য মানুষের প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর'—কিন্তু তথ্যগত ঝোঁক না-থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধির যে জোরে ১৯৩০-এই এই নবীন সভ্যতার সমগ্রতার ছবি দেখেছিলেন ও এঁকেছিলেন, তাকে 'প্রধানত নিজের ভালোলাগা মন্দলাগার ইতিবৃত্ত' বলা যায় কি? সম্পাদক স্বয়ং এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায়ও ১৯৩০-এ সোভিয়েত রাশিয়ার বাস্তবতার কথা বলেছেন—তখনও বিপ্লবের সুফল ততটা প্রত্যক্ষ হয় নি—তখনও লড়াই ও পুনর্গঠনের কষ্টসাধ্য পর্ব চলেছে। জীদ যেখানে রাশিয়ার আনাজ-তরকারি বা বিয়ার উচ্চমানের নয় বলে আক্ষেপ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বোঝাতে চেয়েছেন, 'মনে রেখো, এখানে যে বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেছে ১৯১৭ খৃস্টাব্দে। অর্থাৎ তের বছর পার হল মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েছে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে। পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম' কিংবা 'আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর-আর সব জায়গায় ধনীদরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড় করে চোখে পড়ে—সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে, নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর, দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা-কিছু দেখতে পাই সমস্তই সুভদ্র, শোভন, সুপরিস্ফুট।...এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।' একে আমরা সাব্‌জেকটিভ বলব?

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বার বার, সব সময়, এসেছে দুর্গত ভারতবর্ষের কথা। ভূমিকায় সম্পাদক বিস্তারিত বলেছেন সেই দেশ ও কালের কথা। শান্তিনিকেতনে বা শ্রীনিকেতনে যে বিরুদ্ধতা ও সীমাবদ্ধতার

গত সেপ্টেম্বরের ১৯ থেকে ২১ কলকাতা প্রেস ক্লাবে সংবাদচিত্রের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল কলকাতার ফোটো জার্নালিস্টস ক্লাব-এর উদ্যোগে।

প্রদর্শনীতে এখনকার ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে গত ত্রিশ বছরের কিছু-কিছু ছবিও ছিল। ফলে ফোটো-সাংবাদিকতার একটা ধারাবাহিকতাই দেখা গেল। আমাদের দেশে এমন চেষ্টা খুব একটা হয় না। সেজন্য ফোটো জার্নালিস্টস ক্লাবকে ধন্যবাদ।

কিন্তু প্রদর্শনীটি দেখে একটু হতাশই লাগল। কিছু ছবিতে কল্পনাশক্তির পরিচয় আছে। কিছু ভালো অ্যাকশন ছবিও আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছবিই যেন অসচেতন, অসতর্ক ও অদক্ষ ফোটোগ্রাফারদের তোলা—এই ছবিগুলি দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষেও যেন অতিরিক্ত নির্জীব। আমাদের বিরাট দেশের বিচিত্র সমাজের দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাসের বিস্ময়কর রহস্যের কোনো ঘটনা ফোটো-সাংবাদিকদের মনকে নাড়া দেয় নি। কোথায় গেল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জীবনের নানা নাটকীয় মুহূর্ত? ছাত্র-কিশোরদের জীবনের বৈচিত্র্য? গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার নানা কৌতুক-কৌতূহলের দিক? এই প্রদর্শনী দেখে মনে হয় নেতাদের কিছু নির্জীব মুখের ছবি আর খেলার মাঠের কিছু মনোবাসনার ছবিতেই ফোটো-সাংবাদিকের তৃপ্তি ঘটে যায়। যে-সচেতনতা ও সমবেদনা একজন ফোটো-সাংবাদিককে ঠিক মুহূর্তটি ধরার জন্য কষ্ট স্বীকারে অনুপ্রাণিত করে তা থেকেই তার ছবিতে বিষয়ের গভীরতা আসে। আর সেই গভীরতাই এক-একটি ফোটোকে বাঙ্ময় করে তোলে।

হয় তো এই অবস্থার জন্য আমাদের সংবাদপত্রগুলিও অনেকখানি দায়ী। ভালো ছবির জন্য চাহিদা, ভালো ছবি ভালো ভাবে ছাপার জন্য জায়গা, কোনো ছবির যোগ্য মর্যাদা না থাকলে ফোটোগ্রাফারও উৎসাহিত হন না।

কয়েকটি ছবি বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। তারাপদ ব্যানার্জির একটি ছবি টাঙানো হয় নি কিন্তু ব্রসিওরে ছাপানো হয়েছে। প্রাক্তন

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় শেষরাবের মতো রাইটার্স ছেড়ে যাচ্ছেন। ফোটোর ফোকাসিং মুখ্যমন্ত্রীর বিশাল, কিছুটা আরামের, শূন্য চেয়ারে। সিদ্ধার্থবাবু, সঙ্গে বিষণ্ণ পার্শ্বচর। ছবিটি রহস্যময় ও নাটকীয় হয়ে উঠেছে। ছবিটির মুহূর্ত নির্বাচন এমনই চরম যে দেখেই বোঝা যায় কয়েক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হলেই পরিস্থিতির নাটকীয় সেন্টিমেন্ট নষ্ট হয়ে যেত।

পল্লব দত্ত বেশ ভালো কাজ করেছেন। বহরমপুরে ট্রেন দুর্ঘটনার ছবি ও টিয়ারগ্যাসের ধোঁয়ার ভেতর পুলিশ অফিসারের ছবি মনে ছাপ ফেলে। সুব্রত পত্রনবিশের ছবিতে আসাম আন্দোলনের ব্যাপকতা ধরা পড়েছে—ফ্ল্যাগ হাতে বাচ্চা ছেলের কাবিকেচারে। একটু সতর্ক সচেতনতাতেই একটা খুব প্রচলিত ঘটনা থেকেও কী নাটকীয় মুহূর্ত ধরে ফেলা যায়—এ-ছবিটিতে তার নজির। সুবিনয় দাশের 'ফ্লাইং সসার' বেশ কল্পনাপ্রবণ ছবি।

ত্রিশ বছরের পুরনো ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে কিন্তু এখন দেখে মনে হয় নেহরু, শেখ আবদুল্লা, বিধান রায়—এই নেতাদের ডাইনামিজম ফোটোগুলিতে আসে নি। অরিজিৎ ভট্টাচার্যের শিশু-হাতে মায়ের কান্না—বেশ সার্থক ছবি। পুরো প্রদর্শনীতে বোধহয় মাত্র এই একটি ছবিতেই সাধারণ মানুষের দিকে ক্যামেরা ধরা হয়েছে সমব্যথী ভালোবাসায়। শৈবাল মিত্রের খেলার ছবিটি বেশ ভালো কাজ। অলোক গুহের 'দি আই' ও মোহন নাগের 'গেম স্টার মন্দ নয়।

আশা করি, এই প্রদর্শনী আগামী বছরে এমন নতুন কিছু ছবি দেখাতে পারবে যাতে ফোটো-সাংবাদিকতার প্রকৃত ক্ষমতার আঁচ আমরা পাই।

অজয় দে

প্রীতিভাজনেষু—

৺বিজয়ার প্রীতি অভিনন্দন 'পরিচয়' ও তার কর্মী ও বন্ধু-বান্ধব সকলকে জানাবেন, এবং সপরিবারে আপনি গ্রহণ করবেন।

'পরিচয় শ্রাবণ-১৩৮৭/জুলাই ১৯৮০' সংখ্যা দিন দুই হল পেয়েছি—ভালো হয়েছে। মতামত থেকে 'বিয়োগপঞ্জী সব পড়া এখনো হয়নি, অনেকগুলিই পড়েছি। প্রশংসনীয়। পূজার 'পরিচয়' এ শহরে কোথাও কোথাও এসেছে, আমরা পাই নি। তার সুখ্যাতি (যোগ্য লোকের) মুখে শুনেছি।

'পরিচয়' তার মান পুনরুদ্ধার করছে। আপনারা যারা তা করলেন,—আমি অন্তত জানি দুঃসাধ্য এ কাজ—সকলে আমার ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানবেন।

ইতি শুভার্থী—
গোপাল হালদার

২

বাংলা গবেষণা সংসদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী বাংলাদেশ
তারিখ ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৮০

প্রিয় মহাশয়

আপনারা অনুগ্রহ করে আমার কাছে আপনাদের খ্যাতনামা পত্রিকা 'পরিচয়' নিয়মিত পাঠান। কিন্তু ডাকের গোলমালে অথবা অজ্ঞাত কোন কারণে মাঝে মাঝে 'পরিচয়' হাতে আসে না।

'বাংলা গবেষণা সংসদ' নামে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণের একটি সংস্থা

গঠন করে, আমরা এখানে বাংলা পঠন-পাঠনের উন্নতি এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণাকর্ম সংগঠিত ও উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি। 'পরিচয়' পত্রিকা আমাদের প্রয়াসে অনেকখানি সহায়তা দান করে। ··

'পরিচয়'-এর একটি পুরনো সংখ্যা আমাদের গবেষণা কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমরা সংখ্যাটির বিবরণ নিচে দিলাম।

পরিচয় সমালোচনা সংখ্যা ১৩৮৪, ৪৬ বর্ষ ৮-১০ সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩—বৈশাখ ১৩৮৪

আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

ইতি

কাজী আবদুল মান্নান

২৬ ১২ ৮০

৩

প্রিয়বরেষু ২৭ ১০ ৮০

পরিচয় শারদীয় সংখ্যা পেয়েছি। ঐতিহ্যসম্মত ভালো হয়েছে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

১৩ ১২.৮০

৪

'পরিচয়' সমালোচনা সংখ্যার বিভিন্ন লেখা নিয়ে তার পরের সংখ্যায় নানা মতামত দেখা গেল। বিশেষত অরুণ সেন-এর প্রবন্ধটি নিয়ে সিদ্ধার্থ রায় ও 'জনৈক পাঠক'-এর প্রায় পরস্পরবিরোধী মত আমাদের কৌতূহল জাগিয়েছিল যে এ নিয়ে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আরো ব্যাপক আলোচনা হবে। কিন্তু সম্ভবত শারদীয় সংখ্যা এ-বিষয়ে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শারদীয় সংখ্যার পরের সংখ্যাতেও এ-বিষয়ে কোনো আলোচনা না দেখে সন্দেহ হচ্ছে হয়ত এ-বিষয়ে আর কোনো মতামত প্রকাশিত হবে না।

অথচ এই সমালোচনা সংখ্যাটি নিয়ে, বিশেষত এই প্রবন্ধটি নিয়ে যে-আলোচনা ও মন্তব্য শুনেছি তাতে মনে হয় না যে এই আলোচনা এখানেই

থেমে গেছে। 'পরিচয়'-এর এই প্রবন্ধটিতে প্রথম এক বিস্তৃত পর্বের বাংলা কবিতার ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং এই আলোচনা কোনো অবস্থাতেই মাঝখানে থামানো উচিত নয়।

বহড়া অনিলেন্দু ধর

যে মতামত আমরা পেয়েছি তার থেকে নির্বাচিত কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ-বিষয়ে আলোচনা এখনো চলতে পারে। স পরিচয়

৫

এবারের শারদীয় সংখ্যায় আফসার আহমেদ-এর 'গোলাহ' গল্পটির জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের মুসলমান সমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রায় সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। কৃষক-আন্দোলন বা শ্রমিক-আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত গল্প-উপন্যাসে মুসলমান কৃষক ও শ্রমিক এসেছে বটে কিন্তু সে তো আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে। আফসার আহমেদ-এর গল্পে একটি সম্পন্ন মুসলমান পরিবারের অন্তঃপুর, পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির ভেতর সম্পর্ক, কোরাণ-আশ্রিত জীবনযাত্রা, পরিবারের দাসী-বাঁদীর অবস্থা এমন বিশ্বস্ততার সঙ্গে এসেছে যে ভাবতে আনন্দ হয় আপনারা এই বাণিজ্যিক সাহিত্যের যুগেও এমন তরুণ ও নতুন লেখককে এমনভাবে উৎসাহিত করছেন।

পাটনা-৩ বিমল মিত্র

আপনার 'সাইক্লোনের চোখ' গল্পটা পড়েছি। গল্পের detail-এর কাজ দারুণ, কিন্তু ঘটনা পরম্পরা পড়তে গিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আমার কাছে খোঁচা দিচ্ছে। হতে পারে আমার ভুল, আপনি নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট কোর্ট থেকে খবর নিয়েই লিখেছেন গল্পটা, তবু কৌতূহল নিরসনের জন্য জানাই :

১. এক্ষেত্রে ডিভোর্সের মামলাটায় যেহেতু কনটেস্ট হচ্ছে না এবং উভয় পক্ষই রাজী, সেক্ষেত্রে লেটেস্ট আইন অনুযায়ী সেসন-জজ বা অ্যাডিশনাল সেসন জজ ব্যাঙ্কের কোনো জজ দুপক্ষকে ইন ক্যামেরা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই সরাসরি ডিভোর্স দিতে পারেন। এক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট বলতে কি আপনি চিফ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটজাতীয় কোনো ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে চেয়েছেন? গল্প থেকে (অতো ডিটেলস সত্ত্বেও) জানা যায় না

ম্যাজিস্ট্রেট কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কি না। সেসন জজ অনেক সময় দু পক্ষকে ডিভোর্স না করার জন্য তাদের পরামর্শ দেন, বা পুনর্বিবেচনা করতে বলেন। গল্পে এ জায়গাটায় কিছু ফাঁক আছে বলে মনে হল। তাছাড়া সাধারণ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ডিভোর্স কেস শুনতে পারেন না। তাছাড়া গল্পে নায়ক-নায়িকার বাড়ি যথাক্রমে সল্ট লেক ও টালিগঞ্জ এলাকা বলে দেখানো হয়েছে। দুটো জায়গাই চিফ মেট্রপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর এলাকার বাইরে, অর্থাৎ আলিপুর সেসনস জজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে বিশদ জানতে চাই।

২. ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একহাজার টাকা দেওয়ার প্রশ্ন এলো কেন? এটা কি খোরপোষ?

৩. বাণ্ডিলটা যখন একহাজার টাকার এবং ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া তখন বাণ্ডিলে ইসুয়িং ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ারের সই ও শীল থাকা স্বাভাবিক। অবশ্য মিস অনিমা রায় যদি ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার আগে বাণ্ডিলটা না খুলে থাকেন।

৪. অনিমা রায় যখন বেইল পেয়েছেন, তখন একটা কেস শুরু করা হয়েছে নিশ্চয়ই, তাতে পরমহংসের বডি সার্চ-এর সঙ্গে বাড়িটার সার্চ ওয়ারেন্ট থাকা উচিত ছিল, জাল নোটের কারবার বলে যখন সন্দেহ করা হচ্ছে।

যাই হোক, এতো আইনের কচকচি দেখে হয়তো আপনি বিরক্ত হলেন। নিছক বিতর্কের খাতিরে প্রশ্নগুলো রাখলাম আপনার সামনে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের উত্তর

তপনবাবুকে ধন্যবাদ। তাঁর মতো পাঠক বেশি জুটলে বাংলা গল্পের গরু গাছে কমই উঠত। আমার যা জানা সেটুকু লিখছি।

১. সল্ট লেক আর টালিগঞ্জে তারা বেশিদিন নেই, টালিগঞ্জে তো গেছে ডিভোর্সের প্রস্তুতিতেই। আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো-একটি জায়গায় নির্দিষ্ট ক-বছর (পাঁচ বা দশ বোধহয়) থাকলে তবে সেখানকার আদালতে এ-আবেদন করা যায়। বিকল্প ব্যবস্থা—যেখানে বিয়ে হয়েছিল, সেটা যে-আদালতের আওতায়, সেখানে আবেদন করতে হবে। সুতরাং, সেই ভাবে তাদের কলকাতার সীমানার মধ্যেই—আলিপুর বা ব্যারাকপুর নয়—ডিভোর্স-আবেদনের সম্ভাবনা একটা আছে। সেটুকুকেই ব্যবহার

করেছি। তবে জানি না, এ-বিষয়ে আমি যাঁর কাছ থেকে জেনেছি, তিনি—ডিভোর্স-করানোতে বেশ হাতযশ আছে এমন একজন আইনজীবী—কিছু ভুল বলেছেন কি না।

২. ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে টাকা দেয়াটা ঘটনামাত্র—আইনের বাধ্যতা নয়। ঐ অবস্থাটায় দেখানো হয়েছে ছেলেটি টাকাটা বের করে কিছুটা অপ্রস্তুতের মতোই, যে জানেই না তার করণীয় কি ও উকিল একটু চাপাই দেয় ঘটনাটা—ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে। ম্যাজিস্ট্রেটও পরে পুলিশের কাছে ঘটনাটা সেভাবেই বলে।

৩ মেয়েটি তো টাকাটা খরচ করতে গিয়েই ধরা পড়েছে, তাহলে তো স্লিপ থাকতে পারে না—বা স্লিপটা কি অত নিশ্চিতভাবে থাকেই? সব সময়? না বোধহয়।

৪. সেগুলো তো পরেও ঘটতে পারে—।

শৈলেন মোহন্তর শেষ যাত্রা

শৈলেন মোহন্তর জন্ম হয় এক শিল্পানুরাগী পরিবারে—তাঁর পিতা ছিলেন শিল্পপ্রিয়, বিশেষ করে যাত্রা-পাগল আর তাঁর শ্বশুর গৌরচন্দ্র দাস ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাত্রার স্রষ্টা ও মালিক। তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে। রাজনীতি-জ্ঞান, সংগঠনঅভিজ্ঞতায় পুষ্ট সমাজ-সচেতন শিল্পী মন যেন পথ খুঁজে নিতে চাইছিল একটা সার্থক পরিণতির দিকে—ঘটনার গতিতে এসে পড়েন যাত্রাজগতে—তাঁরই শ্বশুরের সৃষ্টি সত্যন্বর অপেরায়—১৯৫৪।৫৫ সাল থেকে। ১৯৪০-৪২ সালে ছাত্র ফেডারেশনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসেন। দক্ষিণপূর্ব রেলে কাজ করার সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান।

যাত্রার উন্নতিকল্পে তিনি যাত্রা-মঙ্গল সমিতি গঠন করেন। যাত্রাকে জনপ্রিয় করার ও তাঁর গ্রামীণ শিল্পের মূল্যের দিক দিয়ে যথাযথ অবস্থানে দাঁড় করাবার জন্যে। যাত্রার এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, প্রসার ও চাহিদার মূলে প্রধান অবদান তাঁরই। যাত্রা-মঙ্গল সমিতি পরে যাত্রা সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়—তিনি হন তার সম্পাদক। সরকারের তরফ থেকে কোনো ব্যবস্থা না থাকায় দুঃস্থ দলকে এবং যাত্রা শিল্পীকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমা নিয়ে নানাভাবে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এই তিনটি মিলিয়ে সরকারের তরফ থেকে যাতে একটা সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়, তার চেষ্টা করেছেন। থিয়েটার ও সিনেমার নতুন নতুন কলাকৌশল যাত্রায় যাতে প্রয়োগ করা যায় যাত্রার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেও—তার জন্যে বহু কষ্ট, চিন্তা-ভাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষাও প্রয়োগ করেছেন।

১৯৬৫ সাল থেকে ৭১।৭২ সালের মধ্যে তিনি পরপর যুগান্তকারী নাটকের সৃষ্টি করে চলেন—'একটি পয়সা', 'পদধ্বনি', 'সিপাহী বিদ্রোহ', 'জালিয়ান-ওয়ালাবাগ', 'মাতঙ্গিনী হাজরা' প্রভৃতি। এর প্রতিটি নাটক করার পূর্বে তাঁর প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার তুলনা হয় না।

শৈলেন মোহন্তর জীবনাবসানে এই সব নানা কথাই মনে পড়ে।

কালী চৌধুরী

পরিচয়

৫০ বছরের 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত নির্বাচিত রচনার পুনর্মুদ্রণ

দ্বিতীয় সিরিজ, ১৯৮১

১. নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আত্মজীবনীর ওপর সুশোভন সরকারের প্রবন্ধ

২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ১৯৪২-এ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর ও ১৯৫২-তে ননী ভৌমিক-এর দুটি প্রবন্ধ

৩. রমেশচন্দ্র সেন-এর ছোটগল্প, 'সাদা ঘোড়া'

৪. দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছোট গল্প, 'মুহূর্ত'

৫. 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত কয়েকটি আন্দোলনের কবিতার সংকলন। প্রতিটির দাম ৫০ পয়সা। পাঁচটি একসঙ্গে ২ টাকা

বইমেলায় 'পরিচয়'-এর স্টলে পাওয়া যাবে

বইমেলায়

'পরিচয়'-এর স্টলে আসুন

'পরিচয়'-এর লেখকদের বই কিনুন

দাম ঃ দুই টাকা